বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র

সূচীপত্র

অসমাপ্ত ॥ ১
কবি কুণ্ডু মশায় ॥ ৬
সঞ্চয় ॥ ১৪
সিঁদুরচরণ ॥ ১৮
একটি কোঠাবাড়ীর ইতিহাস ॥ ২৫
বুধোর মায়ের মৃত্যু ॥ ৩২
রামতারণ চাটুজ্যে, অথর ॥ ৪০
অরণ্যকাব্য ॥ ৪৯
অসাধারণ ॥ ৫৬
কাঠ বিক্রি বুড়ো ॥ ৬১
সুলেখা ॥ ৬৪
রূপো-বাঙাল ॥ ৬৮
তেঁতুলতলার ঘাট ॥ ৭২
কম্পিটিশন ॥ ৭৭
ব্ল্যাকমার্কেট দমন করো ॥ ৮০
রাসু হাড়ি ॥ ৮৫
দৈব ঔষধ ॥ ৯২
বারিক অপেরা পার্টি ॥ ৯৭
মাছ চুরি ॥ ১০৪
বেসাতি ॥ ১০৮
উল্টোরথ ॥ ১১৪
অন্তর্জলি ॥ ১১৮
বোতাম ॥ ১২৮
খোলস ॥ ১৩৯
চৌধুরাণী ॥ ১৪৫
নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব ॥ ১৫৩
বরো বাগদিনী ॥ ১৫৯
গিরিবালা ॥ ১৬৩
চিঠি ॥ ১৭০
হাজারি খুঁড়ির টাকা ॥ ১৭৩
প্রত্যাবর্তন ॥ ১৭৯
পড়ে পাওয়া ॥ ১৮২
আমার ছাত্র ॥ ১৮৬
সংসার ॥ ১৯৩
হিঙের কচুরি ॥ ২০০
দুই দিন ॥ ২১০
অনুশোচনা ॥ ২১৪

সূচীপত্র

দাদু ॥ ২১৬
বাসা ॥ ২২৪
থনটন কাকা ॥ ২৩৫
ঝগড়া ॥ ২৩৯
বড় দিদিমা ॥ ২৫০
অবিশ্বাস্য ॥ ২৫৫
খেলা ॥ ২৫৮
জাল ॥ ২৬৪
আবির্ভাব ॥ ২৭১
বে-নিয়ম ॥ ২৭৪
অভিমানী ॥ ২৮১
পরিহাস ॥ ২৮৭
সীতানাথের বাড়ী ফেরা ॥ ২৯১
হরিকাকা ॥ ২৯৮
এমনিই হয় ॥ ৩০৪
ঝড়ের রাতে ॥ ৩১১
আর্টিস্ট ॥ ৩১৫
ননীবালা ॥ ৩১৯
আমার ডাক্তারী ॥ ৩২৫
বর্শেলের বিড়ম্বনা ॥ ৩৩১
কাদা ॥ ৩৩৪
অনুসন্ধান ॥ ৩৩৯
ভূত ॥ ৩৫৩
বিপদ ॥ ৩৫৬
আমোদ ॥ ৩৫৯
সতীশ ॥ ৩৬৪
অভিনন্দন সভা ॥ ৩৬৭
মরফোলজি ॥ ৩৭৩
ডালুর বিপদ ॥ ৩৮২
চ্যালারাম ॥ ৩৮৬
স্বপ্ন ও বাসুদেব ॥ ৩৮৯
রাজপুত্র ॥ ৪০৩
শেষ লেখা ॥ ৪০৬
তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প ॥ ৪১৪
ছেলে-ধরা ॥ ৪২৫
নুটি মন্তর ॥ ৪২৯
ফড় খেলা ॥ ৪৩৩

সূচীপত্র

বিরজা হোম ও তার বাধা ॥ ৪৩৭
কাশী কবিরাজের গল্প ॥ ৪৪২
মায়া ॥ ৪৪৬
ভৌতিক পালঙ্ক ॥ ৪৫২
টান ॥ ৪৫৭
ছায়াছবি ॥ ৪৬১
কবিরাজের বিপদ ॥ ৪৬৬
রহস্য ॥ ৪৭১
অশরীরী ॥ ৪৭৪
বাঘের মন্তর ॥ ৪৭৯
হারুণ অল রসিদের বিপদ ॥ ৪৮৪
মুখোশ ও মুখশ্রী ॥ ৪৮৮
কলহান্তরিতা ॥ ৪৯৩
মুক্তপুরুষ হরিদাস ॥ ৪৯৫
আচার্য কৃপালনী কলোনি ॥ ৫০১
জওহরলাল ও গড ॥ ৫০৬
পথিকের বন্ধু ॥ ৫০৯
এয়ার গান ॥ ৫১৩
সাহায্য ॥ ৫১৫
কালচিতি ॥ ৫১৮
দিবাবসান ॥ ৫২৪
মুশকিল ॥ ৫২৭
গল্প নয় ॥ ৫৩০
শিকারী ॥ ৫৩২
কয়লাভাঁটা ॥ ৫৩৬
কবি ॥ ৫৪১
যাচাই ॥ ৫৪৭
বিক্রমখোল ॥ ৫৫৪
অরণ্যে ॥ ৫৫৬
হাট ॥ ৫৬১
পিদিমের নীচে ॥ ৫৬৪
প্রভাতী ॥ ৫৭৪
মড়িঘাটের মেলা ॥ ৫৭৫
কুশল পাহাড়ী ॥ ৫৮০
উড়ুম্বর ॥ ৫৮৫
মানতালাও ॥ ৫৮৯
বিশ্ব-শিল্পী ॥ ৫৯৫
গ্রন্থপরিচয় ॥ ৫৯৯

কোন্নগরে সাহিত্য-সভা করিতে গিয়াছিলাম।

আমিই সভাপতি। টানা মোটরে কলিকাতা হইতে আমায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সভাস্থলে পেঁীছিয়া বেজায় খাতির, কলিকাতা হইতে সমাগত আরও কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর সহিত পুষ্পমাল্যশোভিত আমারও ফটো নেওয়া হইল স্থানীয় উৎসাহী সাহিত্য-বাতিকগ্রস্ত তরুণদের দ্বারা।

—এইবার আসুন, একটু জলযোগ—

—সভা কখন? সময় হল তো—

—সভার আগে সামান্য একটু চা—

বন্ধুদের দিকে ফিরিয়া বলিলাম—চল হে তবে। ওঁরা যখন নিতান্তই ছাড়বেন না—

—আসুন এদিকে—ইনিই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রামকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর, এখানকার জমিদার—

—ও! নমস্কার! হেঁ—হেঁ—

একগাল হাসিয়া রায় বাহাদুর প্রতিনমস্কার করিলেন।

—গরিবের বাড়ীতে—সামান্য একটু—হেঁ হেঁ—। আপনার নাম অনেকদিন থেকে শোনা ছিল। আজ বড় সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে দেখা হল। আপনার শাপমোচন পড়ে আমাদের বাড়ীর এরা কেঁদে বাঁচে না। আমি এখনও পড়ি নি। সময় পাই নে, মিউনিসিপ্যালিটির কাজ বড় বেশি—যদিও রিটায়ার করেছি, তবুও কাজের অন্ত নেই।—ওঁরই নাম বিনয়বাবু? আসুন আসুন, আপনার বইও—মানে, পড়ি নি—তবে নাম কে না শুনেছে আপনাদের বাংলা দেশে, বলুন!

আমরা সবাই খ্যাতির গর্বে স্ফীত হইয়া উঠি।

প্রকাণ্ড ঘর। মাঝখান জুড়িয়া লম্বালম্বি একখানা বড় টেবিল সাদা কাপড় দিয়া ঢাকা—চার পাঁচটা ফুলদানিতে ফুল সাজানো। বড় বড় চীনামাটির প্লেটে সিঙাড়া, কচুরি, নিমকি ও রসগোল্লা। কাচের গ্লাস সারি সারি ও কাচের জগে জল। চায়ের সরঞ্জাম।

—আসুন, বসুন—এই যে, আপনি এইদিকে—বিনয়বাবু এখানে। ওরে ফল কই? এখনও কাটা হয় নি? কখন আর কাটবি? নিয়ে আয়।...ওহে সুশীল, তোমরাও বসে পড়, দাঁড়িয়ে রইলে কেন সব? কেনারাম কোথায় গেল? ডেকে নিয়ে এস। বাঃ, চা খেয়ে নাও সকলে একসঙ্গে—না না, দেওয়ার লোকের অভাব হবে না।

—ওই ছবিখানা কার? বেশ সুন্দর চেহারা—

—আজ্ঞে, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের! ফ্রেঞ্চ গভর্নমেণ্টের দেওয়ান ছিলেন—একেবারে ডান হাত বা বাঁ হাত। আর ওই বাঁ পাশে আমার পিতামহ। আমাদের আদি বাড়ী শশধরপুর, নিমতের কাছে। আমার ঠাকুরদাদার বাবার নামে গ্রামের নাম—নিমতির দারোগা ছিলেন সেখানে। ওই অঞ্চলে জমিদারী কেনেন—ওরে সিঙাড়া আরও নিয়ে আয়—খান খান—গরম সিঙাড়া সব বাড়ীতে তৈরী—দোকানের জিনিস মশাই এ বাড়ীতে ঢোকে না। আমার বড়বৌমার হাতে ভাজা সব। বড় ছেলে? সে এখানে নেই—কাস্টম্স্-এ কাজ করে—এবার আড়াই-শ-হল—বিয়ে দিয়েছি আজ পাঁচ বছর—তার শ্বশুরও জমিদার—রায় সাহেব হরিনাথ বাঁড়ুজ্যে, হালিসহরের—নাম শুনেছেন বোধ হয়? চা দিয়ে যা এবার—

একটি বার-তের বছরের সুশ্রী বালিকা পান লইয়া আসিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে দরজার নিকট দাঁড়াইল।

—কি ওতে রে খুকি? পান? রাখ এখানে রাখ—এইটি আমার ছোট মেয়ে মিনতি। লজ্জা কি এঁদের কাছে। বেশ গান গায়, আজ সভাতে গাইবে এখন। আবৃত্তিতে আর বছর মেডেল পেয়েছিল—জলধর সেন শুনে কেঁদে ফেললেন একেবারে—

কর্তব্য ও শোভনতার খাতিরে খুকিটিকে কাছে ডাকিয়া দু-একটি মামুলি ছেঁদো

কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার আবৃত্তি পুনরায় আমাদের কাছে করিবার জন্য জিদ ধরি, এবং পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করি—তাহলে ওঠা যাক সব—কি বলেন? সভার টাইম তো হল—

—ওরে কানাই, গাড়ীখানা আনতে বল্ চট করে, গেটের কাছে নিয়ে আসুক—

—না না, গাড়ী কি হবে। দরকার নেই রায় বাহাদুর। হেঁটেই এটুকু—

—বিলক্ষণ! ক্লাব ঘর এখান থেকে দশ মিনিটের রাস্তা। হেঁটে যাবেন কেন, গাড়ী যখন রয়েছে—নিয়ে আয় রে—বলে দিলি না গাড়ীর কথা?

সদলবলে গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি এমন সময় একটি আট ন বছরের বালক পিছন হইতে আমায় ডাকিয়া বলিল—মা আপনাকে ডাকছে—

প্রায় চমকিয়া উঠিয়াছিলাম আর কি। বিস্ময় ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চাহিয়া বলিলাম, কাকে?—কে ডাকছেন বললে খোকা?

বালকটি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—আপনাকে মা ডাকছেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কারণ আমি এ স্থানে পূর্বে কখনও আসি নাই, বালকটি আমায় কখনও দেখে নাই ইহা নিশ্চিত। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের বাড়ী কোথায় খোকা?

আর একজন বলিলেন—আরে ও তো আমাদের হরিজীবনের ছেলে। তুমি হরিজীবনের ছেলে না? হ্যাঁ। ওই দোতলা বাড়ী। এঁকে ডাকছেন তোমার মা? এই বাবুকে?

বালক চারিদিক হইতে জেরায় একটু দমিয়া গিয়া সঙ্কোচের সুরে বলিল এই বাবুকেই তো মা বললেন ডাকতে। মা বললেন—যিনি চাদর গায়ে গাড়ীতে উঠছেন—

—যান মশাই, দেখে আসুন। ওর বাবার নাম হরিজীবন মুখুজ্যে, রেলে কাজ করে, আমাদের এখানে বাসা। চিনতে পেরেছেন? হরিজীবন এখন বাড়ী নেই, বোধ হয় ডিউটিতে গিয়েছে। তোমার বাবা বাড়ী আছেন খোকা?

বুঝিতে পারিলাম না কে হরিজীবন। কিন্তু এই বালকটির মুখের আদল আমার অত্যন্ত পরিচিত মনে হইল, যেন পূর্বে এ ধরনের মুখ কোথায় দেখিয়াছি।

বাড়ীর দরজায় পা দিতেই দরজার আড়াল হইতে যে হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়াই চমকাইয়া উঠিলাম। ইহাকে তো চিনি! অনেক দিন আগে ইহার সহিত খুব জানাশোনা ছিল। কিন্তু নাম কিছুতেই মনে আনিতে পারিলাম না। মেয়েটি আমার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—কি যতীনদা, চিনতে পারেন? কে বলুন তো?

—এস এস—থাক্। কল্যাণ হোক। ভাল আছ বেশ?...সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রাণপণে মেয়েটির নাম মনে আনিবার চেষ্টা করিলাম। আমার মনে পড়িল ইহার সঙ্গে আলাপ হইবার একমাত্র সম্ভবপর স্থান হইতেছে কৃষ্ণনগর, সেখানে থাকিয়া কলেজে পড়িয়াছিলাম—অন্য কোথাও মেয়েদের সঙ্গে আমার আলাপ হয় নাই। কিন্তু ষোল-সতের বৎসর পূর্বের সেই দিনগুলিতে, ভাবিয়া দেখিলাম অনেকগুলি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল শুধু এই কারণে যে, আমি যে বাড়ীতে থাকিতাম সে বাড়ীতে সঙ্গীতচর্চা উপলক্ষে পাড়ার অনেক মেয়ে জড়ো হইত। তাছাড়া কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা, ছোট ছোট মেয়েদের থিয়েটার প্রভৃতি সম্পর্কে মেয়েদের সাহায্য করিতে অনেকবার অনুরুদ্ধ হইতাম—সে উপলক্ষেও অনেক মেয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। সেখানেই যদি ইহার সহিত দেখাশুনা হইয়া থাকে তবে নাম মনে আনিবার চেষ্টা বৃথা। কারণ their name is Legion.

—বসুন যতীনদা।

—ইয়ে—গিয়ে, বসব বটে, কিন্তু ঘুরে আসি, সভা রয়েছে কিনা? সভার টাইম প্রায় হয়ে গেল।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—উঃ, আপনি আবার সাহিত্যিক হয়েছেন, সভায় সভাপতিত্ব করবেন, এসব ভাবলে আমার হাসি পায়। উঃ কি বখাটেই ছিলেন!

চুপ করিয়া রহিলাম—যদিও ঠিক বুঝিলাম না আমার মধ্যে বখাটেগিরির কি দেখিয়াছিল এ। এবং আমার তো মনে হয় না আমি সত্যিকারের বখাটে যাহাকে বলে, তাহা

ছিলাম কোনদিন। কিন্তু তাহা লইয়া তর্ক তুলিবার ইহা সময় নয়।

মেয়েটি আবার বলিল—কতদিন ভেবেছি আপনি কোথায় চলে গেলেন, আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না! কিন্তু ভগবান দেখা করিয়ে দেন এমনি করে।

আমি এবার ইহাকে অনেকখানি মনে আনিতে পারিয়াছি।

জিজ্ঞাসা করিয়াই ফেলিলাম—তোমার নাম শান্তি না?

মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—কেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে নাকি?

বলিতে পারিলাম না যে, সন্দেহ তো দূরের কথা, নামটাই মনে ছিল না এতক্ষণ। কিন্তু এবার ইহাকে বুঝিয়া ফেলিয়াছি। আজ পনের-ষোল বছর আগে ইহার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল—তার পর আর কখনও দেখি নাই বটে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে অতগুলি মেয়ের মধ্যে এই মেয়েটির ব্যবহার ছিল সর্বাপেক্ষা আন্তরিক ও সরল, তখনকার মনোভাবে আমি ইহাকে সেইজন্যেই আমল দিই নাই—গায়েপড়া বলিয়া মনে করিতাম।

শান্তি বলিল—আপনি আজকাল থাকেন কোথায়?

—কলকাতাতেই আছি আজ আট ন বছর। খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করি।

—বিয়ে করেছেন?

—বহুদিন।

—ছেলেপিলে হয়েছে?

—চার মেয়ে। আর কিছু শুনতে চাও?

—বাজে কথা। আপনি কক্ষনো বিয়ে করেন নি।

—এ কথা ভাববার হেতু কি?

—আপনাকে আমি খুব ভালই জানি। আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। বলুন সত্যি কি না?

হাসিয়া ফেলিলাম, সঙ্গে সঙ্গে বড় ভালও লাগিল। পনের বছর পূর্বে এক-আধ বছরের জন্য যে মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ধরনের আলাপ হইয়াছিল তাহাকে আমার চরিত্র ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে এমন নিঃসন্দিগ্ধ মত প্রকাশ করিতে দেখিয়া ভাল লাগিবার কথা বটে। এ এমন এক ধরনের আত্মীয়তা যাহা অন্য কোনও উপায়ে প্রকাশ করা যায় না, বা অন্য কোনও ধরনের ব্যবহার দ্বারা ইহার স্থানও পূর্ণ হয় না!

বলিলাম—ধরে যখন ফেলেছ শান্তি, তখন মিথ্যে বলে লাভ নেই। বিয়ে এখনও করি নি।

শান্তি সগর্বে বলিল—দেখুন, বললাম যে আপনাকে তখনই আমি চিনে ফেলেছিলাম, ঠিক কিনা ভাল করে বলুন এবার।

বলিলাম—তাহলে এখন আমি আসি শান্তি—সভার পরে না হয় আসব এখন একবার। তোমার স্বামী কখন আসবেন? আলাপ হলে বেশ আনন্দ হত। সন্ধ্যের পর? বেশ. আমারও আসতে রাত আটটা বাজবে, বুঝেছ।

—এখানে আজ রাত্রে খাবেন কিন্তু, বলা রইল।

সভার পরে পুনরায় শান্তির ওখানে ফিরিতে প্রায় রাত নয়টা বাজিল। শান্তির স্বামীর সঙ্গে আলাপ হইল—বেশ ভাল লোক। আমার আসিবার খবর শুনিয়া ভদ্রলোক বাছিয়া বাছিয়া বাজার করিয়াছেন, সব রান্না শেষ করিতে শান্তির বেশ সময় লাগিবে—রাত দশটার কমে রান্না সাঙ্গ হইবে বলিয়া মনে হইল না। শান্তি চা করিয়া দিয়া গেল। আমি বসিয়া তাহার স্বামীর সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম।

একবার শান্তি রান্নাঘর হইতে আসিয়া বলিল—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে?

—ও জিনিসটির প্রাদুর্ভাব তোমাদের আতিথেয়তার কল্যাণে আদৌ হবার উপায় নেই। এসে পর্যন্ত খাওয়া চলছে। তুমি নিরুদ্বেগে বসে রাঁধতে পার যতক্ষণ খুশি।

আহারাদির পরে শান্তি বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। শান্তির স্বামী দু-একবার হাই তুলিয়া বলিলেন—আমার কাল খুব সকালে ডিউটি—যদি কিছু মনে না করেন. আমি

কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার আবৃত্তি পুনরায় আমাদের কাছে করিবার জন্য জিদ ধরি, এবং পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করি—তাহলে ওঠা যাক সব—কি বলেন? সভার টাইম তো হল—

—ওরে কানাই, গাড়ীখানা আনতে বল্ চট করে, গেটের কাছে নিয়ে আসুক—

—না না, গাড়ী কি হবে। দরকার নেই রায় বাহাদুর। হেঁটেই এটুকু—

—বিলক্ষণ! ক্লাব ঘর এখান থেকে দশ মিনিটের রাস্তা। হেঁটে যাবেন কেন, গাড়ী যখন রয়েছে—নিয়ে আয় রে—বলে দিলি না গাড়ীর কথা?

সদলবলে গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি এমন সময় একটি আট ন বছরের বালক পিছন হইতে আমায় ডাকিয়া বলিল—মা আপনাকে ডাকছে—

প্রায় চমকিয়া উঠিয়াছিলাম আর কি। বিস্ময় ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চাহিয়া বলিলাম, কাকে?—কে ডাকছেন বললে খোকা?

বালকটি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—আপনাকে মা ডাকছেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কারণ আমি এ স্থানে পূর্বে কখনও আসি নাই, বালকটি আমায় কখনও দেখে নাই ইহা নিশ্চিত। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের বাড়ী কোথায় খোকা?

আর একজন বলিলেন—আরে ও তো আমাদের হরিজীবনের ছেলে। তুমি হরিজীবনের ছেলে না? হ্যাঁ। ওই দোতলা বাড়ী। এঁকে ডাকছেন তোমার মা? এই বাবুকে?

বালক চারিদিক হইতে জেরায় একটু দমিয়া গিয়া সঙ্কোচের সুরে বলিল এই বাবুকেই তো মা বললেন ডাকতে। মা বললেন—যিনি চাদর গায়ে গাড়ীতে উঠছেন—

—যান মশাই, দেখে আসুন। ওর বাবার নাম হরিজীবন মুখুজ্যে, রেলে কাজ করে, আমাদের এখানে বাসা। চিনতে পেরেছেন? হরিজীবন এখন বাড়ী নেই, বোধ হয় ডিউটিতে গিয়েছে। তোমার বাবা বাড়ী আছেন খোকা?

বুঝিতে পারিলাম না কে হরিজীবন। কিন্তু এই বালকটির মুখের আদল আমার অত্যন্ত পরিচিত মনে হইল, যেন পূর্বে এ ধরনের মুখ কোথায় দেখিয়াছি।

বাড়ীর দরজায় পা দিতেই দরজার আড়াল হইতে যে হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়াই চমকাইয়া উঠিলাম। ইহাকে তো চিনি! অনেক দিন আগে ইহার সহিত খুব জানাশোনা ছিল। কিন্তু নাম কিছুতেই মনে আনিতে পারিলাম না। মেয়েটি আমার পায়ের ধূলো লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—কি যতীনদা, চিনতে পারেন? কে বলুন তো?

—এস এস—থাক্। কল্যাণ হোক। ভাল আছ বেশ?...সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রাণপণে মেয়েটির নাম মনে আনিবার চেষ্টা করিলাম। আমার মনে পড়িল ইহার সঙ্গে আলাপ হইবার একমাত্র সম্ভবপর স্থান হইতেছে কৃষ্ণনগর, সেখানে থাকিয়া কলেজে পড়িয়াছিলাম—অন্য কোথাও মেয়েদের সঙ্গে আমার আলাপ হয় নাই। কিন্তু ষোল-সতের বৎসর পূর্বের সেই দিনগুলিতে, ভাবিয়া দেখিলাম অনেকগুলি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল শুধু এই কারণে যে, আমি যে বাড়ীতে থাকিতাম সে বাড়ীতে সঙ্গীতচর্চা উপলক্ষে পাড়ার অনেক মেয়ে জড়ো হইত। তাছাড়া কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা, ছোট ছোট মেয়েদের থিয়েটার প্রভৃতি সম্পর্কে মেয়েদের সাহায্য করিতে অনেকবার অনুরুদ্ধ হইতাম—সে উপলক্ষেও অনেক মেয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। সেখানেই যদি ইহার সহিত দেখাশুনা হইয়া থাকে তবে নাম মনে আনিবার চেষ্টা বৃথা। কারণ their name is Legion.

—বসুন যতীনদা।

—ইয়ে—গিয়ে, বসব বটে, কিন্তু ঘুরে আসি, সভা রয়েছে কিনা? সভার টাইম প্রায় হয়ে গেল।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—উঃ, আপনি আবার সাহিত্যিক হয়েছেন, সভায় সভাপতিত্ব করবেন, এসব ভাবলে আমার হাসি পায়। উঃ কি বখাটেই ছিলেন!

চুপ করিয়া রহিলাম—যদিও ঠিক বুঝিলাম না আমার মধ্যে বখাটেগিরির কি দেখিয়াছিল এ। এবং আমার তো মনে হয় না আমি সত্যিকারের বখাটে যাহাকে বলে, তাহা

ছিলাম কোনদিন। কিন্তু তাহা লইয়া তর্ক তুলিবার ইহা সময় নয়।

মেয়েটি আবার বলিল—কতদিন ভেবেছি আপনি কোথায় চলে গেলেন, আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না! কিন্তু ভগবান দেখা করিয়ে দেন এমনি করে।

আমি এবার ইহাকে অনেকখানি মনে আনিতে পারিয়াছি।

জিজ্ঞাসা করিয়াই ফেলিলাম—তোমার নাম শান্তি না?

মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—কেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে নাকি?

বলিতে পারিলাম না যে, সন্দেহ তো দূরের কথা, নামটাই মনে ছিল না এতক্ষণ। কিন্তু এবার ইহাকে বুঝিয়া ফেলিয়াছি। আজ পনের-ষোল বছর আগে ইহার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল—তার পর আর কখনও দেখি নাই বটে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে অতগুলি মেয়ের মধ্যে এই মেয়েটির ব্যবহার ছিল সর্বাপেক্ষা আন্তরিক ও সরল, তখনকার মনোভাবে আমি ইহাকে সেইজন্যেই আমল দিই নাই—গায়েপড়া বলিয়া মনে করিতাম।

শান্তি বলিল—আপনি আজকাল থাকেন কোথায়?

—কলকাতাতেই আছি আজ আট ন বছর। খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করি।

—বিয়ে করেছেন?

—বহুদিন।

—ছেলেপিলে হয়েছে?

—চার মেয়ে। আর কিছু শুনতে চাও?

—বাজে কথা। আপনি কক্ষনো বিয়ে করেন নি।

—এ কথা ভাববার হেতু কি?

—আপনাকে আমি খুব ভালই জানি। আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। বলুন সত্যি কি না?

হাসিয়া ফেলিলাম, সঙ্গে সঙ্গে বড় ভালও লাগিল। পনের বছর পূর্বে এক-আধ বছরের জন্য যে মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ধরনের আলাপ হইয়াছিল তাহাকে আমার চরিত্র ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে এমন নিঃসন্দিগ্ধ মত প্রকাশ করিতে দেখিয়া ভাল লাগিবার কথা বটে। এ এমন এক ধরনের আত্মীয়তা যাহা অন্য কোনও উপায়ে প্রকাশ করা যায় না, বা অন্য কোনও ধরনের ব্যবহার দ্বারা ইহার স্থানও পূর্ণ হয় না!

বলিলাম—ধরে যখন ফেলেছ শান্তি, তখন মিথ্যে বলে লাভ নেই। বিয়ে এখনও করি নি।

শান্তি সগর্বে বলিল—দেখুন, বললাম যে আপনাকে তখনই আমি চিনে ফেলেছিলাম, ঠিক কিনা ভাল করে বলুন এবার।

বলিলাম—তাহলে এখন আমি আসি শান্তি—সভার পরে না হয় আসব এখন একবার। তোমার স্বামী কখন আসবেন? আলাপ হলে বেশ আনন্দ হত। সন্ধ্যের পর? বেশ. আমারও আসতে রাত আটটা বাজবে, বুঝেছ।

—এখানে আজ রাত্রে খাবেন কিন্তু, বলা রইল।

সভার পরে পুনরায় শান্তির ওখানে ফিরিতে প্রায় রাত নয়টা বাজিল। শান্তির স্বামীর সঙ্গে আলাপ হইল—বেশ ভাল লোক। আমার আসিবার খবর শুনিয়া ভদ্রলোক বাছিয়া বাছিয়া বাজার করিয়াছেন, সব রান্না শেষ করিতে শান্তির বেশ সময় লাগিবে—রাত দশটার কমে রান্না সাঙ্গ হইবে বলিয়া মনে হইল না। শান্তি চা করিয়া দিয়া গেল। আমি বসিয়া তাহার স্বামীর সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম।

একবার শান্তি রান্নাঘর হইতে আসিয়া বলিল—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে?

—ও জিনিসটির প্রাদুর্ভাব তোমাদের আতিথেয়তার কল্যাণে আদৌ হবার উপায় নেই। এসে পর্যন্ত খাওয়া চলছে। তুমি নিরুদ্বেগে বসে রাঁধতে পার যতক্ষণ খুশি।

আহারাদির পরে শান্তি বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। শান্তির স্বামী দু-একবার হাই তুলিয়া বলিলেন—আমার কাল খুব সকালে ডিউটি—যদি কিছু মনে না করেন. আমি

গিয়ে শুয়ে পড়ি—

—বিলক্ষণ। শোবেন বই কি। আমিও তাহলে—

—শান্তি, তুমি বরং বসে গল্প কর। আমি যাই। এ'র বিছানা করে রেখেছ তো? মশারিটা খাটিয়ে দিও।—স্বামী উঠিয়া চলিয়া গেলে শান্তি বলিল—ঘুম পেলে শুনছি নে কিন্তু। আজ সারা রাত বসে গল্প করতে হবে। কতকাল পরে দেখা!

—সারা রাত! বল কি!

হঠাৎ শান্তি বলিল—কেন না? আপনি আমায় কত কষ্ট দিয়েছিলেন জানেন?

আমি অবাক হইয়া ওর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম—কিসের কষ্ট?

—কিসের কষ্ট জানেন না তো? জানবেনই বা কি করে। আচ্ছা দাঁড়ান দেখাচ্ছি। বলিয়াই সে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটি ছোট কাঠের বাক্স আনিয়া আমার সামনে খুলিল। একটা পত্র আমার সামনে ধরিয়া বলিল—দেখুন পড়ে।

পড়িয়া দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। আমার মাসীমা পরলোক গমন করিয়াছেন আজ দশ বছর কি তার বেশি। তাঁর হাতের লেখা খুব ভাল করিয়াই চিনি। মাসিমা শান্তির মাকে চিঠিতে আমার সহিত শান্তির বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন এই চিঠিতে।

বলিলাম—তুমি এ পত্র পেলে কোথায়?

—যেদিন এ পত্র এসেছিল, সেই দিনটি থেকে পত্রখানা আমার কাছে। আপনিও তার পর আর কখনও আজিমগঞ্জে যান নি। সেই শ্রাবণ মাসে যে চলে এলেন—এই আবার এতকাল পরে দেখা।

—কিন্তু আমি এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানতাম না একথা বললে তুমি কি বিশ্বাস করবে শান্তি?

শান্তি অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—জানতেন না মানে? সব জানতেন।

—কেন বল তো তুমি একথা বলছ?

শান্তি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—সব জানি যতীনদা, সব জানি। আমার চোখে আবার ধুলো দেবার চেষ্টা? একবার তো করে দেখলেন, ঠকে গেলেন নিজেই।

—কি চেষ্টা করলুম তোমার চোখে ধুলো দেবার?

—ওই যে বললেন বিয়ে করেছেন, চার মেয়ে হয়েছে। আমি আর জানি নে আপনাকে? বিয়ে আবার আপনি করবেন! কেন বিয়ে করেন নি, তাও কি আমার অজানা ভাবছেন? এক এক সময় তাই মনে হয়েছে, এই ষোল বছরের মধ্যে—যদি কখনও দেখা হয়, পায়ে ধরে আপনার কাছে মাপ চেয়ে নেব। আমি তো গিয়েছিই—আপনি কেন যাবেন সেই সঙ্গে? —সেই কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম এতকাল পরে।

বিস্ময়ে আমার মুখে কথা যোগাইল না। শান্তি বলে কি! এমন ভুলও মানুষের হয়? সমস্ত কথাটা বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় নয় এটা—তবুও এক চমকে ইহার মনের অনেকখানিই দেখিতে পাইলাম। সভা করিতে আসিয়াছি বিদেশে, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া এতখানি দরদ দেখাইবার ঠিকমত কারণ আমি অনেক হাতড়াইয়া খুঁজিয়া পাইতে-ছিলাম না—অনেকখানি পরিষ্কার হইয়া গেল এবার।

কিন্তু মেয়েটি, কি ভুলই নিজের বুকের মধ্যে এই ষোল বছর পুষিয়া রাখিয়াছে! আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল কতকগুলি কথা জানিবার। বলিলাম—আজ যখন এখানে এলাম, তুমি কি করে আমায় চিনলে এতকাল পরে?

—সভার জন্যে কাগজ ছাপিয়ে বিলি করেছিল—আপনার নাম দেখলাম। তা ছাড়া স্মরজিৎবাবুর ছেলে আপনার পরিচয় সেদিন দিচ্ছিল ওঁর কাছে আমাদের বাড়ী বসে। আমি তখনই ওঁকে বললাম, যতীনদা আমার বাপের বাড়ীর দেশের লোক। উনি বললেন, রায় বাহাদুরের বাড়ী আপনাদের চা খাওয়ার আয়োজন হয়েছে—তাই শুনে জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

—দেখেই চিনলে এতকাল পরে?

—ওমা, কেন চিনব না! আপনারা আমাদের ভাবেন কি?

এখন ইহাকে ভাল করিয়াই মনে পড়িয়াছে—আমার কিছুদিনের বাল্যসঙ্গিনী একটি অত্যন্ত মুখরা, চঞ্চলা বালিকার ছবি। আবছায়াভাবে ইহার দু-একটি বাল্যলীলাও মনে পড়িতেছে।

বলিলাম—শান্তি, নিতাইয়ের মা সেই বুড়ো গিন্নীর শিব চুরির কথা মনে পড়ে?

শান্তি হাসিয়া বলিল—খু-উ-ব। চুরি করলেন আপনি আর ধনা—ধনাকে মনে আছে? —সে আজকাল পাটের কলে কাজ করে নৈহাটিতে, মধ্যে একদিন এখানে এসেছিল আজ বছর তিন চার আগে—আর গাল খেয়ে মলুম আমি আর ছোড়দি।

—কেন, তোমরা তো সাহায্য করেছিলে, কর নি? পুজোর ঘরের শেকল তুলে দিতে বলেছিল বুড়ো গিন্নী—শেকল তুলে না দিয়ে বলেছিলে, দিয়েছ। আর একদিন তুমি জাঁতি দিয়ে আঙ্গুল কেটে ফেলেছিলে মনে আছে? কেঁদেছিলে খুব।

শান্তি ছেলেমানুষের মত মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল—হ্যাঁ, কেঁদেছিলে খুব! ছাই মনে আছে। কাঁদবার মেয়েই আমি ছিলাম কিনা।

—তবু যদি আমার মনে না থাকত!

—কি মনে আছে শুনি?

—মনে আছে তুমি কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলে।

শান্তি অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া বলিল—ওমা, কি মিথ্যেবাদী!

আমার হাসি পাইল। বলিলাম—ছেলেবেলার মত ঝগড়া পাকিয়ে তুলছ শান্তি! অভ্যেস কি কখনও যায়!

শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা, যতীনদা—শিবতলার বটগাছে ভারা বেঁধে দিতে তো ফি বছর পরীক্ষার আগে—খুলেছিলে কোনদিন?

সত্যিই অনেক কথা দেখিতেছি মনে রাখিয়াছে শান্তি। আমার নিজেরই মনে ছিল না। মেয়েরা বড় মনে রাখে।

রাত অনেক। শান্তি বলিল—আর না যতীনদা, রাত হয়েছে, শুতে যান। যদিও আমার ইচ্ছে করছে আজ সারারাতটা আপনার সঙ্গে বসে গল্প করি। কাল সকালে উঠেই যেন চলে যাবেন না, খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে—

—কাল 'তা কি করে হবে শান্তি? কাল সোমবার, সব খোলা—খেয়ে যেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। আমি সকালে চা খেয়েই চলে যাব।

শান্তি কর্তৃত্বের সুরে বলিল—সে হবে এখন। সেজন্যে আপনার ভাবতে হবে না —কাল সকালে উঠে দুটো আপিসের ভাত দিতে আমার আর হাত পা খোঁড়া হয়ে যাবে না।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিলাম ব্যাপারখানা। শান্তিকে প্রতারণা করিলাম বটে, স্বীকার করি সেটা বড়ই খারাপ কাজ, কিন্তু সত্য কথা খুলিয়া বলিলেই কি সে খুশী হইত? ওর জীবনে হয়তো এইটুকু ভাবিয়াই উহার সুখ—কেন সে সুখটুকু নষ্ট করিব?

পরদিন সকালে না খাওয়াইয়া শান্তি কি ছাড়ে! খুব ভোরে উঠিয়া এটা সেটা রাঁধিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সাড়ে আটটায় আমার গাড়ী। তার অনেক আগে সে আমায় চার পাঁচ রকমের তরকারি করিয়া খাওয়াইয়া দিল।

পায়ের ধূলো লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল আবার কবে আসবেন দাদা?

—সময় তো পাই নে। তবে—ইয়ে—আসব বইকি।

হঠাৎ খপ করিয়া আমার হাত দুখানা তাহার দুই হাতের মধ্যে লইয়া আর্দ্র কণ্ঠে অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল—না দাদা, আমি সব জানি, সব বুঝি। আপনি যে নিজের জীবনটা এভাবে কাটিয়ে দিলেন, সেজন্যে আমার মনে তুষের আগুন জ্বলে দিন-রাত। আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, রাখবেন বলুন?

—কি অনুরোধ বল শান্তি।

—আপনি বিয়ে করুন—করতেই হবে আপনাকে বিয়ে। আমার অপরাধের বোঝা আর বাড়াবেন না। বলুন অনুরোধ রাখবেন?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। এ কথার কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না।

শান্তি আবার বলিল—চুপ করে থাকলে হবে না! আমার কাছে বলে যান।

—আচ্ছা, ভেবে দেখি শান্তি।

—বেশ, তা ভাবুন। এইটুকু যে বলেছেন এবার সেই যথেষ্ট। আবার এই মাঘ মাসে সরস্বতী পুজোর সময় আসবেন বলুন?

—আচ্ছা, তা বরং—

—না, ওসব শুনব না। বরং টরং না, আসতেই হবে বলে দিলাম। আমি পথের দিকে চেয়ে থাকব।

—আসব।

পথে উঠিয়া দেখি, শান্তি রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীর কাছে ঘটনাটা বলিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না বলাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম।

কবি কুণ্ডু মশায়

আজ দশ বৎসর পূর্বে এ ঘটনার প্রথম আরম্ভ। আমি খুব আশ্চর্য হয়েছি বলেই এ গল্প লিখতে বসেছি। পুজোর সময় প্রত্যেক লেখকের কাছেই সম্পাদকের তাগিদ যায় 'মশাই, গল্প দেবেন একটা যত সত্বর হয়।'

এঁরা হলেন পেশাদার গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক। হাতে পয়সা না পেলে এঁদের মন ভার হয়ে ওঠে, লেখনীও বিরূপ হয়। 'গল্প আছে, টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন।' কেনই বা বলবেন না, লেখকদেরও তো খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে।

খুব বড় একটা সাহিত্যসভায় বসে কথাটা মনে হয়েছিল। পত্রপুষ্পশোভিত তোরণদ্বার, মস্ত বড় মণ্ডপ, বহু বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যামোদী জনগণের সমাগম, আদর-আপ্যায়নও যথেষ্ট। পল্লীগ্রামের অজ্ঞাতনামা কত কবিযশঃপ্রার্থী হতভাগ্যদের সঙ্গে আমার কতবার পরিচয় ঘটেছে, কোনও সাহিত্যসভায় তাদের স্থান হয়নি কোনদিন। অথচ তাদের মধ্যে প্রকৃত কবিমন, কল্পনার উদার প্রসার, ছন্দের বা কোনও শব্দের সৌন্দর্য সম্বন্ধে জ্ঞান নিতান্ত দুর্লভ নয়—কিন্তু তাদের নেই কি, তাও আমি জানি। তাদের নেই বর্তমানের উপযোগী বিষয় নির্বাচনের ক্ষমতা। তাদের দৃষ্টি ১২৯০ সালের বাংলায় পড়ে আছে আজও—ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের, দাশরথি রায়ের প্রভাব তারা আজও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

সেবার গরমের ছুটিতে দেশে আছি।

রাত প্রায় এগারটা বাজে, বিছানায় ছটফট করার পরে একটু নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে মাত্র।

—আছেন নাকি শ্যামবাবু?

এত রাত্রে অপরিচিত সুরে কে ডাকে বুঝতে না পেরে বাইরে এসে বললাম—কোথা থেকে আসছেন?

অন্ধকার রাত। দেখলাম আগন্তুক বিনা আলোয় এসেছে, যেখান থেকেই আসুক। লণ্ঠন জেলে বাইরে আবার গিয়ে আগন্তুকের চেহারা ভাল করে দেখলাম। বৃদ্ধ লোক, ষাটের কাছাকাছি বয়স, গায়ে আধময়লা পিরান, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো—বগলে এক তাড়া বই বা কাগজ।

আগন্তুক বলল—আমায় চিনতে পারলেন না? আমাকে সকলে কুণ্ডু মশাই বলে জানে। বসাকদের কাপড়ের গুদোমে কাজ করি বল্লভপুরের বাজারে। তা আপনারা দেশে ঘরে থাকেন না, গরমের ছুটির পরই চলে যাবেন—চিনবেন কি করে।

কথাটা সত্যি। দেশে থাকলে চিনতাম বই কি—দেশেরই লোক যখন। বললাম—কি জন্যে আসা হয়েছে?

—আপনি একজন রাইটার লোক, আমার লেখা কবিতা কিছু আপনাকে আজ শোনাতে এসেছি।

—ও, বসুন বসুন। সে বেশ কথা। দাঁড়ান একটা কিছু পাতি।

দস্তুরমত অবাক হয়ে গেলাম। বল্লভপুরের বাজার এখান থেকে দু' মাইলের সামান্য কিছু বেশি, এত রাত্রে নিছক কবিতা শোনাতে লোকটা কষ্ট করে এতদূর এসেছে—না, এমন ব্যাপার যে দেখিনি আদৌ একথা বললে ভুল হবে—জীবনে বার কয়েক এ প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে এবং আমি এদের ভালও বাসি।

এরা সরস্বতীর নিঃস্বার্থ সেবক, এরা যশ পায় না, অর্থ তো পায়ই না—লেখার নেশায় লিখে যায়, যশের পরিবর্তে পায় অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ—তবু মদ ধরলে যেমন ছাড়া কঠিন হয়, তেমনই কঠিন হয়ে পড়ে লেখার বাতিক মাথায় একবার ঢুকলে তাকে তাড়ানো।

এ সবই আমি জানি। বললাম যে, এ ধরনের লোক এর আগেও আমি দেখেছি। সুতরাং এঁকেও যত্ন করে বসালাম। বাড়ীতে থাকি আমি একা, দ্বিতীয় প্রাণী কেউ নেই—নতুবা একটু চা খাওয়ালে দেখাত ভাল। কুণ্ডুমশায় তাঁর দপ্তর খুলে তিনখানা মোটা খাতা বার করে পড়ে যেতে লাগলেন অবিরাম একটানা। এসব দলের লোকেরা তাই করে থাকে। আমি কতবার কত জায়গায় দেখেছি।

মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলছিলেন—কেমন লাগছে শ্যামবাবু?

—চমৎকার!

—হেঁ হেঁ—আপনারা রাইটার লোক, আপনাদের ভাল লাগবেই—। তার পর শুনুন এটা, 'সুভদ্রা-হরণ'—

—পড়ে যান।

একটানা চলেছে আবৃত্তির স্রোত—রাত বারটা বেজে গেল।

কুণ্ডু মশায় নাকের চশমা নামিয়ে আমার মুখের দিকে হাসি-হাসি মুখে চেয়ে বললেন—কেমন?

অর্থাৎ এটা আপনার ভাল লাগতেই হবে, উপায় নেই।

পুনরায় বললাম—চমৎকার!

এসব স্থলে এই জবাবই দিতে হয়, দেওয়া নিয়ম—অভিজ্ঞতা থেকে জানি।

—আচ্ছা এটা শুনুন—'বাণ রাজার প্রতি ঊষা'।

পুরাণ ভাল পড়া নেই, বললাম—বাণ রাজা কে?

আমার মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে কুণ্ডুমশায় বললেন—বাণ রাজার কথা জানেন না? বাণ রাজার মেয়ে ঊষা, দৈত্যরাজ বাণ—

বাল্যকালে দৃষ্ট 'ঊষা-হরণ' নামে এক যাত্রার অভিনয় অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল। বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই যুদ্ধ হল, অনিরুদ্ধ-টনিরুদ্ধ—ঊষা-হরণ—

আমার পৌরাণিক জ্ঞানের অবস্থা বোধ হয় কুণ্ডু মশায়ের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখার সৃষ্টি করল। তিনি আবার পড়ে যেতে লাগলেন। সাড়ে বারটা—পৌনে একটা। তিন চারটি কবিতা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেলে কুণ্ডু মশাই এবার ওঠবার জোগাড় করবেন বলে মনে হল। আমার দিকে চেয়ে বললেন—দোকানের কাজ করি সারাদিন, ফুরসত পাই নে। আপনারা কলকাতায় থাকেন, রাইটার লোক—আপনাদের শোনালে মনটা তৃপ্ত হয়। আর কাকে শোনাব বলুন—সব মুখ্যুর দল—

—আপনি বুঝি কাপড়ের দোকানে কাজ করেন?

—হ্যাঁ, খাতাপত্তর লিখি। রাত দশটার সময় ছুটি পেয়ে আহারাদি সেরে তবে আপনার কাছে আসছি। একটু শুনিয়ে মনটা ভাল হয়।

—কতদিন থেকে লিখছেন?

—বাল্যকাল থেকে। পাঠশালায় যখন পড়ি, হাতের লেখার খাতায় কবিতা লিখতাম।

গুরু মশায়ের কত বেত খেতে হয়েছে সেজন্যে, মশায়। এখনও তাই। কেউ বোঝে না। দোকানে যাদের সঙ্গে কাজ করি, তারা সবাই আমাকে খুব মানে, ভয় করে চলে ভাবে, কবিতা লেখে এ মস্ত পণ্ডিত। যা লিখি, তাই ভাল বলে। আমার তাতে তৃপ্তি নেই—যত গণ্ডমুর্খের দল, ভাল বললেই বা কি, আর মন্দ বললেই বা কি!

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতরতানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

আমার হয়েছে ভাগ্যে প্রত্যেক দিন মশাই ওদের সঙ্গে কারবার—অরসিক নিয়ে রসের কারবার। আমার ভাল লাগে মশাই, বলুন দিকি আপনি?

—আপনি রবি ঠাকুরের নাম শুনেছেন?

—হ্যাঁ শুনিছি মশাই। রবি ঠাকুর মস্ত বড় কবি। কোথায় যেন বাড়ী, যশোর না বীরভূম—

—কোনও কবিতা পড়েছেন তাঁর?

—আজ্ঞে না।

কুণ্ডু মশায় বিদায় নিয়ে উঠলেন রাত একটার সময়।

এর পর আমার ছুটি ফুরিয়ে গেল—কলকাতায় কর্মকোলাহলের মধ্যে কুণ্ডু মশায়ের কথা ভুলেই গেলাম একরকম। বড়দিনের ছুটিতে দুদিনের জন্যে বাড়ী গিয়ে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি যে দোকানে কাজ করেন, সে দোকানের মালিক ও অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ধনী, জাতিতে তাঁতি—ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, তবে লেখাপড়া কিছু তেমন জানেন না। লোকটি সজ্জন, রায় সাহেব খেতাব পেয়েছেন।

রায় সাহেবের বাড়ী কি-একটা কাজ উপলক্ষে আমিও নিমন্ত্রিত। সেখানেই কুণ্ডু মশায়ের সঙ্গে আমার পুনরায় সাক্ষাৎ। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের পান-বিড়ি বিতরণে তাঁকে ব্যস্ত দেখা গেল। আমি একবার বললাম—কি কুণ্ডু মশায়, ভাল তো?

আমার দিকে চেয়ে তিনি একবার হাসলেন মাত্র, ব্যস্ত বলে আমার সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ তাঁর তখন হল না।

রায় সাহেব হেঁকে বললেন—কুণ্ডু মশায়, চা দেওয়া হয়েছে কি না সকলকে দেখুন একবার বাইরে গিয়ে।

আহারাদির পরে দেখি সদর দরজায় কুণ্ডু মশায় দাঁড়িয়ে। বললেন—কাল বাড়ী থাকবেন নাকি?

—হ্যাঁ থাকব।

—কাল যাব একবার আপনার কাছে।

—নিশ্চয়ই আসবেন। লেখাটেখা আছে নাকি কিছু?

—অনেক লিখে ফেলেছি তার পর। শোনাব।

কিন্তু বিশেষ কার্য উপলক্ষে তার পরদিন আমাকে চলে যেতে হল অন্যত্র। কুণ্ডু মশায়ের কবিতা শোনবার সুযোগ সেবার আমার হয় নি।

এক বৎসর পরে আবার দেশে গিয়েছি। বর্ষাকাল, পথে-ঘাটে এক হাঁটু জলকাদা। বল্লভপুর ছাড়িয়ে নদীর ধারে বাবলাতলায় দেখি কে বসে মাছ ধরছে। আমি রাস্তা থেকেই পাড়াগাঁয়ের ধরনে জিজ্ঞেস করলাম—কি মাছ হল?

লোকটা আমার দিকে পেছন ফিরে চাইতেই দেখি কুণ্ডু মশায়।

—কুণ্ডু মশায়, মাছ ধরতে এসেছেন নাকি? ভাল সব?

কুণ্ডু মশায় আমায় দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে বললেন—প্রাতঃপ্রণাম। এই আসছেন বুঝি?

—কি মাছ পেলেন?

—আজ্ঞে, মাছ ধরছি নে তো। এই এমনি একটু বসে—মানে—একটু আধটু লিখছি—

কৌতূহল হওয়াতে রাস্তা ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি কুণ্ডু মশায় ভিজে ঘাসের ওপর কাঁচা ডালপালা ভেঙে পেতে বসেছিলেন—পাশেই একখানা মোটা পুরনো রোকড় কি খতিয়ানের খাতা। একটা শরের কলম ও পাঠশালার ছেলেদের মত দড়ি-বাঁধা দোয়াত, যাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। একখানা মসীলিপ্ত ব্লটিং কাগজ মাটির ঢেলা-চাপা এক পাশে।

—বাঃ এ যে কবিকুঞ্জ বানিয়ে তুলেছেন দেখছি।

—আজ আর দোকানে যেতে ভাল লাগল না। অনেকদিন বর্ষার পরে আজ একটু রোদের মুখ দেখা গিয়েছিল—এখন আবার মেঘ করেছে। বলি, যাই নদীর ধারে বসে... লেখার নেশা মাথায় একবার চাপলে—

—একটু শোনান কুণ্ডু মশায়। না শুনে আর যাচ্ছি নে।

কুণ্ডু মশায়ের কবিতার খাতা একখানা প্রাচীন খতিয়ান। খানিকটা পড়ে শোনালেন, কয়েক লাইন মনে আছে—

যদুকুলবধূ চতুরঙ্গিণী সহায়ে
কৃষ্ণতুল্য সুভদ্রারে সারথি করিয়া
আরোহিয়া কপিধ্বজে অর্জুনসমান
গাণ্ডীব কোদণ্ড ধরি উতরিব রণে।
শিখণ্ড আমার জ্যেষ্ঠ, তারে নারী ভাবি।
ধরে না ধনুক ভীষ্ম;...(মনে নেই)
ভূমণ্ডল অকৌরব করিবে দ্রৌপদী।

মজানদীর পাড়ে বিকেলে বসে বেশ ভাল লাগল। বললাম—চমৎকার! আপনার শব্দ সাজাবার ক্ষমতা, ধ্বনির জ্ঞান, সব চমৎকার! দ্রৌপদী যুদ্ধযাত্রা করতে চাইছেন বুঝি?

কুণ্ডু মশায় হেসে বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু কোন জায়গায় বলুন তো?

মাথা চুলকে বললাম—তা তা—কই ঠিক তো বুঝতে পারছি নে—

কুণ্ডু মশায় আমার উত্তরের দিকে কান না দিয়ে বললেন—শুনে যান আর একটু—

শত তীক্ষ্ন শর
মম করোন্মুক্ত যবে উঠিবে উড়িবে
গৃধ্রপংক্তি সম ব্যোমে শোণিতপিপাসু,
দেখিব কি করি করে ব্রতরক্ষা তাঁর
দেবব্রত। রণচণ্ডী শিখণ্ডী-ভগিনী
আখণ্ডলে রক্ষিলেও ছাড়িবে না তাঁরে।

হাসি-হাসি মুখে বললেন—কেমন?

—এ আর বলতে! আমার খুব সৌভাগ্য যে, আজ কবির মুখে—কি ঝঙ্কার!

কুণ্ডু মশায় বিনয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন—অমন কথা বলবেন না, আপনারা রাইটার লোক—

—ভাষার ওপর সমান অধিকার সব লেখকের থাকে না। আপনার তা আছে কুণ্ডু মশায়। আর আপনি একজন সত্যিকার কবি। নয় তো পালিয়ে এসে এই নদীর ধারে বসে আপন মনে—

কুণ্ডু মশায় পাশের একটি থেলো হুঁকোয় তামাক সাজছিলেন এতক্ষণ। আমায় বললেন —খান?

—না। আপনি খান।

হুঁকোয় বেশ আরামে টান দিয়ে বৃদ্ধ এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওপরের দিকে চাইলেন, যেন জীবনের এক বড় আনন্দের সম্মুখীন হয়েছেন—অর্থাৎ থেলো হুঁকোটিতে টান দেবার অবকাশ পেয়েছেন।

বললেন—আমার মাথায় যখন লেখার নেশা চেপে যায়, তখন আর কিছুই ভাল লাগে না। পালিয়ে আসতেই হবে—একটু ফাঁকা নির্জন জায়গা খুঁজতেই হবে।

—আপনার বাসা তো নির্জন? আপনি তো একাই থাকেন শুনেছি?

—মোটেই না। কাপড়ের গদির সাতজন কর্মচারী সব এক ঘরে থাকি। সব কজন সমান গোলমাল করে। সেখানে বসে লেখা...কাল আসবেন দয়া করে? দেখবেন?

পরদিনই কুন্ডু মশায়ের বাসায় গেলাম। কুন্ডু মশায় এক বর্ণ অতিরঞ্জিত বলেন নি। বসাকদের কাপড়ের গদির পেছনে অতি অন্ধকার, প্রায় জানালাবিহীন নাতিক্ষুদ্র একটা ঘরে চারখানি সরু সরু তক্তপোশ পাতা। প্রত্যেক তক্তপোশে কাপড়ের গাটবাঁধা চট আগে পেতে তার ওপর অতি মলিন শয্যা বিস্তৃত। বালিসগুলো থেকে চিমটি কাটলে তেল আর ময়লা ওঠে। ঘরে আড়া-আড়ি অনেকগুলো দড়ি টাঙানো—তাতে ময়লা ও আধময়লা লুঙ্গি, ন-হাতি কাপড়, সেলাই করা পুরনো কাপড় ছড়িয়ে দেওয়া। একটা তক্তপোশের তলায় একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপর এক জোড়া নতুন বাদামী রঙের ফিতে-আঁটা জুতো সযত্নে তোলা। দেওয়ালে পেরেক দিয়ে আঁটা বিবর্ণ পুরনো খবরের কাগজ। তার ওপরে কাঠের ছোট আলনায় দু-একটা ছিটের কফ-আঁটা কামিজ, কোনটায় কুষ্টিয়ার ছিটের একটা আলোয়ান। সমস্ত ঘরটা স্থূলত্ব, নোংরামি, কুশ্রীতা, রুচিহীনতার একখানি সুস্পষ্ট ছবি।

একপাশের তক্তপোশে জনচারেক লোক বসে তাস খেলছে, কারও গা খোলা, কারও গায়ে আধময়লা গেঞ্জি। আমার প্রশ্নের উত্তরে একজন বললে, কুন্ডু মশায় গদি থেকে ফেরেন নি। একজন কুন্ডু মশায়ের খাটখানা আমায় দেখিয়ে দিলে। তাঁর বালিস ততোধিক ময়লা, উপরন্তু একটা ফুটো দিয়ে তুলো বেরিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ বসবার পরে তাস-খেলোয়াড়দের হর্ষধ্বনি ও চীৎকার আমার নিকট অসহ্য মনে হওয়ায় একটু বাইরে যাব ভাবছি, এমন সময় কুন্ডু মশায় ঘরে ঢুকলেন।

ওদিকে খেলোয়াড়দের একজন বলে উঠল—ও দাদু, তোমার ইলিশ মাছ সব কানু খেয়ে—এই দেখ!...বক্তা মুখে পুরে দেবার অভিনয় করে ব্যাপারটা বোঝালে।

আর একজন বললে—এত দেরি হল কেন? বাবুর হাতে নাকানিচোবানি খেয়েছ কেমন, বল?

আমার দিকে চেয়ে কুন্ডু মশায় বললেন—আপনি যে! আপনি যে এখানে আসবেন, তা ভাবি নি। বসুন, দুটো খেয়ে আসি। এখন ছুটি পেলাম। বড্ড খিদে পেয়েছে—

বেলা আড়াইটে উত্তীর্ণ প্রায়। ক্ষুধার্ত বৃদ্ধকে আমি একটুও দেরি করতে দিলাম না। বললাম—যান শীগগির যান, আহার করে আসুন।

কুন্ডু মশায় চলে গেলে আমি তাস-খেলুড়েদের উদ্দেশ করে বললাম—এখানে খাওয়া হয় কোথায়?

একজন বললে—এই ঘরের পর উঠোন, তার ওদিকে রান্নাঘর। গদির ঠাকুর আছে, সেই রাঁধে।

—কি রকম খাওয়ায়?

—সে কথা আর ওঠাবেন না দাদা। উরসুনি ডালের জল, এই এতটুকু খয়রা মাছ কি তিৎপুটির ঝোল, একটা লাল ডাঁটা দিয়ে কুমড়ো দিয়ে ঘ্যাঁট—ছিঃ—মানুষের যুগ্যি নয়।

একজন বলে উঠল—পরের পয়সায় খেতে আর কত দেবে বল? ওই যা পাচ্ছ, তাই ঢের।

কুন্ডু মশায় পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করে এলেন, তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারা গেল। তার পর কাপড়ের গাঁট-বাঁধা চটের উপর শ্রান্ত দেহ প্রসারিত করে আমার দিকে চেয়ে বললেন—এখানে এসে বসুন।

—চলুন না দীঘির ধারে গিয়ে একটু বসা যাক।

—আজ আর ছুটি নেই, কলকাতা থেকে মহাজন আসবে এই ট্রেনে, হিসেব ঠিক করে দিতে বলেছেন বাবু।—ও গোষ্ঠ, পাইকারী মালের ফিরিস্তিগুলো করে ফেল গিয়ে—বসে তাস পিটলে চলবে না।

এমন সময়ে হঠাৎ হল্লা ও হাসি মন্ত্রমুগ্ধবৎ থেমে গেল।

রায় সাহেব ঘনশ্যাম বসাকের স্থূল, চিক্কণ, সুখাদ্য-পরিপুষ্ট দেহ দোরের কাছে দেখা যেতেই তাস-খেলোয়াড় কজন এবং কুন্ডু মশায় তড়াক করে চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

রায় সাহেব বললেন—এত গোলমাল কিসের কুণ্ডু মশায়?

ঘরের মধ্যে সকলের অবস্থা তখন হঠাৎ হেডমাস্টার ক্লাসে ঢুকলে কোলাহলরত স্কুলের ছাত্রদের মত। সবাই পাষাণ-মূর্তির মত একদম জমে গেল। আমাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে রায় সাহেব বললেন—এই যে, শ্যামবাবু যে—এখানে আপনি?

—একটু কুণ্ডু মশায়ের কাছে দরকার ছিল।

—কুণ্ডু মশায়ের সঙ্গে আপনার বনবে ভাল। কুণ্ডু মশায় শুনেছি কবিতা লেখেন। মানে, লোকটা ছিল ভালই, কিন্তু ওর মাথায় কি পোকা আছে—থাকে থাকে, ফট করে একদিন দেখি গদিতে নেই। কোথায় গেল? বসে নাকি কোথায় কবিতা লিখছে। আমার গদির কাজ চলে কি করে? কবিতা লিখে তো পেট ভরবে না দাদা। কি বলেন?

—তা বটে।

রায় সাহেব কুণ্ডু মশায়ের দিকে চেয়ে বললেন—যাও সব, গদিতে যাও। এখানে হল্লা করবার জন্যে তোমাদের রাখা হয় নি—কবিতা লেখবার জন্যেও নয়। যাও—কুণ্ডু মশায়, মহাজনের দেনাপাওনার হিসেবটা বেলা পাঁচটার মধ্যে ঠিক করে ফেল গিয়ে। যাও সব।

পরে ঘরের চারিদিকে অপ্রসন্নদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—নিজেরা থাকে—অথচ ঘরদোর বিছানাপত্তর কি নোংরা করেই রাখে—রামোঃ। ও সতীশ, দশগজা ফুলন শাড়ীর একজোড়া কাল হিসেবের খাতায় ওঠে নি কেন?

সতীশ-নামধেয় লোকটি এতক্ষণ তাসের আড্ডায় বেশি চেঁচামেচি করছিল। সে যেন অতিরিক্ত বিস্ময়ে হঠাৎ কাঠ হয়ে বললে—সে কি বাবু! দশগজা ফুলন শাড়ী কাল কে বিক্রি করলে? এই তো কুণ্ডু মশায়, জানেন?

কুণ্ডু মশায় নিজের গা থেকে ঝেড়ে ফেলে বললেন—আমি কি জানি বাপু। আমি খতেন রোকড় নিয়ে আছি, তোমাদের খুচরো বিক্রির তবিলে কি হয় না হয়—

রায় সাহেব বললেন—সব চোরের আড্ডা হয়েছে। ভাত-কাপড় দিয়ে চোর পোষা। আচ্ছা, আজ ধরা পড়লে তাকে আমি জবাব দেব, নয় এক মাসের মাইনে কাটব।

রায় সাহেব চলে গেলেন।

এই হল কুণ্ডু মশায়ের প্রতিদিনের জীবন। এই অত্যন্ত স্থূল আবহাওয়ার মধ্যে একটি কবিপ্রাণ কিভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে, তা আমার অভিজ্ঞতায় লেখা নেই। কুণ্ডু মশায়ের এই বয়সেও যে সজীবতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরিস্ফুট, ছাইপাঁশ আহারেও তাঁর যে তৃপ্তি, এত হট্টগোল ও অপমানের মধ্যেও তাঁর যে আনন্দ—এ সবের জন্য সমঝদার লোকমাত্রেই তাঁকে হিংসে না করে পারবে না।

তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ আর অনেকদিন হয় নি।

এর প্রায় পাঁচ বছর পরের কথা। অন্য জায়গায় কাজ করি বলে দেশে আসা ঘটে নি অনেকদিন। দেশের বাড়ীঘর ভেঙে গিয়েছিল, মিস্ত্রি লাগিয়ে মেরামত করছি।

এই যে শ্যামবাবু, প্রাতঃপ্রণাম!

চেয়ে দেখি কুণ্ডু মশায়। আরও বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, মাথায় আর এক গাছাও কাঁচা চুল নেই। সেই পুরনো বেনিয়ান গায়ে।

—কি ব্যাপার কুণ্ডু মশায়? ভাল আছেন বেশ? খবর কি?

—বাবু পাঠিয়ে দিলেন। আপনি বাড়ী করবেন,—চুন সিমেণ্ট নেবেন আমাদের নতুন আড়ত থেকে। দর সস্তা।

—ও। কে, ঘনশ্যামবাবুরা চুনের আড়ত খুলেচেন বুঝি?

—চুন, সিমেণ্ট, মগরার বালি—

—বেশ বেশ। বসুন।

—না, আর বসব না। অনেকক্ষণ বেরিয়েছি বাড়ী থেকে।

—কবিতা লেখা-টেখা হয় কি আর?

—আপনি আছেন তো এখন; আসব একদিন।

বলে সামান্য কয়েক পা গিয়েই ফিরে এসে বললেন—ভাল কথা, পকেটেই আছে, আজ আপনার এখানে আসতে আসতে বটতলায় বসে লিখলাম কটা লাইন—

প্রকৃতির কোলে শুয়ে সৌন্দর্যে ভাসায়ে আঁখি
সাধ হয় অনিমেষে শুধু যেন চেয়ে থাকি।
নীরবে নিঝুমে সেথা কি যেন মুখের পরে
স্বপ্নরেণু কিংবা মায়া নিয়ত ঝরিয়া পড়ে।
পরমাণু নিভে যায় ভাঙিয়া জড়ের কারা ;
কে তুমি ডাকিছ মোরে করিয়া পাগলপারা ?

কুণ্ডু মশায়কে কোলে তুলে নিয়ে নাচবার ইচ্ছে হল, ব্রাহ্মণ না হলে পায়ে হাত দিয়ে পায়ের ধুলো নিতাম। বললাম—এই কটা লাইন এইমাত্র লিখলেন পথে আসতে আসতে ?

কুণ্ডু মশায় হেসে বললেন—বটতলার ছায়ায় বসে, খানিকটা আগে।

—আপনি ঘনশ্যামবাবুর দোকানে কাজ করেন বটে কিন্তু আপনি সে জায়গার উপযুক্ত নন। কবিতায় আর্টের কোন দরকার নেই। আপনার মনের আনন্দের অনুভূতিকে ধ্বনি ও ঝঙ্কারের মধ্যে প্রকাশ করছেন এবং সফল হয়েছেন, সেইটেই বড় কথা। আমি আপনার মনের সেই সময়ের অনুভূতিকে ওই কটা কথার মধ্যে দিয়ে নিজের মনে ধরতে পারছি—ওই হল কবিতা।

চুন কিনতে গিয়ে রায়সাহেবের দোকানে বসলাম খানিকটা। মস্ত বড় গদি, লোকজন খাটছে, নানারূপ ব্যবসাদারী শব্দ ও বোল উত্থিত হচ্ছে—'ছএর দাগের নিয়ে এস' 'বাইশ শ বাইশ রোল দশ জোড়া' মিহি জরিপাড় চন্দননগর', 'খতেনের আঠারর পাতা' ইত্যাদি। পাইকারী ক্রেতাদের বড় ভিড় লেগেছে, ঝম্ ঝম্ টাকার শব্দ উঠছে—ওদিকে গদির এক পাশে আনকোরা টাটকা দশটাকার নোট তাড়াবন্দী হচ্ছে।

ঘনশ্যামবাবুকে একপাশে বসে থাকতে দেখে কাছে গেলাম। গত পাঁচ বৎসরে রায়সাহেবের বয়স যেন পনের বছর বেড়েছে। আমায় বললেন—আসুন, বসুন শ্যামবাবু, অনেকদিন দেখি নি।

—ভাল আছেন ?

—ভাল কোথায় ? আজ বছরাবধি ভুগছি নানা অসুখে। আর এইবার বোধ হয় চললাম—

—না না, সে কি কথা ? আপনার বয়েসটা কি !

—আপনি জানেন না, দুটি হাজার টাকা খরচ করেছি এক বছরের মধ্যে। কিন্তু সারবার নামটি নেই, বেড়েই চলেছে। দোকানে আসি যাই—মনেও বল পাই নে, শরীরেও না। ডাক্তারের কথায় মাগুরমাছের ঝোল খাই, কাচকলা আর পটল দিয়ে—একবেলা দুখানি সুজির রুটি।

—কোথাও চেঞ্জে যান না কেন ?

—ব্যবসা ফেলে যেতে পারি নে। আবার নতুন চুন সিমেণ্টের আড়ত খোলা হয়েছে, এসব কার ওপর দিয়ে—

রায়সাহেবের কথার সুরে এবং মুখের চেহারায় একটা জিনিস বেশ সুস্পষ্ট হল আমার কাছে, তাঁর মনে আনন্দের অভাব এবং একটা ভয়ের ভাব। কথাবার্তার মধ্যে কণ্ঠের যে মিহি-সুর ধ্বনিত হচ্ছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মৃত্যুভয়, জড়িয়ে রয়েছে নৈরাশ্য ও মূঢ় অন্ধতা। এত ঐশ্বর্য থেকেও ভোগের তৃপ্তি নেই।

যতক্ষণ আমি সেখানে বসেছিলাম, ঘনশ্যামবাবুর মুখে আমি আনন্দের রেখা খোঁজবার বহুবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি। আনন্দের পরিবর্তে বরং ভয়টা এত বেশি দেখেছি যে লোকটার কাপুরুষতার ওপরে আমার ঘৃণা জন্মেছে। এত টাকা থেকেও লোকটা সত্যিকার অসুখী। বাইবেলের সে বাণী মনে পড়ল —Men cannot live by bread alone—জীবনের বড় পুঁজি নেই যেখানে, সেখানে শুধু টাকার পুঁজি মানুষকে অমৃতের পুত্রত্ব দান করে সাধ্য কি তার ?

তারও চার বৎসর পরে এবারের কথা।

বাড়ীতে এসেছি দশ-বার দিন কি তার বেশি। কাজের গোলমালে অন্য কোথাও যেতে পারি নি—কেবলমাত্র একদিন বল্লভপুর বাজারে অতি অল্প সময়ের জন্যে রায়সাহেবের গদিতে গিয়েছিলাম। কুণ্ডু মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এই পর্যন্ত, কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয় নি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে বসে আছি, একজন লোক এসে বললে—শ্যামবাবু এ বাড়ীতে থাকেন? লোকটার খালি পা, হাতে লাঠি আর হারিকেন লণ্ঠন।

—কোথা থেকে আসছ?

—আজ্ঞে বাবু, প্রণাম হই। বল্লভপুরের আড়তের কুণ্ডু মশায় আপনাকে ডেকেছেন। তিনি বাঁচেন না, আপনাকে এখুনি যেতে হবে।

—কুণ্ডু মশায় বাঁচেন না! কেন, কি হয়েছে তাঁর?

—বাবু, তিনি আজ সাত দিন শয্যাগত। জ্বর, কাসি—

—তা আমি তো ডাক্তার নই? আমি কেন যাব?

—তিনি সন্ধ্যে থেকে কেবল আপনার কথা বলছেন। আমায় বলে দিলেন, যে-করে হোক নিয়েই আসতে হবে তাঁকে।

আমি একটু বিরক্ত না হয়ে পারলাম না। অনেক দিনের অদর্শনে কুণ্ডুমশায়ের ওপর পূর্বের আন্তরিকতা অনেকখানি চলে গিয়েছে। তবুও গেলাম। মুমূর্ষু বৃদ্ধের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। সেই আড়তের ঘরের সেই বিছানাতেই কুণ্ডু মশায় শুয়ে। মাথার শিয়রে কেবল একটা ছোকরা বসে আছে—ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। একটা লণ্ঠন আধ-নেবানো ভাবে জ্বলছে ঘরের মেজেতে। একটা বাটিতে আধবাটি জল-বার্লি। গোটাকতক কাগজি নেবুর খোসা লণ্ঠনের পাশে।

কুণ্ডুমশায় বোধ হয় ঘুমুচ্ছিলেন কিংবা অর্ধচেতনভাবে শুয়ে ছিলেন। ছেলেটি ডাকলে—ও দাদু, দাদু, বাবু এসেছেন—

কুণ্ডুমশায় চমকে বলে উঠলেন—অ্যা—

—ঐ সেই বাবু এসেছেন—

ততক্ষণ আমি গিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছি। কুণ্ডু মশায় হাতের ইঙ্গিতে আমায় বসতে বললেন। আমি বিছানার একপাশেই বসে বললাম—কি হয়েছে কুণ্ডুমশায়? জ্বর নাকি?

প্রায় এক মিনিট কুণ্ডুমশায়ের কাছ থেকে কোন উত্তর পেলাম না। তারপর ক্ষীণ স্বরে বললেন—আর কি, এবার চললাম শ্যামবাবু—

আমি ভরসা দেওয়ার সুরে বললাম—সে কি কথা। এখনও কত কবিতা শোনাবেন আমাদের—যেতে দেব কেন?

কুণ্ডুমশায়ের মুখে অস্পষ্ট লণ্ঠনের আলোয় যেন ক্ষীণ হাসির রেখা দেখতে পেলাম। বললেন—ডাক এসেছে। আপনার কাছে একটা অনুরোধ—সেইজন্যে—

—বলুন, বলুন।

—এই ছেলেটি দেখছেন—বড় সৎ, বাবুদের গদিতে কাজে ঢুকেছে এ বছর, ছেলেমানুষ—ওই দেখে।

আমি ছেলেটিকে বললাম—তোমার নাম কি?

—সুশীল।

—এই ঘরের আর সব লোক কোথায়?

—সব পালিয়েছে। দুজন কাল ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে, দুজন দোকানঘরে শুয়ে আছে বারান্দায়।

কুণ্ডুমশায় যেন মাছি তাড়াচ্ছেন মুখের কাছ থেকে—দুর্বল হাতে দু একবার এমনি ভঙ্গি করে চুপ করে রইলেন। প্রায় দশ মিনিট ঘরের মধ্যে কোন শব্দ নেই। তার পর আমার দিকে চেয়ে বললেন—আমার খাতাগুলো—

বুঝতে না পেরে বললাম—খাতা?

কবিতার খাতাগুলো আপনার হাতে দিয়ে যাব। বড় আদরের! ছেলেমেয়ে নেই! ওই ছেলেমেয়ে। খাতাগুলো—থেমে থেমে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে কুন্ডুমশায় কথাগুলো শেষ করলেন।

—ব্যস্ত হবেন না। স্থির হয়ে শুয়ে থাকুন। আচ্ছা সে হবে—সেগুলো কোথায়?

কুন্ডুমশায় শিবনেত্র হয়ে শিয়রে উপবিষ্ট ছোকরার দিকে তাকাবার চেষ্টা করলেন। ছেলেটি তখনই নিজে থেকে বললেন—উনি আমায় সন্ধ্যেবেলা বলেছিলেন গুছিয়ে রাখতে—ওঁর তোরঙ্গ থেকে বের করে রেখেছি।

কুন্ডুমশায় বললেন—এঁর হাতে দাও।

আমি হাতে নিয়ে বললাম—পেয়েছি। এগুলো কি করব বলুন আমায়।

আবার তিন চার মিনিট কেটে গেল—রোগী নিরুত্তর। তারপর আমার হাতে দুর্বল হাত তুলে দিয়ে বললেন—আপনার কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন। ওদের যত্ন আর কোথাও হবে না। ভার নিলেন?

—নিলাম, ভাববেন না।

কুন্ডুমশায় দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আর কোন ভাবনা নেই। মরণে ভয় করি নে, বয়েস হয়েছে। এই খাতাগুলো—। শেষের দিকের কথাগুলো যেন কুন্ডুমশায় আপন মনেই বললেন।

এই তাঁর শেষ কথা। আমি সারারাত বসে ছিলাম তাঁর শয্যাপার্শ্বে। রাত্রিশেষে কুন্ডুমশায় মারা গেলেন। শবানুগমনের সময় আমি সঙ্গে যাওয়া কর্তব্য বিবেচনা করলাম। আমারই অনুরোধে তাঁর প্রিয় মজা খালের ধারে তাঁর দাহকার্য সমাধা হল। চিতার ওপর আমি আমার নিজের হাতে বন্য ছোটগোয়ালে লতার ফুল নিকটবর্তী ঝোপ থেকে তুলে এনে ছড়িয়ে দিলাম।

রায় সাহেবের সঙ্গে দিন চারেক পরে দেখা। আমায় বললেন—আপনি সেদিন শুনলাম খুব করেছেন। লোকটা নিজের দোষেই মারা গেল।

সঞ্চয়

অতুল স্ত্রীকে ডেকে বললে—সে টাকা কোথায় গেল? বাক্সের মধ্যে যে টাকা ছিল?

স্ত্রী দ্বিতীয় পক্ষের বৌ, স্বামীকে বেশ ভয় করে। সম্প্রতি টাইফয়েড থেকে উঠে অনেক কথাই মনে করে রাখতে পারে না।

ভয় পেয়ে বললে—কেন, বাক্সের মধ্যে তোয়ালে-বাঁধা ছিল—নেই?

—দেখছি না তো। তুমিও দেখ না খুঁজে।

যা গিয়েছে তা আর পাওয়া যায় না। সে টাকাও পাওয়া গেল না। বাক্সের মধ্যে তো নেই-ই—কোথাও তা নেই। বিমলা সারা দুপুর ধরে শত জায়গায় খুঁজেও তার কোন কিনারা করতে পারলে না। সন্ধ্যার সময় ম্লান মুখে এসে স্বামীকে বললে—সে তো পেলাম না?

—পাবে না আমি জানি। আমার জিনিসে তোমাদের কোন মায়া নেই। যেদিন নিরুপমা (প্রথম পক্ষের স্ত্রী) গিয়েছে, সেদিনই সব গিয়েছে। তোমার বাক্সে অতগুলো টাকা রইল; কাপড় আছে, সায়া-সেমিজ, পাউডারের কৌটো ঠিকই রইল—তোয়ালে-বাঁধা টাকা-টাই গেল চুরি!

সদ্য টাইফয়েড থেকে উঠেছে বিমলা।

তার অধিকাংশ কথাই মনে থাকে না। তোরঙ্গের মধ্যে তার জামাকাপড় সাবান এসব ছিল সবই সত্যি বটে, কিন্তু সে ভেবে দেখলে গত তিন মাসের মধ্যে সে রোগশয্যায় পড়ে ছিল মাস দুই—মরণের দ্বার থেকে ফিরে এসেছে তাও সে জানে। স্বামীই সর্বদা শিয়রে বসে পাখার বাতাস করে, মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢেলে, কত রকমে সেবা শুশ্রূষা করে তাকে

বাঁচিয়ে তুলেছে—একথা তার ভাসা-ভাসা মনে আছে। অসুখ সেরে উঠে আজ দিন কুড়ি সে বাপের বাড়ী এসেছে—সেই তোরঙ্গটাও এখানে এসেছে সঙ্গে।

অসুখের আগে একদিন অতুল খাজনা আদায় করে অনেকগুলো টাকা আনে। বিমলা বায়না ধরলে—ওগো, কিছু টাকা আমায় দাও—দিতেই হবে—ছাড়ব না কিছুতেই।

অতুল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর অন্যায় আবদারে একটু বিরক্ত না হয়ে পারলে না। সংসার-খরচের টাকা, জমাবার মত বেশি টাকা যদি থাকত তবে সে কথা স্বতন্ত্র। তা যখন নেই অত বড় মেয়ের বোঝা উচিত। কিন্তু স্ত্রী বায়না ধরলে ছেলেমানুষের মত—এ টাকাগুলো আমি আমার বাক্সে তুলে রাখব—দাও আমাকে, ওগো?

অতুল পাঁচটি টাকা অন্য খরচের জন্য রেখে বাকি টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দিল। অতুলেরই একটা আধ-ময়লা রুমালে বিমলা টাকাগুলো বেঁধে তাকে ছোলার কলসীর মধ্যে রেখে দিল।

রাত্রে অতুল বললে—টাকা কোথায় রেখেছ?

—তাকে, ছোলার কলসীর মধ্যে।

—থাক, ভাল জায়গা। কেউ টের পাবে না।

এর কিছুদিন পরে বিমলা পড়ল শক্ত টাইফয়েডে। দুদিন পাঁচদিন করে যখন আঠার দিন কেটে গেল—তখন বাড়ীর ঝি একদিন বিমলার ভাগ্নীকে বললে—দিদিমণি, ছোলা গুলো রোদ্দুরে দেব? বর্ষাকাল, নষ্ট হয়ে যাবে একেবারে।

বিমলার এই ভাগ্নী তার মামার সংসারেই থাকত। অবিবাহিত, তের-চৌদ্দ বছর বয়েস। সে ছেলেমানুষ, কিছুই জানে না টাকার খবর। তার সম্মতি পেয়ে ঝি ছোলার কলসী তাক থেকে পেড়ে ছোলা ঢালতে গিয়ে রুমালে-বাঁধা কি একটা দেখতে পেল।

প্রথমে সে বুঝতে পারে নি জিনিসটা কি। হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে যখন বুঝলে এতে পয়সাকড়ি বাঁধা, ততক্ষণ বিমলার ভাগ্নী জয়ন্তী সেখানে চুলের দড়ি রোদে দিতে এসে দাঁড়িয়েছে। জয়ন্তী বললে—কি গো ওটা?

—তা কি জানি দিদিমণি, এই তো বেরুল এর ভেতর থেকে—কি জানি।

—দেখি দেখি, দাও তো?

বাড়ীতে কেউ নেই, মামা কোথায় বেরিয়েছে, সে শয্যাগত মামীর কাছে রুমালে-বাঁধা টাকা এনে-বললে—মামীমা, এ টাকা তুমি রেখেছিলে ছোলার কলসীতে?

বিমলার তখন ভীষণ জ্বর, গা তেতে তপ্ত খোলার মত। সে তাড়াতাড়ি জ্বর-অবস্থায় উঠে হাত বাড়িয়ে বললে—দে, আমার টাকা—

অতুল সেই সময়ে ঘরে ঢুকে সব শুনে বলল—তুমি শোও, শোও—টাকার জন্যে কি? শুয়ে পড়।

—আমার এই টাকাগুলো রেখে দেবে?

—হ্যাঁ, আমি রেখে দিচ্ছি, রেখে দিচ্ছি।

—দাঁড়াও ক টাকা গুনে রেখে দিই। এক, দুই, তিন—এই আঠার টাকা সাত আনা। কোথায় রেখে দেবে?

—আমি ঠিক জায়গাতে রেখে দেব। তুমি নিজের বুদ্ধিতে টাকা রাখতে গিয়ে হারিয়েছিলে তো টাকাটা? বিন্দি না দেখলে ঝি মাগী চক্ষুদান করেছিল আর কি! আমার কাঠের বাক্সটাতে রেখে দেব, কেমন?

রেখে দাও। তুমি যেন খরচ করে ফেলো না তা বলে? ও আমার টাকা, আঠার টাকা সাত আনা—মনে করে রেখে দিলাম।

তার পর বিমলার অসুখ ভীষণ বেড়ে গেল। অতুলের পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট সংসার—মেটে ঘর, খড়ের চালা। সংসারে আছে মাত্র ভাগ্নী আর স্ত্রী। আর দ্বিতীয় পুরুষমানুষ নেই। সে পড়ে গেল মহা মুশকিলে। রোজ মহকুমা থেকে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে ডাক্তার আনতে হয়। খরচ যা পড়ে, তাতে সামান্য খাজনাপত্রের আয়ে কোনমতেই কুলোয় না, কদিনেই বেশ কিছু ঋণগ্রস্ত হতে হল।

বিমলার জ্ঞান-চৈতন্য নেই। যখন একটু জ্ঞান হয়, তখন কেবল বলে—জল খাব, আমায় জল দাও—এক ঘটি জল দাও—

তার পরেই আর জ্ঞান থাকে না।

ডাক্তার বললে, চেষ্টার তো ত্রুটি করছি নে অতুলবাবু, তবে এই সোমবারটা না কাটলে কিছু বলতে পারব না।

—ও বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?

—কি করে বলি বলুন, সবই ভগবানের হাত। কাল একটা ইনজেকশন দেব ভাবছি।

ইনজেকশনের কথা শুনে বিমলা ভয় পেয়ে গেল। ইনজেকশন করলে নাকি ভারি লাগে, গা ফুঁড়ে ওষুধ দেওয়া, সে নাকি বড় খারাপ কথা। অতুল নানারকমে তাকে বুঝিয়ে রাজী করালে।

রাত্রে আবার বিমলা বললে হ্যাঁগা, কাল সকালে আমাকে নাকি ইনজেকশন দেবে?

—কেন, তখন তো তুমি রাজী হলে?

—একটা কথা বলব? আমায় আর ওসব কষ্ট দিও না।

—কেন, কি হল আবার?

—আমি এবার বাঁচব না। তোমার অদৃষ্টে বৌ নিয়ে সংসার করা নেই দেখছি।

—ওসব কথা বলতে নেই এখন। ছিঃ, চুপ করে শুয়ে থাক।

—তোমার কোন বুদ্ধি নেই। যা বলছি তাই শোন।

—শুনেছি। তুমি বেশি কথা বলো না। ডাক্তারে বারণ করে গিয়েছে।

—হ্যাঁগা, তুমি আমায় বাঁচিয়ে তুলতে পারবে।

—সে আবার কি কথা! নিশ্চয়ই। তোমার কি হয়েছে? এর চেয়েও শক্ত অসুখ হয় লোকের, তারা বেঁচেও ওঠে।

বলে, অতুল কে কোন্ দুঃসহ ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়েছে তারই তালিকা, কতক স্মৃতি থেকে কতক কল্পনার ওপর নির্ভর করে আবৃত্তি করতে লাগল স্ত্রীর শিয়রে বসে। রায়দের বাড়ীর বড়-বৌ পাঁচ মাস অসুখে ভুগে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল, ননী চক্কত্তি এই ধরনের টাইফয়েডে ভুগে বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, তারা সেরে সামলে উঠে দিব্যি সংসারধর্ম করছে।

বিমলা বললে, সে কতদিন আগে?

—ওঃ, তখন নিরু বেঁচে আছে। তুমি তখন হয়তো জন্মাও নি।

—আমাকে তুমি বাঁচাও। তোমার কাছ ছেড়ে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, স্বর্গেও না।

—তোমার তো সেরে গিয়েছে। ভাবনা কিসের? চুপটি করে শুয়ে থাক তো!

—সত্যি আমায় তুমি বাঁচাতে পারবে?

অতুল দেখল বিমলার রোগজীর্ণ কপোল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে. মুখের ভাব এত বদলে গিয়েছে যে ওকে সেই বিমলা বলে চেনাই যায় না। ওর মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে আদর করতে করতে অতুল বললে, অমন কথা বলে না। নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে, সে আবার একটা কথা কি।

বিমলা নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলেমানুষের মত ঘুমিয়ে পড়ল।

সোমবারের বিপদ ঈশ্বরের ইচ্ছায় কেটে গেল এবং বিমলা ক্রমে ক্রমে ব্যাধিমুক্ত হয়ে পথ্য পেলে দু-মাস অতি কঠিন রোগভোগের পরে। অসুখ সেরে উঠে বিমলার মস্তিষ্ক কেমন দুর্বল হয়ে গেল, কোন কথাই সে মনে রাখতে পারে না। আট দশ দিন এভাবেই কাটল। সকালবেলা আহারাদির পরে হয়তো একটু চুপ করে শুয়ে থাকে. তার পর দুপুরের দিক উঠে বিছানায় বসে জয়ন্তীকে ডাকাডাকি করে—ও বিন্দি, শুনে যা—ও বিন্দি—

—কি মামীমা?

—কত বেলা হয়ে গেল. আমায় ভাত দিবি নে?

—সে কি মামীমা। তুমি রোগা মানুষ, নটার সময় যে তোমাকে ভাত দিয়ে খাইয়ে

গেলাম পাশে বসে।

না, আমি খাই নি—দে, ভাত দে—

—তুমি ভুলে গেলে মামীমা, ভাত দিয়ে গেলাম যে। তুমি যে খেয়ে শুয়ে ছিলে—

—হ্যাঁ, তোদের সব মিথ্যে কথা। আমায় খেতে দিবি নে তাই বল্। দে দুটো ভাত! বিমলা ছেলেমানুষের মত কাঁদতে শুরু করলে।

জয়ন্তী স্নেহের সুরে বললে—কাঁদতে নেই মামীমা ছিঃ, তোমার মনে থাকে না কিছু। ভাত তোমাকে খাইয়ে গিয়েছি—আচ্ছা মামাবাবু এলে জিজ্ঞেস করো—

--হ্যাঁ, যেমন তুই, তেমনি তোর মামাবাবু—আমি এদিকে খিদের জ্বালায় মরছি—

জয়ন্তী নানারকমে ভুলিয়ে তার দুর্বলমস্তিষ্ক মামীমাকে শান্ত করে ঘুম পাড়ালে।

শ্রাবণের শেষ। ভীষণ বর্ষা পড়ে গেল। দিন নেই রাত নেই, সব সময় বৃষ্টি। খানা ডোবা জলে থৈ থৈ করছে, পটলের ক্ষেত সব জলে ডুবে গিয়েছে বলে হাটে-বাজারে পটল বেজায় আক্রা।

একদিন বিমলা স্বামীকে ডেকে চুপি চুপি অপরাধিনীর মত বললে—ওগো, একটা কথা বলব?

—কি?

—আমি একটা ভুল করে বড় লোকসান করে ফেলেছি,—বল, আমায় বকবে না?

—আগে শুনি না?

—বকবে না আগে বল—

—আচ্ছা, বকছি নে।

—দেখ, তুমি সেই একবার আমায় টাকা দিয়েছিলে মনে আছে? আমার অসুখের আগে? সে আমি তাকের ওপর ছোলার কলসীটার মধ্যে রেখেছিলাম। আজ আস্তে আস্তে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ছোলার কলসীটা পেড়ে দেখলাম সে টাকা নেই! সে তো কেউ জানত না। আমার অসুখের সময় কে বের করে নিয়েছে। আমার মনে হয় ঝি মাগীটা—এখন কি ও কবুল যাবে? কত দাকা ছিল তোমার মনে আছে?

অতুলের মনে কি কুবুদ্ধি চাপল। অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে স্ত্রীর অসুখে। বেশি তো নয়, আঠারো টাকা সাত আনা মাত্র। বিমলার মনে নেই যে ভীষণ অসুখের সময় টাকাটা সে তারই হাতে দিয়েছিল। বললে, তা থাক গে। গিয়েছে তো গিয়েছে—সামান্য টাকা—

—ঝিকে একবার বল না?

—ও ঝগড়া বাধাবে তা হলে। কেউ তো ওকে দেখে নি টাকা নিতে? কি আর হবে!

—কত টাকা তোমার মনে আছে? একটা ময়লা রুমালে বাঁধা ছিল মনে হচ্ছে যেন। আহা, কতগুলো টাকা—আমার অদেষ্টেই গেল! তুমি কিছু মনে করো না—লক্ষ্মীটি। রাগ করবে না আমার ওপর? তোমার ক্ষেতি-লোকসান করতেই আমি আছি।

বিমলা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

একবার অতুলের মনে হল সব কথা স্ত্রীকে মনে করিয়ে দেয়। বলে, ভেবো না, লক্ষ্মীটি—ঠাট্টা করছিলাম। টাকা যে সেই তুমি আমার হাতে—

কিন্তু তখনই ভাবলে, হবে হবে—এর পরে দেব। এই ধাক্কাটা সামলে নিই তো। সামান্য টাকা, দিলেই হবে এর পরে।

ভাদ্র মাস পড়বার আগেই ঘুঘু-ডাকা সুদীর্ঘ শ্রাবণের এক দ্বিপ্রহরে নৌকাযোগে সে তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ী রেখে এল। এত বড় অসুখ থেকে উঠল, বাপ-মায়ের কাছে একবার যাওয়া উচিত!

বিমলা আর ফেরে নি।

শীতের প্রথমে সামান্য জ্বর থেকে দাঁড়াল নিউমোনিয়া, দুর্বল শরীর সামলাতে পারলে না সে ধাক্কা। অতুলের সঙ্গে দেখাও হয়নি শেষ সময়টা। স্বামী—বা দু-পাঁচটা সঞ্চিত টাকা যা পাউডারের কৌটোটাতে ছিল নিজের তোরঙ্গটাতে—সব ফেলে রেখে চলে গেল।

এর পর সাত বৎসর অতীত হয়ে গিয়েছে।

অতুলের বয়সও ভাঁটিয়েছে, মাথার চুলে পাক ধরেছে, দেখলেই মনে হবে যৌবন বিদায় নিয়েছে কিছুকাল আগে। এখন রাস্তায় কনট্রাক্টরি করে হাতে দু পয়সা করেছেও। আগের চেয়ে অবস্থা ঢের ভাল। গ্রামের মধ্যে একজন সঙ্গতিপন্ন লোক সে বর্তমানে। এবার স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত হয়েছে।

শীতকালের দিন। সে বসে চৌকিদারের মাসিক বেতনের বিল পরীক্ষা করছে, এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে সরোজিনীর (তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী; দুটি ছেলে ও একটি মেয়েও হয়েছে) উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—শোন শোন, শীগ্‌গির ইদিকে এস তো? দেখ দেখ—

কি না জানি বিপদ ঘটেছে ভেবে অতুল ছুটে গিয়ে দেখল স্ত্রী ঘর পরিষ্কার করতে করতে পৈতৃক আমলের যে বাক্সটাতে সাবেক আমলের জমিজমার খাতা, পুরোনো চেক-দাখিলা, কাগজপত্র ইত্যাদি আছে তার মধ্যে থেকে কীটদষ্ট বিবর্ণ একটা নেকড়ার পুঁটুলি বার করে হাতে তুলে ধরে বলছে, এই দেখ! আজ ভাবলাম পুরনো বাক্সটা ঝেড়েঝুড়ে সাফ করি, কাগজপত্তরের ভেতর এই দেখ কি ছিল! কি বল তো এটা? বোধ হয় টাকাকড়ি। খুলে দেখি দাঁড়াও।

পরে ক্ষিপ্রহস্তে পুঁটুলির গেরো খুলে বললে, দেখ দেখ—টাকা আর খুচরো! দাঁড়াও গুনি—

আনন্দপূর্ণ উত্তেজিত কণ্ঠে সে গুনতে লাগল—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—ওঃ দেখি—

গোনা শেষ করে খুশির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে, হুঁ হুঁ। এ কিন্তু আমি দেব না। কর্তাদের আমলের রাখা নিশ্চয়ই। এতদিন তোমরা তো কেউ পাও নি। একখানা রুমালে বাঁধা—দেখ না?

অতুল চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ।

অনেকদিন আগেকার একখানা জ্বরদীপ্ত আরক্ত মুখ...ছেলেমানুষের মত লোভার্ত-দৃষ্টি...এক বর্ষার মেঘমেদুর দিন...শ্রাবণ মাস...

সে শুধু কলের পুতুলের মত বললে, কত আছে বললে?

সরোজিনী হেসে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, আঠার টাকা সাত আনা। এ আমি আর দিচ্ছি নে! আমি পেলাম, এ আমি নেব।

সিঁদুরচরণ

সিঁদুরচরণ আজ দশ-বারো বছর মালিপোতায় বাস করচে বটে কিন্তু ওর বাড়ী এখানে নয়। সেদিন রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে সিঁদুরচরণ কোথা থেকে এসেচে তা নিয়ে কথা হচ্ছিল। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মশায় তামাক টানতে টানতে বললেন—"কে, সিঁদুরচরণ? ওর বাড়ী ছিল কোথায় কেউ জানে না, তবে এখানে আসবার আগে ও খাবরাপোতায় প্রায় দশ বছর ছিল। তার আগে অন্য গাঁয়ে ছিল শুনিচি, গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোই ওর পেশা।"

পেশা হয়তো হতে পারে, কারণ সিঁদুরচরণ গরীব লোক।

জীবনে সে ভালো জিনিসের মুখ দেখেনি কখনো। কেউ আপনার লোক ছিল না, সম্প্রতি মালিপোতাতে এসে বিয়ের চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীলকে কেউ মেয়ে দেবার আগ্রহ দেখায়নি। মালিপোতার এক বুনো মালী আজকাল ওর সঙ্গে একত্র স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করে। তার বয়স ওর চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। দেখতে মোটাসোটা, মিশকালো রং, মাথার চুলে এখনও পাক ধরেনি বটে তবে ধরবার বেশি দেরিও নেই। বুনো বলে এদেশে সেইসব কুলি-মজুরের বর্তমান বংশধরদের, যারা একশো বছর আগে নীল-কুঠির আমলে রাঁচি, হাজারীবাগ, গিরিডি, মধুপুর প্রভৃতি থেকে এসেছিল মজুরি করতে, এখন তারা বেমালুম বাঙালী হয়ে গিয়েচে—ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার সব রকমে। পূর্বপুরুষের বোংগা পুজো ভুলে গিয়েচে কতকাল, এখন হরিসংকীর্তন করে

ঘরে ঘরে, মনসা-পুজো, ষষ্ঠী-পুজো করে, কালীতলায় মানত করে।

এখন যদি এদের জিজ্ঞেস করা যায়—তোরা কোন্ দেশ থেকে এসেছিলি রে? তোদের আপনজন কোথায় আছে?

ওরা বলবে তা কি জানি বাবু।

—পশ্চিম থেকে এসেছিলি, না?

—শুনেচি বাপ-ঠাকুরদার কাছে। ওদিকের কোথা থেকে আমাদের পাঁচ-ছ' পুরুষের আগে এসে বাস করা হয়। সে সত্য যুগের কথা।

সিঁদুরচরণ এ-হেন বুনো মালীকে নিয়ে দিব্যি ঘর করতে থাকে। তার নাম কাতু—হয়তো 'কাত্যায়নী'র অপভ্রংশ হবে নামটা। কিন্তু ওর অপভ্রংশ নামটাই অন্নপ্রাশনের দিন থেকে পাওয়া—ভাল নাম তাকে কেউ দেয়নি।

সিঁদুরচরণ পরের গোরু চরিয়ে আর পরের লাঙ্গল চষে জীবনের চল্লিশটি বছর কাটিয়ে দেওয়ার পরে বিঘে তিনেক জমি ওটবন্দি বন্দোবস্ত নিলে। তার জমিতে পরের বছর দশ মণ পাট হলো; সেবার বাইশ টাকা পাটের মণ। পাট বিক্রি করে সেবার এত পেলে সিঁদুরচরণ, অত টাকা একসঙ্গে তার তিন পুরুষে কখনো দেখেনি। দশ টাকার নোট বাইশখানা।

কাতু বললে—হ্যাঁ গো, দশ হাত ফুলন শাড়ীর দাম কত?

—কেন, নিবি?

—দাও গিয়ে এবার। অনেকদিন যে ভাবচি। বড্ড শখ।

—এই বয়সে ফুলন শাড়ী পরলি লোকে ঠাট্টা করবে না?

কথাটা কিঞ্চিৎ রূঢ় হয়ে পড়লো, মনে হলো সিঁদুরচরণের। অল্প বয়সে ওকে দেবার লোক কে ছিল? আজ বেশি বয়সে সুবিধে যখন হলোই তখন অল্পবয়সের সাধটা পূর্ণ করতে দোষ কি? তারপর ঘোষেদের দোকান থেকে একখানা ফুলন শাড়ী শুধু নয়—তার সঙ্গে এলো একখানা সবুজ রঙের গামছা।

কাতু খুশিতে আটখানা। বললে—শাড়ীখানা কি চমৎকার—না?

—খুব ভালো। তোর পছন্দ হয়েচে?

—তা পছন্দ হবে না? যাকে বলে ফুলন শাড়ী।

—আর গামছাখানা কেমন?

—অমন গামছাখানা কখনো দেখিইনি। ও কিন্তু মুই ব্যাভার করতি পারবো না প্রাণ ধোরে। তাহলি খারাপ হোয়ে যাবে।

—খারাপ হয় আবার কিনে দেবো।। আমার হাতে এখন কম ট্যাকা না!

সেদিন কামার-দোকানে বসে তিনকড়ি বুনোর মুখে কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নান করতে যাবার বৃত্তান্ত শুনলো সিঁদুরচরণ। বাড়ী এসে কাতুকে বললে—কাতু, তুই থাক্, আমি দুদিন দেশ বেড়িয়ে আসি—

—কোথায় যাবা?

—একদিকে বেড়িয়ে আসি—

—আমারে নিয়ে যাবা না?

—তুই যাস তো চল্—ভালোই তো—

দুজনে জিনিসপত্র একটা বোঁচকাতে বেঁধে তৈরী হলো। কিন্তু যাবার দিন কাতুর মত বদলে গেল হঠাৎ। সে বললে—তুমি যাও, আমি যাবো না। গোরুটার বাছুর হবে এই মাসের মধ্যে। যদি আসতে দেরি হয়, বাছুরটা বাঁচবে না।

—তুই যাবিনে?

—আমার গেলি চলবে কেমন করে? বাছুরটা মরে গেলি সারা বছরটা আর দুধ খেতি হবে না। তুমি যাও। আমি যাব না।

সুতরাং সিঁদুরচরণ একাই রওনা হলো বোঁচকা নিয়ে। রেলগাড়ীতে সামান্যই চড়েচে সে, একবার কেবল বেনাপোল গিয়েছিল গোরুর হাট দেখতে। সে জীবনে একবারমাত্র রেলগাড়ী চড়া। পরের চাকরী করতে সারা জীবন কেটেচে।

স্টেশনে গিয়ে রেলে চড়ে যেতে হবে। সিঁদুরচরণ কাপড়ের খুঁটে শক্ত করে গেরো বেঁধে দুখানা দশ টাকার নোট নিয়েচে। কেউটেপাড়ার কাছে পাঁচু বুনোর দো-চালা ঘর রাস্তার ধারে। ওকে দেখে পাঁচু জিজ্ঞেস করলে—ও সিঁদুরচরণ, কনে চলেচ এত সকালে?

—একটু ইস্টিশানে যাবা।

—কোথায় যাবা?

—বেড়াতি যাবা রাণাঘাটের দিক।

—তামাক খাও বসে।

সিঁদুরচরণ তামাক খেতে বসলো। কাছেই একটা বাঁশনি-বাঁশের ঝাড়—সিঁদুরচরণ সেদিকে চেয়ে ভাবলে—এই বাঁশনি-বাঁশের ঝাড়টা এদেশে, আবার অন্য দেশেও গিয়ে কি এমনি দেখা যাবে? সে আবার না জানি কি রকম বাঁশনি-বাঁশ। এই রকম কেঁচো, এই রকম কচুর ফুল কি অন্য জায়গাতেও আছে? দেখতে হবে বেড়িয়ে। সত্যি, বড় মজা দেশ-বিদেশে বেড়ানো।

সিঁদুরচরণ স্টেশনে পেঁছবার কিছু পরে টিকিটের ঘণ্টা পড়লো ঢং ঢং করে। একজন ওকে বললে—যাও গিয়ে টিকিট করো। গাড়ী আসচে।

টিকিটের জানলায় গিয়ে ও বললে—ও বাবু, একখানা টিকিস্ দ্যান মোরে—

টিকিটবাবু বললে—কোথাকার টিকিট?

—দ্যান বাবু, রাণাঘাটেরই দ্যান আপাতোক একখানা।

গাড়ীতে উঠে সিঁদুরচরণের ভীষণ আমোদ হলো। সে আমোদ রূপান্তরিত হলো বার বার ওর ধূমপান করবার ইচ্ছায়। ঘন ঘন বিড়ি খায়, এই ধরায়, এই খায়। কয়েকটি বিড়ি খেতে খেতেই রাণাঘাটে গাড়ী এসে পড়াতে ও আশ্চর্য হয়ে পড়লো। ষোল মাইল রাস্তা যে এত অল্প সময়ে এসে পড়বে, তা ও ভাবেই নি।

রাণাঘাটে নেমে এখন কোথায় যাওয়া যায়? এখন অনেক দূরে যেতে হবে, যেখানে কখনো সে যায়নি।

স্টেশনের এপারে একটা উঁচুমত রোয়াক বাঁধানো জায়গা খুব লম্বা। তার দুধারে রেল লাইন পাতা। সেই লম্বা রোয়াকের ওপর লম্বা একটা টিনের চালা। অত বড় টিনের চালার তলায় বা রোয়াকটার অন্যদিকে লোকে পান বিড়ি, চা, খাবার ইত্যাদি বিক্রি করচে—লোকজনে কিনচে। যেন একটা মেলা বসে গিয়েচে। মড়িঘাটায় গঙ্গাস্নানের যোগের সময় এ রকম মেলা সে দেখেচে।

একদল উত্তরে লোক তার সঙ্গে একই ট্রেন থেকে নেমে বিড়ি টেনে আড্ডা জমিয়েচে টিনের চালার নীচে। ও সেখানে গিয়ে বললে—কনে যাবা?

তারা বললে—মুকসুদাবাদ; বেলডাঙা।

—সে কনে?

—উত্তুরে।

—কোথায় গিয়েলে?

—পাট কাচতে গেছলাম ওই কানসোনা, তালহাটি, মেহেরপুর।

মেহেরপুর গ্রাম সিঁদুরচরণের বাড়ীর কাছে। লোকগুলো সেখান থেকে আসছে শুনে সিঁদুরচরণের মনে হলো এই দূর বিদেশ বিভুঁয়ে এরাই তার পরম আত্মীয়। সে বললে—মেহেরপুরের নসিবদ্দি সেখরে চেন?

—তেনার বাড়ীতেই তো ছিলাম আমরা। বছর বছর তেনার পাট কাচি। পত্তর দিয়ে আমাদের তিনি নিয়ে আসে।

—মুইও তারে খুব চিনি।

—আপনি কতদূর যাবা?

—বেড়াতে বেরিইচি, যেতদূর যাওয়া যায় ততদূর যাবো।

ওদের মধ্যে একজন বললে—তবুও কতদ্দূর যাওয়া হবে? আমার সঙ্গে বাহাদুরপুর চলো। আমি সেখানে যাবো।

—সে কনে?

—কেষ্টলগর ছাড়িয়ে।

—তবে পয়সা নিয়ে মোর টিকিটখানা তোমার সংগে করে নিয়ে এসো ভাই।

—দ্যাও ট্যাকা।

—কত নাগবে?

—এগারো আনা।

আধঘণ্টা পরে লোকটা টিকিট কেটে এনে তার হাতে দিল। সিঁদুরচরণ পুঁটুলির মধ্যে থেকে কাতুর দেওয়া ধুপি-পিঠে খেতে লাগলো এবং তার সংগীকে দিলে। ধুপি-পিঠে আর কিছুই নয় শুধু চালের গুঁড়োর পিঠে, জলে সিদ্ধ। গুড় দিয়ে ভিন্ন সে কঠিন ইঁটের মত জিনিস গলা দিয়ে নামে না—কিন্তু গুড় সে সংগে করে আনেনি কাপড়চোপড়ে লেগে যাবে বলে। ওর সংগী বল্লে—একটু রসগোল্লার রস কিনে আনবো? এ বড্ড শক্ত।

—হ্যাঁগা উত্তরের গাড়ী কখন আসবে?

—এই এল। তামুক খেয়ে ল্যাও তাড়াতাড়ি।

একটু পরে আরাম করে বসে ওরা তামাক খেতে লাগলো। সংগে সংগে হুড়মুড় করে উত্তরের অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের ট্রেন এসে হাজির। চা, পান, পাঁউরুটির ফিরিওয়ালাদের চীৎকারে প্ল্যাটফর্ম মুখরিত হয়ে উঠলো। যাত্রীরা ইতস্তত ছুটাছুটি করতে লাগলো গাড়ীতে ওঠবার চেষ্টায়। হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় সিঁদুরচরণের হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে তার নতুন সংগী তাকে একটা কামরায় ওঠালে।

গাড়ী রাণাঘাট ছেড়ে দিলে। সিঁদুরচরণ এক কল্কে তামাক সেজে হাঁপ ছেড়ে বললে —বাবাঃ—এর নাম গাড়ী চড়া? কি কান্ড।

সিঁদুরচরণের মনে হলো কাতুকে কতদূরে ফেলে সে অজানা বিদেশে বিভুঁইয়ের দিকে চলেচে! না এলেই যেন ছিল ভালো! কে জানে বাড়ীর বার হলেই এসব হাঙ্গামা ঘটবে? বিদেশের লোক কি রকম তারই বা ঠিক কি? তার টাকা ক'টা কেড়ে নিতেও পারে।

তার সংগী তাকে বলে দিচ্চে—এই উলো, এই বাদকুল্লো, এই কেষ্টলগর।

—কেষ্টলগর? কই দেখি দিকি! নাম শোনা আছে বহুৎ দিন যে।

সিঁদুরচরণ বিশেষ কিছুই দেখতে পেলে না। গোটাকতক টিনের গুদোম, খানকতক ঘোড়ার গাড়ী, দু-চারটে কোঠাবাড়ী। তাই দেখেই সে মহা খুশি। মস্ত জায়গা কেষ্টনগর। দেশে ফিরে গল্প করার মত কিছু পাওয়া গেল বটে। কাতুকে নানা ছাঁদে গল্প শোনাতে হবে বাড়ী ফিরে।

আরও একটা স্টেশন গেল। পরের স্টেশনেই বোধ হয়—তার সংগী বললে—নামো, নামো, বাহাদুরপুর।

সিঁদুরচরণ বোঁচকা নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লো। তখন সন্ধ্যা হয় হয়; সে চেয়ে দেখে—ধু ধু মাঠের মধ্যে ছোট্ট স্টেশন চারিধারে কুলকিনারা নেই এমন বড় মাঠ। দূরে দূরে দু-চারটে তালগাছ, বাঁশবন।

সিঁদুরচরণের বুকের মধ্যেটা হু-হু করে উঠলো।

কোথায় কাতু, কোথায় তাদের মালিপোতা। সব ফেলে সে আজ এ কোথায় কতদূরে এসে পড়েচে!

মনে মনে বললে—এ্যান্ধারা বিদেশেও মানুষ আসে! ভগবান, এ তুমি কোথায় নিয়ে ফেললে মোরে।

ওর সংগী বললে—চলো।

—ও বলে—কনে যাবো?

—মোদের গাঁয়ে চলো। এখেন থেকে দু-কোশ পথ।

—সেখানে যাবো?

—যাবা না তো এখানে থাকবা কোথায়? খেতে-দেতে হবে তো?

—কি নাম তোমাদের গাঁ?

—গোয়ালবাথান। নাগরপাড়া।

অগত্যা সি'দ্রচরণ চললো নাগরপাড়া, তার নতুন সঙ্গীর বাড়ী। ক্রোশ দুই হাঁটবার পরে এক গাঁয়ে ঢুকবার মুখেই ছোট্ট চালাঘর। সেখানে গিয়ে তার বন্ধু বললে—এই মোদের বাড়ী। ভাত-পানি খাও, হাত-মুখ ধোও।

সি'দ্রচরণ বললে—ভাত-পানি খাব কি, মুই কনে এসে পড়েচি তাই শুধু ভাবতি লেগেচি।

—কন্দূর আসবা আবার!

—কোথায় ছেলাম আর কনে আলাম! উঃ! এ পিরথিমির কি সীমেমুড়ো নেই? হ্যাঁগা, আর কন্দূর আছে ইদিকি?

—আরে তুমি কি পাগল নাকি? কী বলে আর কী করে! ল্যাও ভাত-পানি খাও।

ভাত খেয়ে সি'দ্রচরণ গ্রামের মাঠের দিকে বেড়াতে গেল।

বড় বড় মাঠ, দূরে তালগাছ। এতবড় মাঠ তাদের দেশে সে কখনো দেখেনি, আর চারিদিকেই আকের খেত। উ-ই কি-একটা গ্রাম দেখা যায়! ওর পরও পিরথিম্ আছে ওদিকে? বাব্বাঃ!

একজন লোককে বললে—হ্যাঁগা, ইদিকে এত আকের চাষ কেন?

—কেন, বেলেডাঙায় চিনির কল আছে। আক সেখানে মণ দরে বিক্রি হয় গো—

—সব আক?

—এ কী আক তুমি দেখচো, বেলডাঙার ওদিক ষাট সত্তর একশো বিঘের এক এক বন্দ, শুন্দু—আক।

ওর বন্ধুর বাড়ীতে দিন দুই থাকার পরে আকের জমির মজুর দরকার হয়ে পড়লো। ওদের পরামর্শে সি'দুচরণও আকের ক্ষেতে আক কাটবার কাজে লেগে গেল। আট আনা রোজ। সি'দুচরণদের দেশে মজুরের রেট সওয়া পাঁচ আনা। সে দেখলে মজুরির রেট বেশ ভালোই। দুদিনে একটা টাকা রোজগার, হবেই বা না কেন, কোন্ দেশ থেকে কোন্ দেশে এসে পড়েচে—এখানে সবই সম্ভব।

নাগরপাড়ার ওপারে বোরগাছি, তার পাশে ধুবুলি। এই দুই গ্রাম থেকে অনেক মজুর আসতো আকের ক্ষেতে কাজ করতে। ওদের মধ্যে একজনের সঙ্গে সি'দ্রচরণের খুব ভাব হয়ে গেল। সে বললে—আমাদের গেরামে যাবা? সেখানে ঘোষ মশায়দের বাড়ীতে একজন কিষাণ দরকার। দশ টাকা মাইনে, খাওয়া-পরা।

সি'দ্রচরণের কাছে এ প্রস্তাব লোভনীয় বলে মনে হলো। তাদের দেশে কৃষাণদের মাইনে পাঁচ টাকার বেশি নয়, খাওয়া-পরার কথাই ওঠে না সেখানে। এবার পাটের দাম বেশি হওয়াতে কৃষাণদের রেট এক টাকা বেড়েচে মাসে—তাও কতদিন এ চড়া রেট টিক্‌বে তার ঠিক নেই। হাতে কিছু টাকা করে নেওয়া যায় এদেশে থাকলে। কিন্তু এতদূর বিদেশে সে থাকবে কতদিন?

সে জবাব দিলে—না ভাই, আমার যাওয়া হবে না।

—চাকরি করবা না?

—মরতি যাবো কেন বিদেশে পড়ে? মোদের গাঁয়ে চাকরির অভাবডা কী?

খেয়ে দেয়ে হাতে দুপয়সা জমেছে যখন, তখন পরের চাকরি করতে যাবার দরকার নেই। রোজ রোজ মজুরি চলে। আজকাল একদিনও সে বসে থাকে না। ভালো একখানা রঙিন গামছা কিনে ফেললে তেরো পয়সা দিয়ে বাহাদুরপুরের হাটে একদিন।

রঙিন গামছাখানাই হলো কাল—এখানা কিনে পর্যন্ত তার কেবলই মনে হতে লাগলো কাতু যদি তাকে এ গামছা-কাঁধে না দেখলো তবে আর গামছা কেনার ফলটা কি? সবুজ গামছাখানা তো সেদিন কিনেছিল সে কাতুর জন্যে।

একদিন কাজকর্ম সেরে বিকেলে সে মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েচে। একটা বড় ঘোড়া-নিমগাছ ছায়া ফেলেচে অনেকখানি ফাঁকা মাঠে। সেখানে বসে চুপি চুপি কোমর থেকে গে'জে খুলে পয়সাকড়ি উপুড় করে সামনে ঢেলে গুনে দেখলে, উনিশ টাকা তেরো আনা জমেচে মজুরি করে।

সামনে একটা খালে তেরো-চৌদ্দ বছরের সুন্দরী মেয়ে শামুকগুগুলি তুলচে। ও বললে—কি তোলচো, ও খুকি?
মেয়েটা বিস্ময়ের সুরে বললে—কি?
—তোলচো কী?
—গুগ্‌লি।
—কি হবে?
মেয়েটি সলজ্জহাস্যে বললে—খাবো।
—কি জাত তোমরা?
—বাউরি!
—বাড়ী কনে?
মেয়েটি আবার ওর দিকে যেন খানিকটা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে আছে—তারপর আঙুল দিয়ে দূরের দিকে দেখিয়ে বললে—নটবরপুর।
আর কোন কথা হয় না। মেয়েটা আপন মনে গুগ্‌লি তুলতে থাকে। সিঁদুরচরণ বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কাতুর কথা বড় মনে হয়, আর থাকা যায় না। এ কোন্ মুল্লুক, কতদূর, বিদেশ বিভুঁই, সেখানে বাউরি বলে জাত বাস করে। কেউ বাপ-পিতেমোর জম্মে শুনেচে বাউরি বলে কোনো জাতের কথা, যারা খালে বিলে গুগ্‌লি তুলে খায়?
ওর মনটা হু-হু করে ওঠে নতুন করে। বুকের মধ্যে কী যেন একটা মোচড় খায়। যদি এই বিদেশে মারা যায়?
কাতুর সঙ্গে তাহলে দেখাই হবে না।

কাতু সজনে-তলায় গোরু বেঁধে বিচুলি কেটে দিচ্চে, সন্দের পিদিম ঘরে ঘরে সবে জ্বালা শুরু হয়েচে, এমন সময় রাস্তা কাঁপিয়ে রব উঠলো—বল হরি হরিবোল। ব্যাপারটা নতুন নয়—এই পথ দিয়েই দূর দেশের সমস্ত মড়া পোড়াতে নিয়ে যায় কালীগঞ্জের বা চাঁদুড়ের গঙ্গাতীরে।
কাতুদের পাড়ার কে একজন জিজ্ঞেস করলে—কনেকার মড়া?
—সনেকপুর।
—কি জাত হ্যাঁগা?
—সনেকপুরের বিপিন ঘোষের নাম শুনেচ? তেনার ছেলে। কাতু বিপিন ঘোষের নাম শোনেনি, কিন্তু বড় কষ্ট হলো শুনে। কারো জোয়ান ছেলে মারা গেল—বাপ-মায়ের কী কষ্ট! এ লোক যে কোথায় গেল আজ মাসখানেকের ওপর হবে তা কেউ জানে না। খবর পত্তর কিছুই নেই। শিবির মা গাই দুইতে এসে দেখলে ও চালাঘরের ছেঁচতলায় বসে কাঁদচে। শিবির মা অবাক হয়ে বললে—কাঁদচিস কেন রে?
—মনটা বড্ড কেমন করচে।
—দূর! বাছুরটা ধর। ইদিক আয় দিনি।
—একটা মড়া নিয়ে গেল দেখলি? বিপিন ঘোষের ছেলে।
—নিয়ে গেল তা তোর কি? মর্ মাগী! বাছুর ধর্। এখুনি পিইয়ে যাবে।
শিবির মা পাড়ায় গিয়ে রটিয়ে দিলে সিঁদুরচরণ কাতুকে ফেলে পালিয়েচে। আর আসবে না, এতদিনে বোঝা গেল। অনেকে সহানুভূতি দেখালে। কেউ কেউ বললে—বিয়ে করা সোয়ামী নয় তো। গিয়েচে তা কী হবে। গোরুটা রয়েচে, অমন ভাল বক্‌না বাছুরটা হয়েচে, ওরই রইল।

আরও দিন-পনেরো কাটলো...
কাতুর চোখের জল শুকোয় না। রোজ সন্ধ্যেবেলা মন হু-হু করে। এমন বক্‌না-বাছুর হলো গোরুটার, বার দোয়া শেষ করে আজ সেই গোরু দেড় সের দুধ দিচ্চে দুবেলায় —ও এসে দেখুক। নইলে ঘরে আগুন ধরিয়ে সে চলে যাবে একদিকে, যেদিকে

দুচোখ যায়।

পাড়ার ছিচরণ সর্দার আজকাল ওর বাড়ী বড় যাতায়াত শুরু করেচে। ঠিক যে সময়টিতে কেউ থাকে না, ভর সন্ধ্যেবেলাটি, বাঁশবনে রোদ মিলিয়ে গিয়েচে—ছিচরণ এসে বলবে—ও কাতু!

—কি?

—ঘরে আছিস্?

—কেনে?

—একটু তামুক খাওয়া।

—তামুক নেই গো।

—পান সাজ্ একটা।

—পান কনে পাবো? মানুষ ঘরে না থাকলি ও-সব থাকে? তুমি এখন যাও।

ছিচরণ সর্দার দমবার পাত্র নয়। তার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েচে আজ দু'বছর। অবস্থা ভালো, এক আউড়ি ধান ঘরে তুলেচে গত ভাদ্র মাসে। একবার চড়া পাটের বাজারে ত্রিশ মণ পাট বিক্রি করেচে। লোকে খাতির করে চলে ওকে। শিবির মা রোজ গাই দুইতে এসে ছিচরণের ঐশ্বর্য্যের ফিরিস্তি কাতুকে শুনিয়ে যায় অকারণে। ছিচরণ নিজে দু-একদিন অন্তর আসে; বসতে না বললেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গল্প জমাবার চেষ্টা করে। কাতুর ভালো লাগে না এ-সব। আর কিছুদিন সে দেখবে—তারপর গোরু বাছুর বিক্রি করে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে একদিকে।

সেদিন ছিচরণ আবার এসে হাজির। ডাক দিলে—ও কাতু!

—কি?

—বাবাঃ, তা একটু ভালো করে কথা বললি কি তোর জাত যাবে?

—তুমি রোজ রোজ ভর-সন্দেবেলা এখানে আস কেন?

—তার দোষটা কি?

—না, তুমি এসো না। লোকে কি মনে করবে।

—একটা কথা বলি তোর কাছে। আমার সংসারডা তো গিয়েচে তুই জানিস। একা থাকতি বড্ড কষ্ট হয়।

—তা কি করবো আমি?

ছিচরণের আর বেশি কথা বলতে সাহস হলো না, আমতা আমতা করে বললে—না না—তাই বলচি।

কাতু বললে—এখন তুমি এসো গিয়ে।

ছিচরণ তবুও যায় না। বলে—ওরে দাঁড়া। যাবো, যাবো, থাকতি আসিনি। এই দু-বিশ ধান কর্জ্জ দেলাম পাঁচরে। বলি হয়েচে দেড় পৌটী ধান, তা লোকের উপকারে লাগে তো লাগুক। ধান ঝেড়ে দিয়ে-থুয়ে এই আসচি। বড্ড কষ্ট হয়েচে আজ।

কাতু ঝাঁঝালো সুরে বললে—কষ্ট জুড়োবার আর কি জায়গা নেই গাঁয়ে?

—তোর সঙ্গে দুটো কথা বল্লি আমার মনডা জুড়োয় সত্যি বলচি কাতু। তোরে দেখে আসচি ছেলেবেলা থেকে। আমি যখন গোরু চরাই তখন তুই এতটুকু। তোর বয়েস আমার চেয়ে সাত আট বছরের কম।

—বেশ, তা এখন যাও। বয়েসের হিসেব কসতি কে বল্‌চে তোমারে?

—হ্যাঁরে, সিঁদুরচরণ তোরে ফেলে এমনিই পালালো, না পয়সাকড়ি কিছু দিয়ে গিয়েচে? চলা-চলতির একটা ব্যবস্থা চাইতো?

—সেজন্যি তোমার দোরে গিয়ে কেঁদে পড়েলাম মুই, জিজ্ঞেস করি?

ছিচরণ বেগতিক দেখে আস্তে আস্তে চলে গেল। কাতু কাঁদতে বসলো। তার বয়েস হয়েচে একথা সত্যি, প্রায় প'য়তাল্লিশের কাছাকাছি, কি তার চেয়েও বেশি। ঘরসংসার বলে জিনিসের মুখ এই ক'বছর দেখেচে, সিঁদুরচরণের কাছে থেকে। আবার কোথায় যাবে এই বয়সে? একটা পেট চলে যাবে, ভিক্ষে করা কেউ কেড়ে নেবে না। দুদিনের গেরস্থালি ভেঙে যদি যায়—আর কোথাও গেরস্থালি বাঁধবে না, সব ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বে।

শিবির মা এসে দোরে দাঁড়ালো। কাতু জানে, ও কেন আসে। আসে একটা নিয়ে অবিশ্যি। বললে—একটু হলুদবাটা দেবা?

—নিয়ে যাও!

—দুসের হলুদ এনেছিলাম ছিচরণ সর্দারের বাড়ী থেকে। তা ফুরিয়ে গিয়েচে। ওর ঘরে কোনো জিনিসের অভাব নেই। হলুদ বলো, ঝাল বলো, পেঁজ বলো, সরষে বলো—সব মজুদ। গুড় আমাদের দেয় বছরে একখানা ক'রে! ওর ঘরে চার-পাঁচ মণ গুড় হয় ফি-বছর।

কাতু বললে—তা এখন হলুদ-বাটনা নেবা?

শিবির মা বললে—হলুদ-বাটনা দ্যাও একটু। মাছ রাঁধবো।

—তবে নিয়ে যাও।

—তোমার শরিল খারাপ হলি দেখাশোনা করে কে তাই ভাবছি।

—সে ভাবনা তোমায় ভাবতি কেডা গলা ধরে সেধেচে শুনি? গা-জ্বালা কথা শুনলি হয়ে আসে।

ঠিক সেই সময় উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কে ডাক দিলে—ও কাতু!

কাতু চমকে উঠেই পরক্ষণে দাওয়া থেকে ছুটে নেমে এসে বললে—তুমি! ওমা, আমি কনে যাবো!

শিবির মা অন্য দিক দিয়ে পালানোর পথ খুঁজে পায় না শেষে।

এই হলো সিঁদুরচরণের বিখ্যাত ভ্রমণের ইতিহাস। এর পর থেকে মালিপোতা গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত ভ্রমণকারী বলে সে গণ্য হয়ে রইল। দশবার ধরে এ গল্প করেও তার ভ্রমণ-কাহিনী আর ফুরোয় না। লোকে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে বলে—ওই লোকটা বাহাদুরপুর গিয়েছিল। জোয়ান বয়সে ও বড্ড বেড়িয়েচে দেশ-বিদেশে।

অবিশ্যি সিঁদুরচরণকে দেখতে নিতান্ত সাধারণ লোকের মতই। তার মধ্যে যে অত বড় গুণ লুকিয়ে আছে তা তাকে দেখে বোঝবার উপায় ছিল না। মানুষের কীর্তিই মানুষকে অমর করে।

সিঁদুরচরণের খ্যাতি আমার কানেও গিয়েছিল। ঝুমুরির বাগানের মধ্যে দিয়ে সিঁদুরচরণ হাট থেকে সেদিন ফিরচে, আমি বল্লাম—সিঁদুরচরণ নাকি বাহাদুরপুর গিয়েছিলে?

সিঁদুরচরণ বিনম্র হাস্যের সঙ্গে বললে—তা গিয়েলাম বাবু। অনেকদিন আগে।

—বটে! আচ্ছা, সে কতদূর?

—আপনি কেষ্টলগর চেন?

—না চিনলেও নাম শোনা আছে।

—কোন্ দিক জানো?

—তা কি করে জানবো, আমি কি সেখানে গিয়েচি?

—বাহাদুরপুর কেষ্টলগরের দু'ইস্টিশনের পরে।

কথা শেষ করেই সিঁদুরচরণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, বোধ হয় এই দেখবার জন্য যে, তার কথা শুনে আমার মুখের চেহারা কি রকম হয়।

একটি কোঠাবাড়ীর ইতিহাস

সন ১২৪০ সাল। সকাল বেলা। কাল দোলদুর্ণিমা।

কালীপদ চৌধুরী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। থই-দই খাইয়া তিনি এখনই রওনা হইবেন। অক্ষয় মিস্ত্রিকে ডাকিয়া আনিয়া কোঠাঘরের আনুমানিক ব্যয় ঠিক করিতে হইবে।

রামতারণ বাঁড়ুজ্যে কৃষ্ণনগর কোর্টের নকলনবিশ। গ্রামে অগাধ পয়সা প্রতিপত্তি। দু' পয়সা করিয়াছেন, গোলাপালা, জমিজমাও করিয়াছেন। ছুটিতে রামচরণ বাড়ী আসিয়া-

ছেন, চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক টানিতেছেন সকালবেলা। কালীপদ চৌধুরীকে দেখিয়া কহিলেন—কোথায় চললে হে?

—আজ্ঞে কাকা, অক্ষয় মিস্ত্রীকে একবার ডাকতে যাচ্ছি।

—কেন হে? অক্ষয় মিস্ত্রীকে কি হবে তোমার?

কালীপদ আসিয়া বসিলেন চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায়। বলিলেন—বাঃ, এবার মিছরে গাছটাতে খুব বোল হয়েছে দেখছি!

বসন্তের সকাল। একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে, আম্রমুকুলের সুমিষ্ট সৌরভে ভরপুর।

রামতারণ বলিলেন—আর-বারও বোল হয়েছিল ভাল, কুয়াশাতে সব ঝাঁই পড়ে গেল। দেখ এ বছর কি হয়। বোল তো ভালই হয়, তবে টিকে থাকে না। বস বাবা।

এই সময় রামতারণের ভাইঝি একটা কাঁসার সাগুরিতে চাল-ভাজা, নারকেল-কোরা ও খানিকটা গুড় লইয়া আসিয়া বলিল—জেঠামশায়, খাবার খান।

রামতারণ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—ও-শৈলি, এই তোর কালীপদ-দাদা এসেছে। বাড়ী গিয়ে তোর জেঠাইমাকে বল গে—

কালীপদ বলিলেন—না না, কাকা। আমি এইমাত্তর খই-দই খেয়ে বেরিয়েছি। আমায় যেতে হবে সেই পুবপাড়া। অক্ষয় মিস্ত্রীকে বাড়ী পাওয়া দরকার। আমি উঠি।

—না না, বস, দুটি চালভাজা খেলে তোমাদের মতন ছেলে-ছোকরা মানুষের আর অক্ষিধে হবে না। যা শৈলি, নিয়ে আয় তো। ভাল হয়ে উঠে এসে বস না। তুমি আজকাল সেই জমিদারি সেরেস্তাতেই কাজ করছ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

একটু পরে শৈলি আর এক বাটি চালভাজা ও গুড় লইয়া আসিয়া কালীপদর সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পল্লীগ্রামেও অবিবাহিত কিশোরী মেয়ে গ্রামের তরুণ যুবক প্রতিবেশীর সহিত গুরুজনের সম্মুখে কথাবার্তা বলিতে পারিত না।

শৈলি মেয়েটি বেশ স্বাস্থ্যবতী, দেখিতে শুনিতে ভাল। রংও ফর্সা। চাহিয়া দেখিবার ও দু-একটি কথা কহিবার ইচ্ছা থাকিলেও কালীপদ সামলাইয়া গেলেন।

রামতারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তার পর, অক্ষয় মিস্ত্রীর কাছে কী মনে করে?

—দুটো পাকা ঘর করব ভাবছি, কাকা।

রামতারণ একটু বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না। সেদিনের ছেলে কালীপদ, ওর বাবা পয়সা রাখিয়া যায় নাই মৃত্যুকালে। একটি অবিবাহিতা ভগ্নী ও বিধবা মা লইয়া ওর সংসার। আজ আট-দশ বৎসর কি করিয়া চালাইতেছে, রামতারণ বাঁড়ুজ্যে তাহার খবর রাখা আবশ্যক মনে করেন নাই। কিন্তু সেই কালীপদ আজ তাহার পৈতৃক আমলের চৌচালা খড়ের ঘর ছাড়িয়া পাকা বাড়ীতে বাস করিবার স্পর্ধা করিতেছে। এত পয়সা ছোঁড়ার হাতে আসিল কি-ভাবে?

রামতারণ বলিলেন—হুঁ।

—আচ্ছা কাকা, আপনি বলতে পারেন, দুখানা ঘর মাত্র, দরজা জানালা, সামনে একটু রোয়াক—এতে কত খরচ পড়তে পারে? তাই যাচ্ছিলাম অক্ষয় মিস্ত্রীর কাছে। আপনার আঁচ পেলে আর অতদূরে যাই নে।

—হুঁ।

—তাহলে যদি বলেন—

—দাঁড়াও। কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হচ্ছে। আনি।

কাগজ কলম আনিয়া হিসাবপত্র জুড়িয়া দেখা গেল আটশ টাকার কমে ও রকম একখানি ছোট বাড়ী তৈয়ারী হয় না। সব জিনিসের দাম বেশি। ইটের হাজার সাত টাকা। সাড়ে দশ আনা সিমেণ্টের বস্তা। রাজমিস্ত্রীর মজুরি দশ আনা, পেটেল মজুরের চার আনা হইতে স' পাঁচ আনা। রামতারণ ভাবিয়াছিলেন, খরচের হিসাব পাইলে ছোঁড়ার চুলবুলুনি ভাঙিয়া যাইবে, কিন্তু দেখা গেল, তাহা নয়, ছোঁড়া দমিল না। বরং বলিল—

আট শ' টাকা তো? না হয় শ'খানেক টাকা এদিক-ওদিক হতে পারে, কি বলেন? তাহলে পাঁজি দেখে একটা শুভদিন দেখে দিন, কাকা। সূত্র ফেলা যাক।

রামতারণ বলিলেন—তা একদিন দেখো এখন। কোঠা করছ—বড় আনন্দের কথা। তোমাদের উন্নতি দেখলে মনে বড়ই আনন্দ হয় বাবা। আহা, আজ যদি তোমার বাবা বেঁচে থাকতেন। তা সবই ভাগ্য।

কালীপদ রামতারণ বাঁড়ুজ্যের পদধূলি লইয়া বলিলেন—আপনি আশীর্বাদ করুন কাকা, যেন মাকে অন্তত কোঠাঘরে শোয়াতে পারি। আপনাদের আশীর্বাদ—

—হবে, হবে বাবা, হবে বই কি। তবে হাজার টাকা ট্যাঁকে গুঁজে তার পর কাজে হাত দিও। দেখো, যেন অর্ধেক হয়ে পড়ে না থাকে। বড় শক্ত কাজ। ছেলেমানুষ কিনা। তাই বলছি।

—আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে সব করব। আমার আর কে আছে আপনাদের পাঁচজন ছাড়া। কত কষ্টে মানুষ হয়েছি বাবা মারা যাওয়ার পরে, সবই তো জানেন। কোনদিন খাওয়া জুটেছে, কোনদিন জোটে নি। ছেঁড়া কাপড় তালি দিয়ে মায়ে পোয়ে পরেছি। দুধ-ঘি এর মুখ দেখি নি কোনদিন।

—হ্যাঁ হে, তোমার ভগ্নীটি তো প্রায় এগার বছরে পড়ল। আর তো ঘরে রাখা যায় না, এবার ওর একটা বিয়ের জোগাড় কর। পল্লীগ্রাম জায়গা, লোকে কি বলবে না বলবে। বাড়ী না হয় দু বছর পরে ক'রো—ভগ্নীর বিবাহটি আগে দাও।

—তাও সন্ধান দেখছি কাকা। ওবেলা এসে বলব এখন সব। আচ্ছা, উঠি তাহলে এখন।

কালীপদ চৌধুরী চলিয়া গেলেন। রামতারণ বাঁড়ুজ্যের সকালটা মাটি হইয়া গেল। নাঃ, আজ আর কোন কাজ করা চলিবে না। কি কুক্ষণে তিনি চণ্ডীমণ্ডপে তামাক খাইতে বসিয়াছিলেন।

রামতারণ বাঁড়ুজ্যে অন্যভাবেও দু-একবার বাধা দেবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; একবার মিস্ত্রীদের কাজ করা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর একবার অন্য কি একটা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালীপদ চৌধুরীর কোঠাবাড়ী তাহাতে বন্ধ থাকে নাই। অবশেষে যেদিন সুন্দর দুইকুঠারি পাকা ঘর নির্মাণ শেষ করিয়া কালীপদ চৌধুরী গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে গ্রামের ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করিলেন, বাস্তুপূজা ও সত্যনারায়ণের সিন্নির আয়োজন করিলেন, রামতারণ সেদিন তাঁহার কর্মস্থল গোয়াড়িতে। বংশের প্রথম কোঠাবাড়ী। কালীপদ চৌধুরীর মা সেই রাত্রিতে এ ঘরে প্রথম শুইলেন। জ্যোৎস্না-রাত্রি। বর্ষাকাল। মনে পড়িল এই বর্ষার দিনে খড়ের ঘরে জল পড়িত মটকা দিয়া, গরীব স্বামী কখনও সে দুঃখ ঘুচাইতে পারেন নাই। আজ উপযুক্ত ছেলে সে খড়ের চালার জায়গায় পাকা ঘর তুলিল। আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন।

জগদম্বা দেবী সে রাত্রে আদৌ ঘুমাইতে পারিলেন না। দোর-জানালায় নূতন রং মাখানো হইয়াছে—তাহার গন্ধটা বড় উৎকট। এক-একবার সে গন্ধটা মনে পরম আনন্দ বহন করিয়া আনে, চোখ বুজিয়া থাকিতে মাঝে মাঝে চোখ খুলিয়া ঘরের চারিধারে চাহিয়া দেখেন। না, পাকা ঘরই বটে। ওই তো কড়িকাঠ, ওই তো পাকা চুনকাম করা দেওয়াল—ওই সেই রঙের উৎকট গন্ধটা। স্বপ্ন নয় সত্যই কোঠাঘরে শুইয়া আছেন বটে।

এই দিনটি হইতে কালীপদ চৌধুরী গ্রামের মধ্যে মাতব্বর হইয়া উঠিলেন। রামতারণের প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি হইতে চাহেন নাই কিন্তু গ্রামের লোক সালিশ মীমাংসা ইত্যাদি কার্যে তাঁহার সাহায্য চাহিতে লাগিল, বারোয়ারির চাঁদা আদায়ের ভার তাঁহার উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে কালীপদ চৌধুরীর অবস্থা আরও ভাল হইয়া উঠিল, তিনি কাছারির নায়েব পদে পাকাপোক্তভাবে বহাল হইয়া সুখ্যাতির সহিত উক্ত কার্য করিতে লাগিলেন।

মাহিনা কুড়ি টাকা বটে, কিন্তু রোজগার করিতেন ষাট-সত্তর টাকা। যে সময় ন সিকা উৎকৃষ্ট বালাম চাউলের মণ, দশ আনা গব্য ঘৃতের সের, ষোল সের খাঁটি দুগ্ধ টাকায়, একটা দু-তিন সের ওজনের রোহিত মৎস্যের দাম বড়জোর এক টাকা সে সময়ে কালীপদ চৌধুরী

গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন মাতব্বর গৃহস্থ বলিয়া গণ্য কেন না হইবেন!

বেলপুকুরের মহিমাচরণ গাঙ্গুলির কনিষ্ঠা কন্যা হৈমবতীর সঙ্গে কালীপদ চৌধুরীর শুভবিবাহ নিষ্পন্ন হইল। লক্ষ্মী যখন আসেন, কোন দিক দিয়া আসেন বোঝা যায় না। এই বিবাহের পর হইতেই কালীপদ চৌধুরীর অবস্থা খুব ভাল হইতে লাগিল। রামতারণ বাঁড়ুজ্যে বৃদ্ধ হইয়া কার্যে অবসর গ্রহণ করিলেন; নকলনবিশের কাজে পেনশন নাই তাঁহার অবস্থা পূর্বাপেক্ষা খারাপ হইয়া পড়িল। তবে একেবারে গরীব হইয়া তিনি কোনদিনই পড়েন নাই, কারণ হুঁশিয়ার রামতারণ অনেক জায়গাজমি করিয়া লইয়াছিলেন। বছরের ধান গোলায় মজুত থাকিত।

কালীপদ চৌধুরীর একটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে। ছেলেটি গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িবার পরে কিছুদিন বাড়ী বসিয়া জমিদারী সেরেস্তায় কার্য শিখিতেছিল, কিন্তু এক বন্ধুর পরামর্শে তাহাকে দূরবর্তী মহকুমার ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। ইংরেজি লেখাপড়ার চাল তখন গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, দু-তিনটি ছেলে এন্ট্রান্স পাশও করিয়াছেন, রামতারণ বাঁড়ুজ্যের বড় নাতি তাহাদের অন্যতম।

১২৮০ সাল।

কালীপদ চৌধুরীর ছেলে সুকুমার চৌধুরী দেশেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করিয়া দুপয়সা উপার্জন করিতেছে। কালীপদ চৌধুরীর বয়স চৌষট্টির কোঠায় ঠেকিয়াছে, রামতারণ বাঁড়ুজ্যে অতি বৃদ্ধ অবস্থায় এখনও বাঁচিয়া আছেন তবে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার আর ক্ষমতা নাই। তাঁহার ছেলেরা চাকুরি করিতেছে।

আবার বাড়ী হইবে।

সুকুমারের সময় নাই, সে পয়সাওয়ালা ডাক্তার, বৃদ্ধ কালীপদ চৌধুরী ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন কোথায় চুন, কোথায় সিমেণ্ট। দুটি বড় সেগুন গাছ কাটাইয়াছেন, সর্ব পরামানিকের বাগানে। মুর্শিদাবাদ হইতে করাত টানিবার মিস্ত্রি ও ছুতোর মিস্ত্রি আনাইয়া সেই বাগানেই কাঠচেরাই ও দরজাজানালা কড়িবরগা ইত্যাদি তৈরি হইতেছে। ছেলে বাড়ী দোতলা করিবে, পূজার দালান তৈরি করিবে, পুকুর কাটাইবে—বৃদ্ধের উৎসাহের সীমা নাই। অতিবৃদ্ধ রামতারণ (৮৯) বলিলেন—কে?

—এই কাকা, আমি কালীপদ।

—এস এস বাবা, কি মনে করে?

—শুনলাম আপনি নাকি কখানা পুরনো কড়ি বিক্রি করবেন?

—কার বাড়ী?

—আজ্ঞে বাড়ী না, কড়ি। ঘরের কড়ি। বিক্রি আছে শুনলাম আপনার এখানে?

—কেন?

—সুকুমার বাড়ীটা দোতালা করবে—আর বলছে পূজোর দালানটা করবে সঙ্গে সঙ্গে। মহামায়ার কৃপা সবই। যদি তাঁকে এবার আনা যায়। আর আমার তো এখন গেলেই হয়—আপনাদের কোলে-পিঠে মানুষ হলাম, আমরাই বুড়ো হয়ে গেলাম। এখন ওদের সব —নাতি দুটো আছে, ধুলো গুঁড়ো বংশের। আশীর্বাদ করুন যেন ওরা মানুষ হয়ে বংশের নাম রাখে।

—বস, বস বাবা। সুকুমার হীরের টুকরো ছেলে তা বাড়ী করবে বই কি। দুপয়সা রোজগারও করছে। আর আমার ওই বাঁদরগুলো দেখ। মানুষ হল না। পুরনো কড়ি আছে, নিয়ে যাও। ও আমার সেই পৈতৃক আমলের বাড়ীর কড়ি। নিয়ে যেও, দর একটা যা হয় ঠিক করে দেব।

কালীপদ বিদায় লইলে রামতারণ বাঁড়ুজ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

খাইতে পাইত না ওই কালীপদ চৌধুরী, ওর মা লোকের বাড়ী রাঁধুনির কাজ করিয়া ছেলেকে মানুষ করিয়াছিল, তিনি তো সবই জানেন। আজ তাহার ছেলে দোতলা কোঠা তুলিতেছে! আবার পূজার দালান তুলিয়া দুর্গোৎসব করিবে বলিয়াও শাসাইয়া গেল। সবই অদৃষ্ট।

তিন মাসের মধ্যে সুকুমারদের দোতলা বাড়ী উঠিল বিস্তর ছুটাছুটির পরে। একখানা মনের মত বাড়ী তুলিতে সোজা হাঙ্গামা নয়; চুন সুরকি ইট কাঠ জোগাড় করিতে এই তিন মাস পিতাপুত্রের সময়ে স্নান হয় নাই, সময়ে আহার হয় নাই। খুব ধুমধামে গৃহপ্রবেশ হইল, রামতারণ বাঁড়ুজ্যে চিঁড়েদই এর ফলার করিয়া গেলেন। আবার সেই আশ্বিন মাসে সুকুমারদের বাড়ীর প্রথম দুর্গোৎসবে খিচুড়ি মাংস খাইলেন, কবির গান শুনিলেন।

পর পর এত আঘাত বোধ হয় অতিবৃদ্ধ রামতারণের সহ্য হইল না। সেই অগ্রহায়ণ শীতকালের প্রথমেই সামান্য দুদিনের জ্বরে তাঁহার দেহান্ত ঘটিল।

সুকুমার পৈতৃক ভিটাতেই দোতলা বাড়ী উঠাইয়াছিল। তাহার পিতা প্রথম যৌবনে সর্বপ্রথম যে একতলা ক্ষুদ্র বাড়ীটা তোলেন ভিটাতে, যে বাড়ীটা এক সময় রামতারণ বাঁড়ুজ্যের মনে কত ঈর্ষার সঞ্চার করিয়াছিল, সে বাড়ীটার আদর কমিয়া গেল। দোতলা বাড়ীর পিছনে সেটা অনাদৃত অবস্থায় জিনিসপত্র রাখিবার ভাঁড়ার ঘর এবং দু-একজন আশ্রিতা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়াদের শয়নঘর হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। হ্যাঁ, কেবল একটি কথা। বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পূজা ও সিন্নি বিতরণ করা হইলে তাহা ওই পুরানো কোঠাবাড়ীতেই হইয়া থাকে।

সুকুমার ডাক্তার হিসাবে নাম করিল ভাল। অনেক দূর হইতে লোকে রোগী দেখাইতে আসে। যাহারা আসে, তাহারা একবার ডাক্তারবাবুর নতুন দোতলা বাড়ী দেখিয়া যায়। পূজার দালান তো গ্রামে মোটে ওই একটি। দুর্গোৎসবও ডাক্তারবাড়ী ছাড়া আর কোথাও হয় না।

সুকুমারের দুই সংসার। প্রথম পক্ষের কোন সন্তানাদি হয় নাই, দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর পর পর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে হইল। লোকে যে অনেক সময় গল্প করে, নিঃসন্তানা প্রথমা স্ত্রী স্বামীর বংশ রক্ষার জন্য নিজেই স্বামীর বিবাহের ব্যবস্থা করে, সুকুমারের জীবনে তাহা বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছে।

সুকুমারের প্রথমা স্ত্রী তরুবালা পরমা সুন্দরী। অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া কালীপদ চৌধুরী পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পর দশ বৎসর কাটিয়া গেল। সন্তান-সন্ততি বংশে একটিও আসিল না।

সুন্দরী তরুবালার রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে। খিড়কিতেই কালীপদ শখ করিয়া পুকুর কাটিয়া ঘাট বাঁধাইয়াছিলেন, পুকুরঘাটে যখন বড় বৌ নাহিতে নামে ঘাট আলো করে রূপে।

সেদিন রাত্রে তরুবালা স্বামীকে বলিল—একটা কথা রাখতে হবে।

—কি কথা?

—বল রাখবে?

—না শুনে কি করে বলি?

—তোমার আবার বিয়ে দেব।

—হ্যাঁ, একটা কথার মত কথা বটে! একটা কেন, দুটো দাও।

—ও চালাকি রাখ। মেয়ে দেখে রেখেছি। ছেলেপুলে না হলে বংশ থাকবে কি করে? পয়সাকড়ি রোজগার করছ কার জন্যে?

কথাটা সত্যিই ভেবে দেখি নি। না, বিয়ে করা দরকার হয়ে পড়েছে দেখছি।

—তুমি যতই চালাকি কর, আমি কিন্তু জানি বাবার মন খুব খারাপ। বংশে বাতি দিতে কেউ না থাকলে তাঁর মন খারাপ হবারই কথা।

—এসব তোমার মনের কথা?

—নিশ্চয়ই। তুমি কি ভাব আমি ঠাট্টা করছি?

সুকুমার সেবার কথাটা যতই ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিক, অবশেষে পুনর্বার বিবাহ তাহাকে করিতেই হইল। দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম নীরজাসুন্দরী, দেখিতে নিতান্ত মন্দ নয়! বেশ স্বাস্থ্যবতী ও শান্তস্বভাব। বিবাহের তিন বৎসর পরে একটি কন্যা ও আরও দুই

বৎসর পরে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া ডাক্তারবাড়ী আলো করিল।

তরুবালা সর্বদাই দোতলার ঘরে ছেলেটি লইয়া বসিয়া থাকে।

কেহ আসিলে গর্বের সঙ্গে বলে—এই দেখ পিসি আমার ছেলে।

একবার একটি মন্থরা জুটিয়াছিল। সে বুড়ি পাশের বাড়ীর শ্যামাপদ বাঁড়ুজ্যের মা। বড়লোকের বৌ তরুবালার খোসামোদ করিয়া কখনও দুধ, কখনও পাটালি, কখনও একখানা নতুন কাপড়, কখনও বা এক কাঠা সোনামুগের ডাল হাতড়াইয়া যাইত। সেদিন তরুবালা অমন বলিতেই বুড়ি বলিল—আহা, বড় বৌমার যা কান্ড!

তরুবালা বলিল—কেন খুড়িমা?

—সতীন-পোর দেখা পেয়েছ, নিজের ছেলের সোয়াদ তো পেলে না—আহা মা। দুধের সোয়াদ কি ঘোলে মেটে?

—কেন?

—আহা মা, তোমার মুখের দিকে চাইলে কণ্ট হয়! কথায় বলে সতীন কাঁটা। তার খোকা। তোমার তাতে কি? বড় হয়ে কি ও তোমায় ভাল চোখে দেখবে?

এইদিন হইতে তরুবালা তাহাকে এড়াইয়া চলিত।

ক্রমে নীরজাসুন্দরী আরও তিনটি পুত্রসন্তানের জননী হইল।

কনিষ্ঠ পুত্রটি লেখাপড়ায় ভাল হইয়া উঠিল, সব পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, সব বিষয়ে সমান জ্ঞানে শোনে। গ্রামের মধ্যে অমন ছেলে দেখা যায় নাই ইতিপূর্বে। বৃদ্ধ কালীপদ তো নাতিকে পলকে হারায় এমনি অবস্থা। নাতির কথা সকলকে গর্ব করিয়া বলিয়া না বেড়াইলে তাঁর দিন কাটে না।

যে বৎসর ছেলেটি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি পাইল, সুকুমারের প্রথমা পত্নী তরুবালা সেবার বৈশাখ মাসে স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া সৎছেলে-মেয়েগুলিকে কাঁদাইয়া অকালে স্বর্গারোহণ করিল।

তরুবালার মৃত্যুতে গ্রামের এমন লোক ছিল না যে চোখের জল ফেলে নাই। ১৩১০ সালের বৈশাখ মাস সেটা।

তার পর অনেক দিন কাটিয়া গেল। অনেক সুখদুঃখের ঝড় বহিয়া গেল সংসারের উপর দিয়া।

সুকুমারের ছেলে অনাথবন্ধু ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্টে ভাল চাকরি পাইয়া দিল্লী চলিয়া গেল। অন্য দুটি ছেলের মধ্যে একটি উকিল ও অন্যটি ডাক্তার হইয়া কলিকাতায় প্র্যাকটিস শুরু করিয়া দিল, কারণ দেশে নিজের বাবা পসারওয়ালা ডাক্তার, ডাক্তারি শিখিয়া ছেলে সেখানে বসিলে কোন লাভ নাই। সুকুমারও ভাবিল, অনেক দিন হইতেই কলিকাতায় ডাক্তারি প্র্যাকটিস করিবার যে শখটা ছিল, নিজের ছেলের মধ্য দিয়ে সেটা সার্থক করিয়া তোলা যাক।

কালীপদ চৌধুরী এখন অতি বৃদ্ধ। বিশেষ নড়িতে চড়িতে পারে না। নাতবৌয়েরা সেবা করিলে খুব ভাল লাগিত বৃদ্ধের, কিন্তু একাল পড়িয়া গিয়াছে—নাতবৌয়েরা স্বামীদের সঙ্গে বাসায় বাসায় ঘোরে।

যদি কোন নাতবৌ কখনও আসে গ্রামের বাড়ীতে দু-এক সপ্তাহের জন্য কালীপদ তাহাকে পাইয়া বসেন। যত গল্প তাহার সঙ্গে। সে বেচারীকে কাজ করিতে দিবেন না, তাহার নিজের ছেলেপুলেদের তদারক করিতে দিবেন না—কেবল বলিবেন, বস দিদি, বস। এই শোন, তোমার শ্বশুর যখন ছোট ছিল—

অর্থাৎ কেবল সুকুমারের গল্প।

বৃদ্ধ বললেন, বুঝলে দিদি, সুকুমার আমার বংশের চুড়ো—

তার পর বলেন, আগে এই ভিটাতে কি রকম খড়ের ঘর ছিল, তিনি হাতে সামান্য কিছু জমাইয়া পুরানো কোঠাঘরটি করেন। দুই কুঠুরি, ছোট্ট বারান্দা। সে কি আনন্দ উৎসাহের দিনই গিয়াছে। চিরদিনের খড়ের ঘর ঘুচাইয়া প্রথম পাকা বাড়ী করার আনন্দ। গ্রামের লোকের চোখে প্রথম বড় হওয়া। অনেক লোকের প্রশংসা, অনেক লোকের ঈর্ষা

অর্জন করা। জীবনে একটা কিছু করা হইল এই প্রথম। বংশের প্রথম কোঠাবাড়ী।

—তোমার দিদিশাশুড়ি, বুঝলে, আজ যদি বেঁচে থাকত—

নাতবৌ ঠাট্টা করিয়া বলে—কোন্ পক্ষের কথা বলছেন দাদু? আপনাদের সময়ে তো নাকি—

—ও সে আবার কি? ও হ্যাঁ, তা এক পক্ষই ছিল, এখন এই আর এক পক্ষ হয়েছে—এমন টুকটুকে—বলিয়া নাতবৌয়ের গাল টিপিয়া দেন।

নাতবৌ বলে—ও দাদু এবার চলুন আপনাকে বাসায় নিয়ে যাব।

—না দিদি। সে বয়েস আর কি আছে? এখন গাড়ীতে উঠতে নামতে ভয় হয়।

তার পর অনেক বছর কাটিয়া গেল।

১৩৪০ সাল।

স্বর্গত কালীপদ চৌধুরীর পৌত্র অনাথবন্ধু এখন ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্টে বড় চাকুরে। পেনসন লইবার সময় এখনও হয় নাই। তবে খুব বেশি দেরিও নাই। বড় ছেলেটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, অন্য দুটি ছেলে এখনও ছাত্র। অনাথবন্ধুর পিতা সুকুমার এখন বৃদ্ধ। ছেলেরা এখন আর তাঁহাকে ডাক্তারি করিতে দেয় না।

লেক রোডের ধারে হাল-ফ্যাশানের তেতলা বাড়ী সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। দুই ছেলের নামে পাশেই কয়েক কাঠা জমি আগেই অনাথবন্ধু কিনিয়া রাখিয়াছিলেন— আজ বছর দশেক আগে এক দালাল বন্ধুর সাহায্যে। গৃহপ্রবেশের দিন অনেক বড় বড় চাকুরে, এমন কি কয়েকজন সাহেবসুবো নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালই হইল।

অনাথবন্ধুর প্রতিজ্ঞা ছিল কলিকাতায় বাড়ী না করিয়া বড় ছেলের বিবাহ দিবেন না। নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ কত বড় বড় ঘর হইতে আসিতেছিল। এইবার বাদুড়বাগানের বিখ্যাত গাঙ্গুলি পরিবারের মেয়ের সহিত শুভদিনে পুত্রের বিবাহ দিয়া অনাথবন্ধু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বৃদ্ধ সুকুমার ডাক্তার এই উপলক্ষে দেশের বাড়ী হইতে সেই যে কলিকাতার বাড়িতে আসিয়াছিলেন, আর ফিরিয়া যান নাই। ছেলেরা যাইতে দেয় নাই।

নববিবাহিত পৌত্র অরুণ বলিল—কেমন বাড়ী হয়েছে দাদু?

বৃদ্ধ সুকুমার বলিলেন—বেশ হয়েছে, চমৎকার।

—আর তুমি কিন্তু দেশে ফিরো না, সেখানে মশা, ম্যালেরিয়া—

—তা বটে। তবে—

—তবেটা আবার কি শুনি দাদু? চল আমার সঙ্গে আমার সেখানে। শীতলক্ষ্যা নদীর ধারে চমৎকার কোয়ার্টারস্—

—বেশ বেশ। হ্যাঁ দাদু, হাকিমি করে এসে সন্ধেবেলা এতদিন কি করতিস? আজ না হয় নাতবৌ হল—

—কেন, পাশেই টেনিস কোর্ট। জেলখানার পাশেই। সরকারী ডাক্তার, খুরশেদ আলি সেকেণ্ড অফিসার, সার্কল অফিসার দত্ত, জুট অফিসার আবদুল সোভান—সবাই টেনিস খেলি। তোমার নাতবৌয়ের অভাব অনুভূত হয় নি একদিনও। চল দাদু আমার সঙ্গে—

—দাদু, গাঁ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। ওই গাঁয়ে বাবা যেদিন খড়ের বাড়ী ঘুচিয়ে প্রথম দুটি মাত্র পাকা কুঠুরি তুললেন, সেদিনের আনন্দ ওই ভিটের মাটির বুকে লেখা আছে। বংশের প্রথম কোঠাঘর! কত কষ্টের কত আনন্দের জিনিস। ওই ভিটেতে আমার প্রথমা স্ত্রী—তোমার বড় ঠাকুরমা—

এই সময়ে অরুণের ভাই তরুণ আসিয়া ডাকিল—দাদা,—ওপরে যাও টেলিফোনে কে ডাকছে।

১৩৫০ সাল।

স্বর্গত সুকুমার চৌধুরীর গ্রামের ভিটা বনেজঙ্গলে ঢাকিয়া গিয়াছে। দোতলা কোঠার

দেওয়ালে বড় বড় ডুমুর ও অশ্বত্থ বৃক্ষ। লোকে বলে ডাক্তারের ভিটায় দিনমানে বাঘ লুকাইয়া থাকিতে পারে। গত আট বৎসর এ ভিটায় পুত্র ও নাতিরা কেহই আসে নাই। জানালা-দরজার অনেকগুলি লোকে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

স্বর্গত কালীপদ চৌধুরীর তৈরি প্রথম আমলের সেই একতলা বাড়ীর ছাদ কয়েক বৎসর বর্ষার জল খাইয়া ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে—জীর্ণ দেওয়াল দাঁড়াইয়া আছে মাত্র। সাপের ভয়ে আজকাল ডাক্তারের ভিটার ত্রিসীমানা কেহ মাড়ায় না।

বুধোর মায়ের মৃত্যু

বুধো মন্ডলের মায়ের হাতে টাকা আছে সবাই বলে। বুধো মন্ডলের অবস্থা ভাল, ধানের গোলা দু' তিনটে। এত বড় যে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ গেল গত বছর, কত লোক না খেয়ে মারা গেল, বুধো মন্ডলের গায়ে এতটুকু আঁচ লাগে নি। বরং ধানের গোলা থেকে অনেককে ধান কর্জ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

সবাই বলে, বুধোর টাকা বা ধান সবই ওই মায়ের। বুধোর নিজের কিছুই নেই। বুড়ির দাপটে বুধো মন্ডলকে চুপ করে থাকতে হয়, যদিও তার বয়েস হল এই সাতচল্লিশ। ওর মার বয়স বাহাত্তর ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু অত্যন্ত বাল্যকাল থেকে ওকে যেমন দেখে এসেছি, এখনও (অনেককাল পরে দেশে এসে আবার বাস করছি কিনা) ঠিক তেমনি আছে। তবে মাথায় চুলগুলো যা পেকেছে।

অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে। হরি রায়ের পাঠশালায় আমি তখন পড়ি। বিকেলবেলা, তেঁতুল গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে হরি রায়ের ক্ষুদ্র চালাঘরের সামনেকার সারা উঠোন ছেয়ে ফেলেছে। ছুটি হয় হয়, নামতা পড়ানো শুরু হবে এখন। এমন সময় কালীপদ রায় আর চন্ডীদাস মুখুজ্যে এসে হরি রায়ের সঙ্গে গল্প জুড়লেন। কালীপদ রায় গল্পের মধ্যে বুধোর মায়ের সম্বন্ধে এমন একটা উক্তি করে বসলেন যাতে আমি অবাক হয়ে প্রৌঢ় দাদুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

চন্ডী মুখুজ্যে মশায় জবাব দিলেন, আর বলো না ও মাগীর কথা, অনেক টাকা খুইয়েছি ও মাগীর পেছনে।—জবাবটা আজও বেশ মনে আছে।

একটু বেশি পাকা ছিলাম বয়সের তুলনায়, সুতরাং স্ত্রীলোকের পেছনে টাকা খরচ করার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম। আর একটু বয়েস বাড়লে শুনেছিলাম, বুধোর মা গ্রামের অনেকেরই মাথা খারাপ করেছিল। বুধোর মা বালবিধবা; ওই ছেলেটিকে নিয়ে স্বামীর গোলার ধান দাদন দিয়ে কত কষ্টে সংসার নির্বাহ করেছে—এই রকমই শুনতাম। আমি যখনকার কথা বলছি তখন বুধোর মায়ের বয়েস চল্লিশের কম নয়, কিন্তু তখনও তার বেশ চেহারা। আঁটসাট গড়ন, মাথায় একঢাল কালো চুল। আমার বাবার বয়সী গ্রামশুদ্ধ লোকের প্রণয়িনী।

তার পর বহুবার বুধোর মাকে দেখেছি অনেক বছর ধরে। সেই এক চেহারা। এতটুকু টস্‌কায় নি কোনদিন।

দেশ ছেড়ে চলে গেলাম ম্যাট্রিক পাশ করে। পড়াশুনো শেষ করে বিদেশে চাকরি করে বোমার তাড়ায় সেবার আবার এসে গ্রামে ঘর-বাড়ী সারিয়ে বাস করতে শুরু করলাম।

কাকে জিজ্ঞেস করলাম—বলি, সেই বুধোর মা বেঁচে আছে?

—খুব। কাল ঘাটে দেখলে না?

—না।

—আজ দেখো এখন। তার মাথায় চুল পেকে গিয়েছে বলে চিনতে পার নি।

দু-একদিনের মধ্যে বুধোর মাকে দেখলাম। চেহারা ঠিক তেমনই আছে, যেমন দেখেছিলাম বাল্যে। মুখশ্রী বিশেষ বদলায় নি। শুধু মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছে মাত্র। অনেকে হয়তো ভাববেন, সত্তর-বাহাত্তর বছর বয়সে মুখের চেহারা বদলায় নি এ কখনও সম্ভব? তাঁরা বুধোর মাকে দেখেন নি। নিজের চোখে না দেখলে আমিও বিশ্বাস

করতাম না। সেকালের বুধোর মার মাথায় যেন সাদা পরচুলো পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দেখবার দিন আমার এমনি মনে হল।

পরে কিন্তু বুঝলাম তা নয়, ওর বয়েস হয়েছে। একদিন আমার বাড়ীতে বুড়ি লেবু দিতে এসেছিল। ওকে দেখে মনে হল, হায় রে কালীপদ দাদু, চন্ডীদাস জেঠার দল! আজও তোমরা বেঁচে থাকলে তোমাদের মুন্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারত বুধোর মা। কত পয়সাই এক সময়ে তোমরা খরচ করে গিয়েছ ওর পেছনে।

বললাম—এস বুধোর মা, কি মনে করে? অনেকদিন পরে দেখলাম।

—আর বাবা! গাঁয়ে ঘরে থাক না, তা কি করে দেখবা? বাত হয়েছে বাবা। এখন একটু সামলেছি। তাই উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি।

—হাতে কি?

—গোটাকতক কাগজি লেবু। বলি, দিয়ে আসি যাই। তুমি আর আমার পঞ্চা দু'-মাসের ছোটবড়। তুমি হলে ভাদ্র মাসে, পঞ্চা হয়েছে আষাঢ় মাসে। তা আমায় ফেলে চলে গেল।

—পঞ্চা মারা গিয়েছে?

—হ্যাঁ বাবা, অনেক দিন হয়েছে। বছর তিন চার হল।

গাঁয়ের যাকে জিজ্ঞেস করি, ওকে ভাল কেউ বলে না। একদিন ওদের বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে যাচ্ছি, দেখি ওদের বাড়ীতে ঝগড়া ও কান্নাকাটির শব্দ।

দাসু কুমোর রাস্তার ধারেই পণ পোড়াচ্ছে।

বললাম—পণে আগুন দিলে কবে দাসু?

—প্রাতোপেন্নাম দা'ঠাকুর। পণ কাল ধরিয়েছি। জ্বলছে না ভাল। অনেক হাঁড়ি কাঁচা আসবে। কাঠের অমিল, দা'ঠাকুর।

—তোরা কি কাঠ দিয়ে পণ জ্বালাস, না পাতা দিয়ে?

—শুধু পাতা কি জ্বলে, দা'ঠাকুরের কথার যেমন ধারা!

—হ্যাঁরে, বুধোদের বাড়ীতে কান্নাকাটি কিসের রে?

—ওই বুধোর মা ছেলের বৌএর সঙ্গে ঝগড়া করছে।

—বুধোর বৌ বুঝি ঝগড়াটে?

—ওই বুড়ি আসল ঝগড়াটে। ওর দাপটে অত বড় বুড়ো ছেলের টুঁ শব্দ করবার জো নেই, তা ছেলের বৌএর। সব মুঠোর মধ্যে পুরে বসে আছে। টাকাকড়ি, ধানের গোলা সব ওর নামে। ছেলে কাজেই জুজু হয়ে থাকে। চিরকালের খারাপ মাগী, ওর স্বভাব চরিত্তির তো ভাল ছিল না কোনও কালে। ট্যাকা আসে কি অমনি দা'ঠাকুর?

—ওর বড় ছেলেটা বুঝি মারা গিয়েছে—সেই পঞ্চা?

—সে ওই মায়ের জ্বালায় বৌ নিয়ে এ গাঁ থেকে উঠে গিয়ে হিংনাড়ায় বাস করে'ল। বড় বৌডার সঙ্গেও শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া! বুধোর মার দাপটে এ পাড়া কাঁপে দা'ঠাকুর। আমাদের কিছু বলবার জো নেই। সবাই কিছু না কিছু ধারে ওর কাছে। ভয়ে কেউ কিছু বলতে পা'র না।

—কেন?

—কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করে সবাই। দরকারে অদরকারে ধানের জন্যি বুড়ির কাছে—হাত পাততি হয়। পয়সার জন্যি হাত পাততি হয়। পাড়াসুদ্ধ সকলের মহাজন। কেডা কথা বলতি যাবে?

পৌষ মাসে আমার নতুন কেনা জমিতে সামান্য কিছু ধান হল। আমার ধান রাখবার জায়গা নেই। সকলে বললে, বুধোকে বলুন, ওর গোলায় জায়গা আছে। তবে ওর মা—

বুধোর মাকে গিয়ে বললাম সোজাসুজি—ওগো, আমাদের দুটো ধান রাখবে তোমার গোলায়?

—আমার গোলায় জায়গা কোথায় বাবাঠাকুর? কতডি ধান?

—বিশ চার পাঁচ। রেখে দিতেই হবে। নষ্ট হয়ে যাবে ধান তোমার গোলা থাকতে?

বুধোর মা হেসে বললে—তা রেখে দিয়ে যাও। তবে—চোর কি ইঁদুরে ধান নষ্ট করলি আমাকে দায়িক হ'তি হবে না তো?

হায় কালীপদ দাদু' তুমি বেঁচে থাকলে হয়তো ওর হাসিটা এত বয়সেও মাঠে মারা যেত না। ভাল করে চেয়ে দেখে মনে হল এখনও ওকে বুড়ি বলা চলে না—অন্তত বুড়ি বলতে যা বোঝায় তা ও নয়। বেশ দোহারা চেহারা, লম্বা আঁটসাঁট গড়নের একটা আভাস আসে বটে, কিন্তু তা নয়, ঢিলেঢালা হয়ে গিয়েছে শরীর। তবে মুখের চেহারা এখনও আশ্চর্য রকমের ভাল—এত বয়সেও। গর্ব ও তেজ ওর চালচলনে, চোখের দৃষ্টিতে, হাত পা নাড়ার ভঙ্গীতে।

খুব বড় জমিদারি থাকলে ও দাপটের ওপর জমিদারি চালাতে পারত রানী চৌধুরানীর মত। হয়তো ক্যাথেরিন দি গ্রেট কিংবা এলিজাবেথ হতে পারত রাজ্য-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হলে। লুক্রেজিয়া বর্জিয়ার মত নিষ্ঠুর আলো ওর চোখে এখনও খেলে—চোখ দেখে মনে হয়।

কিন্তু আমার ওপর ও কেন এত প্রসন্ন হয়ে উঠল কে জানে। আমার ধানগুলো গোলায় তোলবার সময় চমৎকার করে গোবর দিয়ে লেপাপোঁছা উঠোনে দু-দশটা ধান যা ছড়িয়ে পড়েছিল, নিজের হাতে ঝাড়ন দিয়ে ঝাঁট দিয়ে, খুঁটে খুঁটে তুলতে লাগল। বললে—এ সব গোলায় তুলে রাখ বাবাঠাকুর, লক্ষ্মীর দানা নষ্ট করতি আছে! তুলে রাখ যত্ন করে। দাঁড়াও, আরো দুটো ইদিকে ছড়িয়ে আছে—পোড়ারমুখোগুলো কি করে যে ধান তোলে, সব ঠ্যালামারা কাজ। মন দিয়ে কি কেউ কাজ করে এ বাজারে।

অনেকদিন পরে আবার ওকে দেখে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। ভালই লাগে।

আমি বললাম—তীর্থধর্ম করেছ?

বুড়ি জিভ কেটে বললে—সে ভাগ্যি কি আমার হবে বাবাঠাকুর?

—কেন, গেলেই হয়। পয়সাকড়ির যা হক অভাব তো নেই।

—কে বললে বাবাঠকুর? পাড়ার মুখপোড়া মুখপুড়ীরা আমার নামে লাগায়। পয়সা কনে পাব?

—দেখ, সে তোমার ইচ্ছে। আচ্ছা, এ গাঁ ছেড়ে কখনও কোথাও গিয়েছ?

—গঙ্গাস্তান করতে গিয়ে'লাম কালীগঞ্জে।

—আড়ংঘাটার যুগলকিশোর দেখ নি?

—না বাবা। একবার ও পাড়ার বিনু ঘোষের শাশুড়ি ঘোষপাড়ার সতীমায়ের দোলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তা আমার পায়ে ফোড়া হয়ে সেবার যাওয়া ঘটল না অদেষ্টে। অনেকদিনের কথা, তখন আমার পণ্ডা চার বছরের। ক বছর হল বাবা?

—তা হয়েছে প্রায় চল্লিশ বছর।

—এবার কোথাও যাব ভাবছি বাবা। চিরজম্মো কেটে গেল এই বাঁশবাগানের ডোবা আর গাঙের ঘাটে, আর মুচিপাড়ার মাঠ আর গোয়াল গোবর নিয়ে। এইবার একটু দেশডা বিদেশডা দ্যাখব।

এর পরের ইতিহাসটা আমার সংগ্রহ করা বুধো মন্ডলের শালীর বড় ছেলে ও তার খুড়শাশুড়ির কাছ থেকে। আর ও পাড়ার খুড়িমার কাছ থেকে। আমি নিজে জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরী থেকে এসেছি, চটক পাহাড়ের ওপাশের নির্জন সমুদ্রবেলায় ঝাউবনের সংগীত ও উদয়গিরি খন্ডগিরির শ্যামশোভা, প্রাচীন যুগের তপস্বীদের আশ্রমগুলির ছবি আমার মনে যে স্বপ্ন এঁকে দিয়েছে তখনও তাতে বিভোর হয়ে আছি, এমন সময় ও বাড়ীর খুড়িমা এসে বললেন—ওমা, পুরী থেকে চলে এলে তুমি, আমি যে যাচ্ছি রথ দেখতে!

—তা কি করে জানব খুড়িমা, চিঠি দিলেন না কেন পুরীর ঠিকানায়?

—তখন কি ঠিক ছিল বাবা? কাল বসে ঠিক করলাম। আমি যাব আর বোষ্টম-বৌ।

—আমার সঙ্গে যদি যেতেন। আপনারা কখনও পুরী যান নি, বিদেশেও বেরোন নি, একা যাওয়া এতদূর। বিপদে না পড়েন।

—তুমি বাবা তোমার জানাশুনো লোককে চিঠি লিখে দাও। পান্ডাদেরও চিঠি লেখ।

সব বন্দোবস্ত করে চিঠিপত্র দিয়ে গ্রামসম্পর্কের খুড়িমাকে পুরীতে রওনা করে দিলাম।

দিন পনেরো কেটে গেল।

একদিন কুমোরপাড়ার পথ দিয়ে বিকেলে আসছি, হঠাৎ সামনে পড়ে গেল বুধো মণ্ডল। আমি বললাম—কি রে, তোর মা ভাল আছে?

—প্রাতোপেন্নাম। আজ্ঞে বাবু, মা তো ছিক্ষেত্তর গিয়েছে।

—সে কি! তোর মা গিয়েছে? কই জানি নে তো? কার সংগে?

—আমার শালীর ছেলে আর এক খুড়শাশুড়ি গেল কিনা রথে, তাদেরই সংগে।

—তা তো শুনি নি। ওপাড়ার খুড়িমা, মানে রামের মা, আর শশী বৈরাগীর স্ত্রী ওরা গেল সেদিন। ওরা একসংগে—

—সে বাবু আমরা শুনি নি। তা হলে তো ভালই হত।

কিন্তু যোগাযোগ ঠিকই ঘটেছিল।

ভুবনেশ্বরের বিন্দু সরোবরের তীরে বাঁধাঘাটের সোপানে খুড়িমা সিক্ত বসনে কাপড় ছাড়বার ব্যবস্থা করছেন, হঠাৎ অল্পদূরে কাকে দেখে তিনি অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলেন। পাশেই ছিল বোষ্টম-বৌ, তাকে বললেন—হ্যাঁগা বোষ্টম-বৌ, ও কে দেখ তো? আমাদের গাঁয়ের বুধোর মা না?

শশী বৈরাগীর বৌ চোখে কম দেখে। সে বললে—না মা ঠাকরুন, বুধোর মা এখানে কন থেকে আসবে? আপনি যেমন—!

—এগিয়ে দেখ না বৌ, আন্দাজে মারলে হয় না। ও ঠিক বুধোর মা। যাও গিয়ে দেখে এস।

বুধোর মা হঠাৎ সামনে স্বগ্রামের বোষ্টম-বৌকে দেখে হাঁ করে রইল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না।

বোষ্টম-বৌ এগিয়ে বললে—বলি দিদি নাকি? ওমা, আমার কি হবে! তাই বামুন-মা বললে—

বুধোর মায়ের আড়ষ্ট ভাব তখনও কাটে নি। বললে—কে?

—বামুন-মা আমাদের। রামবাবুর মা। ওই যে ভিজে কাপড় ছাড়ছেন ওখানে—

—তোরা কবে এলি? বামুন-দিদি কবে এলেন? ওমা, আমি কনে যাব! ই কি কাণ্ড!

—তাই তো!

—তোরা আসবি আমাকে তো বললি নে কিছু?

—তুমি এলে কাদের সংগে? তা কি করে জানব যে তুমি আসবে।

খুড়িমা ইতিমধ্যে কাপড় ছেড়ে এগিয়ে এসেছেন। সুদূর বিদেশে নিজের গ্রামের লোকের সংগে অপ্রত্যাশিতভাবে পরস্পর দেখা হওয়া—এ যাদের ভাগ্যে না ঘটেছে তারা এর দুর্লভ আনন্দের এক কণাও উপলব্ধি করতে পারবে না।

বিশেষ করে এরা কখনও বিদেশে বেরোয় নি, এই সবে বিদেশে পা দিয়েই এ ধরনের ঘটনা।

খুড়িমা এক গাল হেসে বললেন—ওমা, আমি কোথায় যাব! তুমি কবে এলে গা?

বুধোর মা বললে—কি ভাগ্যি করে'লাম বামুন-দিদি! তিত্থিস্থানে আপনার সংগে দেখা হয়ে যাবে কি আশ্চর্যি কাণ্ড। কবে এলেন বামুন-দিদি?

পরস্পর আলাপ আপ্যায়নের পর বিস্ময়ের প্রথম বেগ কেটে গেলে সবাই পরামর্শ করে ঠিক করলে, এখন থেকে ওরা একসংগে থাকবে সবাই। সেদিন একই ধর্মশালায় সবাই গিয়ে উঠল, মন্দির দর্শন করলে, পরদিন সকালে একত্র গরুর গাড়ীতে খণ্ডগিরি উদয়গিরি যাত্রা করলে।

এর পরবর্তী ইতিহাস খুড়িমা বা তাদের অন্যান্য সংগীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা।

খুব সকালে রওনা হয়ে ওরা বেলা সাতটার সময় খণ্ডগিরি উদয়গিরির পাদদেশে বনানিকুঞ্জে পেঁাছে গেল। খুড়িমা লেখাপড়া জানতেন, দু-একখানা মাসিক পত্রিকায়

খণ্ডগিরির বিবরণও পড়েছিলেন! তিনি সঙ্গিনীদের সব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। বুধোর মা কখনও পাহাড় দেখে নি জীবনে, এবার পুরী আসবার পথে বালেশ্বর ছাড়িয়ে পাহাড় প্রথম দেখে অবাক হয়ে যায়। উদয়গিরি-আরোহণ ওর জীবনে এই প্রথম পাহাড়ে ওঠা।

খুড়িমার মুখে এ গল্প শুনতে শুনতে আমি চোখ বুজে অনুভব করবার চেষ্টা করছিলুম—মাত্র একদিন আগে যে উদয়গিরির উপরকার নির্জন বনভূমিতে আমি আমার এক সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে অমনি এক সুন্দর মেঘমেদুর প্রভাতে বসে বসে বনবিহঙ্গ-কাকলীর মধ্যে বহু-শতাব্দীপারের সঙ্গীত শুনেছিলুম সেখানে গিয়ে বুধোর মায়ের মনের সে ভার্জিন আনন্দ।

সমতল পাষাণচত্বরের মত শৈলশিখর, যেন প্রকৃতির তৈরি পাষাণবেদী। কত বন্য লতাপাতা, কুচিলা গাছের জঙ্গল, কত গুহা, কত কারুকার্য, কত যক্ষ-যক্ষিনী, কত নাগ-নাগিনী, পাষাণে পাষাণে মৌন অতীতের কত মুখরতা।

বুধোর মা বলে উঠল—কি চমৎকার পাথরের বাঁধানো ঠাঁই বামুন-দিদি! আমাদের গাঁয়ে শুধু কাদা আর ধুলো! কত ভাগ্যি করলি তবে এসব জায়গায় আসা যায়। আচ্ছা, ওসব ঘরের মত তৈরি করেছে কারা পাহাড়ের গায়ে?

—মুনি-ঋষিদের গুহা।

—মুনি-ঋষিদের কী বললে বামুন-দিদি?

—গুহা। মানে, থাকবার ফোকর।

—কে করেছে এসব? গবরমেণ্টো?

—সেকালে রাজরাজড়ারা তৈরি করেছেন।

—এসব দেখলি চোখ জুড়োয় বামুন-দিদি। কখনও দেখি নি এসব। পিরথিমে যে এমন-সব জিনিস আছে তা কখনও জানতাম না। জানবই বা কি করে, চেরকাল বাঁশবন ডোবা আর গরুর গোয়াল এই নিয়ে আছি।

নামবার পথে একটি ফর্সা স্ত্রীলোককে একটি ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরা সেখানে গেল। খুড়িমা বললেন—আপনার এখানে ঘর?

স্ত্রীলোকটি উড়িয়া ভাষায় বললে—হ্যাঁ। নিজের ঘর। তোমরা কোথায় যাবে?

—রথ দেখতে এসেছি বাংলা দেশ থেকে। এখানে খাবার কিছু পাওয়া যায়?

—আমি মুড়ি বিক্রি করি। আর আচার আছে—লঙ্কার, আমের, কুলের।

—কি রকম আচার দেখি?

স্ত্রীলোকটি ঘরের ভিতর থেকে যা হাতে করে এনে দেখালে, সে কতকগুলো নুন-মাখানো আমের টুকরো এবং কুল। খুড়িমা বা তাঁর সঙ্গিনীরা সেসব পছন্দ করলে না। পথে আসবার সময় খুড়িমা বললেন—ওমা, ওর নাম নাকি আচার। আমসি আর শুকনো কুল, ওর নাম নাকি আচার! এখানে আচার তৈরি করতে জানে না বাপু।

বুধোর মা তো আচার দেখে তখন হেসেই খুন হয়েছিল। বললে—না একটু তেল, না একটু গুড়, না দুটো মেথি কি কালজিরে। আচার বুঝি অমনি হয়? আপনারা যেমন খান, আমাদের তো তা কিছুই হয় না, তাও ওদের চেয়ে ভাল হয়।

ভুবনেশ্বর স্টেশনে বিকেলে ওরা এল পুরী প্যাসেঞ্জারের জন্যে।

ট্রেনের তখনও দেরি। দক্ষিণ দিক থেকে সমুদ্রের অবাধ হাওয়া বইছে প্ল্যাটফর্মে। শেষরাত্রে উঠে ভুবনেশ্বর যেতে হয়েছিল, বুধোর মা ঘুমিয়ে পড়ল সেখানে কাঁথা পেতে। দু' ঘণ্টা পরে ওদের প্রথম সমুদ্র-দর্শন হল পুরীতে। আষাঢ় মাসের দিন, তখনও সন্ধ্যা হয়নি।

পাণ্ডা বললে—দেখুন মা—

বুধোর মা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সমুদ্রের ধারে। নীল সমুদ্র ধু ধু করছে যতদূর চোখ যায়! ফেনার ফুল মাথায় বড় বড় ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে বালুবেলায়। দক্ষিণে বামে সামনে অকূল জলরাশি। খুড়িমা, বোষ্টম বৌ, বুধোর মা সকলেই নির্বাক নিস্পন্দ। খুড়িমার যেন কান্না আসছে। কতক্ষণ পরে ওদের চমক ভাঙল। বুধোর মা

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ই কি কাণ্ড বামুন-দিদি! এমন কখনও ঠাওর করি নি গাঁয়ে থাকতি।

খুড়িমা বললেন—তাই বটে।

বুধোর মা বললেন—উঃ রে জল!

খুড়িমা বললেন—তাই।

কেউই চোখ ফেরাতে পারছিল না সমুদ্রের দিক থেকে। ভেবে ভেবে বললে বুধোর মা—আচ্ছা বামুন-দিদি, ওপারে কী গাঁ?

খুড়িমা বললেন—ওপারে? ওপারে-এ-এ লঙ্কাদ্বীপ।

—রাম-রাবণের সেই লঙ্কা, বামুন-দিদি?

—হ্যাঁ।

—কি কাণ্ড! অ্যাদ্দিন মরছিলাম ডোবায় আর বাঁশবনে পচে, কত কি দ্যাখলাম!

—চল সব, এখুনি গিয়ে মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করে আসি।

জগন্নাথ বিগ্রহ ও বিরাট মন্দির দেখে সবাই অত্যন্ত খুশী। রাত সাড়ে নটার পরে জগন্নাথ বিগ্রহের সিঙার-বেশ হবে শুনে ওরা সকলে মন্দিরের অন্য অনেক মেয়েদের সঙ্গে বসে রইল। একটি বৃদ্ধার সঙ্গে খুড়িমার খুব আলাপ হয়ে গেল। তাঁর বাড়ী হুগলী জেলার সিঙ্গুরের কাছে কামদেবপুর। বাড়ীতে তাঁর দুই ছেলে চাষবাস দেখে, তাদের ছেলেপুলে অনেকগুলি, মস্ত সংসার। বৃদ্ধার ভাল লাগে না সংসারের গোলমাল, বছরের মধ্যে চার পাঁচ মাস পুরীতে প্রতিবৎসর কাটিয়ে যান। ভগবানের কথা, গীতার কথা ইত্যাদি বলতে ও শুনতে খুব ভালবাসেন। মন্দিরে কোনও এক সাধু এসেছেন, রোজ সন্ধ্যায় গীতার ব্যাখ্যা করেন, সে সব শুনলে মানুষের মন আর ছোট জিনিস নিয়ে মত্ত থাকতে পারে না। কাল খুড়িমার সময় হবে কি? তাহলে সিংদরজার কাছে তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, নিয়ে যাবেন সেই সাধুর কাছে ওঁকে বা ওঁর সঙ্গিনীদের।

পাণ্ডা ওদের বাসায় নিয়ে এল। দোতলা ঘরের একটা কুঠুরিতে ওদের থাকবার জায়গা। ছোট জানালা দিয়ে সমুদ্রের হাওয়া আসছে। দেওয়ালের গায়ে বাঁশের আড়ায় অনেকগুলো বেতের পেটরা তোলা। পাণ্ডাগিন্নি বললে—ওগুলোতে ওদের কাপড়চোপড় থাকে। পাণ্ডার বাড়ীতে শালগ্রাম শিলার নিত্য পূজা হয়। বাড়ীর মেয়েরা যেমন সুন্দরী. তেমনই ভক্তিমতী। দোতলায় ছোট্ট ঠাকুরঘরে অনেক পুরনো আমলের কাঁথা পাতা কড়ি-ঝিনুকের দোলায় গৃহদেবতা বসানো, দেওয়ালে পদ্ম আঁকা, সর্বদা ধূপ-ধুনোর গন্ধ সে ঘরে। মেয়েরা স্নান করে ঠাকুরের স্তব পাঠ করে, ধপ ধপ করে ওদের গায়ের রং মাথায় একঢাল করে কালো চুল।

বড় মেয়েটির নাম রুক্মিণী, সে বলে—মোর বাবা ভিতরছ পাণ্ডা।

খুড়িমা বলেন—সে কি?

রুক্মিণীর মা বুঝিয়ে বলে—পাণ্ডাদের মধ্যে বড়। সিঙার-বেশ করবার একমাত্র অধিকার ওদের। সেইজন্যে উপাধি সিঙারী—বৃন্দাবন সিঙারীর পুত্র গোবিন্দ সিঙারী। অনেক বেশী মান ওদের। দুজন গোমস্তা, তিন চার জন ছড়িদার মাইনে করা. কটক থেকে পর্যন্ত যাত্রী বাগিয়ে আনে!

রাত্রে ওদের জন্যে মন্দির থেকে এল ঘিয়েভাজা মালপোয়া. ভুরভুর করছে গব্যঘৃতের সুগন্ধ তাতে, আরও দু-তিন রকম মিষ্টি। পাণ্ডাগৃহিণী বললেন—কাল কণিকা-প্রসাদ আনিয়ে দেব শ্রীমন্দির থেকে। মধ্যাহ্নধূপ সরে গেলেই লোক পাঠাব।

সকালে উঠে ছড়িদার ওদের নিয়ে সমুদ্রস্নান করাতে গিয়ে একজন নুলিয়ার জিম্মা করে দিলে।

বুধোর মা বলে উঠল—ও-বামুন-দিদি. ই কি কাণ্ড! এ যে আমারে নিয়ে নাচাতি লাগল ঢেউয়ে।

বোষ্টম-বৌকে উত্তাল এক ঢেউয়ে তুলে নিয়ে সপাটে এক আছাড় মারলে বালির চড়ায়।

স্নানান্তে মন্দিরে গিয়ে সবাই ঠাকুরদর্শন করলে। কাল রাত্রের সেই বৃদ্ধাটির সঙ্গে বিমলাদেবীর মন্দিরে দেখা। তিনি নিজে নিয়ে গেলেন ওদের নৃসিংহদেবের মন্দিরে প্রাঙ্গণ পার হয়ে। সেদিন মধ্যাহ্নধূপ সরতে একটু দেরি হয়ে গেল, কণিকা-প্রসাদ নিয়ে পৌঁছুল বাসায় বেলা চারটের সময়। খুড়িমার একটু কষ্ট হল; অন্যান্য সঙ্গিনীদের খাওয়া অভ্যেস বেলা তিনটের সময়, তারা বিশেষ অসুবিধে অনুভব করলে না।

সন্ধ্যাবেলায় বিমলাদেবীর মন্দিরের চাতালে সেই সাধুটির গীতা-ব্যাখ্যা হচ্ছে।

ওরা সবাই গিয়ে বসল সেখানে হাত জোড় করে। আরও অনেক বৃদ্ধা সেখানেই উপস্থিত, প্রায় সকলের হাতেই জপের মালা। সকলে একমনে গীতার ব্যাখ্যা শুনছে।

বুধোর মা কিছুই বুঝলে না। দু-চারবার বোঝবার চেষ্টা যে না করলে এমন নয়, কিন্তু কি যে বলছেন উনি, যদি একটা কথার অর্থ সে বুঝে থাকে! তবুও তার চোখ দিয়ে জল এল—কোনও কারণে নয়, এমনিই। কেমন সুন্দর কথা বলছেন উনি, মুনি-ঋষিদের মত চেহারা। কতবড় উঁচু মন্দির, বাবাঃ! উই কেমন একটা লাল শাড়ি পরা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা, কত টাকা খরচ হয়েছে না-জানি এই মন্দির তৈরি করতে। পাশের একজন বৃদ্ধাকে সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে—মন্দিরডা কারা তৈরি করে'ল মা?

বৃদ্ধা একমনে শুনছিলেন—বিরক্ত হয়ে বললেন—আঃ, একমনে শোন না বাপু—

বুধোর মা অপ্রতিভ হয়ে বললে—না, তাই শুধোচ্ছিলাম।

ওদিক থেকে কে ধমকে উঠল—আঃ!

আর একজন কে টিপ্পনী কাটলে—শুনতে আসে না তো, কেবল গল্প করতে আসে।

বুধোর মার বড় রাগ হয়ে গেল। একটু কথা বলবার জো নেই, বাব্বাঃ! মাগীদের যদি একবার পেত্রাম আমাদের গাঁয়ে, তবে দেখিয়ে দেতাম—। পরক্ষণেই সে রাগ সামলে গেল। না না, সে মহাপাপী, জগন্নাথ প্রভু দয়া করে তাকে এনেছেন এখানে। নইলে তার কি সাধ্যি সে এখানে আসে। মন্দিরে এসে রাগ করতে নেই। কেমন সুন্দর জায়গা, কত সব ভাল লোক, কেমন ভাল কথা। এসব কথা কেউ তাদের গাঁয়ে বলে? ও-রকম বুড়ো তো কতই আছে—ন'লে জেলের বাবা কেদার, কাক-তাড়ানে পাঁচু, শ্যামা যুগী, বেহারী কুমোর—আরও দু'একটা নাম মনে আসতে সে তাড়াতাড়ি চেপে গেল। ও-সব কিছু নয়। মুখে মার ঝাঁটা মুখপোড়াদের!

এতকাল সে কোথায় কোন্ গর্তে পড়ে ছিল? কি চমৎকার জায়গা, কি পুণ্যির জায়গাতে জগন্নাথ দয়া করে তাকে এনে ফেলেছেন! গীতার ব্যাখ্যা শেষ হয়ে গেলে সবাই যখন চ'লে আসছিল, তখন সে আবার কাকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, মন্দিরডা কে তৈরি করে'ল মা-ঠাকরোন?

—বিশ্বকর্মা।

—বটে!

বুধোর মা আবার অবাক হয়ে কতক্ষণ মন্দিরের দিকে চেয়ে রইল।

খুড়িমা পিছন থেকে বললেন—ও বুধোর মা, অমন কথা-বলতে আছে শাস্ত্রপাঠের সময়? ছিঃ, আর অমন করো না।

রাত্রে বাসায় এসে বুধোর মায়ের উৎসাহ কি! বললে—ও বামুনদিদি, বড্ড ভাল লাগছে আমার। যে-কড়া টাকা হাতে আছে, তীথ্যিধম্মেই খরচা করব। কি ভাগ্যি ছেল আমার যে এখানে এনেছেন জগন্নাথ!

রুক্মিণীর মা ওদের কাছে বসে বসে জগন্নাথদেবের অনেক মহিমাকীর্তন করলেন। কলিকালের জাগ্রত দেবতা জগন্নাথ। যে যা কামনা করে, তাই তিনি পূর্ণ করেন। কলিকালে অন্ন ব্রহ্ম, অন্নদান মহাসেবা। তাই তিনি শুধু অন্ন বিতরণ করছেন দু হাতে। যে যেখানে ক্ষুধার্ত আছে, সকলকে শুধু পেট ভরে খাওয়াচ্ছেন তিনি। ধ্যান-ধারণা তপস্যা এসব শিকেয় তুলে রাখ। অন্ন বিলোও, শুধু অন্ন বিলোও। অন্নদান মহাযজ্ঞ।

বুধোর মা এ-কথাটা কিছু কিছু বুঝতে পারে। গত বছর বর্ষাকালে, যখন লোকে না খেয়ে মরছে তাদের গাঁয়ের আশেপাশে, তখন নিজের গোলা থেকে সে মুচিপাড়ার সতের জন লোককে বিনা বাড়িতে ন বিশ ধান কর্জ দিয়েছিল। কেউ কেউ ব'লছিল—

মুচিদের ধান কর্জ দিলে বুধোর মা, ওদের লাঙল নেই, জমি নেই, কর্জ শোধ দেবে কি করে? বাড়ি দেওয়া তো চুলোয় যাক গে।

বুধোর মা গ্রাহ্য করে নি সেসব কথা।

আজ সিঙারীগিন্নির মুখে জগন্নাথের অন্নদান-মহাত্ম্য শুনে ওর বুকখানা দশ হাত হল। ভগবান তাকে ঠিক পথেই চালিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তাহলে। সবাই তাকে মন্দ বলে তাদের গাঁয়ে, তারা এসে দেখুক এখানে।

সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে ঠাকুরদর্শন করতে গিয়ে বিগ্রহের দিকে চেয়ে ও আজ ভাল করে দেবতাকে যেন বুঝতে পারলে। সে যা বোঝে। অন্নদান মহাপুণ্য। সে নিজের গোলার ধান আর-বছর আকালের সময় বার করে মুচিদের দিতে যায় নি? গনশা মুচির ভাইবৌ ছোট্ট খোকাটার হাত ধরে এসে ওকে আর বছর শ্রাবণ মাসে বললে—ও দিদিমা, কাল থেকে মোর খোকার পেটে দুটো দানাও যায় নি। একটা উপায় যদি না করেন, সবসুদ্দ না খেয়ে মরতি হবে। ধামা বেঁধে তোমার নাতি আজ দুদিন আগে আট আনা রোজগার করে এনেল। তাতে কদিন খাওয়া হবে বল। দুটাকা করে চালির কাঠা। একটা হিল্লে করতে হবে দিদিমা।

ও বললে—ধামা নিয়ে আসিস এখন মানকের বৌ, ধান দেব। একজন যদি নিয়ে গেল, অমনি দশজন এসে পড়ল। মুচিপাড়ার সব ভেঙে পড়ল। ধামা-কাঠা হাতে। সবাই কান্না-কাটি করতে লাগল। খেতে পাচ্ছি নে দিদিমা, ধান দেও। কাউকে সে শুধু-হাতে ফিরিয়ে দেয় নি। এতদূর থেকেও জগন্নাথ দেব তা জানেন। তাই কি এতদূর থেকে তাকে ডেকে এনেছেন? সেদিন কিসের সেই সব হিজিবিজি কথা বলছিল দাড়িওলা সন্নিসিঠাকুর। সে কিছুই বুঝছিল না। আজ জগন্নাথের কথা সে ঠিক বুঝতে পেরেছে।

অন্নহীন যে, তাকে খাওয়াও, মাখাও। গোলার ধান কর্জ দাও, ওদের বিনা বাড়িতেই কর্জ দাও।

খুড়িমাকে সে ফেরবার পথে সব বললে।

জ্যোৎস্নারাত্রে সমুদ্রের ধারে ওরা সবাই গেল, বুধোর মা-ও গেল। কূলকিনারা নেই জলের, আর কি চমৎকার জ্যোৎস্না। কাল যে বৃদ্ধটির সঙ্গে মন্দিরে দেখা, তিনিও ছিলেন। কে একজন বড় সন্নিসি, নাম শ্রীচৈতন্য, এমন জ্যোৎস্নারাত্রে নাকি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন, উনি বলছিলেন সে গল্প। না, সে নিজে কখনও ওঁদের নামও শোনে নি। অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কে ওঁদের নাম শোনাচ্ছে? সে জানে পায়রাগাছি ফকিরের নাম। পায়রাগাছির ফকিরও মস্ত সাধু। সেবার তার একটা গাইগরু কি খেয়ে হঠাৎ মরে যায় আর কি, সবাই বললে পায়রাগাছির ফকিরের খুব ক্ষমতা। বুধোকে সেখানে পাঠানো হল। ফকির সাহেবের সামান্য কি ওষুধে গরু একেবারে চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ওঁরা সবাই ভাল, সবাই বড়। সে-ই কেবল পাপী।

বুধোর মা-ও দুহাত জুড়ে পায়রাগাছির ফকির সাহেবের উদ্দেশে প্রণাম করে।

খুড়িমা বললেন—চল বুধোর মা, বাসায় ফিরি। ভাল লাগছে?

—পাপমুখে কি করে আর বলি বামুনদিদি। ইচ্ছে হচ্ছে জগন্নাথের পায়ে চেরজন্ম পড়ে থাকি। সুদ্দু ওই ছোট নাতনিটার মায়া। আমার হাতে না হলি দুষ্টু মেয়ে খাবে না। এখন বসে বসে তার কথাডাই বড্ড মনে হচ্ছিল। আহা, কদ্দিন মুখটা দেখিনি।

বুধোর মা আঁচলে চোখ মুছলে।

সে-রাত্রে শুয়ে বুধোর মা ছটফট করছে, অনেক রাত্রেও কাতরাচ্ছে দেখে খুড়িমা ও বোষ্টম-বৌ ওকে ডাক দিলেন। দেখা গেল, ওর বড্ড জ্বর হয়েছে। জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গেল বুধোর মা। সেদিন ভুবনেশ্বর ইষ্টিশনের প্ল্যাটফর্মে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে হাঁটুর খানিকটা কেটে যায়। সেই কাটা জায়গাটা বিষিয়ে উঠেছে, পরদিন দেখা গেল। জ্বর কমে না দেখে ডাক্তার ডেকে দেখানো হল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের পরামর্শে রোগীকে হাসপাতালে দেওয়া হল।

তিন দিন পরে—রথের আগের দিন।

বুধোর মার অবস্থা খুব খারাপ। খুড়িমা, বোষ্টম-বৌ, গ্রামের সবাই ঘিরে বসে. এমন কি সেই বৃদ্ধা পর্যন্ত! কখনও কখনও জ্ঞান হয়, কখনও আবার অজ্ঞান হয়ে যায়। ডাক্তার বলছে, অবস্থা ভাল নয়।

খুড়িমা বললেন—ও বুধোর মা, কেমন আছ?

—ভাল না, বামুনদিদি।

—বাড়ী যাবে?

—শরীরডা সেরে উঠলি চলুন যাই বামুনদিদি। ছোট নাতনিটার জন্যি মনডা কেমন করছে।

ভক্তিমতী বৃদ্ধাটি বললেন—ভগবানের নাম কর দিদি। বল—হরে কৃষ্ণ. হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—ওসব চিন্তা ছেড়ে দাও।

রাত বারটার সময় আর একবার জ্ঞান হল ওর। জ্ঞান হলেই বলে উঠল—ও মুখুজ্যে ঠাকুর. আমার সেই সাত গণ্ডা ট্যাকা—

খুড়িমা মুখের ওপর ঝুঁকে বললেন—কি বলছ, ও বুধোর মা?

—আমায় সেই সাত গণ্ডা ট্যাকা আর শাড়ি দেবা না?

—হরিনাম কর। হরি হরি বল। বল, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে!

—আমবাগানের তলায় মুখুজ্যে ঠাকুরের সঙ্গে সিঁদুরকৌটো গাছটার কাছে দেখা। ঘাটের পথ। লোকজন যাতায়াত বড্ড। এখান থেকে সরে চল ওদিকি, ও মুখুজ্যেঠাকুর!

আমি খবরটা জানতাম না।

রথের দিন পাঁচ-ছয় পরে বুধোর সঙ্গে হঠাৎ পথে দেখা। ওর গলায় কাছা দেখে একটু অবাক হয়ে বললাম—কি রে! গলায় কাছা কেন?

বুধো বললে—মা নেই। চিঠি এসেছে কাল। রথের দিন মারা গিয়েছে। পরে একটু থেমে বললে—তিনি ভালই গিয়েছে। বয়স তো কম হয় নি। কিন্তু এতগুলো ট্যাকা দাদাঠাকুর, কোথায় যে রেখে গেল, সন্ধান দিয়ে গেল না। কাউকে তো বলত না ট্যাকার কথা।

গ্রামে সবাই বললে—রথের দিন তিথিস্থানে মিত্যু। কি জানি কি রকম হল! অমন স্বভাব-চরিত্তির, চিরকালের খারাপ মেয়েমানুষ। জগন্নাথের নিতান্ত কিরপা না হলে কি এমন হয়! মাগীর অদেষ্ট ছেল ভাল।

রামতারণ চাটুজ্যে, অথর

পনেরো-ষোল বছর আগেকার কথা। পটলডাঙা স্ট্রীটে এক বেঞ্চিপাতা চায়ের দোকানে রামতারণবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ শুরু হয়। এক পয়সা দামের এক পেয়ালা চা: গোলদিঘি বেড়িয়ে এসে সস্তায় চা-পান সারতে দোকানটাতে ঢুকলাম। আমার দলের আরও পাঁচ-ছটি খরিদ্দার অত সকালেও সেখানে জমায়েত হত এক পয়সার এক পেয়ালা চা খেতে। এই দলের মধ্যে অনেকেই ২৫/২নং মেস-বাড়ীর অধিবাসী; একমাত্র রামতারণবাবুই ছিলেন গৃহস্থ লোক, যিনি ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করেন. মেসে নয়। সেইজন্যেই তাঁর সঙ্গে আলাপের প্রবৃত্তিটা আমার হয়তো অতো বেশি ছিল। তখন থাকি মেসে. গৃহস্থবাড়ীর মধ্যে একটা নতুন জগৎ দেখতাম।

রামতারণবাবুর সঙ্গে এই ধরনের দেখাশুনো প্রায় তিন চার মাস ধরে হল। অবিশ্যি চায়ের দোকানে যেমন আলাপ হওয়া সম্ভব, তেমনি।—নমস্কার. এই যে. কেমন আছেন? হেঁ হেঁ। আমার ওই এক রকম কেটে যাচ্ছে, আপনি? হেঁ হেঁ, ওই এক রকম।

একদিন রামতারণবাবু বললেন—কোন্ দিকে যাবেন? চলুন গোলদীঘিতে।

দুজনে একখানা বেঞ্চির ওপর এসে বসি। রামতারণবাবু একটা বিড়ি ধরালেন। তার পর বললেন—একটা কথা আজ শুনলাম, শুনে বড় খুশী হলাম, তাই আজ আপনাকে একটু আলাদা করে এখানে আনা। আপনি নাকি লেখক? শুনলাম নাকি একখানা বই লিখেছেন, অনেকে ভাল বলছে।

আমার সসংকোচ বিনয়কে তিনি হাত-নাড়া দিয়ে হটিয়ে বললেন—বাঃ, এতে আর অত ইয়ের কারণ কি। ভালই তো। বেশ বেশ, বড় সন্তুষ্ট হওয়া গেল। সুরেন কাল আমায় বিকেলে বলছিল কিনা।

আমি চুপ করেই রইলাম। রামতারণবাবুর বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি, মাথার চুল একটিও কাঁচা নেই, তাঁকে একটু সমীহ করেই চলতাম, বিড়ি সিগারেট চায়ের দোকানেও কখনও তাঁর সামনে খাই নি। রামতারণবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—বড় আনন্দ হল আপনার পরিচয় জেনে। শুনলাম নাকি আপনার বই বেশ বিক্রি-সিক্রি হয়?

—ওই এক রকম। হয় মন্দ নয়।

—বটে!

রামতারণবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—তবুও কি-রকম বিক্রি হয়? একটা এডিশন ফুরিয়েছে?

—আজ্ঞে এই সেকেন্ড এডিশন চলছে।

—কত দিনে হল?

—ধরুন, তা প্রায় দেড় বছর।

—বটে?

রামতারণবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আমার বইয়ের সেকেন্ড এডিশন হওয়া এমন কি একটা সামাজিক দুর্ঘটনা।

আবার তিনি বললেন—আজকাল হয়েছে যত সব বাজে বইয়ের আদর—লোকের রুচিও গিয়েছে নেমে।

আমি মনে মনে ভীষণ রেগে গেলাম। আমি নতুন লিখতে আরম্ভ করি নি। পাঁচ সাত বছরের মধ্যে দুটো উপন্যাস ও অনেকগুলো ছোট গল্প লিখেছি। লোকে সেগুলো মন্দ বলে নি, উনি প্রবীণ ব্যক্তি, কোথায় আমায় উৎসাহ দেবেন, তা নয়, আমার বইকে বাজে বইয়ের পর্যায়ে ফেলে দিলেন এক নিঃশ্বাসে। কি করে জানলেন উনি? পড়েছেন আমার বই? লেখকের অভিমান একটু বেশি। আমি বেঞ্চি থেকে উঠে বললাম—আচ্ছা, চলি। কাজ আছে।

—না না, বসুন। এই দেখুন, রেগে গেলেন। এই আপনাদের মত ইয়ং লেখকদের বড্ড একটা ইয়ে। শুনুন, আমি বলছি কি, আপনি বোধ হয় জানেন না—আমিও একজন অথর।

'অথর' কথাটা বেশ গালভরা করে সময় নিয়ে টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন। 'অ—অ—থ—র'।

আমার বিরক্তি কেটে গেল এক মুহূর্তে। বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করি—ও! আপনার কি কি বই—উপন্যাস না ধর্মগ্রন্থ?

একটা সন্দেহ জেগেছিল মনে, বোধ হয় ধর্মগ্রন্থই হবে। কিন্তু আমায় আরও বিস্মিত করে দিয়ে উনি বললেন—উপন্যাস।

আমি বললাম—আপনার নাম তো রামতারণ—রামতারণ—

—চাটুজ্যে। নাম শোনা আছে? আমার বইএর নাম 'রঙের গোলাম', 'পরশমণি', 'সোনার বাংলা'—

—ও!

কোথাও নাম শুনেছি বলে মনে করতে পারলাম না। তবুও আপ্যায়ন ও হৃদ্যতার সুরে বললাম—বেশ বেশ। বড় খুশী হলাম। এতদিন ধরে চা-এর দোকানে মেলা মেশা কই একথা তো এতদিন শুনি নি—আজই প্রথম—

রামতারণবাবু বললেন—আরে আমিও তো আজ প্রথম—

সেই থেকে ওঁর সঙ্গে আলাপ ঘনিষ্ঠ হয়ে জমল। রোজ চায়ের দোকানে দেখা, প্রায়ই গোলদীঘির বেঞ্চিতে দুজনে নিভৃতালাপ। একদিন রামতারণবাবু বললেন—চলুন আমার বাড়ী একদিন। কবে যাবেন বলুন।

এর দু-তিন দিন আগে থেকে রামতারণবাবু আমায় ধরেছেন. তাঁর একখানা বই আছে, বছর কয়েক আগে লিখেছেন, সেখানার জন্যে প্রকাশক জোগাড় করে দিতে হবে। বুঝলাম যে. বইখানা আমায় দেখাবার উদ্দেশ্যেই উনি বাড়ীতে নিয়ে যেতে চান আমাকে। সেজন্যেই যেতে নারাজ ছিলাম, কি জানি কি রকম বই প্রকাশক জোগাড় করে দিতে পারব কিনা, বাড়ী গিয়ে মাখামাখি করলে একটা চক্ষুলজ্জার মধ্যে পড়তে হবে। সুতরাং আমি কাজের অজুহাত দেখিয়ে কেবলই দিন পিছিয়ে দিই।

মাস দুই এভাবে কেটে গেল।

একদিন সকালে মেসে বসে আছি, রামতারণবাবু এসে হাজির। কখনও আসেন নি, একটু খাতির করা গেল ভাল ভাবেই। প্রবীণ সাহিত্যিক তো বটেই একজন।

আমায় বললেন—একটা বিশেষ কাজে এলাম ভায়া।

—বলুন।

—আপনাকে বলতে কোনও আপত্তি নেই। আমার একখানা বইয়ের সেকেন্ড এডিশন হবে, ফার্স্ট এডিশনের বই একখানাও আর বাজারে নেই, খবর পেয়েছি। একটা প্রকাশক জোগাড় করে দিন। কিছু টাকার বড় দরকার হয়েছে।

—বইখানা কি?

—রঙের গোলাম। আমার বইয়ের মধ্যে সব চেয়ে ভাল বই। বেশ নাম আছে বইখানার। বাজারে যাচাই করে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

—ও।

—দিতেই হবে ভায়া। একটু টানাটানি পড়েছে টাকাকড়ির। কিছু আসা দরকার, যেখান থেকেই হক। বুঝলেন?

রামতারণবাবুর বাড়ী একদিন যেতেই হল। একতলা দু-তিনটি ঘর। বাইরের ঘর নেই, তার বদলে ঢোকবার পথের অতি সংকীর্ণ স্থানটুকুতে একখানি বেঞ্চি পাতা। তাতেই বসলাম। রামতারণ একটা বাটিতে চিঁড়েভাজা নিয়ে এলেন, একটি ছোট ছেলে চা দিয়ে গেল। আতিথেয়তার কোন ত্রুটি হল না।

অত্যন্ত অনুরোধে পড়ে এসেছি। রামতারণবাবুর কোন উপকার করতে পারব কি? যদি পারি তো খুব আনন্দিত হব। সুতরাং কথাটা পেড়ে বললাম—তাহলে এবার—

—হ্যাঁ, এবার নিয়ে আসি।

একটু পরে খান-দুই মোটা পুরনো বাঁধানো খাতা এবং এক বোঝা কাগজ নিয়ে রামতারণবাবু আবার এসে বসলেন আমার কাছে। একখানা খাতা খুলে আমায় দেখাতে লাগলেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকায় তাঁর বই সম্বন্ধে যে সব সমালোচনা বার হয়েছিল, সেগুলোর কাটিং আঠা দিয়ে মারা। কাটিংগুলো হলদে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। বহুকাল আগের জিনিস, সে সব সাময়িক পত্রিকার মধ্যে একখানারও নাম আমি শুনি নি. বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তাদের অস্তিত্ব ছিল, বহুকাল তারা মরে ভূত হয়ে গিয়েছে। তারা সকলে বলছে. রামতারণবাবু 'রংয়ের গোলাম' লিখে বঙ্কিমের খ্যাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন, এমন ভাব ও ভাষা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ—এই ধরনের সব কথা। রামতারণবাবু সলজ্জ বিনয়ের সঙ্গে লাইনগুলো আমায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। একখানা পত্রিকাতে লিখছে, "রামতারণ চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক (তখন 'কথাশিল্পী' শব্দটির সৃষ্টি হয় নি)। বাঙালী সমাজের নিখুঁত ছবি তাঁহার নিপুণ লেখনীর সাহায্যে এই উপন্যাসখানিতে ('রঙের গোলাম') ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।"—এই ধরনের আরও অনেক কিছু। সকলের অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়. হংকং থেকে মুদ্রিত এক ইংরিজি খৃষ্টানী কাগজে তাঁর বইখানার নাম প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। রামতারণবাবু নিতান্ত যা-তা লোক নন দেখছি। আমি নিজে লিখি বটে—কিন্তু কই, স্বদেশ ছাড়া বিদেশের কোনও কাগজে আজও পর্যন্ত আমার সম্বন্ধে একটা লাইনও বেরোয় নি। যত বড় তারা বলেছে রামতারণবাবুকে, অত বড়ও আমাকে আজও কেউ বলে নি।

কিন্তু এসব অতীত যুগের কাহিনী। আমি তখন নিতান্ত বালক, যখন রামতারণবাবু বঙ্কিমের কলম কেড়ে নিই-নিই করছিলেন; যদিও উক্ত ব্যক্তি সে দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। কত যত্নে রামতারণবাবু খাতাখানা রেখে দিয়েছেন আজও। কত কাল আগের সে সব কাগজ, যাদের নামও আজকাল কেউ জানে না। বিবর্ণ হলদে হয়ে গিয়েছে কাটিংগুলো। কত যত্নে কাটিংগুলোর ওপরে নিজের হাতে তারিখ লিখেছিলেন সেখানে. ১৯শে জানুয়ারি ১৯০২, ২রা মে ১৯০৫, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৪—। ১৯৩৪ সালে বসে সেসব তারিখকে যেন বহু যুগ পূর্বের কথা বলে মনে হচ্ছিল আমার। আমি তখন ছেলেমানুষ, হয়তো তুঁততলায় রাখাল মাস্টারের পাঠশালায় পড়ি। কতকাল কেটে গিয়েছে তার পর, কত ঘটনা ঘটে গেল আমার জীবনে, তবে এসেছে ১৯৩৪ সাল আজ। আর উনি সেই সব দিনের নামজাদা লেখক।

তবে এমন হল কেন?

এত যিনি নামজাদা লেখক এক সময়ের—আজ তিনি একখানা বই প্রকাশ করবার জন্যে আমার মত লোকের শরনাপন্ন হয়েছেন কেন? ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এমন গুরুতর পরিবর্তন কি ভাবে সম্ভব হল কি জানি।

রামতারণবাবু হাসিমুখে বললেন—দেখলেন সব?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হংকং টাইম্‌স্‌টার কাটিং দেখলেন?

—আজ্ঞে দেখলাম। আপনার দেখছি আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল এক সময়ে।

—হেঁ—হেঁ—তা—তা

রামতারণবাবু সলজ্জ হাস্যে চুপ করলেন। আমি বললাম—কতদিন আপনি লেখেন নি?

—লিখব না কেন, লিখি। তবে মধ্যে দিনকতক বন্ধ করেছিলাম।

—কেন?

—ইংরেজি কাগজের মোহে পড়েছিলাম।

—সে কি রকম?

—একটা আমেরিকান পেপারে ভারতবর্ষের কথা লিখতাম তারা বেশ টাকা দিত।

—তাতেই বাংলা লেখা ছাড়লেন?

—পয়সা পাচ্ছি ভাল, আর বাংলা লিখে কি হবে, এই ভাবলাম।

—তার পর?

—তার পর দেখলাম বাংলা না লিখলে মনের খুঁতখুঁতুনি যাচ্ছে না। কতকগুলো উপন্যাসের প্লটও মনে এল। আবার তখন বাংলা লিখতে হাত দিলাম। কিন্তু কি জানি কি হয়ে গিয়েছিল—ইতিমধ্যে। আর প্রকাশক পাচ্ছি নে মোটে। এদিকে সে আমেরিকান কাগজের সঙ্গেও আজকাল আর সম্পর্ক নেই। তারা হাত গুটিয়েছে, আগে বেশ টাকা দিত। কাগজ বোধ হয় তাদের উঠেই গিয়েছে। চিঠিও লেখে না আর।

—তাই তো।

রামতারণবাবু একটা বান্ডিল খুলে কতকগুলো পুরানো বই আমার সামনে ধরে বললেন—এই দেখুন আমার সব বই।

অনেক দিনের ছাপা, অনেকদিন আগের কাগজ। সেকালের ধরনের চটকদার বাঁধাই। সোনার জলে রুপোর জলে নাম লেখা। বইগুলোর বাঁধাই শুধু শক্ত কাগজের বোর্ডের। কি রকম ঘোরানো গড়নের অক্ষর। গ্রন্থকারের নামের পূর্বে লেখা আছে—অমুক অমুক বইয়ের লেখক শ্রীরামতারণ চট্টোপাধ্যায়।

একখানা বই হাতে দিয়ে রামতারণবাবু সগর্বে বললেন—এই আমার 'রঙের গোলাম'।

আগ্রহের সঙ্গে বইখানা হাতে নিলাম। বইখানার প্রথমদিকে এক সুদীর্ঘ ভূমিকা। 'শ্রীভুবনমোহন শর্মণঃ' নাম লেখা আছে ভূমিকার শেষে। আর ভূমিকায় লেখা আছে, 'আমি এই পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি, আমার সব ভাল লাগিয়াছে; আমার মনে হয়, আমি নিঃসঙ্কোচে লিখিতেছি, হিন্দুর পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্মের আদর যতদিন থাকিবে ততদিন সাধারণ্যে এই পুস্তকখানির আদর,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এতবার যিনি 'আমি' লিখেছেন ভূমিকায়, যাঁকে এত অনুরোধ করে ভূমিকা লেখানো হয়েছিল একদিন, আজ ত্রিশ বৎসর পরে তাঁকেও লোকে বেমালুম ভুলে গিয়েছে, আমার তো মনে হল না এ নাম কখনও শুনেছি।

রামতারণবাবু বললেন—ভূমিকাটা দেখেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভুবন বাঁড়ুজ্যের লেখা।

কথাটা বলেই রামতারণবাবু আমার মুখের দিকে চাইলেন, বোধ হয় লক্ষ্য করবার জন্যে এ নাম শুনে আমার মুখের ভাব কেমনতর হয়। কিন্তু আমার মুখের ভাবের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নি বলেই আমার ধারণা, তবুও গলায় যতদূর সম্ভব সম্ভ্রমের সুর এনে বললাম—তাই দেখছি।

রামতারণবাবু বললেন—আরও আছে বইয়ের পেছনে। উল্টে দেখুন। অনেক লোকের মতামত ছাপানো আছে।

আমি উল্টে দেখি, সত্যি অনেকে ভাল বলেছে বইখানাকে। ওদের মতামত ছেপে দেওয়া আছে বটে, কিন্তু যে সব লোকের মতামত ছাপানো হয়েছে তখনকার দিনে তাদের ব্যক্তিত্ব হয়তো যথেষ্টই ছিল, তাদের মতামতের মূল্যও ছিল সেই অনুপাতে, আজকাল তাদের কেউ চেনে না, তাদের মতামতের মূল্য কানাকড়িও না। যুগ-পরিবর্তন হয়েছে; সেদিনের বাণী যারা শুনিয়েছিল, আমড়া গাছের পাকা পাতার মত তাদের দিন ঝরে গিয়েছে। তাদের আজ কেউ চেনে না।

তত্ত্বটা কি অদ্ভুতভাবেই উপলব্ধি করলাম সেদিন সেখানে বসে। আমার সামনে নোনাধরা পুরনো দেওয়াল, চুন-বালি খসে অনেকখানি করে ইট বেরিয়ে পড়েছে। এক-গাদা পুরনো বাঁধানো খাতা—জীর্ণ হলদে বিবর্ণ খবরের কাগজের কাটিং-এ ছাপানো জীর্ণ হলদে বিবর্ণ প্রশংসা—যাদের মতামত, তারা ইহলোকের হিসেব চুকিয়ে ফেলেছে বহুকাল পুরনো কাগজ-পত্রের ভ্যাপসা গন্ধ। প্রবীণ পক্ককেশ গ্রন্থকার রামতারণ চাটুজ্যে সামনে বসে শিরাবহুল হাতে পুরনো বই-খাতার পাতা ওলটাচ্ছেন...

মন খারাপ না হয়ে পারে না। আমিও লেখক। আমার চেয়ে অনেক বড় দরের লেখক ছিলেন ইনি একদিন। দিন চলে যায়, থাকে না। এ যুগের বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের বইয়ের জীর্ণ পাতা ও যুগে লাইব্রেরির আলমারির পেছনে তেলাপোকায় কাটে। ওজন-দরে বিক্রি হয়।

রামতারণবাবু বললেন—দেখেছেন? এই দেখুন রায়বাহাদুরের মত—

—কোন্ রায়বাহাদুর?

—রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ মুন্সী—কত বড় ইয়ে—কলকাতায় হেন সভা ছিল না যেখানে রায়বাহাদুর সভাপতিত্ব না করতেন—

—ও।

চিনলাম না। যেমন চিনি নি বইয়ের ভূমিকা-লেখক ভুবনমোহন বাঁড়ুজ্যেকে।

রামতারণবাবু এইবার 'রঙের গোলাম' সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন। কে পড়ে কবে কি বলেছিল। কোন্ সভায় তাঁর সম্বন্ধে কি কি বলা হয়। 'রঙের গোলাম' সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জিনিস বাংলা সাহিত্যে। ও ধরনের প্লট নিয়ে কেউ কখনও লেখে নি। আমাকে বললেন—নিশ্চয় আপনি পড়েছেন? পড়েন নি?

পড়ি নি একথা বলতে কষ্ট হল ওঁর সাগ্রহ প্রশ্নভরা দৃষ্টির সামনে। বললাম—নিশ্চয়ই।

এর পরেই তিনি তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দেখালেন। অনেক দিনের পাণ্ডুলিপি

বলেই মনে হল। আমায় বললেন—শোনাব?

একটু একটু করে পড়েন তিনি, আর আমি বসে বসে শুনি আর ঘাড় নাড়ি। মাঝে মাঝে বলেন, আপনার কেমন লাগছে? বলি, ভালই লাগছে। ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ত্রিশ বছর আগের বাংলায় লেখা মামুলি প্লট বলে মনে হবারই কথা আমার কাছে। ওসব খোঁচ, ওসব কৌশল অনেক পেছনে ফেলে এসেছি আমরা। "পাঠক! এই যুবক ও যুবতীকে কি চিনিতে পারিলেন? ইহারাই আমাদের নবকুমার ও ইন্দুমতী।"

বেলা যায় যায়। এতক্ষণে আমাদের আড্ডা বসেছে 'উদিন-ভানু' আপিসে—বন্ধুবান্ধব এসে গিয়েছে, চা চলছে। আমি উসখুস করি আর ঘন ঘন বাইরের দিকে উঁকি মারি। রামতারণবাবুর সেদিকে দৃষ্টি নেই, তিনি তন্ময় হয়ে দরদের সুরে পড়ে চলেছেন 'ইন্দুমতী'র পাণ্ডুলিপি। ইন্দুমতী কি একটা ফ্যাসাদে পড়েছে, ভাল করে বোধ হয় জায়গাটা শুনি নি, এখন তার করুণ স্বগতোক্তি খুব দরদ দিয়ে উনি পড়ছেন। কি মুশকিলেই পড়া গেল, আজকের আড্ডা ফসকাল দেখছি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলব—"আচ্ছা থাক, আমার কাজ আছে আজ—"?

না, রামতারণবাবু কি মনে করবেন। তার চেয়ে শুনি বসে বসে। আর কখনও আসব না। সন্ধ্যা হয়ে এল ক্রমে। আর পড়া চলে না। রামতারণবাবু হেঁকে যেন কাকে বললেন, ওরে আলো একটা দিয়ে যা!

আমি এই সুযোগে বলি—তাহলে আজ—

—যাবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু দরকার আছে।

—কাল আসবেন কোন্ সময় বলুন! সবটা শুনতে হবে তো। নইলে প্রকাশকদের কাছে বলবেন কি? কেমন লাগছে?

—বাঃ চমৎকার।

—তাহলে কাল—ধরুন এই তিনটে—এসে চা খাবেন?

—ইয়ে—কাল? কাল আবার ভবানীপুরে একটু কাজ ছিল—

—না না, তা হবে না! একটা বই আরম্ভ করে মাঝে ফাঁক দিলে ইমপ্রেশন কেটে যায়—একটানা না শুনলে। আসুন কাল। সময় খুব কম হাতে।

অগত্যা রাজী হতে হল। পরদিনও গেলাম। সেদিন খাতা শেষ হয়ে গেল—আমার সৌভাগ্য বলেই সেটা ধরতে পারতাম যদি না রামতারণবাবু পড়ার শেষে খাতাখানা আমার ঘাড়ে চাপাতেন প্রকাশক খুঁজে দেওয়ার জন্যে।

বললেন—তাহলে এইবার একটু ভাল করে চেষ্টা করুন। শুনলেন তো সবটা? এ ধরনের বই আজকাল কেউ লিখতে পারবে না মশাই—নিজের মুখেই বলছি, তা আপনি যা-ই ভাবুন। অথর হলেই হল না।

আমার ভাবনা অবশ্য একটু ভিন্ন পথে গেল। এ যুগে চেষ্টা করলেও অমন বই লেখা যায় না ঠিকই। যুগের হাওয়া বদলেছে, রামতারণবাবুর যুগ পঁয়ত্রিশ বৎসর পিছিয়ে পড়ে গিয়েছে।

চেষ্টা করি নি তা নয়। সত্যিই চেষ্টা করেছিলাম। প্রকাশকেরা হেসেই কথাটা উড়িয়ে দেয়। সোজা কথা শুনিয়ে দেয় অনেকে, কেন আমি বৃথা চেষ্টা করছি, ও বই চলবে না। লেখকের নাম নেই বাজারে।

বললাম—কেন থাকবে না? এক সময় তাঁর বইয়ের যথেষ্ট আদর ছিল।

—যখন ছিল তখন ছিল। এখন ও অচল।

রামতারণবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সঙ্কোচ হয়। অন্য চায়ের দোকানে চা খাই, গোলদীঘির ত্রিসীমানা মাড়াই না। কিন্তু একদিন তিনি আমার মেসে এসে হাজির। আমি ওঁকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেলাম।

উনি বললেন—কি ব্যাপার? দেখি নে যে?

—আসুন। শরীর খারাপ। বেরই নি।

—বইখানার কতদূর কি হল বলুন তো। আমার ছোট নাতনীর অসুখ, কিছু টাকা

বড় দরকার। কে কি বললে তাই বলুন।

বড় বিপদে পড়ি। কেউ কিছুই বলে নি যে, একথা তাঁকে শোনাতে আমার বড়ই বাধে। প্রবীল লেখকের মনে সে রূঢ় আঘাত কেমন করে দিই? অবশেষে বললাম—একজনদের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে।

—খাতা তারা নিয়ে নিয়েছে নাকি?

—না—ইয়ে—খাতা আমার কাছেই—

রামতারণবাবু যেন দুর্ভাবনার দায় এড়িয়ে হাঁপ ছাড়লেন। প্রকাশকদের বিশ্বাস নেই, তারা অনেক সময় ভাল বই পেলে মেরে দেয়, আমি যেন খুব সাবধানে কাজ করি। অনেক সদুপদেশ দিলেন। আমি বেশ মন দিয়ে চেষ্টা করছি তো?

দু তিন জায়গায় ঘুরলাম আরও। রীতিমত অনুনয়-বিনয় করলাম দু-এক জায়গায়।

তারা হেসে বলে—আপনি অমন করছেন কেন ওঁর জন্যে বলুন তো? ওঁর বই চলবে না। আপনার নিজের বই আছে? থাকে নিয়ে আসুন। কালই প্রেসে দিচ্ছি।

একজন অনভিজ্ঞ লোক বই ছাপবার ব্যবসা করতে এল মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে। আমার কাছে দিন কতক ঘোরাঘুরি করলে। পয়সা বেশি নেই, কম টাকায় কাজ হাসিল করতে চায়। তাকে পাঠিয়ে দিলাম রামতারণবাবুর কাছে। সে চেনে না বিশেষ কোন গ্রন্থকারকে। আমার মুখে শুনলে রামতারণবাবুর খ্যাতির কথা। ওঁর বাসার ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ওঁর কাছে। সন্ধ্যার পরে লোকটা এল আমার বাসায়! খুব খুশী। মস্ত বড় 'অথর' ধরিয়ে দিয়েছি তাকে। আমার কাছে সে কৃতজ্ঞ থাকবে চিরকাল নাকি। অতবড় একজন লোক। বঙ্কিমচন্দ্রের মত খ্যাতি ছিল এক কালে! ইংরেজি কাগজে পর্যন্ত নাম বেরিয়েছে, তাও এখানকার কাগজে নয়, চীন দেশের।

বুঝলাম রামতারণবাবু তাঁর পুরনো খাতাপত্র সব বের করেছিলেন এর সামনে।

দিন পাঁচ-ছয় কেটে গেল। দুজনের কারও সঙ্গে দেখা হয় না। মনে মনে আশা হল, রামতারণবাবুর নৌকা ডাঙায় ভিড়েছে এতদিনে।

পরদিন আমি রামতারণবাবুর বাড়ী গেলাম। রামতারণবাবু স্নান করে উঠছেন সবে, ভিজে গামছা পরেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, হাতে এক ড্যালা বড় কাপড়-কাচা সাবান। বললেন—কে? ও, আপনি? আমি বলি বুঝি সেই ভদ্রলোক—

—কে?

—ঐ যাঁকে আপনি পাঠিয়েছিলেন। বেশ লোক।

—কি ঠিক হল?

—বসুন। আমি কাপড় ছেড়ে এসে সব বলছি। চা দিতে বলি?

—না, এতবেলায়—আসুন আপনি।

রামতারণবাবুর মনে খুব স্ফূর্তি। ফিরে এসে আমার কাছে বসলেন।

আমি বললাম—কি ব্যাপার বলুন।

—এখনই আসবেন উনি। আজ টাকা দেবার কথা।

—কথা পাকাপাকি হয়ে গেল? কত টাকায় মিটল?

—দেড়-শ টাকা!

দুজনেই বসে রইলাম অনেকক্ষণ। কেউ এল না। আমি উঠে বাড়ী চলে এলাম। সেই প্রকাশকটি আমার কাছে দুপুরের পরেই এসে হাজির। বললাম—আপনি গেলেন না ওখানে? কতক্ষণ বসে ছিলাম আমরা।

—না মশাই। ওঁর বই নেব না।

—কেন?

—চলবে না, সবাই বারণ করছে। উনি সেকেলে লেখক—ওঁর বই একালে বিক্রি হবে না।

তবুও আমি অনেক বোঝালাম। ফল বিশেষ কিছু হল না। সেই যে চলে গেল, আর আমি তাকে কোনদিন দেখি নি।

এই ঘটনার পরে দু তিন মাস কেটে গেল। রামতারণবাবুর আর কোন খবর পাই নি। সে চায়ের দোকানেও তিনি আর আসেন না।

তিন মাস পরে একদিন তাঁর বাড়ী গেলাম। ওঁর নাতি আমায় বললে—আসুন, দাদুর বড় অসুখ। উনি আপনার কথা প্রায়ই বলেন। চলুন ও ঘরে।

সে ঘরে গিয়ে দেখি, রামতারণবাবু মলিন শয্যায় শুয়ে চোখ বুজে রয়েছেন। রোগীর মত চেহারা নয় কিন্তু—বেশ সৌম্য মূর্তি, পাশে একখানা খবরের কাগজ—বোধ হয় কিছু আগে পড়ছিলেন। বিছানার পাশে একখানা বেঞ্চিতে ময়লা কাপড়ের ঘেরাটোপে পুরনো কয়েকটি বাক্স-তোরঙ্গ। দেওয়ালে ক্যালেন্ডার থেকে কাটা ছবি টাঙানো। কাঠের বাঁধাই সেকেলে আয়না একখানা।

বিছানার পাশে একটা টুলে রামতারণবাবু আমায় বসবার নির্দেশ করলেন।

বললাম—কেমন আছেন এখন।

—ঐ অমনি। বুড়ো বয়সের জ্বর। শরীরটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

দেখে সত্যিই কষ্ট হল। দারিদ্র্যের কালিমাখা হাতের ছাপ ঘরের আসবাবপত্রে, মলিন বিছানায়, ছারপোকার ছোপ-ধরা তক্তপোষে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বের একজন নামকরা লেখকের এই পরিণতি দেখে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব পুলকিত হয়ে উঠলুম না, বলাই বাহুল্য।

একথা-ওকথার পর রামতারণবাবু বললেন— আচ্ছা এক জুয়াচোরকে পাঠিয়েছিলেন মশাই। এই বলে গেল টাকা নিয়ে আসছি, তার পর আর এলই না। ও আমাকে ভেবেছে কি? আমার পথানে সেন লাইব্রেরীর দোলগোবিন্দ সেন একদিন তিন-শ টাকা নিয়ে খোশামোদ করেছে একখানা ছোট উপন্যাসের জন্য—এই সাত-আট ফর্মা। ওর ভাগ্য ভাল যে দেড়-শ টাকায় ওকে বই দিতে রাজী হয়েছিলাম—তা বুঝল না ও—

রামতারণবাবুর ব্যথা কোথায় জানতে দেরি হয় না। আমি কোন কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

উনি বললেন—আপনার সঙ্গেও দেখা করে নি?

অম্লান বদনে বললাম—কই, না।

—হামবাগ কোথাকার! ওর কোনও পুরুষে প্রকাশক নয়। মুড়িমিছরির যে একদর করে সে আবার প্রকাশক! অনেক পাবলিশার দেখেছি আমি, বুঝলেন? আমার এখানে ধন্না দিয়েছে। বুঝলেন?

—নিশ্চয়ই। তা হবে না! কত বড় নাম আপনার!

রামতারণবাবু আত্মপ্রসাদের প্রসন্ন হাসি হাসলেন। বললেন—সে আপনারা বুঝবেন মশাই, কারণ আপনারা লেখেন নিজেরা। ভাল হক মন্দ হক, লেখেন তো? আমার 'রঙের গোলাম' বইখানা পড়েছেন, দেখেছেন, তো? ওর নাম চিরকাল থেকে যাবে—কি বলেন আপনি?

—তা আর বলতে! সেদিন এক বড়লোকের বাড়ী গিয়েছি—সেখানে আপনার 'রঙের গোলাম'-এর কথা উঠল—

রামতারণবাবু আগ্রহের মাথায় বিছানা ছেড়ে সোজা হয়ে বসে বললেন ব্যগ্রভাবে—কোথায়? কোথায়?

—ওই—ইয়ে, বালিগঞ্জে।

—তার পর? তার পর?

—তার পর ওরা বললে, বইয়ের মত বই একখানা। খুব ভাল বলছিল সবাই।

—বলতেই হবে যে—মশাই, বলতেই হবে। এমন কৌশল করে রেখেছি ওর মধ্যে যে, সব ব্যাটাকে ভাল বলতে হবে। কেঁদে ভাসিয়ে দিতে হবে শেষের দিকে—কেমন, না?

—উঃ সে আর—

ভগবান যেন আমায় ক্ষমা করেন। রামতারণবাবুকে দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর রোগ অর্ধেক সেরে গিয়েছে। নিজের বইয়ের প্রশংসা শোনা অনেকদিন বোধ হয় তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি।

সেদিন একটু পরেই চলে এলাম।

এইদিনটি থেকে কি জানি কি হল, যখনই রামতারণবাবুর কাছে গিয়েছি, তখনই মাঝে মাঝে তিনি জানতে চাইতেন, তাঁর 'রঙের গোলাম' সম্বন্ধে আর কোথাও কিছু শুনলাম কি না। কি আগ্রহেই জিজ্ঞেস করতেন কথাটা!

আমায় সংবাদ দিতেই হত। কখনও তাঁর বইয়ের প্রশংসা শুনে এলাম বালিগঞ্জের কোনও ক্লাবে, কোনদিন ট্রেনে, কোনদিন তরুণ সাহিত্যিকদের আড্ডায়, কোনদিন বা আমার কোন বান্ধবীর মুখে।

এর পরেই তাঁর সানুনয় অনুরোধ শুনতে হত প্রায় প্রত্যেকবার—দেখুন না মশাই, বইখানার সেকেন্ড এডিশন যদি কেউ নেয়! একবার উঠে পড়ে লাগতে হয় এবার। আপনি তো পড়েছেন, আপনি বলবেন তাদের বুঝিয়ে—কি বলেন?

ভগবান জানেন, 'রঙের গোলাম' নামধেয় কোন উপন্যাস আমি চক্ষে দেখি নি।

হয়তো রামতারণবাবুর বাসাতে যাতায়াত করা উচিত ছিল না হত, কিন্তু না গিয়ে আমি পারতাম না। কেমন একটা টান অনুভব করতাম। প্রবীণ লেখক অসহায় ভাবে রোগ-শয্যায় পড়ে আছেন। কখনও দু-পাঁচটা কমলা লেবু, কখনও একটু মিছরি হাতে নিয়ে যেতাম—কিন্তু রামতারণবাবু সব চেয়ে খুশী হতেন ভাল গুড়ুক তামাক নিয়ে গেলে। বৈঠকখানা বাজারের সাধনের দোকানের তামাক বড় পছন্দ করতেন।

এর পরে ধীরে ধীরে রামতারণবাবুর কাছে যাওয়া আমার কমে গেল।

এমনিই হয়ে থাকে জীবনে। কিছু সময় ধরে এক এক লোকের রাজত্বকাল চলে, সে সময় পার হয়ে গেলে সারা জীবনেও আর হয়তো সে লোকের দেখা মেলে না। দেখা মিললেও প্রথম আলাপের দিনের উৎসাহ খুঁজে পাওয়া যায় না। রামতারণবাবুকে সে চায়ের দোকানে আর অনেকদিন দেখি নি।

দশ এগার বছর কেটে গেল এর মধ্যে।

আমার নিজের জীবনেও কত পরিবর্তন ঘটে গেল। কলকাতার অধিবাসী এখন আর আমি নই। গ্রামদেশে বাড়ী করেছি, মাঝে মাঝে আসি যাই, এই পর্যন্ত।

একদিন হেদোর ধারের বেঞ্চিতে বসে একটু জিরোচ্ছি, পাশেই একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বসে ছিলেন আমার আগে থেকেই। দু-একবার চেয়ে দেখে লোকটিকে চিনতে পেরে আমি একেবারে বেঞ্চি ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। বললাম—রামতারণবাবু যে! চিনতে পারেন?

রামতারণবাবু খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছেন—চেহারাও গিয়েছে অনেক বদলে। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—ও! আপনি?

আবার ওঁর পাশে বসে পড়ি। এত দিনের অদেখা। অনেক কথাবার্তা হয়।

উঠবার সময় বললেন—চলুন না আমার বাসায়। সেই ভীম ঘোষের লেনেই আছে বাসা। ওখানেই বহু কাল কাটল। এখন আর কোথায় বা যাব? আপনি তো ভুলেই গিয়েছেন একেবারে।

গেলাম সেই পুরনো বাড়ী'ত। সেই পুরনো দিনের আসবাবপত্র ঠিকই আছে, মায় ঢুকবার দরজার সামনে সেই বেঞ্চিখানা পর্যন্ত। পরিবর্তনের মধ্যে রামতারণবাবু একটু স্থবির হয়ে পড়েছেন, নিজেও তুললেন সে কথা।

—আর তেমন হাঁটাহাঁটি করতে পারি নে। হেদোটাতে গিয়ে বসি বিকালটাতে। যাবই বা কোথায়, গেলে পয়সা খরচ। যা টানাটানির সংসার—

—আপনার বড় ছেলে কোথায় কাজ করছে?

—সে তো নেই। আজ এই আট বছর। ওই ছোট ছেলেটা কি একটা চাকরি করে, রেশন পায়, তাতেই কোন রকমে—

—কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। কি কথা বলি?

রামতারণবাবুই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে উঠলেন—ভাল কথা—

আমি ওঁর মুখের দিকে চাইলাম।

—আমার 'রঙের গোলাম'-এর কথা আজকাল কেমন শোনেন-টোনেন? লোকে বলছে কি? আধুনিক জেনারেশনের মত কি? ওরা ওটা বুঝতে পারবে? ওদের জন্যেই ওটা লেখা। আমরা হচ্ছি অ-অ-থর, বইয়ের কথা—লোকে কি বলে না বলে—সে তো আর আপনাকে বোঝাতে হবে না—আপনিও তো একজন—

শীর্ণকায় অতিবৃদ্ধ ঔপন্যাসিক আমার সামনে; মিথ্যা গল্প ফাঁদি, বলি—হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল, সেদিন ট্রামে দেখি আপনার বই নিয়ে দুই ভদ্রলোকের মধ্যে বেধেছে ঘোর তর্ক—কলেজের ছেলে বলেই মনে হয়, দুজনেই ভক্ত আপনার লেখার—তার পর—

উনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—হতেই হবে যে—ওর মধ্যেই এমন কৌশল করা আছে, কেঁদে ভাসিয়ে দিতে হবে শেষের দিকে যে! তা—ভাল কথা, ওর সেকেন্ড এডিশনটার জন্যে একটু খাটতে হচ্ছে আপনাকে, বুঝলেন? আপনাকে বলব না তো কাকে বলব বলুন—অথরস্য অথরো গতি—নামকরা বই বাজারের! তাহলে একটু দয়া করে—

শীর্ণ হাত দুখানা দিয়ে রামতারণবাবু সাগ্রহে আমার ডান হাত চেপে ধরলেন।

অরণ্যকাব্য

আমরা মাঠাবুরু বাংলোতে কয়েকদিন হল গিয়েছি। বাংলোর পেছনে দু শ' হাতের মধ্যে দীর্ঘ মাঠাবুরু শৈলমালা। বনে আচ্ছন্ন উপত্যকার সমতলে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে বনবিভাগের বাংলো। সেই ফাঁকা জায়গাটাতে বনবিভাগের লোকদের যত্নে কুলু আপেল, নাশপাতি, বোম্বাই আম, কাশীর পেয়ারা প্রভৃতির গাছ লাগানো হয়েছে—এখন চারাগাছ, চেরা শালকাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা, অদূরবর্তী মাঠা গ্রামের গরু ছাগল প্রভৃতির উপদ্রব থেকে রক্ষা করবার জন্যে। গ্রামের লোকসংখ্যা পঞ্চাশ-ষাট ঘরের বেশি নয়, সবাই দরিদ্র, সবারই রাঙা মাটির দেওয়াল দেওয়া খোলার ঘর, কেবল একঘর গৃহস্থের বাড়ী পাথরের দেওয়াল। তারাই নাকি গ্রামের জমিদার, 'বাবু' খেতাবধারী। বাড়ীর ছেলেদের উপাধি 'বাবু'! ওদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, তার নাম দর্পনারায়ণ বাবু, সে বনবিভাগের আরদালি, কুড়ি টাকা মাসিক বেতন। গবর্ণমেন্টের দেওয়া কুড়ুল ঘাড়ে দর্পনারায়ণ বাবু বনবিভাগের রেন্‌জারের পেছনে পেছনে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের লোকের উপজীবিকা বনজঙ্গল থেকে কাঠ চুরি করে বাঘমুণ্ডির হাটে বিক্রি করা; পাহাড়ের ওপর থেকে বেল, কেঁদ, পিয়াল, বুনো আলু, মিষ্টি ডুমুর, করঞ্জা প্রভৃতি বন্যফল সংগ্রহ করে আনা এবং বন্য জন্তু শিকার। আগে এ কাজে কোনও বাধা ছিল না, এখন বনবিভাগের কর্মচারীদের কড়াকড়িতে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আমরা বাংলোর সামনের মাঠে বেতের বড় বড় ঈজি-চেয়ারে শুয়ে গল্পগুজব করছিলাম। মিঃ মিশ্র ফরেস্ট অফিসার টুরে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে এসেছেন বাবু রতনলাল খাস্তগীর, পি. ডবলিউ. ডি-র ইঞ্জিনিয়ার, বিলেতফেরত ও কেতাদুরস্ত লোক। আর আছেন বাঘমুণ্ডি সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সরকার, ইনি নতুন চাকরি পেয়ে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছেন ন মাইল দূরবর্তী বাঘমুণ্ডি নামক বনবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামেঃ কয়েক মাস হল বর্মা থেকে অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন, জাপ-অভিযানের তোড়ের মুখে।

মিঃ সরকার চা খেতে খেতে বলছিলেন তাঁর বর্মা থেকে প্রত্যাগমনের রোমাঞ্চকর কাহিনী। পাঁচ টাকা সের চাল কিনে সঙ্গের নটি প্রাণী কোন রকমে প্রাণ ধারণ করে এসেছিলেন এক এক থাবা ভাত খেয়ে। রাত্রে বন্য অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব তাঁবুতে। পথে কলেরায় একটি দুটি করে ছটি কাবার নটির মধ্যে।

ফাল্গুনের শেষ। বাংলোর পেছনে মাঠাবুরু পাহাড়ে করঞ্জা ফুল ফুটেছে—তার সুগন্ধ ঠিক জুঁই ফুলের মত তীব্র। বাতাস মাতিয়েছে করঞ্জা ফুলের ঘন বাসে। রহস্যময়

পর্বতারণ্যে বন্যকুক্কুটের ডাক এই খানিক আগেও শোনা যাচ্ছিল। আবার গভীর রাত্রে সেদিন শুনেছি অদ্ভুত কি এক জন্তুর আওয়াজ—কেউ বললে বাঘ, কেউ বললে সম্বর হরিণ।

মিঃ সরকার বললেন—এ জায়গাটা বড় চমৎকার, সত্যি—বেশ অদ্ভুত ধরনের সিনারি।

আমি বললাম স্বপ্নলোকে বাস করছি ক'দিন। আবার কলকাতা গিয়ে আপিস করতে হবে—সেই ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি।

মিঃ মিশ্র বললেন—কাল আপনাকে মাঠাবুরু পাহাড়ের ওপরকার বনে নিয়ে যাব। কত রকম ফুল ফুটেছে দেখবেন এই সময়।

মিঃ সরকার বললেন—আমিও যাব।

আমি বললাম—আপনি কাল কাজে জয়েন করবেন না?

—না। আমার জিনিসপত্তর এখনও বলরামপুর থেকে আসে নি।

—কিন্তু এর পরে আপনি বাঘমুণ্ডি যাওয়ার মোটর পাবেন না। মিঃ মিশ্র তো কাল চলেছেন।

মিঃ মিশ্র বললেন—হ্যাঁ, কথাটা খানিকটা ঠিক। তবে আমি কাল কখন যাব বলতে পারি নে। দ্যাট ডিপেন্ডস্—পুরুলিয়া থেকে যদি তার আসে তবে।

—নয়তো?

—নয়তো পরশু সকাল।

হঠাৎ মিঃ সরকার উৎকর্ণ হয়ে বললেন—ও কি ডাকছে বনে? ভীষণ আওয়াজ।

—আমি হেসে বললাম—তাই তো। কি বলুন তো?

—আমি কিছুই বুঝছি না। কি ওটা?

মিঃ মিশ্র বললেন—প্রাগৈতিহাসিক ব্রণ্টোসরাস নয়—নথিং মোর দ্যান এ বার্কিং ডিয়ার।

মিঃ সরকার বিস্মিত হয়ে বললেন—বার্কিং ডিয়ার! অমন শব্দ! ও যে পাহাড় বন ফাটিয়ে দিচ্ছে আওয়াজে।

আমি হেসে বললাম—ও আপদ ওই রকম করে।

মিঃ মিশ্র চাকরকে ডেকে আরও কয়েক পেয়ালা গরম চা আনতে বললেন। বেশ লাগছিল এই চমৎকার রাত্রিটি, যদিও দিনে বেশ গরম, শুকনো শালপাতার গন্ধ মেশানো ও করঞ্জা পুষ্পের সুবাসে ভরা নৈশ বাতাস বাংলা দেশের অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রির মত ঠাণ্ডা। আমরা কেউ কম্বল, কেউ আলোয়ান গায়ে দিয়ে বসেছিলাম।

আমি বললাম—বর্মা থেকে ফেরবার পথে পাহাড়-জঙ্গলের দৃশ্য কেমন দেখলেন মিঃ সরকার?

—ওঃ, ছিন্দউইন নদী পার হয়ে মণিপুরের পথে যে অপূর্ব পাহাড়বনের দৃশ্য, তেমন দৃশ্য হঠাৎ চোখে পড়ে না। অনেক বড় বড় সাহেবের মুখেও আমি একথা শুনেছি। যারা অনেক বেড়িয়েছে, অনেক জায়গায় গিয়েছে, তারাও বলেছে। ভগবানের তৈরি দুনিয়ার একটা ভাল জিনিস যদি কেউ দেখতে চায়, তবে যে ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক, যার বুকে সাহস ও উৎসাহ আছে, সে যেন মণিপুর বর্মা রোড ধরে ছিন্দউইন নদী পর্যন্ত যায়। চোখ সার্থক হবে। যদি পয়সা খরচ করে, পয়সাও সার্থক হবে।

ভৃত্য সবাইকে গরম চায়ের পেয়ালা দিয়ে গেল। আমাদের পরামর্শ হচ্ছিল আগামী কাল যদি পুরুলিয়া থেকে মিঃ মিশ্রের তার না আসে তবে বিকেলে মিঃ সরকারকে নিয়ে নার্কটিটাঁড়ের ফরেস্ট সবাই মিলে টি-পিকনিকে যাওয়া যাবে।

মিঃ মিশ্র বললেন—বাঘমুণ্ডিতে বড্ড কষ্ট হবে আপনার মিঃ সরকার। ছোট্ট গ্রাম, একটি বাঙালী নেই। থাকবার ঘর পাবেন না। ডাকবাংলো আছে বটে কিন্তু তাতে কদিন থাকবেন? রান্না করবে কে, নানা অসুবিধে। সভ্যতার মুখ দেখতে পাবেন না। পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে বাস।

মিঃ খাস্তগীর বললেন—থাকবার যতদিন ঘর জোগাড় না হয়, ততদিন উনি ডাক-বাংলোতেই থাকবেন। সে ঠিক করে রেখেছি। ভদ্রলোকের ছেলে, যাবেন কোথায়।

গাছতলায় তো উঠতে পারেন না।

মিঃ খাস্তগীর মিঃ সরকারের ওপরওয়ালা অফিসার। মিঃ সরকার কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে ওঁর দিকে চেয়ে বললেন—সে আপনার দয়া। যাতে ফ্যামিলি আনতে পারি, এ ব্যবস্থাটা করে দেবেন। নয়তো বড় কষ্ট হবে।

মিঃ মিশ্র বিস্ময়ের সুরে বললেন—ফ্যামিলি? না মশায়, আমি আপনাকে সে পরামর্শ দিই নে।

—কেন?

—না। এ সব বে-খাপ্পা জায়গায় কেউ ফ্যামিলি আনে!

—আনছি আর কি সাধে। নিতান্ত পেটের দায়ে।

—যাই হক। আমার পরামর্শ অন্য রকম।

—এই, কৌন্ হ্যায়?

দেখা গেল একটা বাইরের লোক রাস্তার ওপর থেকে চলে এসে বাংলোর হাতায় ঢুকল। মিঃ মিশ্রের প্রশ্নের উত্তরে সে আরও কাছে এসে এক লম্বা সেলাম দিলে সবাইকে। তার পর এগিয়ে এসে মিঃ মিশ্রের হাতে একখানা চিঠি দিলে। মিঃ মিশ্র চিঠিখানা দেখে বললেন—এ তো বাংলা চিঠি দেখছি। আমি তো পড়তে পারব না—এই নিন পড়ুন—কে লিখল চিঠি—আমার হাতেই চিঠিখানা দিলেন। আমি খুলে দেখলাম বাঁকা মেয়েলি হাতে লেখা কটি মাত্র ছত্রে লেখা চিঠি। তাতে লেখা আছে—"আমার স্বামী উপানন্দ মন্ডল মৃত্যুশয্যায়। কয়দিন হইতে জ্বর আর ছাড়িল না। জ্ঞান নাই, একা আমি যে কি করিব, বুঝিতে পারি না। আমার হাতে টাকা পয়সা নাই। একজন লোক নাই যে আমার কথা বুঝিতে পারে। এই চিঠি দিলাম, বাঙালী বাবু হইলে চিঠি পড়িয়া দয়া করিয়া আসিয়া আমার স্বামীকে বাঁচান। ইতি দুঃখিনী—উপানন্দ মন্ডলের স্ত্রী।"

আমি উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই।

মিঃ খাস্তগীর বললেন—কি হল? কোথাকার চিঠি? ব্যাপার কি?

আমি চিঠি পড়ে সকলকে শোনালাম। মিঃ মিশ্র জিজ্ঞেস করলেন—কোথাকার চিঠি? কোন্ জায়গা থেকে আসছে?

বাকি সকলেই হতবুদ্ধি।

হঠাৎ মনে পড়ল পত্রবাহক তো এখানে সশরীরে উপস্থিত। তাকে জিজ্ঞেস করা গেল কথাটা। সে বললে—বাঘমুন্ডিসে।

আমি বললাম—এ বাবু কে?

—কনট্রাক্টরকা কিরানী।

—কোন্ কনট্রাকটার?

—ফরেস্ট ইজারদার। উ কনট্রাক্টর হুঁয়াপর নেহি রহতা হ্যায়। কিরানী বাবু উনকো কাম দেখতা থা আজ সাত রোজসে বাবু বিমার পড়া—আউর—

মিঃ মিশ্র বললেন—বুঝতে পেরেছি, লোচনলাল কনট্রাক্টারের বুঝনদার। সবাই ঘাসের আঁটি ওজন করে, প্রেসে আঁটি বাঁধায়। সামান্য বিশ-ত্রিশ টাকা মাইনে পায়। ওখানে বাঙালী তো আর কেউ নেই।

মিঃ খাস্তগীর বলে উঠলেন—চলুন সবাই। একটি বাঙালী পরিবার বিপন্ন। এই বিদেশে বিভুঁইএ। লেট আস—। মিনিট কুড়ির মধ্যে সকলে তৈরী হয়ে মিঃ মিশ্রের মোটরে এসে উঠলাম, সঙ্গে সেই পত্রবাহক। রাস্তার মাঝে মাঝে বনজঙ্গল বেশ ঘন স্থানে স্থানে—ডানদিকে দীর্ঘ মাঠাবুরু শৈলমালা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। বনে বনে করঞ্জা ফুলের সুবাস। উঁচুনীচু পথে শোভা নদী (কি চমৎকার নামটি) পার হয়ে (এখন জল নেই) রাত সাড়ে আটটার মধ্যে বাঘমুন্ডি পৌঁছে গেলাম। পত্রবাহক নিয়ে গিয়ে তুলল এক খোলার বাড়ীতে। বাড়ীর সামনে একটা খুব বড় কুসুম গাছ। বাড়ীর মধ্যে থেকে কান্নার শব্দ শুনে আমরা মোটর থেকে না পারি নামতে. না পারি হাত-পা কোলে করে বসে থাকতে। মিঃ মিশ্র হাঁক দিয়ে বললেন—কে আছেন বাড়ীতে? মোটরের হর্ন-ও বাজানো হল।

দু-তিনটে ওদেশী লোক কোথা থেকে জুটল এসে মোটরের কাছে।

মিঃ মিশ্র তাদের বললেন—এখানে এক বাঙালী বাবুর অসুখ?

ওরা সাহেবী পোশাক পরা সব লোক দেখে থতমত খেয়ে গিয়েছিল। সেলাম দিয়ে সংক্ষেপে বললে—ও বাবু মর্ গিয়া।

আমরা সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম—সে কি! কখন?

—বেলা তিন বাজে।

—সৎকার হয়েছে?

—নেহি বাবু।

—লাশ কোথায়?

—বাড়ীমে অভিতক্ হ্যায়। ক্যা করে বাবুজি, হাম লোক তো মুসলমীন হ্যায়. বাঙালী হিন্দুকে লাশ কৌন্ লে যায়গা—

পত্রবাহকটির কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। সে বাড়ীর ভেতর থেকে এসে আমাদের বললে—মাঈজী ডাকছেন আপনাদের।

বাড়ীর মধ্যে গিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তা বড়ই করুণ। খোলার ছোট বাড়ীর মধ্যে দু তিনখানা আলোকবিহীন ঘর। একটা ঘরের দাওয়ায় দু-তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বসে কাঁদছে। ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে প্রথমটা ভাল দেখতে পাওয়া গেল না। তার পর দেখি দড়ির খাটিয়ায় কে যেন শুয়ে আছে, তার পাশে মেজের ওপর বসে একটি মেয়ে কাঁদছে। বিহারের পল্লীগ্রামের ঘর, ভাল আলো বাতাস আসবার ব্যবস্থা নেই এ সব ঘরগুলোতে। খোলার দোতলা করবে, অথচ উপযুক্ত পরিমাণে জানলা থাকবে না।

আমাদের দেখে মেয়েটি আরও চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

ওই অসহায় সদ্যবিধবার কান্না যেন আর্তনাদের মত শোনাল। তার মধ্যে স্বামীর জন্যে শোক কতকটা নিশ্চয়ই আছে, তার চেয়েও বেশি আছে নিজের কি উপায় হবে তার জন্যে আতঙ্কবোধ। আমরা যে ক'জন উপস্থিত আছি. সেটা খুব ভাল করেই বুঝলাম. বাঙালী বিহারী সবাই।

মিঃ খাস্তগীর বললেন সান্ত্বনার সুরে—কাঁদবেন না মা। আমরা যখন এসেছি, তখন সব ব্যবস্থা হচ্ছে।

মিঃ মিশ্র ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে বললেন—ও, সো ভেরি স্যাড।

আমাদের আসতে দেখে দু-পাঁচটি লোক বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। এতক্ষণ কেউ ছিল না। মিঃ মিশ্র তাদের ধমক দিয়ে বললেন—বাঘমুণ্ডি গ্রামে কি এমন একজন মেয়েমানুষ নেই যে এই বিপদের সময় এখানে এসে দাঁড়িয়ে একটু সান্ত্বনা দেয়? শুধু পয়সা করতেই এসেছে সব এখানে? মনুষ্যত্ব শেখে নি?

এখানে বেশির ভাগ লোক মুসলমান, আরা জেলা প্রভৃতি জায়গা থেকে এসেছে বন্যপালা কেনাবেচা করবার জন্যে। ছোট্ট গ্রাম, তবে বন্যপালার মস্ত বড় হাট বসে এখানে ফি সোমবারে। এ ব্যবসা উপলক্ষে অনেকগুলি বিদেশী লোক এখানে এসে বাস করছে. অনেকেই খোলার ঘরদোরও বানিয়েছে। নিজেরা থাকে, আবার ভাড়াও দেয়। হিন্দুও এদের মধ্যে অনেক।

সত্যই রাগ হয় বটে। এ লোকগুলো কি রে বাবা! কেউ নেই ওর আত্মীয়স্বজন এখানে, সদ্যবিধবা একটি মেয়ে স্বামীর মৃতদেহ আঁকড়ে পড়ে আছে বিদেশ বিভূঁইএ. এ অবস্থায় তাকে সান্ত্বনা দিতেও তো দু-চারটি স্থানীয় মেয়েছেলের আসা উচিত ছিল।

শুনলাম নাকি এসেছিল। একেবারে যে আসে নি তা নয়। কিন্তু এই ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে বেলা তিনটের সময়. আর এখন রাত নটা। ছ' ঘণ্টা ধরে কে বসে থাকবে এখানে, বাড়ীঘরের কাজকর্ম সকলেরই আছে না কি?

এ যুক্তি অকাট্য। কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। যদি দোষ দিতে হয় তবে মেয়েটির অদৃষ্টকে।

আমি বললাম—মা, কান্নাকাটি করে আর কি করবেন, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন

সৎকার করবার ব্যবস্থা করতে হবে সকলের আগে। একটু বাইরে আসুন। আমরা জিজ্ঞেস করি—

মেয়েটি বাইরে এসে দাঁড়াল। কপাল কুটেছে, ঢিবি হয়ে ফুলে আছে কপালটা। বয়স তেইশ-চব্বিশ কি বড়জোর পঁচিশের মধ্যে। আধময়লা শাড়ি পরনে, রাত্রিজাগরণে এবং দুশ্চিন্তায় মুখ শীর্ণ, তবুও কেমন মনে হয় মেয়েটি এক সময়ে নিতান্ত খারাপ ছিল না দেখতে; রং ময়লা নয়, বরং ফর্সাই। হাতে দুগাছা সরু রুলি, গাছকতক কাঁচের চুড়ি।

ওর চোখে-মুখে গভীর নিরাশা আঁকা রয়েছে। অবলম্বনহীন নিঃসম্বল জীবনের আতঙ্ক ওর মুখের প্রতি রেখায়।

মিঃ খাস্তগীর ও আমার প্রশ্নের উত্তরে ওদের ঘটনা যা জানা যায় তা এই যে, ওর স্বামী উপানন্দ মণ্ডল এখানে ফরেস্ট কনট্রাক্টারের কেরানী। লোচনলাল কনট্রাক্টার বড়লোক, তার বহু জায়গায় ও-রকম কত লোক মাইনে-করা আছে। সে নিজে থাকে ধানবাদে, এখান থেকে বহুদূর। তাও এক জায়গায় থাকে না। আজ আছে কলকাতায় কাল গেল খড়্গপুর।

উপানন্দ মণ্ডলের বাড়ী পুরুলিয়ার কাছে কি গ্রামে—কিন্তু মেয়েটির বাপের বাড়ী নদীয়া জেলায়। আজ দশ বছর বিয়ে হয়েছিল—ওই তিনটি সন্তান তার ফল। বাপের বাড়ীর অবস্থা খারাপ। শ্বশুরবাড়ীতেও এক বৃদ্ধ জেঠশ্বশুর ছাড়া আর কেউ নেই। চাকরি না করলে যদি সংসার চলবেই তবে এতদূরে পাণ্ডববর্জিত স্থান পাহাড়জঙ্গলের দেশে কেউ আসে চাকরি করতে!

বললাম—বাপের বাড়ীতে কে আছে?

—সৎমা ও দুটি বৈমাত্র ভাই।

—বাবা বেঁচে?

—তাহলে কি আজ—বলেই মেয়েটি ডুকরে কেঁদে উঠল।

ওর এই কান্নার মধ্যে একটা অসহায় সুর ফুটে উঠল বেশি করে—সেটা ততটা আধ্যাত্মিক নয়, যতটা আধিভৌতিক। সংক্ষেপে সব বোঝা গেল। হাতে এমন পয়সা যার নেই যে কাল কি খাবে, তার আধ্যাত্মিক ক্রন্দনের সময় এটা নয়—তা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যত গভীর দাম্পত্য প্রেম থাকুক না কেন।

মিঃ খাস্তগীর আমাদের ইংরেজিতে বললেন—শেষকালে মৃতদেহ কি আমাদেরই বইতে হবে নাকি?

বললাম—গতিক দেখে তাই মনে হচ্ছে।

—এখন এত রাত্রে?

—সকাল তিনটে থেকে সারা রাত মড়া পড়ে থাকবে বাড়ীতে? সে হয় না।

আমাদের মোটর আসতে দেখে এবার অনেক লোক জড়ো হয়েছে বাড়ীর উঠোনে ও বাড়ীর সামনে।

তাদের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল পথে শোভা নদী পার হয়ে এসেছি ওরই ধারে শ্মশান। তবে বর্ণহিন্দু বলতে যা বোঝায় তা বাঘমুণ্ডি গ্রামে নেই—সুতরাং বর্ণহিন্দুর সৎকারপ্রথা এখানে যথাযথভাবে পালন করা হয় না, যেখানে যার খুশি সৎকার করে। এত রাত্রে সেই শোভা নদীর ধারে যেতে হবে! সে এখান থেকে তিন মাইলের কম নয়।

মিঃ মিশ্র বললেন—লাশ আমার মোটরে তুলুন। আমার আপত্তি নেই। চলুন নদীর ধারে। এ প্রস্তাবে আমার আপত্তি জানালাম। ওঁর আপত্তি না থাকতে পারে, কিন্তু হয়তো ওঁর স্ত্রীর আপত্তি থাকতে পারত। ওঁর এ উদারতার সুযোগ নেওয়া উচিত হবে না। ঝোঁকের মাথায় অনেকে অনেক কিছু বলে বইকি।

সে রাত্রে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে উঠত না কিন্তু ভুবনেশ্বর বাঁড়ুজ্যে বলে একটি মানভূমবাসী লোককে পাওয়া গেল হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে। তাকে স্থানীয় বন্য লোকের ভিড় থেকে চিনে নেওয়া অসম্ভব হ'ত, যদি না ওদের মধ্যে কেউ বলে উঠত ওর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে—এ বেরাহ্মণ আছে—

—কে ব্রাহ্মণ আছে? কই?

একজন কালো ভূতের মত লোক সলজ্জভাবে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার হয়ে এসে এক-পাশে দাঁড়াল। অতি ময়লা আটহাতি মোটা কাপড়, ধূলোমাটি লেগে রাঙা হয়ে গিয়েছে কাপড়খানা। রাস্তার কুলির কাজ করে কিনা কি জানি। অতি গরিব ব্যক্তি।

তাকে জিজ্ঞেস করা হল সৎকার কোথায় হয়। সে বললে, সেই নদীটার ধারে বালি এ— অর্থাৎ শোভা নদীর ধারে বালির ওপর।

সে যেতে রাজী আছে। বিস্মিত হলাম যে সে কোন পয়সার দাবি করলে না। সৎকারান্তে পরদিন তাকে কিছু বকশিশ দিতে গেলেও সে প্রথমটা নিতে চায় নি। এটাও বুঝেছিলাম তার এই প্রত্যাখ্যান মৌখিক নয়, আন্তরিক। শোভা নদীর ধারে সে-ই চিতা সাজিয়েছিল, ঘন ঘন কাঠ জুগিয়েছিল—অবিশ্যি আমরা মৃতদেহ নিজেরা বহন করলেও কাঠ মোটরে নিয়ে গিয়েছিলাম। তবে বড্ড বকে, এই মাত্র ওর দোষ। কিন্তু অক্লান্তকর্মী, কাজে ফাঁকি দিতে জানে না, সারা রাত শোভা নদীর তীরবর্তী বনভূমি থেকে শুকনো শালের ডালাপালাও তাকে সেই রাত্রে সংগ্রহ করে আনতে হয়েছিল। কৃষ্ণা দ্বাদশীর ক্ষীণ চাঁদ যতটুকু ম্লান জ্যোৎস্না দান করলে শোভা নদীর বালির চরে, তাতেই শেষ রাত্রে আমরা আমাদের কাজ সমাধা করে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটরে উঠে আবার বাঘমুণ্ডি ফিরে এলাম।

মেয়েটির ঘরদোর ওরই মধ্যে বেশ সাজানো।

বিদেশে গেরস্তালি পাতিয়েছিল বেশ একটু সাজিয়েই। মেয়েটির হাতের কারিকুরি —নিজের হাতে বোনা উলের কুকুর, 'পতি পরম গুরু' ইত্যাদি দেওয়ালে টাঙানো আছে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায়। সরস্বতী, মা কালীর ছবি। একখানা ক্যালেণ্ডার, খানকতক টাঙানো ধুতি একটা আলনায়। দুটো টিনের তোরঙ্গ একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসানো ঘরের একদিকে। অ্যালুমিনিয়মের ছোট ডেকচি একটা। সাজা পানের ডিবে ঝকমক করছে। কষ্ট হল ভেবে এ গৃহস্থালি ভেঙে যাবে আজই। যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল এ দুদিনের বাসা, তা আজ টলেছে। কত গৃহস্থালির এই একই দুঃখময় ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছি।

মেয়েটির নাম কি জানি নে। 'পতি পরম গুরু' বোনা ছবির তলায় লেখা আছে শৈলবালা দেবী, বোধ হয় ঐ নামই হবে ওর। শৈলবালা খুব কাঁদলে আমরা ফিরে এলে. এইবার আমাদের বকুনির ফলে জন-দুই স্ত্রীলোক দেখলাম ওর কাছে রাত্রে ছিল।

আমাদের পরামর্শ-সভা বসল। মিঃ মিত্র বললেন—এখন কি করা হবে বলুন।

আমি গিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম—হাতে কি আছে আপনার?

জানা গেল গোটা দুই টাকা ছাড়া কিছু নেই। অসুখের জন্যে সব খরচ হয়ে গিয়েছে। তার ওপর স্থানীয় মুদীর দোকানে আঠার উনিশ টাকা দেনা। দু মাসের বাড়ীভাড়া বাকি. বাড়ীওয়ালা হরদম তাগাদা দিচ্ছে।

আমি বললাম—আপনার বাপের বাড়ীতে খবর দেব? এখন কান্নার সময় না, ভেবে বলুন।

—সেখানে কোথায় যাব। সৎমা ও দুই বৈমাত্র ভাই, তারা আমাকে স্থান দেবে না।

—শ্বশুরবাড়ীতে খবর দিন তবে।

—এক বুড়ো জেঠশ্বশুর আছেন, তিনি একা থাকেন। রান্নাবান্না করেন, খান।

—কৃপণ?

—তা নয়। গরিব। দুই ছেলে ও দুই নাতি মারা গিয়েছে। কেউ নেই।

—চলে কিসে?

—কোন রকমে চলে। সামান্য দুটো ধান হয় জমিতে। লোকের চিঠিপত্র আর দলিল লিখে কিছু পান, সেও আজকাল আর চোখে দেখেন না। তিনি কি জায়গা দেবেন? তিনি তো আমার শ্বশুরের সঙ্গে এক সংসারে ছিলেন না। তিনি পৃথক হয়েছিলেন অনেকদিন আগে, আমার বিয়েরও আগে।

—আপনার স্বামীর বাড়ীঘর নিশ্চয়ই আছে?

—খোলার বাড়ী ছিল, মাটির দেয়াল। এতদিন আমরা বিদেশে, বাড়ীঘরের অবস্থা

কি রকম আছে কি জানি।

সব তথ্য সংগ্রহ করে এসে আবার পরামর্শ করতে বসি আমরা। এখানে রাখলে দেখা-শুনো করবে কে? তা ছাড়া, জায়গা ভাল না। হাটবাজার করে এনে দেবে, এমন লোক নেই। উঁকি মেরে কেউ দেখবে না। অনেক ভেবে জেঠশ্বশুরকেই টেলিগ্রাম করা গেল।

আমি বললাম—তাতে ফল কি হবে? তাঁর কি মাথাব্যথা পড়েছে, তিনি ছুটে আসবেন কোন্ দুঃখে?

মিঃ খাস্তগীর বললেন—তবে কি সৎমাকে খবর দেবেন?

—তাঁর দায় পড়েছে উত্তর দিতে।

—আপনি কি বলেন?

—আমার মাথায় কিছু আসছে না।

—চলুন, এখান থেকে মেয়েটিকে আমরা ডাক-বাংলায় নিয়ে যাই। এখানে একদিনও রাখা চলবে না। জায়গা খারাপ।

বাড়ীওয়ালাকে ডেকে জানা গেল কুড়ি টাকা বাড়ীভাড়া বাকি, মুদির দোকানেও টাকা কুড়ি—এই গেল চল্লিশ টাকা নগদ। তার পরে শ্বশুরবাড়ী পাঠানোর খরচ টাকা পনেরো—হাতে কিছু দেওয়া দরকার শ্রাদ্ধের খরচের জন্যে। একশ টাকা।

মোটরে করে বিকেলে মেয়েটিকে ডাকবাংলাতে আনা গেল। জিনিসপত্র সামান্যই ছিল—গরুর গাড়ীতে ডাকবাংলায় পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দেওয়া গেল। ওদিকের ঘরটি ওদের জন্যে ঠিক করে ওদের হবিষ্যের ব্যবস্থার জন্যে লোক পাঠানো গেল ভোজুডির বাজারে। গ্রাম থেকে একটি স্ত্রীলোক ঠিক করা গেল শৈলবালার কাছে দিনরাত থাকবে।

দুদিন, তিনদিন কেটে গেল। কা কস্য পরিবেদনা! না বাপের বাড়ী, না শ্বশুরবাড়ী—টেলিগ্রামের জবাব এল না কোথা থেকেও।

মিঃ খাস্তগীর বললেন—পুরুলিয়ায় হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারি ললিতবাবুকে একবার খবর দেওয়া যাবে? এ যে বিষম দায়ে পড়া গেল।

মিঃ মিশ্র বললেন—আমাদের ডাকবাংলায় থাকবার মেয়াদও ফুরিয়ে এসেছে তো। আমরাই বা ওঁকে নিয়ে এখন কি করি?

আমি বললাম—অনাথ-আশ্রম আছে না একটা ওখানে? বা ওই রকম কিছু?

মিঃ খাস্তগীর বললেন—খ্রীষ্টান মিশনারীদের। সে কথা বাদ দিন একেবারেই।

মহা ভাবনায় পড়া গেল। কারও মাথায় আসছে না কিছু। পরের মেয়ে নিয়ে এসে যে বিষম বিপদ দেখছি। শৈলবালা বেশ সেবাপরায়ণা, আমাদের জন্যে চা করে পাঠিয়ে দেয়, খাবার করে। ডাকবাংলায় রান্নাঘরে গিয়ে নিজে রান্নার তদারক করে। আর সব সময়ে যেন কাঁদে। ওর ওপর নিষ্ঠুর হওয়া যায় না, একটা কিছু উপায় করতে হবে ওর। অথচ কি ভাবে, কেউ বুঝতে পারছি না।

আরও তিনদিন কেটে গেল। বিদেশে আমরা এমন কিছু বেশি টাকা নিয়ে বেরুই নি, এখন শৈলবালার কি করা যায়? আমরা ডাকবাংলা থেকে চলে গেলে ওর উপায় কি হবে, কোথায় রেখে যাব ওকে, দিই বা কোথায় পাঠিয়ে? এখানে বেশিদিন রাখাও যায় না, কে কি বলবে।

মাঝগ্রামের এক বৃদ্ধ বৈষ্ণবের পরামর্শে আমরা তার সঙ্গে শৈলবালাকে তার জেঠ-শ্বশুরের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

হাতে সামান্য কিছু টাকাও দিয়ে দিলাম ওর স্বামীর শ্রাদ্ধশান্তির জন্যে। এই ছ সাত দিন ও ডাকবাংলার ঘরটাতে একটা ছোটখাটো সংসার পেতে বসেছিল—যাবার সময় বড় কান্নাকাটি করতে লাগল।

তার যেন যাবার ইচ্ছে নেই।

সে কি সত্যিই ভেবেছিল চিরকালের আশ্রয় হবে ওর এই ডাকবাংলায়—পথিপার্শ্বের ডাকবাংলায়? যে আশ্রয় ওর স্বামীর ঘরে পেলে না?

শৈলবালা ওর পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে মোটরে উঠছে। মোটরে ওকে বলরামপুর

পাঠানো হবে, সেখান থেকে ট্রেনে উঠবে।

সন্ধ্যাবেলা, পঞ্চমীর জ্যোৎস্না পড়েছে মাঠাবুরু শৈলশ্রেণীর শালবনে, করঞ্জাফুলের তেমনি মিষ্ট সুবাস বাতাসে—সেদিন নাকটিটাঁড়ের বনে, শোভা নদীর তীরের বন-ভূমিতে যেমন পেয়েছিলাম। মাদল বাজছে মাঝগ্রামের মহুয়া মদের ভাঁটিতে। কেমন জীবনের মধ্যে ও যাচ্ছে, কে ওকে আশ্রয় দেবে—এ সব কথা মনে না উঠে পারল না। চলে গেল ওদের মোটর।

পরদিন সকালে মিঃ সরকার এসে হাজির।

আমরা বললাম—কি মনে করে? হঠাৎ যে?

—না ওখানে আসব না। উপানন্দ মন্ডলের ব্যাপারে বুঝলাম যে এখানে চাকরি পোষাবে না। ফ্যামিলি না নিয়ে থাকলে আমার চলবে না। আর আনলে তো অমন বিপদ সবারই হতে পারে। আজই রিজাইন দিয়ে দেব অমন জায়গার চাকরিতে।

মিঃ সরকার সেই দিনই পুরুলিয়ায় চলে গেলেন, তাঁকে বলে বুঝিয়ে কিছুতে রাখা গেল না।

অসাধারণ

সীতানাথ ডাক্তারের দোকানে বসিয়াছিলাম। সকালবেলা। খবরের কাগজ এখনো আসিয়া পেঁাছে নাই—কারণ মফঃস্বল জায়গা। খবরের কাগজ না পেঁাছিলে যুদ্ধের আলোচনা ঠিক জমে না। অদূরবর্তী বাজারে প্রাভাতিক সওদা সারিয়া নবীন মুখুয্যে, শশধর মুহুরী, কেনারাম মুখুয্যে, মন্মথ মুখুয্যে, বলাই দাঁ প্রভৃতি ভদ্রলোক সীতানাথের ডাক্তারখানায় স্নানাহারের সময় পর্যন্ত রাজনীতি আলোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা কোন চাকুরী করেন না। দু-একজন পেনসনপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, এক-আধজনের বাপের পয়সা প্রচুর। ইঁহারা জার্মানি ও জাপানের সম্বন্ধে বহু ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্বন্ধে এমন কথাবার্তা বলেন, যাহা স্বয়ং হিটলার, চার্চিল ও তোজোরও অজ্ঞাত। হিটলার কি ভুল করেন, চার্চিলের কি করা উচিত ছিল, জাপান এমনটি না করিয়া যদি এমনটি করিত তাহা হইলে কি ঘটিত—এ সকল মূল্যবান উপদেশ সর্বদাই সেখানে উচ্চারিত হইতেছে।

বর্তমানে কেনারাম মুখুয্যে বলিতেছিলেন—আরে, এই তোমাকে বলি শোনো ভায়া। ভুলটা হিটলারের হোলো কোথায় শোনো। ডানকার্কের যুদ্ধের পরেই—

শশধর মুহুরী বলিয়া উঠিলেন—আঃ, আপনি ঐ এক শিখে রেখেচেন ডানকার্ক আর ডানকার্ক। আসল ভুল সেখানে নয়, আসল ভুল হলো—

এমন সময় একটি পুরুষের হাত ধরিয়া একজন স্ত্রীলোক ডাক্তারখানার বারান্দাতে উঠিয়া আসিল সম্মুখের রাস্তা হইতে। পুরুষটির বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মধ্যে যে কোন বয়েস হইতে পারে, রোগা, পরনে খাটো ময়লা ধুতি; মেয়েটির বয়েসও নিতান্ত কম নয়, তবে পুরুষটির অপেক্ষা অনেক কম, ত্রিশ বত্রিশের বেশি হইবে না। মেয়েটির পরনে তালিলাগানো শাড়ী, কিন্তু ময়লা নয়—মুখশ্রী একসময় বেশ ভালোই ছিল বোঝা যায়, দেহ খুব সম্ভবত অনাহারে ও ম্যালেরিয়ায় শীর্ণ।

মেয়েটি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিল—ও ডাক্তারবাবু—

সীতানাথ ডাক্তার উহাদের দিকে একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে চাহিয়া বলিলেন—কি চাও?

—বাবু, এঁকে একটুখানি দেখতি হবে।

সীতানাথ ডাক্তার বুঝিয়াছিলেন ইহাদের দ্বারা বিশেষ কোনো অর্থাগমের আশা নাই—যত বড় কঠিন অসুখই হউক না কেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত চেহারা। পরনে তো ওই কাপড়। মাথা তৈলাভাবে রুক্ষ। রোগীর মধ্যে গণ্য করিয়া উৎফুল্ল হইবার কোনো

কারণ নাই।

তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—হয়েচে কি?

মেয়েটি বলিল—হবে আর কি। ওঁর জ্বর ছাড়ে না আজ দুমাস! তার ওপর মেহ। শরীর একেবারে ভেঙে দিয়েচে। আমার উনি ছাড়া আর কেউ নেই। আপনি দয়া করে দেখুন।...বলিয়া মেয়েটি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—সরে এসো এদিকে—

পরে রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—হুঁ, দেখবো কি, এর মধ্যে অনেক রোগ। কদ্দিন এমন হয়েচে?

পুরুষটি এবার ক্ষীণস্বরে বলিল—তা বাবু অনেক দিন। আমি আজ তিন-চার মাস ভুগচি। আর এই কাশি, এ কিছুতি যাচ্ছে না—

মেয়েটি হাত তুলিয়া অধৈর্যের স্বরে বলিল—তুমি চুপ করো দিকিনি! খুব খ্যামোতা তোমার! আমার হাড় মাস জ্বালিয়ে খেলে তুমি—তিনমাস ওঁর অসুখ—

তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—ওঁর কথা শোনবেন না। ওঁর কি কিছু ঠিক থাকে? নিজের দিকে ওঁর কোনো খেয়াল নেই—এই শুনুন তবে আমার কাছে—

কথাটা শোনাইল এভাবের যেন লোকটি দার্শনিক কিংবা কবি, অথবা ব্রহ্মদর্শী—সাংসারিক তুচ্ছ বিষয়ে স্বভাবতই ইনি অনাসক্ত। বোধ হয় ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়াই সীতানাথ ডাক্তার পুরুষটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—তোমার গনোরিয়া হয়েচে কতদিন?

—তা বাবু চার-পাঁচ মাস হবে। সেবার যখন...

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি তো সব জানো কিনা! চুপ করো। না বাবু, দুবছর হয়ে গেল। আমার হাড় মাস ভাজা করে খেলে ওই মিন্সে। কি জ্বালায় যে পড়েচি আমি, মরণ হয়তো হাড় জুড়িয়ে যায় আমার।

কাহার মরণ হইলে তাহার হাড় জুড়ায়, কথার ভাবে ঠিক ধরিতে পারিলাম না।

সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—বাড়ী কোথায়?

মেয়েটি বলিল—বাড়ী এই ঝিটকিপোতায়। আমরা হাড়ি।

—ও! ঝিটকিপোতায় হাড়ির বাস আছে নাকি?

—না বাবু, দেশে দেশে ভেসে বেড়াচ্ছি, এই ওনারে নিয়ে। বিয়ে করা সোয়ামী, ফেলতে তো পারি নে। আজ দুটি বছর উনি বিছেনেয় পড়ে। উঠতি হাঁটতি পারেন না। কত অসুদ বিষুদ করলাম আমাদের দেশে ঘরে, যে যা বলে তাই করি কিন্তু কিছুতেই সারাতি পারলাম না, দিন দিন যেন মানুষ উঠতি পারে না, খেতি পারে না। তাই আজ বলি—ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাই—একটু দেখুন আপনি ভাল করে, আমার আর কেউ নেই—

আমি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম। এইবার বলিলাম—তোমার স্বামী কি কাজ করে?

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—কাজ! ওরে আমার কাজের শিরোমণি রে! ও করবে কাজ? সেদিন পুবের সুয্যি পশ্চিম পানে ওঠবে না?

পুরুষটি লজ্জিতভাবে বলিল—না বাবু কাজ আমি করি নে। সে ক্ষ্যামতা নেই তো করবো কি। ও-ই ধান ভেনে দাইগিরি করে সংসার চালায়। তা এই বাজারে বড্ড কষ্ট হয়েচে বাবু।

মেয়েটি বলিল তুমি থামবে বাপু, না বকে যাবে? বাবু শুনুন তবে বলি। কষ্ট দুক্ষুর বার্তা ও কি জানে। সংসারের কোন খোঁজ রাখে ও?

কৃতজ্ঞতার আবেগ বোধ হয় অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল পুরুষটির। সে পুনরায় নম্র স্বরে বলিল—তা যা বললে ও সে কথা সত্যি বটে। ও আমাকে জানতি দায় না। নিজি সব করবে। আমি তো খাটতি পারি নে—আমার এই ডান পাডা একটু খোঁড়া, হাঁটতি পারি নে—এই দেখুন বাবু এই পাডা—

মেয়েটি আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—নাও আর বাবুদের সামনে তোমার পা বার করতি হবে না—

কিন্তু দেখিলাম মেয়েটির চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে। এই গনোরিয়া-গ্রস্ত খোঁড়া অকর্মণ্য বৃদ্ধের প্রতি এতটা দরদ ওর। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—তুমি ধাইয়ের কাজ জানো বললে না?

পুরুষটি এ-কথার উত্তর দিল। বলিল—খুব ভাল ধাই! তা যে বাড়ী যাবে, এক কাঠা করে চাল, একখানা করে কাপড়, একটি করে টাকা—ও-ই খরচ করে আমায় চিকিচ্ছে করাচ্চে বাবু।

মেয়েটি উহাকে থামাইয়া বলিল—তুমি চুপ করো দিকিনি! তুমি কি জানো ও সবের? বাবু, ধাইয়ের রোজগার আগে চলতো ভালই। এখন আপনাদের এখানে হাসপাতাল হয়েছে পোয়াতিদের জন্যি। সব লোক এখানে আসে। আমাদের কাছে কেডা যাবে? ধান ভেনে যা হয়। দু মন ধান ভানলি পাঁচ কাঠা চাল পাওয়া যায়—কিন্তু বাবু, অসুখে ভুগে ভুগে আমার গতর গিয়েচে, আর তেমন খাটতি পারি নে। ধান ভানা বড্ড খাটুনির কাজ। যেদিন ধান ভানি, আজকাল রাত্তিরি বড্ড পা কামড়ায়—

আমি বলিলাম—তোমার কে কে আছে আর?

মেয়েটি সাফ উত্তর দিল—যম।

—জাতে হাড়ি বললে না?

—হ্যাঁ বাবু।

—ঝিটকিপোতা থেকে এলে কি করে? সে তো অনেক দূর।

—নৌকো করে এ্যালাম বাবু।

—ভাড়াটে নৌকো?

—অনেক কেঁদে হাতে পায়ে ধরে তেরো গন্ডা পয়সা ঠিক হয়েল। ওই আমাদের গাঁয়ের রতন মাজি। আমি তাকে ধরম বাপ বলে ডেকেচি।

—ধানের চাষ কর?

—না বাবু, ঘর-দোর নেই তার ধানের জমি। বিচুলির ছাউনি একখানা ঘর, তা এবার খসে পড়ছে। না খুঁচি দিলি এবার বর্ষায় সে ঘরে থাকা যাবে না।

বেলা হইয়াছিল। সেদিন চলিয়া আসিলাম। ইহার পর হইতে প্রায়ই দুদিন অন্তর মেয়েটি উহার স্বামীর হাত ধরিয়া ডাক্তারখানায় হাজির হয়। কখনো ঔষধের দাম কমাইবার জন্য সীতানাথ ডাক্তারের হাতে পায়ে পড়ে, কোনোদিন স্বামীর সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করে, কবে রোগ সারিবে, নৌকা ভাড়া দিয়া আর পারে না সে—ইত্যাদি।

দেখিয়া শুনিয়া সীতানাথ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওকে কেমন দেখেন? ওর রোগ সারবে?

সীতানাথ ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—বিশ্বাস তো হয় না। নানান উপসর্গ। ওর শরীরে কিছু নেই—তবে চেষ্টা করচি, এই যা।

অবশ্য উহাদের সাক্ষাতে একথা হয় নাই।

মাসখানেক পরে একদিন ডাক্তারখানায় বসিয়া আছি, মেয়েটি আরও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর কিছুদিন এমনধারা চলিলে ইহারই চিকিৎসার প্রয়োজন হইবে। হয়তো নিজে আধপেটা খাইয়া স্বামীর ঔষধপথ্য ও নৌকাভাড়া যোগাইতেছে। পরনের বস্ত্রও জীর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে। সেদিনের কাজ শেষ করিয়া তাহারা যখন চলিয়া যায় তখন মেয়েটিকে ডাকিয়া বলিলাম—শোনো এদিকে!

—কি বাবু?

—ধাইয়ের কাজ করতে পারবে?

সে হাসিয়া বলিল—ঐ কাজই তো করি বাবু। তা আর পারবো না?

আমি উহাদের সঙ্গে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। উদ্দেশ্য আমার বাসাটা তাহাকে চিনাইয়া দেওয়া। সে মাসেই আমার বাসাতে ধাত্রীর প্রয়োজন উপস্থিত হইবে! পথে মেয়েটি বলিল—দিন না বাবু একটা কাজ জুটিয়ে। বহু কষ্টে পড়েচি এনাকে নিয়ে। এক এক শিশি ওষুধ পাঁচ সিকে দেড় টাকা। আমার রোজগার বড্ড মন্দা হয়ে গিয়েচে। আর চালাতি পারচি নে। দিন একটা জুটিয়ে, যা দেবে তাই নেবো। এক কাঠা চাল,

একখানা কাপড়, আর না হয় আট আনা পয়সা দেবে—তাই নেবো। আমার খাঁই নেই বাবু অন্য ধাইয়ের মত। তা বাবু আমি রাত্তির আঁতুড়ে থাকবো, সেঁক তাপ করবো, ছাড়া কাপড় কাচবো—

অনুনয়ের সুরে বলিল—দিন একটা কাজ জুটিয়ে—

আমি বলিলাম—ওই আমার বাসা। আর দিন আষ্টেক পরে আমার বাসাতে দরকার হবে ধাইয়ের। চলো আমার সঙ্গে, দেখিয়ে আনি। ওকে এখানে বসিয়ে রাখো।... পুরুষটিকে বলিলাম—তুমি এই গাছতলায় ছায়ায় বসে থাকো, বুঝলে?

বাড়ীতে আনিয়া ধাইকে দেখানো হইল। কিন্তু বাড়ীতে ও ধাই পছন্দ হইল না, অজুহাত অবশ্য পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত ধাই, উহাদের কি জ্ঞান আছে—ইত্যাদি। কিন্তু আমার সন্দেহ হইল আসল কারণ, মেয়েটি দেখিতে ভাল এবং আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি বলিয়া।

পরদিন আবার রাস্তায় দেখা তাহাদের সঙ্গে। ডাক্তারখানায় দুজনে চলিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া মেয়েটি ডাকিয়া বলিল—ও বাবু, শুনুন—

আমি তাহার কিছু না করিতে পারিয়া লজ্জিত ছিলাম। বলিলাম—বলো—

—আপনার বাড়ীতে হোলো না?

—ইয়ে—না—ওদের সঙ্গে কমলা ধাইয়ের কথাবার্তা আগেই হয়ে গিয়েচে কি না। তাই—

—যাক্ গে বাবু। আপনি অন্য এক জায়গায় জুটিয়ে দিন না?

—দেখবো। আরও এক জায়গায় সন্ধান আছে আমার।

—দেখুন। তিনিই দয়া করবেন। চরিতামৃতে প্রভু বলেচেন—

হাড়ির মেয়ের মুখে এ-কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম—তুমি চৈতন্য-চরিতামৃত পড়? লেখাপড়া জান নাকি?

পুরুষ বলিল—ও জানে।

—বইখানা আছে নাকি তোমাদের বাড়ী?

—আছে বাবু, ও রোজ পড়ে আমাকে শোনায়। বই পড়ে আর কাঁদে।

মেয়েটি সলজ্জ প্রতিবাদের সুরে বলিল—তোমার অত ব্যাখ্যানা করতি হবে না, চুপ কর। না বাবু, ওর কথা শোনবেন না। পড়ি একটু একটু সন্দে বেলাডা। তা ও বই পড়ে বোজবার মত অদেষ্ট কি আমাদের আছে বাবু?

—লেখাপড়া শিখলে কোথায়?

উহার স্বামী বলিল—ওর মামার বাড়ী ছেল ধরমপুকুর। শুয়োরের ব্যবসা ছেল মস্ত। অবস্থাও ছেল ভাল। এখন তাদের কেউ নেই, মরে হেজে গিয়েচে—নইলে আজ এমন দুর্দশা হবে কেন ওর বাবু? ও ছেলেবেলায় মামাদের কাছে থেকে ইস্কুলি নেকাপড়া করেল।

—কি ইস্কুল?

বৌটি ইহার উত্তর দিল, কারণ ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পুরুষটির সাধ্যাতীত। অতি জটিল প্রশ্ন।

—অপার প্রাইমারি ইস্কুল বাবু।

—পাশ করেছিলে?

—হুঁ। এখানে এসে পরীক্ষা দিয়ে গিইছিলাম।

উহার স্বামী সপ্রশংস মুগ্ধ-দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—বাবু, ও পাশ করে দু টাকা ইস্কলার্সি পেয়েল।

বৌ ধমক দিয়া উঠিল—তুমি চুপ করো দিকিনি।

পুরুষটি তখনও ঝোঁক সামলাইতে পারে নাই। বলিল—বাবু, আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে আর নেকাপড়া হোল না ওর। মামারাও মরে হেজে গেল। ও যেমন মেয়ে, আমার হয়েচে সেই যারে বলে—বানরের গলায় মুক্তোর মালা। সব অদেষ্টের ফল আর কি। আমি ওরে খেতি দেবো কি, আমি অসুখে পড়ে পর্যন্ত ওই আমারে খেতি দ্যায়। আমার এই

চিকিচ্ছেপত্তর ওই সব চালাচ্চে! আজকাল রোজগার নেই ওর—পেট ভরে দুটো খেতিও পায় না—আমারে বলে, তুমি সেঁর উঠলি আমার—

বৌ আবার কড়া ধমক দিয়া উঠিল—আবার! বাবুর সামনে ওই সব কথা? চলো বাড়ী তুমি—ঝাঁটা মারবো তোমার মুখি—তোমার খুব মুরোদ! মুরোদের আবার ব্যাখ্যানা হচ্চে—লজ্জা করে না তোমার?

আমি মধ্যস্থতা করিয়া বলিলাম—কেন, ও তো ভালই বলচে। ওর যা ভাল লেগেচে, ভাল বলবে না?

বৌ সলজ্জ সুরে বলিল—না বাবু, যেখানে সেখানে ওসব কথা কে বলতে বলেছে ওকে?

—তা বলুক। কোনো দোষ হয় নি।

—বাবু, আমারে দেন একটা কাজ জুটিয়ে—

—চেষ্টা করবো। একটু অপেক্ষা করো, দেখি দু-একদিন।

—কাজ না পেলি বড্ড কষ্ট হচ্চে! ধান ভানতি শরীর আর বয় না। দু-মন করে ধান না ভানলি এই যুদ্ধুর বাজারে দুটো লোকের খাওয়া হয়? তাও বাবু শুধু খাওয়া। পরা এ থেকে হয় না। একখানি কাপড় ঠেকেচে। একটা আঁতুড়ের কাজ জুটলি তবু একখান কাপড় পাবো।

কয়েকদিন ধরিয়া তাহাদের আর দেখিলাম না। কাজও কিছু জুটাইতে পারা গেল না। কাহার বাড়ীতে কে অন্তঃসত্ত্বা আছে এ সংবাদ জোগাড় করা আমার কর্ম নয় দেখিলাম।

এই সময় মন্বন্তর শুরু হইয়া গেল। চাউলের দাম আগুন হইয়া উঠিতেছে দিন দিন। আমাদের এই ক্ষুদ্র টাউনের আশপাশের পল্লীগ্রাম হইতে দলে দলে ক্ষুধার্ত নরনারী হাঁড়ি ও মালসা হাতে ফ্যান ভিক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল ফ্যানও অমিল। দশবিশ সের ফ্যান কোন গৃহস্থবাড়ীতে থাকে না, যাহা থাকে তাহা প্রথম মহড়াতেই ক্ষুধা-ক্লিষ্ট নরনারীদের মধ্যে বিলি হইয়া যায়—একটু বেলায় যাহারা আসে, তাহাদের শুধু-হাতে ফিরিতে হয়। লোক দু-একটি করিয়া মরিতে শুরু করিল তাদের মধ্যে। টাউনের কুণ্ডু বাবুরা ও দাঁ বাবুরা প্রতিদিন একশত দেড়শত লোককে খিচুড়ি খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু আর্ধালঙ্গ অনশনক্লিষ্ট দিশাহারা নরনারীদের সংখ্যার তুলনায় তাহা নিতান্তই অল্প। ইহার মধ্যে আবার ত্রিপুরা জেলা হইতে বহু নরনারী আসিয়া কোথা হইতে জুটিল, তাহাদের কথা ভাল বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া যে গৃহস্থের দোরে যায়, তথা হইতে তাহারা বিতাড়িত হয়, কোথাও তাহারা তেমন সহানুভূতি পায় না।

এই মহাদুর্যোগের হিড়িকে কত লোককে তলাইয়া যাইতে দেখিলাম। কতবার মনে ভাবিয়াছি ওই মেয়েটির কথা। ধান ভানিয়া রুগ্ন স্বামীর চিকিৎসা চালাইত। নৌকা ভাড়া করিয়া হাত ধরিয়া লইয়া আসিত ডাক্তারখানায়। চৈতন্যচরিতামৃতের কথা বলিত। তাহাদের আর পথে ঘাটে দেখি নাই অনেকদিন। সীতানাথ ডাক্তারকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম। সীতানাথ বলিলেন—না, তারা অনেকদিন আসে নি। আর আসবে কি, এই তো কাণ্ড। ওষুধের দাম দিতে পারে না—কশিশি ওষুধের দাম এখনও বাকী।...

অনেকদিন উহাদের দেখি নাই। প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছি।

ভাদ্রমাসের দিকে আমাদের মহকুমার রিলিফ কমিটির যত্নে লঙ্গরখানা খুলা হইল। সেখানে প্রত্যহ বহু দুঃস্থ নরনারী লঙ্গরখানার খিচুড়ি খাইতে আসিত। উহাদের মধ্যে একদিন আবার মেয়েটিকে দেখিলাম। একটা মালসায় করিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছে?

আমি ডাকিয়া বলিলাম—তুমি কোথায় এসেছিলে?

আমায় দেখিয়া সে লজ্জিত হইল।

বলিল—এই—

—তোমার স্বামী কোথায়?

—ওই পুরনো ডাকঘরের পেছনে বটতলায় আজকাল হাঁটতি পারে না মোটে।

—চলো দেখে আসি।

কৌতূহল হইল দেখিবার জন্য, তাই গিয়াছিলাম! গিয়া মনে হইল না-আসিলে আমাকে বড় ঠকিতে হইত—কারণ যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা সচরাচর চোখে পড়ে না।

পুরনো পোষ্টাফিসের পিছনে যেখানে গভর্ণমেণ্টের কলেরা ওয়ার্ডের ঘর, তার সামনে বটতলায় এক ছেঁড়া চাটাই পাতিয়া বৌ-টির খোঁড়া স্বামী শুইয়া আছে। মনে হইল লোকটা চাটাইয়ের সঙ্গে মিশিয়া আছে, এত রুগ্ন। মেয়েটি তার পাশে বসিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি তাহাকে খাওয়াইতেছে। দুপুর বেলা। রাস্তা দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিতেছে. কেহ চাহিয়া দেখিতেছে, কেহ দেখিতেছে না। খাওয়ানো শেষ হইলে সে কলেরা ওয়ার্ডের টিউবওয়েল হইতে শতচ্ছিন্ন শাড়ির আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া স্বামীর মুখে নিংড়াইয়া দিল। লোকটা হাঁ করিয়া দু ঢোঁক জল গিলিয়া বলিল—আর একটু খাবো—

মেয়েটি আবার গেল টিউবওয়েলের কাছে, আবার শাড়ির আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া ওর মুখে দিল। আমি কখনো এমন দৃশ্য দেখি নাই।

বলিলাম—অমন করে জল আনচো কেন?

মেয়েটি বাঁ হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল—ঘটি বাটি কিছু নেই। কিসে জল আনি?

—কেন মালসাটা?

সে মালসাটা তুলিয়া আমার কাছে আনিয়া দেখাইল। বলিল—সবটা খেতে পারে নি। আধ মালসা রয়েচে। রাত্তিরে দেবো। খাওয়া কমে গিয়েচে একেবারে।

তারপর মালসাটা যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া বলিল—বড্ড কষ্ট হয়েছে বাবু—দিন না একটা কাজটাজ জুটিয়ে? এক কাঠা চাল শুধু—খুব কমের মধ্যে করে দেবো—

এই তাহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ।

কাঠ বিক্রি বুড়ো

আমি গাছ বিক্রি পছন্দ করি না। কোনো গাছ যদি কেউ কাটে তবে আমার বড় কষ্ট হয়। লোককে পরামর্শ দিই গাছপালা দেশের সম্পদ, ধরণীর শ্রী ওরা বাড়িয়েচে ফুলে. ফলে. ছায়ায় সৌন্দর্যে—ওদেরই ডালে ডালে দিন রাত কত বিহগ-কাকলী, ওদের কেটে নষ্ট কোরো না।

সুতরাং যখন গ্রামের ঘাটে কাঠের নৌকো এসে লাগলো, আমি সেটা পছন্দ করি নি।

একদিন সকালে বসে লিখচি, একজন দাড়িওয়ালা বুড়ো মুসলমান এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে আমায় সেলাম করলে হাত তুলে।

বললাম—কি চাই?

—বাবুর গাছ বিক্রি আছে, বিক্রি করবেন?

—কি গাছ?

—বাবুর বাড়ীর পেছনে বিলিতি চট্‌কা আছে. বাগানে শিশু আছে. কলুচট্‌কা আছে। লোকটার কথায় দক্ষিণের টান। বললাম—বাড়ী দক্ষিণে?

—হ্যাঁ বাবু, বসিরহাটের ওপার। টাকী শ্রীপুর।

—গাছ কিনতে এসেচ নাকি?

—বাবু, আমাদের নৌকো এসেচে ঘাটে। কাঠ বোঝাই হয়ে কলকাতায় যাবে। আপনার এদিকে যদি বাগান-টাগান পাওয়া যায় কিনবো।

বাগান কেনা শুনে আমি আগেই চটেচি, সুতরাং লোকটার সঙ্গে ভালো করে কথা বললাম না।

ও বললে—বাবু, গাছ বেচবেন?

—না।

—ভালো দর দেবো বাবু।

—কি রকম দর শুনি?

—তা বাবু আপনার বড় চট্‌কা গাছটা চল্লিশ টাকা দর দেবো।

আমি আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। এ অঞ্চলে ও গাছের দাম যুদ্ধের আগে একজন বলেছিল ছ টাকা। যুদ্ধের মধ্যে ওর দাম উঠলো চোদ্দ টাকা। ওটাকেই সর্বোচ্চ দাম বলে আমি ভেবেছিলাম। একটা বুনো চট্‌কা গাছের দাম চোদ্দ টাকা—ওই যথেষ্ট। আশাতিরিক্ত দর। আর এখন এ বলে কি!

চল্লিশ টাকা একটা চট্‌কা গাছের দাম—এ কথা পাঁচ বছর আগেও কেউ কানে শোনে নি। আমার বাগান-সংলগ্ন জমিতে এরকম চট্‌কা গাছ পাঁচ-ছটা আছে, বেশ মোটা পয়সা পেতে পারি দেখচি গাছ কটা বিক্রি করলে।

হঠাৎ মনে পড়লো নেপল্‌স উপসাগরের তীরে কোন এক বড় গাছতলায় গিনি বসে বই লিখতেন, নীল জলরাশি তাঁর চোখের সামনে দূর স্বপ্ন জগতের বাণী ভাসিয়ে আনতো, দৃশ্যমান জগতের ওপারে যে বৃহত্তর স্বপ্ন-জগৎ দিক থেকে দিগন্তরে বিস্তৃত। আমি একটা রঙীন ছবিতে নেপল্‌স উপসাগর তীরের এই ধরনের গাছের ছবি দেখেছিলাম। চট্‌কা গাছগুলো দেখতে ঠিক তেমনি। মনে মনে আমি ওদের নাম দিয়েছিলাম গিনির গাছ। টাকার জন্যে সে গাছগুলো কেটে উড়িয়ে দেবো?

লোকটাকে বললাম—না হে, ও গাছ বিক্রি হবে না।

সেই থেকেই কাঠের নৌকা নিয়ে লোকটা আমাদের গ্রামের ঘাটে রয়ে গেল। দু-তিনটি বড় বড় বাগান কিনে তার সমস্ত গাছ কাটিয়ে গুঁড়িগুলো নৌকা বোঝাই করতে লাগলো—ডালপালা সস্তাদরে গ্রামের লোকজন জ্বালানির জন্যে কিনে নিলে ওর কাছ থেকে। রায়েদের চন্ডীমন্ডপটা অনেকদিন থেকে পোড়ো, ভূতের বাসা হয়ে আছে—কারণ একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া রায়-বাড়ীতে বর্তমানে আর কেউ থাকে না। লোকটা রায়-কাকাকে বলে সেই চন্ডীমন্ডপের একপাশে আছে, আরও দুটি সংগী নিয়ে—চন্ডীমন্ডপের উত্তর দেওয়ালের গায়ে বাইরের দিকে একখানা খেজুর-পাতার চালা উঠিয়ে নিয়ে সেখানেই রান্না করে খায়। একটা বাঁশের তিকড়িতে হাঁড়িকুড়ি রাখে।

গাছগুলো কেটে ফেলচে গ্রামের ছায়াসম্পদ ও শ্রীকে নষ্ট করে—এজন্যে কাঠ-বিক্রি বুড়োকে আমি পছন্দ করতাম না। ওর সঙ্গে বেশি কথাও বলতাম না।

নদীর ধারে ওদের নৌকো থাকে, যেখানে নদীর পাড় খুব ঢালু, বড় বড় উলু ঘাসের বন, ভাঁট বন, পট্‌পটি গাছ—সেখানে ওদেরই কাটা এক কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে থাকি বিকেলে, বেশ ফাঁকা জায়গা, অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়। নীল আকাশের নিঃশব্দ বাণীর মত নেমে আসে অপরাহ্ণের শান্তি।

কাঠ-বিক্রি বুড়ো আমার কাছে আসে নৌকো থেকে নেমে।

আমি বলি—আর কতদিন আছো? গাছগুলো তো দেশের সাবড়ালে।

আমি কি বলচি ও বুঝতে পারে না। গাছগুলো সাবাড় করলে ক্ষতি যে কি তা ওর বোঝবার বুদ্ধি নেই। ও বললে—না বাবু, কি আর এমন লাভই বা হবে, বড্ড খরচ পড়ে যাচ্ছে।

—কিসের খরচ?

—এই জন-খরচ, কাটাই খরচ।

—কলকাতায় কি দর বিক্রি হে?

—আজ্ঞে সাড়ে তিন টাকা কিউবিক ফুট। মিথ্যে কথা বলবো না আপনার কাছে।

লোকটা আর কিছু ইংরেজী জানুক আর না জানুক কিউবিক ফুটের মাপটা জানে। কারণ ওই করেই খায়। তাছাড়া ওকে দেখে আমার মনে হয় লোকটা সরল, সাদাসিদে। কুটিল, ধূর্ত ব্যবসাদার নয়। ও আমায় তামাক সেজে এক একদিন খাওয়ায়। সুখদুঃখের দুটো কথা বলে।

ক্রমে যত দেখি বুড়ো বড় বড় বাগান কেটে উড়িয়ে দিচ্ছে, ততই ওর ওপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মে। পয়সার জন্যে এরা সব পারে।

রাস্তাঘাটে দেখা হোলে ভালো করে কথা বলি নে।

বুড়ো কিন্তু যেচে কথা বলতে আসে আমার সঙ্গে। প্রায় তিনচার মাসের বেশি আমাদের গ্রামে আছে. গ্রামের সকলের নাম-ধাম ভালো করেই জেনে ফেলেচে। কে কোথায় কাজ করে. কত মাইনে পায়. কার কি রকম অবস্থা এ সব ওর জানা হয়ে গিয়েচে। মাঝে মাঝে আমার বাড়ী এসে সন্ধ্যার সময় বসে। তামাক খায়, প্রতিবেশীর মত গল্প করে। একদিন আমায় বললে—বাবু বুঝি বই লেখেন।

—হ্যাঁ।

—বই ছাপান কোথায়?

—কলকাতায়।

—কত খরচ পড়ে?

—পাঁচ-ছশো, হাজার।

—তা বাবু আপনার মত আমাদের যদি হোত। চিরজীবনটা কষ্ট করেই কাটলো। একটা ছেলে আছে. জমিদারি কাছারিতে কাজ করে টাকির বাবুদের। আট টাকা মাইনে পায়। বাবুরা ওকে বড় ভালোবাসে। আবদুল না হলে কোন কাজ হবে না লায়েব-বাবুর। সাইকেলের পিছনে তুলে নিয়ে সাতক্ষীরে যায় মোকদ্দমার দিন থাকলি। আর বছর পুজোর সময় বাড়ী এলো, তা ডিম এনেলো চার কুড়ি। আর গাওয়া ঘি—

বুড়ো দিব্যি গল্প জমিয়ে বসে। তামাক খায়। কিছুক্ষণ পরে আবার চলে যায়।

মাঝে মাঝে ওকে জিজ্ঞাসা করি—কেমন লাভ হবে এবার?

—কি জানি বাবু?

—অনেক গাছ তো কাটলে।

—ওতে কি হয় বাবু—এখনো অনেক গাছ কাটতি হবে।

—মোটা টাকা লাভ করবে এবার।

—দোয়া করুন বাবু, তাই যেন হয়। কনটোলের কাপড় একখানা দিতি পারেন বাবু, নইলে ন্যাংটা হতি হবে।

অনেকদিন ধরে ওর সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। বুড়োও নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে আমিও থাকি নিজের কাজে ব্যস্ত। এমন কি ওর কাছে কিছু ডালপালা কিনেছিলাম জ্বালানির জন্যে, তার দাম নিতেও এল না।

এই সময় আমাদের গ্রামে আমাদের এক তরুণ প্রতিবেশী টাইফয়েড জ্বরে পড়লো। তার চাষবাস আছে. বাজারে ছোট একখানা ফলের দোকান আছে, স্ত্রী ও পাঁচটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে।

রোগ দিন দিন বেড়ে ক্রমে বাঁকা পথ ধরলো। আমরা পাড়ার সবাই রাত জেগে দেখাশুনো করি. দু-তিনটে ছোকরা আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী দূরের শহর থেকে কখনো ওষুধ, কখনো ডাক্তার. কখনো ফল কখনো বরফ আনতে দিনে রাতে চার-পাঁচবার ছুটোছুটি করে। তরুণী স্ত্রী ও ছেলেমেয়েগুলির মুখের দিকে চেয়ে গ্রামের লোকেরা কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে গ্রহণ করে না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না।

চব্বিশদিন জ্বরভোগের পর রোগী মারা গেল। গ্রামের মেয়েরা চার-পাঁচদিন ধরে ব্যস্ত রইল সদ্যবিধবা মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতে। পুরুষেরা ব্যবস্থা করতে লাগলেন ওদের বিষয় আশয় কি হবে চাষবাসের কি বন্দোবস্ত করা যায়।

কান্নাকাটির গোলমালে দিন দশ বারো কেটে গেলে একদিন সন্ধ্যাবেলায় একটা দৃশ্য দেখলুম, যা আমার কাছে এত ভাল লাগলো যে শুধু যেন সেই ঘটনাটার কথা বলতেই এ গল্পের অবতারণা।

বেলা আর নেই. ছিপগুলি নিয়ে পুকুর থেকে ফিরচি মাছ ধরে. ওদেরই বাড়ীর পাশ

দিয়ে দেখি যে সেই কাঠ-বিক্রি বুড়ো মুসলমান ওদের উঠোনে বসে তরুণী বিধবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। রাস্তার ধারেই ওদের রান্নাঘরের ছেঁচতলা, প্রতিবেশীর স্ত্রীটি বসে কি কাজ করচে রান্নাঘরের দাওয়ায় আর বুড়ো বসে আছে ছেঁচতলায়। শুনলাম ও বলচে—সব দিকই দেখুন মা ঠাকরোন, বেঁচে চেরকাল কেউ থাকে না। তিনি অল্প বয়সে গিয়েচেন এই হোল আসল কষ্ট। তা আপনার বাচ্চাকাচ্চাদের মুখির দিকি চেয়ে আপনি কোমর বাঁধুন। নইলি আজ আপনি অস্থির হলি, ওরা কোথায় দাঁড়াবে মা ঠাকরোন? চোকির জল আর ফ্যালবেন না—আপনার চোকি জল দেখলি বুক ফেটে যায়—

আমি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে গিয়েচি। দেখি যে বুড়ো মুসলমান ময়লা গামছার খুঁটে নিজের চোখের জল মুছে ফেলচে।

এর চেয়ে কোনো অপূর্বতর দৃশ্যের কল্পনা আমি করতে পারিনে।

সেই সন্ধ্যায় একটি অতি মধুর গীতিকাব্যের মত মনে হোল এর উদার আবেদন।

সুলেখা

অজ পাড়াগাঁয়ের পথে যখন গাড়ী ঢুকলো তখন সুলেখার কান্না এল। এই সে কলকাতায় ইস্কুলে-কলেজে পড়েছিল? এই পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী হবে, যত অশিক্ষিতাদের মাঝখানে দিন কাটাতে হবে। কলকাতার নীলিমাদের বাড়ী গিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় চায়ের আড্ডা, সেখানে জগদীশ বড়ুয়া ও হিরন্ময় মিত্র সম্বন্ধে আলোচনা, ভয়েল কাপড়ের জরির ধারে কি রঙের পাড় সেলাই হবে এ-সম্বন্ধে গভীর গবেষণা, গৌরীদের বাড়ী গিয়ে রেডিওতে নতুন নতুন গান শোনা—সব শেষ হয়ে গেল। গানের সে ভীষণ ভক্ত। ভাল গান শুনতে পেলে আর কিছু সে চায় না।

এ সবের এই পরিণতি?

এই জন্যে কাকা তাকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন? না দিলেও পারতেন। আরও অল্প-বয়সে বিয়ে দিলেও চলতো। তার চোখ ফোটবার আগেই। কথাটা সে কাউকে বলতেও পারলে না, বলতে পারলে বোঝা নেমে যেত অনেক।

স্বামীকে তার পছন্দ হয়েছিল।

স্বামী শ্যামবর্ণ, অল্প বয়স। বি-এ পাশও করেচেন। কিন্তু হোলে কি হবে, তিনি বিদেশে চাকরী করেন,—গল্প-গুজব করবার জন্যে তাঁকে পাওয়া যাবে না সব-সময়। অশিক্ষিতাদের মধ্যে অজ পাড়াগাঁয়ে একা-একাই দিন কাটাতে হবে। মরে যাবে সে। নীলিমা কত দূরে পড়ে রইল, ও এবার আই-এ পাশ করবে—সামনে কত আনন্দভরা মুক্ত জীবন!

সে আটকে গেল, ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল-ঝাঁঝির দামে। জীবনের গতি ওর বন্ধ হয়ে গেল।

সন্ধ্যা হয়েচে......

একটি জীর্ণ একতলা বাড়ীর সামনে ওদের গাড়ী এসে পেঁছিলো। কতগুলো প্রাচীনা, কতকগুলো পাড়াগেঁয়ে-বৌ, তাদের মুখে চোখে না আছে বুদ্ধির দীপ্তি, না আছে কিছু, তারাই এসে সুলেখার চারিধারে ভিড় জমালে। কলকাতার বাসাতেই বৌভাত হয়ে গিয়েছিল। কোনো আচার-অনুষ্ঠান বাকি ছিল না, থাকলে আরও বিরক্তিকর হয়ে উঠতো ব্যাপারটা।

স্বামীর ছুটি নেই। তিনি তাকে পৈতৃক-বাড়ীতে প্রাচীনাদের হাতে পেঁছে দিয়েই সরে পড়লেন। মিলিটারি চাকরি, বিশেষ ছুটিছাটা নেই। যদি সময় পান, পুজোর সময় আসবেন বলে গেলেন।

সমীর চলে গেলে, সুলেখা কান্নায় ভেঙে পড়লো। একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেল সে। কিভাবে দিন কাটবে এখানে বুড়িদের মধ্যে? যারা বাইরের জগতের কোনো সংবাদ রাখে না এমন তিনকাল-গিয়ে-এককালে-ঠেকা দন্তহীন বুড়ীদের মধ্যে।

টাকা ছিল না কাকার। নতুবা শহরে বিবাহ হোতো।

যাক সে কথা। ছেলে দেখে বিয়ে দেওয়া। ছেলে সত্যিই ভালো। স্বামীকে সে গর-পছন্দ করে নি। ভালো ছেলে, পাশকরা, স্বাস্থ্যবান। গ্রামের বাড়ী জীর্ণ বটে, কিন্তু বেশ বড়। অনেক নাকি জায়গা জমি আছে, প্রজাপত্তর আছে, আগান-বাগান, পুকুর, বাঁশঝাড় আছে। বনেদি সেকেলে গৃহস্থ।

তবে ওই যা কথা, সেকেলে—একেবারে সেকেলে।

শাশুড়ি সুলেখাকে দিয়েচেন একছড়া ভারি সেকেলে মুড়োক-মালা হার। দিয়ে বলেছিলেন—বৌমা, বড় পয়মন্ত জিনিসটা। আমার শাশুড়ি আমাকে এই হার দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, আমি তোমাকে দিলাম আবার। তুমি আবার দিও তোমার ছেলের বৌকে—জন্মোএইস্ত্রী হও, আমার মাথায় যত চুল আছে ততদিন সমীর বেঁচে থাকুক!

সুলেখা শাশুড়ির পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। হারছড়াটা ভারি বটে, কিন্তু একালে ও-হার কেউ পরে? গৌরী কি ভাববে, কলেজের অনুদি কি ভাববে, যদি ও আজ মুড়কি-মালা হার গলায় দিয়ে কলকাতায় গিয়ে হাজির হয়?

দিন পাঁচ-ছয় কেটে গেল।

সুলেখাকে ভোরে উঠে কাজকর্মে বড়-জা নীরদাকে সাহায্য করতে হয়। অবিশ্যি নতুন বউ বলে এখনো কাজের ভার তেমন ঘাড়ে চাপে নি, কিন্তু নীরদাকে দিয়ে সে বুঝতে পারে এ-সংসারে পুরনো বউ হয়ে গেলে কি ধরনের খাটুনিটা আশা করা যায়।

নীরদা উদয়াস্ত খাটে, টিন-টিন ধান সেদ্ধ করে, বোঝা-বোঝা ক্ষার কাচে, খই মুড়ি ভাজে, দু-বেলা রান্না করতে আসে, এখন ওরা একবেলার ভার সুলেখার উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টায় আছে বোধ হয়। নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় বলচে না।

সুলেখা রাঁধতে জানে না যে তা নয়—কিন্তু গেঁয়ো রান্না চচ্চড়ি, সুক্তুনি, মোচার ঘণ্ট, ঝালের ঝোল, বড়ির টক—এসব সে রাঁধতে জানে না। তাছাড়া, ভালোও লাগে না এসব তার। এ-ভাবে জীবন নষ্ট করার কি মানে হয়?

সুলেখা সুন্দরী মেয়ে, কলেজের থিয়েটারে গতবার মালিনীর পার্ট নিয়েছিল। সুশ্রী চেহারার জন্যে আর চমৎকার গানের গলার জন্যে যা মানিয়েছিল ওকে! গৌরীর মা টিসু-শাড়ি পরিয়ে, সোনার গহনা দিয়ে, কপালে অলকাতিলকা এঁকে ওকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন—ইংরেজী অধ্যাপিকা তরুণী ঊষাদি গ্রিন-রুমে এসে ওকে কিভাবে অভিনন্দিত করলেন—এসব কথা তো আর বছর রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের দিনের!

আজ মনে হচ্ছে কত কাল...

সে-সব দিন শেষ হয়ে গেল।

এর চেয়ে তার না-ই বা বিয়ে হোতো? থাকতো সে ঊষাদির মত, নলিনীদির মত, মিস সেনের মত, মিস বিধুবালা গাঙ্গুলির মত অবিবাহিতা।

হাতে ভ্যানিটি-ব্যাগ ঝুলিয়ে, খাটো ছাতা-হাতে ট্রাম ধরতে ছুটতো বেলা সাড়ে দশটায়। যেখানে খুশি তুমি, যাও, সিনেমা দ্যাখো, নাচগানের জলসা দ্যাখো ফার্স্ট ক্লাসে নিউ এম্পায়ারে—কি মজা!

সকালবেলা। ওর বড়-জা এসে বললে—রাঙা-বৌ, এক কাজ করতে হবে যে!

সুলেখা বললে—কি দিদি!

—কলাইয়ের ডাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এগুলো ছাদে নিয়ে গিয়ে রোদে দাও, তারপর বেলা পড়লে ঝেড়ে তুলতে হবে। বুঝলে?

—বেশ।

—পারবে তো?

—করি নি কখনো, তবে চেষ্টা করি।

সুলেখা ডাল ছাদে দিয়ে এসেছে, তারপর আর ডালের কথা ওর মনে নেই। দুপুরে আহারের পরে একটু শোবামাত্র ওর ঘুম এসেচে। বেলা দুটোর সময় কালো-ভোমরার মত মেঘ করে নেমেচে ঝুম ঝুম জল। ও অঘোরে ঘুমুচ্চে তখন। ঘুম যখন ভেঙেচে তখনও সমানে বৃষ্টি হচ্চে। শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি খানা-ডোবা ভর্তি করে ফেলেচে দু ঘণ্টার মধ্যে।

সুলেখা উঠে চোখ মুছতে মুছতে জানালা দিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল। বৃষ্টির এমন রূপ সে শহরে দেখে নি কখনো। বকুল গাছের গুঁড়িটা কালো দেখাচ্ছে বৃষ্টির ধারায়। ছাতারে পাখীগুলো অঘোরে ভিজচে—এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটার কথা মনে এনে দেয়—

এদের কোনো ব্যবস্থা নেই। এই সময় খেতে হয় গরম-গরম চা। সে নতুন-বৌ, চা তৈরি করতে যেতে পারে না। কিন্তু কারো কি সেদিকে দৃষ্টি আছে, না কেউ কিছু বোঝে?...ও-মাগো, ওদের বাড়ীর বুড়িটা কি করে ভিজচে এই জলে নারকোলপাতা কুড়ুতে। পাড়াগেঁয়েদের কান্ডই আলাদা।

এমন সময় ওর জা ঘরে ঢুকে বললে—রাঙা-বৌ, ডালগুলো তুলেছিলে ছাদ থেকে?

সর্বনাশ! সেকথা একদম মনে নেই সুলেখার। লজ্জায় তার সুন্দর মুখ লাল হয়ে উঠলো, অপ্রতিভ সুরে বললে—ওই যাঃ! সেকথা মনেই নেই দিদি—এক্ষুনি আমি যাচ্ছি ছাদে—

লজ্জায় সুলেখার মনে হচ্ছিলো যে, মাথা কুটে মরে।

এই সব অশিক্ষিতার দল তাকে কি রকম আনাড়িই না মনে করচে। তাকে 'স্মার্ট' বলে সবাই জানতো কলেজে। সুলেখা ধড়মড় করে উঠে ছুট দিল ছাদের দিকে, ওর জা সস্নেহে ওর দিকে চেয়ে বললেন—ছুটতে হবে না রাঙা-বৌ, বোসো বোসো।

—বসবো কি দিদি, ডাল যে ভিজে নষ্ট হয়ে গেল!

—সে কি এখনো ছাদে আছে ভাই? তুমি ঘুমুচ্ছিলে যখন বিষ্টি এল, সে আমি তুলে আনলুম যে।

কৃতজ্ঞতায় সুলেখার সুন্দর চোখের দৃষ্টি বিনত হয়ে এল। সত্যি ভালো লোক বটে তার জা। মজা দেখবার মত নয়। ও বললে—বাঁচলুম দিদি। ধন্যবাদ। তুমি আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালে।

সুলেখার জা মুখে কাপড় দিয়ে হেসে বললে—রাঙা বৌয়ের থিয়েটারি-ধরনের কথা শুনে হেসে মরি! ও-মাগো...

এ একটা মস্ত বড় পরাজয়ের দিন বলে সুলেখা মেনে নিলে।

ডাল কখনো তোলে নি সে, অতশত তার মনে থাকে না পাড়াগাঁয়ের লোকের মত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ও-পাড়ার কামিনী এসে বললে—কি হচ্ছে গো বৌদিদি?

—চুল বাঁধছি, এসো ঠাকুরঝি। চুলের দড়িটা ধরো তো।

—গান করবে?

—সন্দে-বেলা গান করলে শাশুড়ি আমায় ভালো চোখে দেখবেন? একেই তো আনাড়ি হয়ে আছি এ-বাড়ীর মধ্যে। সে হবে না ভাই। তবুও তুমি আজ প্রথম বললে গানের কথা।

—কেউ বলে নি বুঝি তোমায় বৌদিদি?

—কে আর বলচে।

এই সময় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো ঘন হয়ে—কামিনী চলে যাবার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়ালো। বললে—চলি আজ বৌদিদি, আর একদিন আসবো।

এক-পসলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে সেদিন বিকেলে। সুলেখার ঘরের জানালার ঠিক বাইরে নেবুগাছে নেবুফুল ফুটেচে—বৃষ্টিসজল অপরাহ্নের বাতাসে ভুরভুরে নেবুফুলের গন্ধ...

বড় জা নীরদা ওর ঘরে ঢুকে বললে—কি হচ্ছে রাঙা-বৌ?

—আসুন দিদি। কি আর হবে, এমনি বসে আছি।

—রান্নাঘরে চলো। দুটো ডাল ভাজবো, তুমি বসে বসে কুলোয় ঝাড়বে।

—আচ্ছা দিদি, সবসময় এসব কাজ তোমাদের ভালো লাগে? একটু অন্য রকমের কাজ —একটু ভালো কাজ...

নীরদা হেসে বললে—সময় নেই ভাই। দেখচো তো সংসারের কাজ নিয়ে বেহাত।

—ওরই মধ্যে সময় করে নিতে হয়—

বিরক্তিতে সুলেখার মন ভরে উঠলো। এমন সব অশিক্ষিতাদের মধ্যেও সে এসে পড়েচে। এরা শুধু জানে ডাল ভাজতে আর ভাত রাঁধতে। শুধু খাওয়া আর খাওয়া।

নীরদা বললে—তুমি তো রাঙা-বৌ নতুন এসেচো। এখন প্রথম প্রথম তোমার খারাপ

লাগবে—এর পর এই আবার লাগবে ভালো। তখন অন্য কিছুতে মন যাবে না।

সুলেখা মনে-মনে বললে—সে দিন আমার জীবনে হঠাৎ না আসুক।

চক্ষুলজ্জার খাতিরেও ওকে গিয়ে ডাল ঝাড়তে বসতে হোলো রান্নাঘরে। দুটি ঘণ্টা সে কি খাটুনি! নীরদা ডাল ভেজে দিচ্ছে আর ও আনাড়ি-হাতে কুলোতে ঝাড়চে। অনেক রাত্রে ঘুম-চোখে সুলেখা এসে যখন বিছানায় শুয়ে পড়লো, তখন তার মন অবসাদে ও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েচে। কি কর্মফলে এমন সংসারে সে এল?

অনেক রাত্রে সেদিন ঘুম ভেঙে উঠে সুলেখা শুনলো কে গান গাইচে...

সুলেখা উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করলে—গুন্ গুন্ করে কে গান ভাঁজচে—নিপুণ-কণ্ঠের আলাপ। ও ভাবলে—বা রে, এমন জয়জয়ন্তী আলাপ করে কে?

সুলেখা নিজে গায়িকা। সে বুঝলে, যে এই গুন্ গুন্ সুরে আলাপ করচে, সে নিপুণ গায়িকা। সুলেখা অমন আলাপ করতে পারলে নিজেকে ওস্তাদ মনে করতো। কিন্তু এ কি সম্ভব?

এখানে কে গান গাইবে এমন?

সুলেখা আরও শোনবার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়ালো, সেই সময় গানও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। যে গাইছিল, সে অন্যমনস্ক ভাবেই, একটুকরো গান অল্প সময়ের জন্যে গাইছিল —ঠিক গান গাইবার জন্যে নয়।

সুলেখা ঘুম ও বিস্ময়জড়িত চোখে এসে শুয়ে পড়লো। সকালে উঠে ও-ঘটনার কথা ওর মনে ছিল না, কিন্তু একটু বেলা বাড়লেই মনো এলো রাত্রের সেই অস্পষ্ট জয়জয়ন্তীর সুর। তখুনি সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলে সমস্ত ডটনাটা। স্বপ্নের ব্যাপার হয়তো সমস্তটা...

গ্রামের ও-পাড়ায় সুলেখা কখনো যায় নি। এবার একদিন ও-পাড়া থেকে কয়েকটি মেয়ে ওকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। তারা সকলেই একবাক্যে সুলেখার রূপের প্রশংসা করলে, চা খেতে বসে রান্না-বান্নার গল্প করলে। এরা চোখ থাকতে অন্ধ নাকি? এমন যে সুন্দর লাইলাক-রঙের জরিপাড় শাড়ী পরে আছে সুলেখা, তার দিকে কারও চোখ গেল না? কেউ বললে না—সে-কথা! না বললে বিখ্যাত ছবি 'মায়ামুকুর' সম্বন্ধে পুড়িয়ে-খেতে একটা বাক্য। সুলেখা ওদের কাছে 'মায়ামুকুর'এর গল্পটা করেচে, ওর সব গানগুলিই সে গাইতে পারে এ-কথাও জানিয়ে দিয়েচে, অথচ গান গাইতে বললেও না তাকে কেউ! হিরণ্ময় মিত্রের গান সবগুলো—কে জানে না হিরণ্ময় মিত্রকে, তাঁর সুকণ্ঠকে?

সুলেখার ইচ্ছে হোল, এই মূঢ় অশিক্ষিতা মেয়েগুলোর সামনে একবার হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে 'চাঁদের দেশের রাজকুমারী'র কিংবা 'এবার ফাল্গুন এলে এসো এসো'র অপূর্ব সুর-পুঞ্জে ঘর ভরিয়ে দেয়।

কারণ, যে-বাড়ীতে ওকে নিয়ে গিয়েছিল, একটা ভাঙা হারমোনিয়ম ছিল সে-বাড়ীতে। একটি এগারো-বারো বছরের ছোট মেয়ে বেসুরে একটা সেকেলে শ্যামাসঙ্গীতও গেয়েছিল—বোধহয় তাকেই বিশেষ করে শোনাবার জন্যেই। এ-গ্রামে কেউ বোধহয় খবর রাখে না যে সে একজন গায়িকা।

বাড়ী ফিরে দেখলে, ওর জা তালের বড়া ভাজবে বলে তালের রস বার করচে। ওকে দেখে বললে—রাঙা-বৌকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে তোমরা?

মেয়ের দল বললে—তুমি তো আর যাবে না বড়বৌদি, তুমি গেলে অবিশ্যি আজ খুব ভালো হোতো। আমাদের সে ভাগ্যি কি আর আছে।

নীরদা বললে—বোস সবাই। তালের ফুলুরি খাবি। রাঙা-বৌ, তুমি তালের গোলাটা করো, আমি কড়ায় তেল চড়িয়ে দিই।

একটি ধামা বড়া ভেজে যখন ওরা উঠলো তখন রাত ন'টা। মেয়ের দল ইতিমধ্যে দু-দশটা বড়া খেয়ে চলে গিয়েচে। সুলেখার এসব কাজ অভ্যাস নেই। ঠায় বসে থাকা রান্নাঘরের গরমে কতক্ষণ পোষায়? এরা শুধু জানে, ভোজনের তরিবৎ করতে সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত।

মনে পড়লো, ওদের কলেজের এক অধ্যাপক বলেছিলেন, বাঙালীর ঘরে রান্নার বন্দোবস্ত যে ধরনের, তাতে খাটুনি এবং আয়োজন যত বেশি, খাদ্যবস্তুর পুষ্টিকারক গুণ তত নেই! জিবে ভালো লাগানোর দিকে যত লক্ষ্য, খাদ্যের গুণাগুণের দিকে তত লক্ষ্য থাকলে আজ বাঙালীর স্বাস্থ্য এত খারাপ হোতো কি?

বসে-বসে শুধু নির্বোধের মত একরাশ তালের বড়া ভাজা...

ওর বড়-জা রান্নাঘরে বসে ওকে বললে—রাঙা-বৌ, আমার ঘর থেকে গামছাখানা নিয়ে এসো না ভাই, গা ধুয়ে নিই কুয়োতলা থেকে। বড্ড গরম লাগচে বড়া ভেজে।

সুলেখা বললে—আলো আছে তোমার ঘরে?

—নেই। হারিকেনটা নিয়ে যাও ভাই।

বড়-জার ঘরে ঢুকে গামছা খুঁজতে গিয়ে সুলেখার চোখে পড়লো একটা জিনিস।

ঘরের ছোট্ট টেবিলটার ওপরে একখানা খাম পড়ে আছে, অল ইণ্ডিয়া রেডিও' ছাপা আছে তার ওপরে। খামটাতে নাম লেখা আছে, নীরজাসুন্দরী মিত্র, রায়গ্রাম, বাহিরগাছি পোষ্ট, জেলা নদীয়া। তাড়াতাড়ি সে খামখানা খুলে ফেলে পড়লে—সতেরোই আগস্ট তারিখে নীরজাসুন্দরী মিত্রের গান আছে রেডিওতে, তারই চিঠি ও কনট্রাক্ট ফরম্। উল্টে-পাল্টে দেখলে সুলেখা, কোনো ভুল নেই কোথাও। নির্ঘাত রেডিও কনট্রাক্টের চিঠি।

কিন্তু কার নামে? নীরজাসুন্দরী মিত্র কে? একটা অস্পষ্ট সন্দেহ ওর মনে জাগলো। তাই যদি হয়? তখুনি সে রান্নাঘরে ছুটে এসে চিঠিখানা দেখিয়ে বললে—এ কার চিঠি, দিদি? নীরজাসুন্দরী কে?

ওর জা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে—দূর! ও-আবার তুমি দেখতে গিয়েচো? আমারই নাম। নীরজা থেকে পাড়াগাঁয়ে সবাই বলে—নীরদা।

—কিন্তু মিত্র কেন? ঘোষ হবে তো?

—বিয়ের আগের নামটাই চলে আসচে রেডিও-আপিসে। ওরা আর বদলায় নি। ও কিছু নয় ভাই—রেখে দে। ঠাকুরপোকে বারণ করে দিইছিলাম, নতুন বৌকে একথা বোলো না, আমার লজ্জা করে। তাছাড়া আমার দাদার বারণ ছিল, শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে এসব কথা জানালে কে কি বলবে। দাদা আমাকে গান শিখিয়েছিলেন কিনা? হিরণ্ময় মিত্র নাম শুনেচ বোধ হয়।

বিখ্যাত গায়ক হিরণ্ময় মিত্রের ছোট বোন ও শিষ্যা সুগায়িকা নীরজাসুন্দরী মিত্র তার সামনে বসে তালের বড়া ভাজচে! সুলেখা শ্রদ্ধায় ও স্নেহে নিজের আঁচল দিয়ে বড়ো জার মুখ মুছে দিতে দিতে বললে—একদিন দিদি জয়জয়ন্তী ভাঁজছিলেন তাহলে আপনিই অনেক রাতে? ঘুমের ঘোরে শুনে সেদিন—পায়ের ধুলো দিন—তখন আমি ধারণাই করতে পারি নি। এতদিন বলা আপনার উচিত ছিল আমাকে। আমি কি করে জানবো?

রূপো-বাঙাল

আমি সকালে উঠেই চণ্ডীমণ্ডপে যেতাম হীরু মাস্টারের কাছে পড়তে।

আজ ঘুম ভাঙতে দেরি হওয়ায় মনে হলো কাল অনেক রাত্রে বাবা বাড়ী এলেন মরেলডাঙা কাছারী থেকে। আমরা সব ভাইবোন বিছানা থেকে উঠে দেখতে গেলাম বাবা আমাদের জন্যে কি কি আনলেন।

চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে পা দিতেই রূপো কাকা আমাদের বকে উঠলো—এ্যাঃ রাজপুত্তুর সব উঠলেন এখন! মারে গালে এক এক চড় যে চাবালিটা এমনি যায়! বলি, করে খাবা কি ভাবে? বামুনের ছেলে কি লাঙল চষ্‌তি যাবা?

বাবা বাড়ী থাকতেও রূপো কাকা আমাদের চোখ রাঙাবে।

দাদা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে—রাতে ঘুম হয় নি রূপো কাকা।

—কেন রে?

—ছারপোকার কামড়ে। বাব্বাঃ, যা ছারপোকা খাটে।

—যা যা তাড়াতাড়ি পড়তে যা।

রূপো কাকা আমাদের আত্মীয় নয়, বাবার বন্ধু নয়, বাড়ীর গোমস্তা কি নায়েব নয়, এমন কি রূপো কাকা হিন্দু পর্যন্ত নয়। রূপো কাকা আমাদের কৃষাণ মাত্র। মাসে সাড়ে তিন টাকা মাইনে পায়।

রূপো কাকার আসল নাম রূপো বাঙাল, ও জাতে মুসলমান। আমাদের গাঁয়ের চৌকিদারও ও। পিসিমার মুখে শুনেচি রূপো কাকা নাকি সাজিমাটির নৌকাতে চড়ে ওর কুড়ি বাইশ বছর বয়সের সময় দক্ষিণ দেশ থেকে আমাদের গ্রামের ঘাটে নিরাশ্রয় অবস্থায় এসে নেমেছিল। কেন এসেছিল দেশ থেকে তা শুনি নি। সেই থেকে আমাদের গ্রামেই রয়ে গিয়েচে—বিদেশ থেকে এসেছিল বলে উপাধি 'বাঙাল'—এ উপাধিরই বা কারণ কি তা বলতে পারব না।

রূপো কাকা আমাদের বাড়ীর কৃষাণগিরি করচে আজ বহুদিন। আমাদের ও জন্মাতে দেখেচে। কিন্তু সেটা আশ্চর্য কথা নয়, আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই যে, ও আমার বাবাকে নাকি কোলে করে মানুষ করেচে। অথচ রূপো কাকাকে দেখলে তেমন বুড়ো বলে মনে হয় না।

আমারই ঠাকুরদাদা হরিরাম চক্রবর্তী গাড়ু হাতে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সায়েবের ঘাটে কই মাছ কেনবার জন্যে। রূপো কাকা সাজিমাটির নৌকাতে বসে ছিল। ওর অবস্থা দেখে হরিরাম চক্রবর্তী ওকে গ্রামে আশ্রয় দেন। সে সব অনেক দিনের কথা। রূপো কাকার বয়স এখন কত তা জানি না, মোটের উপর বুড়ো। ঠাকুরদাদা যখন মারা যান, বাবার তখন পঁচিশ বছর বয়েস। বাবাকে তিনি নায়েব পদে বহাল করে গেলেন জমিদার বাবুকে বলে কয়ে। সেই থেকে বাবা আছেন মরেলডাঙা কাছারীতে। আর বাড়ীতে বিষয় সম্পত্তি দেখা শোনা, প্রজা, খাতকপত্র, এ-সব দেখা-শুনো করার ভার ঐ সাড়ে তিন টাকা মাইনের কৃষাণ রূপো কাকার ওপর।

আমাদের অবস্থা ভাল গ্রামের মধ্যে—এ কথা সবার মুখেতে শুনে এসেছি জ্ঞান হয়ে অবধি। বড় বড় চার পাঁচটা ধানের গোলা। এক একটিতে অনেক ধান ধরে। কলাই মুগ অজস্র। প্রজাপত্র সর্বদা আসচে খাজনা দিতে।

এ সব দেখা শুনা করে কে?

রূপো কাকা সব দেখা শুনা করতো। আশ্চর্যের কথা, বাবা বিশ্বাস করে এই সামান্য মাইনের মূর্খ কৃষাণকে এত সব বিষয়-আশয় দেখবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

বাবাকে সবাই ভীষণ ভয় করে চলতো; মুখের ওপর কথা বলতে সাহস করতো না কেউ। কিন্তু রূপো কাকা বাবাকে বলতো—বলি, ও বাবু, তুমি যে এসো বাড়ীতি ন মাস ছ মাস অন্তর, এতডা বিষয় দেখে কে বল তো। আদায়-পত্তর ত এ-বছর কিছু হলো নি। হাতীর পাঁচ পা দেখেচো নাকি? এত বড় সংসারটা চলবে কিসি?

বাবা দু মাস অন্তর দু-তিন দিনের জন্য বাড়ী আসেন।

বাবার অনুপস্থিতিতে গোলার চাবি খুলে রূপো কাকা ধান পাড়তো, কলাই মুগ পাড়তো। খাতকদের কর্জ দিতো। নিজের দরকার হলে নিজেও নিতো।

আমরা সব ছেলেমানুষ, কিছুই বুঝি নে। ঠাকুরমা প্রবীণা বটে, কিন্তু ভালমানুষ। বিষয়-আশয়ের কিছুই বুঝতেন না। আমাদের আছে সব, কিন্তু দেখে নেবার লোক নেই।

সে অবস্থায় সব কিছুর ভার ছিল রূপো কাকার ওপর।

বাবা বাড়ী এসে পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে বসতেন মহাজনী খাতা খুলে।

বলতেন—কে কি নিয়েচে রূপো?

রূপো কাকা বলতো—লিখে রাখো, সনাতন ঘোষ ছ কাঠা কলাই, দু কাঠা বীজ মুগ, কাঁড় ছ কাঠা—

—আচ্ছা।

—হয়েচে? আচ্ছা লেখো—বীরু মণ্ডল দু বিশ ধান, কাঁড় পাঁচ সলি—

—আচ্ছা।

—হয়েচে?

—হয়েচে।

—রুপো বাঙাল একবিশ ধান দু কাঠা কলাই—

—আচ্ছা।

—হয়েচে ?

—হয়েচে।

—লেখো, কাটু কলু চার কাঠা কলাই, কঁড়ি চার কাঠা। ময়জদ্দি সেখ, ধান এগার কাঠা, কঁড়ি সাত কাঠা।

এইভাবে রুপো কাকা অনর্গল বলে চলেচে গত দু মাসের মধ্যে কর্জ দিয়েচে যাকে যতটা জিনিস। ওর সব মুখস্ত, কোনো কিছু ভোলে না। ওরই হাতে গোলার চাবির থোলা। যাকে যা দরকার দিয়ে সব মনে করে রেখে দিয়েচে, বাবার খাতায় লেখাবার জন্যে।

একদিন একটা ঘটনা ঘটলো।

রুপো কাকার জ্বর হয়েছিল, আমাদের বাড়ীতে আসে নি দু-তিন দিন।

এমন সময় বাবা বাড়ী এলেন মরেলডাঙা থেকে। এসেই বিকেলে রুপোকে ডেকে পাঠালেন। রুপো জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে বললে—বলো গে যাও, আমি জ্বরে উঠতি পারচি নে। এখন যেতি পারবো না—জ্বরে মরচি। তা সীতানাথ আর আসতে পারলে না পায়ে পায়ে? তার একটু এলে কি মান যেতো?

বাবা বাবু মানুষ। নতুন বাবু, রুপো বাঁধানো ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়ান, কোঁচা হাতে নিয়ে। ঘড়ির চেন ঝোলে বুকে, হাতে থাকে ঝকমকে আংটি। প্রজাপত্তরের কাছে খুব খাতির। বাবাকে যখন লোকে ফিরে এসে একথা বললে, তখন বাবা একেবারে তেলেবেগুনে উঠলেন জ্বলে। কিন্তু তখন কিছু না বলে গুম্‌ হয়ে রইলেন।

এর দিন পাঁচ-ছয় পরে রুপো-কাকা সেরে উঠে আমাদের বাড়ী এল। বাবা তখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে হিসেবের খাতাপত্র দেখছিলেন। ওকে দেখেই কড়া সুরে বলে উঠলেন —রুপো!

—কি?

—তুমি মনে মনে কি ভেবেচ জিজ্ঞেস করি? তোমার এতবড় আস্পর্দা, তুমি বলো আমি পায়ে পায়ে তোমার বাড়ী যাবো? তুমি জানো, কার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছ? তোমার মুণ্ডুটা যদি কেটে ফেলি তা হলে খোঁজ হয় না, তুমি জানো? এত বড়লোক তুমি হোলে কবে?

রুপো কাকাও সমানে গলা চড়িয়ে দিলে—তা তুমি মাথা কাটবে না? এখন কাটবে না? এখন কাটবে বৈকি! হ্যাঁরে সীতেনাথ, তোকে যে কোলে করে মানুষ করেছিলাম একদিন, মনে পড়ে? এখন তুমি বড় হয়েচ, বাবু হয়েচ, সীতেবাবু—এখন তুমি আমার মুণ্ডু কাটবা না? বড্ড গুণবন্ত হয়েচিস তুই, হ্যাঁ সীতেনাথ—

'তুমি' ছেড়ে রুপো কাকা, সামান্য সাড়ে তিন টাকা মাইনের কর্মচারী হয়ে মনিবকে 'তুই' বলেই সম্বোধন আরম্ভ করলে সকলের সামনে।

বাবা বললেন—যা যা, বকিস নে—

—না বক্‌বো না—তুই বড্ড তালেবর হয়েচিস আজকাল, বড্ড বাবু হয়েচিস—তুই আমার মুণ্ডু নিবি না তো কে নেবে?

বলেই রুপো কাকা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে।

আমার ঠাকুরমা ছিলেন বাড়ীর মধ্যে। রুপোর কান্না শুনে তিনি বাইরে ছুটে এসে বাবাকে যথেষ্ট বকলেন।

বাবা বললেন—তা বলে আমায় ওরকম বলে কেন?

ঠাকুরমা বললেন—তুই কাকে কি বলিস সীতে, তোর একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? তুই কি ক্ষেপলি?

বাবা কলম ছেড়ে বাড়ীর মধ্যে উঠে এলেন, তারপর রুপো কাকার হাত ধরে বললেন— রুপোদা, তুই কিছু মনে করিস নে। আমার বলা ভুল হয়ে গিয়েচে, বড্ড ভুল হয়েচে।

রুপো কাকার রাগ কমে না, বললে—না, আমার দরকার নেই কাজে। ঢের হয়েচে।

নে, তোর গোলার চাবিছড়া রেখে দে—মুই আর ওসব ঝামেলা পোয়াতে পারবো না। নে তোর চাবিছড়া।

কতবার বোঝানো হলো, রুপো কাকা কিছুতেই শুনবে না। চাবির থোলো সে খুলে বাবার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

শেষে বাবা বললেন—বেশ, তা হলে আমিই বাড়ী ছেড়ে যাই। রইল গোলা পালা, প্রজাপত্তর। আমি কাল সকালের গাড়ীতেই বেরুচ্চি—

রুপো কাকা ঝাঁঝের সঙ্গেই বললে—তুই চলে যাবি তা তোর কাচ্চাবাচ্চা মানুষ করবে কেডা?

—কেন, তুমি?

—মোর দায় পড়েচে। তোরে কোলেপিঠে করে মানুষ করলাম বলে কি তোর ছেলে-পিলেও কোলেপিঠে করে মানুষ করবো? আমি কি আর জোয়ান আছি? এখন বুড়ো হইচি না? ওসব ঝামেলা আমার দ্বারা আর হবে না—

—না, আমি আর থাকবো না। কালই যাবো চলে।

—কোথায় যাবি?

—মরেলডাঙা চলে যাবো। ঠিক বলচি যাবো। আমার বড্ড কষ্ট হয়েচে রুপোদা, তুমি আমায় এমন করে বললে শেষকালে। আমি গৃহত্যাগী হবো, হবো, হবো—বলেই বাবা ফেললেন কেঁদে।

রুপো কাকা অমনি উঠে এসে বাবার হাত ধরে বললে—কাঁদিস নে সীতেনাথ, কাঁদিস নে, ছিঃ—মুই আর তোরে কি বললাম? তুই-ই তো কত কথা শুনিয়ে দিলি—কাঁদিস নে—

শেষে দুজনেরই কান্না।

আমরা ছেলেমানুষ অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম দুই বড় লোকের কান্না। দাদা আমায় কনুইয়ের গুঁতো মেরে মুখে হাত চেপে হি হি করে হেসে উঠলো। আমরা অবিশ্যি দূরে গোলার নিমতলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি মিটমাট হয়ে গেল। বাবাও দেশত্যাগী হলেন না, রুপো কাকাও চাকরি ছাড়লেন না।

রুপো কাকা রাত্রে চৌকিদারি করতো। অনেক রাত্রে আমাদের বাড়ী এসে ঠাকুরমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলতো—ওঠো বৌমা, জাগন থাকো। রাত খারাপ। চণ্ডীমণ্ডপে সন্নিসি ঘোষ ও হীরু মাস্টার শুয়ে থাকতো, তাদের জাগিয়ে দিয়ে বলতো—একেবারে অত নাক ডাকিয়ে ঘুমোও কেন? ওঠো, মাঝে মাঝে তামুক খাও আর গোলাগুলোর চারিধারে বেড়িয়ে এস না—

একটা অদ্ভুত দৃশ্য কতদিন হীরু মাস্টার দেখেচে।

আমাদের গল্প করেচে সকালবেলা।

সব গ্রাম ঘুরে এসে অনেক রাত্রে চৌকিদারি পোশাক পরে লাঠি হাতে রুপো কাকা অন্ধকারে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠার ওপর বসে থাকতো।

এক একদিন হীরু মাস্টার বাইরে এসে ওকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করতো—কে বসে?

—মুই রুপো।

—বসে কেন? এত রাতে?

—তোমরা তো দিব্যি ঘুমোচ্চ, তোমাদের আর কি? গোলার ধান যাবে, সীতেনাথের যাবে। চোরের যা উপদ্রব হয়েছে তার খবর কি জানবা? মোর ওপর ঝক্কি কত! মোর তো তোমাদের মত ঘুমুলি চলবে না। সীতেনাথের এ ঝামেলা আর কদ্দিন পোয়াবো। এবার এলি চাবিছড়া তার হাতে দিয়ে মুই খোলসা হবো। এ আর পারি না বুড়ো বয়সে রাত জাগতি—

হীরু মাস্টার বলে—ঘুমোও গে যাও—

—কিন্তু মুই যে তোমাদের মত নিশ্চিন্দি হতে পারি নে তার কি হবে। ধানগুলোর ঝক্কি যে মোর ঘাড়ে ফেলে সে বাবু দিব্যি চাঙা হয়ে বসে আছেন। এবার আসুক, কিছুতেই আর এ বোঝা ঘাড়ে রাখচি নে মুই।

কিন্তু নিজের ইচ্ছেতে তার ছাড়তে হয় নি। বৃদ্ধ বয়সে তিন দিনের জ্বরে রূপো কাকা আমাদের গোলার দায়িত্ব নামিয়ে চলে গেল। এও সাত-আট বছর পরের কথা। আমরা তখন স্কুলে পড়ি। সর্বসমেত ত্রিশ-বত্রিশ বছর ও ছিল আমাদের বাড়ী।

বাবার সঙ্গে আমরাও দেখতে গেলাম রূপো কাকাকে।

রূপো কাকার ছোট চালাঘর। একদিকে ডোবা, একদিকে বাঁশঝাড়। ছেঁড়া মলিন কাঁথা মুড়ি দিয়ে শীর্ণ, সাদা দাড়ি রূপো কাকা পুরনো মাদুরে শুয়ে। রূপো কাকার ছেলের নাম বেজা, লোকে বলে বেজা বাঙাল। বেজা আমাদের দেখে বললে—আসুন বাবুরা, দেখুন দিকি বাবারে? জ্ঞান নেই, ভুল বকচে—

বাবা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন—ও রূপোদা? কেমন আছ, ও রূপোদা—

রূপো কাকা চোখ মেলে বললে—কেডা? সীতেনাথ? কবে এলে?

—এই পরশু এসেচি।

—বেশ করেচ। এই শোনো, খাতার মুড়োয় লিখে রাখো, মুই চিঁড়ে খাবার বেনামুরি ধান নিইচি চার কাঠা, আহাদ মণ্ডল কলাই দু কাঠা, বাড়ী দু কাঠা, বিষ্টু ধেরিসি ছ কাঠা ধান, বাড়ী চার কাঠা—মোর ধান পোষ মাসের ইদিকে দিতে পারবো না বলে দিচ্চি—ভুলে যাবো, লিখে রাখো—

এই রূপো কাকার দায়িত্বের শেষ। আর কোন কথা বলে নি রূপো কাকা। সেদিন সন্ধ্যেবেলা রূপো কাকা আমাদের গোলা-পালার দায়িত্ব চিরদিনের মত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

বিশ্বস্ত লোকেদের জন্যে কি কোনো স্বর্গ আছে?

যদি থাকে, আমাদের বাল্যের রূপো কাকার আসন অক্ষয় হয়ে আছে সেখানে।

আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা এসব। এই সব চোরাবাজারের দিনে, জুয়োচুরির দিনে, মিথ্যে কথার দিনে বড্ড বেশি করে রূপো কাকার কথা মনে পড়ে।

তেঁতুলতলার ঘাট

হারুর আজ আর জ্বর আসে নি। এখন তার মনটাতে বেশ স্ফূর্তি আছে। জ্বর এলে আর স্ফূর্তি থাকে না। কিছু না কিছু নিরানন্দ আসেই। আজ চার মাস ধরে সমান ভাবে ম্যালেরিয়া জ্বর, পেট-জোড়া পিলে, আর সর্বদাই ভয় ওই বুঝি জ্বর এলো।

অনেকেই ওকে দেখে বলে—ইস্! ছেলেটার মৃত্যু দশা হয়েছে একেবারে। এবার বুঝি বা সরে।

এ সব বলতো এমন সব লোকে, যারা ওকে ভালবাসার চোখে দেখে না। যে ভালবাসার চোখে দেখে, সে কি এমন কথা বলতে পারে! হারুও তা বুঝতো, বুঝে চুপ করে থাকতো। জ্বর আসাটা যেন ওর মস্ত অপরাধ, এজন্যে সে একদিকে যেমন বাড়ীতে বাবা ও পিসিমার, অন্য দিকে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছেও অপরাধী।

ওর মা বলে—সকলের হাড় জ্বালালি তুই বাপু, কারু সোয়াস্তি নেই তোর জন্যে।

অথচ কেমন সুন্দর দিনগুলি। সুনীল আকাশ, অদ্ভুত ধরনের সুনীল আকাশ। ঝলমলে রোদ পড়েচে পথঘাটের দুধারে বনে ঝোপে। রাস্তাঘাট এখনো খট খট করচে। আজ দিন কুড়ি একদম বৃষ্টি বন্ধ। চাষারা রোজ গাজিতলায় রোজ-পালুনি করচে। আল্লা আল্লা বলে মাঠে বুক চাপড়ে চীৎকার করচে, বৃষ্টির চিহ্নও নেই। মেঘই নেই আকাশে তার বৃষ্টি। ধান এবার হবে না সবাই বলচে।

এই সব দিনে প্রত্যেক ঝোপে, প্রত্যেক লতার তলায় যখন রোদ পড়ে, যখন মউটুসকি পাখী বন-চন্দনা লতার আগায় মুখ উঁচু করে দোল খায়, কটুগন্ধ ঘেঁটকোল ফুলের দল ঝোপে ঝাড়ে ফোটে, তখন ঘর আর বার একাকার হয়ে যায়, ঘরে মন বসে না।

হারু তখন পাশের বাড়ীর চুনুর আর মণ্টুর বাড়ী যায়।

মণ্টু মায়ের জন্যে ডাঁটা শাক তুলচে ওদের বাড়ীর সামনের ক্ষেতে। ওকে দেখে

বললে—কিরে, আজ জ্বর আসে নি তো?

যেন তার জ্বর আসাটা প্রভাতকালে সূর্যোদয়ের মত একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। কেন যে ওরা জ্বরের কথাটা মনে করিয়ে দেয়! হারু বললে—না, জ্বর কিসের? চল বেড়িয়ে আসি।

—মাকে ডাঁটাগুলো দিয়ে আসবো। তুই একটু দাঁড়া।

—এ ক্ষেত করেচে কে?

—তুই জ্বরে পড়ে ভুগবি, দেখতে তো আসবি নে? এবার এ ক্ষেত আমি করেচি। মা বললে, ডাঁটা করে রাখ জমিটাতে, তাই জমিটা করলাম।

হারুর মনে দুঃখ হলো বার বার তার জ্বর আসার উল্লেখ করাতে। একবার এত রাগ হলো, সে বেড়াতে যাবে না কারুর সঙ্গে। একাই সে পথে পথে আগেও খেলা করতো, এখন জ্বর হওয়ার পর থেকে মনটা কেমন হয়ে পড়েচে, একা বেড়াতে ভয় ভয় করে, আগে যে সাহস ছিল, এখন আর সেটা নেই। নয়তো মণ্টুর মত সঙ্গীকে সে গ্রাহ্যও করে না।

দুজনে অবশেষে বেরিয়ে গেল নদীর ধারে। কাঠ-কাটা নৌকো এসেচে পুব দেশ থেকে, বড় বড় গুঁড়ি পড়ে আছে এদিকে ওদিকে। বর্ষাকালে অনেক গুঁড়ির গায়ে তেলাকুচো লতা উঠেচে, দু একটা তেলাকুচো ফলও ফলেচে।

কি মায়া যে জায়গাটার!

হারুর বড় ভাল লাগে। খেলা করবার মত জায়গা।

মণ্টু ও হারু কতক্ষণ সেখানে খেলা করলে, খেলা করবার উৎসাহ কারো কম নয়। তেলাকুচো লতার ফল মণ্টু তুলতে গেলে হারু তুলতে দিলে না। কেন, বেশ তো দুলচে লতার আগায়, একটা আধপাকাও হয়েচে, তুলবার কি দরকার? বেশ দেখাচ্ছে গাছে। বেনে-বৌ জোড়ায় জোড়ায় বেড়াচ্চে কালকাসুন্দে গাছের ঝোপে ঝোপে।

কতক্ষণ কেটে গিয়েছে দুজনের কারো খেয়াল নেই।

মণ্টু কাছে গিয়ে বললে—অমন করে বসলি কেন রে? জ্বর এল নাকি?

—নাঃ—

—দেখি গা—ওরে বাসরে, গা যে পুড়ে যাচ্চে—বাড়ী যা বাড়ী যা—

হারু বিমর্ষভাবে বললে—তুই জ্বরের কথা অত করে মনে করিয়ে দিলি কেন? আমি ভুলে ছিলাম বেশ। যেমন তুই মনে করিয়ে দিলি, অমনি আমার জ্বর এল।

মণ্টু বললে—না, না রে, তোর এমনিও জ্বর আসতো, আমি মনে করে দেওয়ার জন্যে কি আর জ্বর এল? ও তোর ভুল কথা। চ, বাড়ী চ—

বাড়ীতে আজ চিংড়ি মাছ দিয়ে লাল ডাঁটার চচ্চড়ি হচ্চে সে দেখে এসেচে। কলাইয়ের ডাল দিয়ে ওই চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেতে যা লাগে!

মাকে না বললেই হলো যে জ্বর হয়েচে। মণ্টুকে পথ থেকেই সরিয়ে দেওয়ার জন্যে বললে—তুই বাড়ী যা—আমি একা যেতে পারবো—

—যেতে পারবি ঠিক?

—খুব। ভারি তো একটুখানি জ্বর। ও এখুনি সেরে যাবে। তুই যা—

হারু বাড়ী ফিরে দেখলে রান্না এখনো হয়নি। কিন্তু দেরি করতে গেলে চলবে না, সে জানে এর পরে এমন ভীষণ কম্প উপস্থিত হবে যে রোদে গিয়ে বসতেই হবে, নয় তো লেপ মুড়ি দিয়ে গিয়ে শুতে হবে। গায়ে কাঁটা দেবে, বমি হবে। সুতরাং ভাত যদি খেতে হয় তবে আর দেরি করা উচিত হবে না, এখুনি খেতে বসা উচিত।

মা জ্বর এসেছে বুঝতে পারলেই সব মাটি। আর ভাত দেবে না। ও রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে নির্বিকার ভাবে বলে—মা, ক্ষিদে পেয়েচে।

—কোথায় গিয়েছিলি রে সকাল বেলা?

—খেলা করছিলাম নদীর ধারে।

ইচ্ছে করেই সে মণ্টুর নাম করলে না। যদি এরা তাকে ডেকে পাঠায় বা এমনি কিছু, তবে সে বলে দেবে জ্বরের কথা। সে বললে—ভাত দাও, ক্ষিদে পেয়েচে—

—আজ এত তাড়া কেন?

—আমার যা ক্ষিদে পেয়েচে!

—এখনো চচ্চড়ি হয় নি। শুধু ডাল আর ভাত নেমেচে—

—তাই দাও, তাই দিয়ে খাবো—

ভাত খেতে বসে হারুর মনে হলো, না খেতে বসলেই ভাল হতো। জ্বর চেপে আসচে। শীত এত বেশি করচে যে রোদে না বসলে আর চলে না। উঃ দাঁতে দাঁত লাগচে এমন শীত! ভাত খেয়েই সে গিয়ে বাড়ীর পেছনে নিমগাছটার তলায় রোদে বসলো। একটু পরে ওর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপুনি ধরলো, এদিকে রোদে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে, কেমন একটা ঘোর ঘোর ভাব ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে। হারু বুঝলে ভীষণ জ্বর এসেচে ওর।

ওর মা বললে—বসে আছিস কেন রোদে? শরীর খারাপ হয় নি তো?

—হুঁ।

—হুঁ মানে কি? জ্বর আসচে? সরে আয় ইদিকে দেখি, পোড়ারমুখো ছেলে, তবে ভাত খেলি কি মনে করে? এমন করে ভুগে মরবি কদ্দিন?

বেশ। যেন তারই দোষ। তার যেন ইচ্ছে যে রোজ জ্বর আসে। বাপ মায়ের অভ্যেস সব দোষ ছেলের ঘাড়ে চাপানো।... হুঁশ হলো যখন ওর আবার, তখন বেলা গিয়েচে। রাঙা রোদ কাঁটাল গাছটার মাথায়। শালিক পাখীর দল ভাঙা পাঁচিলের ওপর কিচ্ কিচ্ করচে। ওর মুখ তেতো হয়ে গিয়েচে, মাথা ভার, চোখে কেমন ঝাপসা ভাব।

ও বললে—কি খাবো মা?

—কি আবার খাবি? ভাত খেয়ে জ্বর এসেচে, খাবি কি আবার? সাবু করে দেবো রাত্তিরে।

হারু নাকিসুরে বললে—না, সাবু আমি খাবো না—হুঁ-উ-উ—

—না সাবু খাবো না, তোমার জন্যে আমি পিঠে-পুলি করি। চুপ করে শুয়ে থাক।

ভোর রাতে ঘাম দিয়ে হারুর জ্বর ছেড়ে গেল। তার পর ঘুম ভেঙে যায়। শরীর খুব হালকা মনে হয় এবং খুব ক্ষিদে পায়। অত রাতে আর কে কি খেতে দেবে, সে চুপ করে শুয়ে থাকে ভোরের আশায়। ভোরের আলো খড়ের ঘরের দেওয়ালের মাথা দিয়ে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও মাকে ডাক দিতে লাগলো।

ওর ঘুমকাতুরে মা চোখ না মেলেই এপাশ ওপাশ ফিরে বলতে লাগলো—বাবাঃ সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরে একটু যে শোবো সে জো নেই। একটু চোখ বুজিয়েছি অমনি ষাঁড়ের মত চিৎকার।—হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেলো!

হারু নাকি-সুরে বললে—সবে চোঁখ বুজেচো বুঝি! রোদ উঠে গিয়েচে গাছপালার মাথায়। আমার খিদে পেয়েচে—উঠে দ্যাখো কত বেলা—

অবশ্য এও অতিশয়োক্তি। রোদ ওঠে নি, সবে ভোরের আলো ফুটেচে মাত্র! ওর মা ওঠবার বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখালে না। ছেলের এ নাকি-সুরে চীৎকার সকাল বেলার দিকে—এ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। হারু খানিকটা কান্নার পরে আপনি চুপ করে।

বিছানা ছেড়ে উঠতেই বেশ আনন্দ লাগে। আজ কি সুন্দর দিনটা। কেমন পাখীর ডাক বাঁশ গাছের মগডালে। কাল মা বলছিল আজ কুমড়োকাটা সংক্রান্তি। যে যার গাছ থেকে যা পারবে চুরি করবে—শসা, লাউ, কুমড়ো—যার যা ইচ্ছে. কেউ কিছু বলতে পারবে না বা সাহসও করবে না।

অন্য কিছু নয়, গানি বুড়ির উঠোনের মাচায় সেই যে শসা গাছ! চমৎকার শসার জালি দুলচে কঞ্চির আড়ালে। কতবার লোভ হয়েচে ওর, কিন্তু বুড়ি বড় সতর্ক। আজ ওবেলা রাতের অন্ধকারে একটা দা হাতে গোটা পাঁচ ছয় শসার জালি আর গোটা শসা গাছকে যদি সাবাড় করা যায়—

উৎসাহে বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়লো।

মণ্টুদের বাড়ী গিয়ে এখুনি পরামর্শ করতে হবে। খাওয়ার কথা সে ভুলেই গেল—এত কান্না, এত অনুযোগ যে খাওয়ার জন্যে।

এক ছুটে সে পৌঁছুল মণ্টুদের বাড়ী। মণ্টু ওর জ্যাঠামশায়ের পাশে বসে সকালবেলা

মুড়ি খেতে খেতে ধারাপাত মুখস্থ করছিল। হারুকে দূরে থেকে আসতে দেখে সে বিশেষ কোনো উৎসাহ প্রকাশ করলে না, কারণ এখন জ্যাঠামশায়ের হাত এড়িয়ে খেলতে যাওয়া অসম্ভব।

সৌভাগ্যের কথা মণ্টুর জ্যাঠামশায় এই সময় তামাক সাজতে গেলেন বাড়ীর মধ্যে।

হারু ছুটে এসে বললে—আজ কী দিন মনে আছে?

মণ্টু পেছন দিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করে বললে—কী দিন?

—কুমড়ো কাটা অমাবস্যে—

—কে বললে?

—সকলকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ—

—কি করবি?

—তুই আর আমি বেরুবো। গানি বউয়ের বাড়ী সেই শসা গাছ আছে তো? আজ রাত্তিরে সব শসা—কি বলিস?

—তুই এখন যা, জ্যাঠামশায় আসচে, ওবেলা আমি তোদের বাড়ী যাবো।

হারু সতৃষ্ণ নয়নে ওর মুড়ির বাটির দিকে চেয়ে বললে—কি খাচ্ছিস?

—মুড়ি।

—দে না একগাল?

এবার হারুর কানেও জ্যাঠামশায়ের খড়মের শব্দ পৌঁছেচে। সে তাড়াতাড়ি কাপড়ে অকারণ ডান হাতখানা মুছে মণ্টুর সামনে পেতে বললে—শীগ্‌গীর দে, তোর জ্যাঠামশায় আসচে। পরক্ষণে এক মুঠো মুড়ি মুখে পুরে দিয়েই সে ছুটে পালালো। মনে ভাবলে —বুড়ো এসে পড়লেই বকতো, আমায় দেখতে পারে না মোটে। কি কেপ্পন মণ্টুটা! একগাল মুড়ি কত কটা দিলে দ্যাখো—দিব্যি মচমচে মুড়ি—

তারপর সে বাড়ী পৌঁছে দেখলে তার মা সামনের উঠোন ঝাঁট দিচ্চে। খাবার দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ও উদ্যোগ কিছুই নেই এ বাড়ীতে।

মা ওই এক রকমের লোক হারু জানে। অন্য লোকের মায়ের মত নয়। কাল রাতে যে খাই নি, জানে সবই, দাও না বাপু খেতে সকাল সকাল! কাণ্ডখানা বেশ! একটা বেলা হোলে মা যদিও খেতে দিলে, সে মাত্র একবাটি সাবু। সে প্রতিবাদ করতে গেলে ওর মা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—হ্যাঁ তোমাকে নুচি ভেজে দিই, পিটেপুলি গড়িয়ে দিই, কাল সারারাত জ্বরে শুষোছো কিনা!

যেন জ্বর না হোলেই মা তাকে লুচি ভেজে আর পিঠেপুলি করে খাওয়ায় আর কি! সে এ বাড়ীতে নয়। এ বাড়ীতে বাঁধা আছে চালভাজা, তিনশো-ত্রিশ দিন। লুচি!

কিন্তু ভাত? মা কি আজ ভাতও খেতে দেবে না নাকি? কথাটা সে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

—ভাত খাওয়ার সময় আমায় সেই গাওয়া ঘি একটু দিতে হবে কিন্তু—

—ভাত খাবে কে?

—কেন, আমি—

—ইস্! বলে, কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় ঘুণ্টি দিতে—সারারাত জ্বরে কোঁ কোঁ করে ওনার ভাত না খেলে চলবে কেন?

—কি খাবো তবে?

—শিউলিপাতার রস তো খেলি নে সকালবেলা। একটু বেলা হোলে দেবো অখন পাতা বেটে—আর সাবু।

হারু মিনতির সুরে বললে—না সাবু নয়, দুখানা রুটি, মাছের ঝোল দিয়ে। তোমার পায়ে পড়ি মা—পুরনো জ্বর তো, ওতে কিছু হবে না।

—আচ্ছা যাক্, দেখবো অখন।

সুতরাং মনে আর একবার খুশীর ঢেউ উঠলো হারুর। শরীর তার খুব হালকা হয়ে গিয়েচে, জ্বর না এলেও পারে। সকলে বলে শরীর হালকা হয়ে গেলে জ্বর আর নাকি হয় না। সে একা মাঠের ধারে বোষ্টম বাগানের পথে বেড়াতে গেল। ও বাগানের খুব নিবিড়

একটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে আছে সেই বুড়ো মাদার গাছটা। একবার রজুন কাকার দলে মিশে সে গিয়েছিল সেখানে। রজুন কাকা অদ্ভুত লোক, বড় বয়সের ছেলে, ওর গোঁপ দাড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল, তবু ও তাদের সঙ্গে খেলতো। কত নতুন নতুন খেলা শিখেছিল। তার দলে খেলতে বেরুলে শুধুই মজা, কত রকমের মজা। কিন্তু রজুন কাকা চলে গেল কোথায়, একদিন হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল এ গাঁ থেকে, দুবার পুজো এসেছে গিয়েচে তারপর—আর আসে নি।

মাদার গাছটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ভিজে ঝোপ-ঝাপ—কত পটপটি ফল দুলচে গাছে গাছে। বড় বড় পটপটি ফল। আজকাল সব ছেলেই বর্ষাদিনে পটপটি ফল ছোঁড়ে, তাদের শিখিয়েছিল সেই রজুন কাকা। একটা বাঁশের চোঙের মধ্যে পটপটি ফল পুরে একটা কাঠি দিয়ে ঠেলে দিলেই ফট-ফটাশ! যেন বন্দুকের শব্দ! তাই ওর নাম পটপটি ফল।

আজকাল সবার হাতে দেখো একটা বাঁশের চোঙ আর কাঠি আর পটপটি ফলের গোছা। রজুন কাকা না থাকলে আজ আর কাউকে পটপটি ছুঁড়তে হোত না।

দুটো বড় বড় তিৎপল্লার ফুল ফুটেছিল উচুতে। লতার-আগে দুলচে। হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া যায় না। এক থোলো পটপটি ফুলই নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে কোনোটাই সংগ্রহ করতে পারলে না। বেলা হয়েচে অনেক, ক্ষিদেও বেশ পেয়েচে।

বাড়ী গিয়ে রুটি আর মাছের ঝোল খাবে—কি মজা! এতক্ষণ রুটি হয়েও গিয়েচে। সে রোগা মানুষ, মা নিশ্চয়ই তার জন্যে আগে করে রাখবে। আজ সে বেশ ভালো আছে, আজ আর জ্বর আসবে না। জ্বর বোধহয় সেরে গেল। একটু একটু খুব সামান্য শীত বোধ হচ্চে, কিন্তু সেটা জ্বরের দরুন নয়। বর্ষাকাল, আর এই বনঝোপে তো রোদ পড়ে না তাই, মণ্টুরও শীত করতো, যদি সে আজ এই বনে ঢুকতো।

হারু ঝোপের বার হয়ে ছায়াবহুল সরু বনপথ ছেড়ে চওড়া রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। এই চওড়া রাস্তা ওদিকে নাকি কেষ্টনগর পর্যন্ত চলে গিয়েচে, বাবার মুখে সে শুনেচে। একসারি ধান বোঝাই গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে আসচে ওদিক থেকে। হারু একটা পিটুলি গাছের তলায় আধ-রোদ আধ-ছায়ায় বসে বসে গরুর গাড়ী দেখতে লাগলো।

বোধহয় একটু বেশীক্ষণ বসা হয়ে গেল। যে সময় উঠবে ভেবেছিল, সে সময় ওঠা হোল না। রোদটা বেশ মিষ্টি লাগচে। না, জ্বর হয় নি তার। বর্ষাকালে রোদ সকলেরই ভালো লাগে।

বাড়ীতে যখন সে পৌঁছলো, তখন বেলা বারোটা। হাতে তার গোটাকতক পিটুলি ফল। ওর মা বললে—ওমা, ই কি কাণ্ড! এই বলে গেলি ক্ষিদে পেয়েচে, আমি কখন রুটি করে বসে আছি। কোথায় ছিলি? ভালো আছিস তো?

—হুঁ—

—কোথায় ছিলি?

—মাদার পাড়তে গিয়েছিলাম বোষ্টমদের বাগানে।

—জ্বর হয় নি তো?

—না—

কিন্তু ওর কথার ধরন আর চোখ মুখের ভাব ওর মায়ের কাছে ভালো বলে মনে হোল না। কাছে ডেকে বললে—তোর চোখ মুখ রাঙা দেখাচ্চে কেন রে? ইদিকে সরে আয়, গা দেখি—বাপরে, গা পুড়ে যাচ্চে। যা শুয়ে পড় গিয়ে, আর খেতে হবে না।

যখন ওর জ্বরের ঘোর কাটলো, তখন রাত হয়েচে। হারু চোখ মেলে চেয়ে দেখলে তক্তপোশের কোণে দেওয়ালের গা ঘেঁষে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলছে, ঘরে কেউ নেই। জ্বর ছেড়ে গিয়েচে। তখনকার ক্ষিদে এখনও রয়েচে। সে কিছু খায় নি দুপুর থেকে। মা কোথায় গেল? সে ক্ষীণ স্বরে ডাকলে—ও মা—আ—আ—

কেউ উত্তর দিলে না। মা রান্নাঘরে কাজ করচে বোধহয়, কিংবা হয়তো পাশের নিতাই কাকার বাড়ীতে গিয়েচে।

একটু পরে ওর মাকে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে ও একটু

অবাক হয়ে গেল। মা অমন করে হাঁটচে কেন? আমসত্ত্ব চুরি করবে নাকি? সে তো আমসত্ত্ব চুরি করবার সময় অমনি...মা এসে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে দেখতে গেল। চোখ তাকিয়ে থাকতে দেখে যেন একটু অবাক হয়ে গিয়ে নরম মোলায়েম সুরে বললে—বাবা হারু! কেমন আছ বাবা?

—ভালো।

—দেখি?

ওর গায়ে হাত দিয়ে ওর মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—ওঃ, কি ঘাম ঘেমেচিস! এঃ, সব যে ভিজে গিয়েচে। হারুও তা লক্ষ্য করলে বটে। কাঁথা ভিজে সপ সপ করচে! ও বললে—মা, আমার ক্ষিদে পেয়েচে।

—ক্ষিদে পেয়েচে বাবা? আচ্ছা দেবো এখন। আহা বাবা আমার, সোনা আমার, শোও। আসচি আমি।

মা ঘর থেকে চলে গেলে ও ভাবলে মা এমন নরম হয়ে গেল কেন? অন্য সময় মা তো খেতে চাইলে বলে ওঠে—জ্বর ছাড়তে না ছাড়তে ক্ষিদে! ছেলের কেবল ক্ষিদে আর খাই খাই, জ্বর হয়েচে, চুপ করে শুয়ে থাক।

কিন্তু মা আজ অমন মিষ্টি, অমন মোলায়েম সুরে কথা বলচে কেন? পা টিপে টিপে হাঁটা—হঠাৎ হারুর মনে পড়ে যায় আজ না সেই কুমড়োকাটা আমাবস্যে! ওঃ, ভালো কথা মনে পড়েচে। এখন সবে সন্ধ্যে, তার তো জ্বর ছেড়ে গিয়েচে। এইবার মণ্টুকে ডেকে নিয়ে গানি বুড়ীর বাড়ী শশা চুরি করতে যেতে হবে। আরও একটু রাত হোক। ততক্ষণ সে খেয়ে নিক।

ওর মা একটু বার্লি নিয়ে ঘরে ঢুকে বললে—এটুকু খেয়ে নাও তো বাবা। উঠো না, শুয়ে থাকো লক্ষ্মী ছেলে—ও লক্ষ্মী ছেলে আমার—

ও বিস্মিত সুরে বললে—কেন, আমার সে ওবেলাকার রুটি? আমি খেয়ে শস্য কাটতে যাবো এক জায়গায়।—আজ কুমড়োকাটা আমাবস্যে যে! জানো না?

ওর মা বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—খুব জানি বাবা, তুমি শোও। কুমড়োকাটা আমাবস্যে গিয়েচে কাল—তুমি এই দুদিন ধরে বেহুঁশ। মা মঙ্গলচণ্ডী, সারিয়ে দাও মা, সেরে গেলে পুজো পাঠিয়ে দেবো বটতলায়—

জোড়হাতে বটতলার উদ্দেশে ওর মা প্রণাম করে।

কম্পিটিশন

শিবশংকর সকালে উঠেই দু দফা ফোন করলেন। একবার য়্যাটর্নি রায় ও মিত্রের জীবনধন রায়কে ও আর একবার প্রসন্নদাস বড়ালের অংশীদার ও কর্তা হরিদাস বড়ালকে; কারণ ও'দের আপিস এখনো খোলে নি।

—নমস্কার, কি খবর?

—আসুন একবার। কতদূর করলেন?

—আসবো এখন?

—এখানেই চা খাবেন।

একটু পরে বাড়ীর বাইরে মোটরের শব্দ শোনা গেল এবং জীবনধন রায় ঘরে ঢুকলেন। জীবনধন রায়ের পরনে সাহেবি পোশাক, চোখে স্টীলের ফ্রেমের চশমা, পায়ে পেটেন্ট চামড়ার চকচকে বুট, বগলে ফোলিও ব্যাগ।

—আসুন, মিঃ রায়, বসুন। নমস্কার।

—নমস্কার।

—ওরে, চা নিয়ে আয়। তারপর?

—তৈরি। সরেজমিন তদারক করবেন না?

—রেজেস্ট্রী আপিস সার্চের রেজাল্ট কি?

—ভালো। দাগী মাল নয়, তবে দেড়—দেড়ের কমে হবে না। আমাদের তিন পার্সেন্ট।

শিবশঙ্কর বাবু হরিশ মুখুয্যের স্ট্রীটে তিনতলা বড় বাড়ী কিনচেন এঁদের দালালিতে। দেড় লক্ষ টাকা দাম, য়্যাটর্নিরা তিন পার্সেণ্ট কমিশন নেবেন—আসল কথা হচ্চে এই।... রুপোর ট্রে ভরে টোস্ট, ডিম সেদ্দ, আলু সেদ্দ ও লেটুস সেদ্দ এল, তার সঙ্গে চায়ের লিকার, দুধ চিনি, আলাদা।

শিবশঙ্কর বাবু বললেন—মিষ্টি দিই নি—কারণ আমাদের এ বয়সে—

—না না। থাক। তারপর আমার গাড়ী রেডি, চলুন একবার সরেজমিনে। জিনিসটা দেখুন।

—বেড রুম কতগুলো?

—উনিশটা রুম সবসুদ্ধ ওপরে নিচে। ছটা বাথরুম, এ বাদে বাইরে তিনটে আলাদা পাইখানা। খুব ভালো বাড়ী। কুণ্ডু কোম্পানীকে রাজী করতে বেগ পেতে হয়েচে খুব। বুড়ো একেবারে বেঁকে বসেছিল শেষকালে।

——এখন যেতে পারবো না—মাপ করুন। এখন বেলা দশটা পর্যন্ত মরবার ফুরসত নেই—এখুনি আবার লোক আসবে—

—আচ্ছা উঠি তাহলে। ওবেলা আপিসে ফোন করবেন এখন—ওখান থেকে যাওয়া যাবে।

একটু পরে হরিদাস বড়ালকে আবার ফোন্ করা হোল।

—নমস্কার, কি খবর? হ্যাঁ, একবার, করেছিলাম—হ্যাঁ—এই আধ ঘণ্টা আগে। হ্যাঁ। সোনাটার কি হোল? বারের দাম কত বললেন? তিন আনা? আমার চাই কিছু—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—আচ্ছা। আজ?—হ্যাঁ—আচ্ছা। আপিসে? আচ্ছা।

সাধারণ লোকে এ কথাবার্তা থেকে বিশেষ কিছু বুঝবে না, কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর 'বড়াল বার' নামক বিখ্যাত সুবর্ণের বাট কিনবার পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ক্রয়-বিক্রয়ের পালা শেষ হোতেই শিবশঙ্করের আপিস ম্যানেজার ও তদারককার মিঃ ঘোষাল ঢুকে শিবশঙ্করকে খানিকটা নিচু হয়ে নমস্কার জানিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন। দুজনের মধ্যে যে কথাবার্তা শুরু হোলো তা স্কোয়ার ফুট রেট, পার্সেণ্ট, ইস্পাতের জালতি, সিমেণ্ট, এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম, গ্যারিসন্ এনজিনিয়ার প্রভৃতি শব্দে পরিপূর্ণ ও কণ্টকিত। আজই মিঃ ঘোষালকে আপিসের কাজে তেজপুর যেতে হচ্ছে, ফোনে এখুনি আসাম মেলে বার্থ রিজার্ভ সম্বন্ধে শেয়ালদা স্টেশনের কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হোলো। অন্য অন্য কথার পরে বেলা ন'টার সময়ে মিঃ ঘোষাল বললেন—তা হোলে আমি উঠি—

—কত টাকার দরকার?

—সতেরো হাজার তো ওদের পেমেণ্ট করতে হবে, আর পুজোর ব্যবস্থা—তাও তিন হাজার নেবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, হাজার খানেক দিতে হবে উপদেবতাদের। মিসেস বর্মনকে একটা প্রেজেণ্ট দিতে হবে ভাল দেখে। কি দেওয়া যায়, স্যার, আপনিই বলুন।

—একটা জড়োয়ার কিছু দাও গিয়ে—হাজার খানেকের মধ্যে। বিশ হাজারের একটা চেক নিয়ে যাও—

—আজ্ঞে স্যার, ব্যাঙ্কে টাকা ভাঙানোর আমার সুবিধে হবে না। একটায় আসাম মেল। তার আগে আমার অনেক কাজ। একবার আপিসে যেতে হবে। ড্রয়ারের মধ্যে কাগজপত্র রয়েচে, নিয়ে যেতে হবে। গহনাই বা কিনবো কখন?

—আচ্ছা গহনার জন্যে আমি সুরেশকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বদ্রিদাসের বাড়ী। যদি কিছু ভালো থাকে দেখে আসুক। সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি এখান থেকে বাড়ী যাও—নেয়ে খেয়ে গাড়ী নিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে আগে চেক ভাঙাও। ওখান থেকে ইস্টিশানে চলে যাও—গহনা যদি পাই সুরেশকে দিয়ে ট্রেনে পাঠাবো। মিসেস বর্মনকে খুশী রাখা চাই মোটের ওপর। দেবতাকে তুষ্ট রাখতে হোলে দেবীর পুজো না দিলে হয় না। কম্পিটিশনের বাজার, বুঝে কাজ করবে।

ডাক এল। এক গাদা চিঠি। হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি একবার দেখে নিতে নিতে শিবশঙ্কর ডেকে বললেন—ও রিতুয়া, নিয়ে যা—বড় বৌমার চিঠি, নিয়ে যা—সুলেখার—

ছোট বৌমার—ওপরে দিগে যা! আর শোন—বলে আয় আমি চান করবো এখুনি।

খাবার ঘরে পুত্রবধূ নন্দা ভাত নিয়ে এলো টেবিলে। ছোট বাটিতে কাঁচামুগের ডাল, বে-মশলার মৌরলা মাছের ঝোল আর কাগজি লেবু কাটা পৃথক ডিশে। সামান্য একটু ঘরে-পাতা দই শ্বেতপাথরের বাটিতে। শিবশঙ্কর খেয়ে হজম করতে পারেন না, লিভারের রুগী। পুত্রবধূ বললে—ও বেলা কখন ফিরবেন বাবা?

—তা কি বলতে পারি কখন ফিরবো? নানা কাজ। তারপর আজ য়্যাটর্নির সঙ্গে গুরুতর কাজ রয়েচে। কেন?

পুত্রবধূ হেসে বললে—আমরা ভাবচি বেহালা যাবো পিকনিক করতে। গাড়ীখানার দরকার ছিল—

ও—। তা—কটার সময় যাবে। গাড়ী না হয় শোভা সিং আপিস থেকে নিয়ে আসবে এখন। তোমাদের পেঁৗছে দিয়ে চলে আসবে। আসবার সময় তোমরা ট্যাক্সিতে এসো। পেঁৗছে গাড়ী ছেড়ে দিও—বিমান কোথায়? ওপরে আছে?

পুত্রবধূ মুখ নত করে বললে—তা তো জানি নে বাবা।

—তার মানে? বেরিয়েছে?

পুত্রবধূ পায়ের নখে মাটি খুঁটতে খুঁটতে সেদিকে চেয়ে থেকে উত্তর দিলে—উনি কাল রাত্তিরে তো বাড়ী আসেন নি।

—সে কি কথা! কালও আবার আসে নি—হুঁ—

শিবশঙ্কর ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, আর কিছু বললেন না।

বেলা একটা। শিবশঙ্করের আপিস বেণ্টিংক স্ট্রীটে। বেশি বড় আপিস নয়। জন আট নয় কেরানী বিবিধ খাতা নিয়ে ব্যস্ত। একজন ছোকরা টাইপরাইটারে ঠকঠক টাইপ করচে। শিবশঙ্করকে আপিসে ঢুকতে দেখে সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সন্ত্রস্ত হবার কথা।

দেখতে আপিস ছোট হোক, কিছু দিন আগে এই আপিসে বসেই শিবশঙ্কর সরকার চালের কারবারে কম করেও সাত লক্ষ টাকা মুনাফা পেয়েচেন। তেরশ' পঞ্চাশ সালে দুর্ভিক্ষের বছর। তেরো সিকে দরে ধানের মণ কিনে সাথে ষোল টাকা মণ দরে ধান বিক্রি করেন। চালের কনট্রাক্ট নিয়ে এক হাজার টন চাল খরিদ করেন ত্রিপুরা জেলা থেকে। তারপর সে দেশে চালের দর উঠে গেল চল্লিশ টাকা মণ।

ভালো করেন নি তা নয়। দেশের বাড়ীতে প্রায় দুহাজার লোককে ফেন-ভাতের খিচুড়ি খাইয়েচেন, কাপড় বিতরণ করেচেন কত লোককে। সম্প্রতি দুটি মিলিটারী কন্ট্রাক্টের কাজে শিবশঙ্কর অনেক টাকা রোজগার করেচেন। দুহাতে ঘুষ বিলিয়েও ছ লক্ষ টাকা ঘরে এনেচেন। এ বাদে খুচরো কারবার তাঁর অনেক রকম আছে, এই ছোট আপিসটাতে বসে সারা বাজারের গুপ্ত খবর রাখচেন। টেলিফোনের বিরাম বিশ্রাম নেই এক মিনিট। বাজারে তাঁর বহু চর সর্বদা ঘোরাঘুরি করচে, শেয়ার মার্কেট থেকে সর্ষে পর্যন্ত কোনো বাজারের গুপ্ত খবর ওদের জানতে বাকি নেই।

মোটের উপর শিবশঙ্করের দিন যাচ্ছে ভালো, ধুলো-মুঠো ধরলে সোনা-মুঠো হচ্ছে। আর কি অসম্ভব খাটিয়ে লোক শিবশঙ্কর। চরকির মতন ঘুরচেন এখানে ওখানে, এ আপিস ও আপিস, কত লোকের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করচেন, কত লোক তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করচে—যে লোক এমনি নরম হয় না, তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করে অগ্রসর হতে হচ্ছে, ছুঁচ যেখানে গলে না, সেখানে হাতী গলিয়ে দিচ্ছেন শিবশঙ্কর,—পয়সা কি অমনি হয়?

শিবশঙ্করের অভিজ্ঞতা এই যে, অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে দয়া মায়া চক্ষুলজ্জা ইত্যাদি দুর্বলতা। যে বিচক্ষণ কারবারী সে এ সব মানবে না। কম্পিটিশনের বাজার, চক্ষুলজ্জা এখানে খাটে না।

আর একটা অভিজ্ঞতা, অবিশ্যি বড় মূল্যবান অভিজ্ঞতা যে, ঘুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। শিবশঙ্করবাবু বলেই থাকেন—ওহে এমন লোক দেখলাম না যে পুজো পেলে খেতে চায় না। তবে বেশি আর কম। কেউ চায় ষোড়শোপচারে পুজো, কারো বা চাল কলা, কারো চিনির নৈবিদ্য—ঢের ঢের দেখলাম হে, যেখানে ভেবেচি এর কাছে কেমন করে

যাবো, এত বড় পদস্থ লোক...পুজো দাও, বাস্ সব ঠিক! সবাই সমান, তবে ওই যে বললাম, বেশী আর কম। চুরি করার সুবিধে জোটে নি যার, সেই সাধু।

বেলা একটার সময় একটি রোগা, দীর্ঘ চেহারার সাহেবি পোশাকপরা লোক শিবশঙ্করের আপিসে এসে ঢুকলো।

শিবশঙ্কর বললেন—কি খবর? আসুন, বসুন।

—বড্ড বেশি চায়।

—কত?

—সাড়ে পাঁচ করে কাঠা।

শিবশঙ্কর বিস্ময়ের সুরে বললেন—জমি কার? ব্যাঙ্কের?

—আজ্ঞে না, মাগনলাল মুখনলাল ক্ষেত্রীর। একবার মর্টগেজ আছে। রেজিস্ট্রি আপিস সার্চ করা হয়েচে।

—বড় বেশি দর বলছে না?

—ও অঞ্চলে ওর কম দর নেই। এর পরে সাত পর্যন্ত উঠবে। ন কাঠা একসঙ্গে আর পাওয়া যায় না স্যার। আপনি কাল নিজে একবার চলুন—বায়নাপত্তর রেজেস্ট্রি না করলে, দু-তিনটে খদ্দের মুখিয়ে রয়েচে।

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। অল্প খানিকক্ষণ কথা বলে শিবশঙ্কর ফোন রেখে সামনের লোকটিকে বললেন—য়্যাটর্নির আপিস থেকে বলচে হরিশ মুখুয্যের স্ট্রীটের বাড়ীটা এখুনি দেখতে যেতে হবে। চলুন না বাড়ীটা দেখে আসবেন—

উভয়ে মোটরে বার হয়ে সোজা হরিশ মুখুয্যে স্ট্রীটে সেই নম্বরের বাড়ীর সামনে এসে দেখলেন মিঃ ঘোষাল তাঁদের পূর্বেই সেখানে মোটর থামিয়ে অপেক্ষা করচেন।

বাড়ীর ওপরের নিচের সব ঘর, বাথরুম, দরদালান, ছাদ সব ঘুরে দেখা হলো। মিঃ ঘোষাল বললেন—মতামত দিন মিঃ সরকার।

—মতামত আর কি, নেওয়া হবে।

—তিন পার্সেণ্টের কথা স্মরণ রাখবেন। ও আমাদের একটা সর্ত। নয়তো আমারই হাতে দুটো খদ্দের। আপনি ক্রেতা, আপনার কাছ থেকে কমিশন নেওয়া নিয়ম নয় জানি —কিন্তু এখানে অবস্থা-অনুযায়ী ব্যবস্থা—

—সে যা হয় হবে। ইলেকট্রিক ইন্স্টলেশন নেই কেন? অত বড় বাড়ী—

—ছিল। ওয়্যারিং করে নিতে যা খরচ পড়বে তা তো আপনি এমনি বাদ পাচ্চেন। ওই বাড়ী কি দুইয়ের কমে হয়—চার লক্ষ সত্তর হাজার প'চাত্তর হাজার তো উইদাউট এনি ডাউট! আপনি বলুন, এখুনি এক মারোয়াড়ী খদ্দের—

—না, না, সে কথা বলি নি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

শিবশঙ্কর একাই আপিসে ফিরলেন, তখন বেলা পৌনে তিন।

আপিসের চাকর কারুয়া বললে—হুজুর, টেলিফোন দুবার বাজিয়েছে। হামি লম্বর লিখে রাখিয়েসে।

—কই নম্বর?

—হুজুরের ঘরের টেবিলমে আছে। মনুবাবুকে দিয়ে লিখিয়ে রাখিয়েসে। এক তো সাউথ ওয়ান ফাইভ—

শিবশঙ্কর চাকরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, তুই যা—এক পেয়ালা চা জলদি তৈরি কর—

—আউর কুছ্ বাবু?

—আজ বাড়ী থেকে টিফিন আনে নি কেউ? ফল-টল?

—না হুজুর। সড়া পোচা দু আপেল হুজুরের টেবিলমে ছিল, ও হামি ফেকিয়ে দিয়েসে—ও কালওয়ালা—

—বেশ করিচিস। যা চা নিয়ে আয়—

কারুয়া অনেক দিনের চাকর; আগে শিবশঙ্করের বাড়ীতে ছিল, এখন কাজকর্মের সুবিধের জন্যে ওকে আপিসে নিজের খাসকামরার চাকর রেখেছেন শিবশঙ্কর। শিবশঙ্কর

কি খান না খান, কি তাঁর অভ্যেস, কারুয়া এ সব জানে। কারুয়ার আনীত চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে শিবশঙ্করবাবু ভাবছিলেন আরও কিছু জমির সন্ধান নিতে হবে।

জমি বড় দরকার।

এই সব অঞ্চলে বড় বড় প্লটের সন্ধানে আছেন।

শিবশঙ্কর কাগজ-কলমে ছোট্ট একটু হিসেব করে দিলেন। লাখ দুই টাকার জমি কিনে রাখতে হবে। টালিগঞ্জের দিকে কিছু জমি এখনো আছে। ব্যাঙ্কের জমি কিছু আছে লেক আর ঢাকুরে যাদবপুর অঞ্চলে।

'টাকা হোলে মাটি করো' মস্ত বড় কথা। অত বড় ইনভেস্টমেণ্ট নেই টাকার। দালালেরা নানারকম সন্ধান নিয়ে আসে। তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে আছে জমিজমা-সংক্রান্ত নানা রকম খবর, দালালদের দেওয়া। শিবশঙ্করবাবু ড্রয়ার খুলে অর্ধ-অন্যমনস্ক ভাবে সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেন। মেদিনীপুর জেলায় শালের জঙ্গল একশো কুড়ি বিঘে এক প্লটে। ধানের জমি ওই সাথে এক প্লটে সত্তর বিঘে, মাঝখানে বড় পুকুর।

বর্ধমান জেলায় ধানের জমি নব্বুই বিঘে। বনপাশ স্টেশনের কাছে।

কুমারডি কয়লাখনির এক তৃতীয়াংশের মালিকানা স্বত্ব, বড় বাংলোঘর, ইঁদারা, ছোট বাগান একত্রে।

রানাঘাট টাউনে রেলের নিকট স্টেশন রোডের ওপর দুখানা বাড়ী, রেলের ওপারে বাইশ বিঘের সেগুন বাগান, ইঁটের ভাঁটা।

যশোর জেলায় মৌজা ধরমপুর ও মৌজা চণ্ডীরামপুর—দুইটি বড় মৌজা নীলামে উঠেচে। সামনের মাসের বারোই তারিখে যশোর সদরে নীলাম হবে। লোক পাঠিয়ে শিবশঙ্কর জেনেচেন মৌজার আদায় ভালো, একাত্তরটি জমার মধ্যে উনিশটি খাস হয়ে গিয়েচে এবং আশা আছে আরও আটটি জমা এই বছরের মধ্যেই খাস হবে। বাকী খাজনা পড়ে আছে প্রজাদের কাছে কয়েক হাজার টাকা।

হাজারিবাগ জেলায় সিংজানি-ভোজুড়ি অভ্রের খনি ও শালবন, বাংলো, ইঁদারা এবং কিছু ধানের জমি।

উল্টোডিঙির খাল ধার থেকে সামান্য দূরে মহেশচন্দ্র সিমলাইয়ের বাগানবাড়ী ও পুকুর, বাগানে জমির পরিমাণ দশ বিঘে। কলমের আম, লিচু, ফলসা, ম্যাঙ্গোস্টিন প্রভৃতি ফলের গাছ। দোতলা বাড়ী।

অভ্রের খনির ওপর ঝোঁক বেশি শিবশঙ্করের। দু-পার্সেণ্টের অনেক বেশি আসবে টাকার ওপর। স্বাস্থ্যকর স্থান, মাঝে মাঝে গিয়ে থাকাও যাবে, কলকাতায় তো যা খান হজম হয় না, লিভারের রোগে কষ্ট পাচ্চেন।

আর বাকী সব পাড়াগাঁয়ে জমিজমা, ধানক্ষেত—নাঃ ওদের কি মূল্য আছে? জমি কিনতে গেলে কলকাতায়। কলকাতার সম্পত্তির মত সম্পত্তি নেই—বাড়ী বা জমি। মহেশ সিমলাইয়ের বাগানবাড়ী ভালো, ফলবান গাছ অনেকগুলো, নার্সারি করবার জন্যে কেউ ভাড়া নিতে পারে, অনেকখানি জমি—মূল্যবান সম্পত্তি হয়ে উঠতে পারে দু-চার বছর পরে। দালালে বলচে আটষট্টি হাজার, তিনি বলচেন পঞ্চাশ হাজার। যদি ওটা হয়, তবে খুবই ভালো।

শিবশঙ্কর ফেঁপে উঠলেন তো সেদিন। ক'বছরের কথা আর? কি ছিল শিবশঙ্করের? বারাসাতের কাছে ভবনহাটি বিষ্ণুপুর, ক্ষুদ্র গ্রাম, সেখানেই পৈতৃক বাড়ী। অবিশ্যি নিতান্ত গরীব ছিলেন না, সেকেলে বড় গৃহস্থ, তবে ইদানীং নামেই ছিল তালপুকুর, ঘটি ডুবতো না।

নিজের বুদ্ধিতে শিবশঙ্কর সব করেচেন। বীরের মত করেচেন, বীরের মতই ভোগ করে যাচ্ছেন শিবশঙ্কর। এখনো হয় নি, লেক অঞ্চলে বড় একখানা বাড়ী করবার শখ তাঁর, কিন্তু পছন্দসই জমি পাচ্ছেন না।

তেজপুরের কাজটা যদি হাতে এসে যায়, তবে নির্ঘাত তিন লক্ষ ঘরে আসবে। হিসেব করে দেখা আছে তাঁর। এই বছরের শেষেই টাকাটা হাতে আসতে পারে, যদি বিলের টাকা গভর্নমেণ্ট এ বছরেই শোধ করে। পুজো দিলে শেষের ব্যবস্থা চটপট হয়ে যাবে।

শিবশংকরকে কাজ শেখাতে হবে না, ঘুঘু হয়ে বসে আছেন তিনি। অনেস্টি বলে জিনিস নেই এ বাজারে। অনেস্টি একটা মুখের কথা মাত্র। কম্পিটিশনের বাজার, অনেস্টিতে হয় না। টাকা...টাকা...চাই, টাকা। দুনিয়াতে টাকা ছাড়া আর কিছু নেই। টাকা যে পথে আসে আসুক। টাকা রোজগারের এই তো সময়। যুদ্ধের বাজারে যে যা করে নিতে পারে। কলকাতার হাওয়ায় টাকা উড়চে...যার বুদ্ধি আছে ধরে নাও। কিছুই এখনো রোজগার করা হয় নি। অনেক কিছুই বাকী।

কেবল একটা ব্যাপার শিবশংকরকে বড় চিন্তিত করে তুলেচে।

বড় ছেলে বিমান প্রায়ই রাত্রে বাড়ী আসে না। নিজের আলাদা একখানা মোটর কিনেচে। নানা রকম কথা কানে গিয়েচে শিবশংকরের। ঠিক বুঝতে পারচেন না এখনও তিনি। বিমান এমন ছিল না। বড় বৌমা প্রায়ই কাঁদেন, সুলেখার মুখে শুনতে পান তিনি। গিন্নি কিছু বলেন না, এজন্যে গিন্নির ওপর শিবশংকর সন্তুষ্ট নন। গিন্নির প্রশ্রয় না পেলে বিমান এমন হতে পারতো না। যত নির্বোধ নিয়ে হয়েছে তাঁর সংসার।

টেলিফোন বেজে উঠে শিবশংকরের চিন্তাজাল ছিন্ন করে দিলে। —হ্যাঁ, কে? ও আচ্ছা—বেশ, বেশ। তুমি চলেই এসো এখানে। দেরি করো না।

একটি শৌখীন বাবুমত লোক, চোখে সোনাবাঁধানো চশমা, ঘরে ঢুকলো দশ মিনিট পরে। এই লোকটি ঘরে ঢোকবার পরে শিবশংকর সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের দরজার দিকে দু-তিনবার চাইলেন। লোকটি চাপা মৃদুস্বরে মিনিট দশেক কথা বলে তারপর হঠাৎ স্বাভাবিক সুরে ফিরে এসে বললে—বেশ, যাই তা হোলে।

—বোসো, বোসো—

—বুঝতে পারলে না? সামলে রাখতে বলিগে যাই! সিনেমায় আজকাল নাম করে উঠেচে ঠেলে, দেখতে পরমা রূপসী—মৌমাছির ঝাঁক কম নয়। বুঝতে পারলে না? ঠিক আটটাতে—

বেলা ছটার পরে শিবশংকর ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিলেন—শোভা সিং, চলা যাও বেহালামে। বৌমাদের লে আও। হাম ট্যাক্সিমে যায়েঙ্গে। ঠিক করে লে আও, যেন মিলিটারি গাড়ীমে ধাক্কা মৎ লাগে—

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর—বলে শোভা সিং গাড়ী নিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত আপিসে নানা কাজ সেরে সাড়ে সাতটার সময় শিবশংকর ট্যাক্সি নিয়ে বার হোলেন। ভবানীপুরের একটা ছোট গলির মধ্যে গাড়ী ঢুকলো। আগের শৌখীন লোকটি বারান্দা থেকে নেমে এসে বললে—এসো ভায়া, এসো—চা খাবে না?

—আর এখন চা নয়। চলো—

—এখনো দেরি আছে। আমি কাপড় পরে নি। আসচি—

দুজনে আবার গাড়ী নিয়ে চললেন—বেলতলা রোডের পার্কের কাছাকাছি একটা বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী দাঁড়ালো। দুজনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। লোকটি বললে—আমি ফোন করেছিলুম, আটটার সময় সব সরিয়ে দিও। খুব সুন্দরী, আর বয়েস উনিশের বেশী নয়। নিজের চোখেই দ্যাখো ভায়া, এ শর্মার নাম গোপাল চক্কোত্তি। মাসে চারশোতেই রাজি করিয়ে দেবো—তুমি শুধু দেখে যাও—সিনেমাতে আজকাল নাম কি! যত সব চ্যাংড়া ছোকরার ভিড় সেই জন্যে—

ওপরে দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর বারান্দা, ফুলের টব সাজানো। অর্কিডের টব ঝুলচে বারান্দার ছাদের প্রান্ত থেকে।

সঙ্গী লোকটি কড়া নাড়তেই ওদিকের দরজা দিয়ে যে তরুণটি সিগারেট মুখে বেরিয়ে এসে পাশের সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেল—শিবশংকর যেন ভূত দেখলেন তাকে দেখে।

শিবশংকরের সঙ্গী বললে—ওই দ্যাখো, যত সব ছেলে ছোকরার মরণ—সিনেমার ইয়ে কিনা? আসল কম্পিটিশন হচ্চে এদের কাছে টাকায়—সে কম্পিটিশনে দাঁড়ানো চ্যাংড়াদের কর্ম নয়—ও কি! দাঁড়ালে যে? কি হোলো?

শিবশংকর তৎক্ষণ দম নিলেন।

যে ওদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, সে বিমান, তাঁর ছেলে বিমান।

চিঠিখানা পাইয়া বড়ই রাগ হইল। সকালে চা পান করিয়া সবে সেরেস্তায় আসিয়া বসিয়াছি, আর অমনি পিওন আসিল। ঘড়িতে দেখিলাম মাত্র আটটা। বলিলাম—আজ এত সকালে?

পিওন বলিল—না বাবু, সকাল আর কই? আপনার দুটো মনিঅর্ডার আছে, ভাবলাম আগে বিলি করে তবে অন্য জায়গায় যাই—একটু পরে মক্কেলের ভিড় হোলে তখন আপনি ফুরসত পাবেন না হয়তো। নিন, সই দুটো করে দিন—পঞ্চাশ টাকা আর আটাশ টাকা এগারো আনা—

মক্কেলদের টাকা অবশ্য। কোর্টের খরচ। বিজন মুহুরীকে ডাকিয়া বলিলাম—দ্যাখো তো এসমাইল বদ্দি বাদী, ফজলুল গাজি বিবাদী। কেসের তারিখটা কত?

বিজন আমাদের সেরেস্তায় অনেকদিনের মুহুরী। আমার ও আমার দাদার। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আমল হইতে উহারা এখানে আছে। বিজনের বাবা 'রামলাল চক্রবর্তী আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মুহুরী ছিলেন। আমাকে ও আমার দাদাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। বিজনের সঙ্গে বাল্যে খেলাধুলা করিয়াছি. আবার সেই বিজন আমাদের সেরেস্তায় মুহুরীগিরি করিতেছেও আজ বাইশ বৎসর। খুব হুঁশিয়ার লোক।

বিজন খাতা দেখিয়া বলিল—২২শে আগস্ট। কত টাকা পাঠিয়েচে এসমাইল?

—আটাশ টাকা এগারো আনা—

—ফেরত দিন মনিঅর্ডার, সই করবেন না বাবু—

—কেন?

—আপনার চার টাকা আর কোর্টফির দরুন আমার কাছে ধার দু টাকা ওর মধ্যে ধরা নেই।

—ঠিক তো?

—ঠিক বাবু, এই দেখুন খাতা—

লিখিয়া দিলাম 'রিফিউজ্‌ড'। অন্যটি সই করিয়া লইলাম, মুহুরীকে বলিলাম—টাকা দেখে নাও। ভজু চাকর আসিয়া বলিল—বাবু বাজারের টাকা—

—দাদার কাছে নিগে যা—

—তিনি বাড়ী নেই। বেরিয়ে ফেরেন নি এখনো। মা ঠাকরুন বলে দিলেন, মাছ এক সের আর মাংস এক সের লাগবে।

—মাংস আবার কি হবে আজ? আঃ, বিরক্ত করলে সব। খরচ করেই সব উড়িয়ে দিলে। রোজ মাংস। নিয়ে যা একখানা নোট—বিজন একখানা দশ টাকার নোট দাও তো ফেলে এদিকে। দুধের তিন টাকা শোধ করে দিয়ে আসবি আজ। বুঝলি?

পিওন হাসিয়া বলিল—বাবু, আপনাদের বড় সংসারে আপনারা যদি রোজ মাংস না খাবেন তো খাবো কি আমরা? আপনাদের দিয়েচেন ভগবান খেতে। আপনারা খাবেন না? ও আড়াই টাকা মাছের সের হোলেও আপনাদের গায়ে লাগে না, তিন টাকা হোলেও আপনাদের গায়ে লাগে না। আমরা এক টাকাতেই মরি।

পিওন ও চাকর চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমার ইঙ্গিতে বিজন পিওনকে একটা সিকি ফেলিয়া দিল। দুজন চাষীলোক ঘরে ঢুকিয়া বলিল—বাবু ছালাম। শরৎবাবু উকিলের বাড়ী কি এডা?

—হ্যাঁ, কেন?

—একটা মকদ্দমা আছে বাবু। আরজি করে দিতে হবে একটা—

—কি কেস? কোথায় বাড়ী?

—বাবু, আমার বাড়ী রাইপুর আর এ আমার খালাতো ভাই, এর বাড়ী ন-হাটা। আমাদের একটা আমবাগান ছেল—তা আমার চাচা হবিবর সেখ—

মক্কেল জটিল গল্প ফাঁদিবে বুঝিয়া বিজন মুহুরীকে বলিলাম—এদের কেস শোনো।

আমি ততক্ষণ ডাকের চিঠিগুলো দেখে নি—খবরের কাগজখানা চোখ বুলিয়ে যাই। যাও তোমরা ওদিকে যাও—টাকা এনেচ সঙ্গে?

—হ্যাঁ বাবু।

—কত টাকা? আরজি করার ফি ছ টাকা লাগবে। সব জিনিসের দাম বেড়েচে, চার টাকায় আর হবে না।

—তা দেবো বাবু ঝা লাগে—আমাদের শুনুন তবে বাবু কি নেগগেরো, এই আমার খালাতো ভাই—

—যাও ওদিকে যাও—

এইবার ডাকের চিঠি খুলিতে খুলিতে এই চিঠিখানা পাইলাম। পড়িয়া বিরক্তি বোধ হইল। চিঠিখানা এই—

শুভাশীর্বাদমস্তু রাশয় বিশেষঃ

বাপজীবন অত্র সকল কুশল জানিবা। তোমাদের অনেকদিন কোনো সংবাদ পাই নাই। পরে লিখি যে আমাদের গৃহদেবতা শালগ্রামের পূজার জন্য তোমরা যে দু' টাকা এগারো আনা প্রতি মাসে পাঠাইয়া থাক, তাহা এ যাবৎ নিয়মিত পাইয়া আসিতেছি। কিন্তু লিখি যে বর্তমান অবস্থায় সকল জিনিস আক্রা। এক সের আলো চাউলের মূল্য মাখমহাটির বাজারে আট হইতে দশ আনা। একটি পাকা কলা এক পয়সা মূল্যে হাটে বিকায়। এ অবস্থায় পূজার দরুন প্রতি মাসে ছয় টাকা করিয়া না দিলে আর পারা যাইতেছে না। সকল দিকে বিবেচনা করিয়া আগামী মাস হইতে ছয় টাকা করিয়া পাঠাইবে। খুড়ো মহাশয় রামধন চক্রবর্তী সম্প্রতি পায়ে আঘাত পাইয়া বড় কষ্ট পাইতেছেন জানিবা। বধূমাতাদের আশীর্বাদ জানাইবা।

ইতি—

সাং বাহিরগাছি নিত্যাশীর্বাদক
বর্ধমান জেলা শ্রীহরিসাধন দেবশর্মা

একটু পরে দাদা বেড়াইয়া ফিরিলেন, তাঁর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বিজনকে বলিলাম—একবার বড়বাবুকে ডাক দাও তো। উনি বোধ হয় সেরেস্তায় গিয়ে বসেচেন।

দাদা আসিয়া বলিলেন—কি রে?

—এই দেখো হরি ভট্চাজ আজ দেশ থেকে চিঠি লিখেচে, ছ টাকা না পাঠালে মাসে মাসে আর সে ঠাকুরপুজো করবে না।

দাদা পত্র পড়িয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—ও! ঠাকুর-পুজোতেও ব্ল্যাক মার্কেট! দয়া করে তো টাকা দিচ্ছি। নামেই পৈতৃক ভিটে, কখনো যাইও নে। জ্ঞাতিরা বাড়ীতে আছে। ও টাকা তো স্টাইপেন্ডের সমান দিচ্চি আমরা। বেশ, না পুজো করেন, না করবেন। টাকা একদম বন্ধ করে দাও সামনের মাসে। গৃহই নেই তো গৃহদেবতা।

তাহাই করিলাম। দু মাস কোনো টাকা গেল না। চিঠিপত্রও নয়।

দু মাস পরে আর এক চিঠি দেশের। খুলিয়া পড়িলাম—

শুভাশীর্বাদমস্তু রাশয় বিশেষঃ

অত্র পত্রে কুশল জানিবা। পরে লিখি যে বাবাজীবন তোমাদের পৈতৃক গৃহদেবতা শালগ্রাম সেবার জন্য যে দুটাকা এগারো আনা করিয়া মাসে মাসে পাঠাইয়া থাকো তাহা আজ দুই মাস বন্ধ হওয়ার কারণ কিছু বুঝিলাম না। আমরা তোমাদের বংশের কুলপুরোহিত। বর্তমানে অবস্থা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। যাহা পাঠাইতেছিলে না দিলে পূজাও বন্ধ হয়, সংসারের সাহায্যও পাওয়া যায় না। অতএব টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিবা না। খুড়া মহাশয় সম্প্রতি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন! পত্রপাঠ টাকা মনি অর্ডার যোগে পাঠাইবা। বধূমাতাদের আশীর্বাদ দিবা।

ইতি—

সাং বাহিরগাছি নিত্যাশীর্বাদক
বর্ধমান জেলা শ্রীহরিসাধন দেবশর্মা

দাদাকে পড়াইলাম। দাদা বলিলেন—দাও পাঠিয়ে। বদমাইশি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েচে। ব্ল্যাক মার্কেট করতে এসেচে ঠাকুরপুজোয়!

সেইদিনই দাদার বড় ছেলে—শুভেন্দু কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিল। তাহার পরনে কাঁচি ধুতি দেখিয়া বলিলাম—এ কোথায় পেলি রে? কত নিলে?

শুভেন্দু প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। দাদার বড় ছেলে। বেশ শৌখীন। সে হাসিয়া বলিল—কাকা, কত বলো তো?

—কি জানি বাপু, আমরা বুড়ো মানুষ। ও সব আগে তো পাঁচ-ছ টাকা ছিল।

—ত্রিশ টাকা একখানা। তাও লুকিয়ে এক দোকান থেকে সন্ধ্যের পর কেনা। এমনি কোথাও মেলবার জো নেই। ভাল না? জরির আঁজি দ্যাখো—

এই সময়ে দাদাও আসিলেন। দুজনেই কাপড় দেখিলাম। দেখিয়া শুভেন্দুর ক্রয়-নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

রাসু হাড়ি

সে বার আষাঢ় মাসে আমাদের বাড়ী একজন লোক এসে জুটলো। গরীব লোক খেতে পায় না, তার নাম রাসু হাড়ি। আমরা তাকে সাতটাকা মাইনে মাসে ঠিক করে বাড়ীর চাকর হিসেবে রেখে দিলাম। প্রধানতঃ সে গরু বাছুর দেখাশুনো করতো, ঘাস কেটে আনত নদীর চর থেকে, সানি মেখে দিত খোল জল দিয়ে।

বাবা মারা গিয়েছিলেন আমাদের অল্প বয়সে। তিন ভাইয়ের মধ্যে আমিই বড়, লেখাপড়া আমার গ্রাম্য পাঠশালা পর্যন্ত। ছোট ভাই দুটি ডাণ্ডাগুলি খেলে বেড়াতো, এখন চাষের কাজে আমাকে সাহায্য করে।

রাসু বছরখানেক কাজ করার পরে একদিন রাত্রে আমাদের বড় বলদজোড়া নিয়ে অন্তর্ধান হ'ল। আমাদের চক্ষুস্থির, তখনকার সস্তার দিনেও গরুজোড়ার দাম দুশো টাকা। আমার ছোট ভাই সত্যচরণের (ডাক নাম নেণ্টু) বড় সাধের বলদ, সে ভালো গাড়ী চালাতে পারতো বলে শখ করে জন্তিপুরের গোহাটা থেকে ওই গরুজোড়া কিনে এনেছিল।

ভোরবেলা মা ওঠেন সকলের আগে। সেদিন উঠে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে দেখেন রাসু নেই, যে কম্বলখানা গায়ে দিয়ে শুতো সেখানাও নেই। গোয়ালে দেখেন বলদজোড়াও নেই।

আমাকে উঠিয়ে বললেন, হ্যাঁরে নীলে, রাসু গেল কোথায় জানিস?

আমার তখন বিয়ে হয়নি, সত্য আর আমি এক ঘরে শুই। আমি উঠে চোখ মুছতে মুছতে বললাম, তা কি জানি? মাঠের দিকে গেল না তো?

—এত ভোরে সে কোনদিন মাঠে যায় না, আজ গেল কেন? বড় গরুজোড়াও তো দেখচি নে।

—গরুকে কি মাঠে খাওয়াতে নিয়ে গেল?

—এত সকালে আর এই শীতে? কখনো তো যায় না।

—তাই তো। দাঁড়াও উঠি আগে।

বহু খোঁজাখুজি করা হ'ল সারাদিন ধরে।

রাসু হাড়ি না-পাত্তা। নির্ঘাত ভেগেছে গরুজোড়া নিয়ে। অমন গরুজোড়া!

সত্য তো পাগলের মত হয়ে গেল। ওর গায়ে খুব জোর, খুব সাহসী আর তেজী ছোকরা। বললে, দাদা, চল, ওর বাড়ী সেই বেলডাঙ্গা যাবো।

—কে যাবে?

—তুমি আর আমি।

—জানিস ওর বাড়ীর ঠিকানা?

—বেলডাঙ্গা থানা, মাঠডা-বেনাদহ গ্রামে। ও দুবার চিঠি পাঠিয়েছে ওই ঠিকানায়।

—ডাকঘর?

—ওই বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ।

—বাবাঃ, সে কদ্দূর এখেন থেকে! ও থাকগে।

সত্য কিছুতেই শুনলো না। তার পীড়াপীড়িতে দুই ভাই পুঁটুলি নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুলাম। বত্রিশ টাকা সঙ্গে নিয়ে।

সোজা গিয়ে বেলডাঙ্গা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলাম।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল মাঠডা-বেনাদহ এখান থেকে তিন মাইলের মধ্যে। বেলডাঙ্গার থানাতে গিয়ে দারোগাবাবুকে সব খুলে বললাম। তাঁর নাম পঞ্চানন রায়, বাড়ী হুগলী জেলা। আমাদের মুখে সব শুনে তাঁর দয়া হ'ল। আমাদের বললেন, সেখানে কিছুদিন থাকতে, অন্ততঃ এক সপ্তাহ। সাধারণ পোশাকে তিনি দু'জন কনেস্টবলকে সঙ্গে নিয়ে নিজে বেনাদহ গ্রামে গিয়ে খবর নিয়ে এলেন, সে বাড়ী নেই।

আমাদের বললেন, থানায় রাত্রে শুয়ে থাকবেন, কোন অসুবিধে হবে না। রেঁধে খেতে পারেন। কিম্বা যদি না রেঁধে খেতে চান আমার এক ছত্রি কনস্টেবল আছে—

সত্য বললে, কিছু না দারোগাবাবু, আমরা রান্না করেই নেবো।

থানার উত্তরে বড় এক পুকুর, পুকুরের পাড়ে উলুটি বাচড়া ও তাল গাছ। আমাদের যশোরের ভাষায় উলুটি বাচড়া বলে উলুঘাসে ঢাকা মাঠকে। দেখে সত্য খুব খুশী। বলে, দাদা, ওই তালগাছের তলায় আধ-ছায়া আধ-রৌদ্রে বসে রাঁধবো।

দিন কয়েক সেখানে থাকা হ'ল, বেনাদহ গিয়ে রাসু হাড়ির সন্ধান সব সময়ে নেওয়া হচ্ছে। কখনো রাত দুপুরে, কখনো দিন দুপুরে, কখনো খুব ভোর বেলায়। গাঁয়ের লোকে বলে সে যশোর জেলায় ব্রাহ্মণদের বাড়ী চাকরি করে। এখানে থাকে না তো। আজ এক বছরের মধ্যে তাকে গাঁয়ে দেখা যায় নি।

সুতরাং সাত দিন পরে আমরা রাসু হাড়িকে অপ্রকট অবস্থায় রেখেই বেলডাঙ্গা থেকে রওনা হলাম বাড়ীর দিকে।

সত্য বললে, দাদা, পয়সা নেই হাতে, তা-ছাড়া রাস্তা দেখে যেতে হবে। যদি এমন হয় পথ দিয়ে গরু তাড়িয়ে বাড়ীর দিকে আসচে। চলো হেঁটে বাড়ী ফিরি।

—সে কি রে, এখান থেকে যশোর জেলা, পথটি যে সোজা নয়। পারবি হাঁটতে?

—গরুজোড়া ফেরত পাওয়ার জন্যে সব করতে পারি দাদা। আমার গাড়ী চালানো একদম বন্ধ হয়ে গেল ওই গরুজোড়ার অভাবে।

অতএব নামলাম দুই ভাই পথে।

বেলডাঙ্গার বাজার থেকে চালডাল কিনে নিই। হাড়ি-সরা কিনে বোঁচকায় বেঁধে নিলাম। প্রথম দিন রাস্তার ধারে এক আমতলায় রান্না করে খেলাম। বেশ লাগে কিন্তু এভাবে পথ চলতে। ঘর থেকে কখনো বেরুই নি, এতদূরেও জীবনে কখনো আসি নি, রাসু হাড়ির দৌলতে অনেক দেশ দেখলাম।

সত্য বললে, দাদা, হাঁড়ি ফেলে দিয়ে কাজ নেই। বড্ড দাম হাঁড়ির। ধুয়ে নিয়ে আসি পুকুর থেকে, বোঁচকায় বেঁধে নিই। নইলে কত পয়সা লেগে যাবে রোজ হাঁড়ি কিনতে।

সন্ধ্যার আগে আশ্রয় নেবার জন্যে একটা কি গ্রামে ঢুকে সামনের একটা বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাড়ীর লোকেরা ঘুঁটের আগুন পোয়াচ্চে উঠোনে। আমাদের কথা শুনে বললে, এখানে জায়গা হবে না। আমাদের তাই থাকবার জায়গা নেই। এগিয়ে গিয়ে গাঁয়ের মধ্যে দ্যাখো গে।

কিছুদূর গিয়ে আর একটি বাড়ী পেলাম রাস্তার বাঁ-ধারে। বাড়ীর সামনে গোয়াল-ঘর, প্রথম শীতে লাউ গাছে মাচাভরা লাউ ঝুলচে। মেটেঘর দু'তিনখানা, উঠোনের পেছন দিকে এক ঝাড় তলদা বাঁশ। বুড়ো-মত একটা লোক তামাক খাচ্ছিল দাওয়ায় বসে। আমাদের দেখে বললে—কে তোমরা?

আমি বললাম, পথ-চলতি লোক।

—এখানে কি মনে করে?

—একটু থাকবার জায়গা দ্যাও কর্তা। অনেক দূর থেকে আসচি, বড় কষ্ট হয়েচে।

—তোমরা?

—আমরা ব্রাহ্মণ।

—গিয়েছিলে কোথায়?

তখন সব কথা খুলে ওকে বললাম। রাসু হাড়ির আনুপূর্বিক ঘটনা। লোকটা নির্বিকার ভাবে তামাক টানতে টানতে সব শুনলে। আমাদের কথা শেষ হয়ে গেলে হুঁকোয় শেষ টান দিয়ে পিচ্ করে থুতু ফেলে শান্ত ও ধীরভাবে বললে, এখানে থাকার অসুবিধে। আগে দ্যাখো—

—এই দাওয়াটায় না হয় শুয়ে থাকবো। এই শীতে—

—এখানে সুবিধে হবে না।

সত্য বললে, এগিয়ে চলো দাদা। এখানে দরকার নেই।

কিছুদূর গিয়ে আমরা একটা বাড়ীর পেছন দিকটাতে পৌঁছলাম। বাড়ীর মধ্যে মুড়ি ভাজার গন্ধ বেরুচ্চে এবং খোলা হাঁড়িতে মুড়ি ভাজার চড়বড় শব্দ হচ্চে। আমরা ঘরে গিয়ে বাড়ীর উঠানে ঢুকলাম। একটা কালোমত বেঁটে লোক বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। আমাদের দিকে কটমট করে চেয়ে বললে, কে তোমরা? কি চাই?

—আমরা বিদেশী পথিক, বেলডাঙ্গা থেকে আসচি। একটু থাকবার জায়গা হবে রাত্তিরে?

—কি জাত তোমরা?

—ব্রাহ্মণ। আমাদের সঙ্গে চালডাল আছে, নিজেরা রেঁধে খাবো।

লোকটা যেন একটু নরম হয়ে বললে, দাঁড়াও জিগ্যেস করে আসি।

বাড়ীর মধ্যে থেকে এবার বেরিয়ে এল একটি মেয়েমানুষ, কালো, ঢেঙা, হাতে কুঁচ-কাঠি। ইনিই মুড়ি ভাজছিলেন তা হ'লে। আমাদের দিকে চেয়ে বললে, কে গা তোমরা?

—আমরা ব্রাহ্মণ, একটু থাকবার জায়গা চাই।

—এখানে জায়গা হবে না। আগে দ্যাখো।

—আগে কোথায় দেখবো?

—ওমা, তোমরা জানো না নাকি? আগে কত লোক আছে—দ্যাখো গে যাও।

—আমরা নতুন লোক। কি ক'রে জানবো লোক আছে কি না।

—সামনে এগিয়ে দেখ না।

—জায়গা একটু হবে না? আমরা নিজেরা রেঁধে খেতাম।

—বার বার বলছি হবে না, তুমি বাপু কি রকম লোক?

বলেই মেয়েমানুষটি আমাদের দিকে পিছন ফিরে একপাক ঘুরে চলে গেল বিরক্তভাবে।

সত্য বললে—দাদা, উপায়? কেউ তো জায়গা দেয় না দেখচি। রাত বেশ হ'ল।

—চ'ল দেখি এগিয়ে?

—আমাদের কি চোর-ডাকাত ভাবচে নাকি?

—কি ক'রে বলবো, চল্ দেখি এগিয়ে।

এবার একটা পাকা দালান-বাড়ীর বাইরের রোয়াকে আমরা ক্লান্তভাবে এসে বসে পড়লাম বোঁচকা নামিয়ে। অনেকক্ষণ পরে একজন লোক বাড়ী থেকে বের হয়ে কোথায় যাচ্ছিল লণ্ঠন হাতে, আমাদের দেখে বিস্ময়ের ভাবে বললে—কে তোমরা?

আমি বললাম—একটুখানি শুয়ে থাকবার জায়গা দেবেন রাত্তিরে? আমরা ব্রাহ্মণ, বাড়ী যশোর জেলা, বেলডাঙা থেকে আসচি।

—হেঁটে আসচো?

—হ্যাঁ।

—তা থাকো শুয়ে।

ব্যাস, এই পর্যন্ত। বললে না উঠে বৈঠকখানার মধ্যে গিয়ে শোও, কিম্বা তোমরা খাবে কি, কিছু না। সেই যে গেল, আর তাকে দেখলামও না। আর কোন খোঁজখবরও ও নিলে না আমাদের।

সেই শীতের রাত্রে খোলা রোয়াকে কাপড় পেতে দুই ভাই শুয়ে রইলাম—কি করি!

সত্য বললে—রাসু হাড়ির সঙ্গে একবার দেখা হ'ত, তার মুণ্ডুটা ভেঙে দিতাম এক ঘুষিতে।

সত্য বেশ জোয়ান ছোকরা, খেতেও পারতো অসম্ভব। একসের রান্না-করা মাংস আর আধসের চালের ভাত একা খেতে পারতো।

বেলডাঙ্গার বাজারে সস্তা ডিম দেখে ও বলতো—দাদা, রোজ চারটে ডিম এক একবারে ভাতে দিও আমার জন্যে। খুব করে ডিম খেয়ে নিই।

আরও বেশী করে তার কথা মনে পড়চে কারণ—

কিন্তু থাক সে সব এখন।

আরও একদিন কাটল পথে।

বেথুয়াডহরি ছাড়ালাম। আরও এগিয়ে যাই দুজনে। জগদানন্দপুর বলে গ্রামের হাটে বড় একটা মাছ কিনলাম, বেলা দশটার পরে। খিদেও পেয়েচে বেশ। একটা বড় পুকুরের ধারে আম গাছের ছায়ায় সত্য উনুন খুঁড়তে লাগলো, আমি মাছ কুটবার ছাই কি ক'রে যোগাড় করি তাই ভাবচি, এমন সময় সত্য বললে—ওই দ্যাখো দাদা—

যা দেখলাম তা এখনো মনে আছে। আজ এই চোদ্দ পনেরো বছর পরেও—

একটি সুন্দরী বৌ গামছা কাঁধে নিয়ে আমাদের দিকে আসতে আসতে পথের অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন থমকে। আমরা রান্না করতে বসেছি পথের ধারেই। এই পথটা নিশ্চয়ই পুকুরঘাটে যাওয়ার পথ। বৌটি অপরিচিত লোকদের দেখে ঘাটে যেতে পারচেন না। ভদ্রলোকের মেয়েদের স্নানের ঘাটে যাবার পথের ধারে আমাদের রান্না করতে বসা উচিত হয় নি।

সত্য বললে—দাদা, ঘাটের পথে বসেচি, কি করি, উঠে যাবো?

হঠাৎ দেখি বৌটি যেন আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে ফিরে গেলেন। অমন রূপসী বৌ এমন পাড়াগাঁয়ে দেখবো আশা করি নি। আমাদের ভয়ও হ'ল। সত্য বললে—যাঃ, ফিরে চলে গেল বৌটি। আমরা না বুঝে অন্যায় করে ফেলেচি—চলো সরে যাই।

পরক্ষণেই ভয়ের সুরে বললে—দাদা, লোক আসচে এদিকে, বৌটি গিয়ে বাড়ীতে বলে দিয়েচে—চলো পালাই—মারবে—

আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম—কেন, পালাতে হবে কেন? কি করেচি আমরা; মার বুঝি সস্তা?

দুটি ছোকরা এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালো,—আপনারা আসচেন কোথা থেকে?

আমি বললাম, বেলডাঙা।

—যাবেন কোথায়?

—যশোর জেলা।

—আপনারা ব্রাহ্মণ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিছু মনে করবেন না। আমাদের খুড়ীমা (আমরা ভাবচি, এই রে! এইবার আসল কথা বলবে) এসেছিলেন ঘাটে নাইতে। তিনি ফিরে গিয়ে বললেন, দুটি ব্রাহ্মণের ছেলে আমাদের বাড়ীর সামনে উনুন খুঁড়ে রেঁধে খেতে যাচ্চে এই দুপুর বেলা। ও'দের গিয়ে বাড়ীতে ডেকে আনো। তা আপনারা দয়া ক'রে চলুন আমাদের ওখানে। আমি জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্চি।

আমরা তো অবাক! এমন কথা বিদেশে কখনো শুনি নি। লোকে একটু শোবার জায়গাই দিতে চায় না, আর কি না রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে যেতে চাইছে। সত্য বললে, ও দাদা।

—কি?

—যাবে নাকি?

ছোকরা দুটি বলে—যেতেই হবে। খুড়ীমা নইলে ছাড়বেন না। আমাদের ওপর হুকুম, নিয়ে যেতেই হবে আপনাদের। নে বলাই, ও'দের বোঁচকা দুটো তোল—

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি, সত্য আর আমি। আমাদের কোনো আপত্তিই গ্রাহ্য

করলে না ওরা, নিয়েই গেল। একতলা কোঠা বাড়ী, বাড়ীর উঠানে ডান দিকে দুটো বড় গোলা, তার পাশেই গোয়ালবাড়ী, সামনে ছোট বৈঠকখানা। আমরা বাড়ীর উঠানে পা দিতেই একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বল্লেন—আসুন আসুন—আপনারা ব্রাহ্মণের ছেলে, এই দুপুর বেলা বাড়ীর সামনে রেঁধে খাবেন, এ কখনো হয়? বড় বৌমা দেখে এসে বললেন, ওঁদের নিয়ে এসো বাড়ীতে। আসুন, বসুন—

আমরা তত লেখাপড়া জানিনে, চাষবাস করে খাই। শিক্ষিত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের মিশতে ভয় হয়। বিশেষ করে তো সত্যর। সে গরুর গাড়ী চালায়, সে বললে—দাদা, এগিয়ে যাও—

এগিয়ে গেলাম আমিই।

ওরা আমাদের নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসালে। পা ধোয়ার জল এনে দিলে। তারপর এল চা আর জলখাবার। ফলমূল আর ঘরের তৈরী ক্ষীরের সন্দেশ; নারকেল নাড়ু।

কর্তার নাম হরিচরণ সেন; ওঁরা জাতে বৈদ্য। আমাকে বললেন—রান্না অবিশ্যি আপনাদেরই করতে হবে। স্নান করে নিন আগে।

সত্য বললে, তুমি রান্না কর গিয়ে দাদা। ওঁদের বাড়ীর মধ্যে রান্নাঘর, আমার লজ্জা করে—

স্নান সেরে অগত্যা আমাকেই যেতে হ'ল রান্নাঘরে।

সেই সুন্দরী বৌটি দেখি সেখানে উপস্থিত। মুখের ঘোমটা খুলেছেন। সুন্দর মুখ। তেমনি কাঁচা হলুদের মত রং। আমার দিদির বয়সী হবেন, আমার ইচ্ছে হতে লাগলো প্রণাম করবার। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, ওঁরা বৈদ্য, কি মনে করবেন।

আমি বললাম, দিদি, আপনার বড় দয়া।

দিদি মুখের ঘোমটা আরও খুলে বললেন, দয়া কিসের? ওকথা বললে আমাদের পাপ হয় না? বলতে আছে? ছিঃ—

—না বলেও তো পারছি নে দিদি।

—না, বলতে হবে না। রান্না করতে জানেন?

আমি হেসে বললাম, পারি নে তো ক'রে খাচ্ছি কি ক'রে, হ্যাঁ দিদি? আমার ভাই বাইরে বসে আছে, সে আরও ভালো রান্না করতে পারে।

—কই তিনি বাইরে বসে আছেন কেন? ডেকে আনুন গিয়ে, দেখি কেমন রাঁধেন।

—সে আসবে না, বড় লাজুক।

—আপনার ছোট?

—পাঁচ সাত বছরের ছোট।

—ডেকে আনুন। আমি রান্নার জিনিসপত্তর আনি। ডাল রান্না করতে পারবেন তো?

—খুব।

জিনিসপত্র যা তিনি আনলেন, তা অনেক রকম। চাল, ডাল, ঘি, দুধ, আলু, বেগুন, কইমাছ। বললেন, সরুন, আমি কুটে বেছে দিই। ভালো কথা, আপনারা যে মাছ কিনেছিলেন, সে মাছটা ভালো না, পচা। সেটা কুটে ঝাল দিয়ে রান্না করতে দিয়েছি। ও মাছ আপনাদের খেতে দেবো না। বিদেশী লোক, পচা মাছ খেয়ে অসুখ-বিসুখে পড়বেন শেষকালটাতে। সে হবে না বাপু।

—একদম পচা? আমি কিনি নি, সত্য কিনেচে।

—ছেলেমানুষ, ঠকেছে। কই তাকে ডাকুন না।

—সে আসবে না দিদি। সে থাকুক বসে বাইরে। বড্ড লাজুক। ঘেমে উঠবে এখানে এসে। তা ছাড়া, আমরা হলাম পাড়াগেঁয়ে মুখ্যসুখ্য বামুন। লোকের সঙ্গে কথা বলতে মিশতে আমাদের লজ্জা হয়। আপনাকে দিদির মতো দেখছি বলে কোনো লজ্জা হচ্ছে না, কিন্তু অন্য জায়গা হোলে—

—সে কথা থাক। আপনি কি রকম রাঁধেন দেখবো—মাছের ঝোলে কি বাটনা দিতে হবে বলুন তো?

—জানি নে। কখনো তো রাঁধি নি।

—বিদ্যে বুঝেচি। আচ্ছা, আমি সব বলে দিচ্চি, আপনি রেঁধে যান। বেলা হয়েছে, খিদে পেয়েচে আপনাদের।

দু'ঘণ্টা ধরে তিনি বসে বসে আমাকে দিয়ে রাঁধালেন। কখন মাছ ভাজতে হবে, কখন কি বাটনা কিসে দিতে হবে, সাঁতলাবার সময় কি ফোড়ন দিতে হবে। দুধ নিয়ে এলেন প্রায় দেড়সের। পায়েস করতে হবে নাকি। আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলাম—আমার দ্বারা আর কিছু হবে না।

তিনি বললেন—তা ভালো, থাক, খিদেও পেয়েছে আপনাদের, বুঝতে পারচি। ওবেলা হবে।

আমি একটু আধটু গান করতে পারতাম। বিকাল বেলা আমার সে বিদ্যের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো আমার ভাইয়ের মুখ থেকে। সন্ধ্যার পরে এল হারমোনিয়াম ও ডুগি-তবলা। আমার গান শুনে অনেকে সুখ্যাতি করতো তখন। গান ভালই গাইতাম। রাত্রে রান্না করবার সময় দিদি বললেন—আপনি এমন চমৎকার গান গাইতে পারেন ভাইটি?

সলজ্জ সুরে বললাম, কি এমন গান?

—আপনাকে এখন ছাড়চি নে। থাকুন দিন কতক এখানে। রোজ গান শুনবো।

—সে তো আমার ভাগ্য। কিন্তু দিদি আমার যে থাকবার জো নেই, পড়ে গিয়েছি এক ফেরে।

—কি ফের?

আমি রাসু হাড়ির গরু চুরির বৃত্তান্ত আগাগোড়া বললাম।

দিদি সব শুনে গালে হাত দিয়ে কি চমৎকার সুশ্রী ভঙ্গী ক'রে বললেন, ওমা আমি যাবো কোথায়!

সুন্দরী মেয়ে, কি অপূর্ব সুন্দর যে দেখাচ্ছিল ওই মুহূর্তটিতে!

বললাম– আপনি তো দেবীর মত। কেউ জায়গা দিতে চায় না বিদেশী দেখে। তিন রাত কি কষ্ট পেয়েছি দিদি! আপনার মত মানুষ ক'জন, যে রাস্তা থেকে লোক ধরে বাড়ী নিয়ে এসে খাওয়ায়? আপনি বুঝতে পারবেন না মানুষ কত দুষ্টু হতে পারে।

দিদি হেসে বললেন—আমার একটা সাধ ছিল—আপনি দিদি বলে ডেকে সে সাধ আমার পুরতে দিলেন কই?

—কেন? কি সাধ?

—জানেন, আমার অনেক দিনের সাধ ব্রাহ্মণ অতিথি আমাদের বাড়ী আসবেন, আমি তাঁর পা ধুয়ে দেবো নিজের হাতে—কিন্তু আপনার বেলা তা করতে পারলাম না। দিদি বলে ডাকলেন।

—সে আমাদের মত ব্রাহ্মণ নয় দিদি। আমরা চাষবাস ক'রে খাই। লেখাপড়া জানিনে। আমাদের কথা বাদ দিন।

—তাতে আমার কি? আপনি কি করেন আমাদের দেখবার দরকার কি? যাক গে। এখন বলুন ক'দিন থাকতে পারবেন?

—কালই যাবো।

—কাল যাবার কথা ভুলতে হচ্ছে। পরশু বিবেচনা করে দেখা যাবে। এখন বলুন তো, মাংস খান তো?

—খাই।

—শুনুন, কাল রাত্রে লুচি মাংস করবো। লুচি আমি ভাজবো, তাতে কোনো দোষ নেই—আপনি শুধু মাংসটা রেঁধে নেবেন।

—আপনি যখন দিদি, মাংস রাঁধলেনই বা—

—সে হবে না। ব্রাহ্মণকে রেঁধে খাওয়াতে পারবো না এ বাড়ীতে—

—বড্ড সেকেলে আপনি। ঠাকুমা দিদিমাদের মত সেকেলে। বলুন ঠিক কি না?

দিদি শুধু হাসলেন, কথার উত্তর দিলেন না।

পরদিনও পরম যত্নে-আদরে কাটলো ও'দের বাড়ী। সন্ধ্যার আগেই গানের ব্যবস্থা হ'ল। বাড়ীর মেয়েরা আড়াল থেকে গান শুনলেন। আমি অনেকগুলো গান গাইলাম।

রান্নাঘরে যেতেই দেখি দিদি গরম চা নিয়ে বসে আছেন। বললেন—বড্ড পরিশ্রম হয়েচে। গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে মাংসটা চড়িয়ে দিন। মেখে চুকে ঠিক ক'রে রেখেচি। কষে নিন আগে। শুনুন, পেঁয়াজ দিই নি কিন্তু।

—কেন, আপনাদের পেঁয়াজ চলে না?

—আমাদের চলে। আপনাদের চলবে কি না—

—খুব চলে। দিন পেঁয়াজ বাটা—

—কি সুন্দর গান গাইলেন আপনি! সত্যিই চাষবাস করেন?

—সত্যি। গান গাইলে চাষবাস করা যায় না, হ্যাঁ দিদি?

দিদি হেসে চুপ করে রইলেন। অনেক সময় কথার উত্তর না দেওয়া ও'র একটা স্বভাব।

পরদিন সকালেই আমরা দু'জন ও'দের কাছে বিদায় নিলাম।

দিদি ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে আর সত্যকে বসিয়ে শসাকাটা, কলা, শাঁকআলু, ক্ষীরের ছাঁচ ইত্যাদি রেকাবিতে সাজিয়ে সামনে দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে চোখে সত্যি জল এল আমার। বার বার বলে দিলেন—আবার আসবেন অবিশ্যি অবিশ্যি! বেলুর বিয়ে হবে বোশেখ মাসে, সেসময় চিঠি যাবে। ভুলবেন না দিদির কথা।

আসবার সময় কর্তাকে বললাম—দিদির মত মানুষ দেখিনি কর্তামশায়—

বৃদ্ধ বললেন—বড় বৌমা তো? এ বাড়ীর লক্ষ্মী। ও'র থেকেই সংসারের উন্নতি। উনি আসার পর থেকে সংসার যেন উথলে পড়লো। আর মা'র আমার কি দয়া! পাড়ার কেউ অভুক্ত থাকবে না। সব খবর নিজে নেবেন। দু'তিনটি স্কুলের ছেলেকে মাইনে দিচ্ছেন এই পাড়ার। যে এসে ধরবে, 'না' বলতে জানেন না। মা আমার স্বয়ং লক্ষ্মী। রূপে গুণে লক্ষ্মী।

ভুলি নি তাঁর কথা।

আজ চোদ্দ বছর হয়ে গেল। এখনো মনে জ্বল জ্বল করচে সে মূর্তি।

আর সেখানে যাওয়া হয় নি। কোন খোঁজখবরও নেওয়া হয় নি।

আজ কেন একথা মনে উঠলো এতদিন পরে, বলি সে উপসংহারটি।

দিন পাঁচ-ছয় আগে আমার ভগ্নিপতি মনোমোহন রায় দফাদার সেই রাসু হাড়িকে গ্রেপ্তার ক'রে বিকেলবেলা আমার বাড়ীতে নিয়ে হাজির। রাসু হাড়ি জয়দিয়ার বাঁওড়ের ধারে শুওরের পাল চরাচ্ছিল—এখান থেকে এগার মাইল দূরে। মনোমোহন থানায় হাজিরা দিতে যায় রোজ বৃহস্পতিবারে এই পথ দিয়ে। রাসু হাড়িকে দেখে চিনতে পেরেচে এবং চৌকিদার দিয়ে তক্ষুনি গ্রেপ্তার করিয়ে আমার এখানে নিয়ে এসেছে। রাসু এসে বসে চারিদিকে চেয়ে বললে—এঃ, বাবুদের বাড়ী এ কি হয়ে গিয়েচে? চণ্ডীমণ্ডপ নেই, গোলা নেই—কোঠা ভেঙে গিয়েচে। লাঙল-গরুও নেই দেখচি।

আমার মাকে দেখে বললে—মা ঠাকরুন এত বুড়ো হয়ে গিয়েচেন? আপনাকে যে আর চেনাই যায় না। ছোটবাবু কই?

মা বললেন—সে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে আজ আট বছর—সে চলে যাওয়াতেই তো সংসার একেবারে গেল। কিছু নেই আর সে সংসারের।

আমি বললাম—রাসু, গরুজোড়া চুরি করিছিলি তুই?

রাসুও বুড়ো হয়ে পড়েচে। মাথার চুল বিশেষ কাঁচা নেই। গোঁপ সম্পূর্ণ পাকা। একটু কুঁজোমত হয়ে পড়েচে।

একটু চুপ করে থেকে বললে—হ্যাঁ বাবু। মিথ্যে বলে আর কি হবে? গরু নিয়ে গিয়ে একটা গাঁয়ের হাটে বিক্রি করি।

—দেশে যাস্ নি?

—না বাবু, সেই টাকা নিয়ে সোজা রাজসাহী চলে যাই। ভয়ে দেশে ফিরি নি।

—কেন চুরি করলি?

—অদেষ্ট বাবু। সবই অদেষ্টের লিখন। তখন বয়েস কাঁচা ছিল, বুদ্ধি ছিল না।

দুঃখু তো ঘুচলো না, সব রকমই ক'রে দেখলাম, বাবু। এখন রাতুলপুরের হিঙ্গল সর্দারের শুওর চরাই। ষোল টাকা মাইনে আর খাতি দ্যায়। বুড়ো হয়ে পড়েচি, আর কনে যাবো এ বয়েসে—চকি ভালো দেখতি পাইনে—

মা বললেন—রাসু, দুটো খাবি? হাঁড়িতে পান্তা ভাত আছে ওবেলার। দুটো খা—বোধ হয় আজ তোর খাওয়া হয় নি?

জগদানন্দপুরের সেই দিদির কথা অনেকদিন পরে আবার মনে এল। ভুলেই গিয়েছিলাম বটে। এখন মা'র ওই কথায় জগদানন্দপুরের দিদির সেই দেবীর মত মূর্তিখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভুলি নি দেখলাম, এতটুকু ভুলি নি। বাইরে ভুলেছিলাম মাত্র। কি জানি, এতদিন পরে বেঁচে আছেন কি না।

মনোমোহনকে বললাম—ভায়া, আর চোদ্দ বছর পরে ওকে গ্রেপ্তার করে কি করবে? ছেড়ে দাও ওকে। এখন ও যেমন গরীব, আমিও তেমনি গরীব। ওকে জেলে দিয়ে আমার কি আর দুঃখু ঘুচবে?

রাসু হাড়ি কেঁদে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলো।

মা চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আয় বাবা রাসু, ভাত দিইগে—রান্নাঘরের উঠোনে চল্—তোমারও অদেষ্ট আমাদেরও অদেষ্ট—চল বাবা—

দৈব ঔষধ

আজ আর তরঙ্গিণী দেবীর কিছুই নেই।

কিন্তু এমন একসময় ছিল, যখন এই গ্রামের শ্রেষ্ঠা রূপসী ছিলেন তরঙ্গিণী দেবী। শুধু রূপসী নয়, বড়ঘরের বউও ছিলেন, এখন আর কিছুই নেই। এই গ্রামের বড় গাঁতিদার—ঘনরাম রায়চৌধুরী তাঁর স্বামী। জ্বলন্ত রূপ নিয়ে প্রথম যখন তিনি শ্বশুরবাড়ী ঘর করতে আসেন, তখন তাঁর বয়েস পনেরো। সেকালে এতবছর বয়েসে বিবাহ হোতো না মেয়েদের, কিন্তু তাঁর পিতামহ রামেশ্বর চক্রবর্তী বিদ্যাভূষণ খুব ভালো জ্যোতিষী ছিলেন। কন্যার চোদ্দবৎসর বয়েসে বৈধব্যযোগ থাকায় স্নেহময় বৃদ্ধ ওই বয়েসটি পার করেই পৌত্রীর বিবাহ দেওয়া ধার্য করেন।

যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসেন তিনি, ঘনরাম রায়চৌধুরীর পিতা দয়ারাম রায়চৌধুরী জীবিত। নামে দয়ারাম হোলে কি হবে, ইনি ছিলেন নিষ্ঠুর প্রজাপীড়ক, কঠোর শাসক ও মামলাবাজ। আবার খুব উদারও যে ছিলেন, তার পরিচয় এই রাজীবপুরের অনেকে আজও মনে রেখেচেন। বাড়ীতে কুড়ি-বাইশটা ধানের গোলাতে ধান বোঝাই, অথচ প্রজার কর্জ নেওয়া সামান্য ধানের জন্যে তাকে চন্ডীমন্ডপের সামনে (গ্রামের লোকে বলতো 'কাছারীবাড়ী') এনে খুঁটিতে বেঁধে রেখে দিতেন, মারধোর করতেন, মোকদ্দমা মামলা করে তাকে ভিটেচ্যুত করতে চাইতেন।

তরঙ্গিণী এসে দেখলেন তিনি মস্ত-বড় প্রতাপশালী শ্বশুরের আদরিণী পুত্রবধূ। শাশুড়িটি লোক ভাল নন, প্রতি কাজে সর্বদা খিট্ খিট্ করা, সবসময় কাজে খুঁত কাটা, এই ছিল তাঁর স্বভাব। তরঙ্গিণী খুব শান্ত মেজাজের বধূ ছিলেন, শাশুড়ির সমস্ত তিরস্কার বিনাপ্রতিবাদে শুনে নীরবে অশ্রুবিসর্জন করতেন—একথা বলতে পারলেই বেশ শোনাতো বা মানাতো বটে, কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে হোলো যে, তরঙ্গিণী আদৌ তা ছিলেন না। তিনিও ঝঙ্কার দিয়ে উঠতেন, সমানে-সমানে তর্ক-ঝগড়া করতেন। সেকালে এতে লোক ভালো বলতো না।

স্নেহের শ্বশুর পুত্রবধূকে কাছে ডেকে বলতেন—শোনো বৌমা, ইদিক এসো। শসা খাবা?

—না।

—কি খাবা?

—কিচ্ছু খাবো না।

—বোসো এখানে।

—কি বলুন?

—তোমার শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করচো কেন সকালবেলা?

—উনি আমায় বললেন, আমি বাটনা বাটতে জানিনে।

—বলচেন বলচেন। উনি তোমার গুরুজন। তোমার কি তর্ক করা উচিত?

—না, উচিত না! আমি ছাড়বো কেন?

—তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। কথাবার্তা বলতি নেই গুরুজনের সঙ্গে, ওতে লোকে নিন্দে করে।

তারপর আরম্ভ হোতো সদুপদেশ মহাভারতের দু'একটি সতীলক্ষ্মী স্ত্রীলোকের কাহিনী। ও'র ছেলেবেলায়, একজন বড় ভালো গৃহিণী এ-গ্রামে বাস করতেন, তাঁরও পুণ্যকথা। সবই মুখে-মুখে। দয়ারাম রায়চৌধুরী বই-টই পড়তে ভালবাসতেন না। বাড়িতে পাঁজি ছাড়া অন্য বইও ছিল না।

এই সময়ে দয়ারামের স্ত্রী জগদম্বা এসে বলতেন—আমি বাপের বাড়ী যাবো, গাড়ী তৈরী করে দাও।

—কি হোলো?

—কিছু হয় নি। তোমার আদরের বৌমা নিয়ে তুমি থাকো, আমার এ-সংসারে আর পোষাবে না। অকমান হতি এ-বাড়ী আমি থাকতি পারবো না।

এইসময়ে তরঙ্গিণী মুখে কাপড় দিয়ে খিলখিল্ ক'রে হেসে উঠতেই জগদম্বা দেবী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন—ওই দ্যাখো...দেখচো? আমার কথায় হেন হেনস্থা! আমি মানুষ নই! শুনলে?

তরঙ্গিণী তখনও মুখে কাপড়-গোঁজা অবস্থায় বললেন—'অকমান' কি কথা বাবা? 'অকমান' মানে কি?

জগদম্বা দেবী অমনি আঁচলের চাবির গোছা খুলে ঝড়াৎ ক'রে স্বামীর সামনে ছুঁড়ে দিলেন—এই রইলো তোমার চাবি, তোমার সংসার তুমি দেখে নাও—তোমার সোহাগের বৌমাকে নিয়ে তুমি থাকো—আমিও সব্বো চক্কত্তির মেয়ে জেনে রেখো। আমি এ-সংসারে অকমান হতি আসিনি—আসিনি—আসিনি...

গৃহিণী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই দয়ারাম বিব্রত হয়ে ব'লে উঠলেন—আরে, শোনো—শোনো—সবাই হয়েছে আমার সমান। কি গেরোতেই পড়েচি বাপু—আচ্ছা বৌমা, আবার তুমি হাসচো! আবার হাসি কিসের? না, এরকম করলে আমাকে সব বেচে কিনে কাশী রওনা হতি হবে দেখচি—

এইভাবেই তরঙ্গিণীর কৈশোর কেটে গেল। তারপর বৃদ্ধ দয়ারাম রায়চৌধুরী একদিন শ্বাসরোগে দেহত্যাগ করলেন। ঘনরাম নিলেন বড় গাঁতি জমা ও প্রজাপত্রের ভার। কিন্তু সংসারে শান্তি ছিল না। জগদম্বা দেবী সংসারের সর্বেসর্বা মালিক হতে চাইলেই প্রবল বাধা আসতো পুত্রবধূ তরঙ্গিণীর দিক থেকে। ঘনরাম রায়চৌধুরী নিজে পিতার মতই দুর্দান্ত শাসক ও মামলাবাজ গাঁতিদার ছিলেন,, কিন্তু বাড়ীতে স্ত্রী বা মা কাউকে পেরে উঠতেন না। সেখানে নিত্য দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। তরঙ্গিণী গ্রামের লোককে জিনিসপত্র দিতে ভালবাসেন, যার চাল অভাব তাকে ভাঁড়ার থেকে শাশুড়ীর অজ্ঞাতসারে চাল বার ক'রে দেন। যার কাপড় নেই তাকে নিজের বা শাশুড়ীর পুরানো কাপড় বার ক'রে দিয়ে দেন—এসব আবার জগদম্বা পছন্দ করেন না। গ্রামের অভাবী লোকেরা বধূকে ভালোবাসে, তার কাছে নিজেদের দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত ক'রে আনন্দ পায়। কিন্তু তারা আবার জগদম্বাকে দেখতে পারে না।

গ্রামে একঘর জেলে আছে, অতি গরীব, নাম যদু জেলে। সে-বার ভীষণ বাদলাবৃষ্টি ভাদ্রমাসে। যদু জেলে ছেলেমেয়ে নিয়ে অসুখে প'ড়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। একদিন তরঙ্গিণীকে তেঁতুলতলায় ডেকে যদুর মেয়ে কমলি বললে—কাকীমা, বাবা আপনাকে একবার বলতে বলেচে, মোদের বড্ড কষ্ট। বাবা অসুখে প'ড়ে আছে, আমরা খেতে পাইনে—

—কি হয়েচে তোর বাবার?

—জ্বর হয়েচে।

—ডাক্তার দেখচে?

কমলা হেসে বললে, খেতে পাইনে তার ডাক্তার। আজ চাল নেই ঘরে।

—চল্ আমি দিচ্চি। চুপি-চুপি পেয়ারাতলার জানলায় গিয়ে দাঁড়া। মা বাড়ী আছেন কি না দেখি।

তারপর উঁকি মেরে দেখলেন, শাশুড়ি ঘাটে গিয়েচেন নাইতে, অমনি ভাঁড়ার থেকে চার কাঠা চাল-পূর্ণ একটি ধামা এনে পেয়ারাতলায় এসে কম্লির হাতে দিয়ে বললেন—পালা!

কম্লি বাঁশবাগান ভেঙে ধামা-হাতে দৌড়েই পালালো।

ঝগড়াতে তরঙ্গিণীর সঙ্গে সব-সময়েই তাঁর শাশুড়ি পরাজয় স্বীকার করতেন। অমন চোখা-চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগের সাধ্য জগদম্বা দেবীর ছিল না। ছেলে মায়ের দিকে থাকতো ব'লেই জগদম্বা চোখ রাঙিয়ে না হোক, কেঁদেও জিতে যেতেন।

সে-বার ঘনরাম রায়চৌধুরী শান্তিপুরের কাছে এক জমিদারের অধীনে নায়েবী কর্ম গ্রহণ ক'রে সেখানে স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চাইলেন।

জগদম্বা বললেন—না। বাড়ী ছেড়ে বৌ নিয়ে যাওয়া চলবে না।

ঘনরাম রায়চৌধুরী আম্তা আম্তা ক'রে বললেন—না নিয়ে গেলে, এখানেও তো তোমাদের—

জগদম্বা ঝঙ্কার দিয়ে বললেন—নিজে গিয়ে শাসন করো গে নিজের বউকে। নয়তো নিজে চ'লে যাও—সংসার কি ক'রে শায়েস্তা রাখতি হয়, তা আমি জানি।

তা সত্ত্বেও ঘনরাম বললেন—নিয়েই যাই না হয় এ-বারটা। অনেকদিন এক জায়গায় রয়েচে—

মা বললেন—আমি মরবার আগে তো নয়! সে সুবিধে এখন হবে না।

অগত্যা ঘনরামকে একাই চাকুরিস্থানে চ'লে যেতে হোল।

সে-বার শীতকালে দেশে চারিধারে বড্ড অসুখ-বিসুখ দেখা দিল। শীতের সন্ধ্যায় জগদম্বা অন্যমনস্কভাবে ব'সে আছেন দেখে তরঙ্গিণীর বড় ছেলে প্রতুল জিজ্ঞেস করলে—ঠাকুরমা, এমন ক'রে ব'সে আছো কেন?

—কিছু না। শরীরডা ভালো না—

—মাকে ডাকবো?

—না, ডাকতি হবে না। হেঁসেল ছেড়ে এখন এলি রান্না-বান্না হবে না।

—দেখি তোমার গা? একি! গা যে পুড়ে যাচ্ছে—

—ও কিছু না, পিত্তির ধাত তাই। তুই গিয়ে প'ড়গে যা।

সেইরাত্রেই জগদম্বা দেবী বিষম অসুখে পড়লেন। সংসারের অবস্থা ভালো, বাড়ীর গোমস্তা রামনাথ গাঙ্গুলী, প্রতুলের আহ্বানে অনেক রাত্রে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে উঠে এসে কর্ত্রীর হাত দেখে বললেন—জ্বর হয়েচে বেশ। নাড়ী খুব চঞ্চল। গুপী ডাক্তারকে ডাকবো?

কর্ত্রী ধমক দিয়ে বললেন—হ্যাঁ, ওইটুকু এখন বাকি আছে। এই বয়েসে ডাক্তারী-ওষুধ না গিললি চলচে না। ডাক্তার বাড়ী এলে, কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে দেবে না? সারকুমারী-মত করো।

অতএব সারকুমারী-মতে চিকিৎসা চললো। এদিকের পল্লী-অঞ্চলে এই একটি চিকিৎসাপদ্ধতি বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। ননী বাগ্দী, নকুল মুচি প্রভৃতি সারকুমারী-মতের বড় চিকিৎসক। এরা গ্রামে গ্রামে বেড়িয়ে রোগী দেখে। বিনিময়ে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। এরা অত্যন্ত অল্পে সন্তুষ্ট হয় ব'লে এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাশ-করা ডাক্তারেরা পেরে ওঠে না।

নকুল মুচি একটা বাঁশের চোঙা থেকে গোটা-দশ-বারো পুঁটুলি বার ক'রে বললে—মা ঠাকরোণের কি বড্ড জলতেষ্টা পাচ্চে?

জগদম্বা বললেন—তা পায় বাবা।

—হুঁ। কি খাচ্ছেন?

—ওবেলা সাবু খেয়েছিলাম।

—সাবু খাবেন না। মোদের মতে ও চলবে না। খাবেন, পান্ত ভাত।

—কি খাবো বাবা?

—আজ্ঞে, পান্ত ভাত।

—তারপর?

—আগে ডোবায় ছেন করবেন, তারপর পান্ত ভাত খাবেন।

প্রতুল বললে—হ্যাঁ। তা না হোলে জ্বর-বিকারের সুবিধে হবে কি রকম ক'রে?

জগদম্বা বললেন—ওকে বলতেই দাও না ভাই।

—আজ্ঞে, মোর বড়ি খেলি, ডোবায় ছেন করতি হবে, পান্ত ভাতও খেতি হবে।

—তাই হবে বাবা। তুমি ওষুধ দিও।

জগদম্বার জিদ বজায় রইলো। ফল এই দাঁড়ালো, সারকুমারী-মতে চিকিৎসার তৃতীয় দিনে রোগিণীর অবস্থা দাঁড়ালো এমন খারাপ যে সারাদিন ধ'রে গ্রামের শূদ্র-ভদ্র সবাই ভেঙে পড়লো বাড়ীতে। অনেকে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতেও লাগলো।

গভীর রাত্রি।

তরঙ্গিণী শিয়রে ব'সে শাশুড়ির সেবা করচেন। ঘনরাম রায়চৌধুরীকে কর্মস্থানে টেলিগ্রাম করা হয়েছে।

বড় মেয়ে রাণী বললে—মা, একটা কথা—

—কী?

—বাইরে এসো। বলচি।

রাণী বাইরে এসে চুপি-চুপি বললে—মা, বুড়ী আর বাঁচবে না।

—তুই কি করে বুঝলি?

—আমি তাই বুঝলাম। এবার সেই ওষুধটা শিখে নাও না কেন?

জগদম্বা নাকি কোন্ সন্ন্যাসীর কথামত কাজ ক'রে রোগ-মুক্ত হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে লোক আসতো তাঁর কাছে ওষুধ নিতে। জীবনে অম্বলশূলগ্রস্ত রোগীকে যে তিনি ওষুধ দিয়েচেন...কত দূর-দূরান্তর থেকে রোগীরা এসে ওষুধ খেয়ে গিয়েচে! এ ওষুধ দেওয়ার একটা নিয়ম হচ্ছে এই যে, রোগীকে স্বয়ং এসে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। ওষুধ তুলে বেটে দেবেন জগদম্বা দেবী স্বয়ং।

তরঙ্গিণী দেবী শাশুড়ির এ দৈব ওষুধের কথা জানতেন। তবে রোগী তো সব-সময় আসতো না, কালেভদ্রে দু'পাঁচ বছর অন্তর হয়তো কোনোদিন একজন এলো। নিতান্ত দুরারোগ্য রোগ না হোলে কেউ বিদেশে ওষুধ আনতে যেতে চায় না।

তরঙ্গিণী দেবী শাশুড়ির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন—মা!

জগদম্বা ঘুমের ঘোর থেকে সদ্য-উত্থানের সুরে ব'লে উঠলেন—অ্যাঁ!

—মা, একটু কমলালেবুর রস দেবো?

—উঁহু...

—মিছরির জল?

—উঁহু...

—মা, একটা কথা। আমাকে সেই ওষুধটার কথা ব'লে দেবেন? সেই দৈব ওষুধটা?

জগদম্বা দেবী এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন—ঘরে আর কে?

—রাণী।

—ওকে যেতে বলো। ঘরে কেউ না থাকে।

রাণী চ'লে গেল। জগদম্বা দেবী বললেন—এই শোনো। আমার তখন সোমত্ত-বয়েস। অম্বলশূল রোগ হোলো। ছট্‌ফট্ করছি রোগের যাতনায়, এমন সময়—অনেক রাত্তিরে—দেখচি কি জানো—এক সন্নিসি এসে আমায় বলচে, তোর রোগ সেরে

যাবে, তুই কাল সকালে উঠে অমুক-গাছের শেকড় তুলে এনে—

—কি গাছের শেকড় মা?

এ-কথার উত্তর জগদম্বা আর ইহজীবনে দিতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ঘনরাম রায়চৌধুরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তিনি টেলিগ্রাম পেয়ে মা'র সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন। তরঙ্গিণী দেবী তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। ভোরের দিকে জগদম্বা দেবী পরলোকে প্রস্থান করলেন।

তারপর অনেক দিন হয়ে গিয়েচে। সংসারের অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েচে। রাণীর বিবাহ হয়ে শ্বশুর বাড়ী চ'লে গিয়েচে। ঘনরাম রায়চৌধুরী বৃদ্ধ-অবস্থায় বাড়ী ব'সে আছেন। প্রতুল সামান্য মাইনের চাকুরি করে, বিদেশে থাকে। সে জৌলুস নেই সংসারের। তরঙ্গিণীও বৃদ্ধা।

এ সময় একদিন জনৈক লোক এসে ঘোড়ার গাড়ী থেকে ওদের বাড়ীর সামনে নামলো। সঙ্গে একটি বৌ, দুটি ছেলে। লোকটা গাড়ী থেকে নেমে একহাতে বুক চেপে ধ'রে এমনভাবে আস্তে আস্তে বৌটির কাঁধে ভর দিয়ে আসতে লাগলো, যেন সে অত্যন্ত যন্ত্রণায় কাতর।

একটু পরেই জানা গেল, লোকটি অম্বলশূলের বেদনায় কাতর হ'য়ে বহু দূর থেকে এসেচে। তরঙ্গিণী দেবী অম্বলশূলের দৈব ওষুধ জানেন, সে শুনেচে। ভদ্রলোকের স্ত্রী বললে—মা, বড্ড দূর থেকে এসেচি আপনার নাম শুনে। আপনার এ-দয়া করতেই হবে—

লোকটিও বললে—না দয়া করলে মা চলবে না। আমার প্রাণ বাঁচান আপনি—বড্ড আশা নিয়ে এসেছি—

তরঙ্গিণী বললেন—তোমরা জানলে কি ক'রে বাবা, যে, আমি অম্বলশূলের ওষুধ জানি?

স্বামী স্ত্রী দু'জনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। রাণীর বিয়ে হয়েচে তাদের দেশে। রাণীর ননদের মুখে একথা ভদ্রলোকের স্ত্রী শুনেছে। তা-ছাড়া একথা কে না জানে, তাঁদের বাড়ীতে অম্বলশূলের বিখ্যাত দৈব ওষুধ আছে?

তরঙ্গিণী সব কথা ভেবে দেখলেন। তিনি যে শাশুড়ির কাছ থেকে ওষুধ পান নি, একথা কাউকে বলেন নি। রাণীকেও কখনো বলেন নি একথা। রাণী শ্বশুরবাড়ী গিয়ে নিশ্চয় মায়ের গুণের কথা অতিরঞ্জিত ক'রে ব্যাখ্যা ক'রে থাকবে। খানিকক্ষণ চিন্তা করে তরঙ্গিণী বললেন—আচ্ছা ওষুধ দেবো বাবা, ব্যস্ত হয়ো না। সে তো কাল সকালে। আজ রাত্রে এখানে সবাই থাকো, খাওয়া-দাওয়া করো। সেরে যাবে বাবা, কোনো ভয় নেই।

পরদিন খুব সকালে উঠে তরঙ্গিণী রোগীর স্ত্রীকে বললেন—আমার নাতনীকে সঙ্গে দিচ্ছি, তোমার স্বামীকে নদী থেকে নাইয়ে আনো। ওষুধ আমি বেটে রেখে দিচ্ছি।

বাড়ীর পেছনের বনের মধ্যে ঢুকে তিনি একটা কাঁটানটের শেকড় তুললেন। মনে মনে বললেন—কোনো অপরাধ নিও না ঠাকুর। আমি কিছুই জানিনে—তোমার দয়ায় যেন ওর অসুখ সারে। এতদূর থেকে এসেচে কষ্ট ক'রে...

সেই কাঁটানটের শেকড় বেটে রোগীকে খাইয়ে দিলেন। ওরা দুজনেই চ'লে গেল।

দুমাস পরেই রাণী শ্বশুরবাড়ী থেকে এলো। কথায়-কথায় একদিন মাকে বললে—আচ্ছা মা, পাঁচঘরার ভুবন মজুমদার তোমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে গিয়েছিল?

তরঙ্গিণীর বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে উঠলো। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কেন রে? হ্যাঁ, একদিন একজন লোক আর তার বৌ এসেছিল বটে। পাঁচঘরা কি ক'ঘরা তা জানিনে। সে এক মজার কথা, সে হলো কি বাপু—আচ্ছা, তুই তোর শ্বশুর-বাড়ীতে ওসব কথা এমন ক'রে—

তাঁর কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই রাণী বললে—ভুবন মজুমদার পরশু আমার শ্বশুর-বাড়ী এসেছিল। সে একদম সেরে গিয়েচে। দিব্যি চেহারা হয়েচে। বললে—তোমার মা আমার আর-জন্মের মা ছিলেন, আমার পুনর্জীবন দান করেচেন। সে কতো কথা। দু'খানা খেজুর গুড় দিতে এসেছিল, বলে—বৌমা, বাপের বাড়ী যাচ্চো, মাকে গিয়ে দিও। তা আমি বললাম, কোনো জিনিস নেওয়ার নিয়ম নেই, নিতে পারবো না। আমার শ্বশুর-বাড়ির দিকে তোমার খুব নাম—

তরঙ্গিণীর কণ্ঠ থেকে কৈফিয়তের সুর মিলিয়ে গেল। মেয়ের কাছে যে-কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তা আর বললেন না।

বারিক অপেরা পার্টি

সকালবেলা।

একজন কাঁচা-পাকা দাড়িওয়ালা মুসলমান আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে—সালাম বাবু।

—কে তুমি?

—আমার নাম বারিক মন্ডল, বাড়ী চালদী। আপনার কাছে এটু আলাম—

—কেন?

—ধানী জমি কিনবেন?

পঞ্চাশের মন্বন্তর তখনো উগ্র হয়ে ওঠে নি, দিকে দিকে ওর আগমনবার্তা অল্পে অল্পে ঘোষিত হচ্ছে। একটা ব্যাপার শেষ না হয়ে গেলে বোঝা যায় না সেটা কত বড় হলো। সবাই ভাবচে, এ দুর্দিনের অভাব অনটন শীগ্‌গির কেটে যাবে। এ সময়ে ধানের জমি কেনা মন্দ নয়, সামনেই শ্রাবণ মাস, জলবৃষ্টিও বেশ হচ্ছে, কিনেই ধান রোয়া হতে পারে এবারই। চালের দাম পঁচিশ টাকা মণ, তাও সহজপ্রাপ্য নয়। কলকাতা থেকে বোমার ভয়ে পালিয়ে এসে বাড়ী বসে আছি। হয়তো কলকাতা শহর জাপানী বোমার ঘায়ে ছত্রাকার হয়ে যাবে; দেশেই থাকতে হবে বরাবর। দেশে ধানী জমির নিতান্ত অভাব, যা আছে, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলচে।

—বললাম—জমি কোথায়? কতটা।

—চালদীর মাঠে। তা বলি আপনার কাছেই যাই, ওঁর জমির যদি দরকার থাকে। সাত বিঘে জমি বাবু। বিক্রি করবে আমাদের গাঁয়ের সোনাই মন্ডল।

—তুমি তার কেউ হও?

—না বাবু। ওর মধ্যে দু'বিঘে ভিটে জমি আছে, সে জমিটুকুতে আমি খাজনা দিয়ে বাস করি। জমিটা কিনলে আমি আপনার ভিটের প্রজা হবো। দু'টাকা ক'রে খাজনা করি। ধানের জমিটা আপনাকে সস্তায় ক'রে দোব বাবু। আমাকে ধানের জমিগুলো কিন্তু ভাগে দিতে হবে। আর যদি আপনি নিজে চাষ করেন তো আলাদা কথা—

কলকাতা থেকে নূতন এসে বহুদিন পরে দেশে বসেছি, জমিজমার ব্যাপার তত বুঝি নে। ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলাম। চালদীর বারিক মন্ডল আমার কাছে এসেচে কিছু জমি বেচতে। ওর জমি নয়, সোনাই মন্ডলের জমি। ও এসেছে কেন, এতে ওর স্বার্থ কি? না, ও আগে থেকেই এই জমির অন্তর্ভুক্ত দু'বিঘে জমিতে বাস করে, জমি নিলে ও আমার প্রজা হবে এবং আমি ওকে ধানের জমির ভাগীদার করবো। বেশ কথা। বারিকের চেষ্টায় ও আমার ইচ্ছায় তিনদিনের মধ্যে জমি কেনা হয়ে গেল।

রেজেস্ট্রি অফিসে যে দলটি জমি রেজেস্ট্রি করতে গিয়েছিল বারিক মুসলমান দেখলুম তার মোড়ল। মহা ফুর্তিবাজ লোক সে। আধ-বুড়ো লোক হলে কি হয়। দাড়ি নেড়ে নেড়ে পান খাচ্চে, বিড়ি খাচ্চে, বেগুনি খাচ্চে, ফুলুরি খাচ্চে। রেজেস্ট্রি শেষ হয়ে গেলে বারিক আমায় ডেকে বললে—বাবু, এটুখানি দোকানে চলুন।

—কোন দোকান?

—জল খাবেন এটু।

জল খাওয়ানোর প্রথা আছে এদেশে, যে জমি কেনে, সেই মনের ফুর্তিতে সাক্ষী ও সনাক্তকারীকে মিষ্টিমুখ করায়। যে জমি বেচে সে তো রিক্ত হয়ে গেল। সে খাওয়াবে কেন? এ প্রথা তো এদেশে নেই। কিন্তু বারিকের আনাড়ি ধরণের বিনীত গ্রাম্য অনুরোধ এড়াতে না পেরে খাবারের দোকানে বসলাম।

—দ্যাও, ও দোকানী, বাবুরি (অর্থাৎ বাবুকে) নিমকি, সেঙ্গারা, সন্দেশ দ্যাও।

আর ওই যে হ্যাদে গোল গোল তোমার, ওকি কি বলে? ওই দ্যাও একপোয়া—নুচি খাবেন বাবু? হ্যাদে বাবুরি নুচি দ্যাও আটখানা, ভাজা নেই? তা ভেজে দ্যাও—

দেড় টাকা খরচ গেল শুধু আমার পিছু। খাবার খরচ গেল টাকা চারেক। বারিক মহাফুর্তিতে এক টাকার খাবার নিজেই খেলে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। সবাই মিলে অন্ধকারে বাড়ীর দিকে রওনা হই। বারিক অন্ধকার পথে গান জুড়ে দিলে চেঁচিয়ে—

'ওগো হরি বংশীধারী শ্যাম লটবর—'

সোনাই মণ্ডল বাজার থেকে বড় দেখে দুটো ইলিশ মাছ কিনেচে, কারণ আজ তার হাতে করকরে আড়াইশো টাকা। জমি ওরা নাকি খুব সস্তায় দিয়েচে আমাকে। দলিল-লেখক আমাকে আড়ালে বলেছিল—আড়াইশ টাকায় সাত-অ্যাট বিঘের জমি কিনেচেন, তার মধ্যে পাঁচ বিঘে আমন ধানের জমি। সাব-রেজিস্ট্রার বাবু এ দলিল এখন মঞ্জুর করলে হয়। দামটা কম বলে মনে হচ্চে কি না—

যাহোক, রেজেস্ট্রি হয়ে গেল, কোন গোলমাল হয় নি।

বারিক মণ্ডল বললে—বাবু, আমাদের গাঁ আগে, তারপর আপনাদের গাঁ। এই অন্ধকারে কি ক'রে যাবেন? সোনাই ইলিশ মাছ কিনেচে, আমাদের গ্রামে আজ থাকুন। ইলিশ মাছ রান্না করুন পেঁজ দিয়ে। আজ চলুন একটু ফুর্তি করা যাক—

আমি রাজি হোলাম না। বাড়ী চলে এলাম অন্ধকারে।

বারিক আমার প্রজা হোল। তখন শুনলাম বারিক অপরের জমিতে বাস করতো। সে ভিটের খাজনা বহুদিন না দেওয়াতে জমিদার ওর বাড়ী (অর্থাৎ একখানা চালাঘর) এবং এক জোড়া বলদ বিক্রি করে ক্রোক দেবার উপক্রম করেছিল। তাই ও সে জমি ছেড়ে আমার জমিতে নতুন করে চালাঘর বাঁধলো। আমার নতুন কেনা ধানের জমি ও-ই ভাগে চাষ করবার জন্যে বন্দোবস্ত করে নিলে। সে-বার ধান রোয়া শেষ করলে।

বারিক রোজ সকালে একবার ক'রে আমার বাড়ী ঠিক আসবে। এসে এ-গল্প ও-গল্প ক'রে উঠবার সময় কিছু না কিছু ছুতোয় টাকা চাইবে।

—বাবু—

—এসো বারিক। তামাক খাও।

—বাবু, বড্ড দায়ে পড়ে অ্যালাম। পাঁচটা টাকা দিতে হবে—

—কেন হঠাৎ?

—আপনার জমিতে বারমেসে চাষ দিয়ে রেখেচি। মুসুরি বোনতাম। যা হবে আপনার আর্ধেক, আমার আর্ধেক।

—বেশ নিয়ে যাও—

তারপর শুনলাম মুসুরি বুনবার টাকা দিয়ে বারিক ওর গানের দলের ডুগি-তবলা কিনেচে।

একদিন বললাম—মুসুরি বুনলে বারিক?

—আজ্ঞে বাবু।

—ক'বিঘে?

—এক বিঘে।

—আর দু' বিঘে?

—বাবু, আর দু'টো টাকা দিতি হবে! খরচে কুলোচ্চে না।

—মিথ্যে কথা। তুমি তোমার গানের দলের ডুগি-তবলা কিনেচ সেই পয়সা দিয়ে। কোথায় তোমার গানের দল?

—ওই জেলেপাড়ার জেলে ছোঁড়াদের নিয়ে বসি। রোজ আখড়াই হয়। গান-বাজনা ভালবাসি বাবু। এবার পুজোর সময় 'সাধন সমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ' নামাবো বারোয়ারীর আসরে—দেখি যদি খোদার মর্জি হয়—আমার ছোট ছেলে কেষ্ট সাজে. দ্যাখবেন কি গানের গলা—কি এ্যাক্‌টটা--

—বেশ, বেশ—

—দ্যান বাবু দু'টো টাকা।

—নিয়ে যাও, কিন্তু মুসুরি ঠিক বুনবে।

—তা আর বলতি? কাল সকালেই বাকি দু'বিঘে সাঙ্গ করবো।

ধানের সময় আমার ভাগে যে ধান দেওয়ার কথা, বারিক আমাকে তা দিলে না। অনেক কম দিলে। লোকে বল্লে—বাবু, ও ওই রকম। কত লোককে ফাঁকি দিয়েচে, আপনাকে ভালো মানুষ পেয়ে ফাঁকি তো দেবেই।

খুব রেগে বারিকের বাড়ী গেলাম। গিয়ে দেখে-শুনে বেশী রাগ রইল না। কি মুশকিল, এই রকম বাড়ীঘর ওর! মাত্র একখানা চারচালা ঘর। ঘরের দরজা-জানলার ফাঁকগুলো বাঁশের ঝাঁপ দিয়ে আটকানো, দোর পর্যন্ত নেই ঘরের। ওর দলিজে বিছানো আছে একখানা বেদে-চটা অর্থাৎ খেজুর পাতার বোনা পাটি, একটা কলঙ্কধরা তামার বদ্‌না, একটা হুঁকো আর তামাক, টিকে রাখবার মাটির পাত্র। একখানা অত্যন্ত ছেঁড়া ও ময়লা রাঙা নরুন-পাড় শাড়ী চালে শুকুচ্চে। চালের অন্যস্থানে একটা কুমড়ো গাছ উঠেছে। উঠোনে একখানা ভাঙা গরুর গাড়ী। সবসুদ্ধ মিলে অত্যন্ত ছন্নছাড়া অবস্থা।

কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি রাখতে গেলে ভাব-প্রবণ হোলে চলে না। আমি কড়া সুরে বললাম, মোটে দু'বিশ ধান পেলাম তিন বিঘে জমিতে? আমার সবসুদ্ধ বাইশ তেইশ টাকা নিয়ে এসেচ, তার বদলে ধান দাও। আর বছরের ভিটের খাজনা দু'টাকা তাও শোধ করো। নইলে কালই নালিশ ঠুকে দেবো।

বারিকের দুটি ছেলে, বড়টির বয়স আঠারো উনিশ, ছোটটির চোদ্দ পনেরো। তারা বাবার কাছেই দলিজে বসে গল্পগুজব করছিল। চট করে একখানা খুরসি পিঁড়ি এনে বড় ছেলেটা আমায় বসতে দিলে।

বারিক বললে—যা, কাঁটালপাতা কি কলার পাতা নিয়ে আয়, বাবু তামাক খাবেন। ওরে আলি, শীগ্‌গির ছোট্।

—থাক, আমার তামাকের দরকার নেই। ধান বের করো বাকী টাকার—

—ঠাণ্ডা হোন বাবু। তামুক খান আগে—

বারিক নিজে তামাক সেজে দিলে।

বললাম—তোমার ছেলেরা কি করে?

—বড়টি গরু চরায়। ওরা দু'জনে ভালো গান গায়। শুনিয়ে দে বাবুকে একখানা গান।

—থাক, গান এখন দরকার নেই, তুমি ধান বের করো।

—দেবো বাবু দেবো।

—আর খাজনা? আজ সব শোধ করে দিতে হবে। নইলে নালিশ হবে জান?

—দেবো বাবু দেবো, তামাক খান।

একটু পরে বারিক ও তার দুই ছেলেতে ধরাধরি ক'রে দু-বস্তা ধান বার ক'রে নিয়ে এল। বারিক বললে, বাবুর এই ধানগুলো ও'র বাড়ী পেশৗছে দিয়ে আসতি হবে—গরু দু'টো খুঁজে নিয়ে এসে গাড়ী জুতে দে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম—কত ধান?

—আড়াই বিশ।

—সাড়ে সাত মণ? এতে তো শোধ হবে না দেনা?

—বাবু, আল্লার কিরে, ঘরে আর ধান নেই। সব দেলাম আপনাদেরে। আর কিছু নেই, আপনি দেখে আসুন ঘরে।

—তোমার ধান রইল না?

—না বাবু, সব দেলাম।

—তুমি ছেলে-পিলে নিয়ে খাবে কি?

—তা' আর কি করবো বাবু। আমি নালিশকে বড্ড ভয় করি।

ওর কথা আমার বিশ্বাস হোল না।

দুই বস্তা ধান গরুর গাড়ী ক'রে ওরা আমার বাড়ী পেশৗছে দিলে।

দু'দিন পরে বারিক তার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে দেখি কোথায় যাচ্ছে। বারিকের বগলে বেহালা।

বললাম, ও বারিক, কোথায় চললে?

—আজ্ঞে বাবু সালাম। মহল্লা দিতে যাচ্ছি।

—তুমি কি বেহালা বাজাও?

—ওই অমনি একটু একটু। খোদার মর্জিতে।

জেলেপাড়ায় ওদের দলের ঘরে একদিন গিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাজির হোলাম। বাঁওড়ের ধারে একটা জাম গাছের ছায়ায় লম্বা দোচালা ঘর, কঞ্চির বেড়ার দেওয়াল, বসবার জন্যে খানচারেক পুরনো মাদুর, এককোণে দু'জোড়া ডুগি তবলা, একখানা খোল, এক জোড়া মন্দিরা, গোটা দুই থেলো হুঁকো টাঙ্গানো বাঁশের খুঁটির গায়ে। জন-পাঁচ ছয় লোক জুটেচে, বাকি এখনও আসে নি। আমাকে ওরা সরবে অভ্যর্থনা জানালো। বটতলাতে বসলাম। সামনের বাঁওড়ের স্বচ্ছ জলে পদ্মফুল ফুটে আছে। লম্বা লম্বা জলজ ঘাসের মধ্যে দিয়ে সুঁড়ি বালি মাটির পথ গিয়ে জলের ঘাটে নেমেচে ; পানকৌড়ি বসে আছে পাট-শেওলার দামে। ওপারে কাজি সাহেবের দরগা, ভাঙ্গা পাঁচিলে মস্ত বড় জিউলি গাছ বেড়ে উঠে সমস্ত দরগা ঘরের ওপর ঝুপসি ছায়া পড়ে আছে, আঠা ঝরে পড়চে গাছটার কাঁধ থেকে—খানিকটা সাদা, খানিকটা লাল—আঠা ঝরে ঝরে দরগা ঘরের পশ্চিম দিকের পাঁচিলের কোণটা একেবারে ঢেকে গিয়েচে। দরগাতলার ঘাটে ওপারে আমিনপুর গ্রামের কৃষক-বধূরা মাটির কলসী কাঁখে জল নিতে যাওয়া-আসা করচে।

একজন তামাক সেজে কলকে আমার হাতে দিয়ে বললে—'তামুক সেবা করুন—একটা কলার ডাঁটা কি এনে দেবো?

আমি তামাক খেতে খেতে বললাম—তা' একটু গান-বাজনা হোক শুনি।

সে বললে, বারিক এখনো আসে নি। সে না এলে আরম্ভ হবে না বাবু। সে হোল বেয়ালাদার। এ দলই তার। এর নাম বারিক অপেরা পার্টি।

—বাঃ বাঃ, নাম দিয়েচে কে?

—বাবু, মোরা তো ইংরিজী জানিনে। অন্য অন্য যাত্রাদলের কাগজে যেমন লেখা থাকে, তাই দেখে মোরা একটা মিল খাটিয়ে করিচি, ভাল হয় নি?

একটু পরে বারিক এসেও সেই কথা জিজ্ঞেস করলে।

আমি বললাম—নামের মত নাম একটা হয়েচে বটে। খাসা নাম।

—গান শুনিয়ে দে, বাবুরি তামুক সেজে দে।

ব্যস্তসমস্ত বারিককে ঠান্ডা ক'রে আমি তাকে বেহালা বাজাতে বললাম। ওর দুই ছেলে বেশ গান গায়। ছোট ছেলে কৃষ্ণ সাজে, বেশ কালো নধর চেহারাটি। তাকে বারিক বললে গান ক'রে আমায় শুনিয়ে দিতে। সে রগে হাত দিয়ে তারস্বরে শোনাই যাত্রার এক গান আরম্ভ করলে—

ওরে ও কিছান ভাই,
আমি হেথা বলে যাই।
গওরেতে শোন সেই বাণী—

বললাম—বেশ, বেশ। কৃষ্ণের গান?

বারিক ধমক দিয়ে বললে—মানভঞ্জন পালার সেই গানখানা গা—আমার সঙ্গে ধর্।

বলে নিজেই রগে হাত দিয়ে আরম্ভ করলে—

ধনি, কি সুখে রাখিব পরাণ,
কানু হেন গুণনিধি গ্রেহে না আইল যদি
অঝোরে বহিল দু'নয়ান—

(ও)　　লয়ান যে বহে যায়
গুণমণির বিরহ-জ্বালায়
লয়ান যে-বহে যায়—

বারিক গান করে মন্দ নয়। খানিকক্ষণ থেকে আমি চলে এলাম। জ্যোৎস্নারাত ছিল। বারিক কি আসতে দেয়?—বসুন বসুন। চন্দ্রাবলীর গান একটা শুনে যান না? আমি নিজে শিখিয়েছি।

রাত এগারোটার সময় দেখি আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে ছেলে দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে বারিক বাড়ী ফিরচে বন-জঙ্গলের পথ দিয়ে। বারিকের বাড়ী চালদী গ্রামে, ওদের যেখানে বাঁওড়ের ধারে গান-বাজনা হয়, বারিকের বাড়ী থেকে সে জায়গা দেড় মাইলের ওপর। এই পথের অধিকাংশই ঘন বন-জঙ্গলে ভরা, সাপখোপের ভয় তো নিশ্চয় আছে এত রাত্রে।

বারিককে ডেকে বললাম—আলো নিয়ে যাও না কেন বারিক?

বারিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বললে—কে, বাবু? এখনো জাগন্ত আছেন? আর বাবু আলো! কেরাচিন তেল কনে পাবো? কেরাচিন তেল অভাবে অন্ধকারে ভাত খেতে হচ্চে রোজ রোজ। গান কেমন শোনলেন? আগাগোড়া নিজে শেখানো বাবু। ওরা সব জেলে-মালো, বেতালা বেসুরো গান গাইতো। হাতে-নাতে শেখালাম বাবু—

বারিক এমন ভাব প্রকাশ করলে যেন স্বয়ং ফৈয়াজ খাঁ।

আমি তাকে এক আঁটি পাকাটি দিয়ে মশাল জেবলে নিয়ে বাড়ী যেতে বললাম।

হাটে ওদের গ্রামের সোনাই মণ্ডলের সঙ্গে দেখা—যে সোনাই মণ্ডল তার ধানের জমি আমার কাছে বিক্রি করেছিল। বেগুন বিক্রি করছে দেখে বললাম—সোনা ভাল আছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একরকম বাবু।

—বেগুন দ্যাও দু'সের।

—বাবু, একটা কথা আপনাকে বলতাম। বারিকের অবস্থা যে খুব খারাপ হোল, আপনি মনিব, আপনাকে না বল্লি আর কাকে বলি।

ভাবলাম, বারিকের বোধ হয় খুব অসুখ হয়েচে। কিন্তু দু'চার দিন আগে তাকে গান ক'রে বাড়ী ফিরতে দেখলাম যে। কি হয়েচে তার?

সোনাই বল্লে, তা না বাবু। ওর বড় দুর্দশা হয়েচে। আপনার কাছে এক মুঠো টাকা দেনা ছিল। আপনি ধানগুলো নিয়ে গেলেন। আর ঘরে খোরাকির ধান রইল না। যার কাছে নেবে, তারে আর ফেরত দেবে না এই ওর দোষ। নলে নাপিতের আর রামচরণ ময়রার গোলা থেকে আর বছর সমানে ধান কর্জ নিয়েচে, একটি দানা শোধ করে নি। সেদিন নালিশ করে রামচরণ ময়রা ওর বলদ ক্রোক দিয়ে নিয়ে গিয়েচে গত সোমবারে। ধান কর্জ পাচ্চে না কারো কাছে, একবেলা খেতে পাচ্চে একবেলা খাওয়া জোটচে না। বস্তর আবানে ওর ইস্তিরির ঘরের বার হওয়ার উপায় নেই। ছেলে দুটো আহম্মদ দফাদারের বাড়ী ওবেলা দুটো ভাত খেয়েছে। স্বামী ইস্তিরির বোধ হয় খাওয়াও হয় নি আজ।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—সে কি কথা! গত সোমবারে ওর গরু ক্রোক হয়েছে বলছো. সেই সোমবার সন্দের সময়েই যে ওকে বারিক অপেরা পার্টির ঘরে মহা আনন্দে দুই ছেলেকে নিয়ে গান করতে দেখিচি?

—তা দেখবেন বাবু। ও যে ওই রকম লোক। কাল কি খাবে সে ভাবনা নেই—দেখুন গিয়ে দুই ছেলে নিয়ে বেহালা বাজাচ্চে—

—ধান নেই ঘরে?

—এক দানা নেই বাবু।

—ওর মহাজনের কাছে কর্জ করে না কেন?

—ওই যে বললাম বাবু, সে দিক যাবার যো আছে? মহাজনের ঘরে সতেরো শলি ধান কর্জ নিয়েছিল, তার এক খুঁচি ধান শোধ করে নি। দেনায় মাথার চুল বিক্রি। যার নেবে

তারে আর দেবে না। কথার একদম ঠিক নেই। কেউ বিশ্বেস ক'রে আর দেয় না।

এর কিছুদিন পরে বারিক আমার কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে গেল। কলাই বেচে টাকা শোধ করবে এই শর্তে তাকে টাকা ধার দিলাম। ক্ষেতের কলাই, মুগ সব যে যার বিক্রী ক'রে ফেললে, বারিক আমার সঙ্গে আর দেখাও করলে না। একদিন হাটে খবর পেলাম বারিকের কলাই, মুগ আহম্মদ দফাদার সব কিনে নিয়েছে। শুনে আমার ভয়ানক রাগ হোল। বারিকের বাড়ী পরের দিন সকালেই গেলাম। বারিকের প্রতিবেশী তোফাজ্জেল বললে—বাবু, শীগগির যান, সে এখনো তার দলিজে বসে তামুক খাচ্ছে, আপনি যাচ্চেন শুনলি পেলিয়ে যেতে পারে। পাওনাদার এলেই পালাবে। ওর স্বভাবই ওই।

বারিকের ঘরদোরের অবস্থা আরও ছন্নছাড়া, চালের খড় গত বর্ষায় পচে ঝুলে পড়েচে, উঠোনের মাঝখানে মুগ কলাই মাড়বার খামার, এক পাশে ভূষি স্তূপাকার হয়ে আছে। গাড়ী-গরু নেই উঠোনে।

বারিক আমাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলো। মুখ ওর শুকিয়ে গেল।

—আসুন, বাবু, সালাম। দলিজে উঠে বসুন। ওরে আলি, খুরসি পিঁড়িখানা বাবুরি পেতে দে—

—থাক গে পিঁড়ি। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে। মুগ কলাই বিক্রি হয়েচে?

—হ্যাঁ বাবু।

—আমার টাকা দাও—

—ট্যাকা এখনো মোর হাতে আসে নি বাবু।

—মিথ্যে কথা। কার কাছে বিক্রি করেচো? আহম্মদ দফাদারের কাছে তো? সে সংবাদ আমি রাখি। আহম্মদ কারো পয়সা বাকী রাখবার লোক নয়। টাকা বের করো—

বারিক নির্বিকার ভাবে আমার জন্যে তামাক সাজতে লাগলো। তামাক সাজা শেষ ক'রে আমার দিকে কলকে এগিয়ে দিয়ে বললে, তামুক সেবন করুন—

—আমার কথার উত্তর দাও।

—আপনি নেয্য বলেচেন। টাকা ওরা দিইছিল, তা সংসারের জ্বালা, সে টাকা মোর খরচ হয়ে গিয়েচে। তবলা ছাইতে খরচ হোল তিন টাকা। বেহালার তার এনেলাম মুকুন্দ তেলির দোকান থেকে—

—ওসব বাজে কথা শুনতে চাইনে। খেতে পাও না, মহাজনের দেনা শোধ করবার যখন ক্ষমতা নেই, তখন অত শখ কেন? বাড়ীঘরের তো এই অবস্থা। গাড়ী-গরু কি হোল?

আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে ওর প্রতিবেশীদের মধ্যে কে একজন। আমার চড়া সুর শুনে অনেকে জড়ো হয়েছিল ওর ঘরের সামনে। বললে—ওরে আর কিছু বলবেন না বাবু। লোকটার আর কিছু নেই—

—গাড়ী গরু কি হোল?

—রামচরণ ময়রা গরু ক্রোক দিয়ে নিয়ে গেল, গাড়ীও বিক্রি করে ফেলেচে আহম্মদ দফাদারের কাছে। গাড়ী গরু না থাকলে চাষার উঠোন মানায়? বলি ও চাচা, বাবুর কাছ থেকে টাকা আনলে কেন, যদি শোধ করতে পারবা না? ভদ্দরলোকের কাছে কথা ভাঙো কেন তুমি? একেবারে দশায় ধরেচে তোমায়—ছ্যাঃ—জুয়োচুরি করা কেন?

বারিক মুখ চুন করে বসে রইল, আর সকলের হাতে হাতে কলকে পরিবেশন করতে লাগালো। আমি নিরুপায় হয়ে চলে এলাম। বারিক কোনো কথা গায়ে মাখে না, কে যেন কাকে বলচে।

বারিকের বাড়ী কিছুদিন আর গেলাম না। টাকা আদায় হবে না জানি, ওর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না। টাকা-কড়ির সম্পর্ক ত নয়ই।

বারিকের সঙ্গে মাস দুই পরে একদিন হাটে হঠাৎ দেখা। কাঁধে একখানা ময়লা গামছা, পরণে ছেঁড়া আধময়লা ধুতি লুঙির মত ক'রে পরা। সদা-হাসামুখ বারিক আমাকে দেখে বললে, বাবু সালাম। আমাদের ওদিকি আর যান না?

—না। আমার অন্য কাজ আছে।

—আজ একবার মহল্লাঘরে যাবেন বাবু ও-বেলা? দুটো গান শোনাতাম আর দেখতেন আমাদের 'সাধন সমর' পালাটা কি রকম হোল। আজ পুরো মহল্লা হবে। পরশু গান হবে আরামডাঙ্গায় বিশ্বেসদের বাড়ী।

—আমার সময় হবে না।

—ও কথা বললি বাবু শুনচি নে। আসুন দয়া করে। আপনারে গান শোনাতে বড্ড ভাল লাগে। যাবেন বাবু।

ওর অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। সন্ধ্যার কিছু আগেই বাঁওড়ের ধারে ওদের বারিক অপেরা পার্টির মহলাঘরে গিয়ে বসলাম। বারিক ও তার দুই ছেলে ঠিক সন্ধ্যার সময়ে এল। তখন বাঁওড়ের দিক থেকে ফুরফুরে হাওয়ায় বড্ড শীত করচে, সময়টা মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ। বারিকের গায়ে একখানা বহু পুরনো কুষ্ঠিয়ার চাদর। জ্যোৎস্না রাত্রি। আমি বাইরেই বসে রইলাম। বারিক মহাব্যস্ত অবস্থায় কখনো গান করে, কখনো এর গানের ভুল ধরে, ওর তালের ভুল ধরে, হাসি ঠাট্টা ও অঙ্গভঙ্গি কি ভাবে করতে হবে বিদূষকের ভূমিকায় তা শিক্ষা দেয়, ছেলেকে শিখিয়ে দেয় কৃষ্ণের ভূমিকায় কি রকম বেঁকে দাঁড়াতে হবে, এর দোষ ধরে, ওর গুণ গায়—মোট কথা এই বয়সে তার উৎসাহ, আমোদ, লম্ফঝম্প একটা দেখবার জিনিস।

আবাব বাইরে এসে আমার কাছে বলে, বাবু, বিড়ি খান একটা। দ্যাখচেন কেমন? আমার নামে যখন এ দল, তখন বারিক অপেরা পার্টির যাতে বাইরে নাম ভালো হয়, তা আমাকেই দেখতে হবে, নাকি বাবু? অজামিল ক্যামন দ্যাখলেন? চলবে? কেষ্ট? বেশ। আপনারা ভালো বললিই ভালো।

কে বলবে এই সেই বারিক, যার দু'বেলা খাওয়া হয় না, যার গাড়ী-গরু পর্যন্ত মহাজন ক্রোক দিয়েচে, দেনায় যার মাথার চুল বিক্রি, যার বয়েস পঞ্চান্নর কোঠা ছাড়াতে চলছে। এই মহল্লার ও একাই একশ।

পরদিনই হাটে আহম্মদ দফাদার ওকে কি ক'রে অপমান করলে আমার সামনে। চেঁচামেচি শুনে গিয়ে দেখলাম, আহম্মদ ওর গলায় গামছা দিয়ে টানাটানি করচে। আহম্মদ চালদীগ্রামের অবস্থাপন্ন লোক, লম্বা দাড়ি রাখে, বেশ একটু গর্বিত, ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়। এবার ধানের দাম সাড়ে ষোল টাকা পর্যন্ত উঠেছিল, দু'টি গোলা ভর্তি প্রায় হাজার মণ ধান চড়া দরে বিক্রি ক'রে আহম্মদ টিনের বাড়ী ঘুচিয়ে দোতলা কোঠাবাড়ী করেছে।

আমি গিয়ে বললাম—কি করো আহম্মদ? ওকে ছেড়ে দাও, ছিঃ, তোমার চেয়ে বয়েসে কত বড় না?

আহম্মদ হাতে পয়সা করেচে, কাউকে মানে না। আমার দিকে ফিরে বললে—আজ জুতিয়ে ওর ইয়ে দেখিয়ে দেবো বাবু, এত বড় আস্পদ্দা, আমার সঙ্গে জুয়াচুরি কথা বলে। মুগ দেবো বলে বায়নার টাকা নিয়েচে সেই আর বছর। দুমণ কলাই দিয়ে আর টাকাও দেয় না, কলাইও দেয় না। রোজ বলে দিচ্ছি দেবো, আজ আমি ওরে—আবার সঙ্গে কিনা ঠকামি কথা বলে বাবু? এত বড় ওর সাহস? (যেন সাক্ষাৎ ভাইসরয় কিংবা মহাত্মা গান্ধী কিংবা গৌরগোপাল ভক্তিবিনোদ গোস্বামী কিংবা বশিষ্ঠ মুনি কিংবা জুলু সর্দার লোচবক্ষুলা)।

বারিক তখন বলচে—ছেড়ে দ্যান বাবু, আমি ও সুমুন্দিকে একবার দেখে নেতাম আপনি ধরলেন কেন?

আহম্মদ আবার সবেগে ঠেলে উঠে বললে—তবে রে—

আবার তাকে কোনরকমে ঠান্ডা করি।

আহম্মদকে বললাম—কত টাকা পাবে?

—তা বাবু অনেক। খেতে পায় না, দু'বিশ ধান দেলাম আশ্বিন মাসে। সাতাশ টাকা নিলে মুগের দাম, মোটে দুমণ কলাই দিলে, এখনো পনেরো টাকা তার দরুণ বাকি।

ঝিঙের ভুঁই করে গাঙের ধারে, তার দু'বছরের খাজনা সাড়ে চার টাকা। আমার গাছ থেকে ব্যবসা করবে বলে দেড় কুড়ি নারিকেল পেড়ে আনে, তার দরুণ একটা পয়সা দেয় নি—ওর মত মিথ্যেবাদী, ফেরেব্‌বাজ, জুয়োচোর এ দিগরে পাবেন না—আপনিও তো শুনি পাবেন—এক মুঠো টাকা—

বারিকের প্রতিবেশী সোনাই মণ্ডল আমাকে আড়ালে বললে—বাবু দু'কাঠা মুসুরী আর দু'টো মানকচু বেচিতি এনলে বারিক তা সব আহম্মদ কেড়ে নিয়েচে। হাটে ওই বেচে চাল কিনে নিয়ে যাবে তবে ওদের খাওয়া হোত। কি অন্যাই কাণ্ড দেখুন দিকি? ছ'-আনা পয়সা হবে আপনার কাছে? বেগুন পটলটা ওকে কিনে দি—

সেই দিনই রাত প্রায় দশটার সময় শুনলাম বারিক উচ্চৈঃস্বরে রাগিণী ভাঁজতে ভাঁজতে বারিক অপেরা পার্টির মহল্লা দিয়ে ফিরচে—

"তুমি কোন্ অংশে বল কোন বংশে
কারে-এ-এ করেচ সুখী—
নামটি তোমার দয়াময়
কথায় বটে কাজে নয়"—ইত্যাদি

এরপর অনেক দিন আমার সঙ্গে ওর দেখা হয় নি।

একদিন সোনাই মণ্ডলের সঙ্গে ওর দেখা। তাকে বলি—বারিক কেমন আছে?

—আর বাবু! আপনি শোনেন নি? তার যে সব্বনাশ হয়ে গিয়েচে!

—কি-কি-কি ব্যাপার? কি হোল?

—ওর সেই বড় ছেলেটা আজ সাত দিন হবে মরে গিয়েচে!

—সে কি কথা? কি হয়েছিল?

—বাবু পুরনো জ্বরে ভুগছিল। পেটে পিলে। রোজ সন্ধ্যেবেলা জ্বর হোত। ওষুধ নেই, পথ্যি নেই। জ্বর সেরে গেল তো পান্তা ভাত আর পটল-পেঁজপোড়া খেলে! সে দিন রাত্তিরে জ্বর হয়েচে ওর সেই অপেরা পার্টি থেকে গান সেরে এসে। ভোর বেলা মারা গেল। কাফনের কাপড় জোটে না শেষে, এই তো অবস্থা। বুড়ো বয়েসে ওই ছেলেডা তবু মাথাধরা হয়ে ঠেলে উঠছিল। আর একটা ছেলে, সে তো বাচ্চা, তার ভরসা কি?

অত্যন্ত মর্মাহত হলাম বলা বাহুল্য। মনের কোণে ঘোর মিথ্যেবাদী, জুয়াচোর, সদা-প্রফুল্ল, বৃদ্ধ বারিকের প্রতি একটু অনুকম্পার ভাব সঞ্চিত ছিল। কাল সকালে একবার বারিকের বাড়ী যাবো। ভাগের জমি দু'বছর কেড়ে নিয়েছিলাম ওর কাছ থেকে, এবার ওর সঙ্গেই আবার বন্দোবস্ত করবো। পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, সাহায্য করা উচিত।

সেই দিনই রাত দশটা এগারোটা। গোঁসাই বাড়ীতে জন্মাষ্টমীর নিমন্ত্রণ খেতে যেতে যেতে শুনি কোথা থেকে বাঁশি, বেহালা, ডুগি-তবলা ও মানুষের গলার একটা সম্মিলিত রব ভেসে আসচে। নিমচাঁদ গারই বললে—বাবু, গোঁসাই বাড়ীর নাটমন্দিরে আজ জন্মাষ্টমীর দিন বারিক অপেরা পার্টির গাওনা হচ্ছে। বেশ ভালো পালা হবে, গিয়ে শুনুন।

আসরে গিয়ে দেখি বারিক বিদূষকের ভূমিকায় দাড়ি নেড়ে নেড়ে খুব লোক হাসাচ্ছে। পালা হচ্ছে 'সাধন সমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ'।

মাছ চুরি

সকালবেলা।

টুনু ও সন্তু তেঁতুলগাছে পা দুলিয়ে টকটক তেঁতুলপাতা চিবুচ্ছে। টুনু বললে—সন্তু, ওবেলা আমার সঙ্গে তেঁতুলতলার দোয়াতে যাবি তো?

ঝিঙের ভুঁই করে গাঙের ধারে, তার দু'বছরের খাজনা সাড়ে চার টাকা। আমার গাছ থেকে ব্যবসা করবে বলে দেড় কুড়ি নারিকেল পেড়ে আনে, তার দরুণ একটা পয়সা দেয় নি—ওর মত মিথ্যেবাদী, ফেরেব্‌বাজ, জুয়োচোর এ দিগরে পাবেন না—আপনিও তো শুনিন পাবেন—এক মুঠো টাকা—

বারিকের প্রতিবেশী সোনাই মন্ডল আমাকে আড়ালে বললে—বাবু দু'কাঠা মুসুরী আর দুটো মানকচু বেচাতি এনলে বারিক তা সব আহম্মদ কেড়ে নিয়েচে। হাটে ওই বেচে চাল কিনে নিয়ে যাবে তবে ওদের খাওয়া হোত। কি অন্যাই কান্ড দেখুন দিকি? ছ'-আনা পয়সা হবে আপনার কাছে? বেগুন পটলটা ওকে কিনে দি—

সেই দিনই রাত প্রায় দশটার সময় শুনলাম বারিক উচ্চৈঃস্বরে রাগিণী ভাঁজিতে ভাঁজিতে বারিক অপেরা পার্টির মহল্লা দিয়ে ফিরচে—

"তুমি কোন্ অংশে বল কোন বংশে
কারে-এ-এ করেচ সুখী—
নামটি তোমার দয়াময়
কথায় বটে কাজে নয়"—ইত্যাদি

এরপর অনেক দিন আমার সঙ্গে ওর দেখা হয় নি।

একদিন সোনাই মন্ডলের সঙ্গে ওর দেখা। তাকে বলি—বারিক কেমন আছে?

—আর বাবু! আপনি শোনেন নি? তার যে সব্বনাশ হয়ে গিয়েচে!

—কি-কি-কি ব্যাপার? কি হোল?

—ওর সেই বড় ছেলেটা আজ সাত দিন হবে মরে গিয়েচে!

—সে কি কথা? কি হয়েছিল?

—বাবু পুরনো জ্বরে ভুগছিল। পেটে পিলে। রোজ সন্ধ্যেবেলা জ্বর হোত। ওষুধ নেই, পথ্যি নেই। জ্বর সেরে গেল তো পান্তা ভাত আর পটল-পেঁজপোড়া খেলে! সে দিন রাত্তিরে জ্বর হয়েচে ওর সেই অপেরা পার্টি থেকে গান সেরে এসে। ভোর বেলা মারা গেল। কাফনের কাপড় জোটে না শেষে, এই তো অবস্থা। বুড়ো বয়েসে ওই ছেলেডা তবু মাথাধরা হয়ে ঠেলে উঠছিল। আর একটা ছেলে, সে তো বাচ্চা, তার ভরসা কি?

অত্যন্ত মর্মাহত হলাম বলা বাহুল্য। মনের কোণে ঘোর মিথ্যেবাদী, জুয়াচোর, সদা-প্রফুল্ল, বৃদ্ধ বারিকের প্রতি একটু অনুকম্পার ভাব সঞ্চিত ছিল। কাল সকালে একবার বারিকের বাড়ী যাবো। ভাগের জমি দু'বছর কেড়ে নিয়েছিলাম ওর কাছ থেকে, এবার ওর সঙ্গেই আবার বন্দোবস্ত করবো। পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, সাহায্য করা উচিত।

সেই দিনই রাত দশটা এগারোটা। গোঁসাই বাড়ীতে জন্মাষ্টমীর নিমন্ত্রণ খেতে যেতে যেতে শুনি কোথা থেকে বাঁশি, বেহালা, ডুগি-তবলা ও মানুষের গলার একটা সম্মিলিত রব ভেসে আসচে। নিমচাঁদ গারই বললে—বাবু, গোঁসাই বাড়ীর নাটমন্দিরে আজ জন্মাষ্টমীর দিন বারিক অপেরা পার্টির গাওনা হচ্ছে। বেশ ভালো পালা হবে, গিয়ে শুনুন।

আসরে গিয়ে দেখি বারিক বিদূষকের ভূমিকায় দাড়ি নেড়ে নেড়ে খুব লোক হাসাচ্ছে। পালা হচ্ছে 'সাধন সমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ'।

মাছ চুরি

সকালবেলা।

টুনু ও সন্তু তেঁতুলগাছে পা দুলিয়ে টকটক তেঁতুলপাতা চিবুচ্ছে। টুনু বললে—সন্তু, ওবেলা আমার সঙ্গে তেঁতুলতলার দোয়াতে যাবি তো?

—ঠিক যাবো। আর কাউকে বলিস নে।

—বলতেই হবে হারুকে। দু'জনার কাজ নয়, বড্ড সোঁত। ডুবিয়ে দিয়ে যাবে।

—যদি টের পায়?

—বেশি রাত্তিরে যেতে হবে। জ্যোচ্ছনা-রাত্তির, তিনজনে ভয় কি?

—ভূতের ভয়, বা রে! আবার পাশেই চটকাতলার শ্মশান!

—দূর, ভূতটুত বাদ দে। তিন ব্রাহ্মণে আবার ভূতের ভয়?

বর্ষাকাল। শ্রাবণ মাস। নদীতে ঢল নেমেছে; তরতর বেগে স্রোত বইছে, কুটো পড়লে দু'খানা হয়ে যায়। তেঁতুলতলার দোয়া গ্রামের উত্তরে, তার পারে সাঁইবাবলা আর কুঁচঝোপের জঙ্গল, নদীর এই বাঁকে নদীর গভীরতা খুব বেশী, তাই এর নাম তেঁতুল-তলার দ'। বর্ষাকালে মাঝে মাঝে মড়া বেধে থাকে ডাঙার জঙ্গলের ছায়ায়, কামট আর কচ্ছপে মড়া ছেঁড়াছেড়ি করে, ভয়ে এদিকে দিনমানেই কেউ আসতে চায় না, চিংড়িমাছ-ধরা নৌকাগুলো দোয়াড়ি ঝাড়বার জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা পর্যন্ত করে না।

সন্ধ্যা পার হয়েও প্রায় ঘণ্টাখানেক পার হোল।

কুঁচগাছে জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে নিবচে।

ওরা তিনটি ছেলে সন্তর্পণে চলেচে তেঁতুলতলার দ'য়ের পথে। সন্তর্পণে যাওয়ার বিশেষ কারণ আছে। এ বর্ষায় বিষাক্ত সাপেরও ভয়, বাঘেরও ভয়; হাতে ওদের দা, লাঠি, শক্ত দড়ি। কিন্তু কোন আলো নেই, যে কাজে যাচ্ছে, আলো থাকলে লোকে টের পেয়ে যাবে।

সন্তু বললে—ভয় করবে না তো তোদের? পাশেই শ্মশান, ডাকসাইটে ভূতের জায়গা তেঁতুলতলার দোয়া।

টুনু ও হাবু হেসে উঠলো—ভয় করলে ওরা এ কাজে আসতো না!

টুনু বল্লে—ভূতটুত রাখ এখন, গদাই জেলে কোথায় মাছটা বেঁধে রেখেচে জানিস তো?

সন্তু ওদের মধ্যে মাছ ধরা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। সে বললে, জেলেরা ডাঙায় কোন বড় গাছের গুঁড়িতে কাছি বেঁধে জলে নামিয়ে দেয়, সেই কাছির সংগে মাছ বেঁধে রাখে।

ঐ দূরে তেঁতুলতলার দোয়া দেখা যাচ্ছে। মন আনন্দে নেচে উঠল ওদের। এবার অত বড় মাছটা ওদের হাতের মুঠোয়!

সন্তু বললে—আমাদের টেনে আনলি তো, মাছ যদি না থাকে?

টুনু খোঁজ না নিয়ে এখানে আসে নি। সে জানে গদাই জেলে আজ সকালে মস্ত একটা দশ-বারো সেরের রুইমাছ ধ'রে তেঁতুলতলার দোয়ার গভীর জলে জিইয়ে রেখে এসেচে, কারণ আজ হাট-বার নয়, অত বড় মাছটা বিক্রি করার সুবিধে হবে না। দিলে নেবে না কি, সবাই নেবে এখন। গাঁয়ের বামুন পাড়ায় সবাই নেবে এখন ধারে, তারপর তাগাদা দিতে দিতে পয়সা আদায় যে কোন্ কালে হবে, তার কোন ঠিক নেই। না দিলে রাগ। জেলেপাড়ার সবাই বামুনদের ভিটের প্রজা! 'উঠে যাও, চাই নে তোমার মত প্রজা' ইত্যাদি, তার চেয়ে হাটে মাছটা নিয়ে গিয়ে নগদ দামে কলকাতার ব্যবসায়ীদের বিক্রি করো—নির্ঝঞ্ঝাট।

এই সব ভেবেই গদাই মাছটি জিইয়ে রেখে এসেছিল তেঁতুলতলার দোয়াতে।

টুনু তা টের পেয়েচে আজ সকালে। সে গুড় কিনতে গিয়েছিল গদাই জেলেরই বাড়ী। গদাই আখের গুড়ের পাইকিরি ব্যবসা করে এবং বাকি সময় দশ আনা সের দরে খুচরো বিক্রি করে প্রতিবেশীদের মধ্যে। টুনু ওদের উঠোনে গিয়ে গুড়ের বাটি হাতে দাঁড়াতেই শুনলে গদাই ঘর থেকে বলচে, মাছটা কি বড় রে! দশ সেরের কম হবে না। জিইয়ে রেখে এ্যালাম তেঁতুলতলার দোয়াতে। গাঁয়ে সবাই ধার নেবে, পয়সার তাগাদা দিতে দিতে পায়ের জুতো ছিঁড়ে যাবে, তবু আদায় হবে না। কাল হাট আছে, কাল তুলে নিয়ে আসবো।'

সন্তু বললে—এখন খুঁজে পেলে হয়, জ্যোচ্ছনা তো উঠলো।

তেঁতুলতলার দোয়ার ধারে ওরা পেঁছে গিয়েচে।

আলো-আঁধারের জাল বুনেচে নদীর পাড়ের বনে বাদাড়ে। মেঘভাঙা চাঁদের আলো পড়েচে বড় বড় বনকচু ছোট-গোয়ালের পাতার গায়ে। ঘেঁটকোল ফুলের কটুগন্ধ বার হচ্চে বর্ষাসন্ধ্যায়। নদীজলে কেমন এক ধরণের শব্দ হচ্চে। ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকচে বনের অন্ধকার গহনে।

সন্তু ভয়ের সুরে বলে উঠলো—ফেউ ডাকচে চটকাতলার ওদিকে—ওই—

টুনু বললে—দূর, ও ফেউ নয়, এমনি শেয়াল ডাকচে।

—কে জলে নামবে?

—আমি নিজে নামবো। দাঁড়া দেখি কোন্ গাছে দড়ি বেঁধেচে।

টুনু কথা শেষ করেই ডাঙার ধারের সব গাছ খুঁজতে লাগলো। ওরা সবাই খুঁজতে লাগলো। অন্ধকার এখনো চাঁদের আলোতে ভালো ক'রে দূর হয়নি, এ সব জায়গাতে অন্ধকার কোন দিনই বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে যায় না। নাঃ, কাছি বাঁধা নেই কোন গাছেই।

সন্তু বললে—টুনুর যত বাজে কথা—

টুনু রাগের সুরে বললে—বাজে কথা তো বাজে কথা। তুমি এলে কেন ভাই? আমার কথায় যদি তোমার এত অবিশ্বাস—

—তবে মাছটা কি জলে ছেড়ে দিয়ে গেল? দড়ি কোথায়? বেঁধেছে কিসে? চল বাড়ী যাই—আর এত রাতে ভূতের জায়গায় থাকে না।

হঠাৎ টুনু চেঁচিয়ে উঠল, 'ইউরেকা, ইউরেকা'!

—তার মানে?

—তার মানে পেয়েছি, পেয়েছি! পড়িস নি নীতিসুধার সেই গল্পটা? আর্কিমিডিস্ বলে একজন সাহেব পণ্ডিত কি একটা বার করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন? গদাই চালাক লোক, কাছি গাছের সঙ্গে বাঁধে নি রে। জলের মধ্যে খোঁটা পুঁতে তার সঙ্গে কাছি বেঁধেছে—ঠিক একেবারে—নির্ঘাৎ—

সত্যিই তাই। খুঁজতেই পাওয়া গেল বটে। জলের ধারে মোটা বাবলাকাঠের গোঁজ। টুনুকে মিথ্যেবাদী বলাতে ওর রাগ হয়েছে। সে বললে—এই দ্যাখ্ গোঁজ—এর সোজা জলের মধ্যে বড় খোঁটা পুঁতে তাতে মাছ বেঁধেচে। আমি জলে নামবো। তোরা এখানে থাক দাঁড়িয়ে—

সন্তু মাছের ব্যাপার অনেক কিছু জানে। সে নিজে ভাল বর্শেল, অর্থাৎ ভাল মাছ ধরিয়ে। সে পরামর্শ দিলে সবাই মিলে জলে না নামলে অতবড় মাছ কিছুতেই ডাঙায় তোলা যাবে না। অন্তত ছ'হাত জল থেকে মাছ ডাঙায় তুলতে হবে। গোঁজ পুঁতেচে চিনে ঠিক করবার জন্যে। ঠিক ওই সোজা জলে নামতে হবে।

সবাই মিলে জলে নামলো। খরস্রোতা নদী, তীরের মত একরোখা গতিতে ভাঁটার দিকে ছুটেছে।

সন্তু বললে—সাবধান, যদি বেকায়দায় সোঁতে পড়ে যাও, তবে টেনে নিয়ে গিয়ে তুলবে একেবারে আঠারো-বাঁকির চরে, জ্যান্ত কি মড়া 'তার ঠিক নেই।

খুঁজতে খুঁজতে একগলা জলের মধ্যে সত্যিই প্রকাণ্ড বাঁশের খোঁটা পাওয়া গেল। তাতে কাছি বাঁধা। কাছিতে সন্তুর পা ঠেকতেই হাত দশ-বারো দূরে জল ঘুলিয়ে প্রকাণ্ড কি একটা জলের জীব হুড়ুম ক'রে ভেসে উঠলো!

সন্তু চমকে উঠে বললে—কি ওটা?

হাবু ও টুনু একসঙ্গে বলে উঠলো—বাপরে! কি বড় মাছটা!

—মাছ?

সন্তুর গলায় সন্দেহের সুর।

টুনু রাগের সুরে বললে—মাছ না? তবে কি? তোর সব কথাতেই এমন একটা ভাব দেখাস যে তুই খুব বুঝিস আর কেউ কিছু না--

সন্তু কিন্তু ততক্ষণ ডাঙার দিকে চলেচে। যেতে যেতে বললে--এত রাত্তিরে এই নির্জন জায়গায় একগলা জলে—না সবাই চলে এসো—

—কেন রে?

—ও মাছ নয়।

—মাছ না? তবে কি? কুমীর?

—কুমীর কি না জানি নে, কিন্তু যত বড়ই মাছ হোক, ওরকম শব্দ তো করবে না। চলে আয় সবাই।

টুনু ততক্ষণে কিন্তু কাছিটা হাত দিয়ে ধরেচে। সে নিজে ওদের ডেকে এনেচে। মাছ চুরির জন্যেই এনেচে, এখন যদি সন্তু ক্রমাগত ওর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকে, তবে ওর মান থাকে কোথায়? প্রাণ আগে না মান আগে?

পরক্ষণেই দেখা গেল কিসে টুনুকে গভীরতর জলের দিকে যেন টেনে নিয়ে চলেচে।

সন্তু বললে—ধর ধর—ও হাবু, দেখিস কি হাঁ ক'রে? ধর—

দুজনে মিলে টুনুর হাত ধরে টেনে বুক-জলে নিয়ে এসে দাঁড় করালে।

টুনু হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—পা জড়িয়ে গিয়েছিল কাছিতে—মাছটা এমন টান দিলে যে তোরা না ধরলে আমায় আজ জলসই করেছিল আর একটু হোলে—বড় মাছ—

সন্তু বললে—ও মাছ নয়।

—আবার বলে মাছ নয়? কি তবে ওটা?

—তা জানি নে। মাছ ওরকম শব্দ করে না। জল থেকে উঠে এসো সবাই—

টুনু আবার গিয়ে কাছি ধরলো। বললে—শীগগির আয়, সবাই মিলে দে টান—এইবার ওঠাবো—

হাবু ওর সঙ্গে কাছিতে হাত দিলে। সন্তুও এগিয়ে গেল।

হাবু বললে—টান দে—দে টান—

ওরা প্রাণপণে টানতে লাগলো কাছি ধরে। সন্তু বল্লে—বাব্বাঃ—যেন একটা পাহাড় বাঁধা আছে কাছির আগায়—

টুনু বল্লে—ভালো কথা, মাছ যদি না হবে, তবে গদাই জেলে ওটাকে কাছিতে যখন বাঁধলে, তখন দেখতে পেলে না ওটা তিমি কি কুমীর? এ কথার উত্তর দাও—

হঠাৎ সন্তু চেঁচিয়ে উঠলো—ওরে হাবু কোথায় গেল? হাবু কোথায়? তলিয়ে গিয়েচে—সর্বনাশ হয়েচে!

দুজনে মিলে ডুব দিতে হাবুর একখানা হাত সন্তুর হাতে ঠেকতেই সন্তু জলের ওপর হাবুকে নিয়ে ভেসে উঠলো—তারপরে ওকে ডাঙার দিকে টানতে লাগলো। হাবু জল গিলতে গিলতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—ডুবিয়ে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমায়—আমি ভাই আর যাবো না—

টুনু বল্লে—কাপুরুষ কোথাকার—ফের আয়।—ধর বলচি!

অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পরে সত্যই ওরা কাছির প্রান্তে বাঁধা মাছটাকে ডাঙার কাছে নিয়ে এল। সন্তু বল্লে—এ কিরকম মাছ? ওর গা দেখা যাচ্ছে না, টুনু ছুরি মার ওর গায়ে—ছুরি মার—

ওর কথা শেষ হয় নি এমন সময় ওর চোখের সামনে টুনু অথৈ জলের দিকে একখানা সোলার মত ভেসে চললো। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চেঁচাতে লাগলো—ধর আমাকে—ধর ভাই—গেলাম—গেলাম—

আবার ওরা ওকে টেনে নিয়ে এলো।

তখন ওদের রোখ চেপে গিয়েছে। মাছটা তুলবেই। আরো আধঘণ্টা প্রাণপণে ধস্তাধস্তি চললো আবার। ছুরি চালাচ্চে টুনু যখনই সুবিধে পাচ্চে। মাছ কাবু হয়ে পড়চে ক্রমশঃ। টুনুর সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপচে।

সকলে মিলে টানতে টানতে কাছি-সুদ্ধ প্রকাণ্ড মাছটা ডাঙায় টেনে তুললে। তখনও সেটা আছড়াচ্চে আর লাফাচ্চে। ভোঁস ভোঁস করে হাওয়া বেরুচ্চে ওর মুখ দিয়ে।

সেখানটাতে জ্যোৎস্না পড়েচে।

সন্তু চীৎকার ক'রে বলে উঠলো—একি সর্বনাশ রে! এ তো মাছ নয়—তখনি তোদের বললাম...দ্যাখ চেয়ে জ্যোৎস্নার আলোয়—

টুনু তখনও বলচে—কি তবে? মাছ নয় তো কি?

সন্তু বললে—সরে পালিয়ে আয়—কাছে যাস নে, ও আস্ত যম—দেখচিস নে ওটা কি জিনিস? প্রকান্ড কামট! প্রাণে বে'চে গিইচি। দেখছিস্ নে ওর মুখে ব'ড়শি এখনো বি'ধে আছে। গদাই ভোর-রাত্তিরে মাছ ধরেচে ব'ড়শিতে ভেবেচে মাছ হবে, মস্ত মাছটা। তখন বড়সি বি'ধে নিজ'ীব হয়ে পড়েছিল বলে জোরজবরদস্তি করতে পারে নি। এখনো নিজমূর্তি ধরতে পারে নি আলটাগ্রায় ব'ড়শি বে'ধা রয়েছে, তাই। নইলে আজ আমাদের রক্তে জল লাল হয়ে উঠতো—

হাবু আর টুবু শিউরে উঠলো। কামট! যার নামে ঝুনো জেলেরা পর্যন্ত আঁতকে ওঠে। আস্ত যমই বটে। ভগবান খুব বাঁচিয়ে দিয়েচেন আজ!

সন্তু বলে—দাঁড় কেটে দে—নইলে গদাই একা যদি কাল ওটাকে তুলতে আসে, বলা যায় না কি হয়। এখনো ওটা মরে নি।

টুবু ক্ষিপ্রহস্তে দড়ি কেটে বিশালকায় হিংস্র জলজন্তুটাকে গভীর জলের দিকে ঠেলে দিলে।

বেসাতি

ভীষণ বর্ষার দিন।

নিরুপমার জ্বর আজ ক'দিন ছাড়ে না। শিউলিপাতার রস খাওয়ালাম, দোকান থেকে পাঁচন এনে খাওয়ালাম, অসুখ কিছুতেই সারে না। স্কুলের ছুটি হওয়ার সময় রোজ ভাবি আজ বাড়ী গিয়ে দেখবো নিরুপমার জ্বর ছেড়ে গিয়েচে। রাস্তা থেকে চেয়ে দেখি জানলা দিয়ে কি দেখা যাচ্চে—নিরুপমা বিছানায় উঠে বসেচে, না শুয়ে আছে।

রোজই নিরাশ হই। নিরুপমা শুয়ে আছে। ছটফট করচে, এপাশ ওপাশ করচে। মস্ত লেপমুড়ি দিয়েচে দেখলেই বুঝতে পারি ওর খুব জ্বর এসেচে।

সামান্য মাইনের মাস্টারি করি, এগারোটি টাকা মাইনে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে থাকি বাড়ীতে। কায়ক্লেশে চলে। পৈতৃক আমলের ধানের জমিতে যদি দুটো ধান না হোত, তা'হলে সংসার একেবারেই চলতো না। নিরুপমা গোছালো গৃহিণী, যা আনি বেশ চালিয়ে দেয়। মাছ মাংস যুদ্ধের বাজারে আমাদের ঘরে আসা মুশকিল। হাট থেকে চাঁদা মাছ, চুনো পুঁটি কিনে আনি। আমাদের স্কুলের বুড়ো পন্ডিত কেশব ভট্টাচার্যি মাছ ভিক্ষে করে মেছোহাটায়। দোষ দিইনে ওকে, মাইনে পায় সাড়ে তিন টাকা। হ্যাঁ, সাড়ে তিন টাকা! বিশ্বাস করা মুশ্কিল হয় জানি। কিন্তু এই সাড়ে তিন টাকার জন্যে বুড়ো কেশব ভট্টাচার্য দুমাইল দূরবর্তী তালকোণা-নকিবপুর গ্রাম থেকে দশটায় আসে, চারটের ফেরে।

কেশব পন্ডিত মেছোহাটায় গিয়ে বলে—ওগো ও অক্রুর, তোমার নাতির দিকে একটু লক্ষ্য রাখবা। বেশ নামতা পড়তো—আজ দু'দিন আবার একটু ঢিল দিয়েচে। বলি ও কি মাছ? ট্যাংরা? দাও দিকি দুটো বাপু। তোমার নাতির কল্যেণে একদিন মাছ খেয়ে নিই। ভারি বুদ্ধিমান নাতি তোমার, হীরের টুকরো—দ্যাও ওই চিংড়ি মাছটাও দ্যাও ওই সঙ্গে। পয়সা দিয়ে তো কিনবার ক্ষ্যামতা নেই।

আমি একদিন বলেছিলাম—পন্ডিতমশাই, মাছ আমি কি দুটো চাইলে পাই নে? পাই। কিন্তু আমার প্রিরবৃত্তি হয় না—আপনি রোজ রোজ কেন চান?

—না চেয়ে ভায়া করি কি। বাড়ীতে তিনটে নাতি, দুটো নাতনী; মেয়েটা অল্প বয়সে বিধবা হোল, কেউ নেই সংসারে। আমি সব নিয়ে আগলে আছি। এই সাড়ে তিন টাকাই আমার কাছে সাড়ে তিন মোহর—

—আপনার জামাই কতদিন মারা গিয়েচে?

—তা আজ হোল সাড়ে তিন বছর।

—সংসারে কে আছে?

—আমার মেয়ে নুটু আর তার কাচ্চাবাচ্চা। ওদের কেউ দেখবার থাকলে আমি কি

আর ওদের নিয়ে বসে থাকি? আমারও বাড়ী কেউ নেই। বলি আগলে না রাখলি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে মেয়েডা কি ভেসে যাবে? তাই পড়ে আছি।

—আর কোনো আয় নেই?

—মাঝে মাঝে পুজোটা আসটা করি, কলাটা মুলোটা সিকিটা দুয়ানিটা এই আয়। তাতে কি হয়। এক বেলা খাওয়া হয়, এক বেলা হোলই না। মাছ ওরা খেতেই পায় না। কিনবার তো পয়সা জোটে না। কোনো রকমে চালানো। আমি মাছের ভক্ত নই, ওই ছেলেমেয়েগুলোর জন্যি।

পাঠশালার মাস্টার পণ্ডিতদের অবস্থার দিকে কেউ তাকিয়ে দেখে না। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ত্রৈমাসিক সাহায্য আজ ছ'মাস বন্ধ। ছাত্রদত্ত বেতন সবাই মিলে ভাগযোগ ক'রে নিয়ে কোনো রকমে চলচে।

কেশব ভট্টাচার্যির মাছ ভিক্ষে করা নিতান্ত হীন কাজ। তবে বেগুনটা, থোড়টা, মোচাটা এ আমরাও নিয়ে থাকি। স্কুলে সবই চাষীগৃহস্থদের ছেলেমেয়ে। আমি জানি জেয়ালা-বল্লভপুরের পতিরাম কাপালীর মোটা চাষ আছে তরকারীর; প্রধানতঃ বেগুনের। সেদিন তার মেয়ে লক্ষ্মী আমার হাতে একটা টাকা দিয়ে বললে—ও মাস্টার মশাই, আমারে কাগজ কিনে দেন না—

—কি কাগজ?

—লেখবার কাগজ।

—টাকা কে দিয়েচে?

—মোর কাছে ছেল। আরও আছে—

—বলিস কি? কটা?

মেয়েটা একটা বার্লির খালি টিন উপুড় ক'রে ঢাললে টেবিলের ওপর। আঠারোটা টাকার নোট, সিকি দুয়ানি, কাঁচাটাকা। টিনটা ঢেলেই বললে—আপনি নেন মাস্টার মশাই। এগুলো সব নেন। খাবার কেনবেন। মুই কাপড় জামা কেনবো, গজা কেনবো, মুড়কি কেনবো—

আমি ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে বললাম—থাম, চুপ কর। এত টাকা তুই পেলি কোথায় আগে বল্। দুটি মেয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে—মাস্টার মশাই, লক্ষ্মী আমাদের একটা ক'রে পয়সা দিয়েচে জলখাবার খেতে—।

আমি বললাম—নিয়ে আয় সে পয়সা আমার কাছে—নিয়ে আয়—অমনি মেয়েদুটি দুটি চকচকে আধুলি নিয়ে এসে আমার টেবিলে রেখে দিল।

—কি সর্বনাশ, এরে পয়সা বলে? হ্যাঁরে, এ কি জিনিস?

মেয়ে দুটি অপ্রতিভমুখে এ ওর দিকে চাইতে লাগল।

—বল্ এ কি জিনিস? পয়সা এর নাম?

—ওরা নির্বাক। একজন সাহস সঞ্চয় ক'রে আমার দিকে বিজ্ঞের দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—মাস্টার মশাই, আমি বলবো?

—বল্ না।

—নোট মাস্টার মশাই।

—নোট! নোট মানে কি?

—তবে সিকি?

—না, এর নাম আধুলি—আট আনা। এক টাকার অর্ধেক।—যা বসগে যা—

পতিরামকে খবর দিয়ে আনিয়ে তার পরদিন সব টাকা তার হাতে দিয়ে দিতে, সে মহা সন্তুষ্ট হয়ে বললে—হতভাগা মেয়েটা আমার বালিশের তলা থেকে টাকার থলি চুরি করেছিল মাস্টার মশায়। গরীবপুরের হাটের পটল বেচার টাকা, উনিশ টাকা সাত আনা। খুঁজে আর পাই নে। পরিবার বলে আমি জানি নে। ভাইপো বলে আমি জানি নে। তবে একমুঠো টাকা নিলে কে? এখন জানা গেল ওই হতভাগা ছুঁড়ি টাকাগুলো সব নিয়ে

চলে এসেছিল—হতভাগা ছুঁড়ির হাড় এক জায়গায় আর মাস এক জায়গায় করবো আজ বাড়ী গিয়ে।

—না বাপু, ও অবোধ মেয়ে। ওর কি সে জ্ঞান আছে। নইলে আধুলিকে কখনো বলে নোট, কখনো বলে সিকি! সে জ্ঞান নেই। মারধোরের দরকার নেই। মুখে শাসন ক'রে দিও—পটল কি রকম হোল এবার?

—তা মাস্টার মশাই মন্দ নয়। হাটরাহাট দু'মণ আড়াইমণ। পাঁচ কুঁড়ো ভুঁই শুধুই পটল করা হয়েছিল এবার।

—একদিন দুটো পটল খাওয়াও তোমার ক্ষেতের। শুনেছি তোমার ক্ষেতের পটল নাকি বড় ভালো—

পতিরাম খুশি হয়ে উৎসাহের সুরে বললে—হাটের সেরা পটল মাস্টারমশাই। ওই নতিডাঙা থেকে বিলের পটলের লত এনেলাম। যেমন পাতলা খোসা, তেমনি মিষ্টি। লতও খুব তেজী, এক এক লতে পাঁচপণ ক'রে উব্ধ সংখ্যে। ভাবুন সে জিনিসটা কি।

—বাঃ বাঃ, চমৎকার ফলন!

—এক একটা লত দশহাত বারোহাত লম্বা। বললি ভাববেন গল্প কথা বলচে, তা নয়, পতিরাম জানে পটলের চাষ কি ক'রে কত্তি হয়। লত পুঁতলিই কি পটল ফলে? ওর কারকিৎ চাই। কাল পাঠিয়ে দেবো দু'সের পটল, খেয়ে দেখবেন আপনি। না, দাম দিতি হবে কেন আপনার। ও কথাই তোলবেন না। ফি হাটে যা পারি পটল আপনি নেবেন, দাম দিতি হবে না।

আমরা এই রকম করেই চালাই সংসার। একথা অস্বীকার করতে চাই নে।

কিন্তু এবার নিরুপমার অসুখ নিয়ে বড় ফেরে পড়ে গেলাম। ওর অসুখ একই রকম চলচে, বাড়েও না কমেও না। রোজ রোজ স্কুল থেকে ফিরে মনটা এমন দমে যায়!

তারপর কি, আমাদের গ্রামে পরস্পরে সহানুভূতি নেই আদৌ। আমার বাড়ী এই যে অসুখ, এই যে নিরুপমা সারাদিন বিছানায় একা পড়ে ছটফট করে (আর কোনো লোক নেই আমার পরিবারে), কেউ উঁকি মেরেও দেখবেন না। আমি যে গরীব, যদি বক্সীদের মত, কিংবা নিতাই হালদারের মত অবস্থা হোত—তবে আমাকে সাহায্য করবার লোকের কিছুমাত্র অভাব ঘটতো না। কিন্তু আমার স্ত্রীর অসুখে কে আসবে? স্কুলে যে ক'ঘণ্টা থাকি, ওর জন্যে মনটা এমন উতলা হয়। এমন একটা গভীর অনুকম্পা হয়, দুঃখ হয় ওর কষ্ট দেখে, নিরু খেতে ভালবাসে কিন্তু খেতে পায় না, পরতে ভালবাসে কিন্তু একখানা পারিজাত শাড়ী (তাও ছ'বছরের পুরানো) ছাড়া আর কোন ভাল কাপড় নেই ওর—কোন সাধ মেটাতে পারি নি আমি।

আমায় কতদিন থেকে বলচে—আমায় একটা ব্লাউজ কিনে দেবে? আমার মোটে নেই—

সেদিন, আজ মাস দুইয়ের কথা, একদিন বললে—হ্যাঁগো, শোনো, একটা সাধ—একখানা ভালো শাড়ী পরি।

—কি শাড়ী?

—রঙিন শাড়ী। ওদের বাড়ী একটি বৌ, রাণাঘাটে বাড়ী; প'রে এসেছিল—ওই রকম একটা—

বলেই সে লজ্জা সঙ্কোচের হাসি হাসে। জানে সেও যে, হবে না কোনো দিনই যুদ্ধের বাজারে বিশ-ত্রিশ টাকা দামের রঙীন শাড়ী কেনা, তবুও বলে। আমার সোজাসুজি বলতে বাধে, কষ্টও হয় যে দিতে পারবো না—সুতরাং বলি—দেবো, ঠিক দেবো—

—সবুজ শাড়ী, শিউলি পাতার রং, বুঝলে?

—কার কাছে দেখলে?

—ওই রাণাঘাটের পিসিমা এসেচেন ও বাড়ীতে। তাঁর ছেলের বৌ।

—বেশ।

—দেবে তো?

—কেন দেবো না?

নিরুপমা বুঝেও অবুঝের মত অনেক সময়ে বলে ছেলেমানুষের মত (বয়েসও অবিশ্যি এই পঁচিশ), তাতে আমার বড় মায়া হয়। ভাবি, কখনো যদি হাতে একসঙ্গে কুড়িটা টাকাও পাই, তবে নিরুর রঙীন শাড়ী আগে দেবো এনে।

সে-বার বড্ড আশা হয়েছিল যে এবার বোধ হয় নিরুর কাপড় একখানা দিতি পারবো। দিগম্বর নন্দী এসে বললে—পণ্ডিত মশাই, একটা ছেলের হাত দেখে দেবেন?

—ঠিকুজি কুষ্ঠি না শুধু হাত?

—ঠিকুজি কুষ্ঠি ক'রে দিতি পারবেন?

—বলে ওই করতে করতে চুল পাকবো পাকবো হোল। হয় না হয় তোমাদের পাড়ার পঞ্চানন বিশ্বাসকে জিগ্যেস—

—জিগ্যেস আর কত্তি হবে না পণ্ডিত মশাই। কত লাগবে তাই শুনি।

—কুড়ি টাকার কমে হবে না। ছেলেটা কে?

—আমার বড় সম্বন্ধীর ছেলে। আমার ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন হবে সামনের বুধ-বারে। তাতে ওরা সব আসচে কিনা—?

—তুমি তোমার ছোট ছেলের একখানা ঠিকুজি এই সময় তৈরী ক'রে নাও না কেন? এই সময় করাই ভালো। সস্তায় ক'রে দেবো। পাঁচটা টাকা দিও।

দিগম্বর নন্দী বড় চাষী গৃহস্থ। সে রাজি হয়েই চলে গেল, মনে মনে ভাবলাম নিরুর রঙিন শাড়ী এবার হয়েই গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর সম্বন্ধীর সে ছেলে এলোই না। দিগম্বরের ছেলের ঠিকুজি তৈরী ক'রে পাঁচটা টাকা পেয়েছিলাম অবিশ্যি।

রহমান ডাক্তার এ অঞ্চলের মধ্যে পসারওয়ালা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। ফী নেয় এক টাকা ক'রে। নিরুর অসুখ কিছুতেই যখন সারে না, তখন তাকে ডাকলাম। রহমান ডাক্তার ঘোড়ায় চড়ে রোগী দেখে। আমার উঠোনে নেমে বললে—মাস্টার মশাই আছেন?

আমি সসম্ভ্রমে এগিয়ে নিয়ে এলাম।

—কি অসুখ? কার? মা ঠাকরুণের?

—হ্যাঁ, আসুন। দেখুন দিকি ভাল ক'রে।

—আপনার সংসারে আর লোক নেই?

—না, তাতেই তো—

—তাই তো। কতদিন অসুখ?

—হোল আজ দু'হপ্তা।

রহমান ডাক্তার দেখে-শুনে চব্বিশ রকমের খুঁটিনাটি প্রশ্ন ক'রে ওষুধ দিয়ে গেল। ভালো লোক, ভিজিটের টাকা নিতে চাইলে না আমার কাছে। বললে—ও কি? টাকা? না থাক থাক—আপনি দেবেন না—

—না নিতে হবে।

—তা কখনো হয়? আমার ছেলেটা পড়ে আপনার স্কুলে। আপনি তার মাস্টার মশায়। টাকা দেওয়া নেওয়ার সম্বন্ধ নয় এখানে! তার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন দয়া ক'রে। ওষুধটা আনিয়ে নিন আমার ডাক্তারখানা থেকে। বেদানার রস খেতে দেবেন। গ্লুকোজ আনিয়ে নিন একটা।

স্কুল থেকে টাকা হাওলাত নিলাম পাঁচটা। ওষুধ জিনিসপত্র সব আনাই বাজার থেকে।

নিরু নাকিসুরে বলে—আঁমি বাঁর্লি খাঁবো নাঁ—

—খাও লক্ষ্মীটি। খেতে হয়—

—আঁমি ও' খে'তে পাঁরি নে—

—না খেলে কি জ্বর ছাড়ে? খেয়ে নাও—

—আঁমাকে সন্দেশ কি'নে দে'বে? সন্দেশ খাঁবো—

—সেরে ওঠো। দেবো বই কি? নিশ্চয় দেবো—

—দে'বে ঠি'ক?

—দেবো, ঠিক দেবো।

সব জিনিসই ওকে বলি দেবো দেবো। না পারি ভাল একখানা শাড়ী দিতে, না পারি

ব্লাউজ দিতে। না কখনো পারি কিছু ভালো খাওয়াতে। মনে পড়লো একবার পাশের বাড়ীর সনাতন রায় খাসি কেটে ভাগ দিচ্ছিলেন, আড়াই টাকা সের। ওদের বাড়ীর বড় খাসিটা, চব্বিশ সের মাংস হয়েছিল। নিরু বললে—হ্যাঁগা, মাংস নেবে? বটঠাকুরদের বাড়ী দিচ্ছে। কদ্দিন মাংস খাই নি—নিয়ে এসো না একটু। একপোয়া নিয়ে এসো গিয়ে। বেশি দামের মাংস ওর বেশি আর নিতে পারবো না। দুজনে ওই খাবো এখন—তুমি নিয়ে এসো—আমি বাটনা বেটে রাখি—

কিন্তু ওরা একপোয়া মাংসের খদ্দের শুনে নাক সেঁটকালে। অন্ততঃ এক সের নিতেই হবে। অত বড় খাসি একপোয়া আধপোয়া ক'রে ভাগ করতে হলে চলে না। দেড় সের দু'সের মাংসের খদ্দেররা সব কচুর পাতা কলার পাতা হাতে ক'রে বসে আছে।

সেবার নিরুকে এসে বলেছিলাম—তুমি ভেবো না; ইস্কুলের ওদিক থেকে মাংসের ভাগ যদি পাই, একদিন নিয়ে আসবো—

—আনবে তো?

—ঠিক আনবো। এই মাসের মধ্যিই—

সে আজ ছ'মাস হয়ে গেল। মাংস আনাও হয় নি, ওকে খাওয়ানোও হয় নি।

রাত্রে নিরুপমা জ্বরের ঘোরে ভুল বকে যখন, তখন কেবল এই কথাই মনে হয়, ও একদিন মাংস খেতে চেয়েছিল, ওকে খাওয়ানো হয় নি, ও কতদিন একখানা রঙীন শাড়ী চেয়েছিল, ওকে কিনে দেওয়া হয়নি। যদি ও না বাঁচে? তবে ওর এই সব কথা কোথায় লেখা থাকবে?

রাত্রে কেউ থাকে না বাড়ীতে। আমি নিরুর বিছানার পাশে একা বসে আছি। রাত্রে অনেক সময় মানুষ চিনতে পারে না। ভয়ে ভয়ে আমার দিকে চেয়ে চোখ বড় বড় ক'রে বলে—'কে? বসে কে? কে গো ওখানে?' আমি ওকে পাখার হাওয়া দিই, মাথায় জলপটি লাগাই। গ্লুকোজের জল খাওয়াই। বসে বসে ভাবি, কাল জগন্নাথ বক্সিদের বাড়ী গিয়ে জানাব আমার দুঃখু। রাত্রে একা থাকতে পারি নে রুগী নিয়ে। কোনও একটা সাহস পাই নে। তার ওপর মন হু হু করে, যেন কান্না আসে। অনেক রাত্রে একটু ঢুলুনি এসেচে, কখন ঘুমিয়ে পড়েচি জানি না। ঘুম ভাঙলো কি একটা শব্দ শুনে। ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে দেখি নিরুপমা বিছানায় নেই। ঘরের দোর খোলা। ছুটে রোয়াকে গিয়ে দেখি নিরু টলতে টলতে রোয়াক পার হয়ে পৈঠেতে নামতে যাচ্চে। আমি খপ ক'রে ওর হাত ধরে বললাম—এসো এসো—যাচ্চ কোথায়?

নিরুপমা চীৎকার ক'রে গান জুড়ে দিল—

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠোসে
তোমার শাওড়ী বলে দিয়েচে বেগুন
কোটোসে—

আমি বললাম—ও নিরু, ছিঃ ওরকম চেঁচিও না। চেঁচাতে নেই, ঘরের মধ্যে এসো—

নিরু ধপ ক'রে রোয়াকের ওপর বসে পড়লো। জ্ঞানকাণ্ড নেই, এলোমেলো অবস্থা কাপড়-চোপড়ের। আমি অনেক ক'রে বুঝিয়ে ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে শুইয়ে দিলাম। এমন দুঃখু হোলো মনে, গরীব বলে কি কেউ এতবড় বিপদে অমনি দেখে না?

কাল বক্সিদের বাড়ী গিয়ে সব খুলে বলবো। দেখি যদি ওদের দয়া হয়।

রাত্রি কোন রকমে কাটলো। খানিক পরে পূর্বদিকে ফরসা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বক্সিদের বাড়ী গিয়ে বিপদ জানিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করার মতলব আমার কোথায় মিলিয়ে গেল। সঙ্কোচ হয় বলতে, ও আমি পারবো না। মাথার ওপর ভগবান আছেন, আমাদের মত গরীবের তিনিই অবলম্বন।

রহমান ডাক্তার সকালে এলে আমি রাত্রের ঘটনা বললাম।

ডাক্তার বললে—হাই ফিভার হয়েছিল—তাই অমন করছিলেন। মাথায় জল দিলেন না কেন? রাত্রে খুব সাবধানে থাকবেন। আর নার্সিং যেন ভাল হয়—উঠে হেঁটে বেড়াতে দেবেন না। বেডপ্যান একটা পাঠিয়ে দেবো এখন আমার কম্পাউন্ডারের হাতে।

একাই ওষুধ দিই, একাই বাতাস করি, একাই বেডপ্যান ধরি।

আহা, মিথ্যে কথা বলবো না। পরদিন ঘাটে নাইতে গিয়ে মুখুয্যে পাড়ার ঘাটের পাড়ের উঁচু জঙ্গলে ওল তুলচি শাবল দিয়ে, জীবন মুখুয্যের বড় মেয়ে আশালতা বললে—কে, কাকাবাবু?

—হ্যাঁ মা। ওল তুলচি একটা। পাতা বেশ হলদে হয়ে এসেচে, বড় ওলটা।

—কাকীমার অসুখ নাকি কাকাবাবু?

—হ্যাঁ মা, বড্ড কষ্ট হচ্চে।

—দেখাশুনা করচে কে?

—আমি। আর কে করবে?

আশা বললে—আহাহা, একা আপনি? রাত্রেও? আপনার তো বড্ড কষ্ট হচ্চে, মেয়েমানুষের অসুখের নার্সিং কি পুরুষ দিয়ে হয়? আমায় যে যেতে দেবে না কাকাবাবু। গেলে পাঁচটা কথা ওঠাবে। গাঁ যে কি রকম তা তো জানেন? নইলে আমি রাত্রে আপনাদের বাড়ী যেতাম কাকাবাবু—জাগতাম সারারাত—

—না মা, বেঁচে থাকো। ভাল হোক। যেতে হবে না, মুখে বললে এই যথেষ্ট মা। ভাল হোক তোমার, ভাল হোক।

ওল তুলে জলে নামতে নামতে বললাম। আশালতা সিক্ত-বস্ত্রে দাঁড়িয়ে আছে ঘাটের পাড়ে। ইচ্ছা ওর, আরো কিছু বলে। আমি বললাম—মা, তুমি যাও—

—কাকাবাবু, দিনমানে কাকীমার কাছে কে থাকে?

—কেউ না মা। তবে দিনমানে সে ভালো থাকে এক রকম। জ্বরের বাড় রাত্তিরে—

সেই দিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি আশা নিরুপমার বিছানায় বসে বাতাস করচে ওকে। বড় ভাল লেগেছিল আমার। বড় লোক না হলেও এর বাবা জীবন মুখুয্যে গ্রামের অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। তার মেয়ে এসেচে আমার মত দরিদ্র স্কুলমাস্টারের স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে। বেশ লাগলো। তারপর আশা আমায় চা ক'রে দিলে নিজে রান্নাঘরে গিয়ে।

—খাবার কিছু নেই কাকাবাবু?

—খাবার? আমি তো কিছু খাই নে মা এসময়—

—দাঁড়ান, আসচি—

বলেই ও চলে গেল এবং একটু পরেই একবাটি মুড়ি ও আধখানা কাটা-শসার ফালি আঁচলে ঢেকে নিয়ে এসে বাড়ী ঢুকলো।

—খান কাকাবাবু।

—এ মা তোমার অন্যায় ব্যাপার—

—কিচ্ছু অন্যায় না। জল খান আপনি।

—ভালো হোক মা, তোমার ভাল হোক। তুমি চলে যাও এখন মা, আমি এসেচি, আমি দেখাশুনো করবো এখন।

গাঁ ভালো না। কে কি বলবে, সোমত্ত মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে আশা। তারপর আর ও আসেও নি। বোধ হয় আর ওকে আসতে দেয় নি ওর বাড়ীর লোকে।

নিরুপমা সেরে উঠলো দিন দশেক পরে। ওকে ভাত রেঁধে খাইয়ে তবে ইস্কুলে যাই। আর এত লোভ বেড়ে গিয়েচে ওর। সারাদিন কেবল এটা খাবো, ওটা খাবো করে। অধিকাংশই কুপথ্য। কুপথ্যের মধ্যে দু-একটা যার নাম করে, তা কিনে দেওয়া আমার ক্ষমতার অতীত। আটা ময়দা কিছু নেই। মহকুমার সাপ্লাই অফিসারের কাছে একদিন গেলাম—নইলে ওকে কি খেতে দেবো রাত্রে। নিবারণ ময়রার দোকানে গেলুম কিছু খাবার কিনতে। এ অঞ্চলের ওস্তাদ কারিগর নিবারণ। রসগোল্লা, পানতুয়া, বরফি, সন্দেশ, জিলিপি যা তৈরী করে! আমি শহরে আসবো শুনে নিরুপমা বলে দিয়েচে চুপিচুপি—খাবার এনো, বুঝলে? খাবার আনবে ভাল দেখে।

কি খাবার খেতে ইচ্ছে হয়?

আহা, মিথ্যে কথা বলবো না। পরদিন ঘাটে নাইতে গিয়ে মুখুয্যে পাড়ার ঘাটের পাড়ের উঁচু জঙ্গলে ওল তুলচি শাবল দিয়ে, জীবন মুখুয্যের বড় মেয়ে আশালতা বললে—কে, কাকাবাবু?

—হ্যাঁ মা। ওল তুলচি একটা। পাতা বেশ হলদে হয়ে এসেচে, বড় ওলটা।

—কাকীমার অসুখ নাকি কাকাবাবু?

—হ্যাঁ মা, বড্ড কষ্ট হচ্চে।

—দেখাশুনা করচে কে?

—আমি। আর কে করবে?

আশা বললে—আহাহা, একা আপনি? রাত্রেও? আপনার তো বড্ড কষ্ট হচ্চে, মেয়েমানুষের অসুখের নার্সিং কি পুরুষ দিয়ে হয়? আমায় যে যেতে দেবে না কাকাবাবু। গেলে পাঁচটা কথা ওঠাবে। গাঁ যে কি রকম তা তো জানেন? নইলে আমি রাত্রে আপনাদের বাড়ী যেতাম কাকাবাবু—জাগতাম সারারাত—

—না মা, বেঁচে থাকো। ভাল হোক। যেতে হবে না, মুখে বললে এই যথেষ্ট মা। ভাল হোক তোমার, ভাল হোক।

ওল তুলে জলে নামতে নামতে বললাম। আশালতা সিক্ত-বস্ত্রে দাঁড়িয়ে আছে ঘাটের পাড়ে। ইচ্ছা ওর, আরো কিছু বলে। আমি বললাম—মা, তুমি যাও—

—কাকাবাবু, দিনমানে কাকীমার কাছে কে থাকে?

—কেউ না মা। তবে দিনমানে সে ভালো থাকে এক রকম। জ্বরের বাড় রাত্তিরে—

সেই দিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি আশা নিরুপমার বিছানায় বসে বাতাস করচে ওকে। বড় ভাল লেগেছিল আমার। বড় লোক না হলেও এর বাবা জীবন মুখুয্যে গ্রামের অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। তার মেয়ে এসেচে আমার মত দরিদ্র স্কুলমাস্টারের স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে। বেশ লাগলো। তারপর আশা আমায় চা ক'রে দিলে নিজে রান্নাঘরে গিয়ে।

—খাবার কিছু নেই কাকাবাবু?

—খাবার? আমি তো কিছু খাই নে মা এসময়—

—দাঁড়ান, আসচি—

বলেই ও চলে গেল এবং একটু পরেই একবাটি মুড়ি ও আধখানা কাটা-শসার ফালি আঁচলে ঢেকে নিয়ে এসে বাড়ী ঢুকলো।

—খান কাকাবাবু।

—এ মা তোমার অনেয্য ব্যাপার—

—কিচ্ছু অনেয্য না। জল খান আপনি।

—ভালো হোক মা, তোমার ভাল হোক। তুমি চলে যাও এখন মা, আমি এসেচি, আমি দেখাশুনো করবো এখন।

গাঁ ভালো না। কে কি বলবে, সোমত্ত মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে আশা। তারপর আর ও আসেও নি। বোধ হয় আর ওকে আসতে দেয় নি ওর বাড়ীর লোকে।

নিরুপমা সেরে উঠলো দিন দশেক পরে। ওকে ভাত রেঁধে খাইয়ে তবে ইস্কুলে যাই। আর এত লোভ বেড়ে গিয়েচে ওর। সারাদিন কেবল এটা খাবো, ওটা খাবো করে। অধিকাংশই কুপথ্য। কুপথ্যের মধ্যে দু-একটা যার নাম করে, তা কিনে দেওয়া আমার ক্ষমতার অতীত। আটা ময়দা কিছু নেই। মহকুমার সাপ্লাই অফিসারের কাছে একদিন গেলাম—নইলে ওকে কি খেতে দেবো রাত্রে। নিবারণ ময়রার দোকানে গেলুম কিছু খাবার কিনতে। এ অঞ্চলের ওস্তাদ কারিগর নিবারণ। রসগোল্লা, পানতুয়া, বরফি, সন্দেশ, জিলিপি যা তৈরী করে! আমি শহরে আসবো শুনে নিরুপমা বলে দিয়েচে চুপিচুপি—খাবার এনো, বুঝলে? খাবার আনবে ভাল দেখে।

—কি খাবার খেতে ইচ্ছে হয়?

—যা তুমি ভাল বোঝো।

আমি সাজানো খাবারের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। দেখলাম বড় কড়া থেকে নিবারণ ভাল সন্দেশ গড়ছে। নিবারণের বিখ্যাত জোড়া সন্দেশ। বড্ড ইচ্ছে হোল নিরুপমার জন্যে জোড়া সন্দেশ নিয়ে যেতে। ও কখনো খায় নি। সে কি খুশিই হবে জোড়া সন্দেশ কিনে নিয়ে গেলে।

পকেট খুঁজে দেখলাম। হাতে চার আনা মাত্র পয়সা অবশিষ্ট আছে খাবার কিনবার। তাতে মোটে হবে একখানা জোড়া সন্দেশ—আর বাকি থাকবে এক আনা।

দু-তিনবার খেয়েছিলাম। কি সুন্দর জোড়া সন্দেশগুলো!

নিরুপমার হাতে যদি দিতে পারতাম!

কিন্তু একখানা সন্দেশ নিয়ে যাওয়ার চাইতে এক পোয়া কুঁচো গজা নিয়ে যাওয়া ভালো। অনেকগুলো পাওয়া যাবে। মনের সাধ মনেই চেপে বললাম—কুঁচো গজা আছে? কত ক'রে সের? দাও তিন ছটাক—বেশ টাটকা?

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরতেই নিরুপমা জিজ্ঞেস করলে—খাবার এনেচ? কি দেখি?

আমি হাসিমুখে পুঁটুলিটি দেখিয়ে এমন ভাবে কথা বলি, যেন অনেকখানি গুপ্ত রহস্যের ভান্ডার এই পুঁটুলির মধ্যে সঞ্চিত।

নিরুপমা কৌতূহলের সঙ্গে বলে—ওর কি নাম?

নিবারণ ময়রার কুঁচো গজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়লাম আমি। এমন দেখি নি, এ জেলায় আর হয় না। বিখ্যাত কুঁচো গজা। নিবারণের কুঁচো গজা কলকাতা পর্যন্ত যায়। বড় বড় লোকে কিনে নিয়ে যাচ্চে। তবে বড্ড দাম। পাওয়াই যায় না। যেমন কড়া থেকে নামে, অমনি কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। অতি কষ্টে আধপোয়া সংগ্রহ ক'রে এনেচি। খেয়ে দেখো।

নিরুপমা বলে—না। তুমি আগে দু'খানা খাও—আরও দু'খানা নাও না?

তারপর মহাখুশির সঙ্গে খেতে খেতে বলে—বাঃ সত্যি! কি চমৎকার জিনিস!... না?...

উল্টোরথ

আমার ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামে নতুন একঘর লোক এসে বাস করলো। আমি সে-বার মামার বাড়ী গিয়েছিলাম ছ'সাত মাসের জন্যে। এসে দেখি রামেশ্বর চক্রবর্তীদের ভিটের পশ্চিম-পাড়ে যে নিবিড় জঙ্গল ছিল, তা কারা কেটে ফেলে সেখানে দু'তিনখানা টিনের ঘর তুলেছে। কাতুকে জিজ্ঞেস করলাম—এ কি রে? আমাদের সেই নোনা গাছ?

কাতু ঠোঁট উল্টে বললে—সে হয়ে গিয়েছে—

—হয়ে গিয়েছে মানে?

—এখানে যে নতুন লোক এসে ঘর বেঁধেছে। মামার বাড়ী ছিলে, দেশের খবরই বা কি রাখো?

—কে রে?

—অনেক দূরে কোথায় থাকতো, সেখান থেকে উঠে এসেছে।

—ব্রাহ্মণ?

—হ্যাঁ। নাম সত্য চক্রবর্তী।

—চল গিয়ে দেখে আসি—ছেলেপিলে আছে আমাদের বয়সী?

—দু'জন আছে। ভাব হয়ে গিয়েছে আমাদের সঙ্গে। নিন্তু আর পটল। ভারি ফরসা দেখতে, আর হিন্দি মিন্দি বলে।

আমি মজা দেখতে নতুন বাড়ীর উঠোনে ঢুকলাম। আমার বড় দুঃখ হচ্ছিল, অমন নোনা গাছটা, যাতে নোনা পেকে গাছ আলো করতো, যা একটা খেলে প্রাণ ঠান্ডা হয়ে যেতো, সেই অমন নোনা গাছটা এরা কেটে ফেলে কি কান্ড করেছে দেখো দিকিনি!

বাড়ীতে ঢুকতেই দেখি খুব ফরসা একটা দাড়িওয়ালা লোক পশ্চিমদিকের ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছেন। কাতু বললে—দাঁড়া। ওই সত্য চক্কত্তি। বড্ড রাগী লোক।

—বক্‌বে?

—বকে, বাড়ী ঢুকতে দেয় না।

সাহস ক'রে আর একটু এগিয়ে যেতেই সত্য চক্কত্তি আমাকে দেখতে পেয়ে বললে—কে?

আমি সাহস সঞ্চয় ক'রে বললাম—আমি।

—আমিটা কে?

—আমার নাম তোতন্। এই গাঁয়ে বাড়ী।

—ব্রাহ্মণ? —

—হ্যাঁ।

—বাপের নাম কি?

—শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়।

—ও, অনাদি দাদার ছেলে তুমি। কবে এলে? এখানে তো তোমরা ছিলে না?

—কাল এসেছি।

—বেশ। এখন যাও, বাড়ীতে ছেলেরা কেউ নেই। সব পাঠশালায় গিয়েছে পড়তে। তোমরা পড়াশুনো কর না বুঝি? এ-গাঁয়ে ছেলেরা সব খেলেই বেড়ায়।

আমার রাগ হলো। আমি পড়ি নে, উনি কি ক'রে জানলেন? যাক বাবা, যাবো না ওদের বাড়ী। ওদের বাড়ী না গেলে কি ভাত হজম হবে না?

এইভাবে প্রথম সত্য চক্কত্তিদের সঙ্গে আলাপ হোল। সত্য চক্কত্তির দুই ছেলে নিন্তু আর পটলের সঙ্গে কী ভাবই হয়ে গেল আমাদের। বেশ ছেলে ওরা, দেখতেও যেমন, লেখাপড়াতেও তেমনি। আমরা এক সঙ্গেই পাঠশালায় আর স্কুলে পড়তাম। ওদের বাড়ীতে সর্বদা যাতায়াত করি। কিন্তু সুখ ছিল না ওদের বাবা সত্য চক্কত্তির জন্য।

কি মারই ছেলেদের দিত লোকটা! সারা বাল্যকাল নিন্তুদা আর পটলের প্রাণে সুখ ছিল না, মনে সুখ ছিল না। কি কড়া শাসনের ওপরই সর্বদা রাখতো বাবা ওদের। পান থেকে চুন খসেছে কি দুড়দাড় মার। সে-বার আমি, নিন্তু আর পটল খেলা করছি, এমন সময় কি নিয়ে নিন্তুদার সঙ্গে পটলের ঝগড়া বাধলো। নিন্তুদা বললে—তুই আমার বড় পেন্সিলটা নিলি তখন, ফেরত দে—

পটল বললে—তুমি আমার খাতা ছিঁড়ে দিয়েছ দাদা, পেন্‌সিল দেবো না—

—আলবৎ দিবি।

—কখনো দেবো না—

—এই নে, এই নে—বাঁদর কোথাকার, বলেই নিন্তু বসিয়ে দিলে—দুই চড়।

—তুমিও এই নাও—এই নাও, বলে পটলও কষিয়ে দিলে—আর দুই চড়।

এমন সময়ে ওদের বাবা সত্য চক্কত্তি অগ্নিমূর্তিতে ঘরে ঢুকে বললেন—কি হচ্ছে? কি হচ্ছে? এই রকম ক'রে পড়া হচ্ছে বুঝি? শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ বাধিয়েচ দেখছি? বলেই দু'জনকে সে কি দুড়দাড়িয়ে মার। গরুকেও মানুষ অমন মার মারে না। নিন্তুদা তো মার খেয়ে উঠোনে এসে ছিটকে পড়লো, পটল কোণে গিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়ালো কাঁপতে কাঁপতে। আমি স'রে পড়লাম বেগতিক বুঝে। এই রকম দেখে এসেছি সারা বাল্যকাল। নিন্তুদা আর পটল বাপের ভয়ে জুজু। কোন জায়গায় ইচ্ছামত খেলতে যাওয়ার জো নেই।

নিন্তুদার বিয়ে হলো অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে। ওদের সকলের ছোটভাই পিণ্টুর বয়স এই সময় বছর চারেক। আমি আই-এ পড়ি কলকাতায়। বিয়ের চিঠি পেয়ে বাড়ী এলাম। নিন্তুদার বিয়ে, আমোদ আহ্লাদ করা যাবে। নিন্তুদা ডাক্তারি পড়ে, ভালো ছেলে কলেজের।

পটল গিয়ে ওর বাবাকে বললে—বাবা, দাদা বলছে পকেট-ঘড়ি নেবে না।

সত্য চক্কোত্তি বিস্ময়ের স্বরে বললেন—অ্যাঁ? কি?

—বলছে পকেট-ঘড়ি নেবে না। আজকাল রিস্ট-ওয়াচের রেওয়াজ হয়েছে, পকেট-ঘড়ি কেউ পরে না—তাই বলছিল—

—পরে না? কোথায় গেল সে হারামজাদা, ডাকো ইদিকে—

নিন্তু তো শঙ্কুচিত ভাবে সামনে এসে দাঁড়ালো! মুখ চুন হয়ে গিয়েছে ভয়ে।

সত্য চক্কোত্তি বললেন—তুমি পকেট-ঘড়ি নেবে না? বড্ড তালেবর হয়েছ বুঝি? বাপের কথার উপর কথা? বজ্জাত পাজি, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব, জানো? যাও, তোমার বিয়ে করতে হবে না। তুমি কালই কলকাতায় চলে যাও—

সেদিন বাড়ীতে লোকজনের ভিড়, শাঁখ বাজছে, নান্দীমুখের চাল কোটা হচ্ছে। চেঁচামেচি শুনে ওদের মা বার হয়ে এলেন। এসে ছেলের পক্ষ হয়ে স্বামীকে দু'কথা শোনালেন।

—তোমার না হয় তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে—কিন্তু দুধের ছেলে, ওর অত হিসেবজ্ঞান এখনো হয় নি তোমার মত। আজকের দিনে বাছাকে কোনো কথা বলতে পারবে না বলে দিচ্ছি—

—অত বড় কথা বলতে ওর সাহস হয়? আজকাল কালে কালে সব হচ্ছে কি?

—অত তোমাকে দেখতে হবে না। যাও, বাইরে গিয়ে বসো খানিকক্ষণ।

নিন্তুদা সেযাত্রা রেহাই পেল।

আমাকে বিয়ের পর নিন্তুদা দুঃখু ক'রে বলেছিল—দেখলি তো ভাই বাবার রাগ। একটা হাতঘড়ির কথা বলতে গেলাম, তা বাবা—

আমি বললাম—বাদ দে। গুরুজনদের কথায় দুঃখু করতে নেই।

—বাবা বোঝেন না। একটা হাতঘড়ি থাকলে আমাকে কেমন মানাতো?

—এর পর কিনে পরিস্। নে এখন।

দিন চলে যেতে লাগলো। দেখতে দেখতে বিশ বছর কেটে গেল। পঁচিশ বছর কেটে গেল। তখনকার বালক এখন যৌবনের সীমা পার হতে চলেছে।

দেশে এসেছি অনেক দিন পরে। অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে দেশের। যেখানে আগে কোঠা-বাড়ী দেখেছি এখন সেখানে ভাঙা ইঁটের স্তূপ আর জঙ্গল। বাড়ীর লোক মরে-হেজে গিয়েছে, যারা বেঁচে আছে, তারা বিদেশে চাকরি করে। দেশে যাতায়াত নেই। আগে যাদের হীন অবস্থা দেখেছি, এখন তারা অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে, বাড়ীতে তাদের গোলাপালা, গরুবাছুর। ভাতের অভাব নেই বাড়ীতে। এই রকম এক গৃহস্থের বাড়ীতে সকালবেলা বেড়াতে গেলাম।

এ বাড়ীর কর্তাকে ছেলেবেলায় আমি দেখেছি। নাম ছিল মাধব পণ্ডিত। এরা গোয়ালার বামুন, অর্থাৎ গোয়ালাদের বাড়ী দশকর্ম ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন ক'রে অতি কষ্টে পরিবারের অন্নের গ্রাস সংগ্রহ করতেন পণ্ডিত মশায়। এদের একখানা চালাঘর দেখেছি ছেলেবেলায়, তখন মাধব পণ্ডিতের বড় ছেলে জয়কেষ্ট (আমার বয়েসী) খিদের জ্বালায় সকালবেলায় পাকা বীচে-শসা খেতো মায়ের কাছ থেকে চেয়ে, কুট্‌নোর থালা থেকে তুলে নিয়ে। পণ্ডিত মশাই কোঁচড়ে ক'রে চাল আনতেন প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে ধার ক'রে, তবে হাঁড়ি চড়তো। মাধব পণ্ডিত কুলের অম্বল বড় ভালবাসতেন। একদিন আমার বেশ মনে আছে, জয়কেষ্ট আর তার বোন নন্দি দু'জনে এক কোঁচড় কুল পেড়ে নিয়ে এল মাঠ থেকে। ওরা পা বিছিয়ে কুল খেতে বসলো রান্নাঘরের দাওয়ায়, কারণ ওদের সদাই খিদে। আমি মুখ ফুটে চাইলাম, আমার হাতে জয়কেষ্ট গোনা একটা কুল দিলে। নন্দি বললে—ও কি দাদা, একটা দিতে নেই, আর একটা দে?

—তোর ভাগ থেকে দে না—

নন্দি আমাকে এক মুঠো কুল দিলে। আজও তার সেই দরাজ হাতের কথা আমার মনে পড়ে বেশ।

এমন সময়ে মাধব পণ্ডিত কোথা থেকে এসে ছেলেমেয়েদের কোঁচড়ে কুল দেখে বলে উঠলেন—বেশ, বেশ। কুল কোথায় পেলি? আর খাস নে, রেখে দে। কুলের অম্বল হবে।

জয়কেষ্ট বললে—না বাবা, আমরা খাবো—

নন্দি বললে—চুপ কর দাদা। বাবা কুলের অম্বল ভালবাসে, তুমি জানো না? না বাবা, আমরা আর কুল খাব না। মাকে দিয়ে আসছি অম্বল করতে। কিন্তু গুড় নেই, বলো, অম্বল হবে কি দিয়ে?

মাধব পণ্ডিত মুখ চুন ক'রে বললেন—ও, গুড় নেই! তবে আর কি হবে?

আমি তখনি উঠলাম। আমাদের বাড়ী অনেক গুড়-পাটালি আছে, কারণ আমাদের উনিশটা খেজুর গাছ কাটা হয় প্রতি বছর। মাকে গিয়ে বলতেই মা খানিকটা পাটালি দিলেন। আমি নন্দিদের বাড়ী এসে সেই পাটালি নন্দির মা'র হাতে দিয়ে বললাম—পণ্ডিত কাকাকে কুলের অম্বল ক'রে দিও কাকীমা।

আর আজ তাদের পরিবর্তন দেখে অবাক হতে হবে।

জয়কেষ্ট পাটের ব্যবসা ক'রে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। একতলা কোঠা বাড়ী, টিউব কল, শান বাঁধানো উঠান, গোয়ালে আট-দশটা ভালো ভালো গাই গরু, ধানের গোলা—আমি দেখে অবাক। জয়কেষ্ট এখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, চিনি, কাপড় দেওয়ার কমিটির সেক্রেটারি, শিক্ষা-কর আদায় করবার কর্তা। লোকে মানে, চেনে, ভয় করে। না করলে উপায় নেই, তোমার শিক্ষাকর বাড়লো, চিনির বরাদ্দ কমলো, কাপড় দু'তিন চালান পাওয়া গেল না। জয়কেষ্টকে এখন গ্রামের লোক বলে বড়বাবু। মাধব পণ্ডিত অনেকদিন মারা গিয়েছেন শুনলাম। সংসারের সুখভোগ তাঁর অদৃষ্টে ছিল না। কিন্তু সকলের চেয়ে পরিবর্তন হয়েছে নিন্তুদা'দের বাড়ীতে।

জয়কেষ্ট চা খাওয়াতে খাওয়াতে আমাকে সব বললে।

নিন্তুদা এখানে থাকে না, শহরে কোথায় চাকরি করে। ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানেই থাকে। পটল এখন রেলে কাজ করে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে লালমণির হাটে রেলের বাসায়। বাড়ীতে আছেন শুধু সত্য চক্কত্তি, আর ছোট ছেলে পিণ্টু। এখন অবিশ্যি তার বয়স ত্রিশ বছরের ওপর।

আমি বললাম—পিণ্টু চাকরি করে না?

—চাকরি করবে কি, ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বাড়ীতে থাকে আর পাগলামি করে।

—সত্য চক্কত্তি কিছু বলেন না?

—সত্য চক্কত্তি আর সে সত্য চক্কত্তি নেই। এখন তিনি ছেলের ভয়ে জুজু। তাঁকে পর্যন্ত এক একদিন মারতে যায়।

আমি অবাক হয়ে বললাম—সে কি? সত্য কাকাকে?

—হ্যাঁ। জিনিসপত্র ফেলে ভেঙে চুরমার করে। চাল ডাল ঘরে চাবি দিয়ে রেখে দেয়। ওই দেখো না আমার বাড়ীতে ওই কালই বস্তাবন্দী ক'রে রেখে গিয়েছেন. ও'র ঘরে রাখলে পিণ্টু বিক্রি ক'রে ফেলবে, নয়তো নষ্ট ক'রে ফেলবে।

—কেউ কিছু বলে না?

—কে বলবে? পাগলকে কে রাগাতে যাবে? গিয়ে দেখ সেখানে. তাহলেই বুঝতে পারবে?

কিছুক্ষণ পরে গেলাম সত্য চক্কত্তি মশায়ের বাড়ী। তিনি দেখি চুপচাপ বসে তামাক টানছেন। কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পরে চারিদিকে সন্ত্রস্তভাবে তাকিয়ে দেখে বললেন—আর বাবা, আমার থাকা না থাকা। আমার যে কি কষ্ট বাবা। পিণ্টু আমাকে কোনো জিনিস খেতে দেয় না...চালডাল দেখো ওই ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছে...আমার কোন জিনিসে হাত দেবার জো নেই...আর...

হঠাৎ সত্যকাকা চুপ ক'রে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিণ্টু কোথা থেকে এসে বলে উঠলো—কি বলা হচ্ছে আমার নামে? কি বলা হচ্ছে বুড়োর? আমি খেতে দিই নে? আমি চালডাল চাবি দিয়ে রাখি? রাখিই তো! নইলে তুমি বিক্রি ক'রে মেরে দাও। তোমাকে

আর আমি জানি নে, বুড়ো ঘুঘু?

আমি বলে উঠলাম—ছি ছি, এসব কি হচ্ছে পিণ্টু? উনি তোমার বাবা না? বাবাকে ওই সব বলতে তোমার মুখে বাধে না?

ও বললে—উনি বাবা তাই কি? আমি ও সব মানি নে। আমার যা খুশি তাই করবো।

—তা বলে ওঁকে তুমি খেতে দেবে না? ঘরে চাবি দিয়ে রাখবে?

পিণ্টুর বাবা বললেন—আর বাবা আমাকে—

পিণ্টুর ধমক খেয়ে কথা শেষ করতে পারলেন না। পিণ্টু হেঁকে বলে উঠলো—চুপ—

আমি বললাম—ও কি পিণ্টু?

—কিছু না। উনি বাজে কথা বলছেন—

—আর তুমি ভালো কথা বলছো? বাবাকে এ-সব কথা বলতে হয়, কোথায় শিখলে?

ওকে ধমক দিয়ে তখনকার মত চুপ করিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু বুঝলাম এ রোগের ওষুধ এত সহজে হবে না। বৃদ্ধ সত্য চক্কতির জন্যে দুঃখ হোল, সেই দোর্দন্ডপ্রতাপ সত্য চক্কত্তি! যার ভয়ে ছেলেরা জুজু হয়ে থাকতো।

তারপর যে ক'দিন দেশে ছিলাম, বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বসতাম। কি অদ্ভুত পরিবর্তন তাঁর দেখে অবাক হয়ে যেতাম। এদিক ওদিক চেয়ে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলেন। ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত, ছেলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পর্যন্ত করতে ভরসা পান না। আমি তাঁকে বললাম—নিন্তুদা কোথায় থাকে, সেখানে গিয়ে থাকেন না কেন? কিংবা পটলের কাছে লালমণির হাটে?

বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—সে সব জায়গায় মন টেকে না বাবা। নিন্তুর বাসায় জায়গা কম, লোকজন ভিড়। পটলের তো রেলের কোয়ার্টার, পাখীর খাঁচা। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, হাত-পা ছড়িয়ে থাকা অভ্যাস, সে সব জায়গায় হাঁফ লাগে আমার। নইলে তাদের দোষ নেই, তারা নিয়ে যেতে চায়। তা আমার নিতান্ত খারাপ অদৃষ্ট বাবা। আমি কি ছিলাম, আজ কি হয়েছি তাই দেখো। তোমার কাকীমাও যদি আজ বেঁচে থাকতো, তা'হলে বুড়ো বয়সে আমাকে ছোট ছেলের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়?

বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেবার মত কিছু কথা খুঁজে পেলাম না।

অন্তর্জলি

বাংলা ১২৭৫ সাল।

ডুমুরদহের গঙ্গার ঘাটে বিখ্যাত পাঁচালীকার ও কবিগান রচয়িতা দীনদয়াল চক্রবর্তীকে অন্তর্জলির জন্য আনা হয়েছে। সঙ্গে আছে চক্রবর্তী মশায়ের দুই পুত্র দেবীপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ, ভ্রাতুষ্পুত্র রামনিধি এবং পাঁচালীর দলের পুরাতন দোহার ষষ্ঠী সামন্ত। তা ছাড়া আছে একটি চাকর, নাম যদু।

দীনদয়াল চক্রবর্তীকে ডুমুরদ' ঘাটে অন্তর্জলির জন্যে আনা হয়েছে, এ সংবাদ লোক-মুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো অতি অল্প সময়ের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে চারিধার থেকে দলে দলে লোক আসতে শুরু করলো সকাল থেকে। যারা আসে, তারা চক্রবর্তী মশায়কে দেখে পায়ের ধুলো নেয়, চলে যায়। কাউকে দাঁড়াতে দেওয়া হয় না, তাহ'লে অল্প সময়ে বেজায় ভিড় জমে যাবে।

জ্যেষ্ঠপুত্র দেবীপ্রসাদ সকলকে হাতজোড় করে বলচে, "আমার বাবার শেষকালের ক্রিয়াগুলো একটু শান্তিতে করতে দ্যান আমাদের। ভিড় করবেন না, দয়া করে চলে যান। দেখা তো হোল, আবার গাছতলায় দাঁড়িয়ে কি দেখবেন? তামাক এখানে না, এগিয়ে গিয়ে খান। বাঁধানো বটতলায় চলে যান।"

সুবোধ লোকেরা চলে যাচ্ছে। বলতে বলতে যাচ্ছে, "আহা—হা! দীনদয়াল চক্কত্তি

চললেন! আহা—হা!"

ওদের চোখে জল।

"অমন অনুপ্রাস আর কেউ লাগাতে পারবে না। আহা-হা!"

"বাংলা দেশের হয়ে গেল! কি লোকই চলে যাচ্ছে!"

"ইন্দ্রপাত হয়ে গেল!"

"দেখলেও পুণ্যি হয়। চেহারা যেন সাক্ষাৎ শিব! চললেন।"

"বর্ধমান আজ অন্ধকার হয়ে গেল!"

"বর্ধমান বুঝি মহাশয়ের বাড়ী? উনি সারা বাংলাদেশের, শুধু বর্ধমান কেন?"

"ও'র জন্মভূমি বর্ধমান তাই বলচি। বর্ধমানের চাঁপা গ্রামে। কাঁকট পরগণা।"

দুর্বুদ্ধি-লোকেরা একবার চলে গিয়ে আবার ঘুরে ফিরে আসে।

"নাভিশ্বাস উঠেছে নাকি? ও, এখনো ওঠে নি? আহা হা!"

"যাবোই তো মশায়, থাকতে আসি নি। অমন লোকটি আহা! চলে যাচ্ছেন? আহা—হা!"

"আমাদের ঝাঁপাই গ্রামে কুন্ডুদের বাড়ী পুজোর সময় বাঁধা আসর ছিল চক্রবর্তী মশায়ের। লোকে বসে গান শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যেতো। ও'র গান সকলের মুখে মুখে।

নিকটেই বর্ধমান রাজার কাছারী। সেখানকার নায়েব নরহরি জোয়ারদার স্বয়ং এসেছেন দেখতে। দুর্ধর্ষ নরহরি জোয়ারদার, এ পরগণায় সাত সাতটা দাঙ্গায় যিনি স্বয়ং ঘোড়ায় চড়ে লেঠেল-পাইক পরিচালনা করেছেন, বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায় যাঁর প্রতাপে। নরহরি বসে আছেন চক্রবর্তী মশায়ের বিছানার কিছু দূরে, বলছেন,—"কোন ত্রুটি না হয় ব্যবস্থার। সব আমি ঠিক ক'রে দেবো। আমার পাইক এখানে বসে থাকবে সন্দে পর্যন্ত। যখন যা দরকার হয়—"

দেবীপ্রসাদ বললে—"আপনার দয়া নায়েব মশায়। রাত্রে আজ দু'জন লেঠেল এখানে থাকা দরকার। এখনো নাভিশ্বাস ওঠে নি, রাত নেবে বলে মনে হচ্ছে।"

"এক্ষুনি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। ভেবো না বাবাজি। তুমি আর তোমার ভাই শুধু চুপ ক'রে বসে থাকো। এ আমাদের দায়।"

"আপনি আর একবার আসবেন তো?"

"আমি আসবো সন্ধ্যাহ্নিক সেরে। দপ্তরের আজ বড় ঝঞ্ঝাট। কিস্তির সময় কিনা। ওটা কি হে?"

"আজ্ঞে এখানা বাবার গানের খাতা। উনি বললেন, অন্তর্জলি করবার সময়ে ও'র হাতে একখানা রাখতে।"

"দেখি দেখি!"

নরহরি খাতাখানা উল্টে-পাল্টে দেখে বললেন, "শ্যামাসঙ্গীত। আহা কি অনুপ্রাসের ঘটা। কি বাঁধুনি—এইখানটা দ্যাখো—বল্ দেখি মা কোন্ রঙ্গে ত্রিবিভঙ্গে রঙ্গক্ষেত্রে রঙ্গ দ্যাখো—আহা হা! ক্ষণজন্মা পুরুষ! আর জন্মাবে না। হয়ে গেল! পিদিম নিভে গেল!"

দেবীপ্রসাদের চোখ ছাপিয়ে জল পড়তে লাগলো। নরহরি বললেন, "সংসার অনিত্য। চিরদিন বাপ মা থাকে না। কেঁদো না বাবাজী। হ্যাঁ, বাপের মত বাপ। যাকে বলে দিগ্‌বিজয়ী বাপ। চোখের জল ফেলবার বহু সময় পাবে বাবাজী, এখন যাতে ও'র শেষ কাজগুলো ঠিক মত করতে পারো—"

দীনদয়াল চক্রবর্তীর বয়েস হয়েছে ছিয়াত্তর সাতাত্তর। দোহারা চেহারা, বেশ ফর্সা রং, এই বয়েসেও বেশ সুপুরুষ। কবির গান গেয়ে অর্থ ও খ্যাতি উভয়ই তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। স্বগ্রামে প্রায় ৫০।৬০ বিঘে জমি ও কয়েকটি আম-কাঁটাল বাগানের তিনি মালিক। এই জমির মধ্যে অর্ধেক আন্দাজ বর্ধমান রাজার ব্রহ্মোত্তর। বাকি তিনি কিনেছিলেন। তাঁর সদ্ব্যয়ও ছিল যথেষ্ট, বাড়ীতে দুর্গোৎসব করতেন খুব জাঁকিয়ে, পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজন কাঙ্গালীভোজন যেভাবে নিষ্পন্ন হোত, এদেশের অনেকে তেমনটি চোখে দেখে নি। গত বৎসর ছিল ঘোর দুর্ভিক্ষের বছর, চালের মণ সাড়ে তিন টাকা চার

টাকা পর্যন্ত উঠেছিল, অনেককে অনাহারে থাকতে হয়েছিল, তাতেও চক্রবর্তী মশায় পিতৃ-শ্রাদ্ধের কোন অঙ্গ বাদ দেন নি। পাঁচমণ ধানের খইমুড়কি বিলিয়ে ছিলেন কাঙ্গালীদের মধ্যে।

দীনদয়াল চক্রবর্তীকে ওই যে রাখা হয়েছে গঙ্গার ঘাটের চালাঘরে। মাটিতেই বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছে! সমস্তদিন কেটে গেল, ও'র নাভিশ্বাস উঠলো না। সন্ধ্যার সময় তিনি ক্ষীণস্বরে ছেলেদের কাছে ডাকলেন।

—"বাবা পটল, তোমাদের খাওয়া-দাওয়া—"

—"বেশী কথা বলবেন না বাবা।"

—"লোকজনের ভিড় কমেছে?"

—"এখন সবাই চলে গিয়েচে বাবা।"

—"বোসো এখানে।"

—"এখন কেমন আছেন?"

—"ভালো না! সংকীর্তন এল না?"

—"গঙ্গাটিকুরির কীর্তন আনতে লোক গিয়েচে, এলো বলে।"

—"আমায় একটু নাম শোনাও।"

—"বেশী কথা বলবেন না বাবা।"

দেবীপ্রসাদ বাবার মুখে কুষী ক'রে গঙ্গাজল দিল। বললে, "একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন বাবা।"

বাইরে এসে সে লোকজনদের বললে, "বাবা এখনো দিব্যি কথাবার্তা কইলেন। বেশ জ্ঞান আছে এখনো।"

একজন বললে, "থাকবে না? পুণ্যাত্মা লোক যে। ওসব লোক সজ্ঞানে দেহত্যাগ করে। যে সে লোক তো নয়।"

সন্ধ্যা নেমে এল। নিস্তব্ধ তারা-ভরা রাত্রি।

শ্মশান-চালার অদূরে কয়েকজন লোক বসে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। ওরা ডুমুরদ'র হাট থেকে কুমড়ো কিনে এনেচে, পটল কিনে এনেচে। ষষ্ঠী সামন্ত বসে কুমড়ো কুটচে। দেবীপ্রসাদ বললে, "ষষ্ঠী কাকা, বাবাকে একবার দেখতে গেলে না?"

—"দেখতে যাবো কি, কর্তার মুখের দিকে তাকালে বুক ফেটে যাচ্ছে। আজ এগারো বছর কর্তার সঙ্গে তেনার দলে ঘুরছি। কত বড় বড় আসর মাৎ করেছেন কর্তা। আমাকে বড্ড ভালবাসতেন, ছোট ভাইয়ের মত। উনি চলে যাচ্চেন, আমার দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। খাবো কি তাই হয়েচে ভাবনা। তুমি দল করো বাবাঠাকুর, আমি সেই দলে আসবো। কর্তার নামে দল চলবে।"

—"পাগল! আমি আর বাবা! গাইবে কে?"

—"গাইবে তুমি বাবাঠাকুর। আমার পরামর্শ শোনো। সব শিখিয়ে পড়িয়ে দোবো। আমার সব ঘাঁৎ-ঘোঁৎ জানা আছে। সোনার দলটুকু, এ ছেড়ো না বাবাঠাকুর, এতেই তোমাদের সংসারে লক্ষ্মী।"

—"আমার ভরসা হয় না ষষ্ঠী কাকা, দেখি কি হয়। বাবা যা রেখে যাচ্চেন, দু'ভাইয়ের অভাব হবে না। দলের ঝন্ঝাটে আর যাবো না। ও সব আমার কর্ম নয়।"

কিন্তু যাঁকে কেন্দ্র ক'রে আজকার এই সব ব্যাপার, তিনি সম্পূর্ণ সচেতন রয়েছেন, নাভিশ্বাস ওঠা তো দূরের কথা।

চোখ বুজে আছেন যে, সে শুধু ভীষণ শারীরিক দুর্বলতার জন্যে।

এক এক বার ছেলেদের ডাক দিচ্চেন, "বাবা পটল—বাবা রামু—এদিকে এসো—"

কিন্তু সে-ডাক ছেলেদের কানে গিয়ে পেঁছুচ্চে না। আসলে চক্রবর্তী মশায়ের মনেই সে-আহ্বানের আসন, কণ্ঠস্বরে রূপান্তরিত হচ্চে না সে-ইচ্ছা, অথচ চক্রবর্তী মশায় ভাবচেন, তিনি ঠিকই ডেকেচেন ছেলেদের।

"ওরা কেন আসচে না? তাই তো—"

চক্রবর্তী মশায় আবার চোখ বুজলেন।

আজ সারাদিন তিনি অতীত-জীবনের বহু হারানো-মুহূর্ত আবার আস্বাদ করেচেন। যা ভুলে গিয়েছিলেন, তা যে এত স্পষ্ট হয়ে অঙ্কিত ছিল স্মৃতিপটে কে তা ভেবেছিল?

প্রথম যৌবনের সে-সব গৌরবময় দিন। হরু ঠাকুর তখন ছিলেন চক্রবর্তী মশায়ের আদর্শ। ইলছোবা-মোল্লাই গ্রামের বারোয়ারিতে বড় আসরে হরু ঠাকুরের কবিগান যখন শোনেন, তখন কত বয়েস হবে তাঁর? বছর সতেরো-আঠারো হয়তো।

আজও মনে আছে সে-রাত্রের কথা।

ভাষার অমন ফুলঝুরি আর তিনি কখনো দেখেন নি, শোনেন নি। মনে হোল যেন দেখচেন বিখ্যাত কবিওয়ালা হরু ঠাকুরের মুখে-মুখে ভাষার সে অপূর্ব সৃষ্টি। হরু ঠাকুর একদিকে, অন্যদিকে গদাধর মুখুয্যে—দুই বিখ্যাত কবিওয়ালা। আসরের লোকের মুখে শব্দ ছিল না। পুতুলের মত সবাই বসে আছে।

"সুধীর ধারে বহিছে এই ঘোরতরা রজনী
এ সময়ে প্রাণসখী রে কোথায় গুণমণি, ঘন সবাজ ঘন শুনি।
ঐ ময়ূর ময়ূরী হরষিত, হেরি চাতক চাতকিনী
ঐ কদম্ব কেতকী চম্পক জাতি সেঁউতি শেফালিকে
ঘ্রাণেতে প্রাণে মোহ জন্মায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে।
বিদ্যুৎ খদ্যোত দিবা জ্যোতির্ময় প্রকাশে দিনমণি
প্রিয়মুখে মুখ দিয়ে সারিশুক থাকে দিবস রজনী।

সতেরো বছরের যুবকের চোখের সামনে হরু ঠাকুরের গান এক নতুন সৌন্দর্য-জগৎ খুলে দিয়েছিল। সেদিন থেকে তাঁর মনে মনে দুরাশা জাগলো যদি কোনোদিন কবিওয়ালা হ'তে পারেন, অমন ভাষার ফুলঝুরি ছোটাতে পারেন মুখে মুখে, তবেই জীবন সার্থক।

ভোর হয়ে গিয়েছিল আসর ভাঙতে। সঙ্গে তাঁর ছিল আর একটি লোক, তাঁরই মত অল্প বয়স। দুজনে আসরের বাইরে এসে একটা গাছতলায় বসলেন। সঙ্গের সে-ছেলেটি অন্য কথাবার্তা পাড়লে, কিন্তু দীনদয়ালের ওসব ভালো লাগছিল না।

তিনি সঙ্গীকে বললেন, "হরু ঠাকুর কোথায় বাসা করেচেন ভাই?"

সে বললে, "জয়বাবুদের চন্ডীমণ্ডপে! কেন?"

—"দেখে আসি। অমন লোক!"

—"গদাধর মুখুয্যেও কম নয়। উনিও ওখানে আছেন।"

—"চলো যাই।"

—"সারা রাত গান ক'রে এখন ওরা ঘুমুবে, না তোমার সঙ্গে বক্‌বক্ করবে। এখন যেও না।"

—"তুমি বাড়ী যাও। পিসিমাকে বোলো আমি ওবেলা যাবো। ওঁদের একবার ভালো ক'রে না দেখে যাবো না। কিছু ভালো লাগচে না ভাই।"

সঙ্গী হেসে বললে, "পাগল হ'লে নাকি? চলো বাড়ী যাই। কি হবে ওদের সঙ্গে দেখা ক'রে?"

কিন্তু যুবক দীনদয়াল সেদিন বাড়ী ফিরে যান নি। হরু ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করবার ফলে তাঁর নেশার ঘোর আরও বেড়ে গেল। এরা মানুষ না দেবতা? মানুষের মুখের ভাষা এমন সুন্দর হতে পারে?

আজ সে-সব দিনের কথা এত মনে আসচে কেন?

আর একজনের কথা বড্ড মনে হয়।

সে একটি নব প্রস্ফুটিত নলিনীর মত নির্মল ও পবিত্র ছিল। জাতিতে ছিল কলু, ব্রাহ্মণেরা ওদের জল স্পর্শ করে না। কিন্তু আজ এ কথা ভেবে চক্রবর্তী মশায়ের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হচ্চে না যে তিনি তার রান্না ভাত খেয়েচেন। তার হাতের জল খেয়ে তৃপ্ত হয়েচেন। আজকার দিনের সাত্ত্বিক, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দীনদয়াল চক্রবর্তীর সে-খবর কেউ জানে না।

আকাশে বাতাসে সে-সব দিনে কেমন মাদকতা ছিল, মনে ভাবের অফুরন্ত জোয়ার অনুকূল-বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বইতো। রাসু নৃসিংহের সে-গান তখন সব সময় মনে গুনগুনিয়ে উঠতো—

সখি এ সকল প্রেম
প্রেম নয়
ইহাতে মজিয়ে নাহি
সুখের উদয়।

অথবা—

মনে রইল সই মনের বেদনা
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি আর বলা হলো না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

মুমূর্ষু দীনদয়াল মনে মনে হাসলেন।

আজকালকার ছেলে-ছোকরা কি বুঝবে সে-সব প্রেমের কথা? ছেলে-বুড়ো নিয়েও কথা নয়, আসলে চাই প্রাণ। প্রাণের গভীরতা যদি না থাকে, অগভীর ঘোলা-জলে সাঁতার কাটলে কি মহাসমুদ্রের বাণী শোনা যায়? মনে পড়লো কানাইহাটির জমিদার-বাড়ীর নাটমন্দিরে নবাই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সে বিখ্যাত কবির লড়াই, যার ফলে তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন দেশে-বিদেশে—আজও সে সান্ধ্য-আসরটি, আসরের পাশের প্রাচীন কদম্ব-গাছটি, সেই ভাঙা শ্যামরায়ের মন্দিরের চূড়াটি, এতকাল পরেও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। নবাই ঠাকুর বিখ্যাত কবিওয়ালা। আর তিনি তখন সবে উঠচেন। লোক বলাবলি করতে লাগলো, এ ছোকরা এবার হাবুডুবু খাবে নবাই ঠাকুরের আসরে।

নবাই ঠাকুরের দোয়ারে গোপেশ্বর সাঁবুই এসে বিকেলে বললে, "ও ঠাকুর, তোমার পাখা উঠেচে?"

—"হ্যাঁ, এবার স্বর্গে যাবো।"

—"সাহস আছে তোমার। চলো, আমায় পাঠিয়ে দিলেন।"

—"কোথায় যাবো? কে পাঠিয়ে দিলেন?"

—"নবাই ঠাকুর।"

—"তাঁর এত মাথাব্যথা?"

—"এন্টনি সাহেব ঘোল খেয়েছিল নবাই ঠাকুরের কাছে, জানো তো? তোমাকে আর ফুঁ খাটাতে হচ্চে না সেখানে। এসো, নবাই ঠাকুরের সঙ্গে একটা ষড় করো! আসরে যাতে—"

—"তোমার নবাই ঠাকুরের ষড় করবার দরকার হয়, বলে দিও, তিনি যেন আমার বাসায় পায়ের ধুলো দেন। আমি তাঁর সেখানে যাবো না।"

—"এত বড় আস্পর্ধা তোমার? আচ্ছা—"

দীনদয়াল নির্বোধ ছিলেন না। তিনি বুঝেছিলেন নবাই ঠাকুর তার সামনে দাঁড়াতে ভয় পেয়েচেন। যত বড় এবং যত বুড়ো কবিওয়ালাই হোন না, অজ্ঞাতশক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনা-সামনি প্রকাশ্য আসরে নামতে ভয় পাবেনই। নিজের শক্তির ওপর অতটা বিশ্বাস কারো একটা থাকে না। বিশেষ ক'রে ও'রা নাম-করা, ও'দের সুনাম নষ্ট হবার ভয় আছে, দীনদয়াল ছোকরা-কবিওয়ালা, হেরে গেলেও লজ্জা নেই।

এই নবাই ঠাকুরই এন্টনি সাহেবকে বলেছিল—

এ নহে এন্টনি আমি একটা কথা জানতে চাই
এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই?

সঙ্গে সঙ্গে এন্টনি সাহেবের প্রত্যুত্তরে যেন বিদ্যুতের ঝলক খেলে গেল—

এই বাংলায় বাঙালীর বেশে বেশ আনন্দে আছি
হয়ে ঠাকুর সিংয়ের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি।

ঠাকুর সিং নবাই ঠাকুরের অন্য নাম।

সন্ধ্যার পর আসর বসলো। কানাইহাটি মস্ত গাঁ, আসর ভর্তি হয়ে গেল সন্ধ্যের আগেই। চারিধারে রটে গিয়েছিল বিখ্যাত নবাই ঠাকুরের সঙ্গে আসরে নামবে একজন ছোকরা-কবিওয়ালা। সবাই মজা দেখতে জড়ো হয়ে গেল, পাঁচ ছ' ক্রোশ দূরের গ্রাম থেকেও পানের পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে ছোলার ছাতু আর তেঁতুল বেঁধে নিয়ে লোক এসেচে মজা দেখতে, নবাই ঠাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছোকরা কেমন হাবুডুবু খায় নবাই ঠাকুরের হাতে, তাই দেখতে।

আসর বসবার দেরি নেই।

জমিদারদের নাটমন্দিরের একদিকে চিকের আড়ালে মেয়েদের বসবার আসন, অন্যদিকে কানাইহাটির বাবুদের বসবার তক্তপোষ ও তাকিয়া বাবুদের তখন নাম-ডাক আছে মাত্র; কিন্তু সাবেক অবস্থা তখন আর ছিল না। হাতীশালা ছিল কিন্তু হাতীর সন্ধান ছিল না। ষোল বেহারার বড় পালকি নাটমন্দিরের পাশের ঘরে পড়েই থাকতো, কেউ চড়তো না তাতে। ঝাড়লণ্ঠন টাঙ্গানো হয়েচে, জাজিম পেতে দেওয়া হয়েচে কবির দলের লোকদের জন্যে, ঠিক আসরের মাঝখানে। তারই পাশে ছিল সেই প্রাচীন কদম্বগাছটা, এখনো সেই আসর, সেই উৎসাহ ও কৌতূহলে-মত্ত শ্রোতৃবৃন্দের জনতা—ওই তো ডুমুরদ' শ্মশান-ঘাটের ওই শ্মশানবন্ধুদের বিশ্রাম করবার ঘরখানার মতই স্পষ্ট তাঁর কাছে। চোখের সামনে বেশ দেখতে পাচ্চেন।

তাঁর নিজের দলের দোহার তখন ছিল চন্দ্র মল্লিক। বুড়ো মানুষ, অনেক ভালো ভালো দল ঘুরে দাঁত পড়বার জন্যে চাকুরি খুইয়ে শেষে তাঁর দলে ঢোকে। বছর-দুই পরেই মারা যায় লোকটা।

চন্দ্র বললে, "বাবাঠাকুর, ওদের লোককে তাড়িয়ে দিয়ে ভালো করলে না। বড় জমকালো আসর হয়েচে। এতে হেরে গেলে বড় দুর্নাম রটবে—"

—"তোমার ভয় হচ্ছে চন্দর খুড়ো?"

—"ভয় না, তবে তুমি ছেলেমানুষ, তাই ভাবছি।"

—"কিছু ভয় নেই। তুমি দেখে নিও—"

—"মস্ত বড় কবিওয়ালা কিনা ঠাকুর সিং, শেষে নাস্তানাবুদ না হ'তে হয়।"

—"তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে উৎরে যাবো, দেখে নিও।"

সত্যি, সে-সন্ধ্যায় একটা নতুন প্রেরণা ও উৎসাহের জোয়ার তিনি অনুভব করলেন নিজের মনের মধ্যে। আজ এই সমাগত কৌতূহলোজ্জ্বল জনসাধারণকে তিনি দেখিয়ে দেবেন, শুধু ইতর গালাগালি দিয়ে জয়লাভের মূল্য নেই, তিনি দেখাবেন ভাষার ও ভাবের মহিমা, নতুন ভাবের ঢেউ এনে দেবেন আজ কবির আসরে, গাইবেন সম্পূর্ণ নতুন ধরণের গীত, সন্ধ্যার আকাশ থেকে সে প্রেরণা আসচে, আসচে ওই প্রাচীন কদম্ববৃক্ষের শ্যামল শাখাপ্রশাখার ইঙ্গিত থেকে, তিনি বুঝতে পেরেচেন আজ তাঁর জীবনে এক মহা-সন্ধিক্ষণ সমাগত।

সেদিনের কথা ভাবলে আজও তাঁর মনে সেই অপূর্ব উন্মাদনা জাগে। এই মৃত্যুর দিনটিতেও। রসের ও ভাবের সে-পুলক মানুষকে অমর, মৃত্যুঞ্জয়ী ক'রে দেয় এক মুহূর্তে। সকলে তা কি বুঝতে পারে?

সাধারণে তার খবর কি জানবে।

সে বুদ্ধি এবং ভাবের সে গভীরতা ক'জনের মধ্যে আছে?

এমন কি তাঁর নিজের ছেলেরাও তার সন্ধান রাখে না। ওদের মাতুলবংশের বৈষয়িক স্থূল-মনের উত্তরাধিকার ওরা পেয়েছে, তাঁর নিজের রসেভরা ছন্দের-অনুগত-ভাবসুষমায় অবগাহন-স্নান-করে-ওঠা মন ওরা লাভ করে নি।

কাকে কি বলবেন? কাকে কি বোঝাবেন?...

তারপর আরম্ভ হ'ল কবির লড়াই। কিন্তু ইতর বা অশ্লীল একটি কথাও উচ্চারণ

করলেন না তিনি। নবাই ঠাকুর যা খুশি বলে চলুক, তিনি তার উত্তর দিতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আক্রমল করবেন না এই সংকল্প নিয়েই তিনি আজ আসরে নেমেচেন।

বরং তিনি তার উল্টোটাই গাইলেন।

নবাই ঠাকুরের সৃজনী-প্রতিভার প্রশংসা করলেন তিনি এ আসরে।

কাব্যবন বিচরণ সোজা কথা নয়
কল্পনার ফুল যেথা ফুটে সমুচয়
ভাবের ভাবুক যিনি সুকবি-রতন
নবাই সে পুষ্পরাশি করেন চয়ন
বন্দি আমি তাঁর পদে নবাই সুন্দর
বাণীর দুলাল তাঁর সবই সুন্দর!

নবাই ঠাকুর ও তাঁর দোহার গোপেশ্বর অবাক হয়ে গেল, ওরা তার ঠিক আগেই দীন-দয়ালকে লক্ষ্য ক'রে বলেচে—

কালে কালে সব গেল কাল কাল রাতি
মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল ফার্সি পড়ে তাঁতি
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ মলো শল্য সেনাপতি
আজব শহরে যথা শৃগাল ভূপতি!
তেলাপোকা হোল পাখী শিখী ছাতারিয়া
অর্বাচীন দীনু নাচে তাধিয়া তাধিয়া।

সে কথার ও-রকমের শ্রদ্ধাপূর্ণ উত্তর ওরা আশা করে নি। গোপেশ্বরকে কি ইঙ্গিত করলে নবাই ঠাকুর। গোপেশ্বর সুর বদলালে। দীনদয়াল নামের ওপর ওরা খুব কায়দা দেখালে।

কোথা ওহে দীননাথ, দীন দয়াময়
দীনহীনে দিন দিন হও হে সদয়
জায়া কায়া মায়া লয়ে মত্ত হয়ে রই
দিনান্তে তোমার নাম প্রাণান্তে না লই।
মিথ্যা কথা জুয়াচুরি করি কদাচার
রাগ দ্বেষ অভিমান অর্থ অলঙ্কার
এ সকল মহাপাপে ডুবি সর্বক্ষণ
কি হবে আমার গতি পতিতপাবন?

উভয় দল এক হয়ে আসরের মধ্যে ভক্তির বন্যা ছুটিয়ে দিলে। শ্যামরায়ের পূজারী বৃদ্ধ মাধব পন্ডিত দীনদয়ালের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। কানাইহাটির বড় বাবু গরদের জোড় বক্‌শিশ করলেন দীনদয়ালকে। দীনদয়ালের মধ্যে নতুন ভক্তির, ভাবের বীজ তখন সবে অঙ্কুরিত হয়েছে। প্রৌঢ় নবাই সে-পথে কখনো হাঁটেন নি, কাজেই দীনদয়ালের গান আসরের সকলের প্রাণে রসের ছোঁয়া দিয়ে গেল।

কিন্তু আজও একটা কথা দীনদয়ালের মনে হয়।

ধন্য নবাই ঠাকুর!

নিজেকে হঠাৎ সামলে নিয়ে নবাই ঠাকুর যখন ভক্তির 'ছড়া' কাটতে শুরু ক'রে দিলেন, তখন সে কি চমৎকার উজ্জ্বল অনুপ্রাসের ঘটা, বিদ্যুতের ঝিলিকের মত খেলিয়ে নিয়ে বেড়াল আসরে।

পাঁচভূতে সুগঠিত দেহ নবদ্বার
কোন্ মন্ত্রে ছাড়াইব ভূত আপনার
মন্ত্র তন্ত্র জলপড়া এ ভূতে না মানে
নিজমূর্তি ধরি ভূত পঞ্চভূতে টানে!
ভূতের জ্বালায় ভূতে সদা জ্বালাতন
কি হবে আমার গতি পতিতপাবন?

শেষ রাত্রে আসর ভাঙলো। উভয় দল এমন গান জমিয়েছিল যে শ্রোতার দল উঠতে

চায় আরো হোক, আরো চলুক, রাত ভোর হয়ে যাক, এমন সঙ্গীতমধু আর কখনো কেউ পান করায় নি এদের, রসের নেশায় ভাবের নেশায় এরাও উন্মত্ত হয়ে উঠেচে যেন, যেন নবদ্বীপে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সংকীর্তন বেরিয়েচে রাজপথে, আপামর জনসাধারণকে মাতিয়ে তুলেচে ভগবানের নামের অপূর্ব মহিমায়। নভোচারীর বায়ুপথ ত্যাগ ক'রে গীতরস এসেচে নেমে মৃত্তিকার বন্ধুর পথ-রেখায়।

দীনদয়াল বাসায় এলেন। রাত আর নেই বললেই হয়। তামাক সেজে দাঁড়িয়ে আছে দলের ভৃত্য বিনু নাপিত। এমন সময় কে সম্ভ্রমের সুরে বলে উঠলো—"নবাই ঠাকুর আসচেন।"

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন দীনদয়াল। একটু পরে নবাই ঠাকুর ঘরে ঢুকে দু'হাত জোড় ক'রে নমস্কার ক'রে বললেন—"চক্কত্তি মশায়, আজ আপনি আমাকে জ্ঞান দিলেন—"

সম্ভ্রান্ত, খ্যাতিমান, অবস্থাপন্ন, প্রৌঢ় কবিওয়ালা নবাই ঠাকুরের সামনে দীনদয়াল বিনয়ে, সংকোচে এতটুকু হয়ে গেলেন। জিব কেটে বললেন—"ও কথা বলবেন না, হাত জোড় করচি, ওতে আমাকে লজ্জা দেওয়া হয়।"

—"আপনি ব্রাহ্মণ, হাত জোড় করবেন না আমার সামনে। ওতে আমার অপরাধ হয়—"

—"বসুন দয়া ক'রে।"

—"এই বসলাম। বড্ড খুশি হয়েছি আজ আপনার—"

—"একটা অনুরোধ।"

—"কি?"

—"আমাকে 'তুমি' বলুন। আপনি বয়েসে আমার পিতৃব্যের সমান।"

—"বাড়ী কোথায় তোমার?"

—"ডুমরদ', হুগলী জেলা।"

—"তুমি নাম করবে বাবাজী। বয়েস হয়েচে আমার, অনেক দেখেচি, অনেক বলেচি। তুমি যে-জ্ঞান আমায় দিলে আজ এমন কখনো পাই নি। আণ্টুনি ফিরিঙ্গির সঙ্গে আসরে উতোর গেয়েচি, ভোলা ময়রার সঙ্গে উতোর গেয়েচি, হরু ঠাকুরকে দেখেছি, গদাধর চক্কত্তিকে নাকাল করেছি শান্তিপুরের ফুলদোলের আসরে। কিন্তু হ্যাঁ বাবা, আমি স্বীকার করছি আজ হেরে গেলাম তোমার কাছে। তুমি নতুন সুর এনে দিয়েচ কবিগানের মধ্যে। আমরা পুরোনো ঘুঘু। ছাইতে না জানি, পোড় চিনি। তোমার যে ক্ষমতা, তাতে অনেক বেশি নাম করবে তুমি। নতুন সুর শোনালে আজ সবাইকে। ভগবানের কাছে কামনা করি, দেশের নাম উজ্জ্বল কর। কেউ বোঝে না বাবা, আসল জিনিস ক'জন বোঝে? রঙ্গ-রস শুনতে আসে সবাই, কবিত্ব যে কি অমৃত, এর মধ্যে যে কি আনন্দ, একটা অনুষ্ঠান ভালমত লাগাতে পারলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতে হয়, পুত্র-শোক ভুলিয়ে দেয় বাবা, পুত্র-শোক ভুলিয়ে দেয়, সে-সব বাইরের লোক কি বুঝবে? তুমি বুঝবে। তোমার মধ্যে সে জিনিস রয়েচে দেখলাম। আর দেখেছিলাম রাসু নৃসিংহকে, ফিরিঙ্গি হোক আণ্টুনি, হাঁ ভাষা বুঝতো বটে, রস চিনতো বাবা। তা সে-সব—"

দীনদয়াল নবাই ঠাকুরকে যথেষ্ট সম্মান দেখালেন। নিজেকে প্রৌঢ়, অভিজ্ঞ কবিওয়ালার ছাত্র বলে বিনয়-প্রণাম করলেন। বিদায় নেবার সময় সেদিন দুপুরে নবাই ঠাকুরের চোখে জল এল।

নবাই এর পরে অনেকদিন বেঁচে ছিলেন, কিন্তু কোন আসরে দীনদয়াল আর তাঁর সঙ্গে কবিগানে গাইতে নামেন নি।

কি দিনই গিয়েচে সে-সব!...

সন্ধ্যা হয়ে এল কি?

দীনদয়াল ডাকতে লাগলেন, "বাবা রামু—"

কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

দেবীপ্রসাদ কাছে এসে বলে—"বাবা, কষ্ট হচ্চে?" দীনদয়াল ঘাড় নেড়ে জানাতে গেলেন কষ্ট নেই, কিন্তু ঘাড় নড়লো না, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বড় ছেলের মুখের দিকে। দেবীপ্রসাদের চোখে জল পড়তে দেখে বললেন, "কাঁদছ কেন বাবা,

আমি বড় আনন্দে আছি, কোনো কষ্ট নেই আমার। কেঁদো না।"

দীনদয়াল ভাবলেন তিনি কথাগুলো বললেন ছেলেকে, কিন্তু অনুচ্চারিত রয়ে গেল কথা, গলা দিয়ে সুরের আধার বায় হয়ে এল না।

দেবীপ্রসাদ বুঝতে না পেরে বললে, "জল খাবেন বাবা?"

নরহরি জোয়ারদার পেছন থেকে বললেন, "হুঁ, জল খেতে চাইচেন। কুশী ক'রে গঙ্গাজল মুখে দাও।"

বিরক্ত হলেন দীনদয়াল। না, জল তিনি চাইচেন না। তাঁর মনে চমৎকার দুটি অনুপ্রাসবহুল পংক্তি এসেচে, কনিষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদকে সে দুটি পংক্তি লিখে নিতে বলছিলেন। ওই ছেলেটি তাঁর নাম রাখতে পারে। জিনিস আছে ওর ভেতরে। তিনি লক্ষ্য করেচেন এটা মাঝে মাঝে। মাতুল বংশের স্থূল-বৈষয়িকতার ধারা হয়তো এই ছেলেটি কাটিয়ে উঠতে পারে।

পরম পুরুষ প্রভো নিত্য সনাতন
চিন্ময় তোমার নাম চিনে কোন্‌জন
আমি দীন জ্ঞানহীন না চিনি তোমারে
কেমনে হইব পার, মায়া পারাবারে।

না, কেউ লিখে নিলে না। কেউ বুঝতে পারলে না। আর এই নরহরি জোয়ারদারটা এখানে এসে জুটেচে যে কেন? ওটা নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি বৈষয়িক, ওকে তিনি খুব ভালোই জানেন। প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করা, মাথট আদায় করা, পার্বনী আদায় করা, হয়কে নয়, নয়কে হয় করা, জুয়োচুরি বাটপাড়ি ওর পেশা। ও কি বুঝবে তিনি কি চান? ও কি বুঝবে নবাই ঠাকুর, আন্টুনি সাহেব, ভোলা ময়রার কবিগানের মাধুর্য, বাহাদুরি, কৌশল, ঔজ্জ্বল্য?

না, বড় সুখে ও আনন্দে কেটেছিল সে-সব দিন।

নতুন যৌবন দেহের, নতুন যৌবন মনের ও প্রাণের।

দিন রাত আকাশে-বাতাসে কিসের উন্মাদনা। এই কবিতা আসচে মাথায়, এই লিখে নিচ্চেন, আবার কবিতা এসে গেল মাথায়। কী পীড়ন করেচে তাঁর কবিতার নেশা। ঘুমুতে দিত না, খেতে দিত না, শুতে দিত না। রাত-দুপুরে মাথায় কয়েকটি পংক্তি এসে গিয়েচে, আর ঘুম নেই, উঠে তখুনি লিখতে বসে গেলেন।

একটা দিন মনে পড়লো। দিনহাটার বারোয়ারীতে কীর্তনওয়ালী বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। বিনোদিনী ওঁর কবিগান শুনে মুগ্ধ হয়ে ওঁকে ডেকে পাঠাল। বিনোদিনী সেকালের খুব নাম-করা কীর্তনগায়িকা। দীনদয়াল গেলেন ওর বাসায়। খুব সুন্দর সে. বয়েস তখন ত্রিশ-বত্রিশ—দীনদয়ালের সমবয়সী। একগাল হেসে এগিয়ে এল পৈঁছে বাজু বাজিয়ে, জলতরঙ্গ মলের বাজনার ঢেউ তুলে।

দীনদয়াল বললে—"কি জন্যে তলব পড়েছে?"

বিনোদিনী বললে—"আমার কি ভাগ্যি! মেঘ না চাইতে জল! আসুন. ঠাকুর মশাই আসুন।"

দীনদয়াল বিনোদিনীর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখন তার সামনাসামনি এসে হঠাৎ বড় সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। মুখে বললেন—"কেন তলব পড়েচে?"

"আমি কি ভাগ্যি করেছিলাম, আমার ঘরে আপনার মত লোক?"

—"আমার ভাগ্যিই কি কম? আমি কার কাছে এসেছি আজ!"

তারপর দুজনে মিলে সুর ও কবিতার চর্চা হ'লো কত রাত পর্যন্ত। দুজন দুজনের গুণে মুগ্ধ. দুজনেই গুণী শিল্পী। গভীর রাতে দীনদয়াল বিদায় নিলেন. কিছু একটা প্রেমের কথা বলবার জন্যে বিনোদিনী কত আনচান করেছিল. দীনদয়াল বুঝেছিলেনও তা. সুযোগ দেন নি। শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর বন্ধুত্ব তিনি অন্য পথে গিয়ে নষ্ট করতে চান নি।

ভোর হতে না হতে বিনোদিনীর ঝি এসে হাজির। বললে, "আপনাকে একটু ডেকেচেন. একটু বেলা হোলে স্নান ক'রে নিয়ে চলুন।"

—"স্তন ক'রে কেন? তোমার মনিব কি দীক্ষা দেবেন নাকি?"

—"আপনি পায়ের ধুলো তো দ্যান কিরপা ক'রে। আমি কি জানি?"

দীনদয়াল স্নান ক'রে পরিষ্কার আনকোরা কাপড় পরে ও চাদর গায়ে দিয়ে চটি পায়ে বিনোদিনীর বাসায় গিয়ে পেঁছিলেন। গিয়ে দেখেন বিনোদিনীও স্নান করেচে, ভিজে চুলের লম্বা গোছা গেরো বেঁধে পিঠে ছড়িয়ে ফেলেচে, গরদের লালপাড় শাড়ী পরেচে। কুশাসন পাতা, কলার পাতে ফল ও মিষ্টি জলখাবার সাজানো, ঝকঝকে মাজা কাঁসার ঘটিতে জল বা চিনির পানা, মুখকাটা কচি ডাব বসানো পাথরের খোরা। দীনদয়াল গিয়ে দাঁড়াতেই বিনোদিনী সামনে লুটিয়ে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "একটু জলসেবা করতে হবে এখানে আজ।"

দীনদয়াল হেসে বললেন—"আমি তো খাই নে কারো বাড়ী, তবে তোমার এখানে খাবো। তুমি সাধারণ মেয়েমানুষ নও।"

"আমি আপনাদের শ্রীচরণের দাসী।"

—"অত বিনয় দেখানো ভালো নয়। কি আছে দাও খাই।"

—"আমি প্রসাদ পাবো কিন্তু। মনে রাখবেন।"

—"দেখি, পেটুক ব্রাহ্মণের পাতে কি থাকে।"

খাওয়ানোও তেমনি খাওয়ানো। কত কি ফলমূল, দু-রকমের চিনির পানা, ক্ষীরের মণ্ডা, ছানার মণ্ডা। যেমন বিনয় তেমনি আদর—যত্ন। হাত জোড় ক'রে বললে, "আপনি যে গুণীলোক। দশহাজার লোকের মধ্যে একটা গুণী লোক মেলে। আপনার সেবা ক'রে ধন্য হোলাম, ঠাকুর।"

একটা পর্দা যেন সরে গেল তাঁর চোখের সামনে থেকে।

এতকাল পরেও বিনোদিনীর সেই বাসা—সেই জলপানের থালা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। লালপাড় গরদের শাড়ী-পরা বিনোদিনী হাসিমুখে নতনেত্রে সামনে বসে।

বিনোদিনী বলচে—"কি ঠাকুর, সবগুলো খেতে হবে। ফেললে চলবে না, আপনি যে গুণী লোক, আপনাকে খাইয়ে তৃপ্তি পাই।"

—"সত্যি?"

—"সত্যি না তো কি মিথ্যে ঠাকুর? খান খান।"

দীনদয়াল কি বলতে যাচ্ছেন, এমন সময় কি একটা গোলমালে তাঁর চমক ভাঙলো: চার-পাঁচজন লোক একমনে কথা বলচে। ওরা সামনে এসে দাঁড়ালো। সব ক'জনকে চিনলেন না, তবে ওদের মধ্যে একজন হোল বর্ধমান কাছারীর ডিহির্নবিশ কাসেমালি মল্লিক। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন ওদের কথাবার্তা থেকে, কাসেমালি মল্লিক কোন্ ভালো কবিরাজ এনেচে পাল্কি ক'রে। এখুনি দেখতে আসবেন তিনি।

কাসেমালি বলচে—'এই মাত্র খবর শুনলাম। সবগুলো কাছারিতে আজ গাঁতি-জমার বিলির দিন। ঘোড়া ক'রে ফিরতে বেলা দু'পহর হয়ে গেল। নামাজ সেরে ভাতপানি গালে দিয়ে সবে শুইচি, শুনলাম চক্কত্তি মশায়কে ডুমুরদ'র ঘাটে অন্তর্জলি করতে নিয়ে গিয়েচে কাল রাত্তিরে। বলবো কি, শুনে মনটার মধ্যে কেমন ক'রে উঠলো। আর থাকতে পারলাম না। চক্কত্তিমশায় গেলে এদিগরের ইন্দ্রপাত হয়ে যাবে যে! অমন গান কে বাঁধবে, অমন শিবের কুচুনি-পাড়া যাওয়ার পাঁচালী কে গাইবে? অমন অনুপ্রাসের ঘটা আর শুনবো না। আহা হা! এখনো মনে আছে, গেয়েছিলেন ষষ্ঠিতলার বারোয়ারীর আসরে—

পঞ্চভূত মন্ত্রপূত ভূত বিশ্বময়
ভূতে ভূতে ভূতোনন্দী, ভূত বিশ্বময়।

আহা হা!...বলি রামজয় কবিরাজ মশাইকে ডেকে এখুনি আমাকে ডুমুরদ'র ঘাটে যেতে হচ্ছে—তখুনি পাইক পাঠিয়ে দিলাম—'

কাসেমালি ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগলো—"ও চক্কত্তি মশাই? কেমন আছেন? চিনতে পারেন আমাকে?"

দীনদয়ালের মনে একটা প্রেমের ও ভাবের ঢেউ এল, তিনি কাসেমালি মল্লিককে খুব আপ্যায়িত করবেন ভাবলেন, বললেন,—"এসো বাবা এসো! কেন কষ্ট ক'রে কবিরাজ আনতে গেলে বাবা ? আমি তো বেশ ভাল আছি। বোসো, বাবা।"

কিন্তু কাসেমালি কি তাঁর কথা শুনতে পেলে না ? লোকজনের দিকে চেয়ে বললে, "আহা, লোক চিনতে পারচেন না। কথাও বলতে পারচেন না। গলার সুরে অনুপ্রাসের মুক্তো বর্ষে গিয়েচে, আজ তাঁর গলার সুর বন্ধ! আল্লার মরজি!" তারপর কবিরাজ এসে বসলো মাথার শিয়রে। দেখে শুনে বললে, "সূচিকাভরণ দেবো। আহা, কি লোক! অমন লোক আর হবে না!"

দীনদয়াল দেখলেন,—কাসেমালি মল্লিক উড়ুনির খুঁটে চোখের জল মুছলে।

কাসেমালি বলচে—"কবিরাজ মশাই, দেবীপ্রসাদ আর তার ভাই ছেলেমানুষ। এরা কিছু বোঝে না। সূচিকাভরণ দিতে হয়, যা করতে হয় আপনি করুন। যা খরচ হয় আমি দেবো। ওদের মত নেবার দরকার নেই। ওরা ছেলেমানুষ। কি বোঝে?"

দীনদয়াল মুখে বলতে গেলেন ভাবের আবেগে, "বাবা কাসেমালি, এই তো আমার সূচিকাভরণ। তোমাদের সকলের ভালবাসাই আমার সব চেয়ে বড় সূচিকাভরণ বাবা। বেঁচে থাকো, আশীর্বাদ করি, উন্নতি করো, ধর্মে মতি হোক। আমার দেবু রামু যা, তুমিও তাই। আমার আর সূচিকাভরণে দরকার নেই, বাবা।"

আবার দেখলেন, বিনোদিনী সামনে বসে হাসি-হাসি মুখে বলচে,—"আপনি যে গুণী ঠাকুর। আপনার সেবা ক'রে ধন্য হই। খান।"

দীনদয়াল বিনোদিনীকে বললেন—"দ্যাখো, কি চমৎকার ছেলেটি! নিজের খরচে আমাকে সূচিকাভরণ দিতে কবিরাজ ডেকে এনেচে। ভালবাসার সূচিকাভরণ দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে তুললে তোমরা সবাই। নবাই ঠাকুরকে একদিন এই ওষুধে আমি বশ করেছিলাম, ও বিনোদিনী, মনে পড়ে?"

বিনোদিনী খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠলো বালিকার মত।

একটু পরে দেবীপ্রসাদ রামপ্রসাদ দুই ভাইয়ে মিলে বাবাকে নাম শোনাতে আরম্ভ করলো—"ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।"

নরহরি জোয়ারদার বলে উঠলো—"ধরাধরি ক'রে গঙ্গার জলে নিয়ে চলো বাবা, আমি ধরচি একদিকে। শিবচক্ষু।"

সবাই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বোতাম

আজকার ব্যাপারটি যা ঘটলো, তা আমার পক্ষে বেশ একটু আশ্চর্যজনক।

সাধারণতঃ জীবনে এমন ঘটনা বেশী ঘটে না।

সেদিন বেলা দশটার সময় ছোকরার দল আমাকে এসে ধরলে, আদিবাসীদের নেত্রী এলিশাবা কুই আজ জেল থেকে মুক্তি পাবেন, (কংগ্রেস গবর্নমেণ্ট কার্যভার গ্রহণ করার পরদিন প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এলিশাবা কুইকে মুক্তি দেওয়াই তাঁদের সর্বপ্রথম কাজ, এ-সংবাদ খবরের কাগজ মারফৎ বিহারের অনেকেই অবগত আছেন) সেজন্যে আমাকে মোটরটা দিতে হবে।

আমি জানতাম না এলিশাবা কুই রাঁচি জেলে আছেন। সানন্দে সম্মতি দিলাম, কিন্তু ওরাই যখন বেলা দুটোর সময় আমার কাছে এসে জানালে মোটর দিতে হবে, তখন হঠাৎ আমার মনে পড়লো ড্রাইভার ছুটি চাওয়াতে তাকে ভুলে ছুটি দিয়ে ফেলেছি। সুতরাং নিজেই মোটর চালিয়ে নিয়ে গেলাম জেলের ফটকে। বেলা দুটো বেজে দশমিনিটের সময় এলিশাবা কুই জেলারের সঙ্গে গেটে এসে দাঁড়ালেন। খুব বেশি ভিড় না হলেও খুব কম লোক যে এসেছিল তাও নয়। গণ্যমান্য লোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন, দু'তিনটি এম-এল-এ, বিখ্যাত কংগ্রেস-নেতা হরজীবন পাঠক, ধনী ব্যবসায়ী নেমিচাঁদ, বাঙালী বড়

উকীল প্রভাত রায়, তাঁর জামাই ডাক্তার নীহার মিত্র ইত্যাদি। জনতা এগিয়ে গেল, এলিশাবা কুই-এর গলায় মালা দিয়ে তাঁকে আমার মোটরে নিয়ে এসে ওঠালে। একটু পরেই আমি মোটর ছেড়ে দিলাম।

আমার বাড়ী হিনু ময়দানের কাছে, জগন্নাথপুরের রাস্তার খানিক এদিকে। জেল থেকে অনেকখানি চলে এলাম মোটর হাঁকিয়ে, সঙ্গে কেবল হরজীবন পাঠক ও দুটি ছোকরা কংগ্রেস-কর্মী।

ওরা বলে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

বললাম—গরীবের বাড়ীতে মাননীয়া নেত্রীর জন্যে ও আপনাদের জন্যে সামান্য একটু চায়ের যোগাড় করেছি—

একটি ছোকরা বললে—উনি তো চা খান না।

হেসে বললাম—জল খাবেন না হয় দয়া ক'রে।

পেছনের সিটে দেশনেত্রীর মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেলাম।

যাঁরা দেশনেত্রী এলিশাবা কুই-এর কথা শোনেন নি বা ভালো জানেন না, তাঁদের অবগতির জন্যে দু-একটা কথা ওঁর সম্বন্ধে বলি।

এলিশাবা রাঁচি ও সিংভূমের বন্য আদিবাসীদের নেত্রী। বাংলাদেশ বা অন্যস্থানে এঁর নাম তত কেউ হয়তো শোনেন নি, কারণ বিহারের অনেক বিষয়েই বাংলার পাঠক উদাসীন। কিন্তু রাঁচি বা সিংভূম জেলার অধিবাসীদের কাছে এলিশাবা কুই-এর নাম ইন্দ্রজালের কাজ করে।

গত ১৯৪২-এর অগাস্ট আন্দোলনের সময় লোহারডগা থেকে যশপুর স্টেটের সীমান্ত পর্যন্ত পালামৌ জেলার সমগ্র বন্য অঞ্চলে দু'মাস কাল একটি স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৃটিশ গবর্নমেন্টের হাত সেখানে অচল ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছিল—প্রত্যেকটি থানা, বাংলো, প্রত্যেকটি ফরেস্ট রেস্টহাউস এই স্বাধীন গবর্নমেন্টের কাছারী, থানা ও কর্মচারীদের থাকবার স্থানে পরিণত হয়েছিল। এই স্বাধীন গবর্নমেন্টের নেত্রী ছিলেন এলিশাবা কুই।

লোহারডগা হতে বুন্‌জিগড় হয়ে যে বাস ঝার্সাগুড়া ও সম্বলপুর যায়, তিনমাসকাল তাদের লাইসেন্স-পত্রে সই নিতে হয়েছিল এই স্বাধীন গবর্নমেন্টের কর্মচারীদের কাছেই। এই তিনমাস একটি চুরি হয় নি এ অঞ্চলে, একটি পয়সা ঘুষ নেয় নি কেউ।

১২ই অগাস্ট লোবরা অভ্রখনির মালিক মিঃ স্পীড্ প্রথমে খবর পান যে বিপ্লবীদল ছ'টা থানা পুড়িয়েচে, টেলিগ্রাফের তার কেটেচে, রাস্তায় ঘাঁটি বসিয়েচে, রাঁচী-লোহারডগা রেলপথ উপড়ে তুলে ফেলেছে, বন্য গ্রামগুলিতে হো বা ওঁরাও মণ্ডলেরা নিজেদের হাতে শাসনভার নিয়েছে, অভ্রখনির আদিবাসী মজুরেরা কাজ বন্ধ করেচে এবং সম্ভবতঃ তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে খুন ক'রে ফেলবে।

এই ব্যাপারের বাকি অংশটুকু আমি মিঃ স্পীডের ম্যানেজার মিঃ শর্মার কাছে শুনে-ছিলাম। আমি নিজে রাঁচিতে অনেকদিন থেকে কন্‌ট্রাক্‌টরী ব্যবসা করি, রাঁচী শহরে আমার আপিসও আছে, আমার বাড়ী গাড়ী সবই এই কন্‌ট্রাক্‌টরী ব্যবসার দৌলতে। মিঃ স্পীডের খনিতে আমি মাঝে মাঝে জিনিসপত্র সরবরাহ করেছি, ওদের কোম্পানীর নাম জন স্পীড্ এণ্ড কোম্পানী—অনেকগুলি অভ্র ও বক্‌সাইট খনির মালিক।

১২ই অগাস্ট সন্ধ্যাবেলা স্পীডের বাংলোতে খবর এল বহুলোক জড় হয়ে আসচে বাংলো পুড়িয়ে দিতে। সাহেবের স্ত্রী ও দুই মেয়েও সে সময় বাংলোতে ছিল। রাত্রে বহু চেষ্টা করেও পালানোর ব্যবস্থা করা গেল না। সকালবেলা একটা লরি যোগাড় করে ওরা মালপত্র ওঠাচ্চে—আধঘণ্টার মধ্যেই লরি ছেড়ে বুন্‌জিগড়ের পথে ওরা ঝার্সাগুড়া বা সম্বলপুর পালাবে—এমন সময় দুজন একখানা মোটরে এসে নামলে—একজন সাহেবের হাতে একখানা চিঠি দিলে, তাতে কড়া হুকুম দেওয়া হয়েচে সাহেবকে, সে যেন স্থানত্যাগ করার চেষ্টা না করে, করলে বিপদে পড়বে পথে। যেখানে আছে সেখানে থাকলে সে

সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে, এর দায়িত্ব নিচ্চে পালামৌ কংগ্রেস সরকার। চিঠিতে সই আছে এলিশাবা কুই-এর।

লোকদুটি চিঠি দিয়েই মোটরে উঠে চলে গেল।

সাহেব ভয় পেয়ে লরি থেকে মালপত্র নামাতে লাগলো। যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মেম-সাহেব কাঁদতে লাগলো। বড় মেয়েটি একটি রিভলবার নিয়ে বাংলোর বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে রইল।

ঠিক এই সময়ে মিঃ শর্মা আর একখানা লরি নিয়ে সেখানে হাজির। তিনি পাথর-বাসা থেকে এই লরিখানা অনেক কষ্টে যোগাড় ক'রে এনেছিলেন সাহেবদের যাওয়ার সুবিধের জন্যে।

মিঃ শর্মা অবাক হয়ে বললেন—একি, মালপত্র নামাচ্চেন কেন? যাবেন না?

সাহেব কিছু বলবার আগেই বড় মেয়েটি রাগের সুরে বললে—Oh, these black curs! Do you know what they have been up to?

—কি?

—Ask daddy— I am here to shoot them like pigs if they dare show their black faces.—

—ঠান্ডা হও মিসি বাবা। তোমার বাবা কই? দাঁড়াও আগে শুনি—

মিঃ স্পীড্ বাইরে এসে হাতের চিঠিখানা নেড়ে মিঃ শর্মাকে বললে—Hallow Sharma, see this, these black Congress devils are at their dirty tricks even here—

—দেখি কি ব্যাপার?

—And see how ungrateful black dogs are, we teach them, we make them what they are, we give them our Gospels and—see this black women with a funny name from the Old Testament intimidating me as if she is the—

মিঃ শর্মা চিঠি পড়ে হেসে বললেন—এরা তো ভালোই বলচে। এলিশাবা কুই আদিবাসীদের নেত্রী। সেবার রামগড় কংগ্রেসে দেখেছিলাম। বেশ সুন্দর চেহারা। আদিবাসী হো, ওঁরাও, মুন্ডা ও কোলেরা এঁকে বড্ড মানে। উনি ওদের জন্যে গ্রামে গ্রামে স্কুল করেচেন—হাতের কাজ শেখাচ্চেন—

—আর আমরা করি নি?

—করবে না কেন সাহেব, তোমরাও, মানে তোমাদের মিশনারীরা, অনেক কিছু করেচে এদের জন্যে। কিন্তু একটা দোষ—তোমরা করেচ বা মিশনারীরা করেচে—সেটা হচ্চে, তাদের নিজের জাতি বা নিজের পিতৃপুরুষের ধর্মের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাবও সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেচ তাদের মনে।

—তার মধ্যে খারাপ কি আছে? ভূতপূজো গাছপূজো ছাড়িয়ে আমরা ভাল করেচি না খারাপ করেচি? কি বলতে চাও তুমি?

—তারা বড় শালগাছ দেখে তার তলায় মারাং বোঙ্গা অর্থাৎ অরণ্যদেবতার পুজো করে—বড় পাহাড় দেখে তার তলায় জিয়াং বোঙ্গা অর্থাৎ পর্বত দেবতার—

—ফেটিশ ওয়ারশিপ্—

—তোমার আমার পূর্বপুরুষও একদিন ফেটিশ ওয়ারশিপ করতে ছাড়ে নি—বেদে তার প্রমাণ আছে—তোমাদেরও পুরোনো দিনের ধর্মের মধ্যে তার প্রমাণ আছে সাহেব—ওসব কথা ছেড়ে দাও, এখন কি করতে চাও বলো—

—লরি রওনা করবো। কি করবে কংগ্রেস কুকুরেরা?

সাহেবের কথা শেষ হতে না হতে একখানা লরি এসে দাঁড়ালো বাংলোর সামনে। লোকবোঝাই লরি, কংগ্রেসের পতাকা উড়ছে, জন-ত্রিশেক লোক হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ল ফটক ঠেলে। মুখে তাদের 'বন্দেমাতরম' ও 'ইনকিলাব্ জিন্দাবাদ' ধ্বনি। সাহেব ও মিঃ শর্মার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। এবার এরা বোধ হয় সবাইকে কেটে টুকরো টুকরো

ক'রে ফেলে ঘরে আগুন দিয়ে চলে যাবে।

কিন্তু গাড়ী থেকে দলের পুরোভাগে নেমে এল একটি ছিপছিপে কালো তরুণী, খদ্দরের শাড়ী পরণে। খালি পা, হাতে একখানা মোটা খাতা। তরুণীটিকে দেখে বোঝা যায় সে হো বা মুণ্ডা জাতের মেয়ে। কিন্তু মুখখানা ও চোখ দুটি ভারি সুন্দর।

মেয়েটি এসেই ইংরেজিতে সাহেবকে বললে—তুমিই মিঃ স্পিড্? অভ্রখনির মালিক?

—হ্যাঁ।

—কোন ভয় নেই। এখানে নির্ভয়ে থাকো। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার চেষ্টা করবে না। পথে অনেক ভয়। তোমাদের মেরে ফেললে তার দায়ী হবে না আমার গবর্নমেণ্ট।

—তুমি কে জানতে পারি কি?

—আমি স্বাধীন পালামৌ আদিবাসী কংগ্রেস গবর্নমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট। আমার নাম এলিশাবা কুই। ইস্তাহারে আমারই নাম আছে। পথে বেরুলে যে বিপদের সম্মুখীন হবে, তার জন্যে আমার গবর্নমেণ্ট দায়ী হবে না বলে রাখছি। তোমাদের ভালোর জন্যেই বলচি। শোনো না শোনো তোমাদের খুশি।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্পীড পরিবারের মেয়েরা এই ব্যাপার দেখছিল। ওরা যখন মোটরে উঠে চলে গেল, তখন সাহেবের বড় মেয়ে ঠোঁট উল্‌টে বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ক'রে বললে—ফু! মাই গবর্নমেণ্ট! সাহেব বললে—I ought to talk to this bully, ram into her stupid noddle that she is a blockhead and a fool—

মিঃ শর্মা চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সাহেবদের কথা তাঁর ভালো লাগচে না। তিনি সবিনয়ে বুঝিয়ে বললেন, এখন বাংলো ছেড়ে পথে না বেরুলেই ভালো হবে। সত্যিই এ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন ভেঙে পড়েচে। তিনি তার অনেক লক্ষণ দেখেচেন রাস্তায়-ঘাটে। সাহেব বললে—এখানে থাকলে কিছু হবে না?

—আমার তাই মনে হয়।

—ওদের কথায় বিশ্বাস কি?

—আমার মনে হয় ওদের কথায় বিশ্বাস করা যেতে পারে।

—আমার সঙ্গে তুমিও থাকবে এখানে?

—যদি বলেন, থাকবো।

—পাথরবাসাতে কত টাকা মজুত?

—ন' হাজারের ওপর। ব্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। পথঘাট বন্ধ।

—টাকা এখানে নিয়ে এসো। চারটা বন্দুক এখানে।

—আনতে ভয় হয়। পথে টাকা নিয়ে বেরুতে পারবো না। সাত মাইল রাস্তা বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে।

—চলো আমি যাচ্ছি বন্দুক নিয়ে। টাকা আজই নিয়ে আসি।

—না সাহেব। তাতে বিপদ বেশি। আমি একা যাই। লোকজন কেউ কাজ করতে চাইচে না। প্রায় সবই তো পালিয়েচে। যারা আছে তাদেরও ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

মিঃ শর্মা পাথরবাসা খনিতে চলে যাবার পরে দু'দিন কেটে গেল, সাহেব চিন্তিত হয়ে পড়লো। ব্যাপার কি, ম্যানেজার টাকা নিয়ে ভাগলো নাকি?

মেমসাহেবের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সাহেব বন্দুক নিয়ে নিজেই লরি চালিয়ে বেরিয়ে গেল—তিন মাইল দূর গিয়ে জঙ্গলের পথে দেখলে এক আশ্চর্য দৃশ্য। মিঃ শর্মা হেঁটে আসছেন, সঙ্গে একজন লোক তাঁর সাইকেল ঠেলে নিয়ে আসচে, তাঁর চারিধারে ঘিরে সাত-আট জন কংগ্রেসী পুলিশ। সাহেব লরি থামিয়ে দিলে দলের সামনে। জিজ্ঞেস করলে—কি ব্যাপার মিঃ শর্মা?

মিঃ শর্মার ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটচেন। তিনি যা বললেন তার ভাবার্থ এই যে, পাথরবাসার কুলিদের সর্দার তাঁকে আক্রমণ ক'রে টাকা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। তারা বলে, সাদা ভূতের রাজত্ব শেষ হয়েছে। ওদের টাকা এখন আমাদের। নাও টাকা কেড়ে। শেষ ক'রে দাও এ কুকুরটাকে।

মিঃ শর্মা ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে গিয়ে হাতে পায়ে আঘাত পান। মারাই পড়তেন, ঠিক এই সময় এঁরা এসে পড়েন। তাই—

সাহেব বললে—এরা কে?

ওদের মধ্যে একজন সাহেবকে উত্তর দিলে—কংগ্রেস বিদ্যুৎ-বাহিনীর লোক—

আর একজন বললে—আমাদের এলাকার মধ্যে কোনো অরাজকতা হতে দেবো না—

সাহেব বললে—টাকা ঠিক আছে মিঃ শর্মা?

—পাই পয়সা।

মিঃ শর্মা খুব ভালো আর প্রভুভক্ত লোক। সাহেব তাঁকে বিশ্বাসও করতো যথেষ্ট, কিন্তু এসময় শুধু বিশ্বাস নয়, ও'র ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়েছিল সাহেবকে। কোনো দিক থেকে একটা আলু কি এক ছটাক চালও যোগাড় করা সম্ভব হ'ত না মিঃ শর্মার সাহায্য ছাড়া। সমস্ত জনমজুর চলে গেল, মোটরের ড্রাইভার চলে গেল, মেম-সাহেব ও তার দুই মেয়ে নিজেরা বড় বড় তিনটে মুলতানী গরুকে বিচালি কেটে খাইয়েচে, নিজেরা দুধ দুয়েচে—নয়তো গরুগুলো ওই ধাক্কাতে না খেয়েই মারা পড়তো।

একমাস। দুমাস।

তারপর সব ঠিক হয়ে গেল।

এলিশাবা কুই ধরা পড়লেন বাগুন্ডার ঘাটোয়ালী কাছারীতে। দলবল কিছু পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারালো, কিছু সুন্দরগড় স্টেটের অরণ্যভূভাগে গা-ঢাকা দিলে।

সেই এলিশাবা কুই।

আমার বাংলোর সামনেই মোটর থামিয়ে ও'কে এবং বাকী সকলকে নামতে অনুরোধ করলাম। কিছু না, সামান্য একটু চা। আমার বাড়ীতে অনেকগুলি মেয়ে এসে জুটে-ছিলেন এলিশাবা কুইকে দেখবার জন্যে। শাঁক বাজলো, হুলু পড়লো, খই ও ফুল ছড়ানো হ'ল। তারপর মেয়েরা হাত ধরে ও'কে অন্দরে নিয়ে গেলেন।

জনৈক কংগ্রেস-কর্মী বললেন—বেশিক্ষণ দেরি করতে পারা যাবে না মশাই, পাঁচটায় আমাদের মিটিং আছে—ও'কে নিয়ে যেতে হবে।

—যত শীগ্‌গির হয় ছেড়ে দেওয়া হবে।

—একটু বুঝিয়ে বলুন মেয়েদের—

—এখন যতই বুঝিয়ে বলি ফল হবে না। কিছু সময় যাক—

বাইরের লোকদের চা-পর্ব মিটে গেল। আধঘণ্টা সময় কাটলো। আবার ও'রা ধরলেন—আপনি একবার অন্দরে যান মশাই, আমরা আর বিলম্ব করতে পারবো না।

আমারও আর ইচ্ছে নেই দেরি করাবার। বাড়ীর সামনে লোকের ভিড় যেন ক্রমশঃ জমচে।

আমি অন্দরের দরজায় দাঁড়িয়ে শূন্যকে উদ্দেশ ক'রে হেঁকে বললাম—কই, হ'ল? ইদিকে এঁরা তাড়াতাড়ি করচেন।

কোনো উত্তর নেই।

বহু মহিলাকণ্ঠের সম্মিলিত কলরবে অন্দর সরগরম। কে কার কথা শোনে?

অসহায়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গলা ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললাম—ইয়ে—এঁরা বড্ড ব্যস্ত হয়েচেন—একটু তাড়াতাড়ি।

ষোলো-আঠারো বছরের একটি কুমারী মেয়ে এসে বললে—কি বলচেন?

—ও'কে একটু ডেকে—তুমি কোন্ বাড়ীর মেয়ে চিনতে পারলাম না তো—

—আমি রজনীবাবুর ভাইঝি—

—ও! তুমি কলেজে পড়ো?

—হ্যাঁ।

—বেশ, বেশ। মাঝে মাঝে এসো। তা ও'কে একটু ডেকে দিতে হচ্চে—এত দেরি হচ্চে কেন?

—সবাই অটোগ্রাফ নিচ্চে যে। আবার বাণী চাইচে। বিশ-পঁচিশটি কলেজের মেয়েই তো এসেচে—ওই আসচেন—

বলেই মেয়েটি ব্যস্তসমস্ত হয়ে সসম্ভ্রমে একপাশে দাঁড়ালো। এলিশাবা কুই আগে আগে হাসিমুখে, পেছনে নারীবাহিনী। এই আমি প্রথম ভালো ক'রে এলিশাবা কুইকে দেখলাম। এতক্ষণ ব্যস্ততায়, উত্তেজনায় ও ভিড়ে আমি ভাল ক'রে ওঁর মুখ দেখবার সুযোগই পাই নি।

আমি চমকে উঠি। হঠাৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে যাই। খুব আশ্চর্য হয়ে যাই।

আমার একেবারে সামনে যখন উনি এসেচেন, তখন আমি বললাম হিন্দিতে—দয়া ক'রে আসুন বাইরে। বড় তাড়াতাড়ি করচেন ওঁরা।

এলিশাবা কুইয়ের মুখশ্রী অতি সুন্দর। এদেশের আদিবাসিনী বন্য রমণীদের সুঠাম দেহসৌষ্ঠব ও শান্তপেলব লাবণ্যমাখা মুখশ্রী এখনো ওঁর বজায় আছে। উনিও এই সময় আমার দিকে চাইলেন। একটু বেশিক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। পেছনে মেয়েদের ভিড়। কিছু বলার সুযোগ হ'ল না। বাইরে নিয়ে এসে মোটরে ওঠাবার সময় সুযোগ ঘটলো, মিনিট খানেকের জন্যে। বললাম—বলিবায় ছিলেন? বলিবার জঙ্গলে?

উনি চমকে উঠলেন। আমার দিকে ভালো ক'রে চাইলেন। ওঁর মুখে বিস্ময় ও সংশয় মাখানো।

বললাম—তা'হলে আপনিই সেই! মনে পড়েচে?

উনি আশ্চর্য হওয়ার সুরে বললেন—আপনি?

কথা সবই হিন্দিতে।

বললাম—চিনেচেন? মনে পড়ে সেই ওভারসিয়ার নিকোডিম কারকাট্টা?

—হ্যাঁ।

—কাজ সেরে আসুন সন্দেবেলা। কথা কইবো অনেক।

—সেই ভালো।

সবাই ও'কে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। এলিশাবা কুই! এলিশাবা কুই! কি আশ্চর্য—শুধু বসে বসে ভাবি। এলিশাবা কুই তো নয়, ওর নাম চম্পু। কি আশ্চর্য লাগচে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা।

কুড়ি বছর আগের কথা।

আমি তখন সবে বছর-দুই হ'ল ময়নামতী সার্ভে স্কুল থেকে পাশ ক'রে ভাগ্যপরীক্ষার জন্যে বাইরে বেরিয়েছি।

আমার বয়েস বাইশ-তেইশ। 'পি ডবলিউ ডি'র সামান্য চাকরি করি।

বলিবা থেকে কামারবেড়া পর্যন্ত রাস্তা তৈরী হচ্ছিল ঘন সারাণ্ডা অরণ্যের মধ্যে দিয়ে।

বলিবা একটি বন্য গ্রামের নাম, লোকসংখ্যা হয়তো ছিল পঞ্চাশ কি তেষট্টি, গুনে দেখি নি কখনো। তবে এই রকমই হবে। গ্রামের সামনে পাহাড়, ডাইনে-বাঁয়েও পাহাড়, পেছনে গভীর জঙ্গল। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে যে সামান্য সমতল জমি, তাতেই গ্রামের লোকে ভুট্টা, জনার, শকরকন্দ আলু, টক পালং ও টোমাটোর চাষ করে।

আজ বেশ স্পষ্ট মনে হচ্ছে বলিবা গ্রামের ছবি। প্রথম যৌবনের স্বপ্নময় কর্মস্থল। তারপর এই কুড়ি বছরে কত জায়গা দেখলাম, সামান্য রোড্-সার্ভেয়ার থেকে এখন আমি একজন ধনী কনট্রাক্টর, কত কি ঘটে গেল জীবনে। কত অসম্ভব সম্ভব হ'ল। কিন্তু বলিবা গ্রামের কথা, তার সেই মাকা হো'র পেঁপে বাগান, ছোট্ট উসুরিয়া ঝর্ণার কলকল জলস্রোত, বোঙ্গা, পুজোর প্রকাণ্ড জগহরি গালগাছটা, সন্ধ্যাবেলায় মাকা হো'র উঠানের পুরু শালকাঠের পালিশবিহীন, অসমতল বেঞ্চিতে বসে চা-পান ও গল্প—কখনো ভুলবো এসব?

বলিবা গ্রামে প্রথমে আমার বাসস্থান ছিল না। বলিবা-কামারবেড়া রাস্তা জঙ্গল কেটে তৈরি হচ্ছিল বন-বিভাগ থেকে। তাঁদের কর্মচারীরা পি. ডবলিউ. ডি'র কাছে আমাকে হাওলাত চান রাস্তা করবার সময়। তিন মাসের জন্যে আমাকে হাওলাত দেওয়া মঞ্জুর করা হয়। সেই সূত্রেই আমাকে যেতে হয়েছিল এবং এগারো মাইল দূরবর্তী জেরাইকেলা থেকে সাইকেলযোগে এসে রোজ কাজ করতাম। সার্ভের কাজ শেষ হয়ে গেল। রাস্তা তৈরী আরম্ভ হ'ল। তবু আমাকে যেতে হ'ত, কতখানি হয়েচে সেটা

তদারক করতে।

ভীষণ জঙ্গল। বড় বড় গাছ পড়েছিল রাস্তার জন্যে নির্দিষ্ট জমিতে। কুলিতে গাছ কাটছিল, পাহাড়ের গা কাটছিল রাস্তা বের করতে, বড় বড় পাথরের চাঁই রাস্তায় এসে পড়ছিল, হো কুলি মেয়েরা মাথায় ঝুড়ি নিয়ে পাথর ও মাটি বইছিল!

সে-জঙ্গলে বুনো হাতী ও বাঘ ঘোরে রাত্রে। আমাদের নতুন তৈরী রাস্তার ওপর বুনোহাতীর পায়ের দাগ। কি বিরাট শাল গাছ এক একটা। দেড়শো-দুশো বছরের পুরোনো। কুলি ও কুলিনীরা না বোঝে বাংলা, না বোঝে হিন্দী—হো ভাষা ছাড়া কিছু জানে না। খাবার কিছু মেলে না, কেবল মকাই আর জনার।

একজন ওভারসিয়ার ছিল হো খৃষ্টান, নাম নিকোডিম কারকাট্টা। লোকটা বনবিভাগের কর্মচারী, রাস্তার কুলিদের কাজ তদারক করতো আর কুলিদের প্রতি কি গালমন্দ, মারধোর করতো! মেয়ে-কুলিদের ওপরও এইরকম দেখে একদিন আমার ভারি রাগ হ'ল। সে কি অকথ্য ভাষায় গালাগাল, চাবুক উঁচিয়ে মারতে যায় মেয়েদের, পাথরের ঝুড়ি বইছে মাথায় নিয়ে, দিলে সজোরে ধাক্কা, ঝুড়িসুদ্ধ ছিটকে পড়ে গেল একটি মেয়ে কুলি।

আমি বললাম—ও কি হচ্ছে?

নিকোডিম রেগে উঠে বললে—কি?

—কি দেখতে পাচ্চ না? মেয়েদের অমন ক'রে ধাক্কা দেয়? ছিঃ!

—ওরা কাজ করচে না।

—তা বলে তুমি মারবে ওদের?

যে মেয়েটিকে ধাক্কা মারা হয়েছিল, সে দাঁড়িয়ে উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়ছিল, নিকোডিমের ভয়ে সবাই সেখানে জুজু, কারো কিছু বলবার সাহস নেই। আমি যখন নিকোডিমকে তিরস্কার করছি, তখন অন্য সকলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ছিল। আমার বকুনি খেয়ে নিকোডিম সেখান থেকে এগিয়ে পাহাড়ের নীচে রাস্তার ও-বাঁকে চলে গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু তখুনি মিটলো না। নিকোডিম সেদিন থেকে আমার শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। ওসব জঙ্গলের মধ্যে ওদের সাহায্য ভিন্ন খাবার যোগাড় করা মুশ্‌কিল। ও গ্রামে বারণ ক'রে দিলে—আমি দুধ পাই নে, ডিম পাই নে। বন-বিভাগের কর্মচারীদের জন্যে বলিবা গ্রামে গবর্নমেণ্টের তৈরী ঘর আছে। সেখানে যাতে আমি রাত্রে আশ্রয় না পাই, তার ব্যবস্থাও করলে। ফলে এই দাঁড়ালো কাজ করতে করতে যদি বেলা যেতো, সূর্য অস্ত যাবার যোগাড় করতো পশ্চিমের বন পাহাড়ের ওপারে—আমায় সাইকেলে ফিরতেই হ'ত বন্যজন্তু-অধ্যুষিত বনপথ ধরে এগারো মাইল দূরবর্তী জেরাইকেলায়। আশ্রয় বা খাদ্য কিছুতেই মিলতো না নিকটে কোথাও।

আমার ভয় করতো না বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। সাত মাইল দূরে কেরুকোচা নালার ধারে বেলা একদম পড়ে আসতো, অন্ধকার দেখাতো পাহাড়ী ঢালুর ঘন শাল জঙ্গল। বড় বড় আসান গাছগুলো দেখাতো ভূতের মত, শুকনো পাতার শব্দ শুনলে মনে হ'ত বাঘ বেরিয়েচে, প্রত্যেক বাঁকে মনে হ'ত আধ-অন্ধকারে বুনো হাতি রাস্তা বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—সাইকেলের সঙ্গে তাল লাগাবে বুঝি—তবুও যেতে হয়েচে বাধ্য হয়ে।

একদিন সম্বর হরিণের একটা দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, আর দেখতাম বন-মোরগ ঝট্‌পট ক'রে সামনের রাস্তার ওপর থেকে উড়ে গেল; দেখতাম ময়ূর রাস্তা পার হয়ে এদিকের বন থেকে ওদিকের বনে যাচ্ছে। দেখতাম দু'-একটা কোৎরা সরু সরু পায়ে ভর দিয়ে পালাচ্ছে, কিন্তু কোন হিংস্র জানোয়ার চোখে পড়ে নি।

দিন পনেরো কাটলো।...

দুপুরবেলা একদিন পাহাড়ের নিচে তেপায়ার ওপর টেবিল বসিয়ে জরীপের নক্সা দেখছি, এমন সময়ে কোথা থেকে একখানা পাথর গড়িয়ে এসে পায়ে বিষম চোট লাগলো। দুটো আঙুল ছেঁচে রক্ত পড়তে লাগলো। আমি দু'হাতে পা চেপে ধরে তখুনি বসে

পড়লাম—দাঁড়াবার ক্ষমতা রইল না।

কিছুদূরে কুলিরা কাজ করছিল, ওরা ছুটে এল। ওদের মধ্যে একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি নিজের শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে আমার পা বেঁধে দিলে। আমি সেখান থেকে উঠতেই পারলাম না, যখন অতি কষ্টে উঠলাম তখন দেখি সাইকেল চালিয়ে যাবার ক্ষমতা হারিয়েছি।

বেলা গেল, সূর্য ঢলে পড়লো বনের ওপারে। সেটা ছিল মাঘ মাসের মাঝামাঝি, শীতও তেমনি নামলো সেদিন সূর্য বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই।

মহাবিপদে পড়ে গেলাম। কুলির দল তো আর একটু পরেই পালাবে। বনবিভাগের লোকেরা আমাকে সহানুভূতির চক্ষে দেখে না নিকোডিমের ভয়ে। ওদের তাঁবুতে আমার প্রবেশ নিষেধ। আমি এখন যাই কোথায়?

কুলিরা কাজ শেষ ক'রে দলে দলে পাহাড়ের ওপারের রাস্তা বেয়ে বলিবা গ্রামের দিকে চললো। আমার অবস্থা কি তা অনেকেই জানে না। কাকে বা বোঝাই, কি বা বলি। হো ভাষা তেমন আয়ত্ত করতে পারি নি, দু'একটি কথা ছাড়া।

এমন সময়ে সেই মেয়ে কুলির দল আমার সামনে দিয়েই নীচে থেকে ওপরে উঠচে। কাজ করতে করতে ওরা রাস্তার নীচের দিকে নেমে গিয়েছিল। আমার কাছে যখন দলটি পৌঁচেছে তখন একটি মেয়ে দল ছেড়ে দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। চেয়ে দেখলাম ওর দিকে, এই মেয়েটিই আমার পায়ে ওর শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে বেঁধে দিয়েছিল। আরও আমার মনে হ'ল, নিকোডিম সেদিন একেই ধাক্কা মেরেছিল। যখন ও আমার পায়ে ওর শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে বাঁধে, তখন যন্ত্রণার চোটে কারো মুখ ভালো ক'রে দেখার অবস্থা ছিল না আমার। তখন চিনি নি।

ও বললে—জুম্ পে?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, বুঝি নে ওকথা। হাত দিয়ে দেখালাম পায়ের ঘা। ওর মুখের দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম আমি সাইকেলে উঠতে পারবো না। পায়ে ব্যথা।

এতদিন পরেও একটা কথা আমার মনে আছে, মেয়েটির বড় বড় কালো চোখের সে অদ্ভুত স্নেহ ও সহানুভূতি-ভরা চাউনি! সে-চাউনি কখনো ভুলবো না। আমি এদের কাছে আশা করি নি এরকম চাউনি। কেননা বাংলাদেশ থেকে নতুন এসেছিলাম, বন্য জাতিরা মানুষই না, ওসব একরকম কিম্ভূতকিমাকার জীব—এই ছিল আমার ধারণা ওদের সম্বন্ধে। তাদেরই একটি মেয়ের চোখের চাউনির মধ্যে দিয়ে আমারই মা বোন উঁকি মারবেন, একেবারে সুস্পষ্ট ভাবেই উঁকি মারবেন—দেখবার আগে সে বিশ্বাস আমার হ'ত না।

আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম। তার চেয়েও বিস্মিত হবার কারণ ঘটলো যখন সে এসে আমার হাত ধরে তুলবার চেষ্টা ক'রে বললে—নাকি ওকু দিইসানা, জুম্ পে?

আমি ঠেলে উঠলাম—দাঁড়ালাম অতি কষ্টে।

কি বলচে মেয়েটি? কি একটা প্রশ্নের সুর ওর কথায়, কি প্রশ্ন? ঘাড় নেড়ে বোঝালাম বুঝি না ওর কথা।

তারপর মেয়েটি যা করলে, তা যে কত বিস্ময়কর হয়েছিল তখন আমার কাছে! মেয়েদের কি বললে ও। আমার চারিপাশ ঘিরে ওরা দাঁড়ালো এসে। দু'তিনজনে শক্ত ক'রে আমার বগল ও হাত ধরলে। মেয়েটিও ধরেচে ডান হাত। চললাম ওদের সঙ্গে। আমাদের পেছনে পেছনে একটি মেয়ে সাইকেলখানা ঠেলে নিয়ে আসতে লাগলো।

জঙ্গলের ধারে বলিবা গ্রামের একটি ঘরে ওরা আমায় নিয়ে এল। পরে গৃহস্বামীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার নাম মাকা হো, বলিবা গ্রামের মন্ডল। শালকাঠের খুঁটি ও আড়ালাগানো একখানা কুঁড়েঘর, না তার জানালা, না দরজা—ঘরের সামনে শালকাঠের তক্তা সোজা ক'রে পুঁতে বেড়া দেওয়া। ওরকম ঘরে কখনো বাস করি নি। তেমনি শীত এখন এই বনের মধ্যেকার গ্রামে। চীহড় লতার ছালের দড়ি দিয়ে ছাওয়া একখানা খাটিয়াতে ঘরের চরখা-কাটা মোটা সুতো দিয়ে বোনা একখানা চাদর পেতে দিলে, শতরঞ্জির মত পুরু।

সেই মেয়েটি আমায় শুইয়ে রেখে চলে গেল। সবাই চলে গেল।

আমি একা ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে শালকাঠের মোটা মোটা আড়া লক্ষ্য করতে লাগলাম। সেই জন্যে শালকাঠের আড়ার কথা আমার বড় মনে আছে। অসহায় অবস্থায় চুপ ক'রে শুয়ে আছি, দূর এক বন্যগ্রামে, বন্য জাতিদের মধ্যে। কি আমার উপায় হবে এখানে, কি করি এখন, এমন সতেরো হাত জলের তলায় পড়ে যাবো বিদেশে এসে তা কখনো ভাবি নি। ভয়ও হ'ল, এ ঘরে তো দরজা নেই, নিকটেই বন, গভীর রাত্রে বাঘ ভালুক ঘরে ঢুকবে না তো? প্রায় দু'ঘণ্টা কেটে গেল। অন্ধকারেই শুয়ে আছি। বাইরে কিন্তু চাঁদনী রাত, তবে শুক্লপক্ষের প্রথম দিক, জ্যোৎস্নার তেমন জোর নেই। আকাশে মেঘ হওয়ার জন্যেও সেটা হ'তে পারে—আমার ততটা মনে নেই।

হঠাৎ দোর দিয়ে কে ঘরে ঢুকলো, কবাটহীন দোর, যে কেউ যেতে-আসতে পারে।

চমকে বাংলায় বললাম—কে?

মৃদু নারীকণ্ঠে উত্তর এল—চম্পু—

মেয়েটি আমার ভাষা বোঝে নি। কিন্তু আমার প্রশ্নের সুরে স্বভাবতঃই তার মনে হয়েচে ঘরে কে ঢুকলো তাই আমি জিজ্ঞেস করচি, সুতরাং সে তার নাম বলেচে।

এই প্রশ্নোত্তরের অভিনবত্বের জন্যেই চম্পু নামটা হঠাৎ এমন মিষ্টি লাগলো। অনার্য নাম নয় বলেও বোধ হয়। কারণ আমি জানি ও-অঞ্চলে মেয়েদের নামের মধ্যে কমনীয়তা খুঁজতে গেলে বড্ড নিরাশ হতে হবে।

ভাষা জানিনে, সুতরাং চম্পু নামটার ওপরই একটি সম্পূর্ণ বাক্যের জোর দিয়ে আবার প্রশ্ন করলাম—চম্পু?

—হোই।

অর্থাৎ 'হাঁ'।

—খিদে পেয়েছে—

সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাত দিয়ে খাওয়ার অভিনয় করলাম। মেয়েটি হেসে ঘর থেকে বার হয়ে গেল এবং আধঘণ্টাটাক পরে কতকগুলো শকরকন্দ আলুসিদ্ধ শালপাতায় জড়িয়ে নিয়ে এল। চা খাবার বড় ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই মেয়েটিকে তা বোঝানো আমার দুঃসাধ্য-জ্ঞানে সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম না।

মেয়েটি তখন চলে গেল। আবার আধঘণ্টা পরে ঘরে ঢুকলো, শালকাঠের আগুন জ্বালিয়ে দিলে ঘরের ঠিক মাঝখানে। ছোট একখানা তুলোর লেপ আমায় দিয়ে গেল রাত্রে গায়ে দেবার জন্যে।

আমি প্রশ্নের সুরে বললাম—চম্পু?

একটিমাত্র কথাই জানি, যতক্ষণ এবং যত রকম ভাবে সম্ভব সেই কথার সদ্ব্যবহার করি।

মেয়েটি একবার হেসে ফেললে আমার সামনেই। বলে হোই।

আমার হো ভাষার দৌড় বোধ হয় বুঝতে পেরেচে।

ঘরে আগুন জ্বললে আমি চম্পুকে ভালো করে দেখতে পেলাম। এ সেই মেয়েটি, যাকে নিকোডিম ধাক্কা মেরেছিল। বেশী ওর বয়েস নয়, পনেরো ষোলোর বেশি হবে না, সুন্দর মুখশ্রী। এই বন্য দেশে এমন মেয়ে আছে জানতাম না। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি তীক্ষ্ম বুদ্ধি। বাংলাদেশের যে কোনো স্কুল কলেজের মেয়ের মত।

একটু পরে মাকা হো ঘরে ঢুকলো। পঞ্চাশ ছাড়িয়েচে বয়েস, এখনো দিব্যি সরল। মাকা হো ঘরে ঢুকেই হিন্দিতে বললে—কেমন আছ?

আমি মহা খুশি হয়ে বললাম—বাঁচলাম। হিন্দি জানো দেখছি—

—বাংলা ভি জানে। কিছুটা বুঝচে।

—বাঃ বাঃ—বেঁচে থাকো। নাম কি তোমার?

—মাকা হো—

—এ গ্রামের নাম কি?

—বাঁলিবা আছে।

—শোনো মাকা হো, তোমাকে বাংলা শেখাই ভালো ক'রে। এখানে 'আছে' অনাবশ্যক ক্রিয়াপদ। শুধু 'বলিবা' বললেই হ'ল। বুঝলে? এরপর ওরকম আর বলবে না।

মাকা হো আমার বৈয়াকরণিক আলোচনা বুঝলে না। না বুঝেই বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলো।

হিন্দিতে বললাম—চম্পু তোমার মেয়ে?

—না। ওর কেউ নেই কেবল এক বুড়ি দিদিমা ছাড়া। এ গাঁয়ে ওদের বাড়ীও নয়। করমপদা থেকে এসেচে।

—বড় ভাল মেয়ে।

—সবাই ওকে ভালো বলে।

চম্পু মাকা হোকে কি বললে। মাকা আমার দিকে চেয়ে বললে—চম্পু বলচে এ গাঁয়ে তোমাকে কিছুদিন থাকতে হবে।

—ওকে বলো, এখানে দেখবে কে?

—চম্পু বলচে, ও দেখবে।

—আমাকে রেঁধে খাওয়াবে?

—বলচে য—া কিছু দরকার সব করবে। শোনো তোমায় বলচে এখন ঘুমিয়ে পড়ো। আমরা যাই। কাল সকালে তোমার পায়ে ওষুধ বেটে দেবে বলচে।

—আমি চম্পুকে ধন্যবাদ দিচ্চি। ও আমার বোনের মত।

—ও বলচে, তুমিই ওকে নিকোডিমের হাত থেকে বাঁচিয়েচ।

—বলো, সে আমার কর্তব্য কাজ। করা উচিত তাই করেচি।

—চম্পু বলচে, কোনো ভয় নেই তোমার। তোমার পা ও সারিয়ে দেবে। তুমি যতদিন সেরে না ওঠো, নিভাবনায় এখানে থাকো। তোমার কর্তব্য তুমি করেচ, ওর কর্তব্য ও করবে।

সেই রাত্রিটির কথা আজও ভুলি নি। ওরা চলে গেল। আমি একা শুয়ে রইলাম। নতুন জায়গা, বনের মধ্যে গ্রাম। দরজার কপাট নেই। নানারকম শব্দ বনের মধ্যে সারা রাত. গ্রামের অদূরেই নিবিড় অরণ্য। বন্যকুক্কুটের ডাক শুনচি, কোৎরা ডাকছে, ঘুম আর আমার আসে না। ঘরের পেছনে খসখস শব্দ হয়, আমি অমনি চমকে উঠে ভাবি এ বোধ হয় ভালুকের পায়ের শব্দ। গভীর রাত্রে দূরে দূরে কোথায় বন্য হস্তীর বৃংহিত কানে গেল। কত রকম ভয়ে যে রাত কাটলো—ঘুমিয়ে পড়লাম একেবারে ভোরবেলা। জেগে উঠে দেখি রোদ উঠে বেশ বেলা হয়েচে, চম্পু এসে ডেকে উঠিয়েচে, বিছানার পাশেই সে দাঁড়িয়ে, হাতে ওষুধ বাটা।

ও আমার পা বেশ ভাল ক'রে টিপে টিপে দেখলে। একবার জোর ক'রে টিপতে আমি যন্ত্রণায় 'উঃ' ক'রে উঠলাম। আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—জুম্ পে?

পরে জেনেছিলাম এর মানে—পায়ে লাগচে?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম—ও বুঝিনে।

হাত দিয়ে দেখিয়ে বললাম মুখ ধোয়ার জল আনতে। চম্পু জল নিয়ে এল। নতুন ওষুধ বাটা আমার পায়ে লাগিয়ে দিলে এবং একটা জামবাটিতে কি একটা জিনিস আনলে. শালপাতা দিয়ে ঢাকা।

হাত দিয়ে দেখিয়ে বললাম—কি ওতে?

—মান্তি।

তার মানে বুঝলাম না।—দেখি বাটি নিয়ে এসো—

চম্পু আমার ইঙ্গিত বুঝে বাটি নিয়ে এল. ও হরি—এক বাটি ভাত! আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—মান্তি?

চম্পু হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ে আর কি! সে আমার ভাষাজ্ঞানের দৌড় বুঝে নিয়েচে। হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে বললে—হোই। এইভাবে ও আমার মনের ভাব আন্দাজে বুঝে নিত. আমি বুঝে নিতাম ওর।

সেই ঘরে কেটেছিল দশ দিন। চম্পু কি সেবাটাই করেছিল এই দশ দিন। ভাষা না

বুঝলেও আমি ওর ভালোবাসা বুঝতাম, নয়নের স্নেহদৃষ্টি বুঝতাম। আমি ওর হাত দুটি ধরে একবার আবেগের মাথায় বলেছিলাম—চিরকাল মনে থাকবে তোমার কথা চম্পু। কখনো ভুলবো না তোমায়।

চম্পু কিছু চায় নি আমার কাছে। যা করেছিল, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে। এমনি দুর্লভ মন ছিল ওর। আমিও তখন গরীব, তবুও আসবার দিন সাইকেলে ওঠবার সময় ওকে আমার হাতঘড়িটা দিতে গিয়েছিলাম, ও নেয় নি। আমার জামার বোতাম দেখিয়ে বললে—ওটা নেবে। মাকা হো'কে বললাম—বুঝিয়ে দাও, এ সোনার নয়, পেতলের ওপর গিল্টি করা। এর দাম ছ'আনা পয়সা। এ নিয়ে কি হবে?

চম্পু শুনলে না, বললে—না, বোতাম নেবো।

সরলা হো বালিকা। যা চায় তাই দিলাম, ছ'আনা পয়সার চারিটি পেতলের বোতাম। অনেক দিনের কথা হয়ে গেল সে-সব। মধ্যে অবস্থা যখন দিনকতক খুবই খারাপ হয়ে গেল, রাস্তার কনট্রাক্‌টরি করতে গিয়ে গরবাই-নালার সিমেণ্টের সেতু দু-দুবার জলের তোড়ে ভেঙে গেল, সাড়ে তিন হাজার টাকা আমার পুঁজি থেকে বেরিয়ে গেল, জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো পাওনাদারের অত্যাচারে—তখন সামনে দেখলাম সর্বস্বান্ত হওয়ার পথ জেলের ফটক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে—কতবার তখন ভেবেচি, সব ফেলে পালিয়ে যাবো বলিবা গ্রামে মাকা হো'র বাড়ী। সেই ঘন অরণ্যে শালফুলের আলস্য-মাখানো দিনগুলিতে চম্পু হো'র সঙ্গে নীরব ভাষার কথোপকথন। সেই নির্জন রাত্রিগুলির নিবিড় মোহ।...

বছরের পর বছর কেটে গিয়েছিল।

বাড়ী গাড়ী করেছিলাম, বড়লোক হয়েছিলাম।

চম্পুর দেখা পাই নি, আজকার দিনটা ছাড়া।

কিন্তু এ কোন্ চম্পু? এ ইংরিজি বলে, মোটর চড়ে, সভায় হিন্দিতে বক্তৃতা দেয়। সেই সরলা বালাকে এর মধ্যে কোন দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবুও উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম সন্ধ্যার জন্যে।

এলিশাবা কুই এলেন সন্ধ্যার একটু পরে। কেউ ছিল না ঘরে।

বললাম—মনে পড়ে?

হেসে বললে—সব।

—চম্পু, তোমার কাহিনী কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি জানি তাই, না জানলে অবিশ্বাস করতাম। কি করে এমন হ'লে? বলিবা ছাড়লে কেন? লেখাপড়া শিখলে কোথায়?

—দশ মিনিটের জন্যে এসেছি। অন্য সময় শুনবে। মিশনারি স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করি। আমাদের গ্রামের হো পাদ্রী আমাকে রাঁচী নিয়ে যায়। মাকা মারা গেল, কেউ ছিল না গাঁয়ে, কে আশ্রয় দেয়? রাঁচীতে বললে, খৃষ্টান হ'লে সব সুবিধে ক'রে দেবে। সত্যি বলচি, এখন এসব ফেলে চলে যেতে ইচ্ছে করে বলিবা গাঁয়ে। আগস্ট আন্দোলনের পরে জেলে বসে বসে শুধু বলিবার কথাই ভাবতাম।

—আর কোনো কথা মনে পড়তো না?

চম্পু কৃত্রিম রাগের সুরে বললে—না। কি কথা মনে পড়বে? মান রেখে কথা বলতে শেখো। জানো আমি কে?

আমি পাল্টা রাগের সুরে বললাম—বেশ। দাও আমার বোতাম ফেরৎ—

চম্পু খিল্ খিল্ ক'রে হেসে বললে—কাল আসবো। মোটর দাঁড়িয়ে আছে। একটা ছুতো ক'রে এসেছি।

তারপর একটু থেমে বললে—বোতাম নিয়ে আসবো। হারাই নি।

আমার ছেলেবেলায় মহকুমার শহরে যখন স্কুলে পড়তাম তখন নীলমণি মল্লিক মশায়কে দেখতাম দামী শাল গায়ে দিয়ে বেড়াতেন, শহরের একজন নাম-করা উকিল। আমরা তখন তাঁকে ভয় ক'রে চলতাম, আমাদের স্কুলে মাঝে মাঝে এসে তিনি আমাদের পরীক্ষাও নিতেন।

নীলমণি মল্লিক সে সময়ে শহরের একজন বিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সকলে তাঁকে সম্মান করে, ভয় করে। নীলমণি বাবুর কাজকর্ম ঘড়ির কাঁটার মত চলে। সকালে উঠে তিনি প্রাতর্ভ্রমণে বার হবেন, ফিরবার পথে মুন্সেফবাবু ও মহকুমা হাকিমের বাড়ী ঘুরে কুশল জিজ্ঞাসা ক'রে আসবেন। হয়তো বসে ও'দের ওখানে একপেয়ালা চা খেয়েও আসতে পারেন। এর নাম হাকিমকে তুষ্ট রাখা। এতে ক'রে শহরে অনেক সুবিধে আছে, বিশেষ ক'রে মহকুমার মত জায়গায়, যেখানে এই হাকিমেরাই সব।

সেবার দীনবন্ধু সেন ডেপুটি বাবুর মেয়ের বিয়েতে নীলমণি বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই বিয়ের রাতে বরযাত্রী অভ্যর্থনা থেকে আরম্ভ ক'রে রান্নার চালায় গিয়ে মাছ-ভাজার তদারক করা পর্যন্ত—সমস্ত কাজ নিজে যেমন উৎসাহ নিয়ে করেছিলেন, মেয়ের বাপ দীনবন্ধু সেন ডেপুটিও তেমন করতে পারেন নি।

পরের দিন বার লাইব্রেরীতে এজন্যে তাঁর সতীর্থ উকিল রামজয় বাঁড়ুয্যে নাকি বলেন, কি হে, কাল কর্মকর্তা তুমি না দীনবন্ধুবাবু বোঝাই যাচ্ছিল না—

নীলমণি বাবু জানতেন তাঁর এই হাকিম-তোষণের নীতি অনেকে এখানে ভালোচোখে দেখে না, আগে দেখতো এবং সেজন্য নীলমণি বাবুকে সাধারণে খাতিরও করতো কিন্তু এখন পড়েছে স্বদেশীর যুগ, সুরেন বাঁড়ুয্যে দেশটাকে উচ্ছন্ন দিয়ে দিলে আর কি—এখন হাকিমের বাড়ী বেশী যাতায়াত নাকি তত সম্মানজনক নয়।

নীলমণি বাবু রাগের সুরে বললেন—মানে?

—মানে কাজের বড্ড আঁটা দেখাচ্ছিলে কিনা তাই বলছি—

—তাতে তোমার কি?

—না, আমার কিছু না। সকলেই বলছিল তাই—

আমি একথা শুনেছিলাম রামজয় বাবুর ছেলে নীরদের মুখে, সে আমার সহপাঠী ছিল। লোকে যে যা বলুক, নীলমণি বাবু গ্রাহ্য করেন না। তিনি আজ পনেরো বছর ধরে এই হাকিম-তোষণের ফলে সরকারী হাসপাতালের কমিটির সদস্য, পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সহকারী সভাপতি, লোকাল বোর্ডের সহকারী সভাপতি, চৌকিদারী কমিটির সদস্য প্রভৃতি বহু সম্মানজনক পদে গবর্নমেণ্ট থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দানশীল বলেও তাঁর একটা খ্যাতি আছে তবে ব্যাপারগুলো গবর্নমেণ্ট-ঘেঁষা হলেই তিনি চাঁদা দিয়ে থাকেন। গবর্নমেণ্ট দাতব্য হাসপাতালে একটা উইং বাড়ানোর জন্যে গবর্নমেণ্টের হাতে তিনি সাড়ে চার হাজার টাকা সেদিন দিয়েচেন। এই রকম আরো অনেক আছে। তিনি গবর্নমেণ্ট প্লীডারও বটে আজ আট ন' বছর ধরে। গবর্নমেণ্ট প্লীডার একটা কতবড় সম্মানজনক পদ, যদিও এই ছোট মহকুমার শহরে গবর্নমেণ্ট প্লীডারের বিশেষ কাজ যে কিছু আছে তা নয়, তবে ওই যে বললাম একটা মস্ত সম্মান। সকলে তো গবর্নমেণ্ট প্লীডার হতে পারে না। নীলমণি বাবুর ছাপানো চিঠির কাগজে লেখা আছে "এন. মল্লিক, বি. এল—গবর্নমেণ্ট প্লীডার।" সম্মানও তিনি পেয়ে এসেচেন খুব। দু-তিনটি স্থানীয় স্কুলের তিনিই হর্তাকর্তা। মোটা বাঁধানো মলক্কা বেতের ছড়ি হাতে ক'রে যখন তিনি রাস্তায় বেড়াতে বেরোন, তখন সকলেই সম্ভ্রমের সুরে তাঁর সঙ্গে কথা বলে। লোককে জব্দ করতেও তিনি অদ্বিতীয়, টুক্ ক'রে কোথায় কি লাগালেন, তার পরদিন থেকে তার পেছনে পুলিশ লেগে গেল।

একটা উদাহরণ দিলে এখানে বোঝা যাবে ব্যাপারটা।

শহরের বাজারে রামনাথ দাঁ তখন বড় ব্যবসাদার। তার ছেলে শিবু খুব শৌখীন মেজাজের লোক, বড়লোকের অপদার্থ ছেলে যেমন হয়ে থাকে। মদ, গাঁজা, গুলি খায়—

মাসের মধ্যে দশবার কলকাতায় ছোটে ফুর্তি করবার জন্যে। বাপের পয়সা দু'হাতে ওড়ায়। রামনাথ দাঁ ওকে টাকা দিতো না, টাকা দিতো ওর ঠাকুরমা।

সেদিন নীলমণি বাবু বেতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বেড়িয়ে ফিরচেন, ঠিক সেই সময় শিবু সদ্য ঘুম ভেঙে উঠে তাদের বাড়ীর দরজায় বসে বিড়ি টানচে। তিনি যখন খুব কাছে এসে পড়েচেন, তখনও বিড়ি ফেলে দেবার বা লুকিয়ে ফেলবার কোন আগ্রহই তার দেখা গেল না, অথচ সে তাঁকে দেখতে পেয়েচে। নীলমণি বাবু আরও কাছে এসে পড়লেন, আর হাত বিশ-ত্রিশ দূর, তখনও শিবু বিড়ি খাচ্ছে। তারপর যখন একেবারে তার সঙ্গে একই সরলরেখায় এসে পড়লেন নীলমণি বাবু, তখন শিবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আধপোড়া-বিড়ি সমেত হাতটা একবার পেছন দিকে নিয়ে গেল মাত্র।

রাগে ও অপমানে নীলমণি বাবুর আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠলো।

এতবড় স্পর্ধা শিবু দাঁর! ওর বাপ রাস্তা-ঘাটে দেখা হ'লে মাথা নীচু ক'রে প্রণাম করে, রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে চলে যায়—আর ও কি না—

বজ্রগম্ভীর সুরে হে'কে বললেন, এই শিবে—

শিবু বললে—আজ্ঞে, আমায় বলচেন?

তখনও সে রোয়াকে বসেই আছে।

—হ্যাঁ, তোমাকেই বলচি।

—বলুন—

নীলমণি বললেন—তুমি না কালকের ছেলে? গুরুজনদের সামনে কি ভাবে চলতে হয় তোমার বোঝা উচিত।

শিবুর অদৃষ্টে দুঃখ ছিল, সে উত্তর ক'রে বসলো—কেন, আমি কি করলাম? বারে! আপনি যাচ্চেন রাস্তা দিয়ে, আমি বসে আছি আমার বাড়ীতে। কি দোষ হ'ল এতে?

নীলমণি মল্লিকের স্বর অতিমাত্রায় কঠোর হয়ে পড়লো। বললেন—কি দোষ হয়েছে? দেখতে পাচ্চ না এখনো? আচ্ছা, দেখতে পাবে।

শিবু ভয় পেয়ে চুপ ক'রে গেল। নীলমণি বাবু অধিকতর দ্রুতবেগে সেখান থেকে চলে এলেন।

এরপরে থানা থেকে দারোগা এসে রামনাথ দাঁয়ের বাড়ী সার্চ করলে, শিবুকে ধরে নিয়ে গেল হাজতে। সে নাকি কি স্বদেশী হাঙ্গামায় জড়িত আছে। রামজয় বাঁড়ুয্যে জামিনের দরখাস্ত ক'রে নিরাশ হলেন। শিবু হাজতে দু-দিন দু-রাত কাটালে। শহরময় শোরগোল পড়ে গেল। এই সময় ঘুঘু রামজয় উকিলের পরামর্শে রামনাথ দাঁ গিয়ে নীলমণি মল্লিকের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লো। বাস্, সব ঠাণ্ডা।

এ সব আমার স্কুল-জীবনের সমসাময়িক ব্যাপার।

তারপর নীলমণি মল্লিক আরও বড় হয়ে উঠলেন মহকুমার শহরে। সব সভাতেই তিনি, সব সমিতিতেই তিনি। সব প্রতিষ্ঠানের তিনি হর্তাকর্তা। গবর্নমেণ্টের খেতাবও পেলেন নববর্ষের এক শুভদিনে। তিনি আরও উদার হয়ে উঠলেন, আরও দাতা হয়ে উঠলেন।

আমি তখন দেশে থাকি না। মহকুমার শহরটি বা তার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যারা পাদচারণ করে তাদের কোনো খবরই রাখি না।

বছর পনেরো পরে আবার দেশে ফিরে এলাম।

রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিক অনেক প্রবীণ হয়ে পড়েচেন। শহরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি, বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি, হাকিম-তোষণ নীতির একনিষ্ঠ সেবক নীলমণি বাবু কিন্তু আগের উচ্চস্তরে এখন যেন নেই—লোকের চোখে। আমার সে স্কুল-জীবনের দিনগুলির পরে ত্রিশ বছর কেটে গিয়েচে। এখনকার যারা তরুণ সম্প্রদায়, তারা দেখলুম ও'কে আমল দেয় না।

দেশে ফিরে আসবার মাস-দুই প'রে এর এক প্রমাণ পেলাম।

সুরনাথ উকিলের বৈঠকখানায় বসে আছি, সেখানে ছোকরা উকিল শুভেন্দু গাঙ্গুলী এসে বসলো। খুব ফড় ফড় ক'রে ইংরেজী বলে, ঘন ঘন সিগারেট ফোঁকে (তবে আমার সামনে না), কথায় কথায় হাসে। তার মুখেই শুনলাম সে এবার রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিকের সঙ্গে হাই স্কুলের সেক্রেটারিত্বের ব্যাপারে নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবে।

আমি অবাক।

এ কি কখনো সম্ভব? নীলমণি মল্লিকের সঙ্গে টক্কর দিতে চলেচে তাঁর ছোট ছেলের বয়সী শুভেন্দু? যে নীলমণি বাবু আজ বিশ বছর ধরে স্কুলের সেক্রেটারি, তাঁর সঙ্গে?

আমি বললাম—শুভেন্দু, এ সম্ভব হবে না। তুমি কার সঙ্গে লড়তে যাচ্চ, জানো?

শুভেন্দু বললে—আপনি জানেন না দাদা। উনি আজ স্কুলটা গ্রাস ক'রে বসে আছেন বিশ বছর। যেন সেকেলে ধরনের স্কুল চলচে। নিউ ব্লাড্ না ঢুকলে আর—

—কিন্তু তুমি পারবে?

—সেকাল আর নেই দাদা। আপনি বহুদিন দেশে ছিলেন না। ও'কে আর কেউ চায় না। ইয়ং দল ওঁর ঘোর বিপক্ষে। তা ছাড়া সকলেই ও'কে ধামাধরা বলে থাকে। মুন্সেফ ডেপুটিদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে চা খেয়ে বেড়ালে যে সম্মান একদিন পাওয়া যেতো, এখন তার পরিবর্তে পাওয়া যায় ঘৃণা। আগে বলতো, অমুক বাবু হাকিমের ডান-হাত বাঁ-হাত, অতএব ওঁকে খাতির করো। এখন বলে, ও সেকেলে মেণ্টালিটির লোক, খোশামুদে। ওঁর সব শেষ হয়ে গিয়েচে। ও'র দ্বারা আর কি হবে? নিউ ব্লাড্ চাই, নিউ ব্লাড্ চাই।

—তোমাকে ভোট দেবে সবাই?

—দেখুন কি হয়। আপনি জানেন না।

শুভেন্দু উঠে গেল। আমি সুরনাথ উকিলকে বললাম—শুভেন্দু ব'লে কি হে? ও পারবে নীলমণি কাকার সঙ্গে?

সুরনাথ বললে—নীলমণি বাবুর দিন চলে গিয়েচে। এখন সকলে ও'কে আড়ালে ঠাট্টা করে।

—বল কি হে?

—তাই। ও'র সমসাময়িক উকিল আর কেউ নেই এক হৃদয় চক্কত্তি ছাড়া। তা হৃদয় চক্কত্তি আজ প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছেন দশ বছর। পক্ষাঘাত হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু আমাদের রায়বাহাদুর এখনো দু'বেলা সেই রকম ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াতে যান পাম্পশু পরে, সিগারেট খেতে খেতে। লাইক এ্যান্ ওল্ড্ স্নব দ্যাট হি ইজ—হি হি—

রাস্তায় নেমে একটু দূর গিয়েই রায়বাহাদুরের সঙ্গে আমার দেখা।

শীতকাল। দামী জামিয়ার গায়ে দিয়ে মলক্কা বেতের ছড়ি উল্টো ক'রে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি পঁচিশ বছরের যুবকের দর্পে ও তেজে পথ চলচেন। আজকালকার যুবক নয়—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের যুবক, যাদের চোখে ছিল শেষ ভিক্টোরিয়া যুগের মোহ-অঞ্জন, নিশ্চিন্ত ব্রিটিশ-প্রীতি, ব্রিটিশ জাস্টিসের প্রতি অগাধ ও অটুট বিশ্বাস।

আমায় অনেক দিন পরে দেখেও কিন্তু নীলমণি কাকা কথা বললেন না।

কেন না আমি 'কমনার' ; তাঁর সেটের লোক নই।

তিনি আমায় খুব ভাল জানেন, আমার বালক-কাল থেকে দেখে আসছেন আমাকে। কিন্তু ওই যে বললাম, ওই এক ধরনের লোক থাকে। ওল্ড্ স্নবই বটে, পয়লা নম্বরের স্নব। নাক-উ'চু লোক।

আমি হৃদ্যতার সুরে বললাম—কাকা ভালো আছেন? অনেক দিন পরে দেখলাম আপনাকে—

—হুঁ।

—জ্ঞান আজকাল কোথায় আছে?

—কলকাতায়।

ব্যাস্—আমার অযথা ঘনিষ্ঠতা করবার প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই নির্মূল করে দিয়ে

রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিক উল্টো-ক'রে-ধরা মলাক্কা বেতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চলে গেলেন।

আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পেছন থেকে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

আমার কষ্ট হ'ল। পিতার বয়সী লোক। এসব মানুষ জানে না যে যুগ বদলে যাচ্ছে ওদের চোখের ওপরে? কিছুই দেখে না—দেখেও দেখে না?

স্কুলের নির্বাচন-দ্বন্দ্বে নীলমণি বাবু হেরে গেলেন। হেরে গিয়েও নির্বাচন ব্যাপারের কি একটা খুঁৎ ধ'রে তিনি আবার এক মোকদ্দমা করলেন, তাতেও হেরে গেলেন।

গত ত্রিশ বৎসরে এই ক্ষুদ্র শহরটির বুকে রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিক এক একখানি ক'রে ইট বসিয়ে সম্ভ্রমের যে বিরাট সৌধ নির্মাণ করেছিলেন, আজ এক অর্বাচীন যুবকের হাতের আঙুলের এক ধাক্কায় তা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

এর পর থেকে কি যে হ'ল, বালিকা বিদ্যালয়, হাসপাতাল, লাইব্রেরী প্রভৃতি অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব একে একে তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে গেল। যে লাইব্রেরীর জন্যে তিনি কত কৌশলে চাঁদা আদায় ক'রে, গবর্নমেণ্টের কাছ থেকে মোটা টাকা সাহায্য বার ক'রে বর্তমান পাকাবাড়ী তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই লাইব্রেরীর কমিটির মধ্যেও তাঁর নাম আর রইল না। অথচ তিনি ঐ কমিটির সহকারী সভাপতি ছিলেন গত পনেরো বছর যাবৎ। সভাপতি অবিশ্যি ছিলেন মহকুমার হাকিম, সেও রায়বাহাদুরের ইচ্ছাক্রমেই। হাকিম, মুন্সেফ সহকারী ডাক্তার, দারোগা প্রভৃতি যাতে সন্ধ্যার সময় এসে লাইব্রেরীতে তাস খেলতে পারেন, তার সুবন্দোবস্তও ক'রে রেখেছিলেন রায়বাহাদুর।

রায়বাহাদুর বলতেন—আরে, ওরা আসা ভালো, এতে লাইব্রেরীর প্রেস্টিজ বাড়ে। দরকার হ'লে দু'পয়সা সাহায্য দেবার মালিক তো ওরাই।

এই লাইব্রেরীতে কতবার বদলির আদেশপ্রাপ্ত হাকিমদের বিদায়-সভা অনুষ্ঠিত হয়েচে, তাদের হিসেব ওর প্রত্যেকখানা ইটে লেখা থাকলে সব ইট ভর্তি হয়ে যেতো আজ। শুধু কি হাকিম, তা হ'লেও তো কথা ছিল। কি সমাচার, সরকারী ডাক্তার বদলি হচ্ছেন, করো বিদায়-সভা। কি সমাচার, ছোট দারোগা বদলি হচ্ছেন, করো বিদায়-সভা। বিদায়-সভার চাঁদার চোটে লোকে বিরক্ত। এসব আগে আগে ঘটে গিয়েচে, তখন তিনি ছিলেন শহরের নেতা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, অনেকের ভীতির স্থল। সুতরাং লোকে দিয়েচেও বিনা কৈফিয়তে।

জেলার শহর থেকে জজসাহেব বদলি হয়ে যাচ্ছেন, নীলমণিবাবু পূর্বাহ্নে খবর পেয়ে গেলেন, তাঁর বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়েই জজসাহেব মোটরে যাবেন কলকাতায়। অমনি একঘণ্টার মধ্যে বিদায়-সভার ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেললেন। গেট সাজানো হ'ল নীলমণি বাবুর বাড়ীর সামনে, সভার অনুষ্ঠান হ'ল ওঁর বৈঠকখানার বারান্দায়। সিঙ্গাড়া, কচুরি, নিমকি, সন্দেশ, চা, ফুলের মালা, গান কোনো কিছুরই ত্রুটি হ'ল না। সব খরচ বহন করলেন অবিশ্যি তিনি নিজেই।

রামজয় বাঁড়ুয্যের দল বললে—অস্তগামী সূর্যের পুজোয় কি হবে ভায়া? ও যখন চলে যাচ্ছে তখন যাক না। এদের সম্মান দেখানো তো ওদের ব্যক্তিগত মেরিটের জন্যে নয়, পদের জন্যে। সে পদ ছেড়ে সে যখন চললো, তখন আর কেন?

নীলমণি বাবুর প্রায় একশো টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল, এসব খরচের বেলা তিনি চিরদিনই মুক্তহস্ত। এসব সেকালের কথা নয়, সেদিনের কথা।

হঠাৎ কিন্তু দিন বদলে গেল আশ্চর্যভাবে। কয়েক বছরের মধ্যে। কি রকম একটা হাওয়া এসে ঢুকলো শহরে। ছেলে-ছোকরার দল সব বিষয়ে এগিয়ে এসে হ'ল পাণ্ডা। লাইব্রেরি তারা দখল করলে, বললে—বুড়োদের দিয়ে আর কাজ হচ্ছে না। একখানা আধুনিক কালের বই নেই—সব সেকেলে। শুধু হাকিমহুকুমদের তাসখেলার আড্ডা হয়ে রয়েচে লাইব্রেরি—আজ বিশ বছর ধরে। এ অচলায়তন আমরা ভাঙবো।

তারা নিজেদের মধ্যে দল পাকিয়ে হৈ হৈ ক'রে ছাপানো কাগজ শহরময় বিলি ক'রে জানিয়ে দিলে—শহরের সব প্রতিষ্ঠান থেকে তারা জং-ধরা প্রাচীন ফাসিলদের তাড়িয়ে নিজেরা ঢুকে পড়বে। তাড়ালোও তারা। লাইব্রেরীতে এক কংগ্রেসী সভা করতেই

হাকিমের দল সরে দাঁড়ালো—তাসের আড্ডা হাওয়া হয়ে গেল। তারপরই ধরলে এক সাহিত্যসভা—কলকাতা থেকে নবীনপন্থী প্রগতিবাদী সাহিত্যিক দল এলেন। তাঁদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে শহরময় শোভাযাত্রা বার করা হ'ল—বহু প্রবন্ধপাঠ, বহু বক্তৃতাদান সাড়ম্বরে সম্পন্ন হ'ল! দেশের স্বাধীনতা নিয়েও অনেক কথাবার্তা হ'ল সে সভায়।

রায়বাহাদুর সে সভার ত্রিসীমানায় পা দেন নি। কিন্তু যত দিন যায়, তিনি দিশাহারা হয়ে পড়েন, কিছু বুঝতে পারেন না। এ সব কি দিন এসে গেল? ছেলে-ছোকরার দল আর তাঁকে দেখে সম্ভ্রম করে না, হাকিম পুলিশ পেয়াদা আরদালিদেরও আর যেন সুদিন নেই, কোথায় সেই সব রক্তচক্ষু দোর্দণ্ড-প্রতাপ হাকিমের দল সেকালের! সব যেন মিইয়ে গেল। নইলে মুন্সেফবাবু এখন সুরনাথ বাবুদের ক্লাবে বসে আড্ডা দেন? মনে পড়ে সেকালের মহেন্দ্রবাবু ডেপুটির কথা। এখনো অনেকে তাঁকে মনে রেখেচে বৃদ্ধদের মধ্যে। বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেতো তাঁর প্রতাপে। কারো বাড়ী যেতেন না, কোর্টের বাইরে কারো সঙ্গে হেসে কথা বলতেন না। নীলমণি বাবুর বড় মেয়ের বিবাহে কাপড় মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ছেলের মারফৎ—নিজে আসেন নি।

পরদিন সকালে সব কাজ ফেলে নীলমণি বাবু ডেপুটিবাবুর বাংলোয় গেলেন কাপড় মিষ্টি পাঠানোর জন্যে ধন্যবাদ দিতে। বললেন—আপনি গেলেন না কাল হুজুর, কাল সকলেই আমরা আপনাকে চেয়েছিলাম।

মহেন্দ্রবাবু বসে চিঠিপত্র লিখছিলেন আর গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন—সেটা আমার ত্রুটি নিশ্চয়ই, আমি স্বীকার করি।

—না, হুজুরের ত্রুটি হয়েচে তা কি বলতে পারি, তা নয়—

—না না, ত্রুটি নিশ্চয়ই। তবে কি জানেন নীলমণি বাবু, এখানে আমি সামাজিক জীব নই, গবর্নমেণ্টের কর্মচারী। আমাকে নিমন্ত্রণ না করাই আপনাদের উচিত।

—সে কি কথা বলচেন আপনি—তা কি কখনো—

—আমি ঠিকই বলচি নীলমণি বাবু। ভবিষ্যতে আপনার বাড়ীর কোনো অনুষ্ঠানে আর আমাকে নিমন্ত্রণ না করলেই আমি সুখী হবো। কারণ এতে আমায় লজ্জায় ফেলা হয় মাত্র।

সরল সোজা কথা। তেমন ধরণের লোক আর আসে না। সব যেন মিইয়ে গিয়েচে।

তারপর কিছুকাল কেটে গেল।

রায়বাহাদুরের অস্তিত্ব যেন এ শহর ভুলে গিয়েচে। কোনো অনুষ্ঠানেই আর তিনি কর্মকর্তা নন, কোনো সভার সভাপতি নন। কেউ তাঁর কাছে যায় না কোনো বড় কাজের পরামর্শ নিতে। একদিন যাঁর পরামর্শ ভিন্ন এ শহরের লোকের চলতো না, আজ তাঁকে বাদ দিয়েও লোকের দিব্যি চলচে।

রামজয় বাঁড়ুয্যে মারা গিয়েচেন, রায়বাহাদুরের সমসাময়িক উকিলদের মধ্যে দু-একজন মাত্র জীবিত আছেন। নীলমণি বাবুও কোর্টে যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েচেন। তবে ছড়ি ঘুরিয়ে এখনো ভ্রমণে বার হয়ে থাকেন সেকালের মত।

চৈত্র মাসের প্রথমে এবার আমি অনেকদিন পরে মহকুমার শহরে গেলাম। তখন শহরে জেলার ছাত্র-সম্মেলন হবার বিরাট তোড়জোড় চলছে। একদিন সকালে নীলমণি বাবুর সঙ্গে দেখা রাস্তায়। বৃদ্ধ ছড়ি ঘুরিয়ে পথে চলেচেন আগেকার মতই। আগেকার সুচেহারা আর নেই, প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স হ'ল, জরার অধিকারের চিহ্ন সারাদেহে। আমি কথা বললেও উনি কথা বলবেন না জানি, কারণ আমি ছেলে খেপিয়ে বেড়াই উনি জানেন এবং বোধ হয় সেজন্যেই আমায় পছন্দ করেন না। পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন কিন্তু কোনো কথা বললেন না আমার সঙ্গে। আমার সামনে এসে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন।

ছাত্রের দল আমার কাছে এল ওদের সম্মেলন সম্বন্ধে পরামর্শ করতে। আমি তাদের বললাম, আমার অনুরোধ এবার নীলমণি বাবুকে সম্মেলনের সভাপতি করতে হবে।

তারা বললে—আপনি কি বলচেন? উনি সভাপতি হ'লে লোকে কি বলবে?

—যে যাই বলুক, তোমরা ওঁকেই সভাপতি করো। উনি আর ক'দিন? অনেক কিছু উনি করেচেন একসময়ে এই শহরের জন্যে। সে সব আজ লোকে ভুলে গিয়েচে। ওঁর সম্মান ওঁকে দাও। এ কথা তোমাদের রাখতেই হবে।

বহুকষ্টে ওদের রাজি করিয়ে রায়বাহাদুরের কাছে আমি নিজে ওদের নিয়ে গেলাম। সন্ধ্যাবেলা। রায়বাহাদুর বৈঠকখানায় বসে ওঁর মুহুরি জীবন চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি গিয়ে দোরের কাছে দাঁড়াতেই বললেন—কে?

—আজ্ঞে, কাকাবাবু আমি।

—ও, এসো। কি মনে ক'রে?

আমার ইঙ্গিতে ছাত্রের দল এগিয়ে এসে দোরের কাছে দাঁড়ালো। তারপর ঘরে ঢুকে রায়বাহাদুরের পায়ে হাত দিয়ে এরা প্রণাম করলে। বিস্মিত রায়বাহাদুর কিছু বলবার পূর্বে আমি বললাম—কাকাবাবু, এরা আপনার কাছে এসেচে, এদের ছাত্র কংগ্রেসের একটা অধিবেশন হবে কাল এখানে—আপনার কাছে আসতে তো সাহসই করছিল না, আমি ওদের বললাম—চলো নিয়ে যাচ্চি, কোন ভয় নেই, তিনি ছাড়া উপযুক্ত লোক আর আছেই বা কে এখানে? তাই এরা এসেচে, আপনাকে কাল ওদের সম্মেলনে প্রিজাইড্ করতে হবে। আপনাকে রাজি হতেই হবে, নিরাশ করবেন না। আমি জানি আপনি খুব বিজ্ঞ লোক, কিন্তু এদেরও তো একটা দাবি আছে আপনার ওপর—

রায়বাহাদুর চমকিত, অভিভূত, ও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ যেন তাঁর মুখে কথা বার হ'ল না।

ছাত্রদের চাঁই সুধীর অমনি হাতজোড় ক'রে বললে—আমাদের নিরাশ করবেন না স্যার, আপনি ছাড়া আর কেউ উপযুক্ত লোক নেই এখানে—

—বেশ, বেশ। তা হবে। বোসো বোসো তোমরা—

রায়বাহাদুর অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন—ওহে নরেন, বোসো বাবা বোসো—সে সব হবে এখন, তুমি যখন নিজে এসেচ তখন আর 'না' বলতে পারি নে। একটু চা খাও সব, বোসো—ওরে—শোন্—ও হৃদে—আচ্ছা সব বোসো. আমি বাড়ীর মধ্যে থেকে আসচি—এক মিনিট—

কিছুক্ষণ পরে আমাদের জন্যে বেশ ভালো জলখাবার এল, কচুরি. নিমকি. সন্দেশ. পেঁপেকাটা ইত্যাদি। ছাত্রেরা জলখাবার খেয়েই চলে গেল, তারা কেউ চা খাবে না। আমাকে একা পেয়ে রায়বাহাদুর নিজের বহু পূর্ব কীর্তির কথা প্রাণভরে আমার কাছে বলে গেলেন। এ শহরে কিছুই ছিল না, না লাইব্রেরী না বালিকা বিদ্যালয়. না প্রসূতি-ভবন। যা কিছু করেচেন, তিনিই করেচেন। ডেপুটি মুন্সেফ বাবুরা তাঁকে খাতির করতেন কত। স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত তাঁর বাড়ী এসে চা খেয়েচেন। আজই এখানকার লোকে তাঁকে পোঁছে না।

আমি বাধা দিয়ে বললাম—আপনাকে চিনবে কে. জানবে কে. কাকাবাবু? সবাই কি সকলকে জানতে পারে? ওরা আমায় বললে আপনার কথা। সাহসই পায় না এগোতে। বলে, অত বড় লোক কি আমাদের সভায় প্রিজাইড করতে রাজি হবেন? আসতে চায় সবাই, আসতে ভয় পায়—

—বোসো বোসো. বাবা, উঠচো কেন? আর একটু চা খাবে না?

—আজ্ঞে না কাকাবাবু। অনেক কাজ আছে. উঠি। আপনার মত লোককে নিয়ে যেতে হ'লে তার উপযুক্ত তোড়জোড় করতে হবে তো? আশীর্বাদ করুন যেন ওরা সফল হয়—

আমরা পরদিন ওঁকে মস্ত বড় শোভাযাত্রা ক'রে গলায় ফুলের মালা দিয়ে সভাস্থলে নিয়ে গেলাম। গত দশ বৎসরের মধ্যে কেউ তাঁকে ডাকে নি। বিস্মৃতি. উপেক্ষিত রায়-বাহাদুর নীলমণি মল্লিকের বহুদিনের অজ্ঞাতবাস মহাসমারোহে আমরা ভঙ্গ করলাম। সভায় অনেক ভালো ভালো লোক এসেছিলেন. জেলা ছাত্র কংগ্রেসের বিরাট সভা. যথেষ্ট আয়োজন, যথেষ্ট আড়ম্বর। বন্দেমাতরম গান হ'ল. জয় হিন্দ্ গান হ'ল। রায়বাহাদুর

মুগ্ধদৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। সেক্রেটারি তার রিপোর্টে রায়বাহাদুরের যথেষ্ট প্রশংসা ক'রে বললে, এ জেলায় তাঁর মত বদান্য, উদার, দেশহিতৈষী লোক আর দ্বিতীয় নেই!

সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে রায়বাহাদুর এই সর্বপ্রথম জীবনে প্রকাশ্য সভায় দেশের স্বাধীনতার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মহাত্মাজীর প্রশংসা করলেন, সুভাষ-চন্দ্রের প্রশংসায় তাঁর বচন স্খলিত হতে লাগলো উত্তেজনায়। আমরা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম—ইনি কি সেই নীলমণি মল্লিক?

ভাষণের শেষে ঘোষণা করলেন ছাত্রসংঘের তহবিলে পাঁচশো টাকা তিনি দেবেন।

রায়বাহাদুরের জয়-জয়কার পড়ে গেল। সকলে বলতে লাগলো—লোকটার মধ্যে জিনিস ছিল।

পরদিন সকালে আমার সঙ্গে দেখা। বেতের ছড়ি ঘুরিয়ে রায়বাহাদুর সদর্পে পথ চলেচেন। আমায় দেখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—কোথায় চললে বাবাজি? বেড়াতে? বেশ বেশ। তোমাকে দেখলে চোখ জুড়োয়। জেলার একটি রত্ন তুমি। তোমার বাবা—

হঠাৎ আমার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন রায়বাহাদুর।

চৌধুরাণী

এ ইতিহাস আজকালকার দিনে শোনাবার মত বলেই শোনাচ্ছি।

যদি লিখে রেখে না দিই—এ কথা কেউ জানতে পারবে না। অনেক লোকের উপকার হবে পড়লে এই বিশ্বাসেই লেখা।

আমার ছেলেবেলাতে গ্রামের ওপাড়ায় রামলাল কাকার হাঁকডাক ছিল। সমস্ত মাল-পাড়ার লোকে তাঁর প্রজা, তাঁর মুখের হুকুমে একশো জোয়ান মরদ পুরুষ লাঠি হাতে এগিয়ে আসতো। শক্ত হাতে লাঠি না ধরতে পারলে তখনকার দিনে পাড়াগাঁয়ে জমিজমা রাখা যেত না। জমি নিয়ে দাঙ্গা, জমির ফসল লুঠতরাজ—এসব ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

রামলাল কাকার প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমার মায়ের চেয়ে তিন বছরের বড়, তিনি ছিলেন মায়ের সই, তাঁকে সই-মা বলে ডাকতাম। সই-মা লোক ভালো ছিলেন বলে শুনি নি, সারা বাল্যকাল ধরে তাঁর নিজের শাশুড়ীর সঙ্গে তাঁর জাঁহাবাজি ঝগড়ার কথা শুনে এসেছি।

শাশুড়ীরা বৌ-এর ওপর অত্যাচার করে একথা বাংলাদেশে সবাই জানে। কিন্তু অত্যাচারিতা অনেক বধূ তখন আমার এই সই-মার নামে পুলকিত হয়ে উঠতো।

এমন এক নিপীড়িতা বধূকেই আমি বলতে শুনেছি ঘাটের পথেঃ—

—বৌ বলতে বৌ হ'ল ওপাড়ার হরির মা। আমরা জন্মেছি ছাগল ভেড়া। শাশুড়ীকে কি ক'রে ছেঁচতে হয়, তা দেখিয়ে দিয়েচে।

তাঁর সঙ্গিনী বললে—কাল নাকি সেজগিন্নির মুখে বৌ কেরোসিনের টেমির ছেঁকা দিয়েছে—সেজগিন্নি তাই সহ্যি করে বাপু! আমাদের মত শাশুড়ী যদি হ'ত—

—সহ্যি না ক'রে উপায় কি বলো! জাঁহাবেজে বৌ যে। পেরে না উঠলে, সহ্যি করতেই হচ্ছে বই কি।

—তা ধন্যি বৌ বটে। আষাঢ় মাসে দু'দিন খেতেই দিলে না শাশুড়ীকে। মুখের জোরে দাঁড়াবে কে সামনে? সেজগিন্নির কর্ম নয়।

—শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করবার সময়ে রণরঙ্গিণী-মূর্তি ধরে। অমন বৌ ঘরে ঘরে হ'লে শাশুড়ীরা জব্দ।

—আমরা পারি নে বাপু, ভয় করে।

—সেই জন্যেই ঝাঁটালাথি খাচ্ছি উঠতে বসতে। কাল হয়েচে কি, মুগের ডাল রোদে দেওয়া ছিল, বিষ্টি এসেচে কখন দেখতে পাই নি—খুকীর কাঁথা সেলাই করচি—সে কি

গালাগাল! আচ্ছা গালাগাল দাও না হয় দিলে—কিন্তু বাপ-ভাই কি দোষ করলে? তাদের তুলে গালাগাল দেওয়া কেন বলো তো ভাই?

—বলবো আর কি! নিজেই দু'বেলা স্বচক্ষে দেখছি, স্বকর্ণে শুনচি। হাড়-ভাজাভাজা হয়ে গেল ভাই। এক সময় মনে হয় একদিকে বেরিয়ে যাই—আর ভাল লাগে না—

সই-মা দেখতে শুনতে ভালো ছিলেন। সবাই তাঁকে সুন্দরী বলতো। তাঁর পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়ে হয়। বড় ছেলেটি বুদ্ধিমান কিন্তু অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, বিশেষ লেখাপড়া শেখে নি। অল্পবয়সে জমিদারি সেরেস্তায় নায়েবী কাজে ভর্তি হোল।

এই সময় সই-মা মারা গেলেন। রামলাল কাকা আবার বিবাহ করলেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিন-চারটি ছেলেমেয়েও হ'ল। কিছুদিন পরে রামলাল কাকা আবার বিপত্নীক হলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বিবাহ করলেন। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীরও পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ে হ'ল।

মাঝের পক্ষের প্রথম সন্তানের নাম আশালতা, বেশ সুন্দরী মেয়ে। রামলাল কাকা তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করবার কিছুদিন পরেই আশালতার ভাই-বোনগুলি একে একে মারা গিয়ে বেঁচে রইল কেবল সে নিজে।

আশালতার বিয়ে হ'ল এগারো বছর বয়সে এবং সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এল। কন্যা বিধবা হয়ে বাড়ী আসার পর থেকে শোকে রামলাল কাকার শরীর ভেঙে পড়লো এবং বছরখানেকের মধ্যে তিনিও ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। এর মুখ্য কারণ কন্যার বৈধব্য নয়, কেন না রামলাল কাকার মৃত্যু হয়েছিল বসন্ত রোগে। ভূমিকা এই পর্যন্ত।

এখন আসল কাহিনী শুরু করা যাক।

আমাদের এ ইতিহাস প্রধানতঃ আশালতার ইতিহাস।

ব্যাপারটি এখন দাঁড়িয়েছে যা তা এখানে আর একবার বলি।

রামলাল কাকার সংসারে এখন কর্তা হয়ে দাঁড়ালো ওঁর প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎ। শরতের তখন বিয়ে হয়েছে এবং দুটি সন্তানও হয়েছে। শরতের ছোট ভাই সনৎও লেখাপড়া শেখে নি, সে গ্রামেই ধানের ব্যবসা করে। প্রথম পক্ষের মেয়ে ক-টির বিবাহ হয়ে গিয়েছে, তারা সকলেই শ্বশুরবাড়ী। রামলাল কাকার তৃতীয় পক্ষের ছেলেমেয়েগুলির বয়স কম। বড়টি ছেলে, তার বয়েস এই সময় আট।

রামলাল কাকা সম্পত্তিওয়ালা লোক ছিলেন। বড় ছেলে শরৎ এমন দুষ্ট ফন্দি সব আঁটতে লাগলো, যাতে তার নাবালক বৈমাত্রেয় ভাইবোনগুলি সম্পত্তির উপস্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। বিমাতার কোন কথা এ সংসারে খাটে না, তাঁর বয়েসও খুব বেশী কিছু নয়। শরৎ জমি মৌরসী বন্দোবস্ত করতে লাগলো মোটা টাকা নিয়ে। পুকুর জমা দিতে লাগলো নিকিরিদের কাছে মোটা টাকা নিয়ে। গোলার ধান বিক্রি ক'রে ফেলতে লাগলো আড়তদারদের কাছে, তাতে পেতে লাগলো মোটা টাকা। গাছের নারকোল সুপুরি বিক্রি করতে লাগলো কলকাতায় যারা মাল চালান দেয় তাদের কাছে।

অথচ ওর বিমাতা বা বৈমাত্রেয় ভাইবোনগুলির পরনে কাপড় নেই, স্কুল-পাঠশালায় যাবার বন্দোবস্ত নেই, যা টাকা পাওয়া যাচ্ছে ওরা ত তার ন্যায্য-অংশীদার—অথচ শরৎ বা সনৎ সে চিজ্ নয়, সোজা পথে হাঁটার অভ্যেস তাদের নেই, বিমাতা মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস করেন না, নিজের চেয়ে বেশী বয়সের সৎ-ছেলের কাছে।

এভাবে অরাজকতা চলল বছর দুই। শরতের বিমাতা মুখ বুজে সহ্য করেন।

তিনি গরীব ঘরের মেয়ে। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হ'য়ে এসেছিলেন এ সংসারে। যা জোর ছিল এখানে, বিধবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু গিয়েচে। দোর্দণ্ড-প্রতাপ সৎ-ছেলেকে কিছু বলতে সাহস করেন না তিনি। নির্জনে চোখের জল ফেলেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা বিষয়সম্পত্তির কি বোঝে, মহা আনন্দে লাটু ঘোরায় আর ঘুড়ি ওড়ায় পথে পথে মাঠে মাঠে।

শীতকাল। সকালবেলা।

শরৎ একবাটি মুড়ি খাচ্ছে বসে, এখুনি চা খেয়ে যে বেরুবে।

আশালতা এসে দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললে—বড়দা!

শরৎ মুখ তুলে বললে—কিরে?

—একটা কথা তোমায় বলবো।

—কি? বল তাড়াতাড়ি। আমার সময় নেই। কাছারিতে বেরুতে হবে এখুনি।

—তুমি বাগদিপাড়ার জমি বন্দোবস্ত করেছ কত টাকায়?

—কবে?

—এই যে সেদিন ক'রে এলে? বৌদিদির হাতে টাকা এনে দিলে?

—কেন, অত খোঁজে তোমার দরকার কি?

আশালতা মুখ গম্ভীর ক'রে দাদার সামনে এসে দাঁড়ালো। সুন্দরী মেয়ে নিরাভরণা বিধবার বেশ, চাপা রাগে ওর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। বললে—দাদা, আজ আমি যে কথা বলতে এসেছি শোনো। তুমি ও-রকম ক'রে বিধু নিধুকে ফাঁকি দিতে পারবে না বলে দিচ্চি—

শরৎ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এমন কথা যে আশালতা তাকে বলতে পারে; এটাই সে বিশ্বাস করতে পারছিল না তখনো। অতটুকু মেয়ে আশালতা!

পরক্ষণেই রাগে ও বিস্ময়ে তার মুখ দিয়ে কথা বেরুতে গিয়ে আটকে রইল খানিকক্ষণ। যখন কথাটা বেরিয়ে এল অবশেষে, তা বড় অসংলগ্ন হয়ে পড়লো। তার মানে বোঝা গেল না।

—কি? জমি কার?...টাকা—বিধু নিধুর ফাঁকি মানে?

—শোনো দাদা। বিধু নিধু আছে, ওদের তিনটি বোন আছে। ওদের তুমি দ্যাখো না। মা ভাল মানুষ, তিনি কিছু বলতে পারেন না। ওদের পরনে না আছে কাপড়, না গায়ে একটা জামা। মার একখানা থান, তাই শুকিয়ে নেয়। বিধু বড় হয়েচে, ওকে স্কুলে দিলে না। ওরা সব খাবে কি এর পরে?

—কি খাবে সে আমি কি জানি? আমারই বা কি দায় পড়েচে বিধুর পড়া নিয়ে মাথা ঘামাবার? বাবা থাকতেই তো আমাকে আর সনৎকে পৃথক ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সে সব কথার কি দরকার এখন জিজ্ঞেস করি? তোমার সে সর্দারি করবার দরকার কি?

আশালতা দৃঢ়স্বরে বললে—সর্দারি করি নি দাদা, কিন্তু না বলেও আর পারছি নে। মা কিছু বলেন না, কিন্তু এটুকু তো বোঝেন যে বিধু নিধু ফাঁকে পড়চে! তুমি যে জমি বিলি করলে, বাঁশ ধান বিক্রি করলে, পুকুর জমা দিলে—সে টাকার ভাগ ওরা পাবে না? অথচ ওদের পরনে না আছে কাপড়, না আছে ওদের গায়ে একটা জামা—

শরৎ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে—এত বড় কথা তোর! তুই কথা বলতে আসবার কে শুনি? তোর কি ভাগ আছে বিষয়ের? তোর কোন জোর এখানে খাটবে শুনি?

—আমার কথা তো একটুও বলি নি দাদা। বিধু নিধুর ভাগ ওদের দাও। মাকে দাও। শৈলবালার বিয়ে দিতে হবে আজ বাদে কাল, সবই যদি বেচে কিনে ফেললে, কাল শৈলর বিয়ে হবে কি দিয়ে?

—সে ভাবনায় আমার রাত্তিরে ঘুম হচ্চে না! মা গিয়ে বুঝুন তাঁর মেয়ের বিয়ে কি দিয়ে হবে! আমার তাতে কি?

—এই কথা তোমার উপযুক্ত হ'ল দাদা? শৈলর বিয়ে না হ'লে কার মুখ হাসবে? মা'র না তোমার? লোকে বলবে অমুকের বোনের বিয়ে হ'ল না, ধুমসি ক'রে ঘরে রেখেচে। রাগ কোরো না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি। আমার কিছু চাইনে। একবেলা দুটো আলো চালের ভাত, একখানা কাপড়। কিন্তু বিধু নিধুকে স্কুলে দাও, এর পর ওরা ক'রে খাবে কি? তোমারই দোষ দেবে লোকে, আমাকে কেউ বলতে আসবে না। ভেবে দ্যাখো।

শরৎ একটা বড় ধাক্কা খেলে এই দিনটিতে।

এতদিন তার বিশ্বাস ছিল সে যখন সংসারের কর্তা, সে যা করবে তাই হবে। অবিশ্যি বাবা তাকে ও সনৎকে পৃথক ক'রে দিয়ে গিয়েচেন কিন্তু হঠাৎ পরলোক গমন করাতে

পাকাপাকি কিছু ক'রে যেতে পারেন নি বিষয়-আশয়ের। নগদ টাকার দরকার হলেই জমি বিলি, ধান বিক্রি, ইচ্ছামত খাজনা আদায় ইত্যাদি করলে বাধা দিচ্চে কে তাকে? বিমাতা বাধা দিতে সাহস করবেন না, হাব্দা-গোব্দা ভীতু মানুষ। আজ সে দেখলে এমন একজন আছে, যে তার আঙগুল উঁচিয়েছে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ওর খেয়ালখুশির বিপক্ষে। আর সে কি না আশালতা?

যাকে কাল দত্ত মশায়ের পাঠশালাতে হাত ধরে জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রেখে এসেছে! কেন না ও পাঠশালায় যাবার নামে কেঁদে আড়ষ্ট হয়ে যেতো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ছোট ভাই সনৎকে ডেকে বললে—আশার কাণ্ড শুনিছিস?

—কি?

—ও নাকি আমাকে দেখে নেবে। আমি নাকি বিধু নিধুকে ফাঁকি দিয়ে বিষয়-আশয়ের বিলিব্যবস্থা করছি। ওইটুকু মেয়ের এত বড় আস্পর্ধা!

—তাই তো!

—এর একটা বিহিত করতে হবে সনৎ। আশার কি জোর খাটে এ সংসারে?

—তা বলে দ্যাখো।

—তুইও বলবি। আমার সঙ্গেই বলবি।

—বেশ।

—কালই সকালে বলা যাবে। ওকে তাড়িয়ে তবে আর কাজ। বড্ড বাড় বেড়েচে ও। আমাকে একেবারে অবাক ক'রে দিয়েচে আজ।

—আমি বলবো এখন বুঝিয়ে—

—বুঝিয়ে-টুঝিয়ে বলার কিছু নেই। ওকে বিদেয় ক'রে দেবো কালই।

—বেশ।

সনৎ তখন দিব্যি রাজী হয়ে গেল, কিন্তু সকালে এসে বললে—দাদা, ওই যে কাল বলছিলে আমাকে বলবার কথা না?

—হাঁ, তা কি?

—আমি ওসব পারবো না। তুমি যা হয় কোরো—

—সে হবে না। তোকেও বলতে হবে—

—আমি ভেবে দেখলাম, ও সব কথার মধ্যে আমার না থাকাই ভালো।

—তুই আমাকে ভয় করিস, না মাকে ভয় করিস?

—কাউকে ভয় করি নে। মা আমাদের দুজনকেই ভয় ক'রে চলে দাদা, সে তুমি জানো। মা সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—নিরীহ প্রাণী। তাকে আবার ভয় করবার কি আছে?

—তবে তুই কেন বলবি নে আশাকে?

—না দাদা। আশা আমাদের কোলপোঁছা বোনটা। ওর মা নেই, বাপ নেই, স্বামী-পুত্তুর নেই। আমি ওকে সব কথা বলতে পারবো না।

শরৎ মুশকিলে পড়ে গেল। দুই ভাই একযোগে কাজ করলে যে জোর পেঁছতো, সে তো পেঁছলোও না, তার ওপর সে দেখলে আশার ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গেলে সনতের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়া বোধ হয় বিচিত্র নয়। সনৎ এত দরদ দেখাবে আশার ওপর তা কে জানে। একবারে গদগদ গোদাবরী! বলিহারি।

কিন্তু শরতের এ ধারণা ভুলও বটে, আবার নয়ও বটে।

সেদিনই সনৎ আশাকে সিঁড়ির নিচের ঘরে নির্জনে ডেকে বললে—তুই কি বলেছিস দাদাকে?

—কেন, কি বলবো?

—চোখ রাঙিয়েছিস শুনলাম—

—ওমা, মাথা কুটবো তোর সামনে ছোড়দা? আমি চোখ রাঙাবো বড়দাকে? আমি ন্যেয্য কথা বলচি—

—কি কথা শুনি।

আশা সব ব্যাপার বললে। বলে কাঁদতে লাগলো।

সনৎ বললে—কে'দে মরচিস কেন তুই?

—না ছোড়দা, তুই বল্ আমি কি অন্যাই কথা বলচি—

—তাই তো।

—আহা, মা'র কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায় ছোড়দা। তুইই বল। বড়দা এতগুলো টাকা পেলেন, জমি বিলি ক'রে, জিনিস বিক্রি ক'রে—একটা পয়সা মা'র হাতে দিয়ে বলেচেন, মা, তুমি একাদশীর দিন একটু মিষ্টি কিনে খেও, কি শৈলকে একটা ফ্রক কিনে দিও? আহা, কিছু পরবার নেই ওর, শাড়ীর পাড় জুড়ে জুড়ে আমি সেদিন ওর একটা ফ্রক ক'রে দিয়েচি তবে পরে বাঁচে। কে আছে ছোড়দা ওদের মুখে তাকাবার? মা তো ওই হতগজ—

—হতগজ না ভালোমানুষ?

—তার মানেই তাই। তুমি গায়ে আগুন ঢেলে দাও, রা কাটবে না। এদিকে বিধু নিধু শৈল ভেসে যাক!

—তা তুই আমাকে বলিলি না কেন, আমি দাদাকে বলতাম—

—তুইও ওই এক রকম ছোড়দা। তোর দ্বারা হ'ত না।

সনৎ আশাকে যতই স্নেহ করুক, সে বেশিদিন বাঁচে নি। সেই বছর শীতের শেষে নিমোনিয়া হয়ে সাত-আটদিন ভুগে সে মারা গেল। আশা দিনরাত মোতীর পাশে বসে সেবা করতো, সারাদিন নাওয়া খাওয়া ভুলে গিয়ে। মজুমদার গিন্নির মুখে আমি একথা শুনেছি। কারণ সে সময় দেশে থাকতাম না। মজুমদার গিন্নি যার খুঁৎ ধরতেন না, সে সত্যিই একজন বুদ্ধ বা খৃষ্ট। মজুমদার গিন্নি বলেছিলেন—সৎমায়ের পেটের বোন বটে, কিন্তু নিজের বোন কমই আছে আজকাল, যারা অমন ক'রে ভাইয়ের সেবা করে।

ওঁর মুখে এইটুকু কথার মূল্য অনেকখানি।

সনতের মৃত্যুর পরে সংসারে শরতের একাধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বাধা দেবার আর কেউ রইল না। রামলাল কাকার বিষয়সম্পত্তির মধ্যে যা ছিল ভালো, যে জমার খাজনা বিনা মোকদ্দমায় সহজে আদায় হয়, যে পুকুরে মাছ বাড়ে এবং বেশি দামে নিকিরিদের কাছে বিক্রি হয়, যে আমন ধানের ক্ষেতে জল বাধে সকলের আগে এবং শুকোয় সকলের শেষে—এক কথায় দুধের সরটুকু শরৎ গ্রাস করতে উদ্যত হ'ল।

আবার আশালতাকে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল ওর কাছে।

শরৎ চীৎকার ক'রে রেগে তক্তপোষ চাপড়ে কথা বলে, আশা ধীরভাবে মৃদুস্বরে কথা বলে। শরৎ দিন দিন বিস্মিত হচ্ছে, কে জানতো সেই আশা এই মানুষ।

নিধু বিধুকে নিয়ে গিয়ে শরতের সামনে দাঁড় করিয়ে সেদিন বললে—ছেলে দুটো যে একেবারে বয়ে গেল, এরা ক'রে খাবে কি? এদের উপায় কি করচো বড়দা?

—আমি কি উপায় করব, তুমি এখন ওদের গার্জেন হয়েচো, তুমি করো—

—আমি তোমার পায়ের জুতোর তলা বড়দা, আমায় অমন কথা বোলো না।

—তোমাকে আর মিষ্টি কথা শোনাতে হবে না আমাকে, যাও এখান থেকে—

—এদের উপায় কি করবে করো বড়দা, পায়ে পড়ি তোমার।

—মাইনে দেবে কে?

—তুমি!

—কেন আমি দেবো? আমার—

শরতের উত্তরের বাকি অংশটুকু ছাপার উপযুক্ত নয়।

আশা চুপ ক'রে থেকে বললে—তোমার পায়ে পড়ি দাদা—এদের লেখাপড়ার হিল্লে করো—বাঁদর হয়ে গেল একেবারে।

তবে তো আমার—

শরতের সবটুকু উত্তর ছাপবার পুনরায় অযোগ্য হ'ল।

আশালতা পরদিন নিজে কোথা থেকে টাকা যোগাড় ক'রে বিধু নিধুকে দু'মাইল দূরবর্তী সোনাখালি-বাকসার মাইনর স্কুলে ভর্তি ক'রে দিল। ছেলে দুটো বদ হয়ে

গিয়েছিল—নিজে জোর ক'রে ওদের স্কুলে পাঠিয়ে দিত, নিজে সকালে বিকালে পড়তে বসাতো। আশা নিজে লেখাপড়া জানত সামান্যই। গ্রামের অমর্ত গুরুমশায়ের পাঠশালায় বাংলা সরলপাঠ তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত। কিন্তু নিজের চেষ্টাতে সে অনেক শিখেছিল। ওর মামার বাড়ী ছিল কলকাতার কাছে এ'ড়েদ'। মা বেঁচে থাকতে সেখানে গিয়ে দু'তিন মাস থাকতো। এ'ড়েদ' থেকে একবার মামীমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা শুনেছিল। আমি অন্ততঃ ওর কাছে একখানা কথামৃত দেখেছি। আশা রামায়ণ মহাভারত পড়তো, গীতা দু'বেলা পড়তো, কবিতা কিছু কিছু পড়তো।

সৎমাকে বলতো—নিধু খুব বুদ্ধিমান মা, ও পড়লে মানুষ হবে—

মা বলতো—বিধুকে কেমন দেখলি?

—বুদ্ধি নেই এর মত। তবে কিছু হবেই।

—তুই চেষ্টা কর্, হয়ে যাবে।

আশা যেন উঠে পড়ে লেগে গেল নিধুকে মানুষ করতে। শয়নে স্বপনে ওর এই এক ভাবনা। নিধুর এতটুকু বেচাল দেখলে নিজে শাসন করে, কড়া পাহারায় পড়াশুনো করায়, একদিন স্কুল কামাই করলে ভাত দেওয়া বন্ধ ক'রে দেয়।

অথচ আশা আর বিধু নিধুর বয়সের তফাৎ খুব বেশি নয়। আট বছরের কি দশ বছরের।

পাড়ার লোকে বলতো—ওদের মা আর ওদের কি করে—আশা ওদের দিদিকে দিদি, মাকে মা—

শরৎ চেষ্টার ত্রুটি করে নি ওদের সম্পত্তি ফাঁকি দেবার। আশা না থাকলে ওরা পথের ফকির হ'ত এ কথার কোন ভুল নেই। শরৎ অত্যন্ত কুচরিত্রের লোক, মদ এবং আনুষঙ্গিক সব কিছুই তার ছিল।

একবার মদ খেয়ে বিধুকে ডেকে বললে—বিধু, এই কাগজখানাতে একটা সই দিতে বল্ মাকে—

বিধু একে বড়দাকে ভয় করে, তার ওপরে মা'তাল অবস্থায় বড়দা অধিকতর ভয়ের কারণ, ভালোই জানে সে। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে সে কাগজখানা মায়ের কাছ থেকে সই করিয়ে নিয়ে এসে দিলে।

শরৎ চলে গেল।

এর দিনদশেক পরে আশা নাইতে গিয়ে দেখলে ওদের ঘাটের ধারের বাগানে সাত আটজন লোকের জটলা। পাঁচজন কাঠুরে গাছ কাটছে, দু'জন লোক দাঁড়িয়ে লোক খাটাচ্ছে; আশার সঙ্গে ছিল গোয়ালপাড়ার কালী গোয়ালিনী। সে কালীকে বললে—পিসি, গিয়ে জিজ্ঞেস করো তো ওরা গাছ কাটছে কেন?

কালী জিজ্ঞেস ক'রে এসে বললে—মাঠাকরুণ, ওনারা বললে, শরৎবাবু এ বাগানের গাছ বিক্রি করেছে আমাদের কাছে।

—সে কি কথা! জিজ্ঞেস ক'রে এসো কত টাকায় বিক্রি করেচে?

কালী আবার গেল এবং ফিরে এসে বললে—তিনশো টাকায় মা ঠাকরুণ—

আশা তখুনি বাড়ী গেল তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে। শরতের সঙ্গে কথাটা বলতে শরৎ ধীরভাবে বললে—কেন, তোমায় সব জানাতে হবে নাকি? তুমি বাড়ীর কে? মা'র ভাগ মা সই ক'রে বিক্রি করেচেন, নাবালকদের অছি হয়ে—

—কত টাকা দিয়েছ মাকে?

—সে খোঁজে তোমার দরকার নেই, জিজ্ঞেস ক'রে এসো—

—তা ছাড়া ও বাগানের গাছ কেটে বিক্রি করার কি ক্ষমতা আছে তোমার? পঞ্চাশ ষাট টাকার ফল বিক্রি হয় বছরে। কেন ও বাগানের গাছ কেটে বিক্রি হবে? মা সই দিয়েছে?

—তোমার কাছে আমি সে কৈফিয়ৎ দিতে রাজী নই, যাও তুমি—

আশা ছুটে এসে সৎ-মাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলে, কিছুদিন আগে একখানা কাগজে সই দিয়েছিলেন বটে, তবে কি জন্যে তাঁর সই নেওয়া হ'ল তা জানেন না তিনি। হ্যাঁ,

কাল বিকেলে বিধু এসে তাঁর হাতে তিরিশটি টাকা দিয়ে বলেছিল, বড়দা দিয়েচে। তিনি বাক্সে তুলে রেখে দিয়েছিলেন—এই পর্যন্ত।

আশা রেগে বললে—তুমি একটি আস্ত বোকা। সই দিতে বললে অমনি দিলে! আমাকে জিজ্ঞেস কর নি কেন? তুমি কি জানো কিসের সই?

—তুই তখন বারের পুজো দিতে গিইচিস পঞ্চানন্দ তলায়। শনিবারের দুপুরে। তা ছাড়া শরৎ মদ খেয়ে এসেছিল। বিধু ভয়ে কেঁদেই বাঁচে না। জানো তো যমের মত ভয় করে ওরা শরৎকে!

—তা তো জানি, এদিকে যে দিব্যি ওদের মাথায় হাত বুলোলো বড়দা। তিনশো টাকায় বাগান বিক্রি করেচে। তার তিন ভাগের এক ভাগ একশো টাকা তুমি পাবে—সেই জায়গায় তিরিশটি টাকা ঠেকিয়েচে মোটে—উঃ কি অন্যায় কাজ বড়দার! বোকা বুঝিয়ে দিয়েচে তিরিশ টাকা দিয়ে। তুমি জিজ্ঞেস করলে না কেন এ টাকা কিসের? আচ্ছা মা, এত বোকা হলে মানুষ সংসার করতে পারে? বিধু নিধু যখন পথে বসবে তখন মজা টের পাবে কে শুনি? তুমি না আমি?

আশা গিয়ে তুমুল ঝগড়া বাধালে শরতের সঙ্গে। ফাঁকি দিয়ে গাছগুলো এভাবে জলাঞ্জলি দেওয়া? মায়ের টাকার ভাগই বা দেওয়া হয়েচে কই?

শরৎ তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—যা-যা, যা পারিস তুই করগে—

আশা রাঙামুখে বললে—বড়দা, তুমি এখনো চেনো নি আমায়। বিধু নিধুকে আর ওই বোকা-সোকা মাকে ফাঁকি দিতে পারো, কিন্তু আমায় পারবে না। এই চললাম বাগানে, দেখি কার সাধ্যি বাগানের গাছ কেটে নিয়ে যায়—আয় তো বিধু আমার সঙ্গে—এখনো এত অরাজক হয় নি দেশে বড়দা—

আশা গিয়ে বাগানে যারা গাছ কাটছিল, বিধুকে দিয়ে তাদের বারণ ক'রে পাঠালে। গাছ বিক্রি করা হয় নি বিধুদের অংশের, বাগানের গাছে কেউ যেন হাত না দেয়।

আশার চেহারার মধ্যে এমন কি একটা জিনিস ছিল, সকলে সমীহ ক'রে চলতো। তারা টাকা দিয়ে দলিল লেখাপড়া ক'রে নিয়েছিলো আগেই—তবুও আশার কথায় গাছ কাটা বন্ধ করলে।

শেষ পর্যন্ত শরতের কাছ থেকে টাকা ফেরৎ নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হ'ল তারা।

এই সব ব্যাপারে শরৎ ক্রমে আশার মহাশত্রু হয়ে উঠলো। ওর ওপরে নানা নির্যাতন শুরু হ'ল—এমন কি বড় ভাই হয়ে বোনের নামে হীন কুৎসা রটাতেও দ্বিধা করলে না।

আশা শরতের কাছে গিয়ে বললে—বড়দা, তুমি আমার নামে গাঙ্গুলী কাকার কাছে এসব কি বলে এসেছো?

শরৎ মন দিয়ে হাঁসের পেনের ডগা কাটছিল। শরতের স্ত্রী সামনে দাঁড়িয়ে চায়ের পেয়ালা হাতে। শরৎ ওর দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে বললে—কেন এখানে এসেচিস? বলবো না? তুমি বড্ড সতী—তা আমার জানতে বাকি নেই—

—কেন, কি করেছি আমি?

শরতের উত্তর ছাপাবার অযোগ্য।

আশা মুখ ফিরিয়ে শরতের স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললে—শুনলে তো বৌদিদি? বড়দাদার কথা?

শরতের স্ত্রী স্বামীকে অনুযোগের সুরে বললে—কি যে বলো, অত বড় সোমত্ত বোনকে ওই সব—

শরৎ দাঁত খিঁচিয়ে বললে—তুমি চা দিয়ে চলে যাও দিকি, নিজের কাজ দেখো গে—

শরতের স্ত্রী চোখের ইশারায় আশাকে চলে যেতে বলে সেখান থেকে সরে গেল।

আশা সে কথা শুনলে না, দুজনে ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে গেল। পাড়ার লোকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগলো। আশাকে অনেক অপমানজনক কটূক্তি শুনতে হ'ল শরতের মুখে। শেষ পর্যন্ত শরতের স্ত্রী হাত ধ'রে সেখান থেকে টেনে নিয়ে গেল। আশার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছিল, আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে—দেখো দিকি বৌদি—কি সব কথা যে উনি বলেন!...শুনেছিলে তো বৌদিদি? আমি না কি—

—তুমি ওবাড়ী চলে যাও ঠাকুরঝি, কেন মিথ্যে অপমান হওয়া—আমি কি বলবো বলো? আমার বলবার যো নেই কিছু সবই জানো। খিড়কি-দরজা দিয়ে চ'লে যাও—

কিছুতেই কিন্তু আশাকে দমানো গেল না। সে ডানা দিয়ে আগলে রেখে দিলে বিধু নিধু শৈলকে নয় শুধু, তাদের মাকে পর্যন্ত, যদিও ওর মা তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। গ্রামের লোকে আশাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। অনেকে অনেক রকম সাহায্য পেতো আশার কাছ থেকে। কারো আঁতুড়ে রাত জাগতে হলে আশা, কোনো যজ্ঞি-বাড়ীতে রান্না করতে আশা, কারো বাড়ী থেকে পুরুষ অভিভাবক বিদেশে যাবেন, সে বাড়ীতে দু'চার দিন শুতে হ'লে আশা, কারো বাড়ীর ডাল বেটে দেবার সময়ে আশা। সারা গাঁ-খানার যে কোনো বিপদে আশাকে সবাই স্মরণ করবে এবং পাবেও। পাবে ঠিকই, ঘড়ির কাঁটার মত পাবে। কখনো নিরাশ করে নি কাউকে।

সে-বার বৃদ্ধ বেণী হালদার ওকে বললেন—দিদি, একটা উপকার করতে হচ্ছে। রাতে কষ্ট পাচ্চি—একটু দুধ পেলে খেতাম। দুধ পাওয়া যায় না, আমি গরীব, আমায় কেউ দেয়ও না। ছনু বোষ্টবের গাই দুধ দিচ্ছে, তুমি গিয়ে বলে কয়ে যদি একপোয়া ক'রে দুধ দৈনিক যোগান দেওয়ানোর ব্যবস্থা করতে পারো—

—দাদু, আপনার ভাত রেঁধে দেয় কে?

—যম। কে দেবে দিদি, এ গাঁয়ে কি কেউ কারও দিকে তাকায়? তোমার দিদি মারা গিয়েচে আজ ছ'বছর, এই ছ'বছরই হাঁড়ি ঠেলচি। ছেলে নেই—মেয়ে থাকে শ্বশুরবাড়ী। আমি না রাঁধলে রাঁধবে কেডা?

—আমি যদি রেঁধে দিই, খাবেন দাদু? যতদিন আপনার বাত না সারে, রেঁধে দিলে খাবেন?

—খাবো। খেয়ে বর্তে যাবো। দু'হাত তুলে নাচবো। মনে করবো ছিক্ষেত্তরের মহাপ্রসাদ খেলাম। কেন, একথা বললি কেন দিদি?

—আমার নামে নানা রকম রটনা রটেচে কিনা গাঁয়ে। বড়দা রটিয়ে বেড়াচ্চে—

—আমার মায়ের নামে যদি রটনা রটতো তবে আমি তাঁর হাতে খেতাম না?

মাস দুই অর্থাৎ সে-বার গোটা শীতকাল ধরে রোজ সকালে এসে বুড়ো বেণী হালদারের রান্না ক'রে দিতো আশা। ফলে সেই শ্রাবণ মাসেই যখন বেণী হালদার মারা গেলেন, তখন নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি থেকে দু'বিঘে আমন ধানের জমি তিনি আশার নামে উইল ক'রে দিয়েচেন শোনা গেল। এ নিয়ে মোকর্দমার সৃষ্টি হয়েছিল। বেণী হালদারের জামাই এসে বললে, ও উইল জাল। সব সম্পত্তি তার ছেলের প্রাপ্য। আশা কে যে তাকে সম্পত্তি দিয়ে যাবেন তাঁর শ্বশুর? শরৎ বেণী হালদারের জামাইয়ের তরফে মোকর্দমার গোপনে তম্বিরও করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশার জমি কেউ কেড়ে নিতে পারে নি।

বিধুর লেখাপড়া যেটুকু হয়েছিল তা আশার চেষ্টা ও উৎসাহের ফলেই। নিধু লেখা-পড়ায় খুব ভালো, ম্যাট্রিক পাশ করলে বেশ ভাল ভাবে। ইদানীং শরৎ সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে গিয়েছিল, এদের সম্পত্তিতে হাত দিতে সাহস করতো না, আশাকে ভয় করতো। সেই শরতের বৌ যখন মারা গেল, আশা গিয়ে শরতের সংসারে বুক দিয়ে পড়লো। ওর ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো, রান্না ক'রে খাওয়ানো, সব কিছু করতো আশা। অবিশ্যি বেশিদিন করতে হয় নি, কারণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে শরৎ তিন মাসের বেশী দেরি করে নি।

আশা চোখের জল ফেলে বলেছিল—বৌদিদির যে কি গুণ ছিল, তা কেউ জানতো না, আমি জানতাম। বড়দার ভয়ে জুজু হয়ে থাকতো বেচারি, নিজের ইচ্ছেতে কিছু করবার কি তার উপায় ছিল? অমন বৌকে বড়দা চিনতে পারলে না—দু'দিন যেতে তর সইল না, অমনি বিয়ে ক'রে নিয়ে এলো!

মাঘমাসের শেষ। আশা শরতের বাড়ী গিয়ে বললে—বড়দা, তোমায় যেতে হবে একবারটি—

—কোথায় যাবো?

—বিধুর বিয়ের জন্যে হাঁটাহাঁটি করচে সাতবেড়ের দুঃখীরাম চৌধুরী। একবার গিয়ে মেয়ে দেখে এসো—

—আমি যাবো?

—তবে কে যাবে বলো। তুমি আমাদের মাথার মণি, বংশের বড় ছেলে, আমাদের সকলের অভিভাবক। তুমি যা ঠিক করবে ওর বিয়ের বিষয়ে, তাই হবে। যাও গিয়ে দেখে এসো বড়দা—

শরৎ খুশি হয়ে মেয়ে দেখে এসে সব ঠিকঠাক করলে বিয়ের ব্যাপারের। ফাল্গুন মাসেই বিধুর বিয়ে হয়ে গেল। বোশেখ মাসে সরাটি-ফুলসারার পাঁচ আনি জমিদার বাড়ী থেকে নিধুর বিয়ের সম্বন্ধ এল। কেন না নিধু ভালো ছেলে, সেবার আই. এ. পরীক্ষা দেবে। আশা আবার গিয়ে শরৎকে ধরলে। শরৎকে বললে—বড়দা, বিয়ে তুমি দিয়ে দিও যদি মেয়ে ভালো হয়, কিন্তু নিধুকে যেন তাঁরা আরও পড়ান। পয়সাকড়ি আমাদের দিতে হবে না তাঁকে। মেয়ের বাবাকে এই কথাটা বোলো বড়দা—

নিধুর বিয়ে হয়ে গেল এখানেই। ওরা নিধুকে বি. এ. পড়াবার খরচ দিতে লাগলো। যেবার নিধু বি. এ. পাশ ক'রে শ্বশুরের যত্নে এম. এ. আর আইন পড়তে ভর্তি হ'ল ইউনিভার্সিটিতে, আশা সে-বার খুব অসুখে পড়ল।

ভাদ্রমাসের শেষ। খুব বর্ষা। নিধু কলকাতায়, বিধু মীরপুরের জমিদারী কাছারীতে কাজ করে, সস্ত্রীক সেখানেই থাকে, বাড়ীতে কেবল বিধুর মা আর ওদের সকলের ছোট অবিবাহিতা বোন দুলা। আশা ডাক্তার ডাকতে দেবে না। বিধু সামান্য রোজগার করে, ডাক্তারের খরচ পাবে কোথায়? এমনি সেরে যাবে।

রোগ হঠাৎ বেঁকে দাঁড়ালো। দুলা দৌড়ে গিয়ে শরৎকে ডেকে নিয়ে এলো। শরৎ এসে বললে—কি হয়েচে মা? আশার নাকি অসুখ?

ওদের মা কেঁদে বললে—বাবা শরৎ, তুমি বাঁচাও আমার আশাকে—ও আমার মেয়ে নয়, ও বিধু নিধুদের মা। আমি তো মিথ্যে মা হয়েছিলাম। কি করলাম কার? ওই করেচে সব! সর্বস্ব বিষয় বিক্রি ক'রে দাও, আমার মাকে বাঁচিয়ে তোলো। দুপুর থেকে মা আমার অজ্ঞান হয়ে আছে, পাঁচ সাড়ে পাঁচ জ্বর, লোক চিনতে পারচে না, বিছানা হাতড়াচ্চে—

এসব আট দশ বছর আগেকার কথা। বিধু এখন চালের কল আর আড়ত ক'রে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে, নিধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বারাসতে পরিবার নিয়ে আছে সম্প্রতি। বড়দিদির কথা বলতে বলতে এখনো ওদের চোখ দিয়ে জল পড়ে। আশার স্মৃতি আমাদের গ্রামের আকাশ-বাতাস ছেয়ে আছে। এখনো সকলে বলে—সৎ-বোন হলেই কি খারাপ হয়—না সৎ-মা সৎ-ভাই হলে খারাপ হয়—আশাকে দেখেচো তো?

নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব

সাহেবের নাম এন. এ. ফারমুর। নীলগঞ্জের নীল কুঠীয়াল সাহেবদের বর্তমান বংশধর। আমি বাল্যকাল হইতেই সাহেবকে চিনি। যখন স্কুলে পড়ি, সাহেবদের কুঠীতে একবার বেড়াইতে যাই। ফারমুর সাহেবকে এদেশের লোক ফালমন্ সাহেব বলিয়া ডাকে। আমার বাল্যকালে ফালমন্ সাহেবের বয়স ছিল কত? পঞ্চাশ হইবে মনে হয়। সাহেবদের কুঠীতে যাইয়া দেখিতাম সাহেব দুধ দোয়াইতেছেন। অনেকগুলি বড় বড় গাই ছিল কুঠীতে, বিশ ত্রিশ সের দুধ হইত। নৌকা করিয়া প্রতিদিন ওই দুধ মহকুমার শহরে প্রেরিত হইত। আমাকে বড় ভালোবাসিতেন। আমাকে দেখিয়া বলিতেন—সকাল-বেলাতেই এসে জুটলে? খাবা কিছু?

—খাবো।

—কি খাবা? দুধ?

—যা দেবেন।

—ও মতি, ছেলেটিকে গুড় দিয়ে মুড়ি দাও আর দু'উড়কি দুধ দাও।—আমি এই মাত্তর খেয়ে আলাম—বোসো খোকা, বোসো।

নীলকুঠীর আমলে ফালমন্ সাহেবের বাবা লালমন্ (লালমুর) সাহেবের অসীম প্রতিপত্তি ছিল এদেশে। নীল চাষ উঠিয়া যাইবার পরে বিস্তৃত জমিদারীর মালিক হইয়া এ দেশেই তিনি বসবাস করিতে থাকেন। ক্রমে জমিদারীও চলিয়া যায় অনেক, লালমন্ সাহেবও মারা যান। ফালমন্ বিস্তৃত আউশ ও আমন ধানের জমি চাষ করিতে থাকেন, বড় বড় গরু পুষিতেন, সেই সঙ্গে হাঁস, মুরগী, ছাগল ও ভেড়া। সাহেবের কুঠীতে সারি সারি ধানের গোলা ছিল বিশ ত্রিশটা। জমিদারীও ছিল, কুঠীর পূর্বদিকের বড় হলদে ঘরে (যার সামনে বেগুনি প্যাটেনফুলের প্রকান্ড গাছ, কি ফুল জানি না, আমরা বলিতাম 'প্যাটেন' ফুল) কুঠীয়াল সাহেবের নায়েব ষড়ানন বক্সি কাছারি করিতেন এবং প্রজাপত্র ঠেঙাইতেন। লালমন্ সাহেব কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছিলেন বলিতে পারিব না, তবে তাঁহার বৈঠকখানায় একখানা বড় ছবির তলায় লেখা ছিল "T. Farmour of Bournemouth, England." ফালমনের জন্ম নীলগঞ্জেই। তাঁহাদের সকলেই যশোর জেলার পাড়াগাঁয়ের কৃষক শ্রেণীর ভাষায় কথা বলিতেন।

—কি পড়ো?

—মাইনর, সেকেন্ ক্লাসে।

—ইউ. পি. পাশ করেচ?

—হ্যাঁ।

—বিত্তি পেয়েছিলে?

—না।

—আমার ইস্কুলে পড়ো?

—আপনার ইস্কুলে না। জেলাবোর্ডের স্কুলে, চেতলমারির হাটতলায়।

—ও বুঝিচি। তবে তোমার বাড়ী এখানে না?

—আজ্ঞে না। আমার পিসির বাড়ী এখানে।

—কেডা তোমার পিসে?

—ভূষণচন্দ্র মজুমদার।

—আরে মজুমদার মশায়ের বাড়ী এসেচ তুমি? বেশ বেশ, নাম কি?

—শ্রীরতনলাল চক্রবর্তী।

—পিতার নাম?

—শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

—তুমি মাখনলাল মাস্টারের ছেলে? চেতলমারির ইস্কুলির?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাই বলো। মাখন মাস্টার তো আমাদের বন্ধু লোক। বেশ, বসো, দুধ দিয়ে মুড়ির ফলার ক'রে খাও।

ফালমন্ সাহেবের সঙ্গে এই ভাবেই আলাপ শুরু। তা' বাদে মাঝে মাঝে সাহেবকে চিতলমারির খড়ের মাঠে আমীনকে সঙ্গে লইয়া জমি মাপিতে দেখিয়াছি। কতদিন নৌকায় লোকের সাহায্যে পটল কুমড়া বোঝাই করিতে দেখিয়াছি। লম্বা একহারা সাহেবী চেহারা। ভুঁড়ি একদম নাই, গায়ে এক আউন্স চর্বি নাই কোথাও। গোঁফ জোড়াটা বড্ড লম্বা, দৃঢ় চোয়াল, সবই ঠিক সাহেবী ধরনের। কিন্তু পোশাকটা সব সময় সাহেবের মত নয়, কখনো ধুতি, কখনো কোটপ্যান্টের উপর মাথায় তালপাতার টোকা। শেষোক্ত বেশটা দেখা যাইত যখন ফালমন্ মাঠের চাষবাসের তদারক করিতেন। কৃষাণ ছিল সংখ্যায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, লাঙল গরু চল্লিশখানা, আট দশখানা গরুর গাড়ী। অত বড় ফলাও চাষ সাধারণ কোনো বাঙালী গৃহস্থ চাষী কল্পনাও করিতে পারে না। তালপাতার টোকা মাথায় কৃষকদের কাজকর্ম দেখাশোনা করিতেন বটে, কিন্তু হুঁকোয় তামাক খাইতে কখনো দেখি নাই—পাইপ সর্বদা মুখে লাগিয়াই থাকিত। কৃষাণদের বলিতেন—বাবলাতলার জমিগুলোতে দোয়ার (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার চাষ) দেবা কবে ও সোনাই মন্ডল? তা দাও।

তার দেরি করবা না। রস টেনে গেলি ঘাস বেধে যাবে আনে। তখন লাঙ্গল বেশী লাগবে। এখনো ভুঁইতে রস আছে।

সোনাই মন্ডল হয়তো বলিল—বাবলাতলার ভুঁইতে পানি আর কনে, সাহেব? কে বল্লে আপনারে?

—নেই? কাল সাঁজের বেলা আমি আর প্যাট্ (সাবেবের শালা, এখানে বরাবর থাকিতে দেখিতাম, চাষবাসের কাজ দেখে) যাইনি বুঝি? ঝা পানি আছে তাতে কাজ চলে যাবে আনে।

—ছোলা কাটতি হবে এবার।

—এখনো দানা পুরুষ্ট হয়নি, আর চার পাঁচটে রোদ খাক্। সময় হলি ব-অ-ল-বো—

এই সময় নদীপপুরের গোপেশ্বর বৈরাগীকে মাঠের পাশের পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া মাথার টোকাটা কপালের উপর দুই আঙ্গুল দিয়া একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া বলিলেন—ও গোপেশ্বর—শোনো—ও গোপেশ্বর—

গোপেশ্বর আসিয়া বলিল—সেলাম সায়েব—

সাহেবের দোর্দণ্ডপ্রতাপ এ অঞ্চলে, কারণ অধিকাংশই তাহার প্রজা।

—যাচ্চ কনে?

—যাবো একবার পানচিতে। মেয়ের খবর পাইনি অনেক দিন। জামাইডা কেমন আছে দেখে আসি, পেট জোড়া পিলে তার। গত অঘ্রান মাসে যায় যায় হইছিল—

—ম্যালেরিয়া?

—তা আমরা কি বুঝি? তাই হবে।

—বেশ। একটা কৃষ্ট বিষয় গান করে শুনিয়ে দাও দিকি?

—কৃষ্ট বিষয়?

—কিংবা শ্যামা বিষয়। না, তুমি বোষ্টম টুম টুম আবার বুঝি শ্যামা বিষয় গাইবা না। ঝা মন চায় একখানা শোনাও। বড্ড রোদ পড়েচে, শরীলির কষ্ট হয়েচে বড্ড। বোসো, এই পিটুলিতলায় ছাওয়া পানে।

গোপেশ্বর গান গাহিতে বসিয়া দুবার কাশিল, সাহেবের দিকে লাজুক দৃষ্টিতে দু'-একবার চাহিয়া পরে গান আরম্ভ করিল—

কোন্‌টি তোমার আসল রূপ শুধাই তোমারে—

ফালমন্ সাহেব হাতে তালি দিতে দিতে বলিলেন—বাঃ বাঃ—বেশ গলা—দাশুরায় না নীলকণ্ঠ?

—নীলকণ্ঠ।

—দাশুরায় একখানা হোক না?

সাহেবের আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই এ অঞ্চলে, সুতরাং গোপেশ্বরকে আর একখানা গান গাহিতেই হইল।

ভয়ে আকুল বসুদেব
দেখে অকূল যমুনা।
কূলে বসে দুনয়নে বারি ঝরে
কোলে অকূলের কাণ্ডারী তাও জানে না।
একবার ভাব যদি বর্তমান কংসের পদে
দৈবে দয়া যদি হোত পাষাণ হৃদে—
তা হয় না আর
গেল একূল ওকূল দুকূল
অকূল পারে গোকুল
কুলের তিলক রাখতে কূল পেলেন না।
ভয়ে আকুল বসুদেব
দেখে অকূল যমুনা—

ফালমন্ সাহেব চক্ষু মুদিয়া পাইপ টানিতে টানিতে গান শুনিতেছিলেন। আবার

গোপেশ্বরের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—বাঃ বাঃ—দাশুরায়ের গানের কাছে আর-সব কিছু লাগে না। কি রগম—কি ওরে বলে গোপেশ্বর?

—অনুপ্রাস?

—ওই যা বললে। ভারি চমৎকার, লাগাতিই হবে যে, দাশুরায় হুঃ—

—আজ উঠি সাহেব।

—আচ্ছা এসো—

ফালমন্ সাহেবের কাছারী ঘরে—রাম শ্যামকে মারিয়াছে, শ্যামের গরু যদুর পটলের ক্ষেত নষ্ট করিয়াছে—এই সব গ্রাম্য মামলার বিচার হইত। বিচার সাধারণতঃ করিত নায়েব ষড়ানন বক্সি, গুরুতর মোকর্দমায় ফালমন্ সাহেব নিজে বিচারাসনে বসিতেন।

আমি দেখিয়াছিলাম যেদিন গুড়ে জেলের ভাই-বৌ রেমো ধোপার ছেলে অতুলের সঙ্গে সোজা চম্পট দেওয়ার পরে আড়ংঘাটা স্টেশনে ধরা পড়িয়া পুনরায় গ্রামে আনীত হইল, সেদিন ফালমন্ সাহেবের বিচার। গ্রামে হৈ চৈ কান্ড পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ দু'দশ বছরে এই ধরনের ব্যাপার কেহ এ অঞ্চলে দেখে নাই, শোনেও নাই।

ফালমন্ সাহেব অতুলকে কড়া সুরে প্রশ্ন করিলেন—জেলেবৌয়ের বয়সটা কত?

অতুল কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—তা জানিনে সাহেব।

—তোমার চেয়ে বড় না ছোট?

—আমার চেয়ে বড়।

—তোমার বয়েস কত?

—আজ্ঞে, এই তেইশ।

রেমো ধোপার দিকে চাহিয়া সাহেব বলিলেন—এই রেমো, বয়েস ঠিক বলচে তো?

রেমো বলিল—হাঁ, সাহেব।

—আর জেলে-বৌয়ের বয়েস কত?

গুড়ে জেলে বলিল—আজ্ঞে, বত্রিশ।

—বত্রিশ?

—আজ্ঞে।

সাহেব রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে অতুলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তোর বড় দিদির বয়িসী যে-রে হারামজাদা—তোর লঘু-গুরু জ্ঞান নেই? মারো দশ জুতো সকলের সামনে—আর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা, যাও—

ব্যস্ বিচার শেষ।

আর কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ বা ওকালতি খাটিবে না।

The great khan has spoken—মিটিয়া গেল!

সেকালের নীলকুঠীর অটোক্র্যাট্ ভূম্যধিকারীর রক্ত ছিল ফালমন্ সাহেবের গায়ে. প্রজাপীড়ন ও শোষণে তিনি তেমনি পটু, তবে যুগপ্রভাবে নখ-দন্ত অপেক্ষাকৃত ভোঁতা—এইমাত্র।

সেবার মস্ত বড় দাঙ্গা বাধিল বাগ্দী ও জেলে প্রজাদের মাৎলার বিলের দখল লইয়া। মাৎলার বিল বরাবর বাগ্দী প্রজাদের কাছে বন্দোবস্ত করা ছিল রানী রাসমণি এস্টেটের স্বরূপনগর কাছারী থেকে। কখনো এক পয়সা খাজনা আদায় হইত না। মামলা মোকর্দমা করিয়াও কিছু হয় না—তখন রানী-এস্টেটের নায়েব ভৈরব চক্রবর্তী মাৎলার বিল দশ বৎসরের জন্য ইজারা দিলেন ফালমন্ সাহেবকে। সেলামি এক পয়সাও নয়. কেবল শালিয়ানা আড়াইশো টাকা খাজনা। কারণ দুর্ধর্ষ জেলে ও বাগ্দী প্রজাদের কাছ থেকে বিলের দখল পাওয়াই ছিল সমস্যা—সাহেবের দ্বারা সে সমস্যা পূরণ হইবে. ভৈরব চক্রবর্তীর এ আশা ছিল এবং সে আশা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়—বিল ইজারা দেওয়ার এক পক্ষ. কালের মধ্যেই পদ্মফোটা মাৎলা বিলের রক্ত-রঞ্জিত জল তাহার প্রমাণ দিল। প্রকাশ ফালমন্ সাহেব স্বয়ং টোকা মাথায় দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া দাঙ্গা পরিচালনা করিয়াছিলেন। যদিও পুলিশ রিপোর্টে পরে প্রকাশ হইল. দাঙ্গার সময় ফালমন্ সাহেব তাঁর বড় মেয়ে মার্জোরির টন্সিল অস্ত্র করিবার জন্যে তাহাকে লইয়া কৃষ্ণনগর মিশন হাসপাতালে যান।

মামলাবাজ ও-ধরনের আর একটি লোক সারা জেলা খুঁজিলে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। প্রায়ই মহকুমায় মামলা পড়িত।

সাহেবের চারদাঁড়ের ডিঙি সাতটার সময় ছাড়িত কুঠিঘাট থেকে। ছইয়ের মধ্যে ফালমন্ সাহেব ও তাঁর খাওয়ার জন্য ফলের ঝুড়ি, জলের কুঁজো, দুধের বোতল, নায়েব ষড়ানন বাবু ও তাঁর বিছানাপত্র, দু'জন মাঝি (তার মধ্যে একজনের নাম গোপাল পাইক, জাতে বাগদী, খুব ভাল গান গাহিতে পারে)—এই লইয়া তীরবেগে নৌকা ছুটিত দশ মাইল দূরবর্তী মহকুমার শহরের দিকে। হু হু করিয়া মুখোড় বাতাস বহিত। গাঙে সাহেবের প্রিয় অনুচর গোপাল পাইক প্রভুর ইঙ্গিতে নৌকার গলুইয়ের কাছ থেকে ছইয়ের কাছে সরিয়া আসিত। সাহেব বলিতেন—একটা কৃষ্ণ-বিষয় কিংব শ্যামা-বিষয় গাও গোপাল—

গোপাল অমনি ধরিত—

নীরবরণী নবীনা রমণী নাগিনী জড়িত জটা সুশোভিনী
নীল নয়নী জিনি ত্রিনয়নী কিবা শোভে নিশানাথ নিভাননী—

তারপর গাহিত—

কি কর কি কর শ্যাম নটবর, ছাড় যাই নিজ কাজে—

গোপাল পাইক যাত্রাদলে অল্প বয়সে গাহিত, সাহেবের সংগীতপ্রিয়তার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ পুরস্কার আশায় একদিন সে নীলগঞ্জের কুঠীতে গাহিতে আসে—গান শুনিয়া সাহেবের বড় ভালো লাগিল এবং সেই হইতে গোপাল সাহেবের এস্টেটের চাকুরিতে বহাল হইয়া গেল।

এক পয়সা খাজনা বাকী থাকিলেও যেমন সাহেবের এস্টেট হইতে নালিশ হইত, আবার ধরিয়া পড়িলে ক্ষমা করিতেও ফালমন্ সাহেব ছিলেন বিশেষ পটু। কতবার এরকম হইয়াছে। দুর্বুদ্ধি প্রজা ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কিংবা উকিল-মোক্তারদের উৎসাহে নীলগঞ্জ এস্টেটের বিরুদ্ধে মামলা লড়িয়াছে। একবার ফৌজদারী, তারপর স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী দেওয়ানী, মহকুমা হইতে সব-জজকোর্ট, সেখান হইতে আবার পুনর্বিচারের জন্য মহকুমার মুন্সেফকোর্ট—এই করিতে করিতে প্রজা এস্টেটকে হয়রান করিয়া এবং নিজেও সর্বস্বান্ত হইয়া যখন জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিল, তখন হিতৈষী বন্ধুদের পরামর্শে কোর্টের বটতলাতেই একেবারে ফালমন্ সাহেবের পা জড়াইয়া উপুড় হইয়া পড়িল পায়ে।

—আরে কি কি, কে?

—আজ্ঞে আমি মুকুন্দ বিশ্বেস।

সাহেব পায়ের ঝটকা মারিয়া বলিলেন—বেরো হারামজাদা—বেরো—বেরো—

ফালমন্ হিন্দী কথাই জানিতেন না, খাঁটি বাংলা ইডিয়মযুক্ত ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং সে শুধু এইজন্য যে নীলগঞ্জের কুঠীই তাঁহার জন্মস্থান, এই গ্রাম্য আম-জাম-নিকুঞ্জ ছায়ার শ্যামলতায় ও কৃষকদের সাহচর্যে তিনি আবাল্য লালিত পালিত ও বর্ধিত। ডরসেট শায়ারের ইংরাজরক্ত ধমনীতে থাকিলেও মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালী, ঊনবিংশ শতাব্দীর নিশ্চিন্ত শান্তি ও আলস্যের মধ্যে যাঁহার যৌবন কাটিয়াছে, সেই সচ্ছল বাঙালী জমিদার। মুকুন্দ বিশ্বাস ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ব্যাপার দেখিতে লোক ছুটিয়া আসিয়া ভিড় বাধাইল। সকলেই ভাবিল সাহেব কি অত্যাচারী! গরীব প্রজাকে কি করিয়া পীড়ন করিতেছে দ্যাখো। একেবারে এইভাবেই সর্বস্বান্ত করিতে হয়? ছিঃ—

কেহ বুঝিল না কিরূপ তেদ'ড় ও দুঁদে-প্রজা মুকুন্দ কলু।

—কি চাই? কি?

—সাহেব মা বাপ—ধরম বাপ—মোরে বাঁচাও ধরম বাপ—

—কেমন? মোকদ্দমা করবিনে? কর ছানি—শোনছেন ও হরিশ বাবু শোনেন—ই দিকি।

চোগা-চাপকান্ পরনে বড় উকিল হরিশচন্দ্র গাঙ্গুলী ঘটনাস্থলের কিছু দূর দিয়া যাইতেছিলেন। সাহেবের আহ্বানে নিকটে আসিতে আসিতে বলিলেন—গুড্ মর্নিং মিঃ ফারমূর, বলি ব্যাপার কি?

—আরে দ্যাখেন না কাণ্ডখানা। চেনেন না মুকুন্দ বিশ্বাসকে? পাচপোতার মুকুন্দ বিশ্বাস। বদমায়েশের নাজির, ওর বদমায়েশী দেখতে দেখতে মাথার চুল আমি পাকিয়ে ফ্যাললাম হরিশবাবু, ওরে আর আমি চিনিনে? শুনুন তবে—আরে নায়েব মশায়, বলুন দিকি সব খুলে—

সব শুনিয়া হরিশবাবু মুকুন্দ কলুকে ধমক দিয়া কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিলেন। সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা! তাহার মত ট্যানাপরা লোকের পক্ষে? যাক্, যাহা হইবার হইয়াছে, সাহেব নিজগুণে এবারটি গরীবকে মাপ করিয়া দিন।

সাহেবকে হরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ বুঝি ডিগ্রির দিন?

—নিশ্চয়। ও এতদিন আমার সঙ্গে একটা কথা কইতো না। আজ একেবারে পায়ে ধরেছে।

ষড়ানন বক্‌সি বলিল—শুধু পায়ে ধরা নয়, একেবারে মড়াকান্না কেঁদে লোক জড়ো করে ফেলেছে—

সাহেব জনতার উদ্দেশ্যে বলিলেন—এই, যাও সব এখান থেকে। এখানে কি? চলে যাও সব—

হরিশবাবু উকিলও সেই সঙ্গে যোগ দিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, তোমরা কেন এখানে বাপু? কাছারীর সামনে ভিড় কোরো না—হাকিম চটবেন—যাও এখন—এখানে কি ঠাকুর উঠেছে?

হিসাব করিয়া ষড়ানন বক্‌সি সাহেবকে জানাইল, এই মামলায় এ পর্যন্ত সাতশো সাড়ে-সাতশো টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।

সাহেব বলিলেন—আচ্ছা যা, মাপ করলাম। নায়েববাবু মামলা মিটিয়ে নেবেন।

ষড়ানন বক্‌সি বলিল—খরচার টাকা?

—ওর সঙ্গে না হয় ষড় করে নেবেন। তবে বলে দিন আমার কুঠীতে গিয়ে নাকে খত দিতে হবে ওকে। নইলি আমি ওকে ছাড়বো না। ও নাকে খত দিতে রাজী কি না?

মুকুন্দ বিশ্বাস খুব রাজী। সে এখনি নাকে খত দিতে প্রস্তুত আছে। সাহেবের আশ্বাস পাইয়া সে চলিয়া গেল।

সেবার শীতকালের মাঝামাঝি মিসেস্ ফালমন্ লিভারের অসুখে ভুগিয়া কলিকাতার হাসপাতালে মারা গেলেন। দিন-সাতেক পরে নীলগঞ্জের চারিপাশের পাঁচ-ছয়খানি গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ গৃহস্থদিগের কাছে তাহাদের মত জিজ্ঞাসা করা হইল—মেমসাহেবের আত্মার মঙ্গল কামনায় যদি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা হয়, তাঁহারা খাইবেন কিনা। তখনকার দিনে এসব ধরনের খাওয়ায় সামাজিক কড়াকড়ি অনেক বেশী ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণদের রাজী না হইয়া এক্ষেত্রে উপায় ছিল না। সাহেবকে চটাইতে কেহই রাজী নয়।

নীলগঞ্জের কাছারি ঘরের সামনে তুঁততলায় দুদিন ধরিয়া কালী ময়রা সন্দেশ, বোঁদে, পানতুয়া ভিয়ান করিল। কাছারি বাড়ীর হলে ব্রাহ্মণ-ভোজনের যে বিরাট ব্যবস্থা হইয়াছিল, এ অঞ্চলে সে রকম খাওয়ানো কখনো কেহ দেখে নাই।

ফালমন্ সাহেব কুঠীর গেটে নিজে দাঁড়াইয়া প্রত্যেককে বলিতেছিলেন—পেট আপনাদের ভরেছে? কষ্ট দেলাম আপনাদের এনে। কিছু মনে করবেন না—

আমিও সে দলে ছিলাম, তখন স্কুলের বালক, ভূরিভোজন করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলাম। দীর্ঘাকৃতি ফালমন্ সাহেবের সে বিনীত মুখভাব, সৌজন্যপূর্ণ সহৃদয় দৃষ্টি এখনো মনে আছে। মানবতার উদার গতিপথের পার্শ্বে অবস্থিত এই ছবিখানি আজকার এই হিংসা দ্বেষ ও সাম্প্রতিক ধর্মমতের দ্বন্দ্বের দিনে বেশী করিয়া স্মরণে উদিত হয়।

বারোয়ারি যাত্রার আসরে ফালমন্ সাহেব সকলের সামনে চেয়ার পাতিয়া বসিতেন। যাত্রাগানের অমন ভক্ত দুটি দেখা যাইত না।

—ও বেয়ালাদার, একটা এ'কালে গৎ ধরো বাবা—জুড়িদের এগিয়ে দাও—

সাহেবের ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতে যাত্রাদলের গাইয়ে বাজিয়ে ব্যতিব্যস্ত।

আর কৃষ্ণ সাজিয়া আসিয়া গান ধরিলেই হইল, অমনি মেডেল ঘোষণা।

সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিবেনই—এই যে ছোঁড়াডা কৃষ্ট সেজে এসে গানখানা করে গেল, ওরে আমি একটা রুপোর মেডেল দেবো। কথা শেষ করিয়াই চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাসিমুখে চাহিয়া বলিতেন—হাততালি—হাততালি—

অমনি চট্‌পট্‌ করিয়া চতুর্দিকে হাততালি পড়িবে। নিজে সকলের আগে হাততালি দিবেন।

কোন করুণ ভক্তিরসের ব্যাপার ঘটিলে সাহেব সকলের সঙ্গে 'হরিবোল' দিয়া উঠিবেন।

বারোয়ারিতে চাঁদা দিতে সাহেব যেমন মুক্তহস্ত, তেমনি রক্ষাকালীপূজা বা শীতলা-পূজার অনুষ্ঠানে। তখনকার দিনে বারোয়ারি দুর্গাপূজো বা শ্যামাপূজার রেওয়াজ ছিল না।

মিসেস্‌ ফালমন্‌ মারা যাওয়ার পরে নীলগঞ্জের কুঠীর রাঙা 'প্যাটেন' ফুলের গাছ, নদীর ধারের অত বড় বাড়ী, লেবু ও আমের বাগান, পসার প্রতিপত্তি, অর্থসম্পত্তি সব কিছু শ্রীহীন হইয়া পড়িল। বাড়ীর এক নিম্নজাতীয়া দাসীর সঙ্গে সাহেবের নাম জড়িত হইয়া চারিদিকে প্রচার হইতে লাগিল। মার্জোরি ও ডোরা বিবাহ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সাহেবের যে ছেলে বিলাতে পড়িত, সে আর এদেশে আসিলই না। শোনা গেল, ইংলণ্ডেই বিবাহ করিয়া সেখানেই সংসার পাতাইয়া সে ইংলণ্ডের প্রজাবৃদ্ধির দিকে মন দিয়াছে।

এই সময় নীলগঞ্জের কুঠীতে এক ঘটনা ঘটিল।

বাহির হইতে কে একজন সাহেব আসিয়া কিছুদিন কুঠীতে রহিল। এ সময়ে প্যাটও কুঠী হইতে চলিয়া গিয়াছিল। নবাগত সাহেবের নাম মিঃ মুডি। এ অঞ্চলে তাহাকে "মুদি সাহেব" বলিত সবাই। মুদি সাহেব একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খাইত।

একদিন কি ঘটিয়াছিল কেহ জানে না, গভীর রাত্রে মিঃ ফাল্‌মনের সঙ্গে মুদি সাহেবের বচসার শব্দ শোনা গেল। বাহির হইতে চাকরে বাকরে কিছু বুঝিল না। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল, সকলে ছুটিয়া গিয়া দেখে মুদি সাহেবের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ ঘরের মেঝেতে লুটাইতেছে এবং ঘরের কোণে সেই নীচজাতীয়া দাসীটা দাঁড়াইয়া থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে।

পুলিশ তদন্ত হইল। কিন্তু মিঃ ফাল্‌মনের কিছু হয় নাই, ব্যাপার নীলকুঠীর শক্ত কম্পাউণ্ডের বাহিরে এক পাও গড়ায় নাই।

এই ঘটনার পরেও ফালমন্‌ সাহেব অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। একাই থাকিতেন। পুত্র-কন্যা কখনো আসিত না। সাহেবের এক ভাই শোনা যায় ইংলণ্ড হইতে কতবার তাহাকে সেখানে যাইতে লিখিয়াছিল, ফালমন্‌ সাহেব বলিতেন—এদেশেই জন্ম এদেশ ভালবাসি। যাবো কোথায়? যখন মরে যাবো ওই নিমতলাডায় করব দিও, বাবা আর মায়ের পাশে। এদেশেই জন্ম, এদেশেই মাটি মুড়ি দেবে।

ফালমন্‌ সাহেব এদেশেই মাটি মুড়ি দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে। নীলগঞ্জের কুঠী ভাঙিগয়া চুরিয়া জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। এখন সেখানে দিনমানেও বাঘ বুনো-শুয়োরের ভয়ে কেউ যায় না। কুঠীর নিমতলায় ঘন বঁইচকাঁটায় দুর্ভেদ্য ঝোপের ছায়ায় খুঁজিলে ফালমন্‌ সাহেবের কবরের ভগ্নাবশেষ এখনো কৌতূহলী রাখাল বালকদের চোখে পড়ে। আলমপুর পরগণার বড় তরফের দে চৌধুরী জমিদার বাবুরা নীলগঞ্জের জমিদারী গবর্ণমেণ্টের নীলামে ক্রয় করিয়াছিলেন।

বরো বাগদিনী

ওর নাম 'বরো' এর মানে বলতে পারব না। সবাই ডাকে বরো বাগদিনী ব'লে। একটু মোটাসোটা, কুচকুচে কালো, আঁটসাঁট গড়নের, বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে।

এই পাড়াতেই বামুনবাড়ী বরো কাজ করতো, বাইরের কাজ, কারণ বাগদিনীর হাতের

জলে কোন কাজ হবে না। গোয়াল গোবর করা অর্থাৎ গোয়াল পরিষ্কার করাই ছিল তার প্রধান কাজ। বিচুলি কেটে গরুকে জাবও দিত। উঠোন ঝাঁটও দিত।

একদিন শুনলাম, বরো মুখুয্যেবাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়েচে। মুখুয্যে মশাই নিজেই এসে আমার কাছে নালিশ করলেন। বললেন—তুমি তো পল্লীমঙ্গলের সেক্রেটারী, এর একটা বিহিত করো—

—কি ব্যাপার হয়েচে কাকা?

—সেই বরো বিটি আজ কোথাও কিছু না, কাজে এল না আমার বাড়ীতে। এক হাঁটু হ'য়ে রয়েছে গোয়াল, থৈ থৈ করচে উঠোন আর বিটি কিনা স্বচ্ছন্দে বললে আমি কাজ করবো না। ছোটলোকের এত বড় আস্পদ্দা আর সহ্যি হয় না। বলি যাই দিকি বিভূতির কাছে, একটা বিহিত এর করো দিকি বাবা।

—কাজ ছাড়লো কেন হঠাৎ, তা কিছু জানেন!

—কি করে জানবো বাবা, কাল বললে আমার তামাক-পোড়া খাওয়ার পয়সা আলাদা দিতে হবে। তাই বললাম, তিন টাকা করে মাইনে আবার তার ওপর তামাক-পোড়া খাওয়ার পয়সা! পারবো না। তাই বাবা—

—এর কি করা যাবে পল্লীমঙ্গল থেকে বলুন? আপনার পয়সা-কড়ি নিয়ে সে তো আর চলে যায় নি! আমি কি করবো বলুন কাকা। আমার দ্বারা কিছু হবে না।

—তা হবে কেন? তা কি আর হবে? ছাইভস্ম কি সব মাথামুণ্ডু লিখতেই শিখেচো। গাঁয়ের কোন উপ্‌গার কি তোমায় দিয়ে হবে বাবা—তা হবে না। সে বুঝতে পেরেচি অনেকদিন—

মুখুয্যে কাকা অপ্রসন্ন মুখে চলে গেলেন। কি করবো—আমি নাচার। পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী তো আর নবাব-নাজিম খান্‌জা খাঁ নয় যে, যাকে তাকে ধরে নিয়ে এসে যে কোনো অপরাধে গন্দান নেবো। আমি কি করতে পারি বরো বাগদিনীর?

হঠাৎ বরোর সঙ্গে একদিন গোপালনগরের পথে দেখা।

একটা ভাঙ্গা চুপড়ি কাঁখে সে বাজারে যাচ্ছে, পরনে শতছিন্ন মলিন বস্ত্র।

বললাম—কি বরো? ভাল আছ?

বরো থমকে রাস্তার এক পাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল জড়সড় হয়ে, আমায় পথ দেবার জন্যে, যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না, পথ দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট চওড়া। বললে—বাবু, আমাকে কাঠ দেবেন একখানা!

—কাঠ? কি কাঠ?

—বাবু, সেই রেশম কাঠ।

—বুঝলাম। তোমার নেই?

—না বাবু, কে এনে দেবে, মোদের কথা কি কেউ শোনে? কাপড় নেই। এই দেখুন এই কাপড়খানা—

বরো আঁচলের অংশটুকু আমার সামনে মেলে ধরলে। বললাম—থাক্ থাক্, ও দেখাতে হবে না, দেখেই বুঝতে পাচ্চি।

কথাটা তখনি মনে পড়ে গেল।

বললাম—আচ্ছা, মুখুয্যেবাড়ীর কাজটা ছেড়ে দিলে কেন হঠাৎ? মুখুয্যে কাকা সেদিন বলছিলেন—

বরো আমার পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে বললে—সে বাবু আর আপনার সামনে বলবো না।

একটু এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে আমার দিকে চেয়ে বললে—ওনার মতিগতি ভাল না বাবু, এই একটা কথা আপনাকে বললাম—

বরো চলে গেল।

ব্যাপার কি?

মুখুয্যে কাকা কি বরো বাগদিনীর কাছে প্রেম করতে গিয়েছিলেন? উভয়ের এই বয়সে? বিশ্বাস তো হয় না। মরুকগে, পরের কথায় দরকার কি আমার!

পৌষমাসের প্রথমেই ভীষণ শীত পড়লো।

একদিন রাত দশটার পর ওপাড়ার হাজারি ঘোষের বাড়ী থেকে ভাগবতের কথকতা শুনে ফিরচি—এমন সময় পায়ে-চলা মাটির পথের ধারে একখানা কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় কে শুয়ে আছে দেখে সেখানে থমকে দাঁড়ালাম।

এ পাড়ায় আমার যাতায়াত খুবই কম। তার ওপর বহুকাল গ্রামে না থাকার দরুণ কোন্‌টা কার বাড়ী চিনিনে। এগিয়ে গিয়ে বললাম—শুয়ে কে?

—কে, বাবু? আসুন। কনে গিয়েলেন এত রাত্তিরি? আমি বরো।

—ও, এই তোমার বাড়ী নাকি?

—হ্যাঁ বাবু। এরে কি আর বাড়ী বলে। ওই কোনো রকমে আছি মাথা গুঁজে। গরীব নোকের আবার বাড়ী আর ঘর। আপনিও যেমন।

সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। কেউ বললে বিশ্বাস করবে না। ছোট্ট একখানা চার-চালা ঘর, ঘরের পেছন দিকে দেওয়াল নেই; কঞ্চির বেড়া ও চাঁচ কিছুই নেই—একেবারে ফাঁকা। সামনের যে দাওয়ায় বরো বাগদিনী এতক্ষণ শুয়েছিল তার দুদিকে নোনার পাতার বেড়া কিন্তু সামনের দিকে এক দম ফাঁকা। এই ভীষণ শীতে এই খোলা দাওয়ায় বরো কি একখানা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। ঘরের মধ্যেও যেন কে শুয়ে আছে মেঝেতে। বললাম—ঘরে ও কে?

—ও মোর ছেলে ট্যানো। ওরে চেনেন না?

—না, তোমার ছেলে আছে তাই জানিনে! কত বড়?

—তা বাবু শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে বড়-সড় হয়েছে। কত তা কি মোরা জানি? এই পাড়ার রাখাল। সবারই গরু চরায়।

—বেশ।

এইবার আমার নজর পড়লো বরো যেখানা গায়ে দিয়েছিল সেই কাপড়খানার দিকে। থলের চট বলেই মনে হওয়াতে জিগ্যেস করলাম—গায়ে দিয়েছ কি ওটা?

—এখানা বাবু কম্বল।

—কি রকম কম্বল?

—আর বছর বনগাঁ থেকে এনে ডাক্তার বাবু বিলি করলেন। এর মধ্যে তুলো পোরা। পাঁচখানা মোদের গাঁয়ে বিলি হয়েল, গোরমেণ্ট থেকে নাকি বিলি হয়েল। কি জানি বাবু, আপনারাই জানেন—মোরা কি খবর রাখি বলুন। দিলে একখানা, নেলাম। তা বাবু, কাপড় একখানা পাবো না? মুছলবে বেরোবার উপায় নেই—

গ্রামের লোকে কি করে জীবন কাটায়, ভাল করে দেখিনি কোনোদিন, আজ একে দেখে তা বুঝলাম। এই শীতে একখানা থলের চট গায়ে দিয়ে বাইরে শুয়ে যে আছে, তার কালই নিমোনিয়া যদি হয় এবছরের এই ভীষণ শীতে, তবে কোন্‌ ডাক্তারখানা থেকে এদের ওষুধ আসবে?

দিনকতক পরে গ্রামে বাঘের উপদ্রব হোল। প্রতি বৎসরই শীতকালে বাঘের উপদ্রব হয় এ অঞ্চলে। লোকের গোয়াল থেকে গরু বাছুর নেয়, রাত্রিচরা গরু তার পরের দিনের আলো হয়তো আর দেখে না। এ বছর উপদ্রবটার বাড়াবাড়ি দেখা গেল। দিনদুপুরে দক্ষিণ মাঠের বেগুনের ক্ষেতে কি নয়ালি দীঘির পাড়ের জঙ্গলে কি চুয়োডাঙার রাস্তার অশ্বত্থ গাছের তলায় বাঘকে শুয়ে থাকতে দেখে চাষী কি পথ-চলতি লোকে। ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে ইছামতীর ধারের বাঁশবনের পথ দিয়ে সীতে জেলে মাছ ধরে তেঁতুলতলার ঘাট থেকে বাড়ী ফিরচে, মস্ত বড় বাঘ (অবিশ্যি সীতে জেলের বর্ণনানুসারে) রাস্তা জুড়ে শুয়ে আছে। জনপ্রাণী নেই তেঁতুলতলার ঘাটের পথে. বাঘও নড়ে না—সীতে জেলের ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা—তারপর বাঘটা হঠাৎ লাফ দিয়ে পাশের ঝোপে কেন পালিয়ে গেল সে-ই জানে। একদিন তো আমারই বাড়ীর পেছনে বাঁশবনে সন্ধ্যা রাতে ফেউ ডাকতে শুরু করলো। হাট থেকে ফিরবার পথে বরো বাগদিনীর ঘরের পাশ দিয়ে এলাম ওকে বাঘের কথাটা বলে সতর্ক করে দেবার জন্যে।

জ্যোৎস্না উঠেছে, সন্ধ্যার অল্প পরেই। তেমনি শীত।

বরো দেখি দাওয়ায় শুয়ে আছে, মাথার কাছে একটু করে ঘুঁটের আগুন। একেবারে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

—কি বরো, এত সকালে শুয়ে পড়েছ?

—বাবু? আসুন, বড্ড জ্বর এয়েল দুপুর বেলা। আজ আর হাটে যেতে পারিনি। চটখানা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছি।

—তোমাকে এলাম একবার সাবধান করে দিতে। বাইরে এরকম শোয়া ঠিক না। কাল তো আমার বাড়ীর পিছনের বাগানে বাঘ ডেকেছে। তোমার ঘর আরও বনের মধ্যে—

—বাবু, কিছু হবে না। বাঘে মোদের কি করবে? ও ভয় নেই মোদের। তা থাকলি কি আর বারোমাস এই ফাঁকা জায়গায় শুতি পারি? ও মোদের সয়ে গিয়েচে। ভয় ডর থাকলি কি মোদের চলে?

একদিন পরের কথা।

সকালবেলা হৈ হৈ ব্যাপার। সবাই ছুটচে ওপাড়ার দিকে।

বরো বাগদিনীকে নাকি শেষরাতে বাঘে মেরেচে। সঠিক খবর কেউ দিতে পারে না। ব্যাপার কি দেখবার জন্য ছুটলাম ওপাড়ার দিকে।

গিয়ে দেখি বরো বাগদিনীর ঘরের উঠানে লোকে লোকারণ্য। বরো বাগদিনীর গলা সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে। সে হাত-পা নেড়ে কি একটা বর্ণনা করচে সকলের সামনে। আর সেই জনমন্ডলীর মাঝখানে বরো বাগদিনীর দাওয়ার ঠিক সামনের উঠানে একটা বড় গুল-বাঘ মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বরো বাগদিনী নাকি বাঘটাকে গত শেষরাতে কাস্তে বঁটি দিয়ে মেরেচে।

জিগ্যেস করলাম—কাস্তে বঁটি দিয়ে অত বড় বাঘটাকে—?

তখন বরো আবার আমার দিকে ফিরে তার কাহিনী গোড়া থেকে শুরু করলে। সত্যিই সে বাঘটা মেরেচে এবং বঁটি দিয়ে মেরেচে। শেষরাত্রে বাঘটা ওর ঘরের পেছনে এসে হাঁক পাড়ে। বরোর ছেলে ঘর থেকে ভয়ে চীৎকার করে উঠতেই বরোর ঘুম ভেঙে যায়। ছেলেকে বাঘে ধরেচে ভেবে ও দাওয়ার কোণ থেকে কাস্তে বঁটি নিয়ে বাঘের ঘাড়ে পড়ে। বাঘ আসলে তখন ধরেচে ওদের সেই ধাড়ি ছাগলটাকে। অন্ধকারে দেখাই যাচ্ছে না বাঘে ছাগল ধরেচে না ছেলে ধরেচে। কাস্তে বঁটি দিয়ে বাঘের ঘাড়ে মরীয়া হয়ে নির্ঘাত ঘা কতক কোপ দিতে বাঘ সেখানেই ঘাড় কাত করে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়—এই হল বরো বাগদিনীর বর্ণনা।

ভিড়ের মধ্যে মুখুয্যে কাকা ছিলেন, তিনি বললেন—তোর একটুও ভয় করলো না ওর সামনে যেতে! বরো বললে—মোর কি তখন জ্ঞান ছিল, দাদাঠাকুর? মোর আজ দুদিন জ্বর। ওই উনি (আমার দিকে আঙুল দিয়ে) পরশু দেখে গিয়েছিলেন। বাঘ হ্যাঁকোর হ্যাঁকোর করে উঠলো তাও শোনলাম জ্বরের ঘোরে, মোর ছেলে চীৎকার করে উঠলো, তাও শোনলাম। জ্বরের ঘোরে ভাবলাম মোর ছেলেটাকে বাঘে ধরেচে, তখুনি কাস্তে-বঁটি কোণ থেকে তুলে নিয়ে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়িচি—মোর তখন জ্ঞানগম্যি নেই—ছেলেকে বাঘে খাবে আর মুই দ্যাখবো? মোর পেরাণ যায় আর থাকে—বাঘ আসলে মোর ঐ ধাড়ি ছাগলডা ধরেচে তখন—মুই কি অন্ধকারে চকি দেখতি পাচ্ছি কিছু? মুই ভাবলাম মোর খোকারে ধরেচে—

ক্রমে ভিড় আরও বাড়তে লাগলো দেখে আসবার উপক্রম করচি এমন সময় বরো বললে—বাবু, একটা কথা। মোর কাপড় একেবারে ফালা ফালা হয়ে গিয়েছে বাঘের সঙ্গে হুড়যুদ্ধ করতি। এ পরে আছি কলু বাড়ীর মনো দিদির থানখানা। সকালে এটু চেয়ে এনেছে মোর ছেলে গিয়ে। মোর সে কাপড় তো নক্ত-মাখা নোনাতলায় পড়ে রয়েচে ওই দেখুন—ও আর পরা যাবে না। তা বাবু, রেশম কাটখানা মোরে দিয়ে একখানা কাপড়ের ব্যবস্থা করে দ্যান আপনি—এ পরের কাপড়, ওরা আজই চেয়ে নিয়ে যাবে এখন—মুছলবে বেরুতি পারব না বস্তর বিনে—

মুখুয্যে কাকাও আমার দিকে চেয়ে অনুনয়ের সুরে বললেন—দাও বাবাজি, ওর রেশন কার্ডখানা দেওয়ার ব্যবস্থা করো, আর যাতে একখানা কাপড় ওকে আজই দিতে পারো—

ওর মোটেই কাপড় নেই—যাতে হয় বাবাজি—তুমি মনে করলেই হবে—
মুখুয্যে কাকা আমার হাতদুটো ধরেন আর কি।

গিরিবালা

দেশের বাড়ীতে অনেক দিন ছিলাম না। গ্রামের অন্য সব পাড়ার লোকদের ভালভাবে চিনিনে বা জানিনে।

সেবার মাঘমাসের দিন, বাজার থেকে ফিরচি এমন সময় একটি সাদা থান-পরা বিধবা স্ত্রীলোক বিনীত সুরে বললে—একটু দাঁড়ান বাবা—

পরে সে সাষ্টাঙ্গে আমাকে প্রণাম করলে।

এ রকম ভাবে প্রণাম পেতে আমি অভ্যস্ত নই।

সঙ্কুচিত ভাবে বললাম—এসো মা এসো। কল্যাণ হোক।

—ও বেলা কি বাড়ী থাকবেন?

—হ্যাঁ, কেন বল তো?

—আমি একবার যাবো এখন আপনার কাছে।

—বেশ।

মনে ভাবতে ভাবতে এলাম, মেয়েটিকে আমি অনেকদিন আগে যেন কোথায় দেখেছি। তখন ওর এরকম বিধবার বেশ ছিল না। তা ছাড়া এখন ওর বয়েসও হয়েছে।

বিকেলবেলা যখন মেয়েটি আমার বাড়ী এল, তখন ওকে ভালো করে চিনলাম। এ দেখচি সেই গিরিবালা। এর যৌবন বয়সে আমি একে অনেকবার দেখেছি, তখন এর বেশভূষা ছিল অন্যরকম। বাজারে যাবার আসবার পথে একে রূপের ঝলক ছুটিয়ে হেলেদুলে চলতে দেখেছি। তখন এর পরনে ছিল লালপেড়ে শাড়ী, বাহুতে অনন্ত, হাতে বালা, কানে মার্কাড়ি, গলায় হার, কোমরে রূপোর গোট্। অনেকদিনের কথা, তখন ম্যাট্রিক পাশ করে সবে কলেজে ভর্তি হয়েছি। কার কাছে যেন শুনেছিলাম ওর নাম গিরিবালা, চরিত্রের পবিত্রতার জন্যে বিখ্যাত নয়। সেই থেকে ওকে দেখলে পাশ কাটিয়ে বরাবর চলে গিয়েছি।

গিরিবালার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম।

এখন ওর বয়েস হয়েছে, যৌবনে কি রকম ছিল আমার মনে হয় না, তবে এখন ওকে দেখে মনে হয় না কোনোদিন ওর যৌবন ছিল। তবে রংটা এখনো বেশ ফর্সা আছে, চোখ-দুটি এখনো সুন্দর।

মনে ভাবছিলাম গিরিবালার কি দরকার আমার কাছে। আমি তো কোনোদিন ওর সঙ্গে একটা কথাও বলিনি। আমাকে কি করেই বা ও চিনলে। আমাকে এ গ্রামে অনেকেই চেনে না, কারণ বহুদিন অনুপস্থিতির পরে আবার দেশে ফিরেচি। ছেলেবেলায় যারা আমায় চিনতো, তাদের মধ্যে অনেকেই এখন বেঁচে নেই। গিরিবালা যদিও সেই সময়ের মানুষ, কিন্তু ও আমাকে জানতো না বা চিনতো না সে সময়।

ওর বসবার জন্যে পিঁড়ি পেতে দিয়ে আমার স্ত্রী চলে গেলেন।

আমি বললাম—তোমার নাম গিরিবালা না?

—হ্যাঁ বাবা—

—তুমি আমাকে চেন?

—আপনাকে এ দেশে কে বা না চেনে?

—সে কথা বলচিনে, তুমি আগে আমাকে দেখেছিলে?

—দেখেছিলাম বাবা। তখন তোমার বাবা-মা আছেন। তুমি ইস্কুলে পড়তে যেতে।

—বেশ। বোসো।

কিছুক্ষণ গিরিবালা বসেই রইল চুপ করে। আমি ভাবচি, কেন গিরিবালা এখানে এসেচে। ভেবে কিছুই পাইনে। একটু অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম।

গিরিবালা বেশীক্ষণ কিন্তু আমায় অস্বস্তি ভোগ করতে দিলে না। হঠাৎ সে বেশ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলে—বাবা, ব্রহ্ম কি?

তার নম্রভাব ও আগ্রহের সুরে মনে হোল জিজ্ঞাসু শিষ্যা যেন পরমজ্ঞানী গুরুর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শুনতে চাইচে।

আমার হাসি পেল। প্রথমটা কিন্তু চমকে উঠেছিলাম।

তা পরিবেশ মন্দ নয়। আমার সামনে কালকের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। যুদ্ধের খবর পড় চি। জিনিসপত্রের দাম-দস্তুর ক্রমেই বাড়চে। রাশিয়া হেরে যাচ্চে, হিট্‌লারের দুর্মদ বাহিনী লেনিনগ্রাডের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল। চা খাচ্চি। তামাক ধরাবো একটু পরেই। আর ভাবচি, কাল ডাকঘর থেকে কিছু টাকা না তুললে হাট বাজার হবে না।

এমন সময় সাবেকদিনের কুচরিত্রা স্ত্রীলোক গিরিবালা আমার কাছে জিজ্ঞেস করচে কি? না, ব্রহ্মের কথা। তাই না হয় বাপু জিগ্যেস কর দেশের খবর, আজকালকার খবর। যেমন গদাই পাড়ুই আমাকে মাছ দিতে এসে জিজ্ঞেস করে—দাদাঠাকুর, যুদ্ধির খবরটা কি?

মনে মনে চটে যাই। সে খবরে তোর কি দরকার? জার্মানি কোথায়, হিট্‌লার কে, জানিস্ এ-সব? ইউরোপের ইতিহাস পড়েচিস? তবে যুদ্ধের খবরের তুই বাপু কি বুঝবি?

গদাই পাড়ুই তবু পদে ছিল। যুদ্ধের খবর জিজ্ঞাসা করা এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। সে আজকালকার সবাই করে থাকে। কিন্তু এ বলে কি? আর 'ব্রহ্ম কি' জিজ্ঞাসা করবার উপযুক্ত গুরুও কি সে খুঁজে খুঁজে বার করেচে!

প্রশ্নটা চাপা দেবার জন্যে বললাম—তুমি আজকাল থাকো কোথায়?

গিরিবালা বৈষ্ণবোচিত দীনতার সঙ্গে বললে—বাবা, আজকাল আশ্রম করেচি বাজারের পেছনে। গোয়ালপাড়ার মুড়োয় যে বটগাছ, ওরই উত্তর গায়ে।

ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। গিরিবালা আশ্রম করেচে! এত কথা আমি কি করেই বা জানবো? না জানি ভালো করে ওর পূর্ব ইতিহাস, না জানি ওর বর্তমান জীবনের কোনো খবর।

কথাবার্তা চালু রাখবার জন্যে বললাম—বটে! বেশ, বেশ। একদিন তোমার আশ্রমে যাবো।

গিরিবালা হাতজোড় করে বললে—সে সৌভাগ্যি কি আমার হবে বাবা!

—না না, সে কি কথা। কতদিন আশ্রম করেচ?

—তা বাবা বৃন্দাবন থেকে যে বছর ফিরলাম, সে বছরই। শ্রাবণ মাসে বৃন্দাবন থেকে ফিরলাম, কার্তিক মাসে আশ্রম পিতিষ্ঠে করলাম।

তাহোলে বৃন্দাবনেও গিয়েচে গিরিবালা। না, আগে যা ভেবেছিলাম তা নয়। ব্যাপার জটিল হয়ে উঠেচে। বললাম—বৃন্দাবনেও গিয়েছিলে?

—পাপমুখে আর কি করে বলি?

—আর কোথায় গিয়েচো?

—কোথাও আর যাওয়ার দরকার হয় নি। ওখানেই তিনি আমায় কৃপা করেচেন। আর অনর্থক তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে কি করবো? যা কাজ তা হয়ে গেল। তিনি আমায় দয়া করে সব দিয়েচেন।

তিনি মানে ভগবান? না, এ দেখচি খুবই জটিল ব্যাপার। থৈ পাওয়া যাচ্চে না। গিরিবালা প্রবর্তকের থাকেও নেই, একেবারে কৃপাসিদ্ধ। এর সঙ্গে কথা বলতে সাহস হয় কই!

বললাম—ও।

—আমায় তিনি বললেন, আমাকে তোর পূজা করতে হবে না। তুই যে আমার মা। আমি তোর ছেলে!

—বটে!

আমার চোখ কপালে ওঠবার উপক্রম হয়েচে। আর না, একে এবার তাড়াতে হবে।

আর কোনো কথা চলবে না।

বললাম—আচ্ছা, গিরিবালা, আর একদিন শুনবো এখন—একটু ব্যস্ত আছি আজ।

কিন্তু গিরিবালাকে অত সহজে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সে হাতজোড় করে বললে—আমার কথাটা?

—কি?

—ব্রহ্ম কি?

—ওসব কথার আমি জবাব দিতে পারবো না। তুমি ও পাড়ায় গোসাঁই ঠাকুরের কাছে যাও বরং—

—না বাবাঠাকুর, আপনি বলুন।

—তুমি ভুল করেচ গিরিবালা, আমি বইয়ের ব্যবসা করে খাই। ব্রহ্ম-ট্রহ্মের খবর রাখিনে—

—আচ্ছা বাবাঠাকুর, আর একদিন আমি আসবো। আজ ফাঁকি দিলেন, কিন্তু সেদিন ফাঁকি দেবেন না যেন।

আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গিরিবালা বিদায় নিল।

আমায় স্ত্রী জিগ্যেস করলেন—ও কে গো?

—ওর নাম গিরিবালা এইটুকু জানি। আর জানি যে ওকে তিনি নাকি কৃপা করেচেন।

—তিনি কে?

—তিনি আর চিনলে না—তিনি মানে তিনি। ভগবান, গড্, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্ম।

—আহা হা, ঢং।

বলে স্ত্রী বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। আমি সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের ফটিক চক্কত্তির কাছে গেলাম। ফটিক চক্কত্তির এখন বয়েস হয়েছে, এক সময় যথেষ্ট আমোদ-প্রমোদ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদির অনুষ্ঠান করার ফলে এখন ভগ্নস্বাস্থ্য, হাঁপানি রোগগ্রস্ত।

বললাম—ফটিক কাকা, গিরিবালাকে চেন?

—এসো বাবা, বসো। কোন্ গিরিবালা? ও নামের অনেক লোক ছিল। কার কথা বলচো?

—এই যে গিরিবালা আশ্রম করেচে গোয়ালপাড়ায়, পথে ঘাটে বেড়াতে দেখি।

—ওঃ, বুঝলাম। ওকে আর জানিনে?

—ওকে জানতে?

—জানতে মানে? জানতে মানে? হুঃ, জানতে! বলে—

—যাক, যাক, সে সব কথা যাক গে। বলি ও কি রকম লোক ছিল?

—তা ভালো লোক ছিল! অনেক ফুর্তি করিচি ওর সঙ্গে। ওর চেহারা ভারি সুন্দর ছিল। যেমন নাচতে পারতো তেমনি গাইতে পারতো। একবার নন্দ পাল, যতীন দত্ত আর শশী আচার্যি—তিনজনে দোলের দিন ওর ঘরে সে ফুর্তি কি! ওর মদ খেয়ে সে ঘুরে ঘুরে নাচ কি! কালাপেড়ে শাড়ী পরে ঘুঙুর পায়ে—তারপরে ইদিকে—

—গিরিবালা মদ খেতো?

ফটিক চক্কত্তি হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে বললে—নাঃ, তোমায় দিয়ে বাবাজি কাজ চললো না। গিরিবালা মদ খেতো মানে? গিরিবালা মদ খেতো মানে কি? গিরিবালা মদের পিপের জম্মো দিয়েচে বলো। তুমি বাবাজি এ সবের কি বোঝো। কেন, গিরিবালার খবর নিচ্চ কেন বলো তো? ব্যাপার কি?

—এই জন্যে নিচ্চি যে সে কাল আমার কাছে এসেছিল—

—তোমার কাছে এসেছিল? কেন তোমার কাছে—তার এখন আর—তোমার কাছে বাবাজি, এখন তার বয়েস কত?

—না কাকা, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। সে এখন আর সে গিরিবালা নেই, সে এসেছিল আমার কাছে ব্রহ্মের কথা জানতে।

—কার কথা জানতে?

—ব্রহ্মের কথা।

—সে কে?

—ব্রহ্ম মানে ভগবান, মানে—

—থাক বুঝেছি, থাক বাবাজি। আবার তোমার সামনে যা-তা বেফাঁস বলে ফেলবো বাবাজি—

—আপনি জানেন না, সে আশ্রম করেচে। তিনি তাকে কৃপা করেচেন। তিনি তাকে মা বলে ডেকেচেন—

ফটিক চক্কত্তি বিস্ময়ের সুরে বললে—তিনি কে?

—ওই দেখুন আবার আপনাকেও—তিনি মানে, যাকগে—ইয়ে, আমি এখন যাই। আপনার মেজাজ এখন ভাল নেই দেখচি।

—ভালো কি করে হবে বাবাজি? যে কথা তুমি সকালবেলা শোনালে তাতে মেজাজ ভালো রাখবার উপায় কি বলো? গিরিবালা নাকি আশ্রম করেচে। গিরিবালা নাকি—

—আচ্ছা তাহলে এখন আসি ফটিক কাকা। আমার একটু কাজ আছে। বসুন।

শশী আচার্যির নাম পেলাম ফটিক কাকার মুখে। শশী স্থানীয় কালীমন্দিরের পুজারী, এখন বয়েস হয়েচে। চোখে ভালো দেখতে পান না। তাঁকে গিরিবালার নাম করতে তিনি বললেন—গিরিবালা ডাকসাইটে ইয়ে ছিল। সে সব কথা আর তোমার কাছে বলবো না বাবা। হ্যাঁ জানি, সে আশ্রম করেচে, সন্নিসিনি হয়েচে, ওই যে বলে বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী তাই—

গিরিবালার পূর্ব ইতিহাস ভালো ভাবেই জানা হয়ে গেল।

সুতরাং সে যখন পুনরায় আমার বাড়ী সেদিন এল, তখন আমি বেশ কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়েই ওকে দেখলাম।

বৈকাল বেলা। আমি চা খেয়ে একটু বেড়াতে যাবো ভাবছিলাম। গিরিবালা বললে—বাবা, একটু পড়ে আমায় শোনাবেন? আমি একখানা বই এনেচি।

—কি বই দেখি?

—আপনার বাড়ীতেই বইখানা থাক। মাঝে মাঝে এসে শুনে যাবো। বড় ভালো বই বাবা। তা আমি তো লেখাপড়া জানিনে—

বইখানা উল্টে-পাল্টে দেখলাম। বইখানা অত্যন্ত পুরানো, নাম "সাধনতত্ত্ব ও জীবন্মুক্তি"। লেখকের নাম শ্রীমৎ ওংকারানন্দ সরস্বতী, প্রাপ্তিস্থান সাধন আশ্রম, গ্রাম সারাড়িতলা, জেলা পুরুলিয়া, মানভূম। এসব ধরনের বইয়ের ওপর আমার কোনো কালে শ্রদ্ধা নেই, তবুও গিরিবালার মনস্তুষ্টির জন্যে পাতার পর পাতা অত্যন্ত কঠিন সেকেলে বাংলায় লেখা সেই তত্ত্ব আমাকে গড় গড় করে পড়ে যেতে হোল।

গিরিবালা মাঝে মাঝে হয়তো প্রশ্ন করে—হ্যাঁ বাবা, তাহোলে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্কটা কি বলচে?

আমি আবার আগের পাতা থেকে পড়ে যাই। যা বুঝতে পারি ওকে বুঝিয়ে বলি। প্রত্যেক পাতা শেষ হওয়ার পর ভাবি এইবার কি একটা ছুতো করে উঠে পড়া যায়।

ঘণ্টাখানেক এভাবেই কেটে যাওয়ার পরে গ্রামের দুজন লোক হঠাৎ এসে পড়াতে ধর্মালোচনার আসর ভেঙে গেল। গিরিবালা যাবার সময় বইখানা আমার কাছে রেখে গেল। আবার একদিন যত শীগগির হয় ও আসবে 'সাধন তত্ত্ব' শুনতে। আমার স্ত্রী বললেন—ও তোমার কাছে রোজ রোজ আসে কেন? ও আপদকে রোজ রোজ আসতে দিও না।

—তুমি জানো না। গিরিবালা আগে যেমনই থাক, এখন ওর পরিবর্তন এসেচে বলেই মনে হয়।

—তা হোক গে। ও সব লোক কখনো ভালো হয় না। দরকার কি ওর এখানে আসবার?

এবার কিন্তু গিরিবালা যখন এল, তখন সকলের আগে আমার স্ত্রীকে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলে। অনেকক্ষণ ধরে কি সব গল্পগুজব করলে। তারপর বাইরে এসে আমার সামনে বসলো। তাকে 'সাধন তত্ত্ব' পড়ে শোনাতে হোল ঝাড়া দু'ঘণ্টা। ইতিমধ্যে

বাড়ীর মধ্যে চা খেতে গেলে গৃহিণী বললেন—গিরিবালা কি চলে গেল?

—না। বাইরে বসে আছে, সাধনতত্ত্ব শুনবে।

—যাবার সময় যেন এবেলা এখানে খেয়ে যায়।

—কেন, হঠাৎ তার ওপরে এত প্রসন্ন?

—জানো না, সে এক গাদা ফুলবড়ি নিয়ে এসেচে। তিনখানা আমসত্ত্ব আর অনেকখানি আমের আচার। আমি বললাম আমি নেবো না। এ তুমি নিয়ে যাও। সে আমার হাতে ধরে জোর করে দিয়ে বললে—এ নিতেই হবে। ব্রাহ্মণের সেবার জন্য এনিচি, ফিরিয়ে নিয়ে যাবো কি ব'লে?—ওকে এ বেলা খাইয়ে দিতে হবে।

—বেশ। বলচি আমি।

গিরিবালাকে গিয়ে বলতে সে ভারি খুশি হোল। এক গাল হেসে বললে—মায়ের হাতে রান্না পেসাদ পাবো—এ কি আমার কম ভাগ্যি? বৃন্দাবনে একবার—

—ভালো কথা, বৃন্দাবনে তোমার কি হয়েছিল সেদিন বলেছিলে?

গিরিবালার মুখে হঠাৎ যেন ভক্তি ও দীনতার ভাব ফুটে উঠলো। হাত জোড় করে বললে—ঠাকুর যদি কৃপা করেন, তবে মরুভূমিতে ফুল ফোটাতে পারেন—

—নিশ্চয়ই।

—আমি তবে বলি শুনুন, আমি কত সামান্য মানুষ আপনি তা জানেন। বৃন্দাবন গিয়ে গুপীনাথের ঘেরা বলে জায়গায় আমাদের গাঁয়ের রসিক পরামাণিকের বাসায় উঠলাম। গঞ্জের রসিক পরামাণিক সেখানে অনেকদিন থেকে কাপড়ের ব্যবসা করচে জানেন তো? রসিকের দিদি বড় ভালো লোক। আমার তো বৃন্দাবনে গিয়ে কি রকম হোল, দু'চারদিন মন্দির আর ঠাকুর দেখে বেড়াই! একদিন একেবারে অজ্ঞান।

—অজ্ঞান?

—বাবাঠাকুর, একেবারে ভাবের ঘোরে অজ্ঞান!

—বল কি? ভাব-সমাধি?

—যাই বলেন বাবাঠাকুর। দশ বারো দিন একেবারে দিনরাত জ্ঞান ছিল না আমার। নাওয়া-খাওয়া করতে পারতাম না। না খেয়ে মরতে হোত যদি রসিকের দিদি না থাকতো। কি সেবাটাই করেছিল পনেরো কুড়ি দিন।

—এই যে বললে দশ বারো দিন?

—দশ বারো দিন তো একেবারে অজ্ঞান। তারপর জ্ঞান হোল বটে, কিন্তু ঘোর কাটে না। উঠতে পারিনে, হাঁটতে পারিনে।

—ফিটের ব্যামো ছিল না তো আগে?

—না বাবাঠাকুর, শুনুন বলি আশ্চর্যি কাণ্ড! সেই অবস্থায় একদিন রসিকের দিদি সন্দেবেলা সঙ্গে করে কাছে এক ঠাকুরবাড়ীতে নিয়ে গিয়েচে। ফিরে আসচি, পায়ে কিসের একটা ঠোক্কর লেগে হোঁচট্ খেলাম। একখানা ছোট্ট পাথর, মাটিতে অর্ধেক পোঁতা। মাটি একটুখানি খুঁড়ে হাতে তুলে দেখি বাবা, পাথরের গোপাল মূর্তি। বাবা বলবো কি—আমার সারা গা যেন শিউরে উঠলো। মনে মনে ভাবলাম আমি তো মহাপাপী, আমার ওপর তাঁর এ অহেতুক কিরপা কেন? আমি তো কিছু করি নি তাঁর জন্যি?

গিরিবালার চোখ ছলছল করে এল। নাঃ, ফটিক কাকা যা-ই বলুন, এর সত্যই অনেক পরিবর্তন হয়েচে। 'পরম মোহান্ত' হওয়ার পথে উঠেচে দেখচি 'গিরিবালা। হরিদাস ঠাকুর আর লক্ষহীরার উপাখ্যান চোখের সামনে পুনরায় অভিনীত হতে চলেচে নাকি?

ফটিক কাকার কথা আর শুনচিনে।

বললাম—তারপর?

—তারপর বাবা সেই পাথরের বিগ্রহ আমার কাছে তো এসে ঠেলে উঠল। আঁকড়ে আমায় রইল কি বাবা, কোথাও যেতে চায় না! আমারও বাবা সেই যে বলেচে চৈতন্য চরিতামৃতে—নিজেরে পালক ভাবে, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান—'আমারও' হোল তাই। খাওয়া-নাওয়া চুলোয় গেল! গোপাল আমার কি খাবে, গোপাল আমার কি নেবে, এখনো তাই। সেই গোপাল ঘাড়ে চেপে আছে, আর নামতে চায় না। এখানে আমার আশ্রমে তাকেই

তো পিরীতিষ্ঠে করে তাকে নিয়েই আছি।

—বল কি?

—কি বলবো বাবা, পূজো করতে দেয় না। বলে, তুমি যে আমার মা। মা হয়ে ছেলেকে পূজো করতে আছে! হাত চেপে ধরে। স্বপন দিইছিল রাত্তিরি। ওর জন্যি ভাত রাঁধতে হবে। আর কোন দেবদেবী আমি জানিনে বাবা ঠাকুর। গোপালই আমার সব। গোপালই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। আর কিছু মানিনে।

গিরিবালা অবাকই করেচে আমাকে। হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারিনে।

ও খেয়ে-দেয়ে সেদিন চলে গেল। আমার স্ত্রী খুব যত্ন করেই খাওয়ালেন ওকে। যাবার সময় ও বার বার বলে গেল—সামনের পূর্ণিমের দিন বাবা আমার আশ্রমে ঠিক যাবেন। দেবেন পায়ের ধুলো। বিকেলের দিকে যাবেন।

গেলাম ওর আশ্রমে পূর্ণিমার দিন বিকেলে। ওদের গ্রামের গোয়ালপাড়ার পেছনে খামারকালনা বলে সেকালের গ্রাম। সে গ্রাম এখন জনশূন্য। বড় বড় ভিটে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। দিনমানে বাঘ বেরোয় খামারকালনায়, বরাবর শুনে এসেছি। সেই খামার-কালনার নির্জন বনের প্রান্তে এক প্রাচীন বটতলায় তিন চারখানা খড়ের ঘর। বটের মোটা সরু ঝুরি নেমে এসেচে চালাঘরের মটকায়। সন্ধ্যামালতী ফুল ফুটেচে আশ্রমের আঙিনায়। বনে জঙ্গলে পাখীর দল কিচির মিচির করচে। ঘন বিকেলের ছায়া দেখে মনে হয় রোদ বুঝি এদিকের ত্রিসীমানায় কোনদিন ছিল না।

অনেক মেয়ে-পুরুষ দেখলাম ওর আশ্রমে। উঠোনের মাটিতে বটগাছের ছায়ায় বসে তামাক খাচ্ছে পুরুষেরা, মেয়েরা পটল আর লাল ডাঁটা কুটচে রাশীকৃত। আধমণটাক লাল মোটা আউশ চাল ধুচ্চে দুজন মেয়েতে! আজ নাকি ওরা সবাই এখানে খাবে। প্রতি পূর্ণিমাতেই নাকি এমন হয়। গিরিবালা আমায় পূর্ণিমার দিন আসতে বলেছিল কেন, এখন বুঝলাম।

সন্ধ্যার আগে খোল বাজিয়ে কীর্তন শুরু করলে পুরুষেরা। আরো রবাহূত অনেক পথচলতি লোক এসে জুটলো। জঙ্গলের দূর প্রান্তে গাছের ওপরকার আকাশ জ্যোৎস্নায় সাদা দেখাচ্ছিল। এরা সবাই আশপাশের গ্রামের চাষী, গোপ, কাপালী প্রভৃতি শ্রেণীর নরনারী। সবাই মিলে বেশ আমোদ করচে দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। রাত্রে ওরাই রাঁধলে, বড় বড় আঙট কলার পাতা পেতে আউশ চালের ভাত আর লাল ডাঁটার চচ্চড়ি সোনা-হেন মুখ করে খেল। যে যখন আসে, আগে দেখি গিরিবালাকে সাষ্টাঙ্গে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করে দুহাতে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় মুখে দেয়।

আমি অবিশ্যি ওর ওখানে মচ্চবের প্রসাদ পাইনি। গিরিবালা আমায় খুব যত্ন করে বসালো দাওয়ায়। আমি বললাম—না, আমি গাছতলায় বসি, বেশ লাগচে তোমার এই জায়গাটা, এত বন আছে খামারকালনায় আমার জানা ছিল না।

আমায় বললে—একটু কিছু সেবা না করে যেতে পারবেন না বাবা।

—ভাত আমি খাবো না।

—না বাবা, ও আউশ চালের মোটা ভাত আপনাদের খেতে দেব কি বলে? ও ওরা খাবে গিয়ে।

—এত চাল ডাল পেলে কোথায়? খুব খরচ হয় তোমার দেখচি!

—কিছু না বাবা। ওরাই সব আনে। নিজেরাই রাঁধে, আমোদ করে খেয়ে যায়। ওরা বড্ড ভালবাসে আমাকে। সবই গোপালের ইচ্ছা।

ওর সে বিগ্রহ আমি দেখলাম। খুব ফুল দিয়ে সাজিয়েচে। ছোট্ট একটি পাথরের পুতুলের মত। সে ঘরে সবারই অবারিত দ্বার। চাষীরা পাকা কলা, বাতাবি লেবু, শশা প্রভৃতি ফল নিয়ে এসেচে, গোপালের বেদীর আশেপাশে সেগুলো জমা আছে। সন্ধ্যার সময় ধুপধুনো দেওয়া হয়েচে। ছোট একটা মাটির প্রদীপ মিট্ মিট্ করে জ্বলচে ঘরে।

গিরিবালা আমায় বাতাবি লেবুর কোয়া ছাড়িয়ে, শশা কেটে কলার পাতায় সাজিয়ে নিয়ে এসে দিলে। মিষ্টির মধ্যে আখের গুড়। গোটা কতক ছোলাভিজে ওই সঙ্গে। ওর আশ্রমের আবেষ্টনীতে বসে সেই পূর্ণিমার প্রথম রাত্রে বেশ লাগল খেতে।

গিরিবালার মুখে কিছু ভালো কথা শুনবার জন্যে ওরা এসেচে। গিরিবালা বোধহয় প্রতি পূর্ণিমাতেই ওদের কিছু কিছু ভাল কথা শোনায়। যারা এসেচে, তারা দেখি কেবলই বলতে লাগলো, মা, আজ দু'কথা বলবেন না? সন্দে উতরে গিয়েচে, এবার বলুন মা—

গিরিবালা সঙ্কুচিত হতে লাগলো আমার সামনে।

—বাবাঠাকুর বরং কিছু বলুন ওদের। আপনি থাকতি আমি আবার কি শোনাব?

—সে কি কথা? আমি তো ধর্মকথার আচায্যি নিজেকে বলিনি কোনোদিন। রাজনীতির কথা শুনতে চাও শোনাতে পারি। উড়োজাহাজ কি করে হোল তার কথা বলতে পারি। কিন্তু তত্ত্বকথা! বাপ্‌রে!

গিরিবালা সলজ্জ মুখে বলে—বাবার যেমন কথা! আমিই বা কি কথা বলি! আমি বলি, তাঁর ওপর ভক্তি রাখো সব হবে। লোকে এসে বিরক্ত করে, আমার গরুর বাছুর হচ্চে না, আমার স্ত্রীর সন্তান হচ্চে না, বেগুনের ক্ষেত থেকে বেগুন চুরি যাচ্চে, গাঁয়ে গরুর ধ্বসা-পশ্চিমের মড়ক লেগেচে, অমুকের বৌয়ের সন্তান হয়ে বাঁচে না—এসব আমার কাছে নালিশ। বিহিত করে দ্যাও মা।

—তবে তো খুব দায়িত্ব তোমার—

—বাবা, ওরা কোথায় যাবে বলুন? সংসারে ধরে কাকে? কার ওপর নির্ভর করে? একটা কিছু চাই তো। আমাকেই এসে মা বলে ধরে। আমাকেই সব ধকল সইতে হয়। আমার কি খ্যামতা বল, গোপাল ভালো করবেন। গোপালের প্রসাদী ফুল নিয়ে যাও—যা হয় গোপাল করবেন, তাঁর দয়া। বুঝলে না বাবা?

—কাজ হয়?

—হয় বৈ কি বাবা। লাগে তুক্, না লাগে তাক্। ঝাড়ে ঢিল মারলে কোনো বাঁশে লাগবেই। ওরা সংসারী মানুষ, ওদের বুঝতে হবে সংসারের ভেতর দিয়েই।—আপনাকে আলো ধরে পেঁছে দিয়ে আসুক বাবা—

—না, না, আমি বেশ যাবো এখন, সবে তো সন্দে—

—না বাবা, সন্দের সময় এখানে বাঘ বেরোয়। আপনি যান, সঙ্গে লোক দিচ্ছি, বড় রাস্তায় তুলে দিয়ে আসুক গিয়ে—

বড় রাস্তায় যে লোকটা আমায় আলো ধরে এগিয়ে দিতে এল, ওর দেখি বড় ভক্তি। আমায় বললে—মা একেবারে সাক্ষাৎ—হে' হে' উনিই—সব উনিই—

ভক্তিভরে হাত কপালে ঠেকিয়ে উদ্দেশে প্রণাম করলে।

বললাম—খুব ক্ষমতা নাকি?

—উনিই সাক্ষাৎ—উনিই সব। যা বলবেন তাই হবে। ছেলে হবে বললি ছেলেই হবে, মেয়ে হবে বললি মেয়েই হবে। বিষ্টি হচ্চে না, কলাই মুগ বুনতে পারচিনে, জমি ভাঙতে পারচিনে—মাকে গিয়ে ধরলেই হোল—

—বলো কি? বাক্‌সিদ্ধ নাকি?

—কি বললেন বাবু বুঝতি পারলাম না—

—না ঠিক আছে। তারপর?

—তারপর মোদের বিপদে আপদে সব উনি। ওনারে ছাড়া মোরা জানিনে। ছুটে ছুটে আসচি ও'র কাছে। মা যা করেন।

লোকটি আমাকে রাস্তায় তুলে দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বললে—দেন একটু চরণের ধুলো ঠাকুর মশাই। আমরা মুরুক্ষু সুরুক্ষু গরীব মানুষ, কি বুঝি বলুন। অনেক কিছু বলে ফেললাম অপরাধ নেবেন না। যাই, মা এসময় দু'একটা ভালো কথা আমাদের শোনান—

—কি কথা?

—ভালো কথা! তেনার—ভগমানের কথা। আমাদের ওসব কথা কে বলচে বলুন। চাষা লোক, সারাদিন ভুঁই চাষ ক্ষেত-খামার নিয়েই থাকি। মায়ের ছিরিমুখ থেকে ছাড়া আর পাচ্চি কোথায় বলুন—কে মোদের শোনাচ্চে!

ও চলে গেল।

এতক্ষণে বেশ চাঁদ দেখা যাচ্ছে ফাঁকে। খামারকালনায় বড্ড জঙ্গল। ঝিঁঝি পোকা আর মুগ্রো পোকা ডাকচে বনে ঝোপে।

গিরিবালাকে অন্য চোখে দেখলাম এতক্ষণ পরে। ওর ঠিক স্থানটি কোথায় বুঝতে পেরেচি। ওর সম্বন্ধে আমার যে বিদ্রূপভরা মনোভাব ছিল তা এখন নেই।

গঙ্গা নদী সব জায়গায় নেই, কিন্তু তা থেকে বেরিয়ে শাখা নদী, খাল, সোঁতা সমস্ত দেশের সব লোকের কাছে পেঁৗছে দেয় জীবনদায়িনী বারিধারা। গিরিবালা বড় নদীর একটি ক্ষুদ্র সোঁতা, ছোট্ট অজ চাষীদের গ্রামে জল বিতরণ করে বেড়াচ্ছে, তা যতই ঘোলা হোক, তবু সেটা জলই, তাতে স্নান করে, জল পান করে লোক তৃপ্ত হয়। নইলে এই সব গরীব লোক বাঁচে কিসে?

ফটিক চক্কোত্তির কথা আর শুনিচিনে।

এর পরে আমি গিরিবালাকে অনেকবার দেখেচি। একটা জিনিস লক্ষ্য করেচি, যেখানে সংকীর্তন হচ্চে কিংবা ভাগবত পাঠ হচ্চে কিংবা কথকতা হচ্চে সেখানেই ও সকলের সামনের সারিতে চুপটি করে বসে আছে এবং হাঁ করে শুনচে। খালের জল আগে হয়তো ঘোলা ছিল, এখন ক্রমে ফর্সা হয়ে আসচে।

চিঠি

আজই সকালে যে এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে, এমন দিনটি যে নির্দিষ্ট ছিল এমন এক আশ্চর্য কাজের জন্য—তা যখন ঘুম ভেঙে উঠেচি তখনও জানি কি?

আজই বিশেষ করে বলচি এজন্যে যে, আজ আমাদের দিল্লী যাওয়ার দিনটি নির্দিষ্ট ছিল। দিল্লীতে জওহরলালজী পৌরোহিত্য করবেন আমাদের এক সভায়।

সমস্ত জগতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হয়েছেন দিল্লীর মহাসম্মেলনে, আমিও সেখানে যাবো, বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছি, সবাই মিলে মিশে একত্র যাবো। মনে খুব উৎসাহ এবং দীপ্ত আনন্দ।

এক বন্ধুর চিঠি কাল পেয়েছি, তিনি আমার সঙ্গে যাবেন সস্ত্রীক; আমি যেন কলকাতায় গিয়ে তাঁর ওখানে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।

গ্রামেই থাকি। সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে আমার প্রয়োজন হয় পল্লী-প্রকৃতির শান্ত পরিবেশ, ছায়াভরা লতাবিতান। সেখান থেকে ভারতবর্ষের মর্মকেন্দ্র দিল্লীতে যাবো। পথে পড়বে কাশী এলাহাবাদ কানপুর—ভারতবর্ষের ইতিহাসের কত সুপ্রসিদ্ধ কর্মভূমি। ঐতিহাসিক দিগন্তের কত বিচিত্র বিকাশ ঘটেছিল এদের পুণ্যভূমিতে।

ভাদ্রের মাঝামাঝি। বনে বনে নাটা-কাঁটার ফুলের শিষ উঁচু হয়ে আছে, ভুর ভুর করছে সুবাস শরতের বাতাসে। এবার বর্ষা বেশি। রোজ লেগেই আছে বৃষ্টি। রাস্তাঘাটের কাদা শুকুতে চায় না।

ভাবছি এখানে প্রত্যাসন্ন শরতের অপূর্ব শ্যাম শোভা ছেড়ে দিল্লীর ঊষর রুক্ষ প্রান্তরে যাবো বটে, কিন্তু কি পাবো সেখানে? জওহরলালের সঙ্গে হয়তো পরিচয় হবে: রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে গল্পগুজব করা যাবে, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে এক টেবিলে চা-পানের সৌভাগ্য হয়তো হয়ে যাবে। মনে মনে যে এসব নেই সে কথা অস্বীকার করলে মিথ্যে কথা বলা হবে।

হরিপদ বাঁড়ুয্যে এসে বললে—ভায়া, দিল্লী যাচ্ছ নাকি শুনচি?

—যাবো ভাবছি।

—কবে যাবে?

—কাল সকালে।

—তারা খরচপত্র দেবে তো?

—না, তারা কেন দেবে?

—বলো কি, সব খরচ তোমাদের করতে হবে? নইলে ভাবছিলাম তোমাদের রিজার্ভ

গাড়ীতে না হয় যাবো তোমাদের সঙ্গে। ভাড়াটা লাগতো না।

—রিজার্ভ গাড়ীতে গেলেও ভাড়া লাগে দাদা।

হরিপদ বাঁড়ুয্যে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে বললে—কেন? ভাড়া তো তোমাদের জমা দেওয়াই আছে।

—আছে তো বটেই, কিন্তু যারা সে ভাড়াটা দিয়েছে তারাই যাবে সে গাড়ীতে, তোমাদের নেবে কেন?

—তুমি যদি নেও?

—ভাড়া দিতেই হবে! বিনা ভাড়ায় যাওয়া চলে না।

—তবে আর রিজার্ভ মানে কি হোল!

হরিপদ বাঁড়ুয্যে অপ্রসন্নমুখে তামাক খেতে লাগলো। রিজার্ভ গাড়ী সম্বন্ধে তার ধারণা একটু অদ্ভুত রকমের সন্দেহ নেই। ভাবছি যে ওর ভ্রান্ত ধারণার একটু সংশোধন করে দেওয়া দরকার।

এমন সময় গফুর পিয়ন এসে বললে—বাঁড়ুয্যে মশাই, বাড়ী আছেন?

গফুর পিয়ন বড় ভালো লোক। আমাদের এখানে গফুর অনেকদিন আছে, সকলের সঙ্গেই আত্মীয়তা ওর। বাড়ীতে ডেকে ওকে জল-খাবার খাওয়ায়। কাঁঠালের সময় কাঁঠাল, আমের সময় আম, তালের বড়ার সময় ঝোলা গুড় আর তালের বড়া। বললাম—গফুর কি পাকিস্তানে চলে যাবে?

—হ্যাঁ বাবু, আমাকে যশোরে বদলি করেচে।

—সত্যি গফুর, তুমি পাকিস্তানে গেলে আমাদের সকলেরই মনে বড় দুঃখ হবে।

গফুর বিনীত হাস্যে বললে—বাবু, আমারও মনডা কি ভাল থাকবে? আপনাদের এখানে যে রকম কাটিয়ে গেলাম, এমন সোনার চোখে আমাকে অপর জায়গায় কি দেখবে?

—সকলেই দেখবে। যে ভালো হয় তাকে সকলেই ভালো বলে, বুঝলে না গফুর!

গফুর আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললে—বাবুর আজ মোটে একখানা।

গফুর চিঠি দিয়ে চলেই যাচ্ছিল, আমি বললাম—যাবার আগে একটু দেখা করে জল মুখে দিয়ে যেও। সামান্য একটু মিষ্টিমুখ—

গফুর হেসে চলে গেল।

তারপর চিঠিখানার দিকে চেয়ে বিস্মিত হলাম। কাঁচা মেয়েলি হাতে লেখায় চিঠিখানা লেখা—পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচরণকমলেষু—

কে চিঠি লিখেছে? খামখানা এত ময়লা আর পুরোনো আর অন্য রকমের! এ আবার কি রকমের খাম—আজকালকার খামের মত নয়।

কোনো ভক্ত পাঠিকার চিঠি নাকি?

খুলেই ফেলা যাক।

আশ্চর্য! এ কার চিঠি!

চিঠিখানা এইঃ—

শ্রীচরণকমলেষু,

শ্রীচরণের দাসিকে কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন? অনেক দিন আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাই নাই। আমরা কি অপরাধ করিয়াছি কি জানি। আপনি খড়িবেড়েতে নারান মুখুজ্যের ভাইপোর বিয়েতে বরযাত্রি আসিয়াছিলেন ভরত দাদার মুখে শুনিলাম। কিন্তু এ দাসিকে দর্শন দিতে আসিলেন না কেন, ইহার কারণ কিছু বুঝিলাম না। আপনি রাগ করিলে দাসির আর কে আছে বলুন? সেই ফুলশয্যার রাতের দিন আমাকে আম খাওয়ানোর জন্যে আপনার কি জেদ। আমি আম খাইনি কেন জানেন, তাহা বলিব। বিয়ের দরুণ ভালো চেলি পরণে ছিল জানো গো মশাই। তাই যদি নষ্ট হয়ে যায় সেজন্য আম খাইনি। অমনি মশাইয়ের রাগ হোল, কি রাগ সারা রাত্তির। জানো এখন আমার সে সব কথা মনে পড়লে হাসি পায়। না, এ সব লিখিব না তুমি আবার রাগ করিবে। এতদিন এখানে আসিলে না কেন? আমার ওপর রাগ করিও না। তুমি এমন নির্দয়, আমার ওপর মায়া হইল না! যাই হউক, তোমার ওপর জোর আছে বলিয়া তাই তোমাকে বার বার

জ্বালাতন করিতেছি। মা ও পিসিমা কত দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হইয়াছেন একবার আসিয়া তাঁহাদের চিন্তা দূর করিবেন। ভাবিয়া দেখুন কতদিন আপনাকে দেখি নাই, না দেখিয়া আমার মনটার মধ্যে কি রকম হইতেছে। তুমি সেই গান গাহিয়াছিলে, বিভাদিদি গান গাহিয়াছিল, সেই সব কথা মনে পড়ে আর বুক যেন ফাটিয়া যায়। ওগো তুমি আমাকে আর দুঃখ দিও না একবার শ্রীচরণ দেখিতে বড় ইচ্ছা করে। ওগো, তুমি এবার আসিলে আমি কত গান শুনাবো বিভাদিদির কাছে ও কর কাকাদের বাড়ীর সেজ-বৌয়ের কাছে কত গান শিখিয়াছি। শুনবে তো? এসেছে হৃদয়ের হাসি অরুণ অধরে। সম্মুখে রাঙা মেঘ করে খেলা তরণি বেয়ে চলো নাহি বেলা। সুখ যদি না পাও যাও সুখের সন্ধানে। কিছু নাহি চাবো গো আমি তোমার বিহনে। তোমাতে করিব দাস দীরঘ দিবস মাস। এই সব গান শিখিয়াছি। তুমি এলে চিলের কোঠায় দুপুরে দুজনে বসিয়া গাহিয়া শুনাবো। রানি দিদি ঠাট্টা করে বলিয়া আমার গান গাহিতে লজ্জা করে। যাহোক, এবার ঠিক গান গাহিয়া শোনাবো। আমায় আর কষ্ট দিও না, ওগো অত নিদয় হয়ে দাসিরে চরণে ঠেলিও না। আমার প্রণাম নিও। ইতি তোমার শ্রীচরণের দাসি—

নিরুপমা

তাং ২২ ফাল্গুন, ১৩২৪ সন।

কুলবেড়িয়া। জেলা নদীয়া।

ভাল বুঝতে পারলাম না। বানান ভুল, ভাষা ভুল, ছেদচিহ্নহীন এ চিঠিখানা কার? নিরুপমা? কে নিরুপমা?

পত্রখানি মনে এক অপূর্ব ভাব এনে দিল। কতদিন আগেকার বিস্মৃত প্রথম যৌবনের সুবাসভরা দিনগুলির বাতাসে মেশানো ছিল যে পিককুলের রসিকতা, নববসন্তের পত্রশোভা, দায়িত্বহীন জীবনের নিশ্চিত আরাম, মোহমদির দিগন্ত, অপরূপ মাধুরী একতাল পরে আবার ফিরিয়ে আনল চিঠিখানা।

তবুও বুঝতে পারলাম না কার এ চিঠি। গত ২৪ সালের চিঠি এল এই ৫৪ সালের ভাদ্র মাসে। আচ্ছা এও কি সম্ভব? আমার এতকাল আগেকার পরলোকগতা স্ত্রী নিরুপমার চিঠি এল আজ ত্রিশ বছর পরে?

এতকাল এ চিঠি কোথায় ছিল? কোন্ ডাকঘরের কোন্ আলমারির অন্ধকার কোণে আত্মগোপন করে ছিল সুদীর্ঘ ত্রিশটি বছর? আমার যৌবন বয়সের চিঠি এল যখন আজ আমি প্রৌঢ়ত্বে উপনীত? আমার ফুলশয্যার পরে নবপরিণীতা বধূর করুণ আহ্বান-লিপিখানি ডাকঘরের কর্মচারীরা এতকাল লুকিয়ে রেখে কি রসিকতা করতে চেয়েছিল আমার সঙ্গে!

এই চিঠি আসছিল গত ত্রিশ বছর ধরে। কত ঘটনা ঘটে গেল এই ত্রিশ বছরে, আমার জীবনের কত উত্থান-পতনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে। কত শোক, দুঃখ, প্রেম-কাহিনীর মধ্য দিয়ে এই চিঠিখানা আসছিল।

ত্রিশ বছর পরে এ চিঠি পেয়ে লাভ কি আমার?

চমৎকার শরৎ দুপুরটিতে শুধু বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম চিঠিখানা হাতে করে। দূর আকাশের কোণে যেন বেলপুকুর গ্রামটিতে আমার প্রথম শ্বশুরবাড়ীর চিলেকোঠার ঘরে আমার প্রথম পরিণয়ের নববধূ আজও যেন আমার পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষায় বসে আছে। চতুর্দশ বর্ষীয়া দেশে অবস্থিত সেই সুন্দরী বধূটির মুখ এতকাল একেবারেই মনে ছিল না—আজ হঠাৎ অতি আশ্চর্যরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

আমার স্ত্রী ঘরে ঢুকে বললে—পিয়ন এল দেখলাম, কার চিঠি এল গো? অমন করে বসে আছ কেন?

চমকে উঠে চিঠিখানা ঢাকা দিয়ে বলি—পিয়ন? কই চিঠি কিছু আসে নি। ও সই দিতে নিয়ে এসেছিল।

নিরুপমা মারা গিয়েছে আজ কত বছর? আটাশ উনত্রিশ বছর খুব হবে। বিয়ের পর কতদিন বেঁচে ছিল বা? বছরখানেক কি দেড় বছর হবে।

গ্রামের মধ্যে বাবা ছিলেন মাতব্বর।

আমাদের মস্ত বড় চন্ডীমন্ডপে সকালবেলা কত লোক আসতো—কেউ মামলা মেটাতে, কেউ কারো নামে নালিশ করতে, কেউ শুধু তামাক খেতে খোশগল্প করতে। হিন্দু মুসলমান দুই-ই। উৎপীড়িত লোকে আসতো আশ্রয় খুঁজতে।

আমরা বসে বসে পড়ি হীরুঠাকুরের কাছে। হীরুঠাকুর আমাদের বাড়ী থাকে খায়। পাগল মত বামুন, বড্ড বকে—আর কেবল বলবে—ও নেড়া, একটু কুলচুর নিয়ে এসো তো বাড়ীর মধ্যে থেকে। আমার মাসতুতো ভাই বিধু বলতো—কুলচুর কোথায় পাবো পন্ডিত মশাই, ঠাকমা বকে। হীরুঠাকুর বলে—যখন কেউ থাকবে না ঘরে, তখন নিয়ে আসবি।

আমাদের গোমস্তা বদ্যিনাথ রায় কানে খাকের কলম গুঁজে চন্ডীমন্ডপের রোয়াকের পশ্চিম কোণে প্রজাপত্তর নিয়ে বসে বাকিবকেয়া খাজনার হিসেব করতো। সবাই বলতো বদ্যিনাথ কাকা লোক ভাল নয়। প্রজাদের উপর অত্যাচার-অনাচার করে, দাখিলা দিতে চায় না। বাবা এ নিয়ে বদ্যিনাথ কাকাকে বকুনিও দিতেন মাঝে মাঝে। তবু ওর স্বভাব যায় না। বাবা কখনো প্রজাদের কিছু বলেন না। তাঁর কাছে আসতেও প্রজারা ভয় পায়। যখন আসে তখন কিছু মাপ করার জন্যে বা বদ্যিনাথ কাকার বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্যে।

তামাকের অঢেল বন্দোবস্ত আমাদের চন্ডীমন্ডপে। কেনা তামাকে কুলোয় না, সুতরাং হিংলি কিংবা মোতিহারি গাছ তামাক হাট থেকে কিনে আনা হয়। আমাদের কৃষাণ দুলাল মুচি সেগুলো বাঁশের উপর রেখে দা দিয়ে কাটে, তারপর সেই রাশীকৃত গুঁড়ো তামাক কোতরা গুড় দিয়ে মেখে মেটে কলসী ভর্তি করে রাখা হয়। যে আসচে সেই কলসীর মধ্যে হাত পুরে এক থাবা তামাক বার করে নিচ্চে, কলকে আছে, ভেরেন্ডা কিংবা বাবলা কাঠের কয়লা আছে একরাশ, সোলা আছে বোঝা বোঝা, চকমকি পাথর আর ঠকুনি আছে—খাও কে কত তামাক খাবে! গ্রামের কতকগুলি লোক শুধু তামাকের খরচ বাঁচাবার জন্যেই আমাদের চন্ডীমন্ডপে সকাল-বিকেল আসে—একথা আমার মাসতুতো ভাই বিধু বলে।

দুপুরের বেশী দেরি নেই। হীরুঠাকুরকে আমি বললাম—পন্ডিত মশায়, নাইতে যাবেন না?

—কেন?

—এর পর জোয়ার এলে আপনি নাইতে পারেন না তাই বলচি! নিরীহ সুরে বললাম কথাটা।

—কখন জোয়ার আসে?

—এইবার আসবে।

—তুমি কি করে জানলে?

—আমি—আমি জানি। বিধু বলছিল।

—না, বসে নামতা পড়ো। কড়ি-কষার আর্যা মুখস্ত হয়েছে বিধুর? নিয়ে এসো—বলো শুনি।

বিধু না বলতে পেরে হীরুঠাকুরের বেঁটে হাতের চটাপট চড় খায়। আমি হঠাৎ ধারাপাতের ওপরে ভয়ানক ঝুঁকে পড়ি। এমন সময়ে আমাদের হাজারি খুড়ি এসে বদ্যিনাথ কাকার সামনে দাঁড়ালো।

হাজারি খুড়ি গোপাল ঘোষের পরিবার, ওর ছেলের নাম বলাই, আমার বয়িসী, আমাদের সঙ্গে খেলা করে। গোপাল ঘোষ মারা গিয়েছে আজ বছরখানেক ওদের সংসারে বড় কষ্ট। হাজারির এক পা খোঁড়া বলে গ্রামের সকলে তাকে হাজারি খুড়ি বলে ডাকে। সে এর ওর বাড়ী ঝি-গিরি করে কোনো রকমে দিনপাত করে।

বদ্যিনাথ কাকা বললে—কি?

হাজারি বললে—ট্যাকা।

—কি?

—ট্যাকা এনেলাম।
—কিসের টাকা?
—এই ট্যাকা।
হাজারি লজ্জায় জড়সড় হয়ে গেল। বদ্যিনাথ কাকা বাবার দিকে চেয়ে বললেন—ও অম্বিক!
বাবা ছিলেন চণ্ডীমণ্ডপের ওদিকে বসে। কেন না এদিকে ছেলেদের নামতা পড়ার গণ্ডগোল ও বিভিন্ন প্রজা-পত্তরের কচকচি তাঁর বরদাস্ত হোত না। তিনি ওদিকে বসে নিবিষ্টমনে তামাক খেতে খেতে কি সব খাতার পাতা ওল্টাতেন। বদ্যিনাথ কাকা তাঁকে ডাক দিতে তিনি খাতার পাতা থেকে মুখ তুলে বললেন—কি?
—গোপাল গয়লার পরিবার কি বলচে শোনো। আমি তো কিছু বুঝলাম না। টাকার কথা কি বলচে।—যাও, বাবুর কাছে যাও।
আমরা নতুন কিছু ঘটনার সন্ধান পেয়ে ধারাপাত থেকে মুখ তুলে কান-খাড়া ক'রে দু'চোখ ঠিকরে সোজা হয়ে বসলাম।
বাবা বললেন—কি হাজারি, কিসের টাকা বলছিলে?
—ট্যাকা এনেলাম।
—কিসের টাকা? তোমরা তো খাজনা কর না। গোপাল গয়লার ভিটের খাজনা মাপ ছিল।
—এজ্ঞে, সে ট্যাকা নয়—
কথা শেষ করেই হাজারি খুঁড়ি একখানা কালোকিষ্টি ময়লা নেকড়ার পুঁটুলি খুলে বাবার পায়ের কাছে ঢাললে—একটি রাশ রুপোর টাকা।
বাবা অবাক, বদ্যিনাথ কাকা অবাক, হীরু পণ্ডিত অবাক, আমাদের তো কথাই নাই। গরীব হাজারি খুঁড়ি একটি রাশ নগদ টাকা ঢালচে তার ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলি খুলে।
বাবা বললেন—এ কিসের টাকা? এত টাকা কেন এনেচ? তুমি পেলে কোথায়?
হাজারি মুখে ঘোমটা টেনে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—উনি দিয়ে গিয়েছেন। আপনার ছেলে। আপনার কাছে রাখুন।
এতক্ষণে আমরা সবাই ব্যাপারটা বুঝলাম। হাজারি টাকাটা গচ্ছিত রাখতে এনেচে বাবার কাছে।
বাবা বললেন—টাকাটা আমার কাছে রাখবে?
—হ্যাঁ বাবা।
—কত টাকা আছে?
সে বললে—চারশো। আপনি গুনে দেখেন।
বদ্যিনাথ কাকা টাকা গুনে দেখলে ঠিক চারশো টাকাই আছে। বাবা বললেন—চারশো টাকা পুরোপুরি রাখতে নেই। এক টাকা কম কি এক টাকা বেশী রাখতে হয়। এক টাকা তুমি নিয়ে যাও। কোথায় এতদিন টাকা রেখেছিলে?
—ঘটির ভিতর বাবা।
—একটা কথা শোনো গয়লা-বৌ। তুমি গরীব মানুষ, টাকাটা দুই-এক টাকা করে নিও না। এতে টাকা খরচ হয়ে যাবে, অথচ তোমার কোন বড় কাজে আসবে না।
—বাবা, আপনি যা বলেন, তাই করবো।
হাজারি চলে গেল।
বদ্যিনাথ কাকা বলে—দেখলে অম্বিক, ধুকড়ির ভেতর খাসা মাল! কে জানতো যে ওর ঘরে ঘটির মধ্যে তিনশো চারশো টাকা আছে? ঝি-বৃত্তি করে সংসার চালায় এদিকে, আজকাল মানুষ চেনা দায়।
—যাও, কাজ করগে। সে কথায় তোমার দরকার কি?
এই ঘটনার পর মাস পাঁচ ছয় কেটে গেল। আবার আমরা বসে হীরুঠাকুরের কাছে ধারাপাত মুখস্থ করচি।
এমন সময়ে হাজারির ছেলে বলাই এসে কাঁদো কাঁদো সুরে বদ্যিনাথ কাকাকে বললে—

মা মারা গিয়েচে নায়েব মশাই।

বদ্যিনাথ কাকা চমকে উঠে হাতের কলম ফেলে বললে—তোর মা? কোথায়—কই—তা তো জানিনে—এখানে মারা গিয়েচে?

—না। মোর ভগ্নিপতির বাড়ী, কালোপুরে।

—কবে গিয়েছিল?

—তা আজ দুমাস। মুইও তো সেখানে ছেলাম।

একটু পরে বাবা এলেন বাড়ীর ভিতর থেকে। বলাই গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালো বাবার সামনে। বদ্যিনাথ কাকা বললে—শুনলে অম্বিক, হাজুরি মারা গিয়েচে।

—সে কি?

—হ্যাঁ। ও তাই বলচে।

—বলিস কিরে বলাই, শ্রাদ্ধ হয়ে গিয়েচে?

—তা হয়েল।

—তা তুই কি মনে করে এলি এখন?

—সে বলবানি। এখন মেলা নোকের ভিড়। নিরিবিলি বলবানি।

বাবা স্বভাবতই ভাবলেন যে বলাই টাকার জন্য এসেচে। কিন্তু তার বদলে সে যা বললে তাতে বাবা একটু অবাক হয়েই গেলেন।

কথাটা যখন বললে তখন বদ্যিনাথ কাকাও সেখানে ছিল।

বাবা বললেন—কি কথা বলবি বলাই?

—মোদের ঘরের চাবিটা নায়েব মশায়কে খুলে দিতে বলুন। ঘরে একটা ভাঁড়ে তিনশো ট্যাকা আছে, মা মরণকালে মোরে বলেচে।

—ভাঁড়ে?

—হ্যাঁ, একটা ভাঁড়ের মধ্যে।

—আর কোনো টাকার কথা বলেচে তোর মা?

—না।

—আর কারো কাছে কোনো টাকা আছে বলে নি?

—না। বলেছে ভাঁড়ে ট্যাকা আছে।

—বেশ, তুই চাবি নিয়ে ঘর খুলে দেখগে।—বদ্যিনাথ, ওর ঘরের চাবিটা দিয়ে দাও।

দুপুরের পর বলাই চাবি হাতে আবার আমাদের বাড়ী এসে বললে—ট্যাকা পেলাম না।

বাবা বললেন—টাকা পেলিনে? কোথায় গেলো অতগুলো টাকা?

—ইঁদুর বাঁদরে নিয়ে কোথায় ফেলেচে বাবা। তখন বললাম অঘোর ঘোষের বাড়ীর দিকি বাঁশঝাড়টা কাটিয়ে দেন। ঐ বাঁশঝাড় থেকে ইঁদুর বাঁদর আসে।

—বটে।

—তা মুই যাই?

—কোথায় যাবি?

—মুই কালোপুর চলে যাই। ভগ্নীপতির বাড়ী গিয়েই থাকবো। এখানে একা ঘরে থেকে কেডা রাঁধবে, কেডা বাড়বে। মা মরে গেল। দুটো রাঁধা ভাতের জন্যি কার দোরে যাবো?

—বুঝলাম। তোকে কোন নগদ টাকা দিয়েছিল তোর মা?

—এক কুড়ি ট্যাকা দিয়ে গেছে। মোর কাছে আছে সে ট্যাকা। মুই তেলেভাজা খাবার কিনে খাই হাটে হাটে। একমুটো ট্যাকা।

—আচ্ছা তুই একবার মাসখানেক পরে আসবি। দেখি তোর মায়ের টাকার যদি কোনো সন্ধান করতে পারি, বুঝলি?

—সে আর আপনি কোথায় সন্ধান করবা? সে ইঁদুরে-বাঁদরে নিয়ে গিয়েচে। বাদ দ্যান।

—তাহলেও তুই আসিস্, বুঝলি?

বলাই চলে গেলে বদ্যিনাথ কাকা বললে—আরে অম্বিক, তোমাকে একটা কথা বলি। ও টাকাটা তুমি ওকে আর দিও না। দেখচো ওর বুদ্ধিশুদ্ধি? অতগুলো টাকা নাকি ইঁদুরে নিয়ে গিয়েচে। ওকে আজ টাকা দেবে, কাল ওর ভগ্নীপতি ওর হাত থেকে ভুলিয়ে টাকাগুলো নেবে। মাঝে পড়ে—ন দেবায়, ন ধর্মায়। ছেলেমানুষের হাতে অতগুলো টাকা দিতে আছে? বিশেষ করে ওর মা মরণকালে যখন বলে যায়নি, তখন তোমার টাকার কথা কবুল করবারই বা দরকার কি? কেউ যদি এর পরে বলে, তখন বললেই হবে ওর মা জামাই-বাড়ী যাবার সময় গচ্ছিত টাকা আমার কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। খাতায় তুলিনি ও টাকা। মুখে-মুখে টাকা রাখা। কে সাক্ষী আছে টাকার?

বাবা বললেন—বদ্যিনাথ, সাক্ষী নেই বলচো। তখন চণ্ডীমণ্ডপে কত লোক ছিল জানো তো?

—তারা জানে না কিসের টাকা। তুমি মহাজনী করো, তোমার দেনার টাকা তো হতে পারে।

—খাতায় দেনার কথা প্রমাণ করতে পারবে?

—তা হাতচিঠি একখানা তৈরী করে ফেলি আজই। দুবছর আগের তারিখ দিই।

—পাগল। টিপসই কে দেবে?

—মরা লোকের টিপসই বুঝে নিচ্ছে কে? কোর্টে তার টিপসই রুজু করাচ্ছে কে? আমার টিপসই যে হাজারির নয় তাই বা প্রমাণ হচ্ছে কিসে থেকে?

বদ্যিনাথ কাকা ধড়িবাজ ঘুঘু লোক। ওর পেটে বহু অন্যায় ফন্দি সর্বদাই বিরাজ করছে, নদীর জলে তেচোকো মাছের ঝাঁকের মতো। বাবা হেসে বললেন—তা হয় না বদ্যিনাথ, এ কোর্টে না-হয় ও গরীব বেচারা হারলো, কিন্তু উঁচু কোর্টে যে আমি হেরে যাব।

—উঁচু কোর্ট করছে কে?

—সে কোর্ট নয়—

বাবা আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

বদ্যিনাথ কাকা আর কোনো কথা বললে না।

মাস দুই পরে বলাই এসে হাজির হোল একদিন। বাবা বললেন, ভাল আছিস বলাই?

—আপনার ছিচরণ আশীর্বাদে—

—তোর টাকার সন্ধান পেয়েছি।

—পেয়েছেন?

—পেয়েছি। একটা কাজ করতে হবে তোকে। তোদের সেখানে তোদের স্বজাতির মধ্যে কোন মাতব্বর কেউ আছে?

—আছে। তেনার নাম সতীশ ঘোষ।

—আচ্ছা, সেই সতীশ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে আমার এখানে তুই সামনের বুধবারে আসবি। টাকার সম্বন্ধে তার সঙ্গে পরামর্শ করবো।

সেই বুধবারে বলাই আবার এল, সঙ্গে একজন আধবুড়ো লোক। গলায় ময়লা চাদর, পায়ে চটি জুতো, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো পায়ে। সামনের দাঁত দুটো একটু উঁচু ওর। বাবা তখন পাড়ায় কোথায় বেরিয়েচেন। আমি আর আমার মাসতুতো ভাই বিধু গাছের কচি ডাব পাড়াচ্ছি।

বলাই বললে—এই সতীশ ঘোষকে এনেচি। তোমার বাবা কনে?

সতীশ ঘোষ বললে, প্রাতঃপেনাম। আমাকে আপনার বাবা ডেকেচেন কেন জানেন কিছু? আমি তো তাঁকে চিনিনে। কখনো দেখিনি। ব্রাহ্মণ দেবতা, ডেকেচেন তাই এলাম।

—আমি তো কিছু জানিনে। বাবা আসুন। আপনি তামাক খাবেন?

—হাঁ বাবা, খাই। তামাক টিকে কোথায়, আমি সেজে নিচ্ছি।

আমি ঠাকুরমাকে গিয়ে বলতেই তিনি বললেন—তোমার বাবা বাড়ী নেই। ভিন্ গাঁ থেকে লোক এলে যত্ন করতে হয়। তাকে গিয়ে জিগ্যেস কর এখন কি তাকে জলপান পাঠিয়ে দেওয়া হবে?

আমার প্রশ্নের উত্তরে সতীশ ঘোষ বললে জিভ কেটে—সে কি কথা? ব্রাহ্মণ দেবতা, তাঁর বাড়ী এসে আমি আগে তাঁদের পায়ের ধূলো না নিয়ে জল খাবো কেমন কথা? মা ঠাকরোণ কই?

আমি তাকে ঠাকুরমার কাছে নিয়ে গেলাম। সতীশ গড় হয়ে ঠাকুরমাকে প্রণাম করে জোড়হাতে বললে—আমার উপর কি হুকুম হয়েচে আপনার? আমি তো আপনাদের চিনিনে—তবে মনে ভাবলাম, ব্রাহ্মণ দেবতা যখন হুকুম করেচেন—

মিনিট পনেরোর মধ্যে দেখি সতীশ ঘোষ আমাদের ভেতর বাড়ীর রোয়াকে বসে কাঠা-খানেক চিঁড়ে-মুড়কি আর আধখানা ঝুনো নারকেল ধ্বংস করচে।

ঠাকুরমাকে একটু মিষ্টি কথা বললে আর রক্ষে নেই। কত প্রজা যে বিপদে পড়ে এসে ঠাকুরমার মনস্তুষ্টি করে শক্ত শক্ত বিপদ পার হয়ে গিয়েছে তার ঠিক নেই। ঠাকুরমার মন অতি সহজেই মিষ্টি কথায় গলে। এদিকে বাবা অত্যন্ত মাতৃভক্ত। ঠাকুরমা যা বলবেন, তাই বেদবাক্য বাবার কাছে। ঠাকুরমা কেবল ভুলবেন না আমাদের কথায়। হাজার মিষ্টি কথা বলে নিয়ে এসো দিকি একটু তেঁতুলছড়া, কি একটু কাসুন্দি, কি এক থাবা কুলচুর! উঁহু, আসল কাজে ঠিক আছে ঠাকুরমা। তার বেলা—এই নবুনে, ভাঁড়ার ঘরের তাকের দিকে ঘন ঘন আনাগোনা করা হচ্চে কেন? খবরদার, ভাঁড়ার ঘরের চৌকাঠে পা দেবে না বলে দিচ্চি—

একটু পরে বাবা এলেন। সতীশ ঘোষকে দেখে বললেন—এ কে?—না, না—তুমি খাও—খাও—উঠতে হবে না। খেয়ে নাও আগে—

ঠাকুরমা বললেন—তুমি খাও বাবা, আমি বলচি। এ হোল সতীশ ঘোষ। হাজারির ছেলে বলাই সঙ্গে করে এনেচে কালোপুর থেকে।

—ও বুঝলাম। আচ্ছা, বেলা হয়েছে, আমি চান করে আহ্নিক করে নিই। আহারাদির পর কথাবার্তা হবে। তুমিও গঙ্গায় চান্ করে এসো। দিব্যি ঘাট, চখা বালি, কোনো অসুবিধে হবে না।

সতীশ ঘোষ চণ্ডীমণ্ডপে খেয়ে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। ঠাকুরমা বললেন—এতটা পথ হেঁটে এসেচ বাবা, একটু জিরিয়ে নাও খেয়েদেয়ে।

বিকেলে বাবা সতীশ ঘোষকে বললেন সব কথা। সতীশ অবাক হয়ে বললে—কত টাকা বললেন?

—চার শো টাকা।

—তা আমায় ডাক দেলেন কেন?

—তার মানে ওর হাতে টাকা দিতে চাইনে। ও ছেলেমানুষ, যেমন ওর হাতে টাকা পড়বে, অমনি ওর ভগ্নীপতি শরৎ ঘোষ ওর হাতে থাবা দিয়ে সমস্ত টাকা কেড়ে নেবে। তাকে আমি চিনি, অভাবগ্রস্ত লোক। ও বেচারী মায়ের ধনে বঞ্চিত হয়ে থাকবে। তার চেয়ে আমি তোমার হাতে টাকাটা দিই, তুমি রেখে দাও আপাততঃ ওকে জানানোর দরকার নেই। জানালে বিরক্ত করে মারবে টাকার জন্যে, আজ দাও দুটাকা, কাল দাও পাঁচটাকা—ওর সেই ভগ্নীপতি প্ররোচনা দেবে, যা গিয়ে টাকা নিয়ে আয়। বুঝলে না? তুমি টাকাটা রেখে দাও, বলাই সাবালক হোলে সমস্ত টাকাটা ওর হাতে দিয়ে দেবে। তারপর সে যা হয় করুক গে। এখন তুমি আমি ভগবানের কাছে দায়ী আছি নাবালকের টাকার জন্যে। নাবালকের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব আমার এবং তোমার।

সতীশ হাতজোড় করে বললে—দেখুন দিকি, এই জন্যিই তো বলি ব্রাহ্মণ দেবতা। সাধে কি আর বলি। তা আপনি আমাকে ডাকলেন কেন? আমাকে কেন জড়ান? আপনার কাছেই তো—

—না। বলাই যদি এ গাঁয়ে বাস করতো, তবে টাকা আমিই রাখতাম। ওরা আমার প্রজা, ভিটের খাজনা নিইনে, তবে ব্যাগার দিতে হয় আমার বাড়ীর ক্রিয়াকর্মে। প্রজা হয়ে থাকতো, ওর স্বার্থ দেখতাম। এখন যখন চলে যাচ্ছে, সে দায়িত্ব আমি রাখি কেন? সেই জন্যে ওকে বলেছিলাম, তোমার গাঁয়ের মাতব্বর লোক একজনকে ডেকে এনো। কেন, কি বৃত্তান্ত তা আর বলিনি। টাকা অতি খারাপ জিনিস সতীশ, তুমিও তো বিষয়ী লোক,

আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে। টাকাটা আমি এনে দিই, তুমি নিয়ে যাও—

—আচ্ছা দেবতা, একটা কথা। আপনার যখন হুকুম, তখন নিয়ে আমি যাবো। তবে মোড়ল মাতব্বর আমি কিছুই নই। আপনাদের ছিচরণের চাকর—এই মাত্তর কথা। মোড়ল মাতব্বর আমি নই। কিন্তু একটা কথা—

—কি?

—যদি বলাই সাবালক হওয়ার আগে মারা যায়, তবে টাকার কি হবে?

—তাহলে মা ও ছেলের নামে এই দিয়ে স্বজাতি জ্ঞাতিকুটুম্ব ভোজন করিও একদিন। ওদের তৃপ্তি হবে।

—আহা, ওর মা হাজারি বড্ড ভালো লোক ছিল। তার কথা ভাবলে কষ্ট হয়। বড্ড সরল।

সতীশ সেদিন টাকাকড়ি গুনে-গেঁথে নিয়ে চলে গেল বটে, কিন্তু মাসকয়েক পরেই একদিন এসে হাজির হোল। সেই চণ্ডীমণ্ডপে হীরু ঠাকুরের কাছে তখন আমরা পড়িচি। সতীশ ঘোষ এসে বাবাকে প্রণাম করে বললে—সে হয়ে গিয়েচে। আপনাকে আর (আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) এই খোকাবাবুকে আর এই নায়েববাবুকে একবার যেতে হচ্ছে কালোপুর—

বাবা বললেন—মানে?

—মানে, আপনাদের বলাই আজ তিনদিন হোল গরু চরাতে গিয়ে বাজ পড়ে মারা গিয়েচে।

—বাজ পড়ে!

—আজ্ঞা হ্যাঁ। মরে মাঠেই পড়ে ছিল। সন্দের সময় টের পেয়ে তখন সবাই গিয়ে তাকে দেখে, পড়ে আছে। নিয়তির খেলা, আপনিই বা কি করবেন, আমিই বা কি করবো। এখন চলুন, অপঘাতে মৃত্যু, তিনদিন অশৌচ, কাল তার শ্রাদ্ধ। সেই টাকাটা আপনি যেমন হুকুম দেবেন, আপনার সামনে খরচ করবো।

বদ্যিনাথ কাকা আর বাবা পরদিন কালোপুর গেলেন, সঙ্গে আমি। আশ্চর্য হলাম আমরা সকলেই সেখানে গিয়ে। সতীশ ঘোষ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, আটচালা বড় ঘর, চণ্ডীমণ্ডপ, সদর অন্দর পৃথক। সবই ঠিক, কিন্তু লোকজনের সমারোহ, আয়োজন দেখে আমরা তো অবাক। চারশো টাকায় এত লোক খাওয়ানো যায় না, এমন সমারোহ করা যায় না। হাজারি খুড়ির বার্ষিক সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধও ওই সঙ্গে হোল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লোক খাওয়ানোর বিরাম নেই। আজ থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। সস্তাগণ্ডার দিন ছিল বটে, তবুও সাত আটশো টাকার কমে সে রকম খাওয়ানো যায় না, তত সমারোহই করা যায় না। আর কি যত্নটা করলে আমাদের সতীশ ঘোষ! লুচি, ছানা, সন্দেশ, দই। সব সময়ে হাতজোড় করেই আছে।

বাবা বললেন—সতীশ, এ কি ব্যাপার? তোমার ঘর থেকে কত খরচ করলে? তুমি তাদের কেউ হও না, জ্ঞাতি নও, কুটুম্ব নও, তাদের জন্য এত টাকা—

সে হাতজোড় করে বললে—দেবতা, টাকা তো ময়লা মাটি। আপনি হুকুম দেলেন। বলি, করতে যদি হয় তবে ভিন্ গাঁয়ের মা আর ছেলে বেঘোরে মারা গেল, ওদের শ্রাদ্ধ একটু ভাল করেই করি। আপনি খুশি হয়েচেন, দেবতা?

বদ্যিনাথ কাকা যে অত জাঁহাবাজ ঘুঘুলোক, কালোপুর থেকে ফিরবার পথে বললে—না, সত্যি হাজারি খুড়ির পুণ্যি ছিল। তাই টাকাটার সদ্ব্যয় হোল। ভালো হাতে পড়েছিল টাকাটা।

ছেলেবেলার কথা এ সব। তখন পল্লীগ্রামের লোক এমনি সরল ছিল, ভালো ছিল—আজ বাবাও নেই, সে সতীশ ঘোষও নেই। এখন দূর স্বপ্নের মত মনে হয় সে সব লোকের কথা। হাজারি খুড়ির শ্রাদ্ধের পরে সতীশ ঘোষ আমাদের বাড়ীতে অনেক বার এসেছিল। আমার ঠাকুরমাকে মা বলতো, বাবাকে দাদাঠাকুর বলে ডাকতো। সঙ্গে করে আনতো মানকচু, আখের গুড়, ঝিকরহাটি বাজারের কদমা আর জোড়া সন্দেশ। কখনো ক[illegible] ভাঁড়ে করে গাওয়া ঘি আনতো। আমার বড়দিদির বিয়ের সময় ওদের বাড়ীর ঝি-

বোয়েরাও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। একখানা ভাল কাপড় দিয়েছিল বিয়েতে।

বাবা মারা যাওয়ার পরে আমরা দেশ ছেড়ে বিদেশে যাই। শুনেছিলাম সতীশ ঘোষ মারা গিয়েচে বহুদিন। আর কোন খোঁজখবর রাখিনে তাদের।

প্রত্যাবর্তন

মাথাটা আগে থেকেই ঝিম্ ঝিম্ করছিল। আবার বোধ হয় জ্বর আসচে।

পাল্লা-হরিশপুরের মাইনর স্কুলে পড়ি। বাবার হাতে পয়সা নেই, মা কান্নাকাটি করেন, ছেলেটার লেখাপড়া হোল না—তাই পাল্লা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ষড়ানন চাটুয্যে আমার সাবেক স্কুলের মাস্টার মহাশয়ের অনুরোধে পাল্লার মাইনর স্কুলে বিনা মাইনেতে পড়তে দিয়েচেন। গ্রামের পুরুতঠাকুর শ্রীগোপাল চক্কত্তি দয়া করে তাঁর বাড়ীতে আমার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করেচেন। আছি এখানে আজ বছরখানেক হোল।

থাকতে পারিনে ভালোভাবে দু' কারণে। সে কথা কেউ জানে না। মা জানতো; কিন্তু মা তো এখন নেই এখানে।

প্রথম—ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছি আজ একটি বছর। কত ওষুধ খাচ্ছি, কিছুতেই সারে না।

দ্বিতীয় কারণটা—আমার ছোট ভাই দেশে আছে, তার নাম নন্তু। বড় চমৎকার ছেলে সে। সাত বছর বয়স হোল। আগে আমায় ডাকতো—'তাতা—ও তাতা'। এখন 'দাদা' বলেই ডাকে। সুন্দর দেখতে। নন্তুকে না দেখে বড় কষ্ট হয়।

সেদিন টিফিনের ছুটি হবার আগেই মাস্টার মশাইকে বলি—স্যার, আমার জ্বর আসচে—

ননী মাস্টার আমার দিকে চেয়ে সহানুভূতির সুরে বললেন—আবার জ্বর?

—হ্যাঁ, স্যার।

—বাড়ী যাবি?

—এখন হাঁটতে পারব না, স্যার!

—বেঞ্চিতে শুয়ে পড়। আয় দিকি হাত দেখি—

হাত দেখতে হোল না, গায়ে হাত দিয়েই বললেন—এঃ বড্ড জ্বর যে! গা পুড়ে যাচ্চে। শুয়ে পড়।

শুয়েই পড়ি বেঞ্চিতে।

তারপর জ্বরে কখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েচি। যখন জ্ঞান হোল তখন আমতলার স্কুল-বোর্ডিঙে আমাদের ক্লাসের গোপালের তক্তপোশে শুয়ে আছি।

গোপাল আমার পাশে দাঁড়িয়ে; বললে—কেমন আছিস বিনোদ?

সে কোথা থেকে দৌড়ে এসেচে। গায়ে ঘাম, মুখ রোদে রাঙা হয়েচে। বললাম—দৌড়ুচ্ছিলি?

—হাঁ, ষাঁড় তাড়াচ্ছিলাম—হেড মাস্টারের কপিক্ষেত সাবাড় করেচে।

—আমার গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখ—জ্বর আছে?

—হুঁ! বেশ আছে। বাড়ী যাবিনে?

—হাঁটতে পারলেই যাবো।

—তাই যা। এখানে শোবার জায়গা নেই, কোথায় থাকবি? বাড়ী যা।

বাড়ী যাবো কোথায়, তাই ভাবি। এ আমার নিজের বাড়ী নয়। যাঁর বাড়ী থাকি, তিনি বাড়ী-বাড়ী ঠাকুরপুজো করে বেড়ান। তাঁর বাড়ীতে খুব খাটতে হয় আমাকে, তাঁর ছোট মেয়েটাকে সর্বদা কোলে করে বসতে হয়। একটু যদি কেঁদে ওঠে খুকি, তার মা আমার উপর চটে যান।

একদিন মনে আছে, স্কুল থেকে বাড়ী গিয়েচি, খিদেয় সমস্ত শরীর হালকা হয়ে গিয়েচে, খুকিকে আমার কোলে দিয়ে তার মা রান্নাঘরে ঢুকলেন। আমি আসবার আগে থেকেই

খুকি কাঁদছিল। আমার কোলে উঠে আরও কাঁদতে লাগলো। আমি কত বোঝালাম, কত ছড়া বললাম, গান গাইলাম, কিছুতেই শুনলে না, কান্নাও থামলো না। ওর মা এমন রেগে গেলেন আমার ওপর, আমার কাছ থেকে খুকিকে নিয়ে নিজে কোলে করে বসলেন। আমায় কিছু খেতে দিলেন না। রাত্রেও আমাকে ভাত দিতেন না বোধ হয়। রাত্রে চক্কত্তি মশায় খেতে বসে বললেন—বিনোদ খেয়েচে?

তখন কত রাত হয়ে গিয়েচে! খিদেয় অবসন্ন হয়ে পড়েচি। স্কুল থেকে এসে পর্যন্ত একগাল মুড়িও খাই নি।

অন্য দিন এমন সময় কোন্ কালে আমার খাওয়া হয়ে যায়! পুরুত মশায় নবীন দাঁর চণ্ডীমণ্ডপের দাবা-খেলার আসর থেকে রোজই বেশি রাত করে ফেরেন। তারপর তিনি খেতে বসেন।

খুকির মা বললেন—না।

পুরুত মশাই বললেন—কেন? এত রাত্রেও খায় নি এখনো? জ্বর হয়েচে বুঝি?

—না, জ্বর হবে কেন? বসে পড়ছিল, তাই ভাত দিই নি এখনো।

—যাও, ডেকে দাও। ছেলেমানুষ, খিদে পেয়েচে, আমার পাশেই বসুক।

—তুমি খেয়ে উঠে যাও, দেবো এখন।

—না, ওকে ডাকো। জায়গা করে দাও এপাশে।

পুরুত ঠাকুরের কথায় আমার জায়গা করে দিলেন খুকির মা। নয়তো আমি জানতাম রাত্রে তিনি আমায় না খাইয়ে রেখে দিতেন। কাউকে কিছু বলা আমার স্বভাব নয়। চুপ করেই থাকতাম।

সেই বাড়ীতেই ফিরে যাবার কথা বলচে গোপাল!

সেখানে আমার মা নেই। মা থাকলে—আমায় দেখলে রাস্তা থেকে ছুটে আসতেন। এখানে খুকির মা আমার জ্বর দেখলেই মুখ ভার করে বলবে—ঐ এলেন অসুখ নিয়ে.! কে এখন সেবা করে? আমার তো বড্ড উপকার হচ্চে ওঁকে দিয়ে! কুটোটুকু ভেঙে দুখানার উপকার নেই। শুধু সেবা করো। বার্লি রে—সাবু রে—

কিছুই করতে হয় না ওঁকে। আমি ওঁকে কখনো কষ্ট দিইনে। আমার রোজ জ্বর লেগেই থাকে। ওঁকে ডাকতে বা কিছু বলতে আমার লজ্জা হয়। উনিও আমার কাছে বড় একটা আসেন না। মিথ্যে বলব না, সে বরং পুরুত মশায় যত রাত্রেই ফিরুন না দাবা খেলে, আমার অসুখ হয়েছে শুনলে আমার শিয়রে এসে বসে আমার হাত দেখবেন; গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখবেন। স্ত্রীকে ডেকে বলবেন সাবু কি বার্লি করে দিতে। নিজে কাছে বসে খাওয়াবেন। সকালে উঠে গোবিন্দ ডাক্তারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন ব্যস্ত হয়ে—ও ডাক্তার-বাবু, বিনোদ যে অমন ভুগতে লাগলো! পরের ছেলে আমার বাড়ী আছে, অমন করে পড়ে থাকলে মন বড় ব্যস্ত হয়। ওর অসুখের একটা বিহিত করুন।

পুরুত মশাইকে দেখলে বাবার কথা মনে পড়ে। দুজনেই নিরীহ; কেউ ওঁদের মানে না, বরং ওঁরাই সবাইকে ভয় করে চলেন!

বড় যদি হই, পুরুত মশাইয়ের দুঃখু আমি ঘোচাবো। ওঁর ছেলে নেই। আমি ওঁর ছেলে হবো। না, ওঁদের বাড়ী আমি এখন যাবো না। জ্বর আমার এবার খুব বেশি। হয়তো আরও বাড়বে।

গোপালকে আমি বললাম—ভাই, আমি মার কাছে যাবো।

—মার কাছে যাবি! তোদের গাঁয়ে? সে এখান থেকে ছ'কোশ রাস্তা। নদী পার হতে হবে কেউটেপাড়ার খেয়াঘাটে, পারবি কেন? এই জ্বর-গায়ে—

—তা হোক। তুই কাউকে বলিসনে। আমার পকেটে সরকারি ডাক্তারখানার ওষুধ আছে। আমি যাবো। রাত্তিরটুকু তোর খাটে থাকতে দে।

গোপাল রেগে গেল। বললে—দায় পড়েছে তোকে থাকতে দিতে! তোর যত বাজে আবদার! বাড়ী যাবি কি করে এই অসুখ গায়ে? বাড়ী যাবি বললেই হোল? আমারও খাটে নেই জায়গা। দুজনে শোব কোথায়? আমি রুগীর সঙ্গে এক বিছানায় শুইনে। বাড়ী যা।

মনে বড় দুঃখু হোলো, গরীব বলে সবাই হেনস্তা করে। গোপাল যে আমার এই অসুখ-গায়ে তাড়িয়ে দেবে, তার মানেও তাই।

আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বেলা এখনও ঘণ্টা-দুই আছে। শরীরটা একটু হালকা মনে হচ্ছে। এই দু ঘণ্টা হাঁটলে কেউটেপাড়ার খেয়াঘাট পর্যন্ত পেঁছিতে পারবো না? খুব পারবো। খেয়াঘাটের ইজারাদার যে ঘরে থাকে, বললে আমাকে জায়গা দেবে না একটু? গোপালের মত নিষ্ঠুর তারা নয়। পুরুত ঠাকুরের বৌয়ের মত নিষ্ঠুর তারা নয়!

—আচ্ছা ভাই, চললাম।

বলেই রওনা হলাম বোর্ডিং থেকে। লুকিয়ে মাঠের রাস্তা ধরলাম। আমি জানি, আমি বেশিদিন বাঁচবো না। মাকে আমার দেখতেই হবে। কারো কাছে যাবো না, মার কাছে যাবো।

চৈত্র মাস। অথচ এমন শীত করে এখনো! বেলা খুব বেড়েচে। মেঠো পথের দুধারে ঘেঁটুফুল ফুটেচে কতো!

বাঘজোয়ানির ঠাকুর-বাড়ী পার হয়ে ফলেয়া গ্রামের পথে পড়ে ছোট্ট খালের খেয়া। একখানা নৌকো আছে। মাঝি থাকে না, নিজেই নৌকো বেয়ে পার হয়ে ওপারে শিমুল-তলায় বসি। শিমুলফুল ফুটেচে গাছটাতে, টুপটাপ করে রাঙাফুল ঝরে পড়চে। শুকনো কঞ্চির বেড়া দিয়েচে পোড়া খালের ধারে ধারে। চাষাদের মুসুরি-ক্ষেতে মুসুরি পেকে গাছ শুকিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনো মুসুরি তোলে নি। ঘেঁটুফুলের কি সুন্দর সুগন্ধ বেরুচ্চে পড়ন্ত রোদে। নিঃশ্বাস টেনে শুঁকি।

কেবলই হাঁটছি, কিন্তু হাঁটতে পারিনে আর। পা ধরে আসচে। ফলেয়া গ্রামের পেছনে মস্ত বাঁশবাগানে মরা শুক্নো বাঁশপাতার কেমন চমৎকার গন্ধটা! বাঁশবাগানের মধ্যে দিয়ে পথটা, তারপর আবার মাঠ। মাঠের মধ্যে বড় একটা যজ্ঞিডুমুর গাছ। থোলো থোলো যজ্ঞিডুমুর পেকে টুপটুপ করচে গাছে। আমার গা বমি-বমি করছিল। ডুমুর-তলায় বসে বমি করলাম। গা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। জলতেষ্টা পেলো। ঠান্ডা জল কোথায় পাই?

অবসন্ন হয়ে থাকলে চলবে না, মার কাছে পেঁছিতে হবে। কখনো একা এত দূর পথ হাঁটি নি। ভয় করচে। অন্য কিছুর ভয় আমার নেই। চিল্‌তেমারি গ্রামের শ্মশানটা রাস্তার ধারেই পড়ে। শ্মশানে নাকি কত লোক ব্রহ্মদাত্যি দেখেচে, পেত্নী দেখেচে। চিল্‌তেমারি যেতে অবশ্যি সন্ধ্যে হবে না। হে ভগবান, যেন সন্ধ্যা না হয়। মাকে দেখতেই হবে। তার আগে যেন সন্ধ্যা না হয়, অথবা না মরি! হে ঠাকুর!

একটা কাদের বাড়ী পথের ধারে। দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম—একটু জল দেবে?

একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে আমার সামনে এসে বললে—কি জাত!

—ব্রাহ্মণ।

—আমাদের জল খাবে? আমরা জেলে।

—তা হোক, দাও।

মেয়েটি একটু পরে একখানা পাটালি আর এক ঘটি জল নিয়ে এসে আমায় দিলে। আমার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখে বললে—তোমার কি হয়েছে?

—জ্বর।

—কোথায় বাড়ী?

—মনোহরপুরে।—পাটালি খাবো না। শুধু জল দাও।

জল খেয়ে আমি হেঁটে চললাম অতি কষ্টে। মেয়েটা আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল কতক্ষণ। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল আমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। সে চেঁচিয়ে বললে—আজ এখানে থেকে গেলেই পারতে—হ্যাঁগো?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম—না, আমাকে যেতেই হবে; মার জন্যে মন কেমন করচে!

আবার মাঠ। কি সুন্দর মাঠ। শুধু আকন্দ ফুল আর ঘেঁটুফুল ফুটে আছে।

যদি শরীর ভালো থাকতো, হয়তো মাঠে হাডুডু খেলতাম বন্ধুদের নিয়ে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এখনো সামনে চিল্‌তেমারি গ্রাম, তারপর কেউটেপাড়ার খেয়াঘাট—যমুনা নদীর ওপর। সন্ধ্যে হলেই আমার ভয় করবে। চিল্‌তেমারির শ্মশান তার আগেই পেছনে ফেলতে হবে; কিন্তু আর যেন হাঁটতে পারচিনে। শরীর কেমন করচে!

একটা তুঁতগাছের তলায় গুঁড়ি ঠেস দিয়ে বসে দম নিই। সূর্যটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। সূর্য ডুবলেই অন্ধকার হয় না। ভরসা একেবারে ছাড়ি নি। আচ্ছা, এই তুঁততলায় যদি আর খানিকটা বসি? না, তা হলে কেউটেপাড়ায় খেয়াঘাটে পৌঁছতে পারবো না। আবার জ্বর আসবে নাকি? শীত করচে আবার।

এক দাগ ওষুধ পকেট থেকে বের করে নাক টিপে খেয়ে নিলাম। বিকট তেতো কুইনিন্‌ মিক্‌চার। মা সুপুরি কেটে দেবে বাড়ীতে, তখন শুধু মুখে আর ওষুধ খেতে হবে না। চিল্‌তেমারি ছাড়লাম প্রাণের দায়ে জোর হেঁটে। শ্মশান-রাস্তার বাঁ-দিকে তেলাকুচো আর সোয়াদি গাছের নিবিড় ঝোপে অন্ধকার হয়ে আসচে। আড়চোখে একবার চেয়ে দেখে সন্তর্পণে রাস্তা পার হয়ে যাচ্চি।

কে যেন বলে উঠলো, পারবিনে তুই মায়ের কাছে যেতে। আমরা তোকে যেতে দেবো না। তোকে এই শ্মশানেই রাখবো।

দূর, ওসব মনের ভুল। রাম রাম, রাম রাম! এখনো অন্ধকার হয় নি। অন্ধকার না হোলে ওসব বেরুতে পারে না। রাম-নামে ভূত পালায়।

সত্যি, আর কিন্তু হাঁটতে পারচিনে। কেউটেপাড়া এখনো কত দূর! ওই দূরে বাঁশবন দেখা যাচ্চে কেউটেপাড়া গ্রামের। এখনো অনেক দূর। এই বড় মাঠটা পার হতে হবে, জনপ্রাণী নেই! সেই সন্দের সময় মাঠে! কেউ দেখবার নেই!

কেন গোপাল আমায় তাড়িয়ে দিলে বোর্ডিং থেকে? আমার ভয়ানক জ্বর এসেচে। আবার জ্বর এসেচে। কেউটেপাড়া কতদূর? চোখে যেন সর্ষের ক্ষেত দেখচি চারদিকে! পুরুত ঠাকুরের স্ত্রী রাগ করে বলচেন—মাগো, ছেলেটার শুধু জ্বর আর জ্বর! পরের আপদ কে দেখাশুনো করে? আজই বিদেয় করে দাও।

ননী মাস্টার বলচে—ওর পা ফুলেচে, ও বাঁচবে না। ও এবার যাবে।

ডানদিকে একটা বড় আমগাছ রাস্তার ধারে। ঐখানে একটু শুয়ে জিরিয়ে নেবো? আর এক দাগ ওষুধ খাবো? আর হাঁটতে পারচিনে। ভীষণ জ্বর এসেচে।

হঠাৎ আমার মনে হোল এই জামতলাতেই মা আঁচল বিছিয়ে বসে আছেন! আমি আসবো বলেই কখন থেকে বসে আছেন। মা এগিয়ে এসেচেন আমায় নিতে।

আমি টলতে টলতে মার কোলে শুয়ে পড়ি। মাথায় একটা কিসের চোট লাগলো। তারপর আমার আর জ্ঞান নেই। অন্ধকার নামলো মাঠে।

পড়ে যাওয়া

কালবৈশাখীর সময়টা। আমাদের ছেলেবেলার কথা।

বিধু, সিধু, নিধু, তিনু, বাদল এবং আরও অনেকে দুপুরের বিকট গরমের পর নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছি। বেলা বেশি নেই।

বিধু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে বড়। সে হঠাৎ কানখাড়া করে বললে—ঐ শোন—

আমরা কানখাড়া করে শুনবার চেষ্টা করলাম। কিছু শুনতে বা বুঝতে না পেরে বললাম—কি রে?

বিধু আমাদের কথার উত্তর দিলে না। তখনো কানখাড়া করে রয়েছে।

হঠাৎ আবার সে বলে উঠলো—ঐ—ঐ শোন—

আমরাও এবার শুনতে পেয়েছি—দূর পশ্চিম-আকাশে ক্ষীণ গুড়-গুড় মেঘের আওয়াজ।

নিধু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—ও কিছু না—

বিধু ধমক দিয়ে বলে উঠলো—কিছু না মানে? তুই সব বুঝিস কিনা? বোশেখ মাসে

পশ্চিম দিকে ওরকম মেঘ ডাকার মানে তুই কিছু জানিস? ঝড় উঠবে। এখন জলে নামবো না। কালবৈশাখী।

আমরা সকলে ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি ও কি বলছে। কালবোশেখীর ঝড় মানেই আম কুড়নো! বাঁড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আম এ অঞ্চলে বিখ্যাত। মিষ্টি কি! এই সময়ে পাকে। ঝড় উঠলে তার তলায় ভিড়ও তেমনি। যে আগে গিয়ে পেঁছিতে পারে, তারই জয়।

সবাই বললাম—তবে থাক।

কিন্তু তখনো রোদ গাছপালার মাথায় দিব্যি রয়েছে। আমাদের অনেকের মনের সন্দেহ এখনো দূর হয় নি। ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণ তো কিছু দেখা যাচ্ছে না; তবে বহু দূরাগত ক্ষীণ মেঘের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওরই ক্ষীণ সূত্র ধরে বোকার মত চাঁপাতলীর তলায় যাওয়া কি ঠিক হবে?

বিধু আমাদের সকল সংশয় দূর করে দিলে। যেমন সে চিরকাল আমাদের সকল সংশয় দূর করে এসেছে। সে জানিয়ে দিলে যে, সে নিজে এখুনি চাঁপাতলীর আমতলায় যাচ্ছে, যার ইচ্ছে হবে সে ওর সঙ্গে যেতে পারে।

এর পর আর আমাদের সন্দেহ রইল না। আমরা সবাই ওর সঙ্গে চললাম।

অল্পক্ষণ পরেই প্রমাণ হোল ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ। ভীষণ ঝড় উঠলো, কালো মেঘের রাশি উড়ে আসতে লাগলো পশ্চিম থেকে। বড় বড় গাছের মাথা ঝড়ের বেগে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগলো, ধুলোতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল, একটু পরেই ঠান্ডা হাওয়া বইল, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে পড়তে চড় চড় করে ভীষণ বাদলের বর্ষা নামলো।

বড় বড় আমবাগানের 'তলাগুলি ততক্ষণে ছেলেমেয়েতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে! আম ঝরছে শিলাবৃষ্টির মত; প্রত্যেক ছেলের হাতে এক-এক বোঝা আম। আমরাও যথেষ্ট আম কুড়ুলাম, আমের ভারে নুয়ে পড়লাম এক একজন। ভিজতে ভিজতে কেউ অন্য তলায় চলে গেল, কেউ বাড়ী চলে গেল আমের বোঝা নামিয়ে রেখে আসতে। আমি আর বাদল সন্ধ্যের অন্ধকারে নদীর ধারের পথ দিয়ে বাড়ী ফিরছি। পথে কেউ কোথাও নেই, ছোট বড় ডালপালা পড়ে পথ ঢেকে গিয়েছে; পাকা নোনা সুদ্ধ নোনাগাছের ডাল কোথা থেকে উড়ে এসে পড়েছে, কাঁটাওয়ালা সাঁইবাবলার ডালে পথ ভর্তি, কাঁটা ফুটবার ভয়ে আমরা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ চলছি আধ-অন্ধকারের মধ্যে।

এমন সময় বাদল কি একটা পায়ে বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আমায় বললে—দ্যাখ তো রে জিনিসটা কি?

আমি হাতে তুলে দেখলাম একটা ছোট টিনের বাক্স, চাবি বন্ধ। এ ধরনের টিনের বাক্সকে পাড়াগাঁ অঞ্চলে বলে, 'ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স'। টাকাকড়ি রাখে পাড়াগাঁয়ে। এ আমরা জানি।

বাদল হঠাৎ বড় উত্তেজিত হয়ে পড়লো। বললে—দেখি জিনিসটা?

—দ্যাখ তো, চিনিস?

—চিনি, 'ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স'।

—টাকাকড়ি থাকে।

—তাও জানি।

—এখন কি করবি?

—সোনার গহনাও থাকতে পারে। ভারী দেখেছিস কেমন?

—তা তো থাকেই। টাকা গহনা আছেই এতে।

'টিনের ক্যাশ বাক্স' হাতে আমরা দু'জনে সেই অন্ধকারে তেঁতুলতলায় বসে পড়লাম। দু'জনে এখন কি করা যায় তাই ঠিক করতে হবে এখানে বসে। আম যে প্রিয় বস্তু, এত কষ্ট করে জল ঝড় অগ্রাহ্য করে যা কুড়িয়ে এনেছি, তাও একপাশে অনাদৃত অবস্থায় পড়েই রইল থলেতে বা দড়ির বোনা গেঁজেতে।

বাদল বললে—কেউ জানে না যে আমরা পেয়েছি—

—তা তো বটেই। কে জানবে আর।

—এখন কি করা যায় বল।

—বাক্স তো তালা বন্ধ—

—এখুনি ইট দিয়ে ভাঙ্গি যদি বলিস তো—ওঃ, না জানি কত কি আছে রে এর মধ্যে। তুই আর আমি দুজনে নেবো, আর কেউ না। খুব সন্দেশ খাবো।

ঝড়ের ঝাপটা আবার এল। আমরা তেঁতুলগাছের গুঁড়িটার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তেঁতুলগাছে ভূত আছে সবাই জানে। কিন্তু ভূতের ভয় আমাদের মন থেকে চলে গিয়েছে। অন্যদিকে আমাদের দুজনের সাধ্য ছিল না এ সময় এ গাছতলায় বসে থাকি।

বাদল বললে—শীতে কেঁপে মরছি। কি করা যাবে বল। বাড়ী কিন্তু নিয়ে যাওয়া হবে না। তাহোলে সবাইকে ভাগ দিতে হবে, সবাই জেনে যাবে। কি করবি?

—আমার মাথায় কিছু আসছে না রে।

—ভাঙ্গি তালা। ইট নিয়ে আসি, তুই থাক এখানে।

—না। তালা ভাঙ্গিসনে। ভাঙ্গলেই তো গেল। অন্যায় কাজ হয় তালা ভাঙ্গলে, ভেবে দ্যাখ। কোন গরীব লোকের হয়তো। আজ তার কি কষ্ট হচ্ছে, রাতে ঘুম হচ্ছে না। তাকে ফিরিয়ে দেবো বাক্সটা।

বাদল ভেবে বললে—ফেরত দিবি?

—দেবো ভাবছি।

—কি করে জানবি কার বাক্স?

—চল সে মতলব বার করতে হবে। অধর্ম করা হবে না।

এক মুহূর্তে দুজনের মনই বদলে গেল। দুজনেই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম। বাক্স ফেরত দেওয়ার কথা মনে আসতেই আমাদের অদ্ভুত পরিবর্তন হোল। বাক্স নিয়ে জল ঝড়ে ভিজে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বাড়ী চলে এলাম। বাদলদের বাড়ীর বিচুলিগাদায় লুকিয়ে রাখা হোল বাক্সটা।

তারপর আমাদের দলের এক গুপ্ত মিটিং বসলো বাদলদের ভাঙ্গা নাটমন্দিরের কোণে। বর্ষার দিন—আকাশ মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম। সেই কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টির পরই বাদলা নেমে গিয়েছে। একটা চাঁপাগাছের ফোটা চাঁপাফুল থেকে বর্ষার হাওয়ার সঙ্গে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। ব্যাঙ ডাকছে নরহরি বোষ্টমের ডোবায়।

আমাদের দলের সর্দার বিধুর নির্দেশমত এ মিটিং বসেছিল। বাক্স ফেরত দিতেই হবে—এ আমাদের প্রথম ও শেষ প্রস্তাব। মিটিং-এ সে প্রস্তাব পেশ করার আগেই মনে মনে আমরা সবাই সেটি মেনেই নিয়েছিলাম। বিধুকে জিজ্ঞেস করা হোল বাক্স ফেরত দেওয়া সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত, অতএব এখন উপায় ঠাওরাতে হবে বাক্সের মালিককে খুঁজে বার করবার। কারো মাথায় কিছু আসে না। এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হোল। যে কেউ এসে বলতে পারে বাক্স আমার। কি করে আমরা প্রকৃত মালিককে খুঁজে বার করবো? মস্ত বড় কথা। কোনো মীমাংসাই হয় না।

অবশেষে বিধু ভেবে ভেবে বললে—মতলব বার করিছি। ঘুড়ির মাপে কাগজ কেটে নিয়ে আয় দিকি।

বলেছি—বিধুর হুকুম অমান্য করার সাধ্য আমাদের নেই। দু-তিনখানা কাগজ ঐ মাপে কেটে ওর সামনে হাজির করা হোল।

বিধু বললে—লেখ—বাদল লিখুক। ওর হাতের লেখা ভালো।

বাদল বলল—কি লিখবো বলো—

—লেখ বড় বড় করে। বড় হাতের লেখার মত। বুঝলি? আমি বলে দিচ্ছি—

—বল—

—আমরা এক বাক্স কুড়িয়ে পেয়েছি। যার বাক্স তিনি রায়বাড়ীতে খোঁজ করুন। ইতি —বিধু সিধু নিধু তিনু।

আমি আর বাদল আপত্তি করে বললাম—বারে, আমরা কুড়িয়ে পেলাম, আর আমাদের নাম থাকবে না বুঝি? আমাদের ভালো নাম লেখো।

বিধু বললে—লিখে দাও। ভালোই তো। ভালো নাম সবারই লেখো।

তিনখানা কাগজ লিখে নদীর ধারের রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন গাছে বেলের আঠা দিয়ে মেরে দেওয়া হোল।

দু'তিন দিন কেটে গেল।

কেউ এল না।

তিন দিন পরে একজন কালোমত রোগা লোক আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি তখন সেখানে বসে পড়ছি। বললাম—কি চাও?

—বাবু, ইঁদিরভীষণ কার নাম?

—আমার নাম। কেন? কি চাই?

—একটা বাক্স আপনারা কুড়িয়ে পেয়েছেন?

আমার নামের বিকৃত উচ্চারণ করাতে আমি চটে গিয়েছি তখন। বিরক্তিভাবে বললাম—কি রকম বাক্স?

—কাঠের বাক্স।

—না। যাও।

—বাবু, কাঠের নয়, টিনের বাক্স।

—কি রংয়ের টিন?

—কালো।

—না, যাও—

—বাবু দাঁড়ান, বলছি। মোর ঠিক মনে হচ্ছে না। এই রাঙা মত—

—না, তুমি যাও।

লোকটা অপ্রতিভভাবে চলে গেল। বিধুকে খবরটা দিতে সে বললে—ওর নয় রে। লোভে পড়ে এসেছে। ওর মত কত লোক আসবে!

আবার তিন চার দিন কেটে গেল।

বিধুর কাছে একজন লোক এল তারপরে। তারও বর্ণনা মিললো না; বিধু তাকে বিদায় দিলে পত্রপাঠ। যাবার সময় সে নাকি শাসিয়ে গেল, চৌকিদারকে বলবে, দেখে নেবে আমাদের ইত্যাদি! বিধু তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—যাও যাও, যা পারো করো গিয়ে। বাক্স আমরা কুড়িয়ে পাইনি। যাও।

আর কোনো লোক আসে না।

বর্ষা পড়ে গেল ভীষণ।

সেবার আমাদের নদীতে এল বন্যা।

বড় বড় গাছ ভেসে যেতে দেখা গেল নদীর স্রোতে। দু'একটা গরুও আমরা দেখলাম ভেসে যেতে। অম্বরপুর চরের কাপালীরা নিরাশ্রয় হয়ে গেল। নদীর চরে ওদের ছোট ছোট ঘরবাড়ী সেবারেও দেখে এসেছি। কি চমৎকার পটলের আবাদ, কুমড়োর ক্ষেত, লাউ কুমড়োর মাচা ওদের চরে! দু'পয়সা আয়ও পেতো তরকারি বেচে। কোথায় রইলো তাদের পটল কুমড়োর আবাদ কোথায় গেল তাদের বাড়ী ঘর। আমাদের ঘাটের সামনে দিয়ে কত খড়ের চালাঘর ভেসে যেতে দেখলাম। সবাই বলতে লাগলো অম্বরপুর চরের কাপালীরা সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে।

একদিন বিকেলে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা লোক এল। বাবা বসে হাত-বাক্স সামনে নিয়ে জমাজমির হিসেব দেখছেন। গ্রামের ভাদুই কুমোর কুয়ো কাটানোর মজুরি চাইতে এসেছে। আরও দু'একজন প্রজাপত্তর এসেছে খাজনা দিতে। আমরা দু'ভাই বাবার কড়া শাসনে বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছি। এমন সময় একটা লোক এসে বললে—দণ্ডবৎ হই, ঠাকুরমশায়।

বাবা বললেন—এসো। কল্যাণ হোক। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—আজ্ঞে অম্বরপুর থেকে। আমরা কাপালী।

—বোসো। কি মনে করে? তামাক খাও। সাজো।

লোকটা তামাক সেজে খেতে লাগলো। সে এসেছে এ গাঁয়ে চাকরির খোঁজে। বন্যায় নিরাশ্রয় হয়ে নির্বিষখোলার গোয়ালাদের চালাঘরে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছে। এই বর্ষায় না আছে কাপড়, না আছে ভাত। দু'আড়ি ধান ধার দিয়েছিল গোয়ালারা দয়া করে, সেও এবার ফুরিয়ে এল। চাকরি না করলে স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে মরবে।

বাবা বললেন—আজ এখানে দুটি ডাল-ভাত খেও।

লোকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—তা খাবো। খাচ্ছিই তো আপনাদের। দুরবস্থা যখন শুরু হয় ঠাকুরমশাই, এই গত জষ্টি মাসে নির্বিষখোলার হাট থেকে পটল বেচে ফিরচি; ছোট মেয়েটার বিয়ে দেবো বলে গহনা গড়িয়ে আনছিলাম। প্রায় আড়াই শো টাকার গহনা আর পটল-বেচা নগদ টাকা পঞ্চাশটি—একটা টিনের বাক্সের ভেতর ছিল। সেটা যে হাটের থেকে ফিরবার পথে গরুর গাড়ী থেকে কোথায় পড়ে গেল, তার আর খোঁজই হোল না। সেই হোল শুরু—আর তারপর এল এই বন্যে—

বাবা বললেন—বল কি? অতগুলো টাকা গহনা হারালে?

—অদেষ্ট, একেই বলে বাবু অদেষ্ট। আজ সেগুলো হাতে থাকলে—

আমি কান খাড়া করে শুনেছিলাম। বলে উঠলাম—কি রংয়ের বাক্স?

—সবুজ টিনের।

বাবা আমাদের বাক্সের ব্যাপার কিছুই জানেন না। আমায় ধমক দিলেন—তুমি পড়ো না, তোমার সে খোঁজে কি দরকার? কিন্তু আমি ততক্ষণে বইপত্তর ফেলে উঠে পড়েছি। একেবারে এক-ছুটে বিধুর বাড়ী গিয়ে হাজির। বিধু আমার কথা শুনে বললে—দাঁড়া, সিধু আর তিনুকেও নিয়ে আসি। ওরা সাক্ষী থাকবে কি না?

বিধুর খুব বুদ্ধি আমাদের মধ্যে। ও বড় হোলে উকিল হবে, সবাই বলতো।

আধঘন্টার মধ্যে আমাদের চন্ডীমন্ডপের সামনে বেশ একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। বাক্স ফেরত পেয়ে সে লোকটা যেন কেমন হকচকিয়ে গেল। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। কেবল আমাদের মুখের দিকে চায় আর বলে—ঠাকুরমশাই, আপনারা মানুষ না দেবতা? গরীবের ওপর এত দয়া আপনাদের?

বিধু অত সহজে ভুলবার পাত্র নয়। সে বললে—দেখে নাও মাল সব ঠিক আছে কিনা আর এই কাকাবাবুর সামনে আমাদের একটা রসিদ লিখে দাও, বুঝলে? কাকাবাবু, আপনি একটু কাগজ দিন না ওকে—লিখতে জানো তো?

না, ও উকীলই হবে!

আমার বাবা এমন অবাক হয়ে গেলেন ব্যাপার দেখে যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না।

আমার ছাত্র

মানুষের প্রতি মানুষের এই যে হিংসা, এই যে উলঙ্গ বর্বরতা আচরিত হচ্চে সভ্যতার নামে, শত বৎসরের শিক্ষা সংযম এক মুহূর্তে যাতে করে তৃণের মত উড়ে গেল, উদগ্র লোভ, হিংসা ও লালসার এই যে নগ্ন মূর্তি দেখা গেল চোখে,—তাতে দমে গেলে চলবে না। মানুষ আছে এখনও, মানবতা আছে, মনুষ্য সমাজ থেকে লজ্জায় মুখ ঢেকে বিদায় নেবার সময় ভগবান এদেরই দিকে ফিরে ক্ষীণ আশ্বাসের বাণী শুনতে পান, শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ান।

আমাদের গণেশদাদার কথা বলবার যোগ্য বলে এতদিন ভাবতামই না, কিন্তু আজ দেখচি গণেশদাদার ছবি আমার মনের পটে মস্ত বড় হয়ে ফুটে উঠেচে। এর আর একটা কারণ যে গণেশদাদা আমার ছাত্র।

গণেশদাদার নাম গণশা মুচি। আমাদের গ্রামের মুচিপাড়ার ছোট্ট খড়ের চারচালা ঘরে দুটি গরু ও চার-পাঁচটি বাছুর এবং স্ত্রী পুত্র নিয়ে, উঠানে লাউমাচা পুঁইমাচা বানিয়ে,

পুনুকে নটে শাক বুনে, মেটে আলু ও বুনো ওল তুলে হাটে বিক্রি করে সংসার চালাতো।

যখন পাঠশালায় পড়ি, তখন হরিশ জ্যাঠামশায়ের বাড়ী গণেশ মুচি কৃষাণের কাজ করে। আমরা গণেশদাদা বলে ডাকতাম, অন্যালোকে বলতো গণশা মুচি। মিশ্‌কালো, দোহারা গড়ন, মুখে একপ্রকার শান্ত, দীন ভাব, লাজুক-নম্র চোখ দুটি, সর্বদাই যেন অপ্রতিভ, যেন কি একটা মহা অপরাধ করে ফেলেচে সে।

হরিশ জ্যাঠামশায় কড়া প্রকৃতির গ্রাম্য গাঁতিদার। গণেশদাদাকে ডেকে বলতেন—এই গণশা—বাব্‌লাতলার জমিতে দোয়ার দেওয়া হয়েচে?

গণেশ অমনি হাত কচলাতে কচলাতে বলতো—আজ্ঞে না, বাবাঠাকুর। কাল তো মোটে লাঙল দেলাম—

—হারামজাদা, এতদিন ঘুমুচ্ছিলে নাকে তেল দিয়ে? কবে বলিচি চষ্‌তে ও ভুঁই?

—জমিতি লাঙল না লাগলি কি ক-অ-রবো বাবাঠাকুর। আজ সাঁজবাতির মদ্যি দোয়ার দিয়ে দেবানি—

—না দিলে জুতিয়ে তোমার আজ হাড় খুলে নোব মনে থাকে যেন।

গদেশদাদা আমরা যেখানে খেলা করচি সেখানে এসে হেসে বলতো—বাবাঠাকুর চটে গিয়েচেন।

আমি বলতাম—ও গণেশদাদা, ইংরিজি জানো?

—ইন্‌জিরি? কনে থেকে জানবো? মুই কি লেখাপড়া জানি?

—শিখবে?

—শিখিয়ে দাও দাদাঠাকুর তো শিখি—

—শেখো—ওভার মানে ওপর।

—কি?

—ওভার মানে ওপর, উড্ মানে কাঠ, কাউ মানে গরু—

গণেশদাদা মুখস্থ করতে লাগলো। ইউ. পি পাঠশালায় কুঞ্জ মাস্টারের শেখানো যত বিদ্যা আমার মাথায় ভিড় করে তাদের উগ্রতায় আমাকে ব্যতিব্যস্ত করছিল, তা সবগুলো গণেশদাদার ঘাড়ে না চাপাতে পারলে যেন আমার নিস্তার নেই। সেই থেকে গণেশদাদার ইংরিজি শিক্ষার ভার আমি স্বহস্তে গ্রহণ করলাম। গোটা ওয়ার্ডবুকখানা গণেশদাদাকে কণ্ঠস্থ করাবার সে কী দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা আমার। মুখে মুখে শেখানো ছাড়া অবিশ্যি অন্য উপায় ছিল না, গণেশদাদার ভাষাতেই বলি, 'মা সরস্বতীর ঘরের ঝন্‌কাট কখনো মাড়াইনি যে।'

গণেশদাদা কিন্তু শিখলো অনেক কথা। শ্রুতিস্মৃতির প্রাচীন উপায়ে প্রায় ডজনখানেক ইংরিজি শব্দের ঐশ্বর্যে সে ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠলো। আমিও শিষ্যগর্বে গর্বিত হয়ে উঠলাম রীতিমত।

আমার সে-গর্ব মাঝে মাঝে বড় অশোভন ভাবে আত্মপ্রকাশ করতো, গদেশদাদার লাজুকতা ও অপ্রতিভ ভাবকে আরও বাড়িয়ে। যেমন একটা উদাহরণ দিই। হরিশ জ্যাঠা-মশায়ের বাড়ী তাঁর বড় ছেলে ফটুদা'কে বিয়ের জন্যে কন্যাপক্ষ দেখতে এসেচে—দুতিনটি ভদ্রলোক, শ্যামনগরের কাছে কোথায়। আমরা ছেলেরা বলাবলি করলাম শ্যামনগর অর্থাৎ শহরের দিকে যতই বাড়ী হোক বাছাধনদের, আমাদের অজপাড়াগাঁ বলে যে নাক সিঁটকোবেন তা হোতে দিচ্চনে—দেখিয়ে দেবো এ গ্রামের একজন মুচি কৃষাণও ইংরিজি কেমন জানে। সেই ভদ্রলোকের দল যখন হরিশ জ্যাঠামশায়ের চন্ডীমন্ডপে বসে আছে, তখন আমি গদেশদাদাকে ডেকে বললাম—এই দেখুন, এদের মাইন্দার কেমন ইংরিজি জানে—

তাদের মধ্যে একজন কৌতূহলের সুরে বললে—তাই নাকি। দেখি—দেখি—

আমি অমনি বলি—গণেশদাদা, ওভার মানে কি?

—গণেশ হাত ওপরে তুলে বললে—ওপোর।

—ওয়াটার?

—জল।

—স্কাই?

—আকাশ।

ইত্যাদি।

এক ডজন শব্দের ক্ষীণ পুঁজি শেষ হতেই আমি থেমে গেলাম। গণেশদাদার দিকে শহরের চালবাজ লোকদের সপ্রশংস দৃষ্টি পড়ুক—এই আমার ইচ্ছা। আমার উদ্দেশ্য সফল হোল; শহুরে বাবুরা ওর দিকে চেয়ে চেয়ে বললে—বাঃ, বাঃ, এ লোকটি তো বেশ। কি নাম তোমার? বেশ। এদিকে এসো—

ওরা চার আনা বকশিস করল তখুনি। অর্থকরী বিদ্যা বটে ইংরিজি।...

সেই থেকে গণেশদাদার কি উৎসাহ ইংরিজি শেখবার। সাতদিনের মধ্যে আর এক ডজন শব্দ কণ্ঠস্থ করে ফেললে।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। শীতকাল। বাড়ীতে রুটি হচ্চে, দুধ আর গুড় দিয়ে খাবো বলে মনে খুব ফুর্তি। এমন সময় পীতাম্বর রায় জ্যাঠামশায়ের বাড়ী হৈ চৈ শুনে সেদিকে গেলাম। গিয়ে দেখি তাঁর চণ্ডীমণ্ডপের সামনে লোকে লোকারণ্য। পীতাম্বর রায়, হরিশ জ্যাঠামশায়, নবীন চক্রবর্তী প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসে। পীতাম্বর রায় খুব চীৎকার করচেন ও হাত-পা নাড়চেন। উঠানের মাঝখানে গণেশদাদা মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রয়েচে। ব্যাপার শুনে বুঝলাম, পীতাম্বর রায়ের একটি গরু আজ দুদিন হারিয়ে গিয়েছিল, আজ সেটা গণেশদাদার বাড়ীর পিছনে মুচিপাড়ার বড় আমবাগানে (যার নাম এ গ্রামে গলায়-দড়ির বাগান) লতা দিয়ে বাঁধা ছিল এবং তার লেজ কে দা দিয়ে অনেকখানি কেটে দিয়েচে, ঝরঝর করে রক্ত পড়চে লেজ দিয়ে। এই অপরাধের সন্দেহ গিয়ে পড়েচে গণেশদাদার ওপর, কারণ প্রথমতঃ মুচিরা গরুর চামড়া বিক্রি করে, দ্বিতীয়তঃ গরু গণেশদাদার বাড়ীর পিছনে বাঁধা ছিল, তৃতীয়তঃ গণেশদাদা গরীব। সুতরাং গণেশদাদাই রাত্রে গরুটি কেটে চামড়া খুলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সেটাকে লুকিয়ে রেখেছিল তার বাড়ীর পিছনের আমবাগানে। দায়ের কোপও সে-ই মেরেচে।

পীতাম্বর রায়ের ও হরিশ জ্যাঠামশায়ের যুক্তির মধ্যে যে ফাঁক ছিল, তা কারো চোখে পড়লো না। গণেশদাদার বক্তব্য প্রথমতঃ সুসম্বন্ধ নয়, দ্বিতীয়তঃ ভয়ে তার বুদ্ধিশুদ্ধি (যার আতিশয্য তার কোনোদিনই নেই) লোপ পেয়েছিল, সুতরাং আত্মপক্ষ সমর্থনে সে পটুত্বের বিশেষ পরিচয় দিল না।

উঃ, সে কি মারটাই মারলেন পীতাম্বর জ্যাঠামশাই ওকে, পা থেকে চটি জুতো খুলে! কত কাল কেটে গিয়েচে, দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর, কিন্তু আজও আমি চোখের সামনে গণেশদাদার যন্ত্রণা ও লজ্জাকাতর মুখ দেখতে পাই। মার বটে একখানা। শুধু শোনা যায় পীতাম্বর রায়ের তর্জন-গর্জন এবং চটাং চটাং জুতোর শব্দ গণেশদাদার পিঠে। পিঠ ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো দরদর করে। তখনও পীতাম্বর জ্যাঠার থামবার চেহারা ছিল না, নীলু বাঁড়ুয্যের ছেলে মণিদাদা, জোয়ান ছোকরা, দৌড়ে গিয়ে পীতাম্বর রায়ের হাত ধরে টেনে এনে নিরস্ত করলে।

আহা, গণেশদাদা বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো। আমি জানতাম গণেশদাদা নির্দোষী। আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো গণেশদাদার কান্না দেখে। ইচ্ছে হোল পীতাম্বর জ্যাঠার কান ধরে কেউ এখুনি ঘুরপাক দেয় তো আমার মনের রাগ মেটে।

এ সব বাল্যকালের কথা।

সারা বাল্যকাল ধরে দেখেছি গণেশদাদা লোকের ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে দিনান্তে একথালা রাঙা আশচালের ভাত কায়ক্লেশে যোগাড় করচে। তাতেই তার কি খুশি!

—ও গণেশদাদা, আজ কি খেলে?

আমি হয়তো প্রশ্ন করি।

তখন গণেশদাদা আস্তে আস্তে বলবে, যেন কল্পনায় খাদ্যগুলো সে আবার পরম তৃপ্তির সঙ্গে আস্বাদ করছে—

—খ্যালাম? তা খ্যালাম মন্দ নয়। তোমার বড় বউদিদি রেঁধেলো অনেকগুলি। খ্যালাম ধরো (আঙুলের পর্বে হিসাব রেখে) ভাত, শুল্‌কোর (গ্রামের নাম) নাঙা ডাঁটা দিয়ে, কুমড়ো দিয়ে, পেঁজ দিয়ে ঝিঞের ঝাল (তরকারি হিসেবে অদ্ভুত শুধু নয়,

বিকট), বাগ্‌ন দিয়ে, পে'জ দিয়ে, কাঁচানংকা আর তে'তুল। তা বেশ খ্যালাম—কি বলো?

—বেশ খেয়েচ, আবার কি খাবে?

কোনোদিন জিজ্ঞাসিত না হয়েও একগাল হেসে বলতো—দাদাঠাকুর, আজ খ্‌ব খ্যালাম—

—কি গো গণেশদাদা?

—কি বল দিনি?

গণেশদাদা সকৌতুকে আমার দিকে তাকায়।

—তা কি জানি? তুমি বলো!

—আজ তোমার বউদিদি বড্ড করেল। উস্তের (উচ্ছে) শাক আর দয়াকলা দিয়ে একটা তরকারি আর পান্ত ভাত।

খাবারটা লোভনীয় বলে মনে না হলেও মৌখিক তারিফ না করে উপায় নেই গণেশ-দাদার কাছে।

খাওয়ার তো এই দশা—পরণে ময়লা ছে'ড়া কাপড় কিংবা গামছা ছাড়া তো গণেশদাদার ছবিই মনেই করতে পারিনে। অথচ...ব্রাহ্মণপাড়ার অর্ধেক কাজে গণেশকে না হোলে চলেই না। বেশির ভাগই ব্যাগার।

—ওরে গণশা, আজ উঠোনের কাঠগ্‌লো ঘরে তুলে দিয়ে আসিস তো?

—গণশা, গাছের নারকোলগ্‌লো পেড়ে দিতে হবে ওবেলা।

—গর্‌টো প'টে গিয়েচে রে, তুই দ্‌প্‌রবেলা একবার এসে গর্‌টো আজ এনে দিবি—ব্‌ঝলি?

—গণশা, আমার গাছের দ্‌কাঁদি কাঁচকলা হাট থেকে বিক্রি করে দিতে হবে বাবা—

শ্‌ধ্‌ মিষ্টিকথা—ব্যাস! ঐ পর্যন্ত! কখনো গণেশদাদা ম্‌খ ফ্‌টে একটা পয়সা মজ্‌রি এ সব ফাইফরমাশ খাটার জন্যে চাইতো না। বরং বলতো—বেরাহ্মণ দেবতা, ওনাদের পা ধোয়া জল খেলি স্বগ্‌গো। ওনাদের একট্‌ সেবা করবো তার আবার পয়সা!

কিন্তু শ্‌ধ্‌ ব্রাহ্মণের নয়, আমি যে-কোন জাতির সেবা করতে দেখেচি ওকে অম্লান-বদনে। জেলে-পাড়ার অথর্ব ব্‌ড়ী বিন্দের মাকে তার সঞ্চিত তে'তুলকাঠের গ্‌ড়ি কুড়্‌ল দিয়ে চ্যালা করে দিতে দেখেছি। কত ক্রিয়াহীন মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণপাড়ার চণ্ডীমণ্ডপগ্‌লি যখন অলস য্‌বক ও প্রৌঢ়দের পাশা দাবা ক্রীড়ার বিবিধ ধ্‌নিতে অথবা দিবানিদ্রাভিভ্‌ত ব্যক্তিদের নাসিকা-গর্জনে ম্‌খরিত, তখন গণেশদাদা কারো তে'তুলগাছে তে'তুল পেড়ে দিচ্চে, না হয় কারো কলাইয়ের গাছ বোঝাই গাড়ী চালিয়ে খামারে আনচে। ঘামে ও'র সারা দেহ ভিজে, মাথার চ্‌ল ধ্‌লিধ্‌সর, পেটে পেট লেগেচে, কারণ—এখনও খাওয়া হয়নি।

কখনো দেখিনি গণেশদাদা কারও সংগে ঝগড়া করচে কিংবা চড়াস্‌রে কথা বলচে।

আমার বাল্যকাল কেটে গেল। কলেজে পড়ে দ্‌টো পাশ করে গ্রামে ফিরে যেতে পথেই গণেশদাদার সংগে দেখা বেলতলার মাঠে। গণেশদাদা গর্‌ চরাচ্চে মাঠের মধ্যে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে। পাশ দিয়েই আমার পথ। গণেশদাদাকে ডেকে বললাম—ও গণেশদাদা, চিনতে পারো?

—তা চিনতে পারবো না, দ্যাখোদিনি দা'ঠাকুর। কোলে পিঠি করে মান্‌ষ করলাম আর চিনতে পারবো না? কত বচ্ছর দেখিনি। কোথায় ছিলে এ্যাদ্দিন আমাদের ভ্‌লে?

—মামার বাড়ী। তুমি তো ব্‌ড়ো হয়ে গিয়েচ দেখচি। মাথার চ্‌ল পেকেচে, হ্যাঁ গণেশদাদা?

—ওমা, তোমাদের কোলে করে মান্‌ষ করলাম, তোমরাই কত বড় হয়ে গেলে—ম্‌ই আর ব্‌ড়ো হবো না? বয়েস কি কম হোল?

—ভাল আছ, হ্যাঁ গণেশদাদা?

—হ্যাঁ ভালো। তোমরা সব ভালো?

গণেশদাকে এই বয়সে গর্‌ চরাতে দেখে আশ্চর্য হলাম। কারণ পল্লীগ্রামে গর্‌ চরানো হোল বিষয়কর্মের প্রথম সোপান। সাধারণতঃ বালকেরা এ কাজ করে থাকে—তারপর

ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে উঠতে শুরু করে। মোটামুটি সেটা এই রকম ঃ—

১। গরু চরানো (১৭ বছর পর্যন্ত)

২। জন খাটা (১৬।১৭ থেকে ত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত)

৩। অপরের কৃষাণগিরি করা (২৫।৩০ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত)

৪। নিজের জমিতে চাষ-আবাদ করা (এ সৌভাগ্য সকলের ঘটে না)

৫। বাড়ীতে ধানের গোলা বাঁধা (যেমন অনেকেই ব্যবসা করে কিন্তু ধনী হতে পারে না, তেমনি চাষ অনেকেই করে কিন্তু গোলা বাঁধতে পারে না। এ সৌভাগ্য ক্বচিৎ ঘটে চাষীর ভাগ্যে)।

৬। কিন্তু এ লিখচি কেন, এ ভাগ্য সকলের হয় না—ব্যবসাদার মাত্রেই কি টাটা-বিড়লা হয়? তবুও এটার উল্লেখ করতেই হবে—প্রত্যেক চাষীর স্বপ্ন, প্রত্যেক রাখালের অলস-মধ্যাহ্নের স্বপ্ন, প্রত্যেক দিন-মজুরের বর্ষা-দিনে এক হাঁটু জল-কাদায় ধান বপন করতে করতে ক্লান্তি অপনোদনের স্বপ্ন—এটি উল্লেখ না করলে চলবে না। সেটি হোল নিজে মহাজন হয়ে নিজের গোলা থেকে অপরকে ধান কর্জ দেওয়া।

এই উচ্চতম ষষ্ঠ স্তর প্রাপ্তি বহু পুণ্যের ফলে ঘটে!

যাক্, কিন্তু গণেশদাদা এই বয়েসে বিষয়কর্মের প্রথম সোপানটিতে কেন, এ প্রশ্ন আমার মনে না উঠে পারলো না। পাড়াগাঁয়ে এই বয়সেও যারা গরু চরায়, বুঝতে হবে তারা ভাগ্যলক্ষ্মী দ্বারা নিতান্তই অবহেলিত, তারা নিতান্তই অভাজন। এ প্রশ্ন গণেশ-দাদাকে করলাম না, যদি ও মনে কষ্ট পায়। আমার কিন্তু মনে বড় কষ্ট হোল পক্বকেশ গণেশদাদাকে পাঁচন হাতে তালপাতার ছাতি মাথায় গরু চরাতে দেখে।

গণেশদাদা বললে—বোসো, বোসো দাদাঠাকুর। তামুক খাবা?

—ও শিখিনি।

—এতটুকু দেখিচি তোমারে। কত বড়ডা হয়ে গিয়েচ। হ্যাদে, জিগ্যেস করো দিনি সেই ইন্‌জিরি? মনে আছে কিনা দেখি।

ওঃ, অনেক দিনের কথা—উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালার সেই দিনগুলি কতকাল আগে অতীতে মিলিয়ে গিয়েচে। আজ পনেরো বছর আগের ব্যাপার সেই গণেশদাদাকে ইংরিজি শেখানো। কি কি শিখিয়েছিলাম তাই কি ছাই আমার মনে আছে?

গণেশদাদা কিন্তু হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে আছে আমার দিকে। বললাম—তুমি বলতে আরম্ভ করো?

—ওভার মানে ওপর—

—বেশ, বেশ—তারপর?

—তুমি জিগোও দাদা,—আমি বলি—

—জল?

—ওয়াটার।

—আকাশ?

—স্কাই।

—দুধ?

—মিল্ক।

গণেশদাদার মুখে বিজয়ীর গর্বিত হাসি। তুমি তো ঠকাতে পারলে না দাদাঠাকুর এতদিন পরেও, ভাবটা এই রকম। আমি ভাবচি, এ-ইংরিজি শিখে তালপাতার ছাতি মাথায় গোচারণরত গণেশদাদার কি উপকার হবে?

গণেশদাদা বললে—বলো বলো—

—পিঁপড়ে?

—পিঁপড়ে! ওডা তো শিখোও নি দাদাঠাকুর। ও তুমি শিখোও নি। ঝা শিখিইসে. তা মুই এ্যাকটাও ভুলিনি। তা ওডা মোরে শিখিয়ে দ্যাও, পিঁপড়ের ইন্‌জিরি কি?

—এ্যান্ট।

—এ্যান্ট? এ্যান্ট-এ্যান্ট-এ্যান্ট-এ্যান্ট—

জিউলি গাছটার তলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য গ্রাজুয়েট আমি আমার পক্ককেশ গোচারণরত ছাত্রকে ইংরাজি ভাষার পাঠ দিতে দিতে বড্ড দেরি করে ফেলি, বেলা যায় দেখে গণেশই বললে—তুমি এস দাদাঠাকুর। মুই গরু কড়ারে জল দেখিয়ে আনি পোড়ার খালে —আজ অনেক কথা শেখলানি—এ সব দেশ মুরুক্ষুর দেশ, ল্যাখাপড়ার কথা কেউ বলে না —মোর মত ইন্‌জিরি ক'জন জানে, ওই তো সব রাখাল ছোঁড়ারা গরু চরাচ্চে, কই ডেকে শুধোও না জলের ইন্‌জিরি, ধানের ইন্‌জিরি—সব মুরুক্ষু দাদাঠাকুর—সব মুরুক্ষু—

—পোড়ার খালে মাছ পড়চে আজকাল গণেশদাদা?

—ওই হচ্চে দুচারটে—বান, ফলুই, তেচোকো—চলো না একদিন ধত্তি যাই—

—যাবো। দু-একদিন পরে।

—ঝে ক'ডা দিন গাঁয়ে থাকবা মোরে শেখাবা কিন্তু—

—নিশ্চয়ই। এবার তোমাকে চার ডজন ইংরিজি কথা না শিখিয়ে আর—

—তোমাদের বাপ মায়ের আশিব্বাদে ঝা মুই শিখিচি, তাতেই মোর সামনে কেউ দাঁড়াতি পারে? ওই তো হিবু ঘরামির ছেলে ওসমান গরু চরাচ্চে—ডেকে শুধোও না—

গণেশদাদা দূরে গোচারণরত একটি তেরো-চোদ্দ বছরের বালকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

গ্রামে এসে গণেশদাদার কথা লোককে জিজ্ঞেস করলাম। ওর অবস্থা এত খারাপ হোল কেন? কারণ শুনলাম ওর ওই দুই ছেলেই মারা গিয়েচে। বুড়ো হয়েচে বলে লোকের বাড়ীতে কৃষাণের কাজে কেউ রাখতে চায় না। জমিদারের দেনার দায়ে সামান্য একটু ভিটেসংলগ্ন জমি ছিল, তাও বিক্রী হয়ে গিয়েচে। নিজের লাঙল নেই বলে ভাগে চাষ করবার উপায় নেই—যার লাঙল নেই, তাকে বর্গা দেবে কে জমি? সুতরাং এ বয়েসে বাধ্য হয়েই ওকে গরু চরাতে হচ্চে।

গণেশদাদার বাড়ী গেলাম একদিন। ও বসে বসে কঞ্চি চাঁচচে—ঝুড়ি বুনবে। ঝুড়ি তৈরি করে হাটে বেচলে পয়সা হয়, কিন্তু ও ঝুড়ি বুনচে পরের ব্যাগার। এ আমি জানি। এর একটা মস্ত কারণ, ওকে পরের বাঁশঝাড় থেকে কঞ্চি কেটে আনতে হয়—অপরে তার দামস্বরূপ নেয় একটা ঝুড়ি, না তো একটা গাছ-ঘেরা কঞ্চির ঠোঙা। গণেশদাদার ঘরে কঞ্চির ঝাঁপের-বেড়া, চালে খড় নেই—একটা চালকুমড়ো লতা উঠিয়ে দিয়েচে চালে. চাল-কুমড়োর ফুল আর ফল যথেষ্ট হয়েচে, লতাগুলো চাল ছাড়িয়ে এদিক ওদিক ঝুলে পড়ে বাতাসে দুলচে, একটা ধাড়ি ছাগল ঘরের ছেঁচতলায় পরম তৃপ্তিতে কাঁঠাল পাতা চর্বন করচে, ওর বৌ গৃহকর্ম করচে—বেশ লাগল আমার। ঘরে পেতল-কাঁসার সংস্পর্শ নেই—মাটির কলসী, মাটির হাঁড়ি সরা, মাটির ডাবর, মাটির ভাঁড়ে জল রাখা আছে। ভাত খায় কলার পাতায় নয়তো চাম্‌টার বিলের পদ্মপাতায়। আমাকে বললে—চালকুমড়ো একটা নিয়ে যাও দাদাঠাকুর।

—ও আমি কি করবো?

—নিয়ে যাও, বেশ সুক্তুনি করো তোমরা। মোরা সুক্তুনি রাঁধতে জানিনে। বামুন-বাড়ীতে কত সুক্তুনি খেইচি আগে আগে। পস্কার লাগে—

—কেন, বউদিদি সুক্তুনি করতে জানে না?

—অত তেল মশলা কনে পাবো মোরা? দাদাঠাকুরের য্যামন কথা। ও সব তরকারি কি মোরা খেতি জানি, না পারি?

ওদের ঘরের দাওয়ায় একজন খুনখুনে বুড়ি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে শুয়ে আছে অনেক-ক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিলাম। গণেশদাদাকে জিজ্ঞেস করাতে ও বললে—আরে ও সেই রতনের মা, ওরে চেনো না? রতন ঘর ছেড়ে পালিয়েচে এক বাগদি মাগীকে নিয়ে। ওর মা যায় কনে? কেউ দেখে না। দুদিন না খেয়ে ঘরের মধ্যে পড়েছিল। তাই ওরে এনে রেখে দেলাম মোর এখানে। চোকির ওপর না খেয়ে মরবে পাড়া পিরতিবাসী—চোক কি দ্যাখা যায়? তাই ওরে এনে রেখে দেলাম। যদি মোদের জোটে, তোমারও একবেলা জোটবে। তাও নড়তে পারে না, জ্বর ছর্দি, কাশি। একটু হুমনেপাতি ওছুদ এনে দিয়েলাম যগানন্দ-পুরের ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে। দু আনা দাম নিয়েল—তা যদি কোনো উপ্‌গার হোলো

দাদাঠাকুর—তুমি জানো হুম্‌নেপাতি?

—না, আমি জানিনে। আচ্ছা আমি দেখবো এখন ওবেলা ওষুধের ব্যবস্থা।

—কি দেবো তোমাদের দাদাঠাকুর তাই ভাবচি—

—কিছু দিতে হবে না। তুমি কথা বলো আমি শুনি—

কিন্তু কথা কইতে গণেশদাদা জানে না। তার সংকীর্ণ জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করেছে আজ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর ধরে, সে যতই সামান্য হোক, বলতে জানলে তাই নিয়েই চমৎকার কথার জাল রচনা করা যেতো যা আকাশকে বাতাসকে রাঙিয়ে দিতে পারতো, শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে পারতো—চাম্‌টার বিলের পদ্মফুলের পদ্মগন্ধি রেণু আমার নাকে উড়িয়ে নিয়ে আসতে পারতো। গণেশদাদা সে সব পারে না। তবুও ওর সঙ্গ আমার এত ভালো লাগে। কথার দরকার হয় না, ওর নিরুপকরণ ও অনাড়ম্বর সাহচর্যই আমার মনে একটি মৌন লিরিকের আবেদন বহন করে আনে।

সেবার চলে আসার পর পাঁচ ছ' বছর হবে গণেশদাদার সঙ্গে আবার দেখা।

গণেশদাদার মাথার চুল পেকে একেবারে শনের নুড়ি হয়ে গিয়েচে, পিঠের দিকটা বেঁকে একটু কুঁজো হয়ে গিয়েছে—সামান্য।

শরৎকাল। পুজোর ছুটি। সেবার নদীতে একটু বন্যার আভাস দেখা গিয়েছে। কাশফুল ফুটে আলো করেচে নদীর দুই পাড়। নদীর ধারের মাঠে গণেশ গরু চরাচ্চে, খুঁজতে খুঁজতে বার করলাম। ওর মাথার চুল আর ওর চারিপাশে কাশফুল একই রকম দেখতে। বৃদ্ধ গণেশদাদা সেই পাঁচ-সাত বছর আগের মত তালপাতার ছাতি মাথায় দিয়ে লাঠি হাতে গরু চরাচ্চে। কোঁচড় থেকে বের করে কি খাচ্ছিল, আমায় দেখে লজ্জিত সুরে বললে—সৈরভির মা দুটো চালভাজা দেলে, বললে, গরম-গরম একখোলা নামিয়ে ফেললাম, তুমি দুটো নিয়ে যাও—তাই নিয়ে এল্যাম। বেশ লাগে।—তা এলে কবে দাদাঠাকুর? আর দ্যাখো বড্ড বুড়ো হয়ে পড়িচি, তুমি আসচো, কিন্তু মুই বুঝতে পারলাম না। বলি, কেডা আসে বাবুপানা? চকি তেমন আর ঠাওর হয় না—

—চালভাজা খাচ্চ, দাঁত আছে?

—তা আছে তোমার বাপমায়ের আশিব্বাদে। বলি ও কথা যাক, বিয়ে-থাওয়া করেচ?

—না। বিয়ের আর বয়েস নেই।

—কি কথা বলো দাদাঠাকুর? তোমারে কোলে করে মানুষ করলাম, কালকের কাঁচা ছেলে, বয়েস ফুইরে গেল তোমার? ও কথা বোলো নি। মা লক্ষ্মীকে দেখে মুই চক্ষু বুজোবো। বিয়ে করো—কি করচো আজকাল?

—চাকরি করচি।

—বেশ বেশ। মোদের শুনেও সুখ। তা বোসো। এই গাছটার ছিঁয়াতে বোসো—হ্যাদে, তোমরা টুপি পরো? বেনার ডাঁটার খাসা টুপি বুনি দিতি পারি। পস্কার সায়েবের টুপি। নেবা?

—না, আমি সায়েবের টুপি পরিনে।

—বোসো। জিরোও, বড্ড রুদ্দুর।

কি সুন্দর নীল আকাশ কাশফুলে ভরা বিস্তীর্ণ মাঠের ওপরে হুমড়ি খেয়ে আছে। সাধারণ ধরনের নীল নয়, সে এক অদ্ভুত ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের নীল। ওপার থেকে হু হু হাওয়া বইচে, গণেশদাদার মাথার সাদা চুল বাতাসে কাশফুলের মত উড়চে। আমার কাছে ছবিটি বেশ লাগে।

গণেশদাদা এইবার চালভাজা খাওয়া শেষ করে নদীর পাড় বেয়ে জলে নেমে দুহাতে আঁজলা করে জল খেয়ে সরস তৃপ্তির সঙ্গে 'আ' বলে একটি দীর্ঘস্বর উচ্চারণ করলে। আমার কাছে এসে বললে—তামুক খাবা?

—খাই নে।

—দাঁড়াও সাজি। মোর দা-কাটা খরসান তামাক, বড্ড তলব। কিছু নেই, শুধু তামাক আর গুড়। বাজারের তামুকে চুন মেশায়। বলি হ্যাদে দাদাঠাকুর, একটু শুধোও দিকি?

—কি?

—সেই ইনজিরি। মুই মুখস্ত বলবো? ওভার মানে ওপর, ওয়াটার মানে জল, বার্ড মানে পাখী, বালির ইনজিরি স্যান্ড, মাছের ইনজিরি ফ্লাই—

—উঁহু—

—কি, মাছের ইনজিরি ফ্লাই নয়?

—না।

—তবে কি এ্যান্ট?

—না, এ্যান্ট মানে পিঁপড়ে। মাছের ইংরিজি ফিশ, মাছির ইংরিজি ফ্লাই।

—হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। বলি হ্যাদে, বয়েস হয়েচে আজকাল অনেক, সব কথা ঝক্করে মনে পড়ে না, বেস্মরণ হয়ে যাই। আর তুমি না এলি তো চচ্চা হয় না, সব মুরুক্ষু—কার সঙ্গে ইনজিরি বলি বলো দিকি?

আর এক ডজন ইংরিজি শব্দ বসে বসে আমার জ্ঞানপিপাসু শুভ্রকেশ ছাত্রকে শিক্ষা দিলাম, সেই কাশফুল-ফোটা চরে বসে শরতের অপরাহ্ণে। আগের শেখা শব্দগুলোও একবার সে ঝালিয়ে নিলে মহা উৎসাহে। তারপর সেই বিদ্যার বোঝা বহন করে সেই বছরের মাঘ মাসে নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে গণেশদাদা পরলোক যাত্রা করলে। পর বৎসর পুনরায় দেশে ফিরে গিয়ে আর ওকে দেখতে পাই নি।

কি বৈষয়িক উন্নতির দিক থেকে, কি ইংরিজি শিক্ষার দিক থেকে গণেশদাদা সারা-জীবন প্রথম সোপানের দিকেই রয়ে গেল বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার সাহায্যে ও সব সোপান অতিক্রম করে, আমাদের অনেককে অতিক্রম করে, অনেক উঁচুতে গিয়ে পোঁছে ছিল। তাই আজকার দিনে বার বার তার কথা মনে পড়ে।

সংসার

উপেন ভটচাজের পুত্রবধূ বেশ সুন্দরী। একটি মাত্র ছোট ছেলে নিয়ে অত বড় পুরনো সেকেলে ভাঙা বাড়ীর মধ্যে একাই থাকে। স্বামীর পরিচয়ে বৌটি এ গ্রামে পরিচিতা নয়, অমুকের পুত্রবধূ এ-ই তার একমাত্র পরিচয়। কারণ এই যে স্বামী ভবতারণ ভটচাজ ভবঘুরে লোক। গাঁজা খেয়ে মদ খেয়ে বাপের যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়েছে, এখন কোথায় যেন সামান্য মাইনেতে চাকরি করে, শনিবারে শনিবারে বাড়ী আসে, কোন শনিবারে আসেই না। শ্বশুর উপেন ভটচাজ গ্রামের জমিদার মজুমদারদের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্যপূজা করেন। সেখানেই থাকেন, সেখানেই খান। বড় একটা বাড়ী আসেন না তিনিও। ভাল খেতে পান বলে ঠাকুরবাড়ীতেই পড়ে থাকেন, নইলে সকালের বাল্যভোগের লুচি ও হালুয়া, পায়েস দই ও বৈকালীর ফলমূল বারভূতে লুটে খায়।

কোন কোন দিন সন্ধ্যার দিকে তিনি বাড়ী আসেন। হাতে একটা ছোট্ট পুঁটুলি, তাতে প্রসাদী লুচি ও মিষ্টি, ফলমূল, একটা বা ক্ষীরের ছাঁচ থাকে। তাঁর নাতি করুণার বয়স এই সাত বছর! না খেতে পেয়ে সে সর্বদা খাইখাই করছে, যা হয় পেলেই খুশী, তা কাঁচা আমড়া হোক, পাকা নোনা হোক, চালভাজা হোক, তালের কল হোক, আধপাকা শক্ত বেল হোক। খাওয়া পেলেই হল, স্বাদের অনুভূতি তার নেই। ঝাল, টক, মিষ্টি, তেতো তার কাছে সব সমান।

—ও করুণা, এই দ্যাখ—কি এনেছি—

—কি ঠাকুরদাদা?

'দাদু-টাদু' বলার নিয়ম নেই এই সব অজ পাড়াগাঁয়ে, ওসব শৌখিন শহুরে বুলি করুণা শেখে নি। সে ছুটে যায় উৎসুক লোভীর ব্যগ্রতা নিয়ে। ঠাকুরদাদা পুঁটুলি খুলে দুখানা আখের টিকলি, একটা বাতাসা ওর হাতে দেন। ও তাতেই মহাখুশী। ঠাকুরদাদা যে জিনিস দেন, তার চেয়ে যে জিনিস দেন না তা অনেক ভাল ও অনেক বেশি। পুঁটুলির সে অংশে থাকে বৈকালী ভোগের লুচি, কচুরি, মালপুয়া ও তালের বড়া। যখনকার যে ফল সেটা ঠাকুরকে নিবেদন করার প্রথা এ ঠাকুরবাড়ীতে বহুকাল থেকে প্রচলিত। এখন

ভাদ্র মাস, কাজেই তালের বড়া রোজ বিকেলে নিবেদিত হয়।

করুণা এক আধবার পুঁটুলির অন্য অংশে চাইলে।

কিন্তু তাতে তার লোভ হয় না, ও রকম দেখতে খুব ছেলেবেলা থেকে সে অভ্যস্ত। সে জানে ও অংশে তার কোন অধিকার নেই।

ঠাকুরদাদার দিকে ও খোকার মত চেয়ে থাকে। উপেন ভটচাজ গলায় কাশির আওয়াজ করে পুত্রবধূকে তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করতে করতে বাড়ী ঢোকেন এবং সটান দোতলায় নিজের ঘরটিতে চলে যান।

রোজ তাঁর ঘরটিতে নিজে চাবি দিয়ে বেরিয়ে যান এবং এসে আবার খোলেন। পুত্র-বধূকে বিশ্বাস করার পাত্র নন তিনি। কোন মেয়েমানুষকেই বিশ্বাস নেই।

—ও বৌমা—বৌমা, ওপরে এস—

—কে? বাবা?

—একবার ওপরে এস।

পুত্রবধূ ওপরে গিয়ে দেখে শ্বশুর পুঁটুলি খুলে কি সব খাবার জিনিস ত্রস্ত ভাবে হাঁড়ির মধ্যে পুরছেন। পুত্রবধূকে দেখে তাড়াতাড়ি তিনি হাঁড়িটার দিকে পেছন ফিরে বসে বললেন—বৌমা? ইয়ে কর তো—আমার ঘরে একটা আলো জেলে দিয়ে যাও।

—আপনি রাতে কি খাবেন? ভাত রাঁধব?

—না। তুমি শুধু খাবার জল একঘটি দিয়ে যেও এর পরে।

এ সংসারে বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্য পুত্রবধূর রাঁধবার নিয়ম নেই। যার যার, তার তার। ছেলে যখন আসে, বাপের খোঁজ নেয় না। ওরা নিজে রাঁধে, নিজেরা খায়। উপেন ভটচাজ এসে নিজের ঘরের তালা খুলে বড় জোর একটু জল কোনদিন একটু নুন চান পুত্রবধূর কাছে। এর বেশি তাঁর কিছু চাইবার থাকে না, কেউ তাঁকে দেয়ও না। আজ পুত্রবধূর তাঁর জন্যে রান্না করার প্রস্তাবে তিনি খানিকটা বিস্মিত না হয়ে পারেন নি মনে মনে। বোধ হয় সেজন্যেই পুত্রবধূর প্রতি তাঁর মনোভাব হঠাৎ বড় দরাজ হয়ে গেল। তার ফলে যখন আবার সে জলের ঘটি নিয়ে ঢুকল, তখন তিনি হাঁড়িটা সামনে নিয়ে বললেন—দাঁড়াও বৌমা। করুণাকে দিইছি—আর তুমি এই দুখানা লুচি আর এই একটু মিষ্টি নিয়ে যাও। জল খেও।

পুত্রবধূ দুই হাত পেতে শ্বশুরের দেওয়া আধখানা ক্ষীরের ছাঁচ, খানচারেক লুচি, আধখানা ছানার মালপুয়া ও দুটি তালের বড়া নিয়ে একটু অবাক হয়েই দাঁড়িয়ে রইল।

শ্বশুর হঠাৎ কেন এত সদয় হয়ে উঠলেন তার ওপরে? না খেয়ে থাকলেও তো কখনও পোছেন না সে খাচ্ছে, না উপোস করছে।

সে বললে—আমি যাই বাবা?

—হ্যাঁ যাও। পান আছে?

—না তো বাবা। এ হাঠে আমার হাতে পয়সা ছিল না। করুণার পাঠশালার মাইনে চার আনা বাকি। তাগাদা করছে মাস্টার। তাও দিতে পারছি নে।

পুত্রবধূর নাম তারা। গরীব ঘরের মেয়ে না হলে আর এমন সংসারে বিয়ে হবে কেন? নিচে নেমে এসে সে ছেলেকে ডেকে দুখানা লুচি আর মিষ্টিগুলো সব খেতে দিলে। নিজের জন্যে রাখলে দুখানা লুচি আর দুটো তালের বড়া। ছেলেকে তালের বড়া খেতে দিলে ওর পেট কামড়াবে রাতে।

সত্যি, তার হাতে পয়সা না থাকায় কোনদিনই রাতে সে কিছু খায় না। করুণার জন্যে দুবেলার চাল নেওয়া হয় ওবেলা, জল দেওয়া ভাত সন্ধ্যের পিদিম জ্বালিয়েই করুণাকে খেতে দেয়। তার পর মায়ে-পোয়ে শুয়ে পড়ে।

নিত্য নক্ষত্র ওঠে আকাশে, নিত্য চাঁদের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে যায় ওদের মস্ত বড় ছাদটা। ও ছেলেকে নিয়ে অত বড় বাড়ীর মধ্যে একখানা ঘরে শুয়ে থাকে, ইঁদুর খুটখাট করে, কলাবাদুড় পুরনো বাড়ীর কোণে কোণে চটাপট শব্দে ওড়ে, ছাদের ধারের বেল

গাছটাতে বেলের ডাল বাতাসে দোলে—কোন কোন দিন ওর ছেলের ঘুম ভেঙে যায়, ভয়ে মাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে বলে—ও কি খুটখুট করছে মা?

—কিছু না, তুই ঘুমো। ও ইঁদুর।

—বাইরে ছাদে? ওই শোন—

—ও কিছু না। তুই ঘুমো।

—শাঁকচুন্নী আছে মা বেলগাছে?

—না। সে সব কিছু না।

—শোন মা, রেতার দাদা গল্প করছিল, তাদের বাঁশঝাড়ে শাঁকচুন্নী আছে—রেতা নিজেও দেখেছে একদিন, বুঝলে মা?

—তুই ঘুমো। ওসব বাজে গল্প। আচ্ছা খোকন, আমি একা একা রাত আটটার সময় পুকুরে কাপড় কেচে আসি, আমি কিছু তো দেখি নে?

উপেন ভটচাজের পুত্রবধূর সাহস খুব, একথা গাঁয়েও সকলে বলাবলি করে। অত বড় প্রাচীন অট্টালিকায় বহু ঘরদোরের মধ্যে ছোট্ট একটি ছেলে সম্বল করে বাস করে—ওই ভূতের বাড়ীতে। বাবা! শ্বশুর তো কালেভদ্রে বাড়ী ফেরে, সোয়ামীও প্রায় তাই। শনিবারে যদি বা এল, রবিবার বিকালেই চলে গেল। ধন্যি সাহস বটে মেয়েছেলের।

কেউ কেউ বলে—মেয়েমানুষের ভাই, যাই বল, অতটা সাহস ভাল না। স্বভাব-চরিত্তির কার কি রকম তা তো কেউ বলতে পারে না।

শেষ রাত্রে করুণা আবার মাকে ঠেলা মেরে বললে—ওমা, ওঠ না। কিসের শব্দ হচ্ছে—

—তুই বাবা আর ঘুমুতে দিলি নে। কই কোথায় শব্দ?

কে এসে দরজায় ঘা দিলে। কড়া নাড়লে ওদের ঘরের বাইরে।

তারা ধড়মড় করে উঠে বললে—কে?

বাইরে থেকে উত্তর এল—আমি! দোর খোল।

করুণা ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল প্রায়।

—ও, বাবা!

তারা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে খিল খুলে দিয়ে একগাল হেসে বললে, এস এস। একেবারে শেষ রাত্তিরে? ভাল আছ?

—হ্যাঁ। বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল রাস্তায়। আসতি যা কষ্ট হয়েছে! তালপুকুরের মাঠের মধ্যে বাস খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাত দশটা থেকে। এই খানিকটা আগে তখন চলেল।

—তুমি হাত-মুখ ধোও। জল গামলায় আছে, গাড়ুতে আছে। আমি ভাত চড়াই।

—ভাত? শেষ রাত্তিরি ভাত খেয়ে মরি আর কি। আমার পুঁটুলির মধ্যে সরু চিঁড়ে আছে, তাই দুটো ভিজিয়ে দ্যাও। খোকা, সরে আয়, তোর জন্যি জিলিপি কিনেছিলাম, তা মিইয়ে ন্যাতা হয়ে গিয়েছে। এই ন্যাও, খোকারে দুখানা দ্যাও, তুমি দুখানা খাও।

—আমি খাব না, তুমি খেয়ে এটু জল খাও।

—ওগো না না। যা বলছি শোন না। আমার পেট ভাল না কদিন থেকে। সরু চিঁড়ে ভিজিয়ে নেবুর রস আর নুন মেখে বেশ কচ্‌লে কথ বের করে—

—থাক, থাক, তোমাকে আর শোনাতে হবে না। হাত-মুখ ধুয়ে এস।

—যাব। তার আগে একবার গাড়ুটা দাও দিকি।—গামছাখানা এখানে রেখে দিও। আসছি আমি।

তারা তখুনি চিঁড়ে ভেজাতে দিলে। স্বামী এসে হাত-মুখ ধুয়ে বসল, তার সামনে পাথরের একটা বড় বাটিতে চিঁড়ের কথ নুন লেবু মিশিয়ে তাকে খেতে দিলে। স্বামী একটুকু মুখে দিয়েই বললে—বাঃ, বেশ! নুন নেবু মিশিয়ে বড় চমৎকার খেতে লাগছে!

—আর দেব?

—না না, এই বেশি হয়েছে। হ্যাঁগা, ধার দেনা কত এবার?

—মাছ কিনেছিলাম একদিন চার আনা, একদিন দু আনা। আর খোকা আমসত্ত্ব খেতে চেয়েছিল, তাই বোষ্টম বাড়ী থেকে কিনে এনেছিলাম দু আনার।

—আমসত্ত্ব আবার কিনতে গেলে? বড় নবাব হয়েছ, না?

স্বামীর মুখে কড়া সুরের কথা এই প্রথম নয় তারার। ওর চেয়ে অনেক বেশি রূঢ় ব্যবহার ও কথা সে সহ্য করে আসছে স্বামীর।

গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে তার।

তাও বিনি দোষে। খোকা খেতে চেয়েছিল, ছেলেমানুষ আবদার ধরলে, ও কি বোঝে কিছু? অবোধ। না দিতে পারলে কষ্ট হয়।

—বা রে, খোকা কাঁদতে লাগল, দেব না কিনে?

—না। বাপের বাড়ী থেকে পয়সা এনে দিও।

—মুখ সামলে কথা কও বলছি। বাপ তুলো না, খবরদার।

—ওরে বাপ্‌রে! দেখো ভয়েতে ইঁদুরের গর্তে না ঢুকি। তবুও যদি বাপের বাড়ীর চালে খড় থাকত!

—ছিল না বলেই তো তোমার মত অজ পাঁড় মুক্‌খু আর মাতালের হাতে বাপ দিইছিল ধরে!

—তবে রে—

স্বামী ভবতারণ হাতের কাছে ছাতা পেয়ে তাই উঁচিয়ে গেল তারার দিকে। করুণা চীৎকার করে কেঁদে উঠল ভয়ে। ওপর থেকে উপেন ভটচাজ বলে উঠলেন—কে? কে? কি হল? কে ওখানে?

ভবতারণ উদ্যত ছাতা নামিয়ে বললে—তোমায় আমি—ফের যদি—ছোটলোকের মেয়ে কোথাকার!

—খবরদার! আবার বাপ তুলছ? বেরোও তুমি বাড়ী থেকে। দূর হও। তোমার মুখে ছাইয়ের নুড়ো দেব বলে দিচ্ছি। বেরোও—

—হারামজাদী, দ্যাখ, এখনও মুখ সামলা বলে দিচ্ছি। বেরোব কেন, তোর কোন্ বাবা এ বাড়ী করে রেখে গিইছিল জিগ্যেস করি? তুই বেরো—

করুণা আকুল সুরে কাঁদছে বাবা মার ধুন্ধুমার ঝগড়ার মাঝখানে পড়ে গিয়ে। ওর মা এসে ওকে কোলে নিয়ে বললে—চল্ খোকা, আমরা এ বাড়ী থেকে চলে যাই—ওরা থাকুক, যাদের বাড়ী। তোর-আমার বাড়ী তো না!

—খবরদার, খোকাকে ছুঁয়ো না বলছি। যাবি হারামজাদী তো একলা মর গে যা—খোকা তোর না আমার?

—বেশ! রাখ খোকাকে। আমি একলাই যাচ্ছি।

—যা—বেরো—

করুণা ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে—মা, তুমি যেও না। আমি তোমার সঙ্গে যাব—

ভবতারণ বললে—খোকন, কেঁদ না। তোমায় আমি কলকাতায় নিয়ে যাব। রেলগাড়ী কিনে দেব। মটোর কিনে দেব—এস—

করুণা কান্নায় জড়িত সুরে বললে—না—

—এস—

—না—

—কলকাতায় যাবি নে?

—না—

মাকে সে আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরে।

এমন সময় ওপর থেকে উপেন ভটচাজ নেমে এসে ছেলেকে বললেন—তুই কী চেঁচামেচি আরম্ভ করলি ভোর রাত্তিরে? তুই মানুষ হলি নে এই দুঃখে আর আমি বাড়ী আসি নে। কেন মিছিমিছি বৌমাকে যা তা বলছিস? আমি সব শুনছি নে ওপর থেকে? তোরই তো দোষ। ও আমার ঘরের লক্ষ্মী—

—আপনাকে তো কিছু বলিনি—আপনি ওপরে যান বাবা—আমাদের কথার মধ্যে আসতে কে বলেছে আপনাকে?

—আমি যাই না যাই সে আমি বুঝব। আর তুই যে বলছিস বৌমাকে বাড়ী থেকে বেরুতে—আমার বাড়ী না তোর বাড়ী? আমি আজও বেঁচে নেই? তোর কী দাবি আছে এ বাড়ীর ওপর? আমি ওপর থেকে সব শুনেছি। বদমাইশ পাজি কোথাকার। আমি মরবার আগে খোকনকে বাড়ী লিখে দিয়ে যাব—কালই যাচ্ছি আমি সদরে। বৌমাকে অছি করে যাব। তোমার বাড়ীর আস্বা ঘুচিয়ে তবে আমার কাজ, হতচ্ছাড়া বদমাইশ! রাত দুপুরের সময় এসে উনি ঘরের বৌকে বলবেন, বেরো, বেরো। মুরোদ নেই এক কড়ার—হ্যাঁরে হারামজাদা, ও ভদ্দরনোকের মেয়ে সারা মাস কি খায় তুই তার কোন হদিস রাখিস? না কেউ রাখে? বেরো বলতে লজ্জা করে না? এস তো খোকন, এস—চল বৌমা—ওপরের ঘরে চল—

তারা ঘোমটা টেনে দিয়েছিল শ্বশুর আসবার সঙ্গে সঙ্গেই। সে ফিস ফিস করে খোকনকে কি বললে।

খোকন বললে—ঠাকুরদাদা, তুমি ওপরে যাও—মা বলছে।

ভবতারণ সাহস পেয়ে বললে—আমি তাড়িয়ে দেবার কথা আগে মুখে এনেছি না আপনার গুণধর বৌমা? জিগ্যেস করুন তো কে আগে কাকে বেরিয়ে যাবার কথা বলেছে! হ্যাঁ খোকা, বল তো? আপনার বৌমাই বললে না আমাকে বেরিয়ে যেতে? কেন, ওর বাবার বাড়ী?

—হ্যাঁ, ওর বাবার বাড়ী। আলবৎ ওর বাবার বাড়ী। হারামজাদা, ফের যদি তুমি ওসব কথা মুখে এনেচ তবে তোমাকে আমি—

উপেন ভটচাজ ওপরে উঠে গেলেন। ভবতারণ চুপ করে বসে রইল তক্তপোশের এক কোণে।

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। হঠাৎ ভবতারণ উঠে জামার পকেট হাতড়ে একখানা দু টাকার নোট বার করে স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, এই দিলাম। ধার দেনা শোধ দিও। আমি এক্ষুনি চললাম। দেশলাই কে নিল আমার?

তারা বললে—খোকন, দেশলাইটা ঐ রয়েছে, দে তো।

একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে ভবতারণ জামা গায়ে দিতে দিতে বললে, এসেছিলাম অনেক আশা করে। তা এ বাড়ী আমি থাকব না। এখানে আমার পোষাবে না বুঝলাম। কেউ যখন আমাকে দেখতে পারে না এ বাড়ীতে। খাওয়া হল না, শরীরটাও খারাপ। তা হক, যাবই। আর আসছি নে। দ্যাখ খোকন, যাবি কলকাতায়? চল্ আমার সঙ্গে, মটোর কিনে দেব, লবেঞ্চুস্ কিনে দেব—

করুণা নিরুত্তর।

—যাবি?

—না।

—এস আমার সোনা, আমার মানিক, চল আমার সঙ্গে—

এই সময়ে তারা এগিয়ে এসে স্বামীর হাত ধরে বললে, কেন পাগলামি করছ? বস। এখনও অন্ধকার রয়েছে। এখন কোথায় যাবে? ছিঃ—

—ছাড় হাত—

ঝটকা মেরে ভবতারণ হাত ছাড়িয়ে নিলে।

—তোমার মত ইতরের সঙ্গে আমি কথা বলি নি। আমি খোকনের সঙ্গে কথা বলছি।

—রাগ করে না—ছিঃ—

—ফের আবার? এইবার কিন্তু ভাল হবে না বলছি। খবরদার, আমার গা ছুঁয়ো না—

—আচ্ছা ছোঁব না। বস ওখানে।

—ফের কথা বলে! খোকন, ও খোকন—যাবি আমার সঙ্গে? আয়—আর কখনও যদি এ ভিটেতে পদার্পণ করি তবে আমার—

করুণা মায়ের পেছনে গিয়ে লুকিয়ে আছে। তার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না—

সকাল বেলা। বেশ রোদ উঠেছে।

তারা স্বামীকে দুখানা পেঁপের টুকরো হাতে দিয়ে বললে, খাও। পেট ঠাণ্ডা হবে।

ভবতারণ এই ঘুমিয়ে উঠেছে। চোখ ভারি-ভারি। পেঁপের রেকাবি হাতে নিয়ে বললে, উনি কোথায়?

—ওপরে।

—যাবেন না?

—তা কি জানি।

—খাবেন?

—উনি কবে খান? কাল সন্দের সময় এলেন, বললাম ভাত রেঁধে দিই। উনি বললেন, না।

—পেঁপে আর আছে? দিয়ে এস না ওপরে।

—সে তুমি বললে তবে দেব? সে দিয়ে এসেছি, তুমি তখন ঘুমিয়ে।

—দিও। বুড়ো মানুষ।

—সে তোমাকে শেখাতে হবে না।

—খোকন—ও খোকন—শোন্—

—ও খেয়েছে। ওকে ডাকছ কেন? তুমি খেয়ে ফেল। তোমার পেট ঠাণ্ডা হবে পেঁপে খেলে। এখন কেমন মনে হচ্ছে?

—এখনও গোলযোগ যায় নি। ভাতে জল দিয়ে নুন লেবু দিয়ে তাই খাব। তেল দ্যাও, নেয়ে আসি।

করুণা বাপের কাছে এসে বললে, কি বাবা?

—এ নে, খা—

তারা বললে, আহা, কেন আবার—তুমি খাও—

এই সময় উপেন ভটচাজ খড়ম পায়ে দিয়ে ওপর থেকে নেমে এলেন। ঘরে উঁকি দিয়ে বললেন—কে? ভবতারণ? ভাল পেঁপে, খা। ইয়ে বৌমা, আমি আসি। ওখানেই খাব। ভবতারণ আজ আছিস তো?

ভবতারণ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, না বাবা, ওবেলা চলে যাব। আপনি আসবেন না ওবেলা?

—আচ্ছা, তুই যাবার আগে আমি ফিরে আসব। আমি—

এই সময় তারা ফিস ফিস স্বরে কি বললে স্বামীকে। ভবতারণ ডেকে বললে, বাবা—

—কি?

—এবেলা এখানে দুটো খাবেন, আপনার বৌমা বলছে। কই মাছ আনতে যাচ্ছি বাঁধালে। একসঙ্গে বসে অনেকদিন খাই নি—কেমন?

উপেন ভটচাজ সম্মতি জ্ঞাপন করে রোয়াক থেকে উঠানে পা দিলেন। কি ভেবে এসে আবার বসলেন রোয়াকে।

পুত্রবধূ বললে—তামাক সেজে দেব?

—দ্যাও দিকি।

ছেলে ভবতারণ নিজেই তামাক সেজে নিয়ে এল। বৃদ্ধ উপেন ভটচাজ চোখ বুজে হুঁকোয় টান দিতে দিতে চিন্তা করতে লাগলেন, এমন সকালবেলা কতকাল আসে নি তাঁর জীবনে। স্ত্রী মারা গিয়েছে আজ বোধ হয় বিশ বছর, ভবতারণ তখন এগার বছরের বালক। তার পর থেকেই ছন্নছাড়া সংসারজীবন চলছে, আঁটসাঁট নেই কোন বিষয়ে কারও। তার ওপরে দারিদ্র্য তো আছেই। হাতে পয়সা ছিল না বলেই ভবতারণকে লেখাপড়া

শেখাতে পারেন নি। লেখাপড়া শেখালে অত খারাপ হত না সে। অবহেলিত পুত্রের প্রতি উপেন ভটচাজের মায়া হল। কাল অত বকুনি দেওয়াটা উচিত হয় নি।

ভবতারণ বাড়ী ফিরে এল আটটার সময়। স্ত্রীকে বললে—দেখ, কারে বলে যশুরে কই! আধ পোয়ার নামো নেই, ওপরে এক পোয়া, পাঁচ ছটাক। বাবাকে দেখাও।

পুত্রবধূ বললে—এই দেখুন—

—বাঃ বাঃ—কত করে সের নিলে!

—সাড়ে তিন টাকা।

—তা হবে। যুদ্ধের সময় ছিল ভাল। এ দিন দিন যা হয়ে উঠল—

অনেক দিন পরে পুত্র ও পুত্রবধূর সেবাযত্ন জুটল উপেন ভটচাজের ভাগ্যে। এমন একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া কতকাল হয় নি। তিনি পড়ে থাকেন মজুমদারদের ঠাকুরবাড়ীতে পেটের দায়েই তো। ছেলে উপযুক্ত হয় নি, নিজেরই ছেলেটাকে সে খেতে দিতে পারে না। ওদের ভার লাঘব করবার জন্যেই তিনি পরের বাড়ী খান।

খাওয়া-দাওয়ার পর উপেন ভটচাজ দিবানিদ্রা দেবার জন্যে ওপরের ঘরে চলে গেলেন। পুত্রবধূ তামাক সেজে দিয়ে গেল। আঃ, কি আরাম। সব আছে তাঁর, অথচ নেই কিছুই।

আজ দিনটা একটা চমৎকার দিন। এমন দিন আবার কবে আসবে!

বারমেসে সজনে গাছে ফুল ফুটেছে। ডালপাতা নড়ছে বর্ষার সজল বাতাসে! ঘুমিয়ে পড়লেন উপেন ভটচাজ। উপেন ভটচাজের পুত্রবধূও আপন মনে আজ খুব খুশী। ছন্নছাড়া ভাঙা বৃহৎ বাড়ী আজ যেন কার পাদস্পর্শে লক্ষ্মীর সংসারে পরিণত হয়েছে। দোতলায় শ্বশুরকে তামাক সেজে দিতে যাওয়ার সময় এই কথাই তার মনে হচ্ছিল। তার আছে সবাই। শ্বশুর, স্বামী, পুত্র—যা চায় মেয়েরা, এত বড় বাড়ী, জাজ্বল্যমান সংসার যাকে বলে। ওদের সকলের পাতে পাতে ভাত-মাছ দিয়ে আজ কত সুখ পেয়েছে সে। ওদের খাইয়ে সুখ। ভাবতে ভাবতে সেও ঘুমিয়ে পড়ল।

ভবতারণ অন্য দিন খেয়ে দেয়ে আড্ডা দিতে বেরোয় রায়-পাড়ার হরু রায়ের নাতি অমূল্য রায়ের ওখানে। স্থলপথের যাত্রী দুজনেই। দুপুরের পর ভরা পেটে মৌতাত জমে ভাল।

আজ কিন্তু সে বাইরে গেল না। স্ত্রীকে ঘুমুতে দেখে সে মনে মনে ক্রুদ্ধ হল। কেন, দুটো গল্প করতে কি হয়েছিল। তারাকে কি সে রোজ রোজ পায়? কত কষ্টে থাকে এই বাড়ীতে একা। সে নিজে অক্ষম স্বামী, কিছু করবার পথ তার নেই সামনে।

সে ভাল হবে ভাবে, ভেবেছে কতবার। কিন্তু তা হবার জো নেই। সে জানে কেন। সঙ্গ বড় খারাপ জিনিস। সে-সব বন্ধুদের সঙ্গ তাকে এইখানে নামিয়েছে। জলপথ ও স্থলপথ, কোন পথ বাকি রাখে নি। আজকের সংকল্প কাল উবে যাবে কর্পূরের মত।

তবুও আজকের দিনটি একটা সুন্দর, জাঁকালো, শান্ত দিন হয়ে থাক তার জীবনে। তারাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বললে,—চা আছে ঘরে? চা করো। বাবাকে দিয়ে এস। আমিও একটু খাই—

—না, চা খায় না। নেবু আর নুন দিয়ে চিঁড়ের কথ করে দি—

স্ত্রী সত্যি তাকে যত্ন করবার চেষ্টা করে। তার অদৃষ্টে নেই, কার কি দোষ? তারা সত্যি ভাল মেয়ে বড্ড।

এদিকে দিবানিদ্রা ভেঙে উপেন ভটচাজ সবে উঠেছেন, অমনি পুত্রবধূ গরম চায়ের গ্লাস নিয়ে এসে তাঁর হাতে দিলে। বিস্মিত চোখে পুত্রবধূর দিকে চেয়ে বললেন—কি? চা? বাড়ীতে ছিল?

—ছিল।

—বেশ, বেশ।

পুত্রবধূ হাসিমুখে বললে—আর কিছু খাবেন?

—হ্যাঁ, তা—কি খাওয়াবে?

—বেশ দোভাজা করে চিঁড়ে ভেজে নারকোল-কোরা দিয়ে নিয়ে এসে দেব?

—বেশ বেশ। কাঁচা লংকা অমনি ঐ সঙ্গে একটা এনো। আর শোন, ভবতারণকে আর

খোকনকেও দিও।

—তামাক দেব বাবা?

—এখন না। চিঁড়েভাজা আগে খাই, তার পরে। বাঃ, মৌতাতটা নষ্ট করে দেবে বৌমা?

এমনি সুন্দর হাসিখুশির মধ্যে সেদিনের সূর্য ডুবে গেল জামদার বড় বিলের ওপারে।

সারাদিন কেউ কোথাও নেই।

ভবতারণ চলে গিয়েছে। যা সামান্য দুটি টাকা দিয়ে গিয়েছে তাতে পাঁচদিনের চালও হবে না। উপেন ভটচাজ গিয়ে উঠেছেন মজুমদারদের ঠাকুরবাড়ীতে।

একা রয়েছে তাঁর পুত্রবধূ সেই প্রকান্ড ভাঙা বাড়ীতে ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে রাত্রে। আবার কলাবাদুড় ওড়ে কড়িকাঠের খোপে খোপে, পেঁচা ডাকে ডুমুর গাছের নির্জন অন্ধকারের মধ্যে, করুণা ঘুমের মধ্যে মাকে বলে—ও কিসের শব্দ মা? ওঠ ওঠ—ওটা কি মা?

হিঙের কচুরি

আমাদের বাসা ছিল হরিবাবুর খোলার বাড়ীর একটা ঘরে। অনেকগুলো পরিবার এক-সঙ্গে বাড়ীটাতে বাস করত। এক ঘরে একজন চুড়িওয়ালা ও তার স্ত্রী বাস করত। চুড়িওয়ালার নাম ছিল কেশব। আমি তাকে 'কেশবকাকা' বলে ডাকতাম।

সকালে যখন কলে জল আসত, তখন সবাই মিলে ঘড়া কলসী টিন বালতি নিয়ে গিয়ে হাজির হত কলতলায় এবং ভাড়াটেদের মধ্যে ঝগড়া বকুনি শুরু হত জল ভর্তির ব্যাপার নিয়ে।

বাবা বলতেন মাকে, এ বাসায় আর থাকা চলে না। ইতর লোকের মত কান্ড এদের! এখান থেকে উঠে যাব শীগগির।

কিন্তু যাওয়া হত না কেন, তা আমি বলতে পারব না। এখন মনে হয় আমরা গরিব বলে, বাবার হাতে পয়সা ছিল না বলেই।

আমাদের বাসার সামনে পথের ওপারে একটা চালের আড়ত, তার পাশে একটা গুড়ের আড়ত, গুড়ের আড়তের সামনে রাস্তার একটা কল। কলে অনেক লোক একসঙ্গে ঝগড়া-চেঁচামেচি করে জল নেয়। মেয়েমানুষে মেয়েমানুষে মারামারি পর্যন্ত হতে দেখেছিলাম একদিন।

এই রকম করে কেটেছিল সে-বাসায় বছরখানেক, এক আষাঢ় থেকে আর এক আষাঢ় পর্যন্ত।

আষাঢ় মাসেই দেশের বাড়ী থেকে এসেছিলাম। দেশের বাড়ীতে বাঁশবাগানের ধারে ধুতরো ফুলের ঝোপের পাশেই আমি আর কালী দুজনে মিলে একটা কুঁড়ে করেছিলাম। কালীর গায়ে জোর বেশি আমার চেয়ে, সে সকাল থেকে কত বোঝা আসস্যাওড়ার ডাল আর পাতা যে বয়ে এনেছিল! কি চমৎকার কুঁড়ে করেছিলাম দুজনে মিলে, ঠিক যেন সত্যিকার বাড়ী একখানা। কালী তাই বলত। একটা ময়নাকাঁটা গাছের মোটা ডালে সে পাখীর বাসা বেঁধে দিয়েছিল। ও বলত, শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে কিংবা নষ্টচন্দ্রের রাতে রাত-চরা কাঠঠোকরা কিংবা তিওড় পাখী ওখানে ডিম পেড়ে যাবে।

এসব সম্ভব হয়নি আমার দেখে আসা, কারণ আষাঢ় মাসেই গ্রাম থেকে চলে এসে কলকাতার এই খোলার বাড়ীতে উঠেছি।

আমার কেবল মনে হয় দেশের সেই বাঁশবনের ধারের কুঁড়েখানার কথা, কালী আর আমি কত কষ্ট করে সেখানা তৈরি করেছিলাম, ময়না গাছের ডালে বাঁধা সেই পাখীর বাসার কথা—নষ্টচন্দ্রের রাতে কাঠঠোকরা পাখী সেখানে ডিম পেড়েছিল কিনা কে জানে?

কলকাতার এ বাড়ীতে জায়গা বড্ড কম, লোকের ভিড় বেশি। আমি সামনের টিনের বারান্দাতে সারা সকাল বসে বসে দেখি কলে পাড়ার লোক জল নিতে এসেছে, গুড়ের

আড়তের সামনে গুড় নামাচ্ছে গরুর গাড়ী থেকে, বাঁ কোণের একটা দোতলা বাড়ীর জানলা থেকে একটি বৌ আমার মত তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। এই গলি থেকে বার হয়ে বড় রাস্তার মোড়ে একটা হিন্দুস্থানী দোকানদারের ছাতুর দোকান থেকে আমি মাঝে মাঝে ছাতু কিনে আনি। বড় রাস্তায় অনেক গাড়ী-ঘোড়া যায়। আমাদের গ্রামে কখনও একখানা ঘোড়ার গাড়ী দেখি নি, দুচোখ ভরে চেয়ে চেয়ে দেখেও সাধ মেটে না, কিন্তু মা যখন-তখন বড় রাস্তায় যেতে দিতেন না, পাছে গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়ি।

আমাদের বাড়ী থেকে কিছু দূরে গলির ও-মোড়ে কতকগুলো সারবন্দী খোলার বাড়ী, আমাদেরই মত। সেখানে আমি মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই। তাদের বাড়ী-ঘর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কত কি জিনিসপত্র আছে,—আয়না, পুতুল, কাঁচের বাক্স, দেওয়ালে কেমন সব ছবি টাঙানো। এক এক ঘরে এক একজন মেয়েমানুষ থাকে। আমি তাদের সকলের ঘরে যাই, বিকেলের দিকে যাই, সকালেও মাঝে মাঝে যাই।

ওই বাড়ীগুলোর মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার নাম কুসুম। সে আমাকে খুব ভাল-বাসে, আমিও তাকে ভালবাসি। কুসুমের ঘরেই আমি বেশিক্ষণ সময় থাকি। কুসুম আমার সঙ্গে গল্প করে, আমাদের দেশের কথা জিগ্যেস করে। তাদের বাড়ী বর্ধমান বলে কোন্ জায়গা আছে সেখানে ছিল। এখন এই ঘরেই থাকে।

কুসুম বলে—তোমায় বড্ড ভালবাসি, তুমি রোজ আসবে তো?

—আমিও ভালবাসি। রোজ আসিই তো।

—তোমাদের দেশ কোথায়?

—আর্সাসিংড়ি, যশোর জেলা।

—কলকাতায় আগে কখনও আস নি বুঝি?

—না।

বিকেলবেলা কুসুম চমৎকার সাজগোজ করত, কপালে টিপ পরত, মুখে ময়দার মত গুঁড়ো মাখত, চুল বাঁধত—কি চমৎকার মানাত ওকে! কিন্তু এই সময় কুসুম আমাকে তার ঘরে থাকতে দিত না, বলত—তুমি এবার বাড়ী যাও। এবার আমার বাবু আসবে।

প্রথমবার তাকে বলেছিলাম—বাবু কে?

—সে আছে। সে তুমি বুঝবে না। এখন তুমি বাড়ী যাও।

আমার অভিমান হত, বলতাম—আসুক বাবু। আমি থাকব। কি করবে বাবু আমার?

—না না, চলে যাও। তোমার এখন থাকতে নেই। অমন করে না, লক্ষ্মীটি!

—বাবু তোমার কে হয়? ভাই?

—সে তুমি বুঝবে না। এখন যাও দিকি বাড়ী।

আমার বড় কৌতূহল হত, কুসুমের বাবুকে দেখতেই হবে। কেন ও আমাকে বাড়ী যেতে বলে।

একদিন তাকে দেখলাম। লম্বা চুল, বেশ মোটাসোটা লোকটা—হাতে একটা বড় ঠোঙায় এক ঠোঙা কি খাবার। কলকাতার দোকানে খাবার কিনতে গেলে ঐরকম পাতার ঠোঙায় খাবার দেয়। আমাদের দেশে ও পাতা নেই; সেখানে হরি ময়রার দোকানে মুড়কি কি জিলিপি কিনলে পদ্মপাতায় জড়িয়ে দেয়।

কুসুম ঠোঙা খুলে আগে আমার হাতে একখানা বড় কচুরি দিয়ে বলল—এই নাও, খেতে খেতে বাড়ী যাও।

এক কামড় দিয়ে আমার ভারি ভাল লাগল। এমন কচুরি কখনও খাই নি। আমাদের গ্রামের হরি ময়রা যে কচুরি করে, সে তেলে-ভাজা কচুরি, এমন চমৎকার খেতে নয়।

উচ্ছ্বসিত সুরে বললাম—বাঃ! কিসের গন্ধ আবার!

কুসুম বললে—হিঙের কচুরি, হিঙের গন্ধ। ওকে বলে হিঙের কচুরি—এইবার বাড়ী যাও।

কুসুমের বাবু বললে—কে?

—কলের সামনের বাড়ীর ভাড়াটেদের ছেলে। বামুন।

কুসুমের বাবু আমার দিকে ফিরে বললেন—যাও খোকা. এইবার বাড়ী যাও।

একবার ভাবলাম বলি, আমি থাকি না কেন, থাকলে দোষ কি? কিন্তু কুসুমের বাবুর দিকে চেয়ে সে কথা বলতে আমার সাহসে কুলোল না। লোকটা যেন রাগী মত, হয়তো এক ঘা মেরেও বসতে পারে। কিন্তু সেই থেকে হিঙের কচুরির লোভে আমি রোজ বাঁধা নিয়মে কুসুমের বাবু আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। আর রোজই সকলের আগে কুসুমে আমার হাতে দুখানা কচুরি তুলে দিয়ে বলবে—যাও খোকা, এইবার খেতে খেতে বাড়ী চলে যাও।

কুসুমের বাবু বলত—আহা, ভুলে গেলাম। ওর জন্যে খাস্তা গজা দুখানা আনব ভেবেছিলাম কাল। দাঁড়াও, কাল ঠিক আনব।

আমার ভয় কেটে গেল। বললাম—এনো ঠিক কাল?

কুসুমের বাবু হি হি করে হেসে বললে—আনব আনব।

কুসুম বললে—এখন বাড়ী যাও খোকা—

—আমি এখন যাব না। থাকি না কেন?

কুসুমের বাবু আমার এই কথার উত্তরে কি একটা কথা বললে, আমি তার মানে ভাল বুঝতে পারলাম না। কুসুম ওর দিকে চেয়ে রাগের সুরে বলল—যাও, ওকি কথা ছেলে-মানুষের সঙ্গে!

বাড়ী গিয়ে মাকে বললাম—মা, তুমি হিঙের কচুরি খাও নি?

—কেন?

—আমি খেয়েছি। এত বড়, হিঙের গন্ধ কেমন।

—কোথায় পেলি?

—কুসুমের বাবু এনেছিল, আমায় দিয়েছিল।

—পাজি ছেলে, ওখানে যেতে বারণ করেছি না। ওখানে যাবে না।

—কেন?

—কেন কথার উত্তর নেই। ওখানে যেতে নেই। ওরা ভাল লোক না।

—না মা, কুসুম বেশ লোক। আমাকে বড্ড ভালবাসে। হিঙের কচুরি রোজ দেয়।

—আবার বলে হিঙের কচুরি! বাড়ীতে পাও না কিছু? খবরদার, ওখানে যাবে না বলে দিচ্ছি।

কুসুমের বাড়ী এর পরে আর দিন-দুই আদৌ গেলাম না। কিন্তু থাকতে পারি নে না গিয়ে। আবার মাকে লুকিয়ে গেলাম একদিন। কুসুম বললে—তুমি আস নি যে?

—মা বারণ করে।

—তবে তুমি এসো না। মা আবার বকবে।

—আসি নি তো দুদিন।

—এলে যে আবার?

—তোমায় ভালবাসি তাই এলাম।

—ওরে আমার সোনা! তুমি না এলে আমারও ভাল লাগে না। তুমি না এলে তোমার জন্যে মন কেমন করে।

—আমারও।

—কি করব, তেমন কপাল করি নি। তোমার মা তোমায় পাছে বকেন তাই ভাবছি।

—মাকে বলব না। আমার মন কেমন করে না এলে। আমি এখন যাই।

—সন্দের সময় এসো।

—ঠিক আসব।

কুসুমের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সন্ধ্যের সময় যাই। কুসুমের বাবু এসে আমায় দেখে বললে—এই যে ছোকরা। ক-দিন দেখি নি কেন? সেদিন তোমার জন্যে খাস্তা গজা নিয়ে এলাম, তা তোমার অদৃষ্টে নেই। দাও গো ওকে দুখানা কচুরি।

—গজা এনো কাল।

—আনব গো বামুন ঠাকুর, ফলারে বামুন! কাল অমৃতি জিলিপি আনব। খেয়েছ অমৃতি?

—না।

—কাল আনব, এসো অবিশ্যি।

—কাউকে ব'লো না কিন্তু। মা শুনলে আসতে দেবে না।

—তোমার মা বকেন বুঝি এখানে এলে?

—হুঁ।

কুসুম তাড়াতাড়ি বললে, আরে ওর কথা বাদ দাও। ছেলেমানুষ পাগল, ওর কথার মানে আছে! তুমি বাড়ী যাও আজ খোকা। এই নাও কচুরি। খেতে খেতে যাও।

—না, এখানে খেয়ে জল খেয়ে যাই, মা টের পাবে।

—এখানে তোমাকে জল দেব না। রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে যেও।

কুসুমের বাবু বললে—কেন, ওকে জল দেবে না কেন? কি হবে দিলে?

কুসুম ঝাঁজের সুরে বললে—তুমি থাম। বামুনের ছেলেকে হাতে করে জল দিতে পারব নি। এই জন্মের এই শাস্তি। খাবার দিই হাতে করে তাই যথেষ্ট।

আমার মনে মনে বড় অভিমান হল কুসুমের ওপর। কেন, আমি এতই কি খারাপ যে আমায় হাতে করে জল দেওয়া যায় না? চলে আসবার সময় কুসুম বার বার বললে—কাল সকালে কিন্তু ঠিক এসো। কেমন?

আমি কথা বললাম না।

পরদিন সকালে গিয়ে দেখি কুসুম বসে সজনের ডাঁটা কুটছে। আমায় বললে—এস খোকা।

—তোমার সঙ্গে আড়ি।

—ওমা সে কি কথা! কি করলাম আমি?

—তুমি যে বললে জল দেওয়া যায় না আমাকে। জল খেতে দিলে না কাল।

—এই? বস বস খোকা। সে তুমি বুঝবে না। তুমি বামুন, তোমাকে জল আমরা দিতে পারি নে। বুঝলে? কুলের আচার করছি, খাবে? এখনও হয় নি। সবে কুল গুড় দিয়ে মেখেছি—

এইভাবে কুসুমের সঙ্গে আবার ভাব হয়ে গেল। কুলের আচার হাতে পড়তেই আমি রাগ অভিমান সব ভুলে গেলাম। দুজনে অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। তার পর আমি উঠে মাখনের ঘরে যাই। মাখন কুসুমের পাশের ঘরে থাকে। ওর ঘরটি যে কত রকমের পুতুল দিয়ে সাজানো! একটা কাঠের তাকে মাটির আতা, আম, লিচু, কত রকমের আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস। অবিকল আতা। অবিকল আম।

মাখন বললে—এস খোকা। ও সব মাটির জিনিসে হাত দিও না। বসো এখানে এসে। ভেঙে যাবে।

—আচ্ছা, তুমি তামাক খাও কেন?

মাখন হাসিমুখে বললে—শোন কথা। তামাক খায় না লোক?

—মেয়েমানুষে খায় বুঝি? কই আমার মা তো খায় না। বাবা খায়।

—শোন কথা। যে খায় সে খায়।

—কুসুমের বাবু আমায় খাস্তা গজা দেবে।

—বটে? বেশ বেশ।

—তোমার বাবু কোথায়?

মাখন মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

—হি হি—শোন কথা ছেলের, কি যে বলে! হি হি—ও কুসুমি, শুনে যা কি বলে তোর ছেলে—

মাখনের বয়স কুসুমের চেয়ে বেশী বলে আমার মনে হত। কুসুম সব চেয়ে দেখতে সুন্দর। মাখনকে দিদি বলে ডাকত কুসুম।

কুসুম এসে হাত ধরে আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গেল। কুসুম আমায় বারণ করেছিল আর কারও ঘরে যেতে। আমি প্রকৃতপক্ষে যেতাম খাবার লোভে। কিন্তু অন্য মেয়েদের ঘরের বাবু কখন আসত কি জানি। সুতরাং সে বিষয়ে আমায় হতাশ হতে হয়েছিল।

কুসুম আমায় ঘরে নিয়ে গিয়ে বকলে। বললে—অত শত কথায় তোমার দরকার কি শুনি? তুমি ছেলেমানুষ, কোন ঘরে যেতে পারবে না, বসো এখানে।

—আমি প্রভার কাছে যাব—

—কেন, সেখানে কেন? যা তা বলবে সেখানে গিয়ে আবার? বোকা ছেলে। খাওয়ার লোভ, না? এই তো দিলাম কুলচুর।

আমি আশ্চর্য হওয়ার সুরে বললাম—আমি চেয়ে খাই নি। প্রভাকে জিজ্ঞেস করো।

—বেশ, দরকার নেই প্রভার কাছে গিয়ে।

—একটিবার যাব? যাব আর আসব।

সত্যি বলছি প্রভার ঘরে যাওয়ার কারণ ততটা লোভ নয়, যতটা একটা টিয়া পাখী।

টিয়া পাখীটা বলে—রাম, রাম, কে এলে? দূর ব্যাটা, কাকীমা, কাকীমা। আমি ঢুকে দাঁড়ালেই বলে—কে এলে?

—আমার নাম বাসুদেব।

—কে এলে? কে এলে?

আমি হেসে উঠলাম। ভারি মজা লাগে ওর বুলি শুনতে। অবিকল মানুষের গলার মত কথা—কে এলে? কে এলে?

প্রভা বাইরে থেকে বললে—কে ঘরের মধ্যে?

ও রান্নাঘরে রাঁধছিল। খুন্তি হাতে ছুটে এসেছে। খুন্তিতে ডাল লেগে রয়েছে। আমি হেসে বললাম—মারবে নাকি?

—ও! পাগলা ঠাকুর। তাই বল। আমি বলি কে এল দুপুরবেলা ঘরে।

—তোমার ঘরে কুলচুর নেই? কুসুম আমায় কুলচুর দিয়েছে—খুব ভাল কুলচুর।

—কুসুমের বড়নোক বাবু আছে। আমার তো তা নেই? কোথা থেকে কুলচুর আমচুর করব।

—কুসুমের বাবু আমায় গজা দেবে।

—কেন দেবে না? মোড়ের অত বড় দোকানখানা কুসুমের পায়ে সঁপে দিয়ে বসেছে, ওখানকার কথা ছেড়ে দ্যাও। বলে—মানিনী, তোর মানের বালাই নিয়ে মরি—

ভয়ে ভয়ে বললাম—প্রভা, রাগ ক'রো না আমার ওপর।

—না না, রাগ করব কেন। দুঃখের কথা বলছি। আমিও একপুরুষ বেশ্যে। আমরা উড়ে আসি নি। পনেরো বছর বয়সে কপাল পুড়লে ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম।

—কেন ঘর থেকে বেরিয়েছিলে?

—সে সব দুঃখের কথা তোমার সঙ্গে বলে কি হবে। তুমি কি বুঝবে। বসো, আমার ডাল পুড়ে গেল। গল্প করলে পেট ভরবে না।

—আমি যাই?

—এস রান্নাঘরে।

প্রভার রং কালো, খুব মোটাসোটা, নাকের ওপর কালো ভোমরার মত একটা আঁচিল। প্রভা একদিন আমাকে গরম জিলিপি আর মুড়ি খেতে দিয়েছিল। ওর ঘরে এত জিনিস-পত্তর নেই, ওই খাঁচায় পোষা টিয়া-পাখীটা ছাড়া।

প্রভা রান্না করছে চালতের অম্বল। একটা পাথর বাটিতে চালতে ভেজানো। চালতে অনেকদিন খাই নি, দেশ থেকে এসে পর্যন্ত নয়। সেখানে আমাদের মাঠে তালপুকুরের ধারে বড় গাছে কত চালতে পেকে আছে এ সময়।

বললাম—চালতে পেলে কোথায় প্রভা?

—বাজারে, আবার কোথায়?

—বেশ চালতে।

প্রভা আর কিছু বললে না। নিজের মনে রাঁধতে লাগল।

আমি বললাম—তোমার বাবা মা কোথায়?

—পাপমুখে সে সব কথা আর কি বলি।

—বাড়ী যাবে না?

—কোন্ বাড়ী?

—তোমাদের দেশের বাড়ী।

—যমের বাড়ী যাব একেবারে।

—তোমাদের দেশের বাড়ীতে কুল আছে? আমাদের গাঁয়ে কত কুলের গাছ!

প্রভা এ কথার কোন উত্তর দিলে না। আবার নিজের মনে রাঁধতে লাগল। খানিক পরে সে একটা ঘটি উনুনের মুখে বসিয়ে চা তৈরি করে গ্লাসে আঁচল জড়িয়ে চুমুক দিয়ে চা খেতে লাগল। আমায় একবার বললেও না আমি চা খাব কি না। অবিশ্যি আমি চা খাই নে, চায়ের সর খাই। মা আমায় চা খেতে দেয় না। চায়ের মধ্যে যে দুধের সর ভাসে, মা তাই আমাকে তুলে দেয়।

প্রভা গল্প করতে লাগল ওদের দেশের বাড়ীতে কত গরু ছিল, কতখানি দুধ ওরা খেত, ওদের বাড়ীর ধারে ওদের নিজেদের পুকুরে কত মাছ ছিল। আর সে সব দেখতে পাবে না ও।

হঠাৎ প্রভা একটা আশ্চর্য কাণ্ড করে বসল। বললে—অম্বল দিয়ে দুটো ভাত খাবে?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—খাব। কুসুম টের না পায়।

প্রভা হেসে বললে—কুসুমের অত ভয় কিসের? টের পায় তো কি হবে? তুমি খাও বসে।

আমি সবে চালতের অম্বল দিয়ে ভাত মেখেছি, এমন সময় কুসুমের গলার শব্দ শোনা গেল—ও প্রভাদি, বামুনদের সেই খোকা তোর এখানে আছে? ওকে বাড়ী পাঠিয়ে দিই, কতক্ষণ এসেছে পরের ছেলে।

আমি এঁটো হাতে দৌড়ে উঠে রান্নাঘরের কোণে লুকিয়ে রইলাম। প্রভা কিছু বলবার আগে কুসুম ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে দেখতে পেল। বললে, ওকি? কোণে দাঁড়িয়ে কেন? লুকনো হল বুঝি? এ ভাত মেখেছে কে অম্বল দিয়ে? অ্যাঁ—

প্রভার দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে বললে—আচ্ছা প্রভাদি, ও না হয় ছেলেমানুষ, পাগল। তোমারও কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গেল? কি বলে তুমি ওকে ভাত দিয়েছ খেতে?

প্রভা অপ্রতিভ হয়ে বললে—কেবল চালতে চালতে করছিল, তাই ভাবলাম অম্বল দিয়ে দুটো ভাত—

—না, ছিঃ! চল আমার সঙ্গে খোকা। এ জন্মের এই শাস্তি আমাদের, আবার তা বাড়াব বামুনের ছেলেকে ভাত দিয়ে? চল—হাতে এঁটো নাকি? খেয়েছ বুঝি?

আমি সলজ্জ সুরে বললাম—না।

—চল হাত ধুইয়ে দিই—

কুসুম এসে আমার হাত ধরে বাইরের দিকে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে প্রভা বললে—আহা, মুখের ভাত কটা খেতে দিলি নি ওকে। সবে অম্বল দিয়ে দুটো মেখেছিল—

—না, আর খেতে হবে না। চল।

মায়ের শাসনের চেয়েও যেন কুসুমের শাসন বেশি হয়ে গেল। মুখের ভাত ফেলেই চলে আসতে হল। উঠোনের এক পাশে নিয়ে গিয়ে আমার হাত ধুইয়ে দিতে দিতে বললে—তোমার অত খাই-খাই বাই কেন খোকা? ওদের ঘরে ভাত খেতে নেই সে কথা মনে নেই তোমার? ছিঃ ছিঃ! ওবেলা কচুরি দেব এখন খেতে। আর কক্খনো অমন খেও না। তাও বলি, এই না হয় ছেলেমানুষ—তুমি বুড়ো ধাড়ি, তুমি কি বলে বামুনের ছেলের পাতে—ছিঃ ছিঃ, লোকেরও বলিহারি যাই—

বলা বাহুল্য প্রভা এসব কথা শুনতে পায় নি, সে এদিকেও ছিল না।

বললাম—মাকে যেন বলে দিও না।

—হ্যাঁ আমি যাই তোমার মাকে বলতে! আমার তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।

—বললে মা মারবে কিন্তু।

—মার খাওয়াই ভাল তোমার! তোমার নোলা জব্দ হয় তাহলে।

বাড়ী ফিরতেই মা বললেন—কোথায় ছিলি?

—ওই মোড়ে।

—আর কোথাও যাস নি তো?
—না।

একদিন কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। সেদিন দোষটা ছিল কুসুমেরই। সে আমাকে বললে—চল খোকা, বেড়াতে যাই। যাবে?

বিকেলবেলা। রোদ বেশি নেই। ট্রাম লাইনের ওপারে যেতে দেখে আমি সভয়ে বললাম—মা বড় রাস্তা পার হতে দেয় না। বারণ করেছে।

—চল আমি সঙ্গে আছি, ভয় নেই।

বড় রাস্তা পার হয়ে আর কিছু দূরে একটা খোলার বস্তির মধ্যে আমরা ঢুকলাম। একটা সরু গলির দুধারে ঘরগুলো। যে বাড়ীতে আমরা ঢুকলাম, সেখানেও সবাই মেয়েমানুষ, পুরুষ কেউ নেই। একজন মেয়ে বললে—আয় লো কুস্‌মি কতকাল পরে—বাব্বা, আমাদেরও কি আর নাগর নেই? তা বলে কি অমন করে ভুলে থাকতে হয় ভাই?

আমার দিকে চেয়ে বললে—এ খোকা আবার কে? বেশ সুন্দর দেখতে তো।

—বামুনদের ছেলে। আমাদের গলিতে থাকে। আমার বড্ড ন্যাওটা।

—বাঃ—বসো খোকা, বসো।

—ও ছেলের শুধু ভাই খাই-খাই। খেতে দ্যাও খুব খুশী।

—তাই তো, কি খেতে দিই। ঘরে কুলের আচার আছে, দেব?

আমি অমনি কিছুমাত্র না ভেবেই বলে উঠলাম—কুলের আচার বড্ড ভালবাসি।

কুসুম মুখঝামটা দিয়ে বললে—তুমি কী না ভালবাস। খাবার জিনিস হলেই হল। না ভাই, ওর সর্দিকাসি হয়েছে। ও ওসব খাবে না। থাক।

আমার মনে ভয়ানক দুঃখ হল। কুসুম খেতে দিলে না কুলচুর। কখন হল আমার সর্দিকাসি? কুলচুর আমি কত ভালবাসি।

খানিকটা সে-ঘরে বসবার পরে আমরা অন্য একটা ঘরে গেলাম। তারাও আমাকে দেখে নানা কথা জিগ্যেস করতে লাগল। বাড়ীর তৈরী সুজি খেতে দিলে একখানা রেকাবি করে। তাও কুসুম আমায় খেতে দিলে না। আমার নাকি পেটের অসুখ।

সন্ধ্যের খানিকটা আগে আমাকে নিয়ে কুসুম বড় রাস্তার ট্রাম লাইন পার হয়ে এপারে এল। একখানা ট্রাম আসছিল। আমি বললাম—কুসুম, দাঁড়াও—ট্রাম দেখব।

—সন্দে হয়েছে। তোমার মা বকবে।

—বকুক।

—ইস্! ছেলের যে ভারি বিদ্ধি!

—আচ্ছা কুসুম, তুমি ওকথা বললে কেন? আমায় কুলচুর খেতে দিলে না। ওরা তো দিচ্ছিল।

—তুমি ছেলেমানুষ কি বোঝ। কার মধ্যে কি খারাপ রোগ আছে ওসব পাড়ায়। তোমায় আমি যার তার হাতে খেতে দেব। যার তার ঘরের জিনিস মুখে করলেই হল! তোমার কি। কার মধ্যে কি রোগ আছে তুমি তা জান?

—আচ্ছা কুসুম, 'নাগর' মানে কি?

—কিছু না। কোথায় পেলে এ কথা?

—ওই যে ওরা তোমায় বলছিল?

—বলুক। ও সব কথায় তোমার দরকার কি। পাজী ছেলে কোথাকার!

কুসুম আমায় বাড়ীর পথে এগিয়ে দেবার আগে বললে—চল, কচুরি এতক্ষণ এনেছে ও। তোমায় দিই।

—দাও। আমার খিদে পেয়েছে।

—কোন সময়ে তোমার পেটে খিদে থাকে না বলতে পার? তোমার মাকে যদি সামনা-সামনি পাই তো জিগ্যেস করি, ছেলের অত নোলা কেন।

—নোলা আছে তো বেশ হয়েছে। কচুরি দেবে তো?

—চল।

—গজা এনেছে?

—তা আমি জানি নে।

—গজা কাল দেবে?

—গলির রাস্তাটা কি নোংরা! বাবা রে বাবাঃ!

—গজা দেবে তো?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ! এখন কচুরি নিয়ে তো রেহাই দাও আমায়।

সে রাত্রে কুসুম আমায় আমাদের কলটার কাছে এগিয়ে দিয়ে চলে গেল। মার কাছে সত্যি কথা বললাম। কুসুমের বাড়ী গিয়েছিলাম, কুসুম কচুরি খেতে দিয়েছে। মা খুব বকলেন। কাল থেকে আমায় বেঁধে রাখবেন বললেন। বাবাকেও রাত্রে বলে দিলেন বটে, তবে বাবা সে কথায় খুব যে বেশি কান দিলেন এমন মনে হল না।

পরদিন সকালের দিকে আমার জ্বর এল। চার-পাঁচ দিন একেবারে শয্যাগত। একজন বুড়ো ডাক্তার এসে দেখে-শুনে ওষুধ দিয়ে গেল।

জানলার ধারেই আমাদের তক্তপোশ পাতা। একদিন বিকেলে দেখি রাস্তার ওপর কুসুম দাঁড়িয়ে আমাদের ঘরের উল্টো দিকের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর সঙ্গে মাখন। মাখন এগিয়ে গিয়ে আরও দুখানা বাড়ীর পরে একখানা বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে।

আমি ডাকলাম—ও কুসুম—

কুসুম পেছনে ফিরে আমায় দেখতে পেল। মাখনকে ডেকে বললে—দিদি, এই বাড়ী—এই যে—

মা কলতলায়। কুসুম ও মাখন এসে জানলার ধারে দাঁড়াল।

কুসুম বললে—কি হয়েছে তোমার? যাও না কেন?

মাখন বললে—কুস্মি ভেবে মরছে। বলে, বামুন খোকার কি হল। আমি তাই বললাম, চল দেখে আসি।

বললাম—আমার জ্বর আজ পাঁচ দিন।

কুসুম বললে—তোমার মা কোথায়?

—কুসুম, তুমি চলে যাও। মা দেখতে পেলে আমায় আর তোমাদের ঘরে যেতে দেবে না। আমি সেরে উঠেই যাব। চলে যাও তোমরা।

ওরা চলে গেল। কিন্তু পরদিন বিকেলে আবার কুসুম এসে রাস্তার ওপর দাঁড়াল। নিচু সুরে বললে—যাব?

মা ঘরে নেই। বদ্যিনাথদের ঘরে ডাল মেপে নিতে গিয়েছে আমি জানি। এই গেল একটু আগে। আমায় বলে গেল—ছোট খোকার দুধটা দেখিস তো যেন বেড়ালে খায় না, আমি বদ্যিনাথদের ঘর থেকে ডাল নিয়ে আসি।

হাত দেখিয়ে বললাম—এস।

ও জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে বললে—কেমন আছ?

—ভাল। কাল ভাত খাব।

—দুটো কমলানেবু এনেছিলাম। দেব?

—দাও তাড়াতাড়ি।

—খেও।

—হ্যাঁ।

—অসুখ সারলে যেও—

—যাব।

—কাল ভাত খাবে?

—বাবা বলেছে কাল ভাত খাব।

—কাল আবার আসব। কেমন তো?

—এসো। আমি না বললে জানলার কাছে এসো না।

—তাই করব। আমি রাস্তায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব। শিস্ দিতে পার?

—উঁহু! আমি হাত দেখালে এসো।

পরের দুদিন কুসুম ঠিক আসত বিকেলবেলা। একদিন প্রভা দেখতে চেয়েছিল বলে ওকেও সঙ্গে করে এনেছিল। প্রভাও দুটো কমলালেবু দিয়েছিল আমায়, মিথ্যে কথা বলব না। বালিশের তলায় লেবু লুকিয়ে রেখে দিতাম, মা ঘরে না থাকলে খেয়ে ছিবড়ে ফেলে দিতাম রাস্তার ওপর ছুঁড়ে।

সেরে উঠে দুদিন কুসুমের বাড়ী গিয়েছিলাম।

তার পরেই এক ব্যাপার ঘটল। তাতে আমাদের কলকাতার বাসা উঠে গেল, আমরা আবার চলে এলাম আমাদের দেশের বাড়ীতে। মা একদিন সোডাওয়াটার-এর বোতল খুলতে গিয়ে হাতে কাঁচ ফুটিয়ে ফেললে। সে এক রক্তারক্তি কান্ড। হাতের কব্জি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। বাসার সব লোক ছুটে এল বিভিন্ন ঘর থেকে। কোণের ঘরের বিপিনবাবু এসে মার হাতে কি একটা ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিলে। কিন্তু মায়ের হাত সারল না। ক্রমে হাতের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠল। মা আর রান্না করতে পারেন না, যন্ত্রণায় কাঁদেন রাত্রে। ডাক্তার এসে দেখতে লাগল। আমার মামার বাড়ীর অবস্থা ভাল। চিঠি পেয়ে মেজমামা এসে আমাদের সকলকে নিয়ে চলে গেলেন মামার বাড়ীতে।

আষাঢ় মাসের শেষ। তাল দু-একটা পাকতে শুরু হয়েছে। মামার বাড়ীর গ্রামে মস্ত বড় একটা পুকুর আছে মাঠের ধারে, তার পাড়ে অনেক তালগাছ। আমি বেড়াতে গিয়ে প্রথম দিনই একটা পাকা তাল কুড়িয়ে পেলাম মনে আছে।

মার হাত সেরে গেল মামার বাড়ী এসে। ভাদ্র মাসের শেষে আমরা দেশের বাড়ীতে চলে এলাম। কলকাতা আর যাওয়া হল না। বাবাও সেখানকার বাসা উঠিয়ে দেশে চলে এলেন।

সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পরের কথা।

কলকাতায় মেসে থাকি, আপিসে কেরানীগিরি করি, দেশের বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্র থাকে। আমার পুরনো কলেজ-আমলের বন্ধু শ্রীপতির সঙ্গে বসে ছুটির দিনটা কি গল্প করতে করতে শ্রীপতি বললে—কাল ভাই সন্ধ্যের পর প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট দিয়ে আসতে আসতে —দুধারে মুখে রং—হরিবল্!

—আমিও দেখেছি। ঐ পথ দিয়েই তো আসি। আমি কিন্তু ওদের অন্য চোখে দেখি। ওদের আমি খুব চিনি। ওদের ঘরে এক সময়ে আমার যথেষ্ট যাতায়াত ছিল।

আমার বন্ধু আশ্চর্য হয়ে বললে—তোমার!

—হ্যাঁ ভাই, আমার। মাইরি বলছি।

—যাঃ, বিশ্বাস হয় না।

—আচ্ছা, চল আমার সঙ্গে এক জায়গায়। প্রমাণ করে দেব।

বছর পনেরো আগে একবার নন্দরাম সেনের গলি খুঁজে বার করে মাখনের বাড়ী যাই। কুসুম, প্রভা—কেউ ছিল না। ওই দলের মধ্যে মাখনই একমাত্র সে খোলার বাড়ীতে ছিল তখনও।

শ্রীপতিকে নিয়ে আমি চলে গেলাম নন্দরাম সেনের গলিতে। মাখন এখনও সেই বাড়ীতেই আছে। একেবারে শনের নুড়ি চুল মাথায়, যক্খি বুড়ির মত চেহারা। একটি দাঁত নেই মাড়িতে।

আমি যেতে মাখন বললে—এস এস! ভাল আছ?

—চিনতে পার?

—ওমা, তোমায় আর চিনতে পারব না! আমাদের চোখের সামনে মানুষ হলে। ভাল কথা, কুসুমের খোঁজ পেইছি।

—কোথায়? কোথায়?

—শোভাবাজার স্ট্রীটে একটা মেস-বাড়ীতে ঝি-গিরি করে। ঢুকেই বাঁ-হাতি।

মন্দিরের পাশের ভাঙা দোতলা। আমায় সেদিন নিয়ে গিয়েছিল মন্দিরে নীলের পুজো দিতে। তাই আমায় দেখালে।

শ্রীপতিকে নিয়ে সে মেস-বাড়ী খুঁজে বার করলাম। সন্ধ্যে তখনও হয় নি, নীচে রান্নাঘরে ঠাকুরকে বললাম—তোমাদের ঝি কোথায় গেল?

—বাজারে গিয়েছে বাবু। এখুনি আসবে। কেন?

—দরকার আছে। তার নাম কুসুম তো?

—হ্যাঁ বাবু।

একটু পরে একজন লম্বা রোগা ঝি-শ্রেণীর মেয়ে-মানুষ সদর দরজা দিয়ে ঢুকে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঠাকুর বললে—ও কুসুম, এই বাবুরা তোমায় খুঁজছেন।

আমি ঝিএর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। বাল্যদিনের সেই সুন্দরী কুসুম এই! মাখনের মত অত বুড়ি না হলেও—কুসুমও বুড়ি। বুড়ি ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যাবে না। ওর মুখ আমার মনে ছিল, সে মুখের সঙ্গে এ বৃদ্ধার মুখের কিছুই মিল নেই। ঠাকুর না বলে দিলে একে সেই কুসুম বলে চেনবার কিছু উপায় ছিল না।

কুসুমও আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে—আমায় খুঁজছেন আপনারা? কোত্থেকে আসছেন?

—মাখনের কাছ থেকে।

—কোন্ মাখন?

—নন্দরাম সেনের গলির মাখন বাড়ীউলি।

—ও! তা আমায় খুঁজছেন কেন?

—চল ওদিকে। কথা আছে।

—চলুন খাবার ঘরে বসবেন।

খাবার ঘরে গিয়ে বসলাম—কুসুম, আমায় চিনতে পার?

—না বাবু।

—নন্দরাম সেনের গলিতে আমাদের বাসা ছিল। আমি তখন আট বছরের ছেলে। আমার বাবা-মা ছিলেন ঈশ্বর নাপিতদের বাড়ীর ভাড়াটে। মনে হয়?

কুসুম হেসে বললে—মনে হয় বাবু। তুমি সেই পাগলা ঠাকুর? কত বড় হয়ে গিয়েছ। বাবা মা আছেন?

—কেউ নেই!

—ছেলেপুলে কটি?

—চার পাঁচটি।

—বসো বসো, বাবা।

আরও অনেক কথাবার্তার পরে কুসুম আমাদের বসিয়ে বাইরে কোথায় চলে গেল। খানিক পরে চট করে কোথা থেকে একটা শালপাতার ঠোঙায় খাবার এনে দুখানা থালাতে আমাদের দুজনকে খেতে দিলে।

আমারও মনে ছিল না। খেতে গিয়ে মনে হল। বড় বড় হিঙের কচুরি চারখানা। তখুনি মনে পড়ে গেল কুসুমের সেই বাবুর কথা, সেই হিঙের কচুরির কথা। মনে এল ত্রিশ বছর পরে আবার সেই লোভী ছেলেটির ছবি ও তার কচুরিপ্রীতি। কুসুমের নিশ্চয় মনে ছিল। কিংবা ছিল না—তা জানি নে। কচুরি খেতে খেতে আমার মন সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ধূসর ব্যবধানের ওপারে আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে একেবারে নন্দরাম সেনের গলির সেই অধুনালুপ্ত গুড়ের আড়তটা ও রাস্তার কলটার সামনে, যেখানে কুসুম আজও পঁচিশ বছরের যুবতী, যেখানে তার বাবু আজও সন্ধ্যেবেলায় ঠোঙা হাতে হিঙের কচুরি নিয়ে আসে নিয়মমত।

দুই দিন

১২৮৫ সাল। সতেরোই শ্রাবণ।

ভাবনাহাটি গ্রামের রামচন্দ্র রায়ের ছেলে পরমেশচন্দ্র রায় আজ বিয়ে করে বৌ নিয়ে আসবে বলে রামচন্দ্র রায়ের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে কয়েকজন লোক জমেছে। রামচন্দ্র রায় ছেলের বিয়েতে যেতে পারেন নি, আনন্দনাড়ু ভাজার দিন তেল জ্বলে উঠে হঠাৎ রান্নাঘরের চালে আগুন ধরে যায়। আগুন নেবাতে গিয়ে রামচন্দ্র রায়ের দুই হাত পুড়ে ঘা হয়েছে করতালুতে। সেজন্যে তিনি ছেলের বিয়েতে যান নি, বরকর্তা করে পাঠিয়েছিলেন ভায়রা-ভাই তেবরের গোপেশ্বর চক্রবর্তীকে।

রামচন্দ্র রায়ের অবস্থা ভাল নয়। দুখানা মাত্র দু-চালা ঘর। কয়েক বিঘে ধানের জমি। বাড়ীর পেছনে একটা খালের এক চতুর্থাংশের মালিকানা স্বত্ব আছে, তাতে বছরে ত্রিশ-চল্লিশ মণ মাছ পান। এর দাম দশ টাকা হিসাবে মণ ধরলে তিন চার শ টাকা। এ ছাড়া অন্য কোন আয় নেই। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে এক রকম সংসার চলে যায়।

রামচন্দ্র রায়ের ছেলে পরমেশের বয়স তেইশ বছর। ছাত্রবৃত্তি পাশ করে স্থানীয় জমিদারী কাছারিতে মুহুরিগিরি কাজে ঢুকেছে। মাসিক বেতন ছ টাকা।

ইতিমধ্যে সে গ্রামের সমবয়সীদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছে।

তাদের বাপ-মা তাদের বলে, সোনার চাঁদ ছেলে দেখ গে যা রামু রায়ের ছেলে পরমেশ। ছাত্রবৃত্তি পাশ করলে দিব্যি—আবার ছ টাকা মাইনেতে মুহুরিগিরিতে ঢুকেছে। ওর উন্নতি ঠেকায় কেডা? তোরা শুধু বাড়ী বসে খাবি আর পাশা খেলবি চণ্ডীমণ্ডপে বসে।

ছ টাকা মাইনে পাওয়ার কথাটা একটু রটে গেল চারিধারে। ফলে ছেলের বিবাহের জন্যে নানা গ্রাম থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগল। রামচন্দ্র রায়ের স্ত্রী ধরে বসলেন আঁকড়ে এক কথা—এক শ এক টাকা বরপণ দিতেই হবে। দশ ভরি সোনা। তা ছাড়া দানসামগ্রী, বরের গরদ আলাদা।

অনেকে বললে, বাপ রে, কি দেখে অত টাকা বরপণ দিতে যাবে লোকে? এক শ টাকা বরপণ কারা পায়? যাদের ভাল জমিজমা আছে। তোমার কি আছে বাপু? ছেলে অবিশ্যি স্বীকার করি অল্প বয়সে চাকরিটা পেয়েছে ভালই। কিন্তু ঐ যা ছেলে দেখেই দেওয়া। কম চাওয়া তো নয়। দশ ভরি সোনার দামই ধর আঠার টাকা ভরি হিসাবে এক শ আশি টাকা। না না, ও চলে না।

আবার অনেকে বলে, চাওয়ার দিন এসেছে তাই চায়। কই, তুমি আমি তো চাইতে সাহসও করি নে। হীরের টুকরো ছেলে। এই বয়সে উন্নতি করেছে কেমন! আট টাকা তো ওর মাইনে হল বলে। ওকে দশ ভরি সোনা দেবে না তো দেবে কাকে?

অনেক মেয়ে দেখা ও উভয় পক্ষের যাতায়াতের পরে অবশেষে গোবরাপুরের তারিণী চক্রবর্তীর বড় মেয়ে পতিতপাবনীকে রামচন্দ্র রায়ের বেশ পছন্দ হল, তাঁরা বরপণ ও দশ ভরি সোনা দিতেও চাইলেন।

আজ সেই কনেকে নিয়ে পরমেশ বাড়ী আসছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে রামচন্দ্র রায়ের বাড়ীতেই কথা উঠেছে—তাই তো, বৌ আসবার আগে নাড়ু ভাজার দিনই ঘরে আগুন লেগে গেল। শ্বশুরের হাত পুড়ে গেল। এ কি অলক্ষুণে বৌ রে বাবা!

রামচন্দ্র রায়ের স্ত্রী স্বামীকে নাড়ু ভাজার দিন শেষরাত্রেই কথাটা বলেছিলেন। তখন শেষরাত্রে দধি-মঙ্গলের শাঁখ বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঝলসানো হাতের যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্বামীকে জাগিয়ে তুলে পরমেশের মা বললেন—ওগো শোন—

—কি গা?

—আমার মনডা ভাল বলছে না। সেই থেকে আমিও ঘুমই নি। আমার কথা শোন, ওখানে ছেলের বিয়ে ভেঙে দ্যাও।

—পাগল! আজই বিয়ে, আজ বিয়ে ভেঙে দেবে?

—খুব দেওয়া যায়। অলক্ষুণে কনে, ঘরে আগুন লাগে ভিটেতে পা দিতে না দিতে?

আমার খোকা বেঁচে থাকুক, তার মুখের দিকে চেয়ে সংসারে সব করতে পারি তো ভারি একটা মেয়ের সংগে সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া যায় না? কাল রাত্রে যারা যারা নাড়ু [illegible] এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই একথা বলেছে—দিগম্বর চাটুজ্যের বৌ, ন খুড়ি, পাড়ার মঙ্গল ঠাকরুন, কাশী চক্কত্তির শাশুড়ি; আমাদের মনমতি, ময়না, এরা ছেলেমানুষ এরাও বলছিল।

রামচন্দ্র রায় একটুখানি ঘাবড়ে গেলেন। ছেলের শুভ বিবাহের দিনটিতে এসব কি বিভ্রাট রে বাবা। বললেন—আচ্ছা, দেখব, সেখানে আগে যাই তো।

—ছেলেকে আমি পাঠাব না কিন্তু।

—তবে দধিমঙ্গলের শাঁখ বাজালে কেন? ওসব লোক-হাসাহাসির মধ্যে আমি নেই। একটা নিরীহ মেয়ের সর্বনাশ করতে আমি পারব না।

—সর্বনাশ কিসে হল?

—ও কথা ব'লো না গিন্নি। পরের দুর্দিনটা নিজের মত দেখতে শেখো। আজ তাঁর মেয়ের বিয়ে, মেয়েরও দধিমঙ্গলের শাঁখ বাজল, কত লোক-কুটুম্ব এসেছে তাঁদের বাড়ী। কি সমাচার, না বর এল না। মেয়ে দো-পড়া হয়ে গেল। কান্নাকাটি উঠল চারিদিকে, রান্নাবান্নার যোগাড় সব নষ্ট। শত্রুরা মুখ টিপে হেসে মুখে আবার গা-ঘেঁষে দুঃখু জানাতে এল। কি দিন ভাব দিকি! ওসব ছেড়ে দ্যাও, পরের মন্দ করতে পারব না; এতে আমাদের ছেলের খারাপ হবে না গিন্নি, ভাল হবে। তুমি ওর মা, তুমি ভাল মনে ওকে আশীর্বাদ কর। তোমার পায়ের ধুলোতে ওর সব মঙ্গল হবে।

পরমেশের মা স্বামীকে মানতেন। স্বামীর কথায় নরম হয়ে গেলেন। উনি যখন বলছেন, তখন কোন ভয় নেই। উনি আমার চেয়ে অনেক বোঝেন। যা ভাল বোঝেন করুন। আমি মেয়েমানুষ, কি বুঝি।

তার পর বেলা হল। বরযাত্রী-ভোজনের যজ্ঞি চড়ে গেল। প্রায় ষাট জন বরযাত্রী হবে। তারা খেয়ে দেয়ে সব রওনা হয়ে চলে গেল, কিন্তু রামচন্দ্র রায় গেলেন না। যেতে পারলেন না। সেই পোড়ার ঘায়ে বড় যন্ত্রণা হতে আরম্ভ করল, একটু জ্বর-মত হল দুপুরের দিকে। তাঁর ভায়রাভাই-এর হাতে বরকর্তার দায়িত্ব তুলে দিয়ে রামচন্দ্র রায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন কোণের ছোট্ট ঘরে।

স্ত্রী সন্ধ্যার পরে ঘরে ঢুকে বললেন—হ্যাঁগা, ঘুমিয়েছ?

—না।

—এ কি হল?

—কি হল?

—তোমার জ্বর, তুমি খোকার বিয়েতে যেতে পারলে না, এ কি কম কষ্ট আমার। ভেবে দ্যাখ, সেই খোকা আমাদের! আমার মন মোটেই ভাল নিচ্ছে না। চোখের জল ফেলছি নে পাছে খোকার অমঙ্গল হয়। কি অলক্ষুণে বৌ আসছে সংসারে যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!

—গিন্নি, আবার সেই কথা? জ্বর মানুষের হয় না? জ্বর হয়েছে বলে একজন নিরীহ মেয়ের উপর রাগ কর কেন, তাকে অলক্ষুণে বলই বা কেন? তার কি দোষ?

—কি খাবে রাত্তিরি? ও বেলা এত যজ্ঞি, তুমি কিছু মুখে দিলে না—

—একটু সাবু করে দি। আর কিছু ভেব না, ভগবানের নাম নিয়ে গিয়ে শুয়ে থাক। যে আসছে, তাকে তুমি আশীর্বাদ কর মন খুলে।

সেই নতুন বৌ নিয়ে পরমেশ এখুনি বাড়ী আসছে। কেন না দূরে ঢোলের শব্দ পাওয়া গেল। গরিবের ঘরের ঠাট বাট, আত্মীয় কুটুম্বিনীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, শাঁখ নিয়ে দোরের বাইরে রাস্তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

পরমেশের মা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন, চোখে তাঁর ঔৎসুক্য, মুখে অনিশ্চয়তার হাসি।

রাস্তার মোড়ে বরকনের পালকি দেখা গেল।

পেছনে বাজনাদার ভক্ত মুচি ও তার দল।

পালকির এ পাশে গোপেশ্বর চক্কত্তি, পাত্রের বড় মেসো।

সকলেই এগিয়ে গেল।

কে একজন চেঁচিয়ে বললে—দুধ-আলতার খোরা ঠিক কর আগে।

গ্রাম্য বৌ-ঝিরা ঘিরে দাঁড়াল। পোঁ পোঁ শাঁখ বেজে উঠল। সুগঠিত-দেহ যুবক পরমেশ রায় পাল্কি থেকে নেমে মার পায়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করলে। মা গিয়ে নববধূকে কোলে করে পাল্কি থেকে নামালেন।

তার পর কৌতূহলচঞ্চল হাতে বধূর ঘোমটা খুলে মুখ দেখলেন, হাতে দিলেন দুগাছা সোনার বালা। তাঁর শাশুড়ি, রামচন্দ্র রায়ের স্বর্গগতা মাতৃদেবী একদিন এই বালা জোড়া দিয়ে তাঁর মুখ দেখেছিলেন এই ভিটেতে পা দেওয়ার দিনে।

পুত্রবধূর মুখ দেখে, খুশী হলেন পরমেশের মা। কাঁটালতলায় বরণের পিঁড়ি পাতা ছিল, পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করে ঘরে তুললেন।

বাঁশবনের মধ্যে বাড়ী।

অনেক রাত্রে লক্ষ্মী-পেঁচা ডাকছে বাঁশবনের মাথায়। ঝিঁঝিঁ ডাকছে বনে। বধূ কি একটা ডাকে ভয় পেয়ে ঘুমের ঘোরে শয্যা-সঙ্গিনী ছোট ননদ হৈমবতীকে জড়িয়ে ধরলে।

—ওকি বৌদি, ভয় কি? ও শেয়াল ডাকছে।

নববধূ ঘুম ভেঙে হেসে ননদের মুখের দিকে ডাগর ডাগর চোখ মেলে চাইলে। কানের মাকড়ি দুটো ঠিক করে নিলে। হৈমবতী হেসে বললে—রও একটা দিন। কালই তো ফুলশয্যে। কাল থেকে দাদার কাছে শোবে, ভয়-ভাবনা কিছুই থাকবে না। ছটফট করে মরছ, আমরা বুঝি নে বুঝি?

নববধূ সলজ্জ কণ্ঠে বললে—ওমা!

ওই দিনটির পরে দীর্ঘ আটষট্টি বছর কেটে গিয়েছে। আজ তের শ তিপ্পান্ন সালের তেরই শ্রাবণ। অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্টেট এন. রায়ের আজ মাতৃশ্রাদ্ধ লোকজনে বাড়ী পরিপূর্ণ।

ভাবনাহাটি গ্রামে এঁদের বড় দোতলা বাড়ী, বৈঠকখানা, পুজোর দালান। এন. রায়ের পিতা ৺পরমেশচন্দ্র রায়ের আমলে দুখানা মাত্র খড়ের চালাঘর ছিল। পরমেশ রায়ের অবস্থা সামান্যই ছিল। স্থানীয় জমিদারী কাছারিতে নায়েবী করে কষ্টেসৃষ্টে দুটি ছেলেকে মানুষ করে গিয়েছিলেন। চারটি মেয়েকেও মোটামুটি পাত্রস্থ করেছিলেন।

বড় ছেলে নৃপেন্দ্রনাথ রায় জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন, আজ সাত আট বছর পেন্‌শন্‌ নিয়েছেন। তাঁর দুই ছেলে, একটি গত মহাযুদ্ধে আই. এম. এস. মেজর ছিল, এখন ভবানীপুরে ডাক্তারি করে। ছোটটি এই বছরে নিজে কনট্রাক্টরির আপিস খুলেছে কলকাতায়। বিগত যুদ্ধে ধানবাদ অঞ্চলে কনট্রাক্টরি করে অনেক টাকা রোজগার করেছে। ভবানীপুরে গোবিন্দ ঘোষাল লেনে সে গত ফাল্গুন মাসে তেতলা প্রকাণ্ড বাড়ী কিনেছে আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে। নৃপেন্দ্রনাথ রায় বকুলবাগানে বাড়ী করেছিলেন—ছোট একতলা বাড়ী বটে, তবে বেশ চওড়া কম্পাউণ্ডওয়ালা ফুলবাগান আছে বাড়ীর সামনে। চাকরি-জীবনের অর্থ দিয়ে বছর ষোল-সতের আগে এই বাড়ীটা তিনি করেছিলেন, এখন ছেলেরা এই বাড়ীতেই থাকে। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কলকাতাতেই। বলা বাহুল্য, সম্পন্ন ঘরেই।

নৃপেনবাবু চাকরি-জীবনের প্রথম দিকে পৈতৃক ভিটেতে এই বড় দোতলা বাড়ী করেন। পুজোর দালানে কয়েক বছর দুর্গোৎসবও করেছিলেন। তখন পরমেশ রায় বেঁচে ছিলেন।

পিতার পরলোকগমনের পর নৃপেনবাবু কয়েক বছর দেশে যাতায়াত করেছিলেন, তার পর আর বড় একটা আসতেন না। মাকে নিয়ে যেতে চাইতেন কর্মস্থানে; বৃদ্ধা বলতেন—না বাবা, আমার কাছে শ্বশুরের এই ভিটেই গয়া কাশী। এ ফেলে কোথাও যাব না। বৌমার শরীর এখানে টেকে না ম্যালেরিয়াতে, বৌমাকে তুমি নিয়ে যাও সঙ্গে।

তখনও পর্যন্ত নৃপেনবাবু স্ত্রীকে বৃদ্ধা মায়ের কাছেই রেখেছিলেন।

ব্যাস, ভাবনহাটির বাস উঠে গেল।

শুধু বুড়ি থাকে, বড় বাড়ীর ঘরে প্রদীপ দেয়। ছেলেদের তৈরি বাড়ী, কত আনন্দের, কত আহ্লাদের! লোকের কাছে বলে সুখ, দেখিয়েও সুখ। ছোট ছেলেও এই বাড়ী করতে টাকা দিয়েছে, দুই ভাইয়ের টাকাতে বাড়ী, তবে বড় খোকা নৃপেন বেশি টাকা দিয়েছে। ছোট ছেলে বীরেন দাদা-শ্বশুরের পসারে বসে গোয়াড়ি কেষ্টনগরে ওকালতি করে, সেখানে শ্বশুরবাড়ীর সম্পত্তি বাড়ীঘর সব তার। সে ক্বচিৎ ভাবনহাটি আসে। তার অবস্থা মন্দ নয়।

পরমেশ রায়ের পরলোকগমনের পর বুড়ি অনেক দিন বেঁচে ছিল। আশি বছর বয়স হয়েছিল মরবার সময়। একবার বড় ছেলে নৃপেন রায়ের খুব অসুখ করে। বুড়ি ভাবনহাটি থেকে ছেলেকে দেখতে যায় বহরমপুরে। তখন নৃপেন রায় বহরমপুরের ম্যাজিস্ট্রেট। বুড়ি বলেছিল—তোকে রেখে আমি যাবই খোকা—কোন ভাবনা নেই, তুই সেরে উঠবি। আমি এই পায়ের ধুলো দিলাম তোর মাথায়, এই তোর বড় ওষুধ।

প্রায় পঁচিশ বছর এই বাড়ীতে একা প্রদীপ দেওয়ার পরে এবার বুড়ি স্বামীর ভিটের পুণ্য মৃত্তিকায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন গত ২রা ফাল্গুনে।

প্রকাণ্ড শ্রাদ্ধসভা। মেজর রায় সব দেখাশুনো করে বেড়াচ্ছেন—বুড়ির জ্যেষ্ঠ পৌত্র। সুন্দর গৌরবর্ণ চেহারা, চোখে চশমা। কাকে বলছেন—কনট্রোলারকে লিখে এক মণ ময়দা অতিকষ্টে যোগাড় করেছিলাম—আর কলকাতার রেশন কার্ডে কিছু কিছু কলেক্ট করে ছিলুম। ভাবনহাটি গ্রামের লোক খুব খুশী হয়েছে।

এরা গ্রামের মধ্যে বড় লোক, অনেক দিন পরে দেশে এসেছে, মাতৃশ্রাদ্ধ করছে, একটা বড় ভোজ দেবে। তবে মুশকিল এই যে, না মেলে আটা ময়দা, না মেলে চিনি। এরা বড় লোক তাই যেখান থেকে হোক যোগাড় করেছে এই বাজারে। শ্রাদ্ধসভা একটা দেখবার জিনিস হয়েছে।

বড় শামিয়ানার নীচে শ্রাদ্ধবেদী। তেরটি নাতি মুণ্ডিতমস্তকে যখন দীর্ঘ সারিতে কুশাসনে বসে ভুজ্যি উৎসর্গ করছে—তখন গ্রামের বুড়ি চক্কত্তি-গিন্নি বললেন—আহা হা, ভাগ্যিমানী চলে গেল! কি ভাগ্যিই নিয়ে এসেছিল! আজ সোনার চাঁদেরা বসে দেখ ভুজ্যি উচ্ছুগ্যুও করছে। এ ভাগ্যি কি সবার হয়। বট্‌ঠাকুরের কী ছিল, দুখানা চালাঘর। আমরা প্রথম ঘর করতে এসে দেখেছি। দিদি আর কত বড় ছিলেন আমার চেয়ে—না হয় দশ বছরের। সেই বাড়ীতে রাজ-অট্টালিকা তুলেছে ছেলেরা, আবার নাতিরা হয়েছে একেবারে রাজা। এমন ভাগ্যি নিয়ে কজন মেয়েমানুষ বসুমতীতে আসে বল—

নাতি মানে শুধু ছেলের ছেলেরা নয়, চার মেয়ের ছেলেরাও আছে।

নৃপেন রায়ের ছোট ছেলে কণ্ট্রাক্টর পরিতোষ বেদী থেকে হেঁকে বললে—বিজয়, গাড়ী গিয়েছে?

বিজয় বিনীত ভাবে বললে—দারোগা বাবুর মেয়েছেলে আনতে গিয়েছে গাড়ী। এখনও ফেরে নি।

—ফিরলে সাবডেপুটির বাড়ীর মেয়েদের আনতে পাঠাতে হবে—এবার বড়খানা পাঠিও।

—যা জল-কাদা সার, গাড়ী চালানো বড় দায় হয়েছে। বড় গাড়ী বেরিয়ে গিয়েছে রাণাঘাটে ছানা আনতে।

—যে করে হোক, একটা-দুটো দিন চালিয়ে নিতে হবে।

পাঁচ মাইল দূরবর্তী মহকুমা টাউন থেকে নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আনবার জন্যে দুখানা নিজেদের মোটর এরা কলকাতা থেকে এনেছে। রাণাঘাট এখান থেকে অনেক দূর, ভাল রাস্তাও নেই, সেখানে গাড়ী পাঠানোর কথায় পরিতোষ বললে, সেখানে গাড়ী পাঠাতে কে বললে? সে তো ষোল মাইলের কম নয়—

বিজয় বললে—সতেরো মাইল সার।

—যত সব স্টুপিড!—তার পর একখানা টায়ার গেলে কি স্প্রিং ভাঙলে এ বাজারে যোগাড় করাই কঠিন—যা রাস্তা! ভাল গাড়ীখানাই ওই রাস্তায় পাঠালে!

এই সময়ে জিপ গাড়ীতে মহকুমা হাকিম ও দুজন গভর্ণমেণ্টের কর্মচারী এসে নামলেন।

মেজর রায় বেদী থেকে বললেন, আসুন, আসুন—ওরে গাড়ী থেকে কি কি আছে নামিয়ে নে—আসুন দয়া করে—

মহকুমা হাকিম মিঃ সেন পূর্বে ছোকরা বয়সে নৃপেন রায়ের অধীনে সার্কেল অফিসারের কাজ করেছেন মেদিনীপুরে, কাঁথি মহকুমায়। জিপ থেকে নেমে মিঃ সেন বললেন—আপনার বাবা? ও! নমস্কার সার—আচ্ছা আচ্ছা, আপনি কাজ আরম্ভ করুন, আমাদের জন্যে ভাববেন না। উই আর কোয়াইট অ্যাট হোম!

—কে আছিস, ওরে? সিগারেটের টিন বার করে দে ওঁদের—চায়ের ব্যবস্থা আগে কর।

এই সময় গোয়ালারা দই আর ক্ষীরের বাঁক নিয়ে উঠোনের এক স্থানে এসে দাঁড়াল। ওপাশে ছোট চালাঘরে মিহিদানা ও দরবেশ ভিয়ান হচ্ছে, লুচির ময়দা মাখা হচ্ছে—সে ঘর থেকে একজন উঠে এসে গোয়ালাদের দই আর ক্ষীর দেখে নামিয়ে হিসেব করে নিতে লাগল।

জার্মান সিলভারের ট্রেতে চা দেওয়া হচ্ছে শামিয়ানায় চেয়ারে বসে যেসব ভদ্রলোক শ্রাদ্ধ দেখছেন তাঁদের এবং বিশেষভাবে মহকুমার হাকিম ও তাঁর দুজন সঙ্গীকে।

গ্রামের সাধারণ লোকও শামিয়ানার এক পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে। শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হয়েছে। অপূর্ব দৃশ্য। তেরটি সোনার চাঁদ নাতি একসঙ্গে ভুজ্যি উৎসর্গের মন্ত্র পাঠ করছে।

একটু দূরে সেই কাঁঠাল গাছটা। যখন এটা অল্প কয়েক বছরের চারা তখন এরই তলায় দুধে আলতায় গোলা পাথরের খোরায় পরমেশ রায়ের নববধূ এসে দাঁড়িয়েছিল বরণের সময়, পাশেই আলপনা-দেওয়া পিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন নবযুবক পরমেশ রায়। আটষট্টি বছর আগের এ খবর সভাস্থ কোন লোক জানত না, জানবার কথাও না।

অনুশোচনা

বালাদাস আপ্তে সকালে উঠে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আজ রবিবার, তাতে পাপস্বীকারকারীদের দল আর একটু পর থেকেই আসতে শুরু করবে। স্নান সেরে তিনি তাড়াতাড়ি তৈরী হতে লাগলেন ভজন-মন্দিরে যাবার জন্যে।

বালাদাস আপ্তে কংকন প্রদেশের টুসুঘাট ও পানাজিম অঞ্চলের একজন নাম-করা লোক। গোয়া থেকে যাতায়াতের বড় সড়কের ওপর সেণ্ট জেভিয়ারের যে ক্ষুদ্র গ্রাম্য মন্দির অবস্থিত, বালাদাস সেখানকার সহকারী পুরোহিত, সাধারণ উপাসনা করেন না বড় একটা, রবিবার সকালে পাপস্বীকার গ্রহণ করেন ও বিধি অনুসারে দণ্ড দেন। বালাদাসের পবিত্রতার জন্যে সকলে তাঁকে খুব মানে, ভয়ও করে। কনফেশন্যালের ক্ষুদ্র ঘুলঘুলি দিয়ে মস্ত বড় জনারের ক্ষেত আর নীচু পশ্চিমঘাট শৈলশ্রেণীর দৃশ্য দেখতে দেখতে অপরাধী ভক্ত এক একবার যখন বালাদাসের দীর্ঘ দাড়ির দিকে চায়, তখন সত্যই নিজেকে সে ঘোর পাপী ও অসহায় মনে না করে পারে না।

বালাদাস জর্ডনের পবিত্র জলের আধার থেকে নিজে একটু জল মাথায় দিয়ে ক্যাম্বিসের চটের মত লম্বা গাউন পরে সেণ্ট জেভিয়ারের ধর্মমন্দিরের ঘুলঘুলি-জানালায় গিয়ে বসেন টুলের ওপর। গত বিশ বছর ধরে এই কাজ করে আসছেন তিনি। তার আগে গোয়ার একজন মেসন্ ব্যবসায়ীর নকলনবিশ ছিলেন।

খুব সকালে প্রথমেই এসেছে একজন চাষী লোক।

বালাদাস তাঁর বাঁধা কাজ কলের মত করে যান। চাষী লোকের মাথায় জর্ডনের জল ছিটিয়ে দিয়ে তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের অনুমোদিত ল্যাটিন মন্ত্র ভুল উচ্চারণে আবৃত্তি করে চলেন—

> আউট ননকর্মিটিস্ সনকোর্মিটিস্ ও ডেলা জেসু
> ননকর্মিটিস্ সনকোর্মিটিস্ ও ইমিড ব্রিস মারি
> হিপোক্রিটিএ নিহিল স্যালভিটর এ আউট—

তার পর গ্রাম্যকৃষককে জিজ্ঞেস করেন গম্ভীরস্বরে—কি কি দোষ বলিয়া যাও। পারত্রিকের সভায় ভগবান সিংহাসনে আসীন। দেবদূতগণ ভেঁপু বাজাইয়া শেষ বিচারের দিন তোমার কৃত সমুদয় পাপরাশি সকলের কাছে প্রচার করিতেছে। তুমি কি কিছু লুকাইয়া রাখিতে চাও?

সংযত সাধুভাষার বাক্যে চাষা ভীত ও স্তব্ধ হয়ে পুরোহিতের মুখের দিকে চেয়ে বলল—কিছু লুকোব না হুজুর। সোমবার সন্দেতে, সলোমন বালকৃষ্ণ যে কুমড়োর ক্ষেত করেছে পাশেই, সেখান থেকে দুটো কুমড়োর জালি না বলে নিয়ে—

বালাদাস ধমক দিয়ে বললেন—বল চুরি রূপ মহাপাপ—

—আজ্ঞে, চুরি রূপ মহাপাপ করেছি। মঙ্গলবার কিছু নেই। বুধবার—

—মঙ্গলবার কিছু নেই? ভেবে দেখ। প্রত্যেক অস্বীকৃত পাপের জন্যে সেন্ট জেভিয়ারের পবিত্র বেদীতে স পাঁচ আনা—

—মেরী মাতার দোহাই হুজুর, মঙ্গলবার আর কিছু নেই।

—আচ্ছা বলে যাও। বুধবার—

—আমার ক্ষেতের খাম-আলু সান্তারা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল বুরুথ টুডু আর তার ছেলে সল্ টুডু, তাদের ঢিল ছুঁড়ে পা ভেঙে দিয়েছি।

—পা ভেঙে?

—হ্যাঁ হুজুর। পা একেবারে ভেঙে। মিথ্যে কথা বলব কেন।

—আর তুমি যখন অপরের ক্ষেত থেকে চুরি করলে তখন বুঝি পাপ হল না?

—আজ্ঞে—

—বলে যাও। বৃহস্পতিবার! পবিত্র সেণ্ট টেরেসা বোজার পবিত্র স্মৃতিতে পূত বৃহস্পতিবার।

পুরোহিত হাঁটু গেড়ে বসে উক্ত সেণ্ট টেরেসার উদ্দেশে আভূমি প্রণাম করলেন। চাষাও তাঁর দেখাদেখি তাই করলে। তার পর বললে—হুজুর, বৃহস্পতিবার একজনের ধার শোধার কথা ছিল—দিই নি!

—ইচ্ছে করে? মনে ছিল?

—হ্যাঁ হুজুর। টাকাটা হাতছাড়া করতে কষ্ট হচ্ছিল।

—হুঁ! ধার করবার বেলা মনে থাকে না সেসব? টাকা শোধ দিয়েছ?

—না হুজুর।

—আত্মপাপ-শোধনকারীদের উচিত পাপস্বীকারের দিনই গির্জা থেকে ফিরে গিয়ে পূর্বের ত্রুটি সংশোধন করা। আজই টাকা শোধ দেবে। তারপর?

—তারপর শুক্রবার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে ওকে বলেছিলাম, তুমি বাপের বাড়ী চলে যাও—

—শনিবার?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

—বল।

চাষা দুবার ঢোঁক গিলে বললে—আজ্ঞে ব্যাপারটা একটু—

—বল।

—আজ্ঞে ও-পাড়ার মঙ্গলদাসের শালী এসেছে পানজিম থেকে। তাকে দেখবার জন্যে, রাস্তার ইঁদারার পাশে যখন মেয়েরা চান করেছিল, তখন বড় ডুমুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে দেখছিলাম।

বালাদাস দুই গালে হাত দিয়ে বললে—কি সর্বনাশ! কেন?

—আজ্ঞে তা যখন বলতেই এসেছি তখন বলব। মঙ্গলদাসের শালী নামকরা সুন্দরী পানজিমের। সেখানে কী নাচঘরে কাজ করে। অমন গাইতে নাচতে কেউ জানে না এ দেশে। গরবা নাচ খুব ভাল নাচে। খুব ভাল নাচ, সেবার এসে নেচে খুব নাম করে গিয়েছিল সে।

বালাদাসের অস্পষ্ট মনে পড়ল শুনেছিলেন বটে, পানজিমের একটি সুন্দরী মেয়ে

গরবা পরবে হিন্দুদের উৎসব-দিনে বটতলায় অদ্ভুত নাচ নেচেছিল।

তিনি ভ্রূকুটি করে বললেন—হুঁ। বড় উৎসাহ দেখা যাচ্ছে যে! ক'বার দেখেছিলে?

—আজ্ঞে, তা চার বার।

—চার বার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। মিথ্যে কথা কেন বলব।

—না, তুমি সত্যাগ্রহী পল। মেয়েটি কত বড় বললে?

—আজ্ঞে, তা যুবতী। লেখাপড়া জানে। মঙ্গলদাসের সংসারের অর্ধেক খরচ তো সেই পাঠায় পানজিম থেকে হুজুর।

—কি নাম?

—সখীবাই।

—আচ্ছা যাও।

চাষা চলে গেল।

নিজের অপরাধের ভারে তার মন এত ভারাক্রান্ত যে বাড়ীতে গিয়ে সে রাঙা মাদ্‌সা চালের ভাত আর খামআলুর তরকারি খেতেই পারলে না। কংকন উপকূল গোধূম উৎপন্ন করে না। ভাদ্রমাসে জনার আর এই মাদ্‌সা ধান উঁচু জমিতে জন্মায়—অন্য নীচু জমিতে হৈমন্তী ধান। মাদ্‌সা ধান ষাট দিনে পাকে বলে গরীব চাষীরা অর্ধেক জমিতে এর চাষ করে; সকালে উঠে ঐ ধানের রাঙা মিষ্টি ভাত পেট ভরে খেয়ে মাঠের কাজে বেরিয়ে যায়।

দুপুর ঘুরে গেল। মাঠে বসে বসে চাষা ভাবলে কাজটা খারাবি হয়ে গেল সন্দেহ নেই। সেজন্য বকুনিও যথেষ্ট খেয়েছে সে মাননীয় পুরোহিত বালাদাসের কাছে।

তবে একটা কথা।

সখীবাই এখানে চিরকাল থাকতে আসে নি।

তিন চার দিন পরে সে পানজিমে চলে যাবে। যাবেই।

আজ না হয় সে জনার ক্ষেতের কাজ শেষ করে বিকেলে ফেরবার পথে সোজা বাড়ী না গিয়ে ওপাড়া দিয়ে একটু ঘুরে সখীবাইকে আর একবার দেখে যাবে এখন।

ও রকম মেয়েছেলে এদিকে হর-হামেশা বড় একটা আসে না। না হয় এই অপরাধের জন্যে সে আগামী রবিবারে বাতি দেবে সেণ্ট জেভিয়ারের দরগায়। পুরোহিত কিছু জরিমানা করবেন একই অপরাধ দুবার করবার জন্যে।

একটাকা স পাঁচ আনা। তা দেবে সে। গোয়ার পাইকারদের কাছে এক গাড়ি কুমড়ো বিক্রি করলে উঠে আসবে এখন ও পয়সা।

কাজ শেষ করে বিকেলের দিকে সে গুটি গুটি চলল মঙ্গলদাসের পাড়ার দিকে। আস্তে আস্তে সে ইঁদারার অদূরবর্তী বড় ডুমুর গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। ডুমুরের যে ঝাড় ঝাড় কাঁদি নেমেছে বৃদ্ধ মহাপুরুষদের দাড়ির মত, তারই ওপাশে কে যেন একজন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে না?

—কে রে?

চাষা গুঁড়ির এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে গিয়ে দেখলে—ক্যাম্বিসের চটের গাউন পরে, লম্বা চুলদাড়ি কাঠের চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে, ডুমুর ঝাড়ের তলায় চোরের মত দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং বালাদাস পুরকোয়াস আস্তে, পুরোহিত।

দাদু

ঠাকুরদাদা আমার শৈশবের অনেকখানি জুড়ে আছেন। সমস্ত শৈশব-দিগন্তটা জুড়ে আছেন। ছেলেবেলায় জ্ঞান হয়েই দেখেছি আমাদের বাড়ীতে তিনি আছেন।

তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় এক-শ। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত দেখেছি তিনি আমাদের পশ্চিমের ঘরের রোয়াকে সকাল থেকে বসে থাকতেন। একটা বড় গামলায় গরম জল করে দিদি তাঁকে নাইয়ে দিত।

ঠাকুরদাদা চোখে ভাল দেখতে পেতেন না। তাঁকে সকালে হাত ধরে রোয়াকে নিয়ে এসে তাঁর জায়গাটিতে বসিয়ে দিতে হত। তামাক সেজে দিত দিদি। কেবল মা ঠাকুরদাদার ভাতের থালাটি নিয়ে গিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতেন। দিদি আবার তামাক সেজে দিত।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরদাদা বসে বসে আপন মনে কি বকতেন। একটু বেশি বেলায় বাবা নায়েবি করে কাছারি থেকে ফিরে বাড়ী ঢুকলেই ঠাকুরদাদা অমনি কান খাড়া করতেন।

—কে এল? হরিশ?

—হ্যাঁ বাবা।

—বাবা হরিশ, আমার বড্ড খিদে পেয়েচে।

—সে কি বাবা, আপনাকে এখনও ভাত দেয় নি?

—না বাবা। খিদেয় মরছি, অ হরিশ। ভাত দিতে বলে দে।

বাবার বয়স পঞ্চাশের ওপর। মাথার চুল প্রায় সব সাদা হয়ে গিয়েছে, বেশ মোটা-সোটা নাদুস-নুদুস চেহারা, সবাই বলে বাবা নাকি দেখতে সুপুরুষ।

বাবা মাকে অনুযোগ করলেন—আচ্ছা, বাবাকে এখনও ভাত দাও নি? ছি ছি, এত বেলা হল!

মা বললেন—ও মা, সে কি গো! দশটার সময় যে আমি নিজের হাতে খাইয়ে এসেছি!

বাবা চেঁচিয়ে ডেকে বললেন—ও বাবা—

—কি হরিশ?

—আপনাকে আপনার বৌমা খাইয়ে এসেছে যে? কি বলছেন আপনি?

—না না, অ হরিশ, মিথ্যে কথা। আমারে কেউ ভাত দেয় নি, না খেয়ে মলাম আমি—

বলেই ঠাকুরদাদা ছেলেমানুষের মত খুঁৎ খুঁৎ করে কান্না শুরু করে দিলেন।

মা রাগ করে বলে উঠলেন—বুড়ো বাহাত্তুরে, মরেও না, সাত কাল জ্বালাবে। তোমার সাধের হিমি গিয়ে তোমায় খাওয়াক মাখাক—আমি আর যদি কাল থেকে তোমায় দেখি, তবে আমি বেণী মুখুজ্যের—

বাবা দুঃখিত স্বরে বললেন—আহা হা, বড়বৌ—ছেলেপিলের সামনে—

—কি ছেলেপিলের সামনে? কে না জানে সোহাগের হিমির কথা! বাহাত্তুরে বুড়ো, চার কালে গিয়ে ঠেকেছে—

—আহা হা বড়বৌ! অমন করে গুরুজনকে বলতে আছে? ছি ছি, তোমার মুখখানা আজকাল বড্ড—

ঠাকুরদাদা তখনও কিন্তু কাঁদছেন ছেলেমানুষের মত।

কান্নার মধ্যে ডাকলেন—অ হরিশ।

যেন অসহায় আর্ত বালক তার একমাত্র আশ্রয়স্থল পিতাকে ডাকছে।

বাবা জামা-টামা না খুলেই ছুটে গেলেন, সান্ত্বনার সুরে বললেন—কি বাবা, কি?

—আমি ভাঁত খাঁব—আঁমি না খেঁয়ে মঁলাম, অ হঁরিশ। ওরা আঁমায় নাঁ খেঁতে দিয়ে মারবে—খুঁৎ—খুঁৎ—

—বাবা,—কাঁদবেন না। কাঁদতে নেই। ছিঃ, অমন কাঁদতে আছে!

মা অমনি এ রোয়াক থেকে বলে উঠলেন—আ মরণ, বুড়ো বাহাত্তুরের মরণ দ্যাখ না, যেন দু বছরের খোকা, ছেলের কাছে কেঁদেই খুন। যমের ভুল এমনও হয়।

বাবা বলেন—আঃ, চুপ কর না বড়বৌ—কি কর!

ঠাকুরদাদা আবার বলেন—খিদে পেয়েছে—ভাত খাব—

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি দেখছি—আপনি চুপ করুন।

অবশেষে আবার সামান্য দুটি ভাত বাবা নিয়ে দিয়ে এলেন। ঠাকুরদাদা দিব্যি খেতে বসে গেলেন আবার। মুখে আর হাসি ধরে না।

আমরাও ঠাকুরদাদার কাণ্ড দেখে হেসে বাঁচি নে।

এমনি একদিন নয়, মাসের মধ্যে দশ দিন হত। ইতিমধ্যে দিদি শ্বশুরবাড়ী চলে গেল।

বাবাকে দেখতাম, ঠাকুরদাদার যত কিছু কাজ নিজের হাতে করতেন। কিন্তু তাঁর সময় নেই, সকালে উঠে সন্ধ্যাহ্নিক করে জল-বাতাসা খেয়ে তিনি বেরিয়ে যেতেন কাছারির কাজে। দুপুরে এসে খেয়ে সামান্য বিশ্রাম করে কাজে বেরুতেন, ফিরতে রাত আটটা নটা বাজত। এসেই ঠাকুরদাদার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করতেন—বাবা, শরীর ভাল আছে? এদিকে ঠাকুরদাদাও সারা দিনের যত অভাব-অভিযোগের কাহিনী জমিয়ে রাখতেন ছেলের সামনে পেশ করবার জন্যে সেই সময়।

—আর বাবা, শরীর ভাল! একটু তামাক, তা কেউ দ্যায় না। টিকে ভিজে, আগুনও ধরল না। আজ এমন মশা কামড়াতে লাগল দুপুর বেলা, মশারিটা কেউ টাঙিয়েই দিলে না—এই দ্যাখ না পিঠটা—

তার পর কাঁদ-কাঁদ সুরে বললেন—তুই একটু হাত বুলিয়ে দে হরিশ—

বাবা বসে বসে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।

—তুই বাড়ী না থাকলে আমাকে সবাই অগ্রাহ্য করে। এক ঘটি জল চাইলে সময়মত দ্যায় না বাবা।

—সত্যি তো! আহা! আমি সব বলে ঠিক করে দেব এখন।

—দিস। ভাল করে বলে দিয়ে যাস তো।

—দেব।

—তোর খাওয়া হয়েছে?

—না বাবা, এই তো এলাম।

—যা তুই, হাত-পা ধুয়ে জল-টল খা—তোকে পেট ভরে খেতে দিচ্ছে তো?

—হ্যাঁ বাবা।

—দেখি সরে আয় তো। একটু মোটা-সোটা হলি, না সেই রকম আছিস? জানিস, ছেলেবেলায় তোর শরীর ছিল এমনি রোগা। তোর গর্ভধারিণী একদিন বললে, খোকার জন্যে ছাগলের দুধের ব্যবস্থা কর। তখন মেহেরপুরে নীলকুঠিতে কাজ করি। সেইখানেই তোর জন্ম, জানিস তো? হ্যাঁ মেহেরপুরের—ইয়ে—ঐ কি বলছিলাম ভুলে গেলাম—আজকাল কিছু মনেও থাকে না—

—ছাগলের দুধ!

—হ্যাঁ, ছাগলের দুধ আনতে বললে তোর গর্ভধারিণী। সাহেবের একটা বড় ছাগল ছিল। মালীর সঙ্গে ষড় করে ফেললাম, মাসে দু টাকা করে দেব—আর সে আধ সের করে ছাগলের দুধ আমায় দেবে—

বাবা ওঠেন না সেখান থেকে, যতক্ষণ ঠাকুরদাদা একটু শান্ত না হন।

ভাত খেয়ে বাবার সঙ্গে গল্প করে ঠাকুরদাদা খুশী মনে বলেন—তা হলে তুই এখন যা হরিশ, খেয়ে নিগে—দুধ পাচ্ছিস তো?

—হ্যাঁ বাবা।

—ভাল করে দুধ খাবি। দুধেই বল।

—না বাবা, দুধ ঠিক খাচ্ছি।

বাবা চলে গেলেন। যাবার আগে ঠাকুরদাদাকে বিছানায় শুইয়ে নিজের হাতে একটা মোটা চাদর ওঁর গায়ে ঢেকে দিলেন।

—চাদর খুলবেন না বাবা, ঠাণ্ডা লাগবে।

মা বকতেন—হল বাপের সেবা? বাব্বাঃ, এমন কীর্তি কখনও দেখি নি!

বাবা একটু লজ্জা ও সঙ্কোচের সঙ্গে বলতেন—আঃ, চুপ কর—

—কেন চুপ করব? বুড়ো বাপের আবদার যেন ছ বছরের খোকার আবদার—এমন কাণ্ড যদি কখনও দেখেছি।

—না দেখেছ না দেখেছ, থাম তুমি। ঐ যে-কদিন বুড়ো আছে. তার পর আর—

—সে সবাই জানে, তার পর কি আর তুমি বুনোপাড়ার দিগম্বর বুনোর সেবা করবে? এখন দুটো খেয়ে নিয়ে আমার মাথা কিনবে এস।

সেদিনই গভীর রাত্রে আমরা সবাই ঘুমিয়ে যখন, ঠাকুরদাদা নিজের ঘর খুলে হাতড়ে

হাতড়ে বাইরের রোয়াকে এসে ডাকছেন—অ বৌমা, অ হরিশ—

বাবা ধড়মড় করে উঠে বাইরে এসে বসলেন—কি বাবা, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

—বাবা হরিশ!

—কি হয়েছে?

—বৌমা আমার এখনও ভাত দিলে না। রাত কত হয়েছে দ্যাখ তো! আমি বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভাত হয় নি এখনও?

বাবা অবাক!

মা ঘুম-চোখে উঠে বললেন—কি?

—বাবা ভাত চাইছেন।

—বাব্বাঃ, হাড়-মাস কালি হয়ে গেল। ঢের ঢের সংসার দেখেছি, ঢের ঢের শ্বশুর দেখেছি—কিন্তু এমন ধারা কান্ডকারখানা কখনও শুনিও নি, কখনও দেখিও নি—

—চেঁচালে কাজ চলবে? ও কি! সব সময়—

ইতিমধ্যে আমার নির্বিকার ঠাকুরদাদা, যিনি চোখে ভাল দেখেন না, কানেও ভাল শোনেন না, আবার ডেকে উঠলেন—অ হরিশ! অ বৌমা!

—যাই বাবা, যাচ্ছি।

—আমাকে ভাত দিয়ে যাও। খিদে পেয়েছে।

বাবা গিয়ে ঠাকুরদাদাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন—অবোধ শিশুকে যেমন লোকে সান্ত্বনা দেয়। তিনি খেয়েছেন সন্ধ্যার পরেই, তাঁর বৌমা ভাত দিয়ে গিয়েছে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে। মনে নেই তাঁর। তাঁকে ভাত না দিয়ে কি বাড়ীর কেউ খেতে পারে? এখন রাত দুটো। এখন কি ভাত খেতে আছে? এখন খেলে তাঁর অসুখ করবে। কাল সকালেই—খুব ভোরেই তাঁকে খেতে দেওয়া হবে, রাত তো ভোর হয়ে গেল। অমন করলে সবারই মনে কষ্ট দেওয়া হবে। অমন কি করা উচিত? ছিঃ!

ঠাকুরদাদা বালকের মত আশ্বস্ত হয়ে বললেন—খেইছি?

—হ্যাঁ বাবা। আমার কথা বিশ্বাস করুন—মাগুর মাছ এনেছিলাম আপনার জন্যে হাট থেকে কিনে—তাই দিয়ে ভাত খেয়েছেন। সত্যি বলছি, আপনার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলছি নে। চলুন, শোবেন আসুন—ঠান্ডা লাগবে—ঘরের মধ্যে আসুন—

—আচ্ছা, আচ্ছা।

—আসুন—

বাবা হাত ধরে ঠাকুরদাদাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে শুইয়ে দিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়লেন।

মা বললেন—সহজে মিটল?

—মেটাতে জানলেই মেটে। এখন থেকে বাবার জন্যে দুটো ভাত রেখে দিলে কেমন হয়?

—হ্যাঁ। তার পর ওই বুড়ো বয়েসে পেট ছেড়ে দিক এই শেষ রাত্তিরে গিলে, তখন ঠ্যালা সামলাবে কে শুনি?

বাবা ন্যায্যপক্ষেই বলতে পারতেন, যে এত কাল সামলে আসছে, সে-ই সামলাবে। কিন্তু তা তিনি বলেন না। নীরবে গিয়ে আবার নিজের ছোট্ট খাটিয়াতে শুয়ে পড়েন।

কাছারির কাজে বাবাকে কয়েক দিনের জন্য গোয়াড়িতে গিয়ে থাকতে হল।

যাবার সময় বার বার মাকে বলে গেলেন, ঠাকুরদাদার যেন কোন অসুবিধে না হয়। অযত্ন না হয় এ কথাটা বলতে বোধ হয় সাহস করলেন না, তাহলে ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে যাবে। ঠাকুরদাদাকে গিয়ে বললেন—বাবা, আমি গোয়াড়ি যাচ্ছি, এই পাঁচ-ছ দিন দেরি হবে। একটু বুঝে-সুঝে চলবেন, আপনার বৌমাও তো কাজের লোক, ছেলে-পুলে নিয়ে বিব্রত।

—কবে আসবি?

—বুধবার নাগাত।

—আজ না গেলে হত না? শনিবারের বারবেলা। নিশিকান্ত তরফদার বলত, মেহের-

পুরের কুঠির জমানবিশ ছিল, শনিবারের বারবেলা—

—কে বললে আজ শনিবার?

—তবে কি বার?

—শুক্রবার।

—তা কি করে হয়? তুই বললি পাঁচ দিন দেরি হবে, তবে আজ শনিবার হল না?

—বাবার অত হিসেব এখনও মাথায় আছে! পাঁচ-ছ দিন বললাম যে। আপনি ভাববেন, না, কোন অসুবিধে হবে না আপনার।

বাবা তো চলে গেলেন, এদিকে দুদিন বেশ কাটল। তার পরই ঠাকুরদাদা উৎপাত শুরু করলেন। রোজ সন্ধ্যের পর অভ্যেস-মত বলেন—অ হরিশ!

কেউ উত্তর দেয় না।

মা আমাদের চোখ টিপে বারণ করে দিতেন বাবা বাড়ী আসেন নি সে কথা বলতে, কারণ তাহলে ঠাকুরদাদা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন।

—অ হরিশ! বাড়ী এলি? অ হরিশ!

আমি মায়ের শিক্ষা মত বলতাম—না, এখনও আসেন নি বাবা।

—আজ কখন কাছারি গেল? আমাকে বলে গেল না?

আমরা উত্তর দিই নে।

—অ হরিশ!

—ঠাকুরদা, তামাক সেজে দেব?

এটিও মায়ের পরামর্শ। ঐ একমাত্র উপায় ঠাকুরদাদাকে অন্যমনস্ক রাখবার। আমাদের বলতেন—বোস্ আমার কাছে।

আমি, আমার ছোট ভাই নীলু ফুচু ও দুই বোন সরলা আর বিনু ঠাকুরদাদাকে ঘিরে বসি।

—সবাই এসেছে?

—হুঁ।

—বিনু এসেছে? আমার কাছে এগিয়ে এসে বোস্ সব। শোন, সুন্দরবনে এক শ ছাপ্পান্ন নম্বর লাটে আমার মনিবের কাছারি ছিল। পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। মস্ত বড় জমিদার। আমি যেখানে থাকতাম, সে কাছারির নাম ছিল গরানহাটির কাছারি। সুন্দরী আর গরান কাঠের জঙ্গল কিনা, তাই নাম ছিল গরানহাটি। একবার নোনাতলার খালে আমাদের ডিঙি লেগেছে, মাঘ মাসের দিন, জলে সোন নেমেছে—

—সে কি ঠাকুরদা?

—সোন মানে জোয়ার। বে-সোন মানে ভাঁটা—বে-সোনে নৌকো চলে না সামনে, নোঙর করতে হয় ও-দিকির গাঙে। তার পর কি বলছিলাম?

ওই হল মুশকিল। ঠাকুরদাদার কাছে গল্প শোনবার সুখ নেই, কেবল ভুলে যাবেন।

—বলছিলেন সোন নেমেছে জলে—

—হ্যাঁ, তার পর দেখি এক মস্ত বাঘ জলে ডিঙির পাশে জল খাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে উজিরালি বিশ্বেস ছিল বড় শিকারী সে অমনি বন্দুকের চোঙ বাগিয়ে এক দ্যাওড় করলে। এক দ্যাওড়, দু দ্যাওড়, ব্যস, বাঘ উল্‌টে পড়ল খালের জলে। হ্যাঁ মনু?

—কি?

—তোর বাবা এল?

—না, এখনও আসেন নি।

—গিয়ে দেখে এস দাদাভাই আমার। অ হরিশ?

—আসেন নি বাবা। গল্প বলুন ঠাকুরদা।

—দেখে এস না দাদাভাই—

—দেখতে হবে না, আসেন নি। এলে আপনার সঙ্গে কথা বলতেন না?

ঠাকুরদা আবার গল্প বলতে শুরু করলেন। বাঘের গল্প জমাতে পারলেন না, কেবল ভুলে যান, আবার গোড়া থেকে শুরু করেন। উলটো-পালটা করে ফেলেন, কখন বলেন

শিকারীর নাম উজিরালি বিশ্বেস, কখনও বলেন তার নাম আজিমুদ্দি বিশ্বেস।

এমন সময় মা ভাত নিয়ে এলেন।

আমরা বললাম—ঠাকুরদাদা, ভাত এনেছে মা।

—ও, এস বৌমা। কি রাঁধলে?

—মাছের ঝোল আর চচ্চড়ি।

—হরিশ আসে নি বৌমা?

—না।

—এখনও এল না? রাত তো অনেক হয়েছে—

—রাত বেশি হয় নি। আপনি খেতে বসুন, আমি দুধ আনি।

—হরিশ এলে ব'লো আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।

মা চলে গেলেন। ঠাকুরদাদার সামনে দাঁড়ালে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে হবে। ঠাকুরদাদা খাওয়া শেষ করে কিন্তু অন্য দিনের মত শুতে গেলেন না, ঠায় অনেক রাত পর্যন্ত রোয়াকে বসে রইলেন, আর কেবল মাঝে মাঝে যার-তার পায়ের শব্দ শুনে বাবার নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন।

অনেক রাত্রে মা বললেন—বাবা, আপনি এবার শুয়ে পড়ুন। ফুচুকে পাঠিয়ে দিই, আপনাকে শুইয়ে আসুক।

—হরিশ এসেছে?

—না।

—কেন এল না এখনও।

—আপনার কিছু মনে থাকে না। তিনি গোয়াড়ি গিয়েছেন, মনে নেই? বুধবারে আসবেন আপনাকে বলে গেলেন যে। শুয়ে পড়ুন।

ঠাকুরদাদা বসে কি ভাবলেন। কথার উত্তর দিলেন না। হয়তো মনে পড়ল বাবার গোয়াড়ি যাওয়ার কথা। ফুচু গিয়ে তাঁকে শুইয়ে দিয়ে এল। অনেক রাতে শুনলাম, ঠাকুরদাদার ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছে। মা শুনে বললেন—দেখে আয় কি হল।

গিয়ে দেখি ঠাকুরদাদা বিছানার ওপর উঠে বসে কোণের দিকে হাত বাড়িয়ে লাঠি হাতড়াচ্ছেন। তিনি নাকি এখুনি বাবার সন্ধানে বেরুবেন। বাবা কেন আসেন নি এখনও। তিনি মোটেই ঘুমুতে পারেন নি নাকি। আমরা জানি, এ কথা ঠিক নয়। ঠাকুরদাদা বসে বসে ঢুলে পড়েন, তিনি না ঘুমিয়ে আছেন এত রাত পর্যন্ত! ইস! তা আর জানি নে!

ঠাকুরদাদাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলাম। অবশেষে মা গিয়ে কড়া সুরে বললেন—আচ্ছা, বাবা, আপনার কাণ্ডখানা কি শুনি? ওরা ছেলেমানুষ, ওদের ঘুমুতে দেবেন না একটু? এক শ বার আপনাকে বলা হচ্ছে তিনি গোয়াড়ি গিয়েছেন, বুধবারে আসবেন. আপনি কিছুতেই তা শুনবেন না। রাত দুপুরে উঠে বাধিয়ে দিয়েছেন গোলমাল। ও রকম করলে থাকুন আপনি সংসারে, আমি এক দিকে বেরুই।

মাকে ঠাকুরদাদা ভয় করতেন। মা ঘরে পা দিতেই তিনি বেশ নরম হয়ে এসেছিলেন, সুড় সুড় করে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সকালে উঠে আমায় কাছে ডাকলেন—শোন মনু—

—কি?

—দাদাভাই, দাদু আমার, একটা পয়সা দেব এখন—

ঠাকুরদাদা নিঃস্ব নিষ্কপর্দক লোক, তিনি পয়সা দেবেন এ কথা যদিও আমি বিশ্বাস করি নে, তবুও বলি—কি বলছেন?

—তোর বাবার চিঠি এসেছে?

—না।

—আজ কি বার?

—সোমবার।

—হরিশ কবে আসবে?

—বুধবারে।

—আচ্ছা যা।

বুধবারে বাবা কি জন্যে যেন এলেন না, কি জানি। ঠাকুরদাদা সারা দিন রোয়াকে বসে রইলেন, গম্ভীর মুখে তামাক খান আর মাঝে মাঝে বলেন—কে এল? অ হরিশ? কিসের পায়ের শব্দ রে, ও ফুচু, ও নীলু—

ফুচু বললে—আমাদের রাঙী গাইএর বক্‌না, ঠাকুরদা।

—ও।

এই রকম চলল সারা দিন। রাত্রে খাবার সময় খেতে বসেছেন, আর মাঝে মাঝে কান খাড়া করে রেলগাড়ীর শব্দ শোনবার চেষ্টা করছেন; মুখে কিছু বলেন না। হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। আমি তামাক সেজে ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠে বললেন—কে?

—আমি মনু।

—ন'টার গাড়ি গিয়েছে, জানিস?

—এখনও যায় নি। আপনি শুয়ে পড়ুন।

—শব্দ পাস নি গাড়ীর?

—না।

—ও।

বাবার কথা মুখেও আনলেন না। বললেন—পান ছেঁচে এনেছিস? নিয়ে আয়।

বাবা তার পর দিনও এলেন না। ঠাকুরদাদা কিন্তু আশ্চর্য রকমের গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। আর কিছু জিগ্যেস করেন না, বাবার নাম ধরে ডাকেনও না।

শুক্রবার দিন সন্ধ্যের গাড়ীতে বাবা বাড়ী এলেন। ঠাকুরদাদা অভিমানে কথাই বলেন না। বাবা বুঝতে পারলেন। মাকে বললেন—বাবার দেখছি রাগ হয়েছে—যাই দেখি ব্যাপার।

ঠাকুরদাদা তামাক খাচ্ছেন, বাবা গিয়ে বললেন—বাবা!

পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন।

ঠাকুরদাদার মুখে কথা নেই।

—বাবা, কেমন আছেন?

ঠাকুরদাদা নিরুত্তর।

—বাবা, রাগ করলেন নাকি? তা আমি আবার রাণাঘাট যাচ্ছি কাল সকাল বেলা।

—রাগ হয় না?

এবার ঠাকুরদাদা আর না বলে থাকতে পারলেন না। কেন না, ওই যে বাবা বললেন, কাল সকালেই রাণাঘাট যাবেন, ওতেই ঠাকুরদাদার রাগ জল হয়ে গিয়েছে একেবারে।

বাবা হেসে বললেন—আপনি রাগ করতে পারেন, তবে আমি পরের কাজ করি, কাজ সারতে গেলে দু-এক দিন দেরি হয়েই যায়।

—আমার জন্যি কি আনলি?

—ভাল জিনিস এনেছি। আপনার ভাল লাগবে। কেষ্টনগরের সরভাজা।

—তা দিতে বল্ বৌমাকে।

সে সময় মা কালীতলায় প্রদীপ দিতে গিয়েছিলেন। আসতে দেরি হল, ঠাকুরদাদা অধীর ভাবে বার বার আমাকে বলতে লাগলেন—এল তোর মা, ও মনু?

বাবা চলে গিয়েছেন নটবর বাঁড়ুজ্যের চণ্ডীমণ্ডপে পাশা খেলতে। ঠাকুরদাদা আমাদেরই বার বার জিগ্যেস করতে লাগলেন—যা না তে'র মার কাছে।

ঠাকুরদাদার উদ্বেগের ন্যায্য কারণ যে ছিল না তা নয়। মা ঠাকুরদাদাকে বিশেষ পছন্দ করতেন না গোড়া থেকেই। তাঁর জন্যে খাবার এলে, বাবা দাঁড়িয়ে থেকে না দিলে ঠাকুর-দাদার ভাগ্যে অনেক সময় শূন্যের অঙ্ক লেখা হত, এ আমি জানি। মা বলতেন—ছেলে-পিলেরা খাবে আগে, তা নয়, বাহাত্তুরে বুড়ো খোকনকে আগে খাওয়াও। অত আমার শ্বশুরভক্তি নেই। উনি আমার কি করেছেন কোন্ কালে? কখনও একখানা কাপড় দিয়েছেন পুজোর সময়—ওঁর হাতে যখন পয়সা ছিল, যখন পাইকপাড়ায় কাজ করতেন? আমি আজ আসি নি এ সংসারে, আমারও হয়ে গেল ত্রিশ বছর। আজই না হয়

ভীমরতি হয়েছে, কোন্ কালে উনি ভাল ছিলেন? ওই ছেলে আর ছেলে! আর সব যেন বানের জলে ভেসে এসেছিলাম!

একটু নাড়ু কিংবা এতটুকু আমসত্ত্ব-ছেঁড়া পড়ত ঠাকুরদাদার ভাগ্যে।

বাবা নিজের হাতে খাবার নিয়ে ঠাকুরদাদাকে দিতেন বোধ হয় এই জন্যেই। আগে ঠাকুরদাদাকে না খাওয়ালে বাবার যেন তৃপ্তি হত না।

আষাঢ় মাসে ঠাকুরদাদা জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। আর উঠতে পারেন না। বাবা তাঁকে বিছানা থেকে উঠিয়ে মুখ ধুইয়ে কাপড় ছাড়িয়ে ওষুধ খাইয়ে দেন। বেদানার রস করে মিছরির গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়ান। কাছারি থেকে আসবার পথে ঠাকুরদাদার ঘরে কিছুক্ষণ বসে তবে এসে স্নানাহার করেন। কি উদ্বেগ তাঁর ঠাকুরদাদার অসুখের জন্যে।

মাকে বলতেন—বাবার জ্বর কত? দেখেছিলে? উনি তো ভুলে যান, ওষুধ ঠিকমত দেবে।

সেরে উঠেও ঠাকুরদাদা প্রায় দু মাস বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেন না। বাবা আজ ছাগলের দুধ, কাল কুমড়োর মেঠাই, পরশু আমলকির মোরব্বা—যে যা বলে তাই যোগাড় করে নিয়ে এসে খাওয়ান, ঠাকুরদাদা গায়ে বল পাবেন বলে।

ঠাকুরদাদাও হয়ে গেলেন একেবারে বালক। তাঁর উৎপাতের জ্বালায় বাড়ীসুদ্ধ লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কেবল দিনরাত খাই-খাই আর একে ডাকছেন তাকে ডাকছেন। আমরা পারতপক্ষে কোন দিনই কেউ ঠাকুরদাদার ঘেঁষ বড় একটা নিই নে, এখন তো একেবারে ত্রিসীমানায় ঘেঁষি নে। দশ বার ডাক দিলে একবার উত্তর দিই কি না দিই। মা ভাতের থালা দিয়ে আসেন নিয়ে আসেন, এই পর্যন্ত।

কথার জবাব দিলেও খুব হৃষ্টচিত্তে দেন না। যা দেন, তাও আবার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অথচ সেই মা-ই নদীর ঘাটে বাঁড়ুজ্যেগিন্নীর সঙ্গে এক ঘণ্টা ধরে হাবড়হাটি বকেন।

ঠাকুরদাদা অসহায় শিশুর মত বাবার পথ চেয়ে বসে থাকেন। বাবার পায়ের শব্দ পেলেই সুর ধরেন—অ হরিশ, এলি? অ হরিশ!

আর ঠিক কি বাবার পায়ের শব্দ চেনেন ঠাকুরদাদা।

বাবা এসে নিজে দেখাশুনো করবেন, নাওয়াবেন খাওয়াবেন ঠাকুরদাদাকে।

বাবা এলেই ঠাকুরদাদা যত কিছু অভিযোগ শুরু করে দেবেন। তাঁর কাছে ছেলে-মানুষের মত—বৌমা আমাকে এ করে নি, আমাকে তা দেয় নি। তাতে ঠাকুরদাদা মায়ের সহানুভূতি আরও হারাতেন।

বাবা তা জানতেনও। সেজন্যে নিজে সর্বদা খবরদারি করতেন।

কারও হাতে ঠাকুরদাদাকে ছেড়ে দিয়ে বাবার বিশ্বাস হত না। দিদি ছাড়া। দিদি তো শ্বশুরবাড়ী চলে গিয়েছে।

পৌষ মাসে বাবা আবাদে গেলেন পৌষ কিস্তির খাজনা আদায় করতে। বার বার মাকে বলে গেলেন ঠাকুরদাদার যেন অযত্ন না হয়।

মা বললেন—কেন, আমি কি বুড়োকে গলা টিপে মেরে ফেলব নাকি?

—ছি, অমন বলতে নেই।

—না, তুমি সেই রকম কথাবার্তা বলছ কিনা তাই বলছি। তবে আমার সংসারের কাজকর্ম সেরে সব দিক দেখতে তো পারি নে। যত দূর পারি, চিরকাল যা হয়ে আসছে, তাই হবে।

—একটু মন দিয়ে—মানে, উনি বুড়ো মানুষ—

—আমি তা জানি। যা পারি হবে। ভেব না।

বাবা ঠাকুরদাদার কাছে বিদায় নেবার সময় কত দিন দেরি হবে তা ঠিক বললেন না। বললে ঠাকুরদাদা হয়তো যেতে দেবেন না কিংবা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। বাবা যখন বেরুলেন, ঠাকুরদাদা বললেন—অ হরিশ, কবে ফিরবি?

তাঁর চিরন্তন প্রশ্ন।

—এই যত শীগগির হয় বাবা, আপনি ভাববেন না।

ঠাকুরদাদাকে ফেলে কোথাও গিয়ে বাবা স্বস্তি পেতেন না আমি জানি। ঠাকুরদাদা

নাকি তিন বছর বয়স থেকে বাবা ও মার মত করে মানুষ করেন বাবাকে ঠাকুরমায়ের মৃত্যুর পরে। বাবা যেন ভাবতেন ঠাকুরদাদা শত্রুপুরীর মধ্যে বাস করছেন—চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত অবস্থায়—একমাত্র আপনার জন তিনি নিজে। চোখে চোখে রাখতেন এইজন্যে সর্বদা। কারও হাতে ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস করতে পারতেন না। বলা বাহুল্য, ঠাকুরদাদা তো নিজেকে অসহায় শত্রুবেষ্টিত বলে মনে করতেনই।

বাবা এবার বাড়ী ফিরতে বড় দেরি করতে লাগলেন।

অবশেষে যখন ফিরলেন তখন গরুর গাড়ী করে ভীষণ অসুস্থ অবস্থায়। ঘোর জ্বর। জ্বরের ঘোরে বলতে লাগলেন—বাবাকে কেউ ব'লো না আমি অসুস্থ হয়ে বাড়ী এসেছি।

ঠাকুরদাদা কিন্তু আন্দাজে মাঝে মাঝে বাবাকে ডাক দিতেন। বুঝতে পেরেছিলেন কিনা কি জানি।

—অ হরিশ! আমার জন্যি কি আনলি, অ হরিশ?

বাবা ঠিক শুনতে পান। জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে বললেন—বাবা বাঁচতে আমার যেন কিছু না হয়, হে ভগবান! মরে সুখ পাব না।

অসুখ বড় বাড়ল। জেলা থেকে ডাক্তার এসে দেখলে দু দিন। সংসারের পুঁজি ভেঙে বাবার চিকিৎসা হল।

একদিন বড় বাড়াবাড়ি হল। ঠাকুরদাদাকে আর দেখাশুনো করার লোক নেই, বাবাকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত। গ্রামের ত্রিলোচন ঠাকুরদাদা কাছে বসে তাঁকে বাজে গল্পে ভুলিয়ে রাখলে।

সবাই বলতে লাগল—সুবোধ আর বাঁচবে না। আহা, বুড়োর কি কপাল!

বাবার মৃত্যু হল, শেষরাত্রে।

ঠাকুরদাদা তার কিছুই জানেন না। গভীর ঘুমে অচেতন।

খুব ভোরে বাড়ীতে এসে ত্রিলোচন চক্রবর্তী ঠাকুরদার হাত ধরে ছুতো করে বাইরে কোথায় নিয়ে গেল।

—চলুন জেঠামশাই, একটু বড়দার বাড়ীতে। আপনাকে একটু পায়ের ধুলো দিতে হবে সেখানে। তারা বলেছে।

—আমি যাব?

কান্নাকাটির চাপা শব্দে বলতে লাগলেন—কি রে? অ হরিশ, কি রে? কিসের শব্দ?

সন্ধ্যায় আমরা বাড়ী এসে ঠাকুরদাদাকে ঘিরে বসি। হঠাৎ আমার বড় মমতা হল ঠাকুরদাদার অসহায় মুখের দিকে চেয়ে।

নতুন কেমন একটা মমতা—যা এতদিন মনের মধ্যে খুঁজে পাই নি।

বাসা

খড়্গপুরে সভা করিতে গিয়েছিলাম। বৈশাখ মাস, বৃষ্টি হয় নি প্রায় সারামাস, তার ওপর খড়্গপুর শহরের গরম। গাছ নেই পালা নেই—ছোট্ট ছোট্ট রেলওয়ে কলোনির বাসাঘর, সামনে দিয়ে ড্রেন চলে গেছে, ময়লা জলে ভর্তি। চার নম্বর বাসায় তবুও যা হয় লোক একরকম বাস করতে পারে, তিন নম্বর বাসায় কষ্টেসৃষ্টে চলে, কিন্তু দু নম্বর এবং এক নম্বরের বাসা যে হতভাগ্য লোকেদের জন্যে তৈরি হয়েছে, তারা পশুজীবন যদি যাপন করত অরণ্যে, এর চেয়ে অনেক ভাল থাকতে পারত, ভগবানের আলো-বাতাস থেকে এভাবে বঞ্চিত হত না।

এক ভদ্রলোকের বাড়ী অতিথি হয়েছিলাম। তিনি কি-একটা ভালো কাজ করেন, চার নম্বর বাসায় বাসের অধিকার পেয়েছেন। সেই নীচু নীচু ছোট ছোট ঘরে তাঁর স্ত্রী কার্পেটের ওপর ফুল-বসানো অক্ষরে 'পতি পরম গুরু' লিখে বাঁধিয়ে রেখেছেন। ডিশ, পেয়ালা, পুতুল, মাটির ময়ূর সাজিয়ে রেখেছেন কাঁচের আলমারিতে, দেওয়ালে টাঙানো

আছে সানলাইট সাবানের ক্যালেন্ডার এবং মহাত্মা গান্ধীর ছবি, রাসলীলা ও চৈতন্যদেবের সংকীর্তনের ছবি; কোথাকার মজুরেরা এক বিদায়-অভিনন্দন দিয়েছিল বাড়ির কর্তাকে সেখানা বাঁধিয়ে টাঙানো—ইত্যাদি। হাওয়া আসে সামান্য, বৈশাখের উত্তাপে নীচু সংক্রিটের ছাদ আগুনের খাপরার মত গরম হয়েছে, হাত-পা নাড়ার স্থান নেই বাসার মধ্যে, গরমে হাঁপ ধরে যায়। চোখের দৃষ্টি সর্বদা দেওয়ালে বেধে যাচ্ছে।

আমি বললাম—কি করে থাকেন এখানে?

গৃহস্বামী বললেন—কি করি বলুন! চাকরি।

—কত বছর আছেন?

—১৯২৭ সালে জয়েন করেছি। তাহলে হিসেব করুন। এই একুশ বছর চলছে।

—বরাবর এই বাসায়?

—তাহলে তো বাঁচতাম। মাইনে যখন কম ছিল, তিন নম্বর বাসায় ছিলাম ন বছর। দু নম্বর বাসা আপনি যদি দেখতেন, তবে না-জানি কি বলতেন! সেই দু নম্বর বাসায় এক বছর।

আমি মনে মনে কল্পনা করলুম সামান্য দু এক শ টাকার জন্যে এই ভদ্রলোক কত জ্যোৎস্নাময়ী দুপুররাত্রির রহস্য, কত বর্ষার ঝর-ঝর ছন্দ, কত সজনে-ফুল-ফোটা কোকিল-ডাকা ফাল্গুনদিন, কত মধুর অপরাহ্ন হারিয়েছেন। শুধু ইনি যে একা হারিয়েছেন তা নয়, এঁর বাড়ীর ছেলেমেয়েরা হারিয়েছে তাদের জীবনের অতি রহস্যময় বাল্যদিনগুলির পরম পবিত্র মুহূর্ত, হারিয়েছেন এঁর স্ত্রীও। তার চেয়েও কষ্ট এই যে, এঁরা জানেন না যে এঁরা কি হারিয়েছেন—সেই কি যেন একটা জিনিসের বিজ্ঞাপনে যেমন ছবির নীচে লেখা থাকে। বললাম—ছুটি পেয়ে দেশে যান ক বার?

—ক' বার? মাত্র দুবার দেশে গিয়েছি এই ক' বছরের মধ্যে।

আপনা-আপনি আমার অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—বড় কষ্ট আপনাদের।

তিনি তখুনি বললেন—না, এর চেয়েও কষ্ট তাদের, যারা নতুন আসে। বাসা পেতে আগে লাগত সাত-আট বছর—এখন লাগে তের-চোদ্দ বছর।

—কোথায় থেকে চাকরি করবে সে বেচারী?

—গাছতলায়। তা কোম্পানি কি জানে। চাকরি করতে হয় কর। বাসার খবর কোম্পানি রাখে না। অথচ এই খড়্গপুর শহরে কোনও বাসা ভাড়া পাওয়া যায় না। কেন না, এখানে বাইরের কোন লোকের ঘর নেই, সবই রেলের কোয়ার্টার।

—সত্যি এ ব্যাপার?

—খুব সত্যি।

—তারা থাকে কোথায়?

—ওই হয়তো আপনার একখানা বাইরের ঘর আছে, সেখানে একটু জায়গা দিলেন। নয়তো কোন অবিবাহিত লোকের কোয়ার্টারে রইল। অবিবাহিত লোকের কোয়ার্টারে খুব ভিড় হয়। নতুন চাকরে অবিবাহিত যুবকেরা হার্ড টুগেদার। ভেড়ার গোয়ালেরও অধম। নিয়ে যাব আপনাকে তেমনি এক বাসায়।

আর একজন কে বললেন—আর একবার আপনাকে নিয়ে যাব এক নম্বর দু নম্বরে। দেখবেন সে কি জিনিস। মানুষের বাস করবার জন্যে সেগুলো তৈরি হয় নি। কোন্ এন্‌জিনিয়ার সেগুলো তৈরি করেছিল, তার কি নিজের বাড়ীতে স্ত্রীপুত্র ছিল না?

এসব কথার উত্তর ভগবানই দিতে পারেন।

সেই আর-একজন ভদ্রলোক বললেন—আপনাকে নিয়ে যেতে হবে আর এক জায়গায়। শহরের দক্ষিণে। সেখানে যতসব অফিসারদের কোয়ার্টারস। দেখে অবাক হয়ে যাবেন। স্বর্গ।

গৃহস্বামী বললেন—হ্যাঁ হে মিত্তির, সেখানেও একবার নিয়ে যেও তো এঁকে।

পূর্বের ভদ্রলোকটি বললেন—না নিয়ে গেলে কনট্রাস্টটা তৈরি হবে না যে। উনি বুঝবেন কি করে যে, আমরা কোন্ নরকে, আর তারা কোন্ স্বর্গে! বোধ হয় মিঃ বাসুর

ওখানে আপনার নিমন্ত্রণ আছে। যেতেই হবে। খবর দেবে এখুনি।

—স্বর্গই বটে। শহরের দক্ষিণে। খোলা জায়গায়। গিয়ে দেখবেন কি চমৎকার হাওয়া। কি সবুজ লন্। অর্নামেণ্টাল ব্রিজ, বড় বড় কাঁচের সার্সি-খড়খড়িওয়ালা জানালাদরজা, লাইট, ফ্যান—সেসব অন্য ব্যাপার। আসল কথা সেসব তো আপনার আমার জন্যে তৈরি নয়, সে ছিল সাহেবদের জন্যে। সাদা চামড়া গায়ে থাকলেই অফিসার্স কোয়ার্টার্সে তার জায়গা—কি বড় কি ছোট। কোন সাহেব কখনও তিন নম্বর চার নম্বরে থাকত না—দু নম্বর এক নম্বর তো দূরের কথা। কি করে শোষণ করেছে দেশটা! আমাদের মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে নি।

বেলা গেল।

পয়লা বৈশাখের উৎসবসভা এবং সেই সঙ্গে 'বিচিত্রানুষ্ঠান' বলে একটা কথা সব জায়গায় বড্ড চলেছে—সেই 'বিচিত্রানুষ্ঠান'।

যথারীতি সবই ছিল। সভাপতি-নির্বাচন, উদ্বোধন-সঙ্গীত, মাঝে মাঝে বিকল হওয়া মাইক, রবীন্দ্র-সঙ্গীত (ভুল সুরে), আধুনিক কাব্য-সঙ্গীত (কোন প্রকার সুর নেই তাতে), বক্তৃতা; তার পরে আবার 'বিচিত্রানুষ্ঠান'।

সর্বশেষে সভাপতির অভিভাষণ দিতে যখন উঠলাম, তখন রাত দশটা। লোক জড় হয়েছে বহু, কয়েক হাজার হবে। বিচিত্রানুষ্ঠানের পরে কেউ দাঁড়াত না সভাপতির অভিভাষণ শোনবার জন্যে—কিন্তু সভার উদ্যোক্তারা ভারি চালাক, তাঁরা সবশেষে রেখে-ছিলেন একটি অতি লোভনীয় ব্যাপার এবং সেটা বড় বড় অক্ষরে কার্যসূচীতে ছাপিয়েও দিয়েছিলেন; সেটি হল 'জলযোগ'। অর্থাৎ দালদায় ভাজা বঁদে আর দরবেশ মিঠাই, বাস। শালপাতার ঠোঙায় ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছাসেবকদল সকলের পেছনের সারির ছেলেমেয়ে-দের মধ্যে বিলুতে শুরু করে দিয়েছে।

দু একজন চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—বড্ড গোলমাল হচ্ছে। দেওয়া বন্ধ কর এখন—দেওয়া বন্ধ কর—

আর দেওয়া বন্ধ কর। ঐজন্যেই আসা। আর ঐ 'বিচিত্রানুষ্ঠান'-এর জন্যে।

কে এসেছে সভাপতির বাজে ভ্যাজ-ভ্যাজ শুনতে!

দু একবার হাততালি পড়ল। কিন্তু পিছনের ছেলেমেয়ের সারি 'জলযোগ'-এর ঠোঙার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে। সংক্ষেপে সেরে বসে পড়লাম।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়াও শেষ হয়ে গেল।

একজন ভদ্রলোক এসে বললেন—চলুন, একটু জলযোগ—হেঁ হেঁ—এই পথে—আজ্ঞে—

না। আয়োজন বেশ ভালই। নিন্দে করবার কিছুই নেই। খুব ভাল আয়োজন।

বেরিয়ে আসছি, এমন সময় ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ কে একটি ছোকরা এসে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। মুখ তুলতেই দেখলাম সে আমাদের গ্রামের হীরু জেলের ছেলে কানাই। কানাই ম্যাট্রিক পাশ করে আগে পূর্ববঙ্গে কোথায় যেন রেলে চাকরি করত।

বললাম—এখানে কাজ কর নাকি?

—হ্যাঁ। পাকিস্তান থেকে চলে এসেছি, ঈশ্বরদি ছিলাম। আপনাকে মা ডাকছে—ওইখানে দাঁড়িয়ে—

—তোমার মা! এখানে?

খুব অবাক হয়ে গেলাম। কানাই জেলের মা চিরদিন পাড়ায় চিঁড়ে কুটে, ধান সিদ্ধ করে ও মাছ বিক্রি করে সংসার চালিয়ে এসেছে। অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে ও বৌ সে। চিরদিন দেখে এসেছি জ্যৈষ্ঠ মাসে আম কুড়ুবার জন্য খুব ভোরে উঠে সে গ্রামের পেছনের বড় জঙ্গলেভর্তি আম-কাঁঠাল বাগানে আম কুড়ুবার জন্যে যেত, আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোজ তাকে দেখা যাবেই আমবাগানে গভীর কাঁটাবন ও লতাপাতার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে বাদুড়েখেকো আম কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষেই পল্লীগ্রামের দেশী

আম শেষ হয়ে যায়, আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ওকে আম কুড়ুতে দেখে আমার হাসি পেত।

আমার বাড়ীর ওপর দিয়ে ওর আম কুড়িয়ে ফেরার রাস্তা। পাড়াগাঁয়ে যেমন হয়, এক বাড়ীর উঠোন দিয়ে অপর বাড়ীর লোকে যাতায়াত করে। ও যখন ফিরত, তখন ওকে বলতাম, ও কানাইয়ের মা, কি আম কুড়ুলে?

কানাইয়ের মা চুপড়ি দেখিয়ে বলত—আম আর কই দাদাঠাকুর। এই দেখুন—

প্রায়ই ঘেয়ো বাদুড়ে-খেকো আম দু একটা ছাড়া দেখতাম না। ও আবার এত ভাল, যেদিন একটাও ভাল আম পাবে, সেদিন আমাকে বলত—এই আমটা আপনার জন্যি দিয়ে যাই। রাখুন।

আমি বলতাম—না না, তুমি নিয়ে যাও—

ও শুনবে না, ঠিক দিয়েই যাবে।

গ্রামের মধ্যে সকলেই বলত, কানাই জেলের মা বড় সৎ। কখনও কারো সঙ্গে ঝগড়া করে নি। মাছ বিক্রির সময় ওর সরলতার সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণপাড়ার ঘুঘু গিন্নীরা ধারে মাছ নিত, ছ মাস ঘুরিয়েও পয়সা দিত না—অবশেষে হয়তো পয়সা মেরে দিত। কখনও কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ ওর ছিল না, আবার ধার চাইলে, ছ মাস ঘুরিয়ে যে কাল পয়সা দিয়েছে, তাকেও আজ আবার মাছ দেবে।

আমাদের পাড়ার রাম চাটুজ্যের ছেলে জেলি পিতৃহীন দরিদ্র অবস্থায় কোন রকমে নিজের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পাশ করে রেলে কি একটা চাকরি পেয়েছিল। জেলির মা একা থাকতেন বাড়ীতে, বাড়ীর সামনের ডোবায় হয়তো সকালে কানাইয়ের মা বাসন মাজতে এসে দেখলে বামুনপাড়ার ঘাটে (একটা ছোট্ট ডোবার আবার তিনটে ঘাট!) জেলির মা বড়ি দেওয়ার ডাল ধুতে নেমেছেন। জেলির মা হেসে বললেন—ও জেলে-বৌ, জেলি কাল রাত্তিরে বাড়ী এসেছে—

—ওমা, কি হবে! তাই নাকি?

অমনি সে এঁটো বাসন ফেলে ছুটে আসবে।

—কই, কোথায় গেল আমার সোনা, আমার মানিক, আমার বাছা—

জেলিকে সে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল। যখন জেলি বাড়ী আসবে, তখন সে কি অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের পরিচয় ওর চোখে মুখে! জেলির জন্যে বড় কই মাছ যোগাড় করে নিয়ে আসবে, নিজের ঘরের গাইয়ের দুধ ঘটি মেপে দিয়ে যাবে, সরু চিঁড়ে কুটে সঙ্গে বেঁধে দেবে জেলির চাকুরিস্থানে চলে যাওয়ার দিন।

কত দিন এই মাতৃস্নেহের লীলা দেখে এসেছি।

সেই জেলেবৌ আজ এখানে!

কত দূরে যশোর জেলার এক অজ পাড়াগাঁ থেকে! জীবনে কখনও যে রাণাঘাটও যায় নি, সে আজ এসেছে খড়্গপুর, সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে, বাঁশবাগানের তলায় ওদের জেলেপাড়ার সেই খড়ের ঘরখানা ছেড়ে ছেলের বাসায়!

জেলেবৌ আমায় দেখে এগিয়ে এসে বললে—দাদাঠাকুর আমাদের কতদূরে এসে নেকচার বলছে! আমায় কানাই বললে—দাদাঠাকুরের নেকচার হবে আজ সভায়। আমি বলি, আমায় নিয়ে চল, কতকাল দেখি নি তাঁকে। কি সুন্দর নেকচার বললেন আপনি!

বলে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। বয়সে সে আমার চেয়ে বড়, আমার দিদির সমান। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, জেলেবৌ আরও বড় হলেও সে এমনিভাবেই আমায় প্রণাম করত। গ্রামের নিয়ম।

বললাম—ভাল আছ কানাইয়ের মা?

—আপনাদের আশীর্বাদে আছি একরকম। বৌদিদি কই? ছেলেমেয়েরা সব ভাল?

—একরকম ভাল আছে। আজকাল সবাই কলকাতায়।

—দেশে যান নি?

—মধ্যে গিয়েছিলাম। মাস দুই আগে।

ও অমনি আকুল ও পিপাসিত সুরে বললে—বলুন গাঁয়ে কে কেমন আছে?

ইতিমধ্যে সভার উদ্যোক্তাগণ আমাকে তাগিদ দিতে লাগলেন—তাহলে কাইণ্ডলি আসুন, আবার আমাদের নববর্ষের ডিনার পার্টির আয়োজন রয়েছে মিঃ বাসুর ওখানে—

আমার কিন্তু যাবার ইচ্ছে নেই সত্যি একটুও। এদের টান আমার হাজার ডিনার পার্টির চেয়েও বেশি। সমস্ত খড়্গপুর শহরের হাজার সুশিক্ষিত, সুমার্জিত, সুভদ্র লোকের মধ্যে এই গ্রাম্য, অশিক্ষিতা জেলেবৌকে আমার অনেক বেশি আপনার জন বলে মনে হল সেই মুহূর্তে।

জেলে-বৌ বললে—তা হবে না, সে কি দাদাঠাকুর? মোদের বাসায় যেতি হবে না বুঝি, না এমনি ছাড়ব? পায়ের ধুলো দেবেন না বুঝি বাসায়?

—চল। যাব না কেন? বাঃ—

এদিকে এরা ছাড়ে না।—সে কি সার? এখন গেলে আর কি ওরা না খাইয়ে ছাড়বে? যাবেন না।

আমি বললাম, কিছু না, বেশি দেরি হবে না। এখুনি আসছি। দেশের লোক ধরেছে—

ওদের সঙ্গে ওদের বাসায় গেলাম। মুশকিল, দু নম্বরের বাসা, কম মাইনের লোকের বাসা।

আমাকে ওরা নিয়ে গিয়ে ঘরে বসালে। দুখানা ছোট্ট ঘর, একটা রান্নাঘর, একটা বারান্দা—এই হল দু-নম্বর কোয়ার্টার্স। বৈশাখ মাসের দারুণ উত্তাপে সে ঘরের অবস্থা যে কি, তা না অনুভব করলে বুঝিয়ে বলা কঠিন। জেলখানা এর চেয়ে ভাল। নড়বার-চড়বার জায়গা নেই। আলো-বাতাস আসে না, হাঁপ ধরে যায়। একখানা ঘর একটু সাজিয়ে রেখেছে, একখানা ফর্সা চাদরও পেতে রেখেছে বিছানার। একটা সস্তা টাইমপিস ঘড়ি কিনে ছোট একটা টেবিলে রেখে দিয়েছে। ওর বাপ হীরু জেলেকে আমরা বাল্য-কালে দেখেছি বাঁশের দোয়াড়ি তৈরী করে মাছ ধরত, হাটে মাছের ঝুড়ি নিয়ে গিয়ে মাছ বিক্রি করত। কানাইয়ের মা টিনের ক্যানেস্ত্রায় ধান সেদ্ধ করত বাড়ীর উঠোনের আমতলায়। বড় গরিব ছিল ওরা।

কানাইয়ের বৌ এসে আমাকে প্রণাম করলে। বললে—বসুন, একটু চা করে দেব?

আশ্চর্য, এরা চা খেতে আরম্ভ করেছে এখানে এসে! কানাইয়ের মা আহ্লাদের সুরে বললে—কানাই একটা ঘড়ি কিনেছে দাদাঠাকুর।

সেই সস্তা টাইমপিস ঘড়িটা।

আমি সেটা হাতে নিয়ে ভাল করে নাড়িচাড়ি, দেখি। খুব প্রশংসা করি ঘড়ির।

বললাম—বাঃ, বেশ টেবিল-চেয়ার দেখছি যে!

—কানাই সব করেছে দাদাঠাকুর।

—দিব্যি সাজানো ঘর। ওখানা কি টাঙানো?

—বৌমার হাতে তৈরি। ঝিনুক দিয়ে তৈরি ফুল।

—বাঃ, বেশ করেছে বৌমা।

—হবে না? বেশ ভাল ঘরের মেয়ে যে! গান গাইতে জানে। দিব্যি গান, হ্যাঁ।

—গান,?

—হ্যাঁ, বাজনার বাক্স বাজিয়ে—

—হারমোনিয়াম? এটা সত্যি আশ্চর্য কথা হল।

—শোনবা গান দাদাঠাকুর? ও বৌমা, চা করে গান শুনিয়ে দাও দাদাঠাকুরকে। আজ আমার কত আনন্দের দিন! দাদাঠাকুর পায়ের মাটি ঝেড়েছেন আমার ঘরে।

—না, বড্ড খুশী হলাম কানাইয়ের মা। কানাই যে এত উন্নতি করবে সব রকমে, তা আমি জানতাম না।

কানাইয়ের মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে—আশীর্বাদ কর দাদাঠাকুর, কানাই আমার বেঁচে থাকুক, সংসারে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে আঁচায় যেন। জান তো, যখন তিনি মারা গেল, কি কষ্ট করে মানুষ করেছি। কানাই তখন এক বছরের, বাচ্চা। কত কষ্ট করিছি ওর জন্যি। লোকের ধান সেদ্ধ করে, চিঁড়ে কুটে, বাসন মেজে তবে ওকে

মানুষ করিছি। সেই কানাই আজ বিয়ে করে মোদের বাসায় এনেছে, ঘড়ি কিনেছে, কেদারা কিনেছে, চা খাচ্ছে—

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম—ঠিক ঠিক। তার আর কথা কি বল।

এই সময় কানাই আমার জন্যে খাবার কিনে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। কানাইয়ের বৌ একটা রেকাবিতে গরম কুমড়োর ফুলুরি, রসগোল্লা ও নিমকি আমায় খেতে দিলে। বললে—খেয়ে দেখুন, কুমড়োর ফুলুরি এখন ভাজলাম। চা নিয়ে এলে কানাইয়ের মা বললে—এই পেয়ালাগুলো কানাই এবার কিনেছে। ভাল দাদাঠাকুর?

—খুব ভাল। চমৎকার।

কানাই সলজ্জ সুরে মাকে বললে—তুমি যাও ওদিকে, পান নিয়ে এস কাকাবাবুর জন্যে।

সে বেচারী জানে না, তার মা আগে কি বলেছে, বা এখন আরও কি বলবে।

কানাইয়ের মা কিন্তু নাছোড়বান্দা।

ওর বৌমাকে নিয়ে এসে হাজির করলে গান শোনাতে। হারমোনিয়ম নিয়ে এল।

বললাম—এ হারমোনিয়ম কি কানাই কিনেছে নাকি?

কানাইয়ের মা বললে—না দাদাঠাকুর। বৌমা গান করে বলে পাশের বাসা থেকে আনা।

গান গাইলে কানাইয়ের বৌ। মন্দ নয়, বেশ গান।

আসবার সময় কানাইয়ের মা বললে—কেমন গান গায় আমার বৌমা?

—ভারি চমৎকার। অতি সুন্দর গান।

কানাই বললে—তুমি যাও দিকি মা—ওদিকে যাও। কাকাবাবুর দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি পেঁছে দিয়ে আসি।

ওদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

কানাইয়ের মা আমার সঙ্গে গলির মোড় পর্যন্ত এল।

সে বড্ড খুশী যে, আমি তাদের বাসায় এসেছি বা এখানে চা-খাবার খেয়েছি।

আমাদের গ্রামে বসে কখনও ও ব্যাপার সম্ভব হত না।

আরও খুশী এই যে, কানাই আজ এত বড় হয়েছে, এত উন্নতি করেছে।

বার বার আমায় বলতে লাগল—যদি গাঁয়ে যান দাদাঠাকুর, মোদের কথা বলবেন সবাইকে। আমি কতকাল গাঁয়ে যাই নি। সেই আর বছর আষাঢ় মাসে বাসায় এইছি এক বছর হতি চলল—বড্ড মনে পড়ে গাঁয়ের কথা—মোদের উঠোনের গাছটার অতগুলো পেয়ারা, এবারে কে খাবে কি জানি!

এর পরে মিঃ বাসুর ডিনার পার্টিতে খুব জাঁকজমকের ভোজ ও আদর-আপ্যায়নের ব্যাপার। চপ, কাটলেট, পায়েস, ক্ষীর, আম, সন্দেশের ছড়াছড়ি। সত্যি চমৎকার খাওয়া। অফিসারদের অঞ্চলের বড় বাংলো। টেনিসের সবুজ লন। ভারবিনা ও জিনিয়ার সারি। অ্যারিস্টলোকিয়া লতার ঝুমকো ফুল গেটে দুলছে। মিঃ বাসুর মেয়ে কল্যাণী, নীলিমা এসরাজ বাজিয়ে আমাদের শোনালে, রবীন্দ্রসংগীত গাইলে, ছোট মেয়ে রেণু একটা ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করলে। তার পর দুই বোনে মিলে রামধুন গাইলে অতি সুন্দর। দুই বোনই শান্তিনিকেতনে থেকে পড়াশোনা করে! দেখতেও সুন্দরী।

খেতে বসে কতবার মনে হল কানাইয়ের মার বাসার সেই সস্তা টাইমপিস ঘড়িটাতে কটা বাজল দেখে আসি।

বন্দী

অনেকদিন পরে দেশে ফিরেছি মাত্র দিন পাঁচ-ছয়ের জন্যে। বাড়ীতে চাবি দেওয়া আছে আজ বছর খানেক। স্ত্রীপুত্র ঘাটশিলার বাড়ীতে গিয়েছে অনেকদিন। বর্ষাকালে আর নিয়ে আসব না।

বাজারে একটি লাইব্রেরী করেছে ছেলেরা। বিকেলে সেখানে তারা আমায় নিয়ে গেল।

সেখানে বসে ওদের সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময় বাইরে থেকে কে বললে, আপনাকে একজন ভদ্রলোক ডাকছেন। বাইরে এসে দেখি একটি যুবক বেঞ্চির ওপর বসে আছে, আমায় দেখে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে উঠল। বললাম, বসুন বসুন, নমস্কার। কোথা থেকে আসছেন?

যুবকের বেশের দিকে চেয়ে আমার একটু অদ্ভুত লাগল। লম্বা প্যাণ্ট ও হাফ-শার্ট পরা, গলায় দুটো টাই একসঙ্গে বাঁধা। পায়ে দামী চামড়ার জুতো, তবে বর্ষার জলে-কাদায় বিবর্ণ। চোখে চশমা, কব্জিতে হাত-ঘড়ি। আমায় 'যুক্ত করে' নমস্কার করে বললে, চিনতে পারছেন না?

—না।

—কেন, সেই বাগেরহাটে?

বাগেরহাটে দু বছর আগে একটা সভায় গিয়েছিলাম বটে, কতলোকের সঙ্গেই সেখানে আলাপ হয়েছিল, তার মধ্যে কোন একজনকে মনে করে রাখার মত আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি আমার নেই। তবুও মিথ্যে কথা বলতে হল বাধ্য হয়ে। এত আশার দৃষ্টি যুবকের চোখে, কেমন মায়া হল। বললাম, ও! এবার মনে পড়েছে বটে। না চিনতে পারার একটা যুক্তিসংগত কারণ দেখাতে গিয়ে বললাম,—আপনার চেহারা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছে।

এমন কেউ নেই যে ভাবে না তার স্বাস্থ্য বর্তমানে ভাল যাচ্ছে না। যুবকটি তখনই বললে, মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া হচ্ছে এদেশে এসে।

—ও।

—বড় মনের কষ্টে আছি।

—ও।

—আপনার কাছে এলাম—

বলে একটু অপ্রতিভের হাসি হাসল। আমি চুপ করে বসে রইলুম, কোন্ দিকে ওর কথাবার্তার গতি বুঝতে না পেরে।

ও আবার বললে, আপনি যদি একটু—মানে—

আর একবার লাজুক হাসি হেসে ও চুপ করল।

আমি কিছু বুঝতে পারলাম না কোন্ সাহায্যের ইঙ্গিত করছে বক্তা। আর্থিক সাহায্য নিশ্চয়ই নয়, বেশভূষা দেখেই সেটা বেশ বোঝা যায়। অন্য কি ধরনের সাহায্য পেতে পারে, খুলেও তো কিছু বলে না।

বললাম, আপনি এখানে আছেন কোথায়?

চালতেপোতা গ্রামে। বড় কষ্টে আছি। আই অ্যাম অলমোস্ট এ প্রিজনার ইন মাই ওন হোম।

—কেন, কেন?

—পয়সা হাতে নেই, বুঝলেন না! একটুখানি রানাঘাটে যদি যেতে হয় তাও পরের হাত-তোলা পয়সার ওপর ডিপেন্ড করতে হয়! আই ফিল লাইক এ হাফ-ড্রাউন্‌ড ম্যান। কলকাতা তো বহুদূর—কে অত পয়সা ভাড়া দেবে!

—ও।

আর কি বলি 'ও' ছাড়া? ব্যাপারটার চারিপাশে এখনও বেশ ঘনীভূত কুয়াশা। কেনই বা নিজের বাড়ীতে নিজে বন্দী। কেনই বা কোন চেষ্টা করে না অর্থ উপার্জনের, বাধা দিচ্ছেই বা কে! ব্যক্তিগত সংবাদ বেশি জিজ্ঞাসা করার দরকারই বা কি আমার।

তার পর ও আপনিই বললে,—বড্ড কষ্ট হচ্ছে এখানে। কখনও পাড়াগাঁয়ে থাকি নি। একটা মানুষ নেই যার সঙ্গে মিশি। আজ আপনি এসেছেন শুনে চালতেপোতা থেকে হেঁটে এলাম।

—হেঁটে এলেন? সে যে খাঁটি ছ'মাইল রাস্তা।

—বেশি হবে। প্রায় সাত মাইল। তবে একটা সোজা রাস্তা আছে মেহেরপুর রেল ফটকের পাশ দিয়ে মাঠের মাঝখান বেয়ে। এখন বর্ষায় সে পথে বেজায় কাদা।

—আপনার বড্ড কষ্ট হয়েছে—

—এ আর কিসের কষ্ট। আসল কষ্ট পাচ্ছি গাঁয়ে বসে। একটা কালচার্ড লোক নেই। না বোঝে সাহিত্য না বোঝে কোন কিছু। জানেন, পিকাসো বলে যে একজন শিল্পী আছে, তাই তারা কোনদিন শোনে নি।

—সেটা অপরাধ নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজেই বা ক'জন জানে পিকাসোর নাম?

—যাই বলুন, আমার শিক্ষা একটু অন্য রকম। আমি ভালবাসি কালচার, ভালবাসি আর্ট। যখন ইউনিভার্সিটিতে এম-এ পড়তাম, সে সময় একবার লাইব্রেরিয়ানের কাছে সেগান্ সম্বন্ধে বই চাইতেই তিনি—

—আপনি এম-এ পাশ?

যুবক পুনরায় অপ্রতিভের হাসি হেসে চুপ করলে একটুখানির জন্যে। বললে, পাস করি নি। এক বছর পড়েছিলাম—ওঃ—নাইনটিন থার্টিনাইন টু নাইনটিন ফর্টিটু এই তিনচার বছর—আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কটি বছর কেটেছে! বলে সে খানিকক্ষণ স্বপ্নাতুর আকুল দৃষ্টিতে জানালার বাইরে গিরীন ঘোষের ধানের আড়তের দিকে চেয়ে রইল।

তার পরে বললে,—জানেন, আমি ইংরেজী প্রবন্ধ লিখে স্টেট্সম্যানে পাঠিয়েছিলাম। ফেরত পাঠিয়েছে। নেয় না। ইংরেজী কবিতাও লিখে থাকি। শুনবেন?

—বেশ বেশ, বলুন না।

—আচ্ছা, একটু পরে বলব। এখন এদের সামনে কি বলি বলুন। একখানা উপন্যাস লিখেছি—দু ভল্যুমে শেষ হচ্ছে। প্রায় ন শ পাতা। আপনাকে একদিন শোনাতে চাই।

—বেশ। একদিন নিয়ে আসুন না, তবে এই হপ্তার মধ্যে। নয়তো আবার চলে যাব।

—কালই নিয়ে আসব। আর ছোট গল্পও লিখেছি চার পাঁচটা। সেগুলো যদি কোন কাগজে বের করে দেন—

—আপনি পাঠিয়ে দিন কোন ভাল মাসিক পত্রিকার ঠিকানায়। তাদের ভাল লাগে, ছাপবে।

—ওরা নেয় না। ভাল গল্প পাঠিয়ে দেখেছি, পড়েও দেখে না। ফেরত দেয়। সেই জন্যেই তো আপনার কাছে আসা—যদি একটু সাহায্য করেন। আসল কথা কি জানেন, আই অ্যাম এ প্রিজনার ইন মাই ওন হোম। দুটো টাকা চাই, রাণাঘাটে যাব তা বাড়ীতে চাইলে কেউ দেবে না।

আবার সেই কথা। এবার জিগ্যেস না করে পারলাম না। বললাম, বাড়ীতে কে আছেন!

—সবাই আছেন। বাবা, মা—

—মা বেঁচে?

—আপন মা নয়। তাহলে আর ভাবনা ছিল কি। বিমাতা। বাবা বুড়োবয়সে বিমাতার বশ। আমি কেউ নই বলেই মনে হচ্ছে। বাড়ী থাকি, দুটো খেতে পাই—এই পর্যন্ত। একটা পয়সা হাতখরচ দেবে না। আই লাইক টু বাই বুকস্, আই নীড এ নিউজ-পেপার- এসব কোথা থেকে হয় বলুন।

—তাই তো।

কি আর বলি। লোকটি আমাকে বড়ই বিপদে ফেললে দেখছি। সাংসারিক ব্যাপারের এসব কথা আমাকে শোনানোর দরকার কি। বলেই ফেললাম কথাটা শেষে।

—আপনার তো চাকরি করা উচিত ছিল?

—ওই যে বললাম, আই অ্যাম এ প্রিজনার ইন মাই ওন হোম—

এ কথাটি বার বার বকে কেন? কে তোকে বেঁধে রেখেছে দড়ি দিয়ে বাপু। আর তাহলে তুমি এখানেই বা আস কি করে? যাক, ওসব কথায় আমার কোনই দরকার নেই।

চুপ করেই রইলাম।

হঠাৎ সে বললে, হ্যাঁ, আমার ইংরিজি কবিতাটি শুনুন—

—বেশ, বেশ, আনন্দের সঙ্গে শুনব—

—একটু বাইরের দিকে নির্জনে চলুন, এখানে আবার মেলা লোক রয়েছে। না

থাকলেও জমে যাবে কবিতার আবৃত্তি শুনলে।

লাইব্রেরির বাঁ দিকে মাঠের মধ্যেকার একটা কৎবেল গাছ, তার পাশে বৈঁচি ঝোপ, তার পাশে একটা ডোবা।—এই নির্জন জায়গাটাতে বৈঁচি ঝোপের আড়ালে সে আমায় নিয়ে গিয়ে হাত-পা নেড়ে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলে—ও মাই বিলভেড ইংল্যান্ড!' এই হল তার কবিতার প্রথম লাইন। বেশ চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে। ইংরিজি কবিতাটিও মন্দ লেখে নি—তবে কি আর শেলি, শেকস্‌পিয়ার, কীট্‌স্‌ কিংবা ব্রাউনিঙের মত হবে ওর কবিতা? না তরু দত্ত বা রবীন্দ্রনাথের মত হবে? একজন বাঙালী যুবকের সাধারণ বুদ্ধিবিদ্যার পক্ষে মন্দ শুধু নয়—ভাল।

আমার সত্যি আশ্চর্য লাগল। এর মধ্যে দেখছি জিনিস আছে।

লাইব্রেরিতে স্কুলের ইংরিজি পড়ানোর মাস্টার ব্রজেনবাবু বসে ছিলেন, তাঁকে ডেকে ওর আবৃত্তি শোনালাম। তিনি বললেন, বাঃ বাঃ, সত্যি খুব ভাল। আপনি কি করেন?

আমি বললাম, কিছুই করেন না। দিন না আপনাদের ইস্কুলে একটা চাকরি।

যুবকটিও হাত কচলে বিনীত ভাবে বললে, দিন না, তা হলে তো খুব ভাল হয়।

ব্রজেনবাবু অপ্রতিভ ভাবে বললেন, আমি আপনার মত লোকের চাকরির কি ব্যবস্থা করব বলুন—হেড মাস্টারকে বরং বলুন। বেশ ইংরিজি জানেন আপনি।

যুবক উৎফুল্ল মুখে বললে, কলেজে আমাদের ক্লাসে আমার নাম ছিল 'দি পোয়েট'। শ্যামসুন্দর রায়কে চেনেন তো? চেনেন না? ও আমার ক্লাস-মেট। ফিলজফিতে অনার্স ছিল ওর। কলেজ লাইব্রেরিতে বসে দুজনে একসঙ্গে পড়াশুনো করতাম। বিলেতে যাওয়ার কত শখ ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে বসে দুজনে এই রকম বই পড়ব কল্পনা করতাম। বললাম যে আপনাকে, কলেজের দিনগুলো, নাইনটিন থার্টিনাইন টু নাইনটিন ফর্টিটু—এই গিয়েছে বেস্ট ইয়ার্স অব মাই লাইফ—আর সেসব দিন ফিরবে না—

আমি কৌতূহল অনুভব করছিলাম ওর কথায়। হাত-পা নেড়ে বেশ কথা বলে। বলবার ক্ষমতা আছে। এসব অজ পাড়াগাঁয়ে বসে ওই অতীত দিনের গল্পের সময় যে ছবিটি ওর মনে জাগে, ও সুখ পায় তাতে। সুতরাং বলতে ভালবাসে সেসব গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা। ওর জীবন ওর কাছে বড়। আমি তার কি বুঝি।

আরও বুঝলাম বেচারী শ্রোতা পায় না। এসব কথা শোনবার লোক এ অজ পাড়াগাঁয়ে নেই। তাই বোধ হয় আমার খোঁজ করে আমায় বার করেছে। শুনিয়ে ওর সুখ হয়, আমার শুনতে আপত্তি কি।

বললাম, আপনার বন্ধু শ্যামসুন্দরবাবু এখন কোথায়?

ওর মুখখানা কালো হয়ে গেল যেন। কি যেন একটা ব্যথা পেয়েছে। কি একটা কথা খানিকক্ষণ ভাবল। তার পর আস্তে আস্তে বললে, সে লন্ডনে থাকে।

—লন্ডনে? কিছু পড়তে গিয়েছে?

—ইন্ডিয়া অফিসে চাকরি করে আর সেই ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনো করে। যা আমরা বসে বসে কল্পনা করতাম, তাই। আমার হল না, ওর হল। আর আমি এই পাড়াগাঁয়ে বসে বসে—

সান্ত্বনার সুরে বললাম, কি আর করবেন বলুন। এমন কত হয়।

—হয়, জানি। কিন্তু—

আবার সেই স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে বৈঁচি ঝোপ আর ডোবার ওধারে দীর্ঘ টানা দূরবিস্তৃত আউশ ধানের মাঠে কচি কচি সবুজ ধানের জাওলার দিকে চেয়ে রইল। তার পরে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, জানেন? ডেভনশায়ার ইজ দি ফেয়ারেস্ট কানট্রি ইন ইংল্যান্ড! লর্না ডুনের লেখক বলে গিয়েছেন। ওঃ ন্যারো লেন্‌স্‌ অব ডেভন! কত জিনিস ঘটে গিয়েছে ডেভনশায়ারে। ডেন্‌স্‌রা এসে ওর গ্রামগুলো পুড়িয়েছিল, স্প্যানিয়ার্ডরা ওর কোস্ট আক্রমণ করেছে। ইংল্যান্ডের সিভিল ওআরে ওখানকার লোক লড়েছে। সমস্ত ডেভনশায়ার এক সময়ে বনভূমি ছিল। হরিণ চরে বেড়াত। র‍্যালে, ড্রেক, হকিন্‌স্‌—সব ডেভনের লোক। বিরাট মুরল্যান্ড, বাল্যকাল থেকে কত সাধ ছিল, সন্ধ্যেবেলা মুরল্যান্ডে বেড়িয়ে বেড়াব, ক্রমলেক দেখব। লর্না ডুন পড়ে পাগল হয়েছিলুম কলেজে, ডুন

কাউণ্ট দেখব, ব্ল্যাকমুরের অমর কাহিনী।—লিণ্টন! লিন্‌মাউথ! ইনফ্রাকুম্‌ব! এসব কতদিনের স্বপ্ন! হল না। কোথায় ডেভনশায়ার লেনের সৌন্দর্য, কোথায় ডার্টমুর আর কোথায় পড়ে আছি চালতেপোতা গাঁয়ে বাঁশবাগানে মশার কামড় খেয়ে! কি অদ্ভুত আয়রনি অব ফেট, তাই ভাবি! শ্যামসুন্দর দিব্যি দেখছে। আমি শুয়ে ভাবি ও লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় বেড়াচ্ছে, উইন্ডারমিয়ার দেখছে, ওআর্ডসওআর্থের লেক অঞ্চল দেখছে—আর আমি কি করছি? ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে যায়—রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। কি হতে চলেছিলাম আর কি হলাম! জানেন, ইংল্যাণ্ডকে এত ভালবাসি! কেন জানি নে, মনে মনে এত ভালবাসি! কত সাধ ওখানে যাব—আমারই হল না।

কি বিপদ! ডোবার ধারে বৈঁচি ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে এ উইন্ডারমিয়ার হ্রদের ছবি দেখতে লাগল! লোক জমে যাবে এখুনি ওর উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে। অবিশ্যি এখন কেউ নেই এখানে। ব্রজেনবাবু আবৃত্তি শোনবার পরে চলে গিয়েছেন। আমি আবার সান্ত্বনার সুরে বললাম—আপনার বয়স বেশি না, কত বেশি বয়সের লোক বিলেতে যাচ্ছে না কি? আমার এক বন্ধু এতকাল পরে এবার এক মালজাহাজে ডানবার বন্দরে গেল। সে ইস্কুলে মাস্টারি চাকরি পেয়েছে ভিক্টোরিয়া নায়ান্‌জা হ্রদের ধারে একটা ছোট শহরে। অনেক ভারতীয় আছে, তাদের ইস্কুল আছে, সেই ইস্কুলে। দেখুন তো মনের কত তেজ ও উৎসাহ! ভারত স্বাধীন হয়েছে, এখন ভারতের তরুণদের সামনে কত বিস্তৃততর ক্ষেত্র, কত কাজ কত দিকে, কত দেশে কত ডাক পড়বে! আর্মিতে যান, নৌভিতে যান, ডিপ্লো-মেটিক সার্ভিসে ঢোকবার চেষ্টা করুন, ব্যবসা করুন, খবরের কাগজে লিখুন, বই লিখুন, বক্তৃতা করুন—আপনি এ বয়সে বসে থাকবেন কি! কিসের বলছেন বন্দী, বন্দী। কিসের বন্দী আপনি?

যুবক বসে বসে আমার কথা শুনলে। কোন উত্তর দিলে না। বিশেষ কোন উৎসাহ পেয়েছে আমার কথা থেকে বলেও মনে হল না।

একটু পরে সে বললে, আমার অবস্থা জানেন না। কি কষ্টে যে আছি, তা আমি জানি। আই অ্যাম রিয়্যালি এ প্রিজনার ইন মাই ওন হোম। মানে, বাবা এ বয়সে আমার বিমাতার বাধ্য। তিনি সংসারের তবিল রাখেন বিমাতার কাছে। আমার একটা পয়সা নিতে হলেও বিমাতার কাছে চাইতে হবে। তিনি মুখ ভার করেন পয়সা চাইলেই, পারত-পক্ষে দিতে চান না। বাবা চাকরির চেষ্টা করতে বলছেন, তাও তো কলকাতা যাবার গাড়ীভাড়া চাই। এই কাছে রাণাঘাটে যাওয়ার পয়সা পাওয়া যায় না, তা কলকাতার ভাড়া দিচ্ছে কে বলুন। এই পায়ে হেঁটে রোজ বিকেলে যতটা বেড়াই। কাজেই প্রিজনার ছাড়া আর কি বলুন।

—তাই তো দেখছি। তবে আপনি এ ভাবে বাড়ী বসে থাকলেও তো এ ব্যাপারের মীমাংসা হবে না। আপনাকে বাড়ী থেকে বেরুতে হবে, তা যতই দুঃসাধ্য হোক। আপনি কি বিয়ে করেছেন?

যুবক ঈষৎ কুণ্ঠা ও লজ্জার সঙ্গে বললে, তা করেছি।

—ও।

সমস্যা গুরুতর সন্দেহ নেই। যতটা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও জটিল। স্ত্রী এবং সম্ভবত দু-একটি পুত্রকন্যা নিয়ে ইনি পিতার সংসারের বেকার অতিথি, এই বর্তমান দুর্মূল্যতার বাজারে।

যুবক যেন খানিকটা আপন মনেই বলতে লাগল, কত আশা ছিল। এখনও সে আশা আমি ছাড়ি নি। বিলেতে আমি যাবই। এই মূর্খ আন্‌লেটার্ড পাড়াগাঁয়ে আমি বেশি দিন পড়ে থাকব না। একখানা ভাল বই কি কাগজ পাই নে পড়তে। অথচ এত পড়তে ভালবাসি। শেলির একটা ভাল এডিশন কিনব, বাবার কাছে টাকা চাইলে পাব না জানি, কেন না টাকা তাঁর কন্‌ট্রোলের মধ্যে নয়। আর একটা কথা আপনাকে বলি—

—হ্যাঁ বলুন।

—আমি একখানা ভাল উপন্যাস লিখেছি—দু ভলুম—বড় উপন্যাস। আপনাকে একদিন শোনাব।

—বেশ বেশ। যেদিন ইচ্ছে শোনাবেন।

—আপনার কবে সময় হবে?

—বিকেলে যে-কোনদিন আসতে পারেন।

—আপনি দেখে দেবেন উপন্যাসখানা, তার পর একজন পাবলিশার ঠিক করে দেবেন আমাকে। দেখি, আপনার দয়ায় যদি এবার মুক্তি পাই বন্ধন থেকে। আমি তাহলে বাঁচি —আমি বাঁচি—উঃ আমি মরে যাচ্ছি—আপনি জানেন না—ও, হোয়াট এগনি অ্যান্ড টর্চার আই অ্যাম পাসিং থ্রু।

বেলা গিয়েছিল।

বৈঁচিঝোপে রাঙা রোদ এসে পড়েছে।

লাইব্রেরী থেকে লোক চলে যাচ্ছে, পাড়াগাঁয়ের লাইব্রেরী কেরোসিন তেলের খরচ যোগাতে পারে না।

বাদুড় উড়ে যাচ্ছে বাঁওড়ের ওপার দিয়ে।

এই সন্ধ্যার আকাশের তলায় এই যুবকের মনের বেদনা আমাকে স্পর্শ করল।

কিসের বাঁধনে এই লেখাপড়া-জানা লোকটি পড়েছে তার খানিকটা আন্দাজ করতে পারলাম।

একটি স্নেহময় পিতার বড় আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্র—একদিন যার জন্মলগ্নে শুভশঙ্খ বেজেছিল একটি আনন্দমুখর গৃহস্থ-বাটিতে, আজ সেই পুত্র বড় হয়েছে, শিক্ষিত হয়েছে—বিবাহ করেছে—তবুও সেই পিতা আজ অসুখী কেন? সেই পুত্রই বা কেন সেই গৃহে নিজেকে বন্দী বলে মনে করছে আজ? প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের লাক্ষাবন্ধন-ন্যায় কাকে বলে আজ ভাল ভাবে বুঝলাম।

যুবক বললে, তবে আজ আসি—সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে। আমার কি, আমি রাত হলেও অন্ধকারে যেতে পারি—যতক্ষণ বাইরে থাকি, ততটুকুই ভাল থাকি।

—না না, দেরি না করাই ভাল। চালতেপোতা গ্রামের রাস্তা বড় খারাপ।

—তাহলে উপন্যাসখানা কাল নিয়ে আসব? দেখবেন একটু? ভাল উপন্যাস। চূর্ণি নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলাম। একটা ডুমুর গাছের তলায় বসে মনে কেমন ভাব এসে গেল। কি চমৎকার যে লাগল! যেন কোথায় এসেছি। কি সুন্দর পৃথিবী। অমনি এই উপন্যাসের প্লটটা মনে এসে—

—বুঝেছি। আসবেন কাল। নমস্কার।

যুবক প্রতিনমস্কার করে ছন্নছাড়া হতভাগ্যের মত শূন্যদৃষ্টি নিয়ে একবার চারিদিকে চাইলে। কি দেখলে চেয়ে জানি নে, সে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। তারপর হন হন করে মাঠ পার হয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে উঠে হেঁটে চালতেপোতার দিকে চলল। বড় মমতা হল ওর ওপর। ওর মনে রস আছে, অনুভূতির যাওয়া-আসা আছে, তা সত্ত্বেও ওর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ওর বাপের চোখের সামনে। ওর তরুণী স্ত্রী রয়েছে বাড়ীতে, তবুও ঘরে ফিরতে ওর মনে আনন্দ নেই। এত কষ্ট করে দু ভল্যুম উপন্যাস লিখে কোন্ সার্থকতা আসবে ওর জীবনে? আমি জানি কোন প্রকাশকই হঠাৎ তো ওর মত অজানা লেখকের উপন্যাস ছাপতে চাইবে না, ভাল হলেও না। ওর লেখক হওয়ার আশা আকাশ-কুসুম, যেমন আকাশ-কুসুম ওর বিলেতে যাওয়ার আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

লাইব্রেরীতে ফিরে গেলাম।

সেখানে দু-একজন তখনও বসে ছিল। একজন বললে, পাগলটা চলে গেল? আচ্ছা ভ্যাজোর ভ্যাজোর আরম্ভ করে দিয়েছিল আপনাকে নিয়ে সন্ধ্যের সময়!

—কে পাগল?

—আরে ওর মাথায় গোলমাল। জানেন না? সেই জন্যেই ওর বাবা ওকে কোথাও বেরোতে দেন না। কেবল বলে, বিলেতে যাব, এখানে যাব ওখানে যাব। সৎমা বড় কড়া, ওকে ঠিক শাসন রেখেছে। ওর নামই হল পাগলা যতীশ, ভীষণ ছিট-গ্রস্ত—ওর বাবা সেদিন বড় দুঃখ করেছিলেন ইস্টিশান মাস্টারের কাছে। বলছিলেন, এত আশা করে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন বিয়েও দিয়েছিলেন, ছেলেও বি এ পাশ, অথচ সব

কিছুই গোলমাল হয়ে গেল।

সত্যি তো। ছেলে হল, সে ছেলে শিক্ষিত হল, বিয়েও করলে। সে ছেলে ভাবুক কবি, মার্জিতরুচি, অনেক কিছু জানে, অনেক কিছুর খবর রাখে।

তবে কি-সব অভাবে সে সংসারের বোঝা হয়ে দাঁড়াল আজ? এর উত্তর কে দেবে? কেন এমন হয় কি জানি?

থনটন কাকা

রজনীবাবুদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে সেদিন ছোটখাটো একটা সাহিত্যিক বৈঠক ছিল। তর্ক, আলোচনা ও প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে সন্ধ্যা বেশ ভালই কাটল। রজনী-বাবু বর্তমানে সাত-আটটা বড় কয়লাখনি, বর্ধমান জেলার জমিদারি ও সিংভূম জেলার শালবন ও মৌজার মালিক; এসব বাদে কলকাতায় বাড়ী জমি তো আছেই নানাস্থানে।

রজনীবাবু বললেন—বসুন, বসুন। বেশি রাত হয় নি এখনও। পেঁৗছে দেব এখন গাড়ীতে। একটা গল্প বলি।—আমার তখন বয়েস ন বছর। আমাদের বাড়ী বর্ধমান জেলার বনপাশ স্টেশন থেকে দু ক্রোশ দূরে একটা ক্ষুদ্র গ্রামে। গ্রামের বাইরে অবধি মাঠ, শুধুই ধান হয় সে মাঠে, মাঠের মাঝখানে বড় বড় তালগাছে ঘেরা সেকেলে দীঘি, তার নাম 'গলাকাটা পুকুর'। বহু আগে যখন ওসব দেশের ওইসব তেপান্তর মাঠে নির্বান্ধব পথিকদের গলা কেটে ডাকাতেরা লাশ বেমালুম দীঘির জলে পুঁতে রাখত, তখন থেকে ওই নামে চলে আসছে দীঘিটা।

এবার রোদপোড়া মাঠে চৈত্র দুপুরে আমি আর গ্রামের দুটি ছেলে মাছ ধরছি, হঠাৎ একটি ছেলে—তার নাম হরু, রামচন্দ্র সাবুই-এর ছেলে, আজও মনে আছে—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ও কে—ওই দ্যাখ—

—কে রে? কই, কোথায়?

—ওই তো বসে।

তার পর সবাই মিলে কাছে গিয়ে দেখলাম তালগাছের তলায় এক সাহেব বসে; তার পরনে অতি জীর্ণ ও মলিন তালি দেওয়া প্যান্টালুন, তেমনি কোট, তেমনি জুতো।

আমরা কাছে যেতে সাহেব কি-একটা বললে, আমরা বুঝতে পারলাম না। যে সময়ের কথা বলছি, তখন একজন সাহেবকে এ অবস্থায় অজ পল্লীগ্রামে দেখা খুব একটা আশ্চর্য বিষয় ছিল। আমরা সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছি এমন সময় সাহেবটা আবার কি যেন বললে।

হরু বললে, ও খেতে চাইছে ভাই।

আমারও তাই মনে হল।

আমি হাত দিয়ে দেখিয়ে বললাম—আমার সঙ্গে এস।

সেই সাহেবকে নিয়ে আমাদের বাড়ী এলাম।

বাবা অবাক হয়ে এগিয়ে এলেন। তিনি মাইনর স্কুলের সেকেন মাস্টার। আমাদের বাড়ীতে দু তিনটে ধানের গোলা ছিল, চল্লিশ বিঘে ধানের জমি ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, জিনিসপত্রও তখন সস্তা ছিল। সংসার ভালই চলত, মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব ছিল না।

বাবা সাহেবকে বাইরের ঘরে একটা টুলের ওপর বসালেন। চেয়ার ছিল না আমাদের বাড়ী। ইংরিজিতে কি কথা তার সঙ্গে বললেন। তার পর আমাকে বললেন, বাড়ীর মধ্যে দিদিকে গিয়ে বল্ গে এক বাটি মুড়ি আর দুধ পাঠিয়ে দিতে। সাহেব খাবে।

আমি কিছু আশ্চর্য হয়েই দিদিকে গিয়ে কথাটা বললাম। আমার মা এ সময় খুব পীড়িত, আমার ছোট ভাই বিনয় তখন সবে মাস-খানেক হল জন্মেছে, মার শরীর সেই থেকেই খারাপ! দিদি কাঁসার বড় জামবাটিতে মুড়ি দুধ আর তালের গুড় একসঙ্গে মেখে আমার হাতে দিয়ে বললে, কেমন সাহেব রে?

—ভাল সাহেব।

—চল আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে আসি।

আমার দিদির নাম ছিল বীণা, আমার সে দিদি মারা গিয়েছে বহুদিন।

বাবার মুখে সব শুনলাম। সাহেব আসছে বরাকর থেকে, গরিব, ওর কেউ কোথাও নেই। বাবার কাছে আশ্রয় চেয়েছে; বাবা বলেছেন, থাক। তবে আমাদের ঘরে যা জোটে তাই খেতে হবে।

সাহেব তাতেই রাজী হয়েছে।

সেই থেকে সাহেব আমাদের বাড়ীই রয়ে গেল। গাঁয়ের লোক দলে দলে আসতে লাগল সাহেবকে দেখতে।

আমরা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতাম, ওই তো সায়েব বসে আছে—

বাইরের ঘরে সাহেব থাকত। কৃষাণের জন্যে একটা ছোট তক্তপোশ পাতা ছিল সেখানে অনেক দিন; সেইখানে পুরনো তোশক ও থলের চট, একখানা পুরনো চাদর ও একটা বালিশ, একটা ছোট মশারি দিয়ে সাহেবকে শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন বাবা। একখানা লোহার কলাই-করা সান্‌কি আর একটা কলাই-করা গেলাস, এই আমরা দিয়েছিলাম ওকে, তাতে সে ভাত খেত।

সাহেবের নাম ছিল থর্নটন। আমার মুখে ভাল উচ্চারণ হত না, আমি বলতাম থনটন কাকা। কেউ বলত ঠনঠন সাহেব।

আমাদের যা রান্না হত, থনটন কাকাকে তাই দেওয়া হত। দিদি এসে মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, থনটন কাকা খেতে জানে না, মাছের ঝোল আর তালের গুড় একসঙ্গে মেখেছে!

ওর কথা শুনে আমি গেলাম দেখতে। সে এক কাণ্ডই করেছে সাহেব। ডাল খায় নি, অথচ মাছের ঝোলে তালের গুড় দিয়ে মেখে চুমুক দিচ্ছে।

বললে ও, ইট ইজ সো হট!

কথাটা আমি স্পষ্ট বুঝলাম; ফার্স্ট বুক পড়ি, মানে করলাম, ইহা হয় এত গরম!

কিন্তু গরম—তাই কি? তালের গুড় মাখলে কি গরম কমবে?

পরে বাবা বলেছিলেন ওর মানে, খুব ঝাল। মাছের ঝোল খুব ঝাল হয়েছিল। হয়ই আমাদের বাড়ীতে।

বাবা বলেছিলেন সাহেবের তরকারিতে ঝাল কম দিতে।

আমি আর দিদি ওকে খেতে শেখালাম—কিসের পর কি খেতে হয়, কোন্ জিনিসটা কি ভাবে মাখতে হয়। থনটন কাকা আমাদের, বিশেষত দিদিকে, বড় ভালবাসতে শুরু করলে। ক্রমে একটু আধটু বাংলাও শিখে ফেললে আমাদের কাছে।

দিদিকে বলত অদ্ভুত বাঁকা সুরে—বী-ণা, ডাল ডেও। বাট ডেও নো—ডাল ডেও।

দিদি হাসতে হাসতে বলত—ভাত দেব না কাকা?

—নো। বাট ডেও নো। ডাল ডেও।

—বেগুনভাজা দেব? এই যে—এই দেব?

—নো।

থনটন কাকা বুড়ো লোক, পরে আমরা আবিষ্কার করলাম। সাহেবলোকের বয়স প্রথমটা আমরা বুঝতে পারি নি।

আমাদের সে তাসের খেলা শেখাত বাদলার দিনে বসে বসে। আমাকে ইংরিজি পড়াত বটে, তবে তার বাঁকা বাঁকা জড়ানো উচ্চারণ আমি প্রথমটা বুঝতেই পারতাম না। একদিন বাবাকে বললাম—বাবা, সাহেবকাকা ইংরেজি জানেন না।

—সে কি!

—কি রকম বলে, হাসি পায়।

—ও যা বলে, ওই ঠিক উচ্চারণ। আমাদের মুখেই হয় না। ও ঠিক বলে। ও যা বলে তাই শিখবি।

থনটন কাকা আমাদের গাঁয়ে পুরনো হয়ে গেল। রামায়ণ-গানের আসরে, কবির আসরে সাহেব গিয়ে বসত সকলের সামনে। করুণ গান শুনে হয়তো খুব হাততালি দিয়ে হাসি-

মুখে—এই রকম বুঝত।

একখানা মোটা বই বের করে মাঝে মাঝে পড়ত। বাবা বলতেন, ও বইকে বলে বাইবেল। সাহেবদের ধর্মপুস্তক।

সন্ধ্যের সময় ডাকত—বীণা—

দিদি এসে বলত—কি থনটন কাকা?

—খাটে ডাও।

—এখনও রান্না হয় নি। মুড়ি দেব?

—নিয়ে এস। টেল নো।

—না, তেল দেব না। গুড় দেব?

—গুড় ডাও।

এইভাবে দু বছর কাটল আমাদের বাড়িতে। তখন সে বেশ বাংলা শিখেছে, এমন কি নিজের নাম বাংলায় লিখত—জেমস থরনটন।

আমি বললাম—ও কাকা, ভুল হয়েছে। থরনটন কি? থর্নটন হবে। এই দেখ—একে বলে রেফ, এই বসাও। এবার হল থর্নটন।

—নো, নো রেফ অ্যান্ড অল দ্যাট। এই ডেখ—

—বেশ, দেখি—

সাহেব লিখল—থরনটন—

আমার দিকে চেয়ে বললে, ঠিক?

—না ঠিক না। এই দেখ—

—ও, হ্যাং—হোক। আমি লিখব—টোমার রেফ আমি লিখব না।

—লিখো না। লোকে বলবে থরনটন—

—লেট দেম। বলটে ডাও।

দিলাম।

সেবার জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে তাড়াতাড়ি সব আম পেকে গেল। আমি বললাম—থনটন কাকা, আম পেড়ে নিয়ে আসি চল পুকুরধারের বাগান থেকে।

—আমি সব পাকা আম খাব।

—খেও। লগা নিয়ে চল, আম পাড়তে হবে।

কিন্তু আম পাড়তে যাবার আগে পিওন এসে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে, পড়তে পার? এ বোধ হয় সাহেবের চিঠি।

থনটন কাকাকে চিঠিটা দিলাম। চিঠিখানা পেয়ে হঠাৎ ওর মুখ কেমন হয়ে গেল। সেখানেই খুলে পড়ল। পড়ে কি সব বলতে লাগল ইংরিজিতে! আর নড়ে না, ওঠেও না। কখনও আপনমনে হাসে, কি বিড়বিড় করে বলে। রাত্রে বাবার কাছে শুনলাম থনটন কাকা অনেক টাকা পাবে বিলেতে। ওর এক খুড়ী না পিসি ছিল, সে মারা গিয়েছে, ও তার সম্পত্তি পেয়েছে। বিলেতের উকিলেরা চিঠি লিখছে।

মাসখানেকের মধ্যে থনটন কাকা দেশে চলে গেল।

তার পর যে কথাটা বলবার জন্যে এ গল্পটার অবতারণা সেটা এখন বলি।

যাবার কিছুদিন আগে থনটন কাকা বাবাকে বললে—আমার তুমি অনেক উপকার করেছ, তোমার একটা উপকার আমি যাবার সময় করব। আমার সঙ্গে এক জায়গায় চল, রেলে যেতে হবে।

বাবা গেলেন।

বরাকর নদীর কাছাকাছি কোন একটা পাহাড়ের তলাকার শালবন আর লাল কাঁকুরে মাটির ডাঙা দেখিয়ে সাহেব বলেছিল বাবাকে—সমস্ত বাংলাদেশের কয়লার ক্ষেতের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কয়লা আছে এই জমির তলায়। আমি মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। কেন আমি তোমাদের বাড়ী গিয়েছিলাম, কেন এমন অবস্থায় পড়েছিলাম, সে কথা তোমাকে জানাব সময় মত। এখন আমার পরামর্শ, এই জমি বন্দোবস্ত নাও, কিংবা কেনো। কেউ জানে না এর তলায় কি অমূল্য সম্পদ লুকনো। আমার কথা

অবিশ্বাস ক'রো না। একদিন ভেবেছিলাম নিজে আমি এই জমি কিনে নেব বা বন্দোবস্ত নেব। কিন্তু অবস্থার ফেরে তা আমার ঘটল না। তার জন্যে দুঃখিত নই। তুমি আমাকে নিজের ঘরে নিজের সহোদয় ভাইয়ের মত স্থান দিয়েছিলে, তার খানিকটা প্রতিদান দিতে পেরে আমি খুশী হয়েছি। আমার কথা শোন, বড়লোক হয়ে যাবে। বীণার বিয়েতে যৌতুক দিলাম এই জমি। কাউকে এসব কথা বলবে না। ঘুণাক্ষরেও না। তা হলে সব যাবে।

বাবা বাড়ী এসে মার গহনা বিক্রি করে টাকা নিয়ে আবার চলে গেলেন বরাকরে।

সন্ধান নিয়ে জানলেন নিকটবর্তী পালনডি মৌজার ডিহি পাঁচপুর কাছারির জমিদার গঙ্গারাম মাহাতোর দু'আনি অংশের জমি ওটা। কলকাতার গৌরমোহন পাল দিগর বর্তমান মালিক।

গেলেন কলকাতায় জমিদারের বাড়ী। গৌরমোহন পাল দিগরের নায়েবকে কুড়ি টাকা ঘুষ দিলেন। নায়েব নক্সা ও কাগজপত্র দেখে বললে—এ জমি বহুকাল থেকে পতিত। এ আপনি কি করবেন?

নায়েবের সুরের মধ্যে যেন সন্দেহের রেশ রয়েছে।

বাবার বুক কেঁপে গেল। মনের অগোচর পাপ নেই। বাবা বললেন—চাষ-বাস করব।

ঘুঘু নায়েব হেসে বললে—সে কি মশাই? পাথুরে ডাঙায় কি চাষ হবে? চাষের জমি হলে এতকাল ও জমি পতিত থাকে? তাছাড়া ওর ত্রিসীমায় জল নেই। কিসের চাষ করবেন?

—গরুমহিষ পুষব, চাষ করব, বাসও করব, সব রকমই—

নায়েব চোখ মিটকি মেরে বললে—আমায় কি দেবেন?

—কেন গরিবের উপর জুলুম করবেন? আপনাকে খুশী করব।

—কত?

—একশ টাকা।

—না। ওতে হবে না।

—দেড়শ?

—না।

—কত বলুন?

—দশ হাজার টাকা। পাঁচ বছর পরে। নগদ দিতে হবে না। লেখাপড়া করুন। এরা কলকাতার বড়লোক, এরা কি জানে মশাই. আমি আন্দাজে বুঝেছি। তবে আপনাকে নগদ দিতে হবে না। একটি কর্জনামার খত রেজিস্ট্রি করা থাকবে। বুঝলেন? যেন আপনি দশ হাজার টাকা ধার নিলেন আমার কাছ থেকে।

—সে হবে না। রেজিস্ট্রার টাকার লেন-দেন নিজের হাতে করবে। দশ হাজার টাকা কে দেবে!

—তার ব্যবস্থা হবে। সব রোগের ওষুধ আছে।

জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেল।

তবে আমরা জমিদারকেও ফাঁকি দিই নি। এখন সে জমির আয় বার্ষিক নিট্ দেড় লক্ষ টাকা।

জমিদারের নাবালক ছেলেকে আমরা দু হাজার টাকা ফি বছর দিই।

আমাদের যা কিছু দেখছেন, সব সেই পালনডি কয়লার খনি থেকে। এখন আমাদের দশটা কোলিয়ারি, কোনওটাই কিন্তু পালনডির মত নয়। পালনডি লক্ষ্মীর ঝাঁপি। থর্নটন কাকার ছবি দেখবেন? চলুন পাশের ঘরে। না, আসল ছবি বা ফটো নয়। আর্টিস্টকে দিয়ে আঁকিয়েছি। আমি চেহারার বর্ণনা দিয়েছিলাম অবিশ্যি যতটা মনে ছিল।

রজনীবাবু গল্প শেষ করলেন। বললেন—চা খান আর একবার।

আমি বললাম—সাহেবের আর কোন খবর পান নি?

—কিছু না। আমার মনে হয় বিলেত যাওয়ার পথেই মারা গিয়েছিল। নইলে অন্তত

বীণা দিদির খবর সে নিশ্চয় নিত। চলুন থর্নটন কাকার অয়েল পেন্টিং দেখাই। থর্নটন কাকা ভাঙা লোহার সান্‌কিতে ভাত খাচ্ছে, এই ছবিটাই আঁকিয়েছি। আসুন এই ঘরে।

ঝগড়া

সন্ধ্যার সময় কেশব গাঙ্গুলীর ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেল দুই কন্যা ও স্ত্রীর সঙ্গে। কন্যা দুটিও মায়ের দিকে চিরকাল। এদের কাছ থেকে কখনো শ্রদ্ধা ভালবাসা পান নি কেশব।

শুধু এনে দাও বাজার থেকে, এই আক্রা চাল মাথায় করে আনো দেড়কোশ দূরের বাজার থেকে। তেল আনো, নুন আনো, কাঠ আনো—এই শুধু ওদের মুখের বুলি। কখনো একটা ভাল কথা শুনেছেন ওদের মুখ থেকে?

ব্যাপারটা সেদিন দাঁড়ালো এই রকম।

সন্ধ্যার আগে কেশব গাঙ্গুলী হাট করে আনলেন। তার বয়স বাহাত্তর বছর, চলতে আজকাল যেন পা কাঁপে—আগের মত শক্তি নেই আর শরীরে। আড়াই টাকা করে চালের কাঠা। দু কাঠা চাল কিনে, আর তাছাড়া তরিতরকারি কিনে ভীষণ কর্দমময় পিচ্ছিল পথে কোনরকমে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে কেশব গাঙ্গুলী তো হাটের বোঝা বাড়ী নিয়ে এলেন।

স্ত্রী মুক্তকেশী বললে—দেখি কি রকম বাজার করলে? পটোলগুলো এত ছোট কেন? কত করে সের?

—দশ আনা।

—ও বাড়ীর পল্টু এনেচে ন' আনা সের। তুমি বেশী দর দিয়ে নিয়ে এলে, তাও ছোট পটোল। ও কখনো দশ আনা সের না।

—বাঃ, আমি মিথ্যে বলছি?

—তুমি বড্ড সত্যবাদী যুধিষ্ঠির—তা আমার ভালো জানা আছে। আচ্ছা, রও, ও পটোল আমি ওজন করে দেখবো।

—কেন আমার কথা বিশ্বাস হল না?

—না। তোমার কথা আমার বিশ্বাস তো হয়ই না। সত্যি কথা বলবো তার আবার ঢাকঢাক গুড়গুড় কি?

এই হল সূত্রপাত। তারপর কেশব গাঙ্গুলী হাত পা ধুয়ে রোজকার মত বললেন—ও ময়না, চালভাজা নিয়ে আয়—

ময়না কথা বলে না, চালভাজার বাটিও আনে না। তাতে বুঝি কেশব বলেছিলেন—কৈ, কানে কি তুলো দিয়ে বসে আছ নাকি, ও ময়না?

ছোট মেয়ে ময়না নীরস সুরে বললে—চাল ভাজি নি।

—কেন?

—রোজ রোজ চালভাজা খাওয়ার চাল জুটছে কোথা থেকে? তা ছাড়া আমার শরীরও ভাল ছিল না।

—কেন, তোর দিদি?

—দিদি সেলাই করছিল।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে বাহাত্তর-তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ কেশব গাঙ্গুলী দশ সের ভারী মোট বয়ে এনে মেয়েদের এ উদাসীনতায় বিরক্ত হবেন, বা প্রতিবাদে দু-কথা শোনাবেন। কিন্তু তার ফল দাঁড়ালো খুবই খারাপ।

পাঁচজনের সামনে বলবার কথা নয়, বলতেও সংকোচ হয়। ছোট মেয়ে ময়না তাঁকে একটা ভাঙা ছাতির বাঁট তুলে মারতে এল। মেজ মেয়ে লীলা বললে—তুমি মর না কেন? মলে তো সংসারের আপদ চোকে—

স্ত্রী মুক্তকেশী বললে—অমন আপদ থাকলেও যা, না থাকলেও তা—

কেশব গাঙ্গুলী রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বললেন, আমি তোদের ভাত আর খাবো

না—চললাম।

মুক্তকেশী ও ছোট মেয়ে ময়না একসঙ্গে বলে উঠলো—যাও না—যাও।

ময়না বললে—আর বাড়ী ঢুকো না। মনে থাকে যেন।

শুনে বিশ্বাস হবে না জানি। কিন্তু একেবারে নির্জলা সত্যি। আপন মেয়ে বুড়ো বাবাকে ছ্যাঁত তুলে মারতে যায়!

কেশব গাঙ্গুলী রাত্রে বাইরের ভাঙ্গা চন্ডীমন্ডপে শুয়ে রইলেন। কেউ এসে খেতে ডাকলে না। মাও না, মেয়েরাও না। সত্যিই কেউ ডাকতে আসবে না, এটা কেশব বুঝতে পারেন নি, ধারণা করতে পারেন নি। তাই ঘটে গেল অবশেষে। না খেয়ে সমস্ত রাত কাটলো কেশব গাঙ্গুলীর—নিজের পৈতৃক ভিটেতে, স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্তমানে। উঃ, এ কথা ভাবতে পারা যায়?

কেশব গাঙ্গুলী সত্যি কখনো ভাবেন নি যে, এতটা তিনি হেনস্থার পাত্র তাঁর সংসারে। মেয়েরা বা স্ত্রী তাঁকে কেউ ভালবাসে না, এ তিনি অনেকদিন থেকেই জানেন। কিন্তু তার বহর যে এতটা, তা তিনি ধারণা করবেন কিভাবে?

ক্ষুধায় ও মশার কামড়ের যন্ত্রণায় সারারাত কেটে গেল ছটফট করে। সকালে উঠে আগে কেশব নদী থেকে স্নান সেরে এসে সন্ধ্যাহ্নিক ও জপ করে নিয়ে প্রতিবেশী যদুনন্দন মজুমদারের বাড়ী চা খেতে গেলেন।

যদুনন্দন বললেন—কি কাকা, আজ এত সকালে কি মনে করে?

এ কথার উত্তরে কেশব গাঙ্গুলী বললেন কাল রাত্রের কথা। পরিবার ও মেয়ে দুটির দুর্ব্যবহারের কাহিনী। যদুনন্দনের কাছে এ কথা নতুন নয়, পাড়ায় মেয়েদের কানাকানির মধ্যে দিয়ে কেশব গাঙ্গুলীর দুরবস্থার কথা অনেকদিন শুনেছেন তিনি।

তবুও বিস্ময়ের ভান করে বললেন—সে কি কাকা—বলেন, কি? কাল রাত্রে খান নি? এ বড্ড অন্যায় কাকীমার। ছিঃ ছিঃ—এ বেলা আপনি আমার বাড়ী খাবেন। বসুন।

কেশব গাঙ্গুলী আর বাড়ী এলেন না। সেখানেই দুপুর পর্যন্ত থেকে আহারের পর যখন বাড়ী এলেন, তখন এক ভীষণ কান্ড বেধে গেল। মুক্তকেশী বললে—আবার বাড়ীতে কেন? যাও দূর হও, যে বাড়ীতে গিয়ে নিন্দে রটনা করে এক পাথর ভাত মেরে এলে, সেখানেই যাও না, কতদিন খেতে দ্যায়, দেখি একবার।

মেয়েরাও বললে—বেশ তো, পরের বাড়ী টোক্‌লা সেধে কদ্দিন চলে, দেখি না? এখানে আবার কেন? যাও না—

—কাকে কি বলেছি আমি?

—আহা! ন্যাকা! আমরা আর জানিনে। এই তো যদুদার মেয়ে ঘাটে আজ ব্যাখ্যান করেছে সবার কাছে। ওই বুড়ো মানুষ ওঁকে খেতে দ্যায়নি, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, মেরেছে—সে কত কথা! আমরা শুনি নি কিছু!

—তা তো মিথ্যে কিছু বলি নি।

—মেরেছিলাম তোমাকে আমরা? খেতে দিই নি আমরা? তুমি না তেজ করে চন্ডীমন্ডপে গিয়ে শুয়ে রইলে! আবার লাগানি-ভাঙানি পাড়ায় পাড়ায়! বেশ লাগাও, লাগিয়ে করবে কি? যাও না, যেখানে খুশি—আমরা তো বলেছি, বেরোও না—

ছোট মেয়ে বললে—মরে যাও না, মলেই তো বাঁচি—

কেশব গাঙ্গুলী ঘরের মধ্যে ঢুকে কাপড়-জামা পরে এবং একটা থলের মধ্যে কাপড়-গামছা পুরে নিয়ে তেড়েফুঁড়ে বাড়ী থেকে বেরুলেন।

বলে গেলেন—বেশ তাই যাচ্ছি—আর তোদের বাড়ী আসবো না—চললাম।

মুক্তকেশী চেঁচিয়ে বললে—তেজ করে যেমন বেরুনো হল তেমনি আর ঢুকো না বাড়ীতে কালামুখ নিয়ে—দেখবো তেজ—কে জ্বর হলে দেখে, তা দেখবো।

কেশব গাঙ্গুলী হন্ হন্ করে বাড়ী থেকে চলে গেলেন। হোক জ্বর। নৈহাটি থেকে এখানে এসে পর্যন্ত ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন। দুর্বল করে ফেলে দিয়েছে বড়। তা হোক। যা হয় হবে।

কেশব গাঙ্গুলী রেলে চাকরী করতেন। চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে নৈহাটিতে বাড়ী করেছিলেন, কিন্তু বারো চোদ্দ বছর বসে খেয়ে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের সামান্য টাকা যা বাড়ী-তৈরির পর অবাশষ্ট ছিল, ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে যেতে লাগল—এখনো ছোট মেয়ের বিয়ে বাকী। টাকা ফুরিয়ে গেলে কি খাবেন?

অগত্যা নৈহাটির বাড়ী বিক্রী করে পৈতৃক গ্রামে এসে এই দুবছর বাস করছেন। সরিকদের সংগে ঝগড়া করে দু'ঝাড় বাঁশ ও বিঘে-দুই ধানের জমির ভাগ পেয়ে যাহোক একরকম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মেয়ে দুটি আর পরিবারের জন্যে সত্যি তাঁর সংসারে বিতৃষ্ণা হয়ে গিয়েছে। মেজ মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীর চরিত্র ভালো নয়, সে মেয়ে তাঁর কাছেই আছে বিয়ের দু'বছর পর থেকেই। সব দিক থেকেই তাঁর গোলমাল।

ভেবেছিলেন ছোট মেয়েটার বিয়ে দিয়ে একরকম নির্ঝঞ্ঝাট হবেন, কিন্তু আর সংসারে তাঁর দরকার নেই। যাদের জন্যে চুরি করেন, তারাই বলে চোর। সে সংসার আর ধরতে আছে?

কেশব গাঙ্গুলী রেলের বোতাম বসানো সাদা কোট একটা নিয়ে বেরিয়েছেন, রেলের ভাড়া লাগবে না। রেলের বোতামওয়ালা কোট দেখলে ছেলেছোকরা টিকিট-চেকাররা একবার চেয়ে দেখে চলে যায়, কিছু জিগ্যেস করে না।

একটি পয়সা তাঁর নিজের হাতে নেই। হাজার চারেক টাকা আছে স্ত্রীর নামে আর হাজার তিনেক আছে অবিবাহিতা ছোট মেয়ের নামে। যদি তিনি মারা যান, মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আগেই, কারণ বয়স তাঁর যথেষ্ট হয়েছে, তাই বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে নৈহাটিতে থাকতে বাড়ী-বিক্রির টাকা থেকে ছোট মেয়ের নামে টাকাটা রেখেছিলেন। আজ চাইলে কেউ একটা পয়সা তাঁকে দেবে? না স্ত্রী, না মেয়ে।

তাই হাটের পয়সা থেকে দু'চার আনা এদিক ওদিক করতেন কেশব গাঙ্গুলী। না করলে চলে না। তাঁর নিজের একটু নস্যি, একটু তামাক, হয়তো বা ইচ্ছে হল দু'পেয়ালা চা কিনে খেলেন—এ পয়সা আসে কোথা থেকে।

মুক্তকেশী এ সন্দেহ করেছিল আগে থেকেই। তাই স্বামী হাট থেকে ফিরলে জিনিস-পত্রের ওজন, দরদস্তুর সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে, দাঁড়ি ধরে আলু, পটোল, চাল, ডাল ওজন করে নেয়।

পাড়ার ছেলেদের জিগ্যেস করে—হ্যাঁরে, আজ হাটে পটল কত করে সের?

--ও নিতাই, আজ হাটে মাছ কত করে সের?

তবুও কেশব গাঙ্গুলীকে সামলানো অত সহজ নয়। চল্লিশ বছর তিনি রেলে কাজ করে এসেছেন। মুক্তকেশী যতই কৌশল করুক, যতই সতর্ক হোক, কেশব গাঙ্গুলীর ফাঁক ধরতে পারা অত সহজ কাজ বুঝি?

পটোলের মধ্যে বাসি তাজা নেই?

দেখলে হয়তো ঠিক ধরা যায় না কিন্তু দর বিভিন্ন। মাছের মধ্যেও দরের তারতম্য নেই? কত ধরবে মুক্তকেশী? না করলেই বা কেশব গাঙ্গুলীর বাজে খরচ চলে কোথা থেকে? চাইলে স্ত্রীর হাত থেকে পয়সা বার করা শক্ত। ঐ নিয়েই তো যত ঝগড়া।

কেশব গাঙ্গুলী বাড়ী থেকে বেরিয়ে স্টেশনে এসে পেঁাছ'লন বেলা তিনটের সময়। কাল হাট থেকে ফিরবার সময় ছ'আনা পয়সার হেরফের করেছিলেন, সেই পয়সা পকেটে খুচরো আছে—আর আছে গুপ্তস্থান থেকে সন্তর্পণে বার করা তিন টাকা সাত আনা। এই তিন টাকা তেরো আনা ছাড়া জগতে তাঁর বলতে আর কোথাও কিছু নেই। হ্যাঁ, অবিশ্যি পকেট ঘড়িটা আছে। সেটাও রেলের জামার বুক পকেটে এনেছেন। বিক্রী করলে কোন্ না ত্রিশ-চল্লিশ টাকা হবে? সেকালের কুরুভাইজার ফ্রেরিসের ঘড়ি। এখনকার মত ফঙ্গবেনে জিনিস নয়।

স্টেশনের কাছে একটা জাম গাছের তলায় পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের পানবিড়ির দোকান। পান কিনলেন দু'পয়সার। বিড়িও দু'পয়সার। দেশলাই একটা কত? চার পয়সা? দাও একটা।

পান খেয়ে বিড়ির ধোঁয়া টেনে কেশব গাঙ্গুলীর শরীরের কষ্ট খানিকটা দূর হল।

এতক্ষণ চিন্তা করবার মত অবস্থা তাঁর ছিল না।

তিনি আপাতত যাবেন কোথায়?

সেটা কিছু ঠিক করেন নি, না করেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন অবিশ্যি। এখনো ট্রেণের ঘণ্টা-খানেক বিলম্ব আছে। যাবেন কোথায়? যেখানেই যান, খেতে তো হবে? তিন টাকা তেরো আনায় স্বাধীনভাবে খাওয়া কতদিন চলবে?

মেয়ের বাড়ী যাবেন? জামাই কাজ করে টিটাগড়ের কাগজের কলে। টিটাগড়েই বাসা। সেখানে যেতে লজ্জা করে। এই গত জ্যৈষ্ঠ মাসে সেখানে গিয়ে দুদিন ছিলেন। অবিশ্যি জামাইষষ্ঠীর তত্ত্বস্বরূপ নিয়ে গিয়েছিলেন কিছু আম ও দুটো কাঁঠাল। বার বার জামাইবাড়ী যেতে আছে?

বিশেষ করে আজকাল রেশনের চালের দিনে কারো বাড়ীতেই একবেলার বেশি দুবেলা থাকতে নেই। কি মনে করবে। যে কাল পড়েছে।

ট্রেণ এসে পড়লো। উঠে বসলেন এককোণে। রেলের জামা আছে, টিকিট লাগবে না।

হু হু করে ট্রেণ চললো। কাশফুলের ক্ষেতে কাশফুল ফুটতে শুরু করেছে। খুব বৃষ্টি হওয়ায় ধানের ক্ষেত জলে ডুবু ডুবু। অনেক জায়গায় এখনো ধান বুনছে। আমন ধান এবার নাবি।

খুব ভুল করেছেন কেশব। যখন কাজ থেকে অবসর নিলেন, তখন প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের দরুন ন' হাজার টাকা পেয়েই যদি তা থেকে কিছু ধানের জমি কিনতেন নিজের নামে তবে আজ স্ত্রী আর মেয়েরা এমন হেনস্থা করতে পারতো?

স্ত্রী আর মেয়েদের দুর্ব্যবহারের কথা মনে আসায় চোখ দিয়ে জল পড়লো, কোঁচার খুঁটে মুছলেন। কি না করেছেন ওদের জন্যে। ঐ ছোট মেয়েটার নৈহাটিতে থাকতে একবার টাইফয়েড হয়েছিল, কেশব গাঙ্গুলী রাত জেগে ঘণ্টায় ঘণ্টায় থার্মোমিটার দেখেছেন, ওষুধ খাইয়েছেন, কই অবহেলা করতে পেরেছিলেন? একশো ষাট টাকা খরচ হয়ে যায় সেই অসুখে।...

ঐ স্ত্রী মুক্তকেশীর সেবার হাঁপানির মত হল। চুঁচুড়ায় নিয়ে গিয়ে সপ্তাহে সপ্তাহে কবিরাজ দেখানো, অনুপানের ব্যবস্থা করা, পাছে আগুনের তাতে কষ্ট হয় বলে রাঁধতে দিতেন না রান্নাঘরের কাছে যেতে দিতেন না। রাত্রে শুয়ে ভাবতেন, এই বয়সে হাঁপানি হল, মুক্তকেশী বড় কষ্ট পাবে, কি করা যায়? রঘুনাথপুরের পীতাম্বর দাসের কাছে হাঁপানির মাদুলি পাওয়া যায়, তাই কি আনাবেন? কত ভেবেছেন। কত ব্যস্ত হয়েছিলেন।

সেই মুক্তকেশী তাঁকে আজ বললে—বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও, আর এসো না—

ছোট মেয়ে বললে—মরো না তুমি, মলেই বাঁচি। তুমি মলেই বা কি?

কেন, তিনি কি ওদের জন্যে কিছু করেন নি? চিরকাল রেলে টরে-টক্কা করেছেন তবে কাদের জন্যে? খাইয়ে মাখিয়ে বড় না করলে ওরা অত বড় হল কি করে? আজ কিনা তিনি মরে গেলে ওরা বাঁচে! তিনি আজ সংসারের আপদ, এই তিয়াত্তর বছর বয়সে।

এই তিয়াত্তর বছর বয়সেও গত আষাঢ় মাসে যখন কাঠের ভয়ানক অভাব হল, নিজে বাঁশঝাড় খুঁজে খুঁজে শুকনো বাঁশ আর কঞ্চি কেটে গোয়ালে ডাং করেন নি, পাছে স্ত্রীর বা মেয়েদের রান্নার এতটুকু অসুবিধে হয় সে জন্যে? এই ভীষণ জলকাদার পথে মোট বয়ে নিয়ে যান নি?

যাক্, এসব কথা তিনি বলতে চান না। তবে মনে কষ্ট হয় এই ভেবে যে, সংসার কি রকম অকৃতজ্ঞ! যাদের জন্যে সারাজীবন খেটে খেটে গায়ের রক্ত জল করেছেন, তারাই আজ বলে কিনা তিনি মলেই তারা বাঁচে, তাদের কোনো ক্ষতি হবে না।

কেশব গাঙ্গুলীর মনের মধ্যেটা হা হা করে উঠলো দুঃখে। চোখে আবার হু হু করে জল এল, কোঁচার খুঁটে মুছলেন। আজ যদি—

—টিকিট?

কেশব গাঙ্গুলী মুখ তুলে চমকে চাইলেন। একটি ছোকরা টিকিট-চেকার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কেশব গাঙ্গুলী বললেন—রেলওয়ে সার্ভেণ্ট—

ছোকরা চলে গেল।

বেশ ছেলেটি। ওই রকম একটি ছেলে যদি আজ তাঁর থাকতো! তা হলে ওরা এমন কথা বলতে সাহস পেতো না। সবই অদৃষ্ট। ছেলে তাঁর হয় নি? হয়েছিল। তখন তিনি তিনপাহাড় স্টেশনের তারবাবু। ছেলের নাম ছিল সান্টু। প্ল্যাটফর্মে হেলে দুলে চলে বেড়াতো। আজও বেশ মনে আছে, তাঁকে বলতো—বাবা, আমাকে পুরনো টিকিট দেবে? পুরনো টিকিট হাতে পেলেই সে হঠাৎ মুখে 'পু-উ-উ-উ' শব্দ করে ট্রেণ ছেড়ে দিত... তারপর ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্ শব্দ করতে করতে প্ল্যাটফর্মের ধারে ধারে খানিকদূর মাথা নাড়তে নাড়তে কেমন যেতো।

টরে-টক্কার টেবিলে কাজ করতে করতে তিনি বসে দেখতেন আর হাসতেন। মাল-কুলি রামদেওকে বলতেন—শিশুকে ধরে বাসায় দিয়ে আসতে। শিশু বুঝতে পারতো, রামদেও তাকে ধরে নিয়ে যেতে আসছে, সে ছোট পায়ে ছুট দিতো আর রামদেও পেছনে পেছনে 'এ খোঁকাবাবু, এ খোঁকাবাবু' বলে ছুটতো—এ দৃশ্য আজও এই এখুনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন কেশব।

দেড় বছর বয়সে সান্টু মারা যায়...আজ ছত্রিশ বছর আগেকার কথা। তবুও যেন মনে হয়, সেই সাহেবগঞ্জ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বড় ঘোড়ানিম গাছটার ছায়ায় আজও সান্টু সেই রকম ছুটে ছুটে খেলা করে বেড়াচ্ছে।...সান্টু থাকলে আজ বোধ হয় এমন কষ্ট কেশব গাঙ্গুলীর হত না। চোখ দিয়ে এবার ঝর ঝর করে জল পড়লো, মনের মধ্যে—বুকের মধ্যে কি একটা যেন ঠেলে ফুলে কেঁপে উত্তাল হয়ে উঠলো। কেশব জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন! একটা রাখাল বালক একটা গরুকে কি নির্দয়ভাবেই না প্রহার করছে! খুব বৃষ্টির জল বেঁধেছে ডোবায়, পুকুরে। এক জায়গায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গামছা দিয়ে ছেঁকে কুঁচো মাছ ধরছে। টেলিগ্রাফের তারে একটা কি পাখী বসে রয়েছে।

নৈ-হা-টি!

কেশব গাঙ্গুলীর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন।

সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই। এখানে সাবেক বাসা ছিল। দু-চারজন বন্ধুর সংগে আলাপ আছে। তাদের কারো বাড়ী যাবার ইচ্ছে নেই, তবুও না গেলে, রাত্রে থাকবেন কোথায় এই অভদ্রা বর্ষাকালে, খাবেনই বা কি? রমাপতির বাড়ী যাবেন?

রমাপতি কুণ্ডুর বড় গোলদারী দোকান ও রেস্টুরেণ্ট। নাম, দি কমলাপতি মডার্ণ রেস্টোরাণ্ট। রমাপতির বড় ছেলের নাম কমলাপতি, তার ছেলে শান্তি ওই রেস্টোরাণ্টে বসে! খুব বিক্রি। চার পাঁচটা ছোকরা চা খাবার দিতে দিতে হিম্‌শিম্ খেয়ে যাচ্ছে।

শান্তি তাঁকে দেখে বললে—এই যে দাদু, আসুন। দেশ থেকে? ভাল সব? ওরে, ভাল করে গরম জলে ধুয়ে এক কাপ চা দে দাদুকে। আর কি খাবেন? একটা চপ দেবে? ভালো চপ আছে। না? টোস্ট দিক? তবে থাক্।

কেশব গাঙ্গুলী জানেন, এখানে যা খাবেন তার নগদ দাম দিতে হবে এখুনি। আর একবার এ রকম হয়েছিল, তাঁকে খাতির করছে ভেবে চপ, কাটলেট, ডিম যা নিয়ে আসে, তাই খান। শেষে হাসিমুখে আপ্যায়িত করে বিদায় নেবার জন্যে টেবিলের কাছে যেতেই শান্তি হাসিমুখে বললে—এক টাকা সাড়ে তেরো আনা—

আজ আর সে ভুল করবেন না। হাতে পয়সা কম। চায়ের ছ'পয়সা দাম দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। শান্তিকে বললেন, তোমার বাবা ভালো? তোমার দাদু বাড়ীতে আছেন?

—আজ্ঞে হ্যা।

—একবার যাবো দেখা করতে?

—যান না। এখন বৈঠকখানাতেই বসে আছেন। ডাক্তারবাবু আছেন, আর শশী কাকা

আছেন।

—আচ্ছা, আসি।

কেশব গাঙ্গুলীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। ব্যবসাদারের চক্ষুলজ্জা নেই। সংসার বড় কঠিন জায়গা।

তবুও রমাপতির বাড়ীতেই গেলেন। রমাপতি কুণ্ডু তাঁর সমবয়সী। তাঁকে দেখে খুশী হল। যত্ন করলে খুব। রাত্রে লুচি, তরকারী, মিষ্টি খাওয়ালে। ভাল গদিপাতা, নেটের মশারি খাটানো বিছানায় শুয়ে কেশব মশারির চালের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। পরের এমন সুন্দর বিছানাতে কদিন তিনি শোবেন? তাঁর আশ্রয়স্থল তো বৃক্ষতল। এরা না হয় আজ রাত্রেই খাতির করে আশ্রয় দিয়েছে।

কেন অপরের অদৃষ্টে এত সুখ থাকে, আর তাঁর অদৃষ্টে এমন ধারা?

এই তো রমাপতিকে দেখলেন, তার নাতনীরা কত যত্নে বাতাস করতে লাগলো খাওয়ার সময়ে। খাওয়ার পর এক বড় নাতনী অমলা নাকি রোজ তেল মালিশ করে দাদুর পায়ে। পুত্রবধূরা 'বাবা' বলতে অজ্ঞান।

সেটা হয়তো পয়সাওয়ালা বলে, রমাপতির নামেই ব্যবসা, লক্ষপতি লোক। আজ তাঁর হাতে যদি পয়সা থাকতো, তবে কি আর মেয়েটা তাঁকে অমন কথা বলতে সাহস করতো? তিনি নিঃস্ব, কাজেই তাঁকে হেনস্থা করে। পয়সা এমন জিনিস।

কত কি ভাবতে ভাবতে কেশবের ঘুম এল। একটা বড্ড ব্যথার জায়গা খচ খচ করে। যখন তিনি চলে যাচ্ছেন বাড়ী থেকে বেরিয়ে, তখন মেয়েরা কেন দৌড়ে এসে পথ আটকালে না? স্ত্রী কেন ছুটে এল না?

সব মিথ্যে। সব ভুয়ো। সব স্বার্থের দাস। দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা পৃথিবীতে নেই। রমাপতি কুণ্ডু লক্ষপতি, তাই আজ নাতি-নাতনী তার পায়ে তেল মালিশ করে, পুত্রবধূরা দুধের বাটি মুখে ধরে। যদি তাঁর টাকা থাকতো, তাঁর আদরও ওই রকমই হত।

সকালে উঠে রমাপতি কুণ্ডু বললে—গঙ্গাস্নান করবেন না গাঙ্গুলীমশায়? গঙ্গাহীন দেশে থাকেন, গঙ্গাস্নানটা করলে ভাল হত!

দুজনে গঙ্গাস্নান করে এলেন। তারপর রমাপতির ছোট নাতনী তাঁদের দুজনের জন্যে শ্বেতপাথরের রেকাবিতে কাটা পেঁপে, কলা, নাশপাতির টুকরো আর সন্দেশ. রসগোল্লা ও চমচম নিয়ে এল। কেশব গাঙ্গুলীকে বললে—দাদু, আপনার রান্নার যোগাড় কি এক্ষুনি করে দেবো! না একটু দেরি হবে?

অর্থাৎ এরা গন্ধবণিক। ভাত রেঁধে দেবে না ব্রাহ্মণের পাতে। রাত্রে লুচি খাওয়াতে পারে, কিন্তু দিনে ভাত রেঁধে খেতে হবে।

কেশব বললেন—আমি চলে যাবো আজ দিদি—

রমাপতি কুণ্ডু বললে—সে কি কথা গাঙ্গুলীমশায়? আজ ওবেলা আপনাকে নিয়ে হরিসভায় ভাগবতপাঠ শুনতে যাবো ঠিক করে রেখেছি—

রমাপতির নাতনী টুনিও বললে—আজ যাবেন কি দাদু? আজ আমরা ওবেলা তালের ফুলুরি, তালের ক্ষীর করবো, আপনি আজ চলে যাবেন, যেতে তো দিলাম?

কেমন সুখের সংসার! কেমন মিষ্টি কথাবার্তা, মিষ্টি ব্যবহার। লক্ষ্মী যেখানে বিরাজ করেন, সেখানে কি কোনো জিনিসের ত্রুটি থাকে?

সারাদিন বড় আনন্দে কাটলো। খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর ব্যবস্থা। সন্ধ্যার দিকে গঙ্গার ধারের হরিসভায় 'অজামিলের উপাখ্যান' শুনতে গেলেন দুজনে। ব্যাখ্যাকারী নবদ্বীপের গোস্বামী-বংশের লোক, বড় সুন্দর বোঝাবার ও বর্ণনা করবার ক্ষমতা।

ভগবান অমন মহাপাপী অজামিলকে কৃপা করেছিলেন, শুধু বিপন্ন হয়ে সে কাতরে তাঁকে মৃত্যুকালে ডেকেছিল বলে।

তিনি কি এতই পাপ করেছেন?

ভগবান নিশ্চয়ই তাঁকে ঠেলে ফেলে দেবেন না দূরে।

কিন্তু কোথায় কিভাবে স্থান দেবেন ভেবে পাওয়া যাচ্ছে না। আহা! জগতে এত

সুখ, এত আনন্দ চারিদিকে, অথচ তাঁরই ভাগ্যে সব এমন হল কেন?

আসবার সময় রমাপতি কুণ্ডুকে বললেন—বেশ আছেন কুণ্ডুমশাই, না?

—আপনার আশীর্বাদে—

—আমায় একটা চাকরি করে দিন না?

—কি রকম চাকরি?

—এই ধরুন, কারো বাড়ীতে থেকে ছেলে পড়ানো, কি হাট-বাজার করা।

—পাগল! আমাদের এই বয়সে কি পরের চাকরি করা চলে দাদা? কেন, চিরকাল চাকরি করে এসে বুঝি বাড়ী থাকতে ভালো লাগছে না? তা হোক। বাড়ী বসে ভগবানের নাম করুন গে।

না, বোঝাতে পারলেন না। সব কথা বলা যায় না। কাল এখান থেকে চলে যেতে হবেই।

রাত্রে আবার সেই লুচি মাছ, মিষ্টি, দুধ। কি খাওয়া-দাওয়া এ বাড়ীর! কি সব আটপৌরে শাড়ী পরেছে মেয়েরা! বিদ্যুতের আলো, পাখা। কত সুখে এরা আছে, কেমন খাওয়া-দাওয়া!

মুক্তকেশীকে, মেয়েদের কি যত্নে তিনি রেখেছেন? চিরকাল রেলের ঘুপচি বাসায় বাস করে এসেছে, এখন দেশে গিয়ে দুবেলা ধান সেদ্ধ করতে হয়, ক্ষারে কেচে কাপড় পরতে হয়, থোড় আর এঁচড়ের তরকারি ছাড়া মাছ-মাংস হয় মাসে কদিন? হাতে পয়সা কোথায়?...কোনো ভাল জিনিস দিতে পারেন ওদের মুখে আজকালকার বাজারে?

লুচি ছিঁড়তে গিয়ে কেশব গাঙ্গুলীর চোখে জল এল। মাছের মুড়ো...কতকাল মাছের মুড়ো খাননি, ওদের খেতে দিতে পারেননি! কি সুখে রেখেছেন ওদের?

টুনি বলল—চমচম দুটোই খেয়ে ফেলুন দাদু, গরম লুচি নিয়ে আসি।

পরদিন সকালে রমাপতি কুণ্ডুর বাড়ী থেকে চলে গেলেন কেশব। ওঁরা বলেছিলেন সেদিনটাও থাকতে। কেশব থাকতে চাইলেন না। তাতে দুঃখ ঘুচবে না। একটা চাকরি পেলেও হত। এখানে সেজন্যেই আসা। ওদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারের দিকে চললেন। একটা নির্জন স্থানে বসে কতক্ষণ ভাবলেন। জগতে কেউ কাউকে ক্ষমা করে না। মুক্তকেশীর ওপর হয়তো কোনো সময় অন্যায় কিছু করে থাকবেন, তা ওরা কখনো ভুলবে না, প্রতিশোধ নেবার সময় এলেই প্রতিশোধ নেবে।

এই কি জগতের নিয়ম?

এ জগতে কেউ কি ভালবাসার নেই? বিচার করবার, দণ্ড দেবার সকলেই আছে?

বেলা দুপুর হল। একটা হোটেল থেকে কিছু খেলেন হুগলীতে। হুগলী থেকে গেলেন ব্যাণ্ডেলে। উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ। রাত হয়ে আসছে। এই বর্ষায় থাকবেন কোথায়?

রাত্রে ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে স্টেশনের একটা বেঞ্চির ওপর শুয়ে রইলেন। শীত করতে লাগলো ঠাণ্ডা বাতাসে। গায়ে দেবার কিছু আনা উচিত ছিল, আনা হয় নি। ভুল হয়ে গিয়েছে।

ভুল! ভুল! সব ভুল জীবনে।

চাকরি করা ভুল, বিয়ে করা ভুল, সংসার করা ভুল। সন্তান-উৎপাদন ভুল, কারো কাছে স্নেহ-মমতা আশা করা ভুল, সব ভুল।

জীবনটা একটা মস্ত ভুল। একটা মস্ত ফাঁকা—একটা মস্ত ফাঁকি। না, ও সব আর তিনি ভাববেন না।

চার দিন পরে।

কেশব গাঙ্গুলীর হাতের সব টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। ব্যাণ্ডেল স্টেশনের বেঞ্চিতে শুয়ে এ কদিন কাটালো। কাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি। খুব খিদে পেয়েছে। চলবে কি করে তাঁর? শরীর ঝিম-ঝিম্ করছে খিদেতে। তিয়াত্তর বছর বয়সে খিদে সহ্য করবার মত শক্তি নেই তাঁর।

সত্যি, বড় খিদে পেয়েছে। কি করবেন এখন? ঘড়িটা বেচবেন?

মনে পড়ে, তাঁর প্রথম যৌবনে তিনি ব্যান্ডেল স্টেশনের সিগন্যাল ক্লার্ক ছিলেন। ওই তো তাঁর সেই ঘর; সেই টেবিল—সব সেই রকমই আছে। তাঁর কোয়ার্টার্স এখানে ছিল না, গঙ্গার ধারে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করে পিসীমাকে নিয়ে থাকতেন। বাসার কাছে একটা ঘোড়ানিম গাছ ছিল। পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, অর্ধ শতাব্দী! আশ্চর্য, সেই টেলিগ্রাফের টেবিলটা আজও আছে!

মুক্তকেশীর সঙ্গে তখন সবে বিয়ে হয়েছে। ঘোড়ানিম গাছের তলাকার সেই বাসায় মুক্তকেশী ঠিক সন্ধ্যা সাতটার সময় জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো। তিনি ফিরবেন, তাঁকে দেখবে বলে।

ষোড়শী বালিকা মুক্তকেশী। কি হাসি ছিল মুখের! চোখ হাসতো তাঁকে দূরে পথের উপর দেখতে পেয়ে।

আছে সেই বাড়ীটা আজও? তাঁদের দুজনের অতীত যৌবনের সুখের প্রহরগুলির সাক্ষী সেই বাড়ীটা?

একদিন বললেন—আচ্ছা মুক্ত, তুমি দাঁড়িয়ে থাকো কেন জানলায়?

মুক্ত বলেছিল—তুমি আস, তাই।

—কেন?

—পথের ওপর দেখতে পেয়ে খুশী লাগে। কতক্ষণ দেখিনে।

—মন কেমন করে?

—তা করে না?

একদিন মনে আছে, তাঁকে জানলা থেকে বললে—আজ কি করেছি বলো তো তোমার জন্যে?

—কি গো?

—ডালপুরি।

—সত্যি?

—হ্যাঁ, এসে দ্যাখো।

তারপর তিনি বাড়ীতে ঢুকলে তাঁকে পাখার বাতাস দিয়ে সুস্থ করে মুক্ত পিঁড়ি পেতে বসিয়ে ১৬।১৭ খানা গরম ডালপুরি খাইয়েছিল কত যত্ন করে।

আর সেই মুক্তকেশী আজ পঞ্চাশ বছর পরে তাঁকে 'দূর দূর' করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল। আজ যখন মুক্তকেশীর সেবা সবচেয়ে তাঁর দরকার হয়েছে, তখন!

চোখ দিয়ে জল বেয়ে পড়লো হু হু করে কেশব গাঙ্গুলীর। কেমন যেন মনে হল সব শূন্য। ওই আকাশের নিরালা মেঘগুলির মতই তাঁর মন শূন্য, জীবন শূন্য, নিরালা, নিরবলম্বন। পৃথিবীতে কেউ তাঁর কোথাও নেই—পঞ্চাশ বছর আগের সেই ষোড়শী, রূপসী মুক্তকেশীকে আজ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোন্ অজানা দিগন্তে সে মিলিয়ে গিয়েছে বহুকাল আগে!

জীবনটা কেন এত বড় ফাঁকি, এত বড় মিথ্যে, এত বড় জুয়োচুরি?

—আরে, গাঙ্গুলীবাবু যে! কোথায় ছিলেন এতদিন?

কেশব চমকে পিছন ফিরে চেয়ে দেখলেন। একজন মধ্যবয়স্ক টিকিটচেকার, ক্রু-দলের মোড়ল। ওর নামটা তিনি জানতেন, এইমাত্র তিনি হঠাৎ ভুলে গেলেন। বুড়ো হয়েছেন, মুখ দেখে এখন আর ভাল বলতে পারেন না।

—বাড়ী ছিলাম ভাই।

—তারপর এখানে কি মনে করে? বৌদিদির সঙ্গে ঝগড়া করে নাকি?

কেশবের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন—হ্যাঁ ভাই—সে-সব, তাই বটে।

—চলুন, সায়েবগঞ্জ পর্যন্ত বেড়িয়ে আসা যাক। চেক্ করতে বেরিয়েছি। চলুন আমার সঙ্গে। সেকেন ক্লাসে তুলে দিচ্ছি। আসুন—

—খাবো কোথায়?

—আপনি খান নি এখনো? বর্ধমানে খাওয়াবো বলুন! জিনিসপত্র কিছু আছে?

—কিছু না।

—তবে চলুন।

এক্সপ্রেস এসে পড়লো। বর্ধমানের ক্রুদের ঘর থেকে সংগী লোকটির জন্যে ভাত-তরকারি এল। রাত তখন সাড়ে সাতটা। দুজনে ভাগ করে খেলেন।

সংগী ব্রাহ্মণ, নাম পঞ্চানন বাঁড়ুয্যে, বাড়ী জয়নগর-মজিলপুর। পেট ভরে ভাত খেয়ে কেশব গাংগুলীর যেন ধড়ে প্রাণ এল। উঃ, সোজা ক্ষিদেটা পেয়েছিল?

কি সুন্দর বর্ষা-সজল বাতাস দুদিকের মাঠে-বনে বইছে! কুর্চি ফুলের সুবাস মাঝে মাঝে আসে বাতাসে। এই সব বন, এই অন্ধকার আকাশ, নক্ষত্রের দল কেমন যেন তাঁকে বহুদূরের সংগীহীন একক জীবনের বাণী এনে দিচ্ছে! নিঃসঙ্গ জীবনে কতদূরে কোথায় যেন যাচ্ছেন তিনি। আর বাড়ী ফিরবেন না। আর মুক্তকেশীর হাতে হাটের থলে তুলে দেবেন না। তাঁর সংসার করা ফুরিয়ে গিয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে নিরুদ্দেশের দিকে যাত্রা শুরু করলেন আজ তিনি।

সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে তিনি একা। বেশ লাগছে অনেক দিন পরে। গত এক বছর শুধু মাথায় মোট করে হাট ঘুরেছেন, বাজার করেছেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রেশনের আটা, চিনি, কেরোসিন তেল এনেছেন—যাদের জন্যে, তারা আজ এই তিয়াত্তর বছর বয়সে তাঁকে পারলে ঘরের বার করে দিতে! পয়সার তাঁর দরকার নেই। পয়সা সব মুক্তকেশীর হাতে থাকুক। তাঁর পয়সাকেই ওদের দরকার, তাঁকে নয় তো? বেশ, পয়সাই রইল, চললেন তিনি।

...সাঁইথিয়া।

অনেক রাত হয়েছে। এবার একটু ঘুমুলে হত না। সারাদিন টো টো করে বেড়িয়েছেন ব্যাণ্ডেলে। এই সাঁইথিয়াতে একবার তিনি রিলিফে এসেছিলেন মনে আছে বহুকাল আগে। তখন মুক্ত বলে দিয়েছিল, রোজ একখানা করে চিঠি দিও। আটখানা পোস্টকার্ড সংগে দিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা।

সাঁইথিয়াতে তখন বিধুভূষণ রায় ছিলেন স্টেশনমাস্টার। তাঁর বাড়ীতেই খাওয়া-দাওয়া হত। বিধুবাবুর ছেলে সদানন্দ তাঁর চেয়ে কিছু ছোট, সদানন্দ ও তিনি একসংগে তাস খেলতেন কাছাকাছি একজন ভদ্রলোকের বাইরের ঘরে বসে।

একবার একটা পাকা কাঁঠাল বিধুবাবু নামিয়ে নিলেন গার্ডের গাড়ী থেকে। কাঁঠালটা আধপচা। সদানন্দ বললে—দাদা, মা বলেছেন, ক্ষীর-কাঁটাল খাবেন ওবেলা।

কেশব বললেন,—দূর! ওর বীচি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না—

—আমি বলছি পাওয়া যাবে।

—কখ্খনো না।

—বাজি!

—কি, বলো?

—বৌদিদিকে তিন দিন চিঠি দিতে পারবেন না দাদা! অত কি টেবিলে বসে লেখেন? ক্ষুদে ক্ষুদে লেখাতে একখানা পোস্টকার্ডে একখানা খামের কাজ করে নেন। ফেলবেন বাজি?

রাজী হন নি কেশব। মুক্তকে চিঠি না দিয়ে থাকা? অসম্ভব। সে একা সেই ব্যাণ্ডেলের সেই ছোট্ট বাসাতে বসে তাঁর জন্যে দিন গুনছে, রোজ ঘোড়ানিম গাছটার তলায় পিওনের আবির্ভাবের অপেক্ষায় বসে থাকে খাওয়া-দাওয়ার পর জানলাটিতে। তাকে তিনদিন চিঠি না দিয়ে বঞ্চিত করতে পারবেন না। তা কখনই হয় না।

সেসব দিন কি খুব দূরে চলে গিয়েছে? বড্ড পেছনে ফেলে এসেছেন কি? স্বপ্নের মত মনে হয়—আবছায়া আবছায়া, সব মিলে একাকার হয়ে যাচ্ছে। মুক্তকেশী...সাণ্টু... ব্যাণ্ডেল...তিনপাহাড়। প্রথম যৌবন...তিয়াত্তর বছরের বার্ধক্য! স্বপ্ন।

কাঁদছেন নাকি আবার তিনি?...হুঁ, তাই তো, কোটের গলার কাছটায় ভিজে! না, না, কাঁদবার কি আছে? বুড়ো বয়সে চোখ পান্‌সে হয়ে যায়। কাঁদবেন কেন তিনি?

—গাঙ্গুলীবাবু, ঘুমোলেন? অমন ভাবে শুয়ে কেন? শরীর খারাপ হয় নি তো?

পঞ্চানন চক্রবর্তী ক্রু। চলন্ত গাড়ীর দরজা খুলে ঢুকলো। সাঁইথিয়া থেকে এইমাত্র ট্রেণ ছেড়েছে।

কেশব যেন চমকে উঠলেন। বললেন—না তো!

—একটু চা খেয়ে নিন আগের স্টেশনে।

—এত রাত্রে চা? পাগল হয়েছ ভায়া? আমি চা খাইনে এত রাত্তিরে। তুমি খাও। ঘুমুবে না?

—আরও গোটাকতক স্টেশন পার হয়ে যাক্। এখন না। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।

পঞ্চানন চক্রবর্তী ক্রু চলে গেল। গাড়ী ঝড়ের বেগে চলছে। বাইরে এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে বেশ জোরে। ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট্ আসছে জানলা দিয়ে কামরার মধ্যে। কি একটা ফুলের সুগন্ধ এল এক ঝলক।

আঃ, কি সুন্দর আরাম!...ঘুমিয়ে আরাম আছে এমন জায়গায়। বুকের মধ্যে কেমন করছে কেন, কে জানে? নির্জন গাড়ী। তিনপাহাড়ে কত রাত্রে গাড়ী পৌঁছুবে? বিয়ের দুতিন বছর পরে তিনপাহাড়ে ছিলেন তিনি মুক্তকে নিয়ে, সাণ্টুকে নিয়ে। সেই সময়ের কথা কখনো ভুলবেন না তিনি।

ব্যাণ্ডেল আর তিনপাহাড়। জীবনে এই দুই স্বর্গ। দুটি স্বর্গের দুটি অমর কাহিনী তাঁর বুকে লেখা রয়েছে। পঞ্চানন ঘুমিয়ে পড়লে তিনপাহাড়ে তিনি নেমে পড়বেন।

তিনপাহাড়ে এই বর্ষাকাল কাটে সেবার। একটা কি পাহাড়ের ওপর কি ঠাকুর ছিলেন। মুক্ত ও তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। মুক্ত বললে—খাবে কি? পাহাড়ের নিচে চড়ুইভাতি করবো।

রান্না করতে করতে বৃষ্টি এল। একটা পাকুড় গাছের তলায় রান্না হচ্ছিল। স্টেশন-মাস্টার ছিলেন শশিপদ সামন্ত, মেদিনীপুরে বাড়ী।

তাঁর দুই ছেলে ননী ও হাবু ছিল সঙ্গে।

হাবু কাঠ ভেঙে নিয়ে এলো পাহাড়ের ওপর থেকে। মুক্ত খিঁচুড়ি রাঁধতে গিয়ে ধরিয়ে ফেললে। তাই নিয়ে কি হাসাহাসি!

পাকুড় গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে মুক্ত চোখ পাকিয়ে বললে,—তুমি খাবে না?

—কে বলেছে?

—ননী হাবু বলেছে।

—বাজে কথা।

চমৎকার চড়ুইভাতি।

—খেয়ে বলতে পারবে না যে, খিচুড়ি এঁটে গিয়েছে।

—না গো, বলবো না। দিয়েই দ্যাখো।

মুক্ত হি হি করে হেসে উঠে বললে—ও পেটুকের পাল্লায় পড়লে খিচুড়ির হাঁড়িই কাবার হবে, তা বুঝতে পারছি—বসো। বসে যাও। ভালো সরের ঘি এনেছি, খিচুড়ি দিয়ে খাবে বলে। কিন্তু সত্যি, ধরে গেল বলে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

—পাগল! দিয়েই দ্যাখো না। মন খারাপ করতে হবে সেজন্যে নয়, আরও বেশি করে রাঁধ নি কেন সেইজন্যে।

—বেশ, খাও না। আবার না হয় চড়িয়ে দেবো।

মনে আছে সেই পাহাড়ের ওধারে কোথায় ছিল কদম ফুলের গাছ। ননী প্রথমে নিয়ে এল এক গুচ্ছ।

মুক্ত বললে—বাঃ, চমৎকার! খোঁপায় গুঁজবো।

তারপর চুপি চুপি বললে—কিন্তু সে ফুল তোমায় নিজের হাতে তুলে এনে দিতে হবে।

—ঠিক এনে দেবো। খাওয়া হয়ে যাক্। যাবার সময়ে নিয়ে আসবো—

পঞ্চাশ বছরের পার থেকে সেই প্রথম যৌবনের ফুটন্ত কদমফুলের সুবাস আজকার এই বর্ষাসজল বাতাসে বৃষ্টির ছাটের সঙ্গে যেন ভেসে আসে।

সে বর্ষাদিনের সুন্দর অপরাহ্ণটি, পাহাড়ের নিচের সেই পাকুড় গাছটি আজ স্বপ্ন হয়ে

গিয়েছে। সে মুক্তকেশীও...

কখন যেন মুক্ত এসে ওর শিয়রে দাঁড়ালো। সপ্তদশী তরুণী মুক্তকেশী। হাসিতে মুক্তোর মত দাঁতগুলি ঝক্‌ঝক্ করছে যেন। স্নেহভরে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললে—তুমি কদম ফুল এনে দেবে তো? তুমি এনে দিলে আমি খোঁপায় পর্‌বো—ভুলো না যেন, ভুলো না।

তারপর আবার চোখ নিচু করে বলছে—রোজ একখানা করে চিঠি দিতে হবে কিন্তু। আমি থাকতে পারবো না—সত্যি, বলো আমাকে ছুঁয়ে—দেবে তো?

পরক্ষণেই বিরলদন্তী পক্ককেশী বৃদ্ধা মুক্তকেশী হাঁটুর ওপর গামছা পরে তাকে ঝাঁটা উঁচিয়ে মারমুখী হয়ে বলছে—বেরো, বেরো, আপদ দূর হও বাড়ী থেকে। ম'লেই বাঁচি—মরণ হবে কবে তোমার? যম নেয় না কেন?

ঘুমের মধ্যেও চমকে উঠলেন কেশব। মস্ত একটা ঝাঁকুনি লাগলো গাড়ীটায়।

অনেক রাতে তিনপাহাড় স্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়ালে তিনি নেমে পড়লেন। দৌড়ে ছুটে গেলেন প্ল্যাটফর্মের পশ্চিম প্রান্তের সেই বুড়ো ঘোড়ানিম গাছটার দিকে। আধ-অন্ধকারে গাছের তলায় খুঁজে দেখলেন।

—সাণ্টু—বাবা—সাণ্টু!

আজ কোথায় গেল খোকা?

পঞ্চাশ বছর আগে সে এই ঘোড়ানিম গাছটার তলায় যে খেলা করতো।

যেন শান্তি পেলেন কেশব গাঙ্গুলী যৌবনের হারানো দিনগুলোর মধ্যে আবার ফিরে এসে, তিনপাহাড়ের নির্জন প্রান্তরে, প্ল্যাটফর্মে, অন্ধকার আকাশের তলায় এসে। তিনি আবার ছাব্বিশ বছরের যুবক কেশব গাঙ্গুলী, এই ইস্টিশনের তার-বাবু—বুকে কত আশা, কত বল, কত উৎসাহ, চোখে কত স্বপ্ন! তাঁর খোকা সাণ্টু আছে কাছে, তার তরুণী মা মুক্তকেশী আছে।

সব তিনি ফিরে পেয়েছেন।

—সাণ্টু, আয় আমার কোলে আয়। রামদেও এখন তোকে বাসায় নিয়ে যাবে না। খেলা করে বেড়া প্ল্যাটফর্মে।

প্ল্যাটফর্মের ঘোড়ানিম গাছটার তলায় দুদিন কেশব গাঙ্গুলী শুয়ে রইলেন।

নির্জন স্টেশন, বিশেষ কেউ লক্ষ্য করতো না। সত্যি কি অপূর্ব আনন্দে কাটলো এই দুটো দিন। সব ফিরে পেয়েছিলেন আবার।

পঞ্চাশ বছর আগেকার হারানো সব দিনগুলি।

তিনপাহাড়ের বিহারী স্টেশনমাস্টার একদিন কুলিদের কাছে খবর পেলেন, কে এক বুড়ো বাঙালীবাবু জ্বরে বেহুঁশ অবস্থায় নিমগাছটার তলায় শুয়ে আছে। কোনো পরিচয় পাওয়া গেল না তখন রোগীর কাছে। আরও দুদিন পরে স্টেশনের মুসাফিরখানায় লোকটি মারা গেল জ্বরের তাড়নায় এবং হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে।

তখন মৃত ব্যক্তির শিয়রের তলা থেকে রেলের বোতামযুক্ত কোট বের হওয়াতে চার ধারে জানাজানি হল এবং ক্রু-ম্যান পঞ্চানন-চক্রবর্তী এসে পড়ে সব পরিচয় দিলে কিন্তু সে দেশের ঠিকানা কিছুই জানে না, দিতেও পারলে না কোনো খবর। ব্যাণ্ডেল স্টেশনে দেখা হয়েছিল এই পর্যন্ত, কোথায় থাকতেন সে তখন বলতে পারলে না।

আরও কয়েকদিন পরে মুক্তকেশী ও মেয়েরা টেলিগ্রাম পেয়ে এসে পড়লেন যেদিন তিনপাহাড়ে, তার কয়েকদিন আগে কেশব গাঙ্গুলীর অস্থি ক'খানা সক্রিগলি ঘাটের গঙ্গায় স্থান পেয়ে গিয়েছে রেলের বাবুদের সহযোগিতায়। মুক্তকেশী শুধু ফিরে পেলেন কুরুভাইজার ফ্রেরিসের সেই ঘড়িটা।

বড় দিদিমা

অনেকদিন পরে মামার বাড়ী গিয়েচি। বোধ হয় বিশ বছর পরে। জঙ্গলে ভর্তি হয়ে গিয়েচে সারাটা গ্রাম। বড় বড় বাড়ী পোড়ো হয়ে, ভাঙা হয়ে পড়ে আছে, বট-অশ্বত্থর চারা উঠেচে ছাদের আর দেওয়ালের ফাটলে। ঘুঘু পাখীর বাসা হয়েচে চিলেকোঠায়— অনেক বাড়ীতে রাত্রে বাঘ ডাকে, বুনো শুওর লুকিয়ে থাকে উঠোনের জঙ্গলে।

লোকজন যারা গাঁয়ে ছিল, অনেককাল আগে বিদেশে চলে গিয়েচে। সেখানেই চাক্‌রি বা ব্যবসায় সূত্রে ঘর বাড়ী বেঁধে বাস করে, ম্যালেরিয়ার দেশে আসতে চায় না। তাদের বাবা জ্যাঠারা হয়তো আসতো, নতুন চাক্‌রি করবার সময় বছর কয়েক এসে দুর্গাপুজো, শ্যামাপুজো করেছিল। এখন তারা বুড়ো হয়ে গিয়েচে, তাদের ছেলেরা জন্মেচে বিদেশে, দেশ তারা জানে না, চেনে না—কেউ বাল্যকালে এক-আধবার এসেছিল, কেউ তাও আসে নি। এই ম্যালেরিয়ার দেশে দূর বিদেশ থেকে পয়সা খরচ করে কিসের টানে তারা আসবে?

সুতরাং বড় বড় বাড়ী ভেঙে পড়ে আছে, দেউড়ি ভেঙে গিয়েচে, হয়তো দরজায় তালা দেওয়া ঠিকই আছে। সাপের ভয়ে দিনমানে কেউ সেদিকে যায় না।

অনাদি-মামার বাড়ীটা বাইরে থেকে দেখলাম। বাল্যে এই অনাদি-মামার বাড়ী প্রথম গ্রামোফোন শুনি মনে আছে। অনাদি-মামার বাবা হরি দাদামশায় ভারি শৌখীন লোক ছিলেন, কলকাতায় চাকরি করতেন—তিনিই বিংশ শতাব্দীর এই আশ্চর্য যন্ত্রটি মামার বাড়ীর গ্রামে সর্বপ্রথম আনলেন কলকাতা থেকে।

কলের গান! কলের গান!

সতীশ মামার ছেলে যাদু বললে—এই কানু, চল্—গ্রামফনো দেখে আসি—

—সে আবার কি?

—গ্রামফনো। কলের গান। হরিজ্যাঠা এনেছেন—

দৌড়ে গেলাম ছুটে। একটা কাঠের বাক্সের ওপর একটা চোঙ বসানো। চোঙের ভেতর থেকে একেবারে অবিকল মানুষের গলায় গান বেরিয়ে আসচে!

একটা ছোট্ট ছেলে বললে—ওর মধ্যে কে আছে?

—কে আবার থাকবে?

—তবে গান গায় যে?

—কলে গান হচ্ছে। একে বলে কলের গান।

প্রাচীন আমলের বৃদ্ধ রামতারণ চক্রবর্তী লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে এসেছিলেন এই অদ্ভুত ব্যাপারটা দেখতে। তিনি সেকালের আমলে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন. নীলকুঠির সায়েবদের অনেক ঘোড়া, টম্‌টম্, বন্দুক দেখেচেন—কিন্তু কলের গান কখনো দেখেনও নি, শোনেনও নি! এগিয়ে এসে ভারী গলায় বললেন—হরি বাবাজি. এর নামডা কি বল্লে?

—গ্রামোফোন।

—মানে কি?

—মানে—মানে হলো কলের গান।

রামতারণ চক্রবর্তী আমার বাল্যেই দেহরক্ষা করেছিলেন. শুধু কলের গান ছাড়া আধুনিক যুগের অনেক আশ্চর্য জিনিসের কিছুই দেখে যেতে পারেন নি।

সেই অনাদি-মামাদের বড় বাড়ী পড়ে আছে জঙ্গলাবৃত হয়ে। দরজা খসে পড়েচে. ওপরের ঘরের জানলা ঝুলে বাতাসে এদিক ওদিক করচে, ছাদের ওপরে এতবড় অশ্বত্থ গাছ গজিয়েচে যে তার তলায় বসে রাখাল বাঁশি বাজাতে পারে। অনাদি-মামা বৃদ্ধ হয়েচেন. তিনি কাশী থাকেন, তাঁর ছেলেরা কেউ জৌনপুরে. কেউ এলাহাবাদে কাজ করে। অজ পাড়াগাঁয়ের পৈতৃক ভিটের নাম মুখেও আনে না।

সেই রামতারণ চক্রবর্তীর দোতলা প্রকাণ্ড বাড়ী ও পুজোর দালান পড়ে আছে. চামচিকে ও বাদুড়ের বাসা কড়ির গায়ে, ভাঙা মেজেতে গোখ্‌রো সাপের বাসা। ও সব

বাড়ীর ত্রিসীমানায় কেউ যায় না সর্পাঘাতের ভয়ে। দু' তিনটি এ গাঁয়ের নীচ জাতীয় লোকে অসাবধানে চলাফেরার ফলে সাপের কামড়ে জীবনও দিয়েচে।

বড় মামাদের বাড়ীটার কি দশা হয়েচে!

এই বড় মামা কাজ করতেন পশ্চিমে কোথায় যেন। আমার ছেলেবেলায় তিনি গ্রামের মধ্যে একজন শৌখীন লোক বলে গণ্য হতেন। বড় মামা হোলেন আমার আপন মামাদের জ্ঞাতি ভাই। যখন তাঁদের নিজেদের সরিকি পৈতৃক বাড়ীর অংশ একবার বৃষ্টির সময় খসে ভেঙে পড়ে, তখন তাঁর আপন জ্যাঠামশাই হাততালি দিয়ে হেসেছিলেন। বড় মামা তখন বাইশ বছরের যুবক, পিতৃহীন, অবস্থাও খারাপ, ওই জ্যাঠামশাই তাঁদের পৃথক করে দিয়েছিলেন।

ওদের অংশ ভেঙে পড়ে গেল, বেশ হয়েছে, এখন কিসে বাস করবে করুক, এই হল তাঁর আটাত্তর বছর বয়স্ক জ্যাঠামশাইয়ের উল্লাসের কারণ।

এদিনের কথা বড় মামার বড্ড মনে ছিল।

তাই তিনি রেঙ্গুনে চাকুরি করতে করতে যা করে হোক টাকা জমিয়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এই বাড়ী তৈরী করেন। এ বাড়ী যখন তৈরী হয়, তখন আমার মায়ের বিয়ে হয় নি—অত আগের কালের পাঁচ হাজার টাকা আজকালকার দিনে ষাট হাজার টাকার সমান।

সেই বাড়ী ভূতের বাসা হয়ে পড়ে আছে আজ কতদিন—বোধ হয় ত্রিশ বছর সে বাড়ীতে জনপ্রাণী পদার্পণ করে নি। ছাদের মাথায় কুঁচকাঁটার জঙ্গল। বট-অশত্থ গাছের স্বাভাবিক ভিড়। কেউ আসে না—বড় মামার ছেলেরা কেউ কলকাতায় থাকে, কেউ আসামে থাকে।

আর বড় মামার সেই যে জ্যাঠামশাই, হাততালি দিয়ে যিনি হেসেছিলেন—তাঁদের বৃহৎ বাড়ীটাও জঙ্গলে একেবারে ভরে গিয়েছে। বড় বড় সেকালের লোহার তালা দেওয়া আছে দরজাতে। তালা ঠিক আছে, কবাটগুলো খুলে শেকলের অবলম্বনে মাত্র ঝুলচে।

দোতলার খোলা ও ভাঙ্গা জানালা দিয়ে ঠাকুরদিদিমার হাতের সাজানো হাঁড়ি, কলসী এখনো তাকের ওপর সাজানো দেখা যাচে। আজ চল্লিশ বছরের ওপর হল এগুলো অমনি সাজানো রয়েচে। ঠাকুরদিদিমা চল্লিশ বছর মরেচেন।

দাদুজীর একমাত্র পুত্র, নাম তাঁর ছিল রামলাল, তাঁকে আমার আবছায়া মনে হয়। দার্জিলিংয়ে চাকরি করতেন, খুব সুপুরুষ ছিলেন। দাদুজীর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে একদিন দার্জিলিং থেকে প্রেরিত এক টেলিগ্রামে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ এলো। আমার তখন এগার বছর বয়েস।

সেদিনকার কথা আমার বড্ড মনে আছে।

আমার আপন দিদিমা তখন ডাল রান্না করছিলেন, তাও মনে আছে। দুপুর বেলা. তিনি রান্না ফেলে ছুটতে ছুটতে গেলেন ওদের বাড়ীতে। আমিও গেলাম দিদিমার সঙ্গে।

গিয়ে একটি করুণ দৃশ্য দেখলুম।

সেই দৃশ্যের জন্যেই দিনটি বড্ড মনে আছে আমার।

দেখি যে রামলাল মামার সুন্দরী তরুণী বধূ উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন মামার বাড়ীর দেশে তখনকার আমলে। উঠোনে এক উঠোন লোকের মধ্যে তিনি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কাঁদচেন না। কে তাঁকে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে. শাঁখা ভেঙে ও সিন্দুর মুছিয়ে নিয়ে আসবে. কেউ রাজী হচ্চে না, সবাই কাঁদিচে. তিনিও কাঠের মত দাঁড়িয়ে আছেন—এইটুকু মাত্র ছবি আমার মনে আছে।

রামলাল মামার একমাত্র শিশুপুত্রকে দিদিমা গিয়ে কোলে তুলে নিলেন রোয়াক থেকে। তার মা কিছুদিন পরে তাকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেলেন। তবে কোনোদিন স্বামীর ভিটেতে তিনি পদার্পণ করেছিলেন কিনা. আমার জানা নেই। ছেলেটি শুনেচি বড় হয়ে পশ্চিমে কোথায় চাকরি করে এখন।

সেই জঙ্গলের মধ্যে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে আবার চলাচলের রাস্তায় এসে উঠেচি —দেখি যে পরেশনাথ আসচে। পরেশনাথ সম্পর্কে আমার মামা হয়—আমার চেয়ে বেশি বড় নয়—অথচ এমন বুড়ো হয়ে গেল কি করে?

ও কাছে এলে বললাম—মামা যে? চিনতে পারো? কেমন আছ?

পরেশনাথ আমাকে দেখে মস্ত একটা হাঁ করলো। বললে—কোথায় যেন দেখেচি, চেনা চেনা মুখ—

আমি হেসে বললাম—বেশ! আমি কানাই—সীতানাথ চক্কত্তির ভাগনে!

সে উদাসীন এবং আগ্রহশূন্যভাবে বললে—ও।

ব্যস্।

অথচ আমি ওর সঙ্গে একত্র খেলা করেচি ছেলেবেলায়। এতদিন পরে ছেলেবেলার সঙ্গী দেখে ওর মনে এতটুকু উৎসাহ বা আনন্দ দেখলুম না। কেমন যেন হয়ে গিয়েচে।

বললাম—ভাল আছ?

জিজ্ঞাসার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তবুও বলতে হল ভদ্রতার খাতিরে।

সে বললে—আর ম'লেই বাঁচি।

বলেই সে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি বললাম—দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমায় চিনতে পারলে?

—হ্যাঁ, তুমি কানাই।

—তোমার কোনো অসুখ হয়েচে?

—হাঁপানিতে ভুগচি।

—বটে। চিকিৎসা হচ্ছে?

—গঙ্গাতীরে হবে, চিতের বিছানায় যেদিন শোবো। খেতেই পাইনে—চিকিচ্ছে।

—আচ্ছা, কেউ আছে নাকি এ পাড়ায় পুরনো দলের মধ্যে?

—বড় জ্যাঠাইমা আছেন। একা থাকেন।

বড় জ্যাঠাইমা মানে দাদ্জীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তাঁকে বাল্যকালেই আমি বৃদ্ধা দেখেচি। তিনি এখনও বেঁচে আছেন? রামলাল মামাকে ইনিই হাতে করে মানুষ করে-ছিলেন তাঁর আপন মা মারা যাওয়ার পর। যখন রামলাল মারা যান, তখনি ইনি বৃদ্ধা। ইনিই উঠোনে পড়ে সেদিন গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিলেন আমার মনে আছে। আজ বিরাশি-তিরাশি বছর বয়েস হয়েচে তাঁর, এর কম হবে না কোনো হিসেবেই।

বড় দিদিমাকে দেখতে গেলাম।

সেই মস্ত বড় বাড়ীর মধ্যে কুঁচকাঁটার জঙ্গল বাঁচিয়ে অতিকষ্টে ঢুকলাম। সরু পায়েচলার পথ কে যত্নে ঝাঁট দিয়ে রেখে দিয়েচে।

জ্যোৎস্না উঠেচে।

নব ময়রার যে বাড়ীতে আমাদের বাল্যকালের পাঠশালা বসতো, সে বাড়ীর জঙ্গলের মধ্যে শেয়াল ডেকে উঠলো।

আমি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখি এক মাজা-ভাঙা বুড়ী তুলসীতলায় পিদিম দেখিয়ে আস্তে আস্তে ভাঙা রোয়াকের ওপরকার কালমেঘের জঙ্গল মাড়িয়ে বারান্দার দোরের দিকে যাচ্চে।

—ও বড়দিদিমা!

—কে?

বুড়ী পেছন ফিরে দেখলে। আমায় চিনতে পারলে না। (চেনা সম্ভবও ছিল না অবিশ্যি)।

—কে তুমি?

—আমি কানাই। সীতানাথ চক্কত্তির ভাগ্নে আমি।

বুড়ী থমকে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে। অবাক হয়ে গিয়েচে যেন। পরেশনাথের চেয়ে এঁর মুখের ভাব অনেক বেশি সজীব ও পরিস্ফুট। প্রাণ এখনো মরে নি।

—ও, তুমি সত্যভামার সেই খোকা! কত বড় হয়ে গিয়েচ। এসো এসো, বসো।

এসো, বারান্দায় এসে বসো।

বুড়ী পিদিম রেখে এসে হরিনামের মালা হাতে আমার কাছে বসলো। বললাম—দিদিমা, এ বাড়ীতে কতদিন একা আছেন?

—আজন্মো। তিনি মরে গিয়ে এস্তক।

—আচ্ছা, আপনার ছেলেপিলে হয়নি দিদিমা?

—একটি মেয়ে হয়েছিল, ন'মাসের হয়ে মারা যায়। তারপর সেই শত্তুরকে মানুষ করেছিলাম—

—শত্তুর কে?

—তার নাম ছিল রামলাল।

—আমি বুঝতে পেরেচি, আমার ছেলেবেলায় তিনি মারা যান।

বড় দিদিমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন—কেউ নেই ভাই। আজ আমার বিয়ে হয়েচে কতকাল তা মনেও নেই। ন'বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। আমার সতীন, রামলালের মা তখন আঠারো উনিশ বছরের। রামলাল হল, আমার কি ন্যাওটো ছিল! হাতে করে মানুষ করেছিলাম। ওর মা তো তার ঝক্কি নিতো না।

—এখন আপনার বয়েস কত হল?

—চার কুড়ি পুরে গিয়েচে ভাই।

—একা কতদিন এ বাড়ীতে আছেন?

—তোমাকে তো বললাম ভাই! তিনি মরে গিয়ে এস্তক। রামলাল তখন থেকেই তো চাকরি করতো। তার বৌ এ বাড়ীতে থাকতো আমার কাছে। রামলাল মারা গেলে বৌমা চলে গেল এখান থেকে।

—আর আসে নি?

—না। বৌমার বাবার বাড়ী ছিল কলকাতার শহরে। শহরের মেয়ে, আর কখনো এখানে আসে!

—তাঁর একটি ছোট ছেলে ছিল?

বড় দিদিমা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি কি করে জানলে?

—ছেলেবেলার কথা মনে আছে যে। সে ছেলে কোথায়?

—জানিনে ভাই। পশ্চিমে চাকরি করে, এই শুনেছিলাম।

—চিঠিপত্তর দেয়?

—নাঃ।

—রামলাল মামার স্ত্রী বেঁচে আছেন?

—তা কি করে জানবো?

—খোঁজ নেয় না আপনার?

—কি জন্যে নেবে ভাই। পরে কি তা কখনো নেয়? তারা তো আর আমার কেউ না। বৌমা আমার সতীন-পোর বৌ। আমার ওপর তার কি দরদ থাকতে পারে বলো। খোকা তো আমায় মনেই করতে পারে না—তখন সে দেড় বছরের বাচ্চা। একাই থাকি. আজ কতকাল আছি তা ভুলেই গিয়েচি। কেউ নেই কোনোদিকে আপনার।

—আপনার বাপের বাড়ীর কেউ?

—হুগলীর কাছে মশাট গ্রামে আমার বাপের বাড়ী। ম্যালেরিয়ায় সে দেশ উচ্ছন্ন গিয়েচে। একটা ভাই ছিল, সে তারকেশ্বরে দোকান করতো। কোনদিন খবর নেয়নি ইনি মারা যাওয়ার পরে। সে আছে কি নেই, তা কি করে জানবো? বসো ভাই. আসচি—

বড় দিদিমা ঘরের মধ্যে ঢুকে হাঁড়ি-কলসী খুটখুট করতে লাগলেন। সেকেলে খাবরাটে ইঁটের প্রকাণ্ড বাড়ীর ছোট ছোট জানালা-দরজাশূন্য কুঠুরী. দিনমানেই অন্ধকার। দু-তিনটি ঘর দিদিমা ব্যবহার করেন, বাকিগুলো পড়ে থাকে চামচিকে আর বাদুড়ের বাসা হয়ে। তেলের অভাবে এতবড় বাড়ী অন্ধকার। খানিকটা পরে দিদিমা বেতের ধামিতে করে আমায় নিয়ে এসে দিলেন দুটি মুড়ি আর গোটাকতক নারকেলের নাড়ু—

আমার সামনে নিয়ে এসে বললেন—খা—

—আবার এ সব কেন?

—তুই কতকাল পরে এলি ভাই, সত্যভামার ছেলে, শুধু মুখে যাবি? আমার মনে সাধ তো আছে, হাতেই কিছু নেই আজ।

দিদিমার স্বর ভারী হয়ে এল। বললেন—কাঁচা লংকা খাবি? তুলে এনে দেবো?

—না, আমি লংকা খাইনে।

—হ্যাঁরে, রাজায় রাজায় যে একটা মকদ্দমা বেধেছিল, তা মিটে গিয়েচে?

—কি মকদ্দমা? কোন্ রাজায় রাজায়?

—তা তো জানিনে। সবাই বলতো। চাল আক্রা হয়েছিল, কাপড় মেলে না, কেরোসিন মেলে না। কি নাকি রাজায় রাজায় মকদ্দমা হচ্চে সবাই বলতো। মিটেচে?

বড় দিদিমা বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলচেন বুঝলাম। বললাম—হ্যাঁ, সে মিটে গিয়েচে। আচ্ছা দিদিমা—

—কি ভাই?

—আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েচে জানেন?

—কি হয়েচে?

—স্বাধীন হয়েচে। মানে, আমরা এখন কারো অধীন নই। ইংরেজ চলে গিয়েচে দেশ থেকে।

—মহারাণীর রাজত্ব এখন আর নেই?

মহারাণী! না, দিদিমাকে কোনো রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে না নিয়ে ফেলাই ভালো। কথাবার্তার ধারা বদলে ফেলার জন্যে বললাম—আপনার চলে কি করে?

—ওই দু তিন বিঘে ধানের জমি আছে। কর্তাদের আমলের। প্রজারা বড় ভালো। তাদের কাছে ভাগে দুটো ধান পাই—আর কিছু খাজনা পাই, তাতেই একরকম কষ্টে-সৃষ্টে চলে।

মুড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেল। বড় দিদিমা ঘটি করে জল দিয়েচেন, চায়ের কথা এখানে উঠতেই পারে না, এখনো দিদিমা মহারাণীর রাজত্বেই যখন বাস করেন।

বড় দিদিমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—রামলালকে দেখতে পাই যেন ছোট্ট দশ-মাসের খোকা, ফুটফুটে, এই বড় বড় চোখ—হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্চে। আমার সেই খুকীকে দেখতে পাই, রামলালের খোকাকে দেখতে পাই। কালকের কথা চোখের সামনে যেন আজও সব ঘোরে। রামলাল আমায় আজও ভোলে নি—বড্ড ভালবাসতো। আমায় বলতো, ছোট মা, আমি এবার এসে তোমাকে আর তোমার বৌমাকে চাকরির জায়গায় নিয়ে যাবো। সেই কোন্ পাহাড়ে। বড্ড শীত সেখানে নাকি।

আমি সচকিতে বলে উঠলাম—ও কিসের শব্দ?

বড় দিদিমা দন্তহীন মুখে হেসে বললেন—ভয় পেলি নাকি? ও-ঘরে চামচিকে ঝটাপটি করচে। ও রোজই করে—আমার ও সব সয়ে গিয়েচে। শুধু তাই? বাড়ীতে বড় বড় সাপ। বাস্তু। ওঁরা কিছু বলেন না। হয়তো বিছানায় শুয়ে আছি, রাত্তিরে গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল।

সভয়ে বলে উঠলাম—বলেন কি!

—বলচি কি। প্রায়ই দেখি। ঠান্ডা হিমমত গায়ে লাগে, তখন বুঝতে পারি। কি বলবো, সবই অদেষ্ট ভাই। নইলে অমন সোনার রামলাল আমায় ফাঁকি দিয়ে যাবে কেন? সতীন-পো বলে কেউ বলতে পারতো না। নিজের পেটের ছেলেও অত ভালবাসে না। আজকাল তো অনেক দেখতে পাচ্চি। বিয়ে করে এনে আমায় বললে—মা তোমার দাসী নিয়ে এলাম। আমি বললাম—না রে, আমার দাসী কেন সংসারের লক্ষ্মী। হেসে বললে —না মা, সংসারের লক্ষ্মী তুমি থাকতে আবার কে মা? বেশ মনে আছে—সূর্যি পাটে বসেচে, আষাঢ় মাসের লম্বা দিন, বৌ নিয়ে এসে আমার খোকা রামলাল দুধে-আলতা পিঁড়িতে দাঁড়ালো—

বড় দিদিমা কেঁদে ফেললেন। আমি সান্ত্বনা দেবার কথা বললাম অনেক। নিজেই

বুঝলাম সব বৃথা। আমি এবার উঠি। যতক্ষণ থাকবো, উনি রামলালের কথা অনবরত বলতে থাকবেন। এতদিন বোধ হয় শ্রোতা পান নি—কতকাল মনের মত শ্রোতা পান নি কে জানে!

চোখ মুছে বললেন—তবুও আছি, কর্তা তো চলে গিয়েচেন, তাঁদের ভিটেতে সন্দেবেলা পিদিমটা দিচ্চি—এই ভেবে মনকে বোঝাই। আজ আমার নাৎবোয়ের পিদিম দেওয়ার কথা, শাঁখ বাজানোর কথা—

আমি দিদিমাকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম। কোথায় হুতুম প্যাঁচা ডাকচে যেন দুর্গা-মণ্ডপের জঙ্গলে। জ্যোৎস্নার আলোয় এই প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা আর কালমেঘের গোয়ালেলতার জঙ্গল রহস্যময় দেখাচ্চে। কত কালের কত ইতিহাস এদের গায়ে লেখা।

পিছন ফিরে আবার দেখলাম, বড় দিদিমা বাইরের রোয়াকে এসে দাঁড়িয়ে আমার গমনপথের দিকে চেয়ে আছেন। কতদিন এই ইটের কারাগারে বন্দিনী থাকবেন দিদিমা? পাষাণী অহল্যার উদ্ধারের আর কত বিলম্ব কে বলবে।

অবিশ্বাস্য

চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

আমি দরিদ্র স্কুল-মাস্টার। চাকুলিয়া এরোড্রোমের চিফ্ এন্‌জিনিয়ারের তক্‌মা-পরা উর্দি-আঁটা চাপরাসী নামলো যে স্টেশন-ওয়াগন থেকে সে স্টেশন-ওয়াগন আমার খোলার বাড়ীর দোরে কেন? এগিয়ে গেলুম। কি ব্যাপার চাপরাসী সাহেব? কোথা থেকে আসা হচ্ছে? ভুল করনি তো?

—আপ্‌কো নাম আছে চাটর্জি বাবু? ইস্কুল-কা মাস্টার? একঠো চিট্টি হ্যায় বড়া সাব কা, আপকা নামমে।

—কোন্ বড় সাহেব?

—চিফ্ এন্‌জিনিয়ার সাব্, চাকুলিয়া এরোড্রোম।

—হ্যাঁ, আমারই নাম শৈলেন চট্টোপাধ্যায়।

—এস্, এন, চাটর্জি—এহি লিজিয়ে—ঠিক হুয়া, ওহি নামমে চিট্টি হ্যায়।

অ্যাঁ?...বলে কি! আমার নামের চিঠি। তাতে লেখা আছেঃ

"ভাই বগ্‌দা, অনেক কষ্টে তোর সন্ধান পেয়েছি। তোর 'বগ্‌দা' নাম আমরাই দিয়েছিলাম, মনে আছে? তুই এখানে মাস্টারি করিস্ শুনলাম। তাই গাড়ী পাঠালুম। বৌ ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে আসবি, এখানেই খাবি রাত্রে। গাড়ী করে পাঠিয়ে দেবো। আসা চাই—একা নয় কিন্তু, সস্ত্রীক। ইতি—তোদের ধীরেন রায়।

ঘাটপাত্‌লে হাই-স্কুল। আমার মাসীর বাড়ী। মেসোমশায় আমায় ভালো চোখে দেখেন নি কখনো। তাঁর কড়া, নির্ম্ম শাসন, হৃদয়হীন শাস্তি। মাসীমার খিট্‌খিটে মেজাজ, বেশি ভাত খাই বলে দুবেলা পাকেপ্রকারে অনুযোগ। সহপাঠিরা 'বগ্‌দা' বলে খেপাতো। পেট ভরে খেতে পেতাম না। কাপড় সেলাই করে পরতে হত।

কিন্তু ধীরেন রায় কোন্ ছেলেটি? আজ পঁচিশ বছর আগেকার বিস্মৃতপ্রায় স্কুল জীবনের দিনগুলির কুয়াশার মধ্যে ধীরেন বলে কোনো ছেলের মুখ তো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো না চোখের সামনে? নাম সব ভুলে গিয়েচি। চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বয়েস হল। পনেরো-ষোল বছরের কথা কত মনে আছে, বিশেষত এই দরিদ্র জীবনে।

সুহাসিনী শুনে হঠাৎ বড় ভয় পেয়ে গেল। অত বড়লোকের বাড়ী যাওয়ার উপযুক্ত শাড়ী নেই, গহনা তো দুগাছা ব্রোঞ্জের ওপর সোনার কাজ-করা চুড়ি। তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি লাল কলকা-পাড় একমাত্র ভালো শাড়ীখানা, যা কি-না বৃটিশ ফ্ল্যাগের মত সর্ব-

জনবিদিত, পরিবর্তনহীন ও অকাট্য হয়ে উঠেচে, পরে উঠলো ছেলেমেয়ের হাত ধরে গাড়ীতে।

গবর্ণমেণ্টের গাড়ী হু হু বেগে ছুটলো মাঠ-বনের পাশ কাটিয়ে চওড়া পিচঢালা রাস্তা বেয়ে। স্টেশন-ওয়াগনের মধ্যে তিনটি গদিমোড়া বেঞ্চি—হাত পা মেলে দিব্যি বসা গেল।

সুহাসিনী জীবনে এতদ্দুর মোটরগাড়ী চড়ে যায় নি কখনো, সে এবং ছেলেমেয়েরা খুশি-উপ্চে-পড়া চোখগুলো বড় বড় করে জানলা দিয়ে দ্রুত চলমান গাছপালা, পাথর, ঝরনার দিকে চেয়ে ছিল। মাঝে মাঝে বলছিল—হ্যাঁগা, আমরা ক'মাইল এলাম? ঐ ঘর-খানাতে কারা আছে? দ্যাখো দ্যাখো—কি চমৎকার ফুল ফুটে আছে বনে! আচ্ছা, এটা কি নদী? আর কদ্দুর আছে? বেশ সিনারি এ জায়গাটার, না? ওটা কি পাহাড়? ঐ যে বনধুঁধুলের ফুল ফুটে আছে দেখলাম, ওই ধুঁধুল কি তরকারি রেঁধে খায়? জবার জামাটা খুব ময়লা না তো? তাকিয়ে দ্যাখো তো! বাঃ কি সুন্দর ঢালু পাহাড়টা। দ্যাখো দ্যাখো —পাহাড়ের ওপর ওটা কি গাছ? কুসুম গাছ?...

চাকুলিয়া এরোড্রোমে গাড়ী পৌঁছে গেল। তারপরও পাঁচ মিনিট চলবার পর একটা সাদা বড় বাংলোর সামনে হর্ণ দিয়ে গাড়ী দাঁড়াতেই ফুল-প্যাণ্ট ও হাতগোটানো কামিজ-পরা এক ভদ্রলোক হাসিমুখে বাংলোর বারান্দায় দেখা দিলেন, তাঁর পেছনে একটি ভদ্র-মহিলা এসে দাঁড়ালেন, ছোট-বড় ছেলেমেয়ে সঙ্গে। সুহাসিনীর মুখ চুন হয়ে গিয়েচে দেখলাম, বেচারী এমন বড়লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে কখনো আসেনি, দেখে শুনে ঘাবড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয় ওর পক্ষে।

—আরে এই যে, আয় বগ্দা! এসো এসো বৌ-ঠাকরুণ! ওগো, এই দ্যাখো আমাদের বগ্দা! তারপর—সব ভালো? একটি ছেলে, দুটি মেয়ে? বেশ বেশ...থাক্ থাক্, এসো বাবা, সুখে থাকো,—ইনি তোমাদের কাকীমা হন, প্রণাম করো।

আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে সাহেবী-পোশাক-পরা ব্যক্তিটির দিকে চেয়ে ছিলুম। আরে, এ দেখচি আমাদের ক্লাসের সেই হাজু! যে সেকেণ্ড মাস্টারের অঙ্কের পিরিয়ডে নিয়মিত টাস্কের খাতা দেখাতো, একদিনও বাদ দিত না বলে মনে আছে। সেকেণ্ড মাস্টার একে বড্ড ভালবাসতেন। কিন্তু নীলমণি মিত্রের ইংরিজির পিরিয়ডে হাজু পেছনের বেঞ্চিতে আত্মগোপন করতো কোথায়, একদিন একটাও পার্সিং করতে শুনিনি ওর মুখে। আর মনে আছে ফুটবল খেলতে গিয়ে স্কুলের মাঠে ওর হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। মাস খানেক সেজন্য হাসপাতালে ছিল। মেয়েরা চলে গেল বাড়ীর মধ্যে, আমি ও হাজু বসে বসে কত পুরোনো কথা বলতে লাগলুম। ঘণ্টা খানেক কেটে গেল। হাজুর বড় মেয়ে চা ও খাবার দিয়ে গেল আমাদের দুজনের।

মিথ্যে কথা বলবো না, অনেকক্ষণ থেকে এই খাবারের প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হয়ে ছিল ক্ষুধাতুর মন। তা খাবার এলো ভালই—লুচি, বেগুন ভাজা, ইলিশ মাছ ভাজা, সন্দেশ, রাবড়ি। পরিশেষে চা।

হাজু বললে—সব বাড়ীর তৈরি। গৃহিণী ভাল রাঁধিয়ে—ওই মস্ত এক সুখ।

—কই, তোর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি তো?

—চল্ বাড়ীর মধ্যে। খাবার-টাবার তৈরি করছিল। রাত্রে এখানে খেয়ে যাবি কিন্তু।

—এই তো ভাই যথেষ্ট পেটভরা খাওয়া হল। আবার রাত্রে কি খাবো?—কথাটা কিন্তু আদৌ অতিরঞ্জিত বলিনি।

চা খাওয়ার পর হাজু বললে—চল্—এরোড্রোমের রান্-ওয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

—বৌকেও নিয়ে যাবো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে যাব, সেখানে খাওয়া যাবে।

সুহাসিনী এসে মোটরে উঠলো হাজুর সঙ্গে—আলাপ করিয়ে দিলাম। হাজু বললে—বৌ-ঠাকরুণ, একদিন আপনার হাতের রান্না খেতে যাচ্ছি কিন্তু—

সুহাসিনী বললে—সামনের রবিবার চলুন না সবাই। দিদি, মণ্টু, নীলিমা, অনিমা, সবাই যাবে।

হাজু হেসে বললে—সে হবে না। স্টেশন ছেড়ে বেশিক্ষণ কোথাও যাবার জো নেই আমার। খাবো গিয়ে সন্দের পরই। ঘণ্টা খানেক থাকবো। বাড়ীতে এরা না থাকলে চলবে না, এরোড্রোমের সাহেব-সুবো আসে ঐ দিন বেড়াতে—তাদের চা-টা দিতে হবে। আমি ঠিক যাবো।

—মণ্টু, নীলিমা, অনিমাকে নিয়ে যাবেন কিন্তু।

চাকুলিয়া এরোড্রোমের নানা জায়গা ঘুরে কেনেডি বলে এক সাহেবের বাংলোয় হাজু মোটর নিয়ে হাজির হল। কেনেডি এরোড্রোমের গ্রাউন্ড অফিসার এবং এন্‌জিনিয়ার। হাজুর সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব আছে বোঝা গেল। আমাকে, বিশেষ করে সুহাসিনীকে, খুব খাতির করলে। সুহাসিনী তো ভয়ে ও সংকোচে জড়সড়। ছেলে-মেয়েদের বিস্কুট, পনির, কলা প্রভৃতি খেতে দিলে। আমাদের দিলে কফি। দেশী গান শুনতে নাকি বড় ভালবাসে শুনে আমি সুহাসিনীকে একটা গান করতে বললাম। সুহাসিনী গরীবের ঘরণী বটে, কিন্তু ভারি সুন্দর ওর কণ্ঠ, তবে সময়াভাবে চর্চা না হওয়ায় নতুন আর কিছু শিখতে পারে নি। রজনী সেনের একটা গান ও কেমন চমৎকার গাইলে। কেনেডি শুনে খুব খুশি। আমি বললাম, যেদিন আমাদের বাড়ী যাবে কেনেডিকেও নিয়ে যেও। সুহাসিনীও তাই বললে। কেনেডিকে আমি সুহাসিনীর অনুরোধ বুঝিয়ে দিলাম। কেনেডির খুশি আর ধরে না। সুহাসিনীকে বললে—মাই ইণ্ডিয়ান সিস্‌টার, আই মাস্‌ট কীপ্‌ ইওর ইন্‌ভিটেশন।

হাজুর বাংলোয় যখন আমরা ফিরে এলাম, তখন রাত আটটা। তখুনি আমাদের খাবার জায়গা হল। ঘি-ভাত, মাংস, মাছ, চাটনি, পায়েস ও সন্দেশ। বেশ রান্না। ঘি খুব ভালো! মুঙ্গের থেকে কে একজন ওকে এই ঘি নাকি এনে দেয়।

খাওয়া হয়ে গেলে স্টেশন-ওয়াগন তৈরী হয়ে এল আমাদের জন্যে। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে মোটরে চড়ে আমরা রওনা হলাম। আবার সেই অরণ্যপথ ও মুক্ত প্রান্তর, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। আমাদের মন আনন্দে পূর্ণ। সমস্ত পথ সুহাসিনী কেবল সেই কথা বলতে বলতে এলো। বললে—আগে ভেবেছিলাম বড়লোকের কাণ্ড-কারখানা, না জানি কি বিপদেই পড়বো গিয়ে। কিন্তু এমন অমায়িক সবাই! দিদি তো মাটির মানুষ। তেমনি ঠাকুর-পো। সাহেবটাই বা কি ভাল লোক! ওদের কিন্তু ভাল করে খাওয়াতে হবে রবিবারে। আমি ছেলেমেয়েদেরও আসতে বলে দিয়ে এসেচি।

আমরা রাত দশটার সময়ে এসে নিজেদের খোলার ঘরের বাসায় পেঁছিলাম। উৎসাহ ও আনন্দে সুহাসিনী সারা রাত প্রায় জেগেই রইল এবং শুধুই এরোড্রোম-ভ্রমণের নানা ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। সে জীবনে কখনো এমন মোটর-ভ্রমণ করে নি, এমন সুখাদ্য খায় নি, এত বড় দরের লোকের সঙ্গে মেশে নি। সবটা মিলিয়ে আজ তার জীবনের একটি অতি স্মরণীয় দিন। আমার তৃপ্তি এই ভেবে যে, আমার নিজের কোনো দিনও ক্ষমতা হত না ওকে এভাবে আনন্দ দিই—তবুও অপরের দৌলতে যা হয় একটু আমোদ আহ্লাদের মুখ দেখে নিলে একদিন।

—আচ্ছা, ওঁদের কি খাওয়াবো বল দিকি? সাহেবটা যদি আসে, আমাদের খাওয়া খাবে তো?

—ঘি-ভাত রাঁধতে পারবে না?

—খুব।

—মাংস আর ঘি-ভাত রেঁধো। পায়েসের দুধ কতটা লাগবে বলো তো?

—তা আড়াই সেরের কম নয়। সেও ধরো একটা টাকা। বাদাম, কিস্‌মিস্‌ চাই।

—বাদাম নয়, পেস্তা বলো।

—ওই হল। পেস্তা।

—মাছ, কি মাছ আনবো?

—রুই কি কাৎলা এনো। কিন্তু মাছ কোথায় পাবে এ সময়? মনে হচ্ছে না যে মাছ পাবে। দেখো চেষ্টা করে। তোমার বন্ধুটি মাছ-মাংস খুব ভালবাসেন।

—কে বললে তোমায়?

—দিদি বলছিলেন।

—মুরগী খায় বলেচে?

—ওঃ, খুব। বাড়ীতে মুরগী পোষে, পেছন দিকটাতে। না খেলে বাড়ীতে মুরগী পোষে কেন?

শেষরাতের দিকে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেও যেন বড় স্টেশন-ওয়াগনের গদি-আঁটা বেঞ্চিতে বসে চক্রাকারে মস্ত বড় রান্‌ওয়েটায় ঘুরচি...ঘুরচি...

... ...

—বাবু! বাবুজি! বাবু!

আগেই মোটর আসার শব্দ পেয়েছি। সেই স্টেশন-ওয়াগনটা। ছুটে বাইরে এলাম। সবে স্কুল থেকে এসে বসেছি হাত-পা ধুয়ে। বেলা পাঁচটা।

—কি ব্যাপার চাপরাসী সাহেব? বড় সাহেব পাঠিয়েছে বুঝি? চিঠি কই, দ্যায় নি?

—বাবুজি, বড়া সাব—নেহি হ্যায়। আজ বেলা করীব এক বাজে বহুৎ ভারী অ্যাকসিডেণ্ট হুয়া দো নম্বর রান্‌-ওয়েমে। পাত্থল ফাটাতা থা ডিনামাইটসে। বড়া সাব হুঁয়াপর হাজির থা—মগর ওহি পাত্থল ফাট কর্‌কে ছুটা বহুৎ দূর। বড় সাবকো মাথামে গিয়া—একদম চুর হো গিয়া। মাইজিকো ফিট হুয়া, আবতক হোঁশ নেহি আয়া। কেনেডি সাহেবনে ভেজিন আপকো পাস্‌—চলিয়ে। কেনেডি সাবকা চিট্টি হ্যায়—

সুহাসিনী বাইরে এসে বললে—কার চিঠি গা? ওঁরা আসবেন? হাজু ঠাকুরপো লিখেচে? কবে আসবে?

খেলা

মতিলাল ছেলেকে বললে—বোসো বাবা, গোলমাল করো না। হিসেব দেখছি—

ছেলে বাবার কোঁচার প্রান্ত ধরে টেনে বললে—ও বাবা, খেলা কব্‌বি আয়—

—না, এখন টানিস্‌নে—আমার কাজ আছে—

—ও বাবা, খেলা কব্‌বি আয়—ঘোয়া খেলা কব্‌বি আয়—

—আঃ, জ্বালালে—চল্‌ দেখি—

মতিলাল হিসাবের খাতা বন্ধ করে ছেলের পিছু পিছু চললো। ছেলে তার কোঁচার কাপড় ধরে টেনে নিয়ে চললো কোথায় তা সেই জানে।

—কোথায় রে?

—ওখেনে—

হাত তুলে খোকা একটা অনির্দেশ্য অস্পষ্ট ইঙ্গিত করে—ভাল বোঝা যায় না। অবশেষে দেখা যায়, ভাঁড়ারঘরের পেছনে যে ছোট রোয়াক আছে, বর্ষার জলে সেটা বেজায় পেছল, শেওলা জমে বিপজ্জনক ভাবে মসৃণ—সেখানে নিয়ে এসে দাঁড় করালে মতিলালকে।

—এখানে কি রে?

—আউভাজা খা, আউভাজা খা—নে—

খোকা রোয়াকের নিচেকার কালকাসুন্দে গাছের পাতা এক একটা করে ছিঁড়ে নিয়ে আসতে লাগলো হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে, তারপর বাবার সামনে সেগুলো এক এক করে বসিয়ে দিলে।

—পড়ে যাবি, পড়ে যাবি, রোয়াক থেকে নীচে পড়ে গেলে ইঁটে কেটে—আঃ!

—আউভাজা খা না—ও বাবা?

মতিলাল ছেলের হাত ধরে রোয়াকের ধার থেকে টেনে নিয়ে এল দেওয়ালের দিকে। ছেলে ঘাড় বেঁকিয়ে চোখের তারা একপাশে নিয়ে এসে মতিলালের দিকে চেয়ে বললে—ঠিক বলেচ—

এ কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অবান্তর। ঐ কথাটা ছেলে সম্প্রতি শিখেচে সুতরাং স্থানে অস্থানে সেটা বলতে হবেই। মতিলাল ছেলের কথার দিকে মন না দিয়ে খড়ের

চালার একটা বাঁশের রুয়োর দিকে চেয়ে আপন মনে বলতে লাগলো—এঃ, উই লেগেচে দেখো—বর্ষাকালে যেটা তুমি নিজে চোখে না দেখবে, সেটাই লোকসান হবে—

খোকা এবারও বললে—ঠিক বলেচ—

অবিশ্যি খোকার উক্তির প্রয়োগসাফল্য এখানে সম্পূর্ণ আকস্মিক।

মতিলাল বললে—যাঃ যাঃ—ঐ এক শিখেচে, 'ঠিক বলেচ,' তা ওর সব জায়গায় বলা চাই। তা খাটুক আর না খাটুক—থাম্—

খোকা ভাবলে, বাবা তাকে বকলে কেন? সে হঠাৎ বড় দুঃখিত হল। দেড় বছর মাত্র ওর বয়েস, নাম টুনু, যেমন দুষ্টু, তেমনি বাচাল। মুখের বিরাম একদণ্ড নেই। বিষম পিতৃভক্ত, বাবা ছাড়া জানে না। সর্বদা বাবাকে চায়। ওর মা বলে, কাকে তুমি বেশি ভালবাসো খোকা?

—বাবা মতিলালকে।

—আর মা অন্নপূর্ণাকে নয়?

—হুঁ-উ-উ।

—তবে?

—বাবা মতিলালকে।

—তা তো সবই বুঝলাম। আমি বুঝি ভেসে এইচি? আমি বুঝি ভালবাসার যুগ্যি নই, হ্যাঁরে—এইবার বল্, কাকে ভালোবাসিস্?

—বাবাকে, বাবা মতিলালকে—

—বাঃ, বেশ ছেলে দেখচি। খোকন, সোনার খোকন, তুমি কার খোকন?

—বাবা মতিলালের!

—আর কার খোকন?

—মার।

—মার কি ভাগ্যি।

এই ধরণের কথা রোজই প্রায় হয়। এসব থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, টুনু বাবার একটু বিশেষ রকমের ন্যাওটো। বাবা ছাড়া সে কাউকে চায় না বড় একটা, বাবার সঙ্গে নাওয়া, খাওয়া, বাবার সঙ্গে ঘুমোনো।

মতিলাল এতে খুব সন্তুষ্ট নয়। তার হিসেবপত্রের খাতা মোটেই এগোয় না, এক দিনের কাজে তিন দিন লাগে।

বিকেলে মতিলাল হয় তো চাইচে নদীর ধারে কি কোনো বন্ধুর বাড়ী একটু বেড়িয়ে আসবে, ছেলে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বললে—ও বাবা, কি করচিস?

—কিছুই করিনি। দাঁড়িয়ে আছি।

—বেরিয়ে চলো। আমি যাবো।

—না।

—আমি যাবো বাবা।

—না। যায় না।

খোকা ততক্ষণ মতিলালের কোঁচার কাপড় হাতের মুঠোর মধ্যে পাকিয়ে ধরে ঠোঁট ফুলিয়েচে। চোখে তার করুণ আবেদন ও আশার চাউনি। কে পারে তার কথা না শুনে? মতিলালকে সঙ্গে নিতেই হয়। বাবার কাঁধে উঠে স্ফূর্তি তার। তখন সে জেনেছে. বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্চে সে অনেক দূরে কোথাও। তার পরিচিত জগতের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে।

মনের আনন্দে সে ব'লে যাবে—ও বাবা, ও মতিলাল. কি করচিস? বেরিয়ে চলো? আমি যাই।

—কোথায় যাচ্চিস রে?

—মুকি আনতে।

—আর কি আনতে?

—চিনি আনতে।

—আর কি আনতে?

—মাছ।

—আর কি?

খোকা ভেবে ভেবে ঘাড় দুলিয়ে বলে—আউভাজা—

—বেশ।

খানিকদূর গিয়ে খোকা আর বাবার কাঁধে থাকতে রাজি হয় না। তাকে পথে নামিয়ে দিলে সে গুটি গুটি হেঁটে চলে। দু-একবার পড়ে যায়, আবার ঠেলে ওঠে। হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে খোকা আর চলে না। সামনের দিকে কি একটা জিনিস সে লক্ষ্য করে দেখচে।

—চল্ এগিয়ে, দাঁড়ালি কেন?

খোকা ছোট্ট হাত দুটি প্রসারিত করে বলে নাটকীয় ভঙ্গিতে—বিচন কাদা!

—কোথায় ভীষণ কাদা রে? কাদাই নেই রাস্তায়—চল্—

—বিচন কাদা!......

—তবে নামলি কেন কোল থেকে? আয় আবার কোলে আয়—

আবার চলতে শুরু করলো খোকা। বেশ খানিকটা গেল গুট গুট করে। একটা জায়গায় পথের পাশে একটা শুকনো কিসের ডাল পড়ে থাকতে দেখে থেমে গেল। আঙুল বাড়িয়ে বললে—বাবা—আটি—আমি নিই—

—যাতে তাতে হাত দিও না—

—বাবা আমি নিই—

—নাও—

খোকার একটা গুণ, বাবার বিনা অনুমতিতে সে কোন একটা কাজ হঠাৎ করতে চায় না। এইবার সে তুলে নিলে লাঠিটা। আশপাশের গাছপালার গায়ে সপাসপ মারতে লাগলো। ওর বাবা বলে—ফেলে দে—ও খোকা, এইবার ফেলে দাও লক্ষ্মীটি—

—ও মতিলাল?

—কি?

—কি করচিস?

—বেড়াতে যাচ্চি বাবা। লাঠিটা ফেলে দে—লক্ষ্মী খোকা, লাঠি ফেলে দে—

খোকা লাঠিটা রাস্তার পাশে ফেলে রেখে আবার দিব্যি গুট্‌গুট্ করে চলে। এক জায়গায় রাস্তার দু-পাশে ভাঁটুই গাছ বর্ষাকালে খুব বেড়েচে। রাস্তার দু-পাশে অনেক দূর পর্যন্ত ভাঁটুইবন।

খোকা হঠাৎ দুহাত প্রসারিত করে বললে—কি ধান! কি ধান!

—ধান কই রে? ও হল—

—কি ধান! কি ধান!

মতিলাল ভেবে দেখলে, অতটুকু ছেলে ধান এবং ভাঁটুইয়ের পার্থক্য কি করে বুঝবে।

—ও বাবা, কি ওতা?

—কই রে?

—ওই—বসে আছে—

মতিলাল খোকার আঙুলের দিগ্‌দর্শন অনুসরণ করে দেখলে, সামনের গাছের ডালে একটা কাঠবেড়ালি বসে আছে। খোকা আর যায় না, সে দাঁড়িয়ে গিয়েচে এবং ভয়ের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে একদৃষ্টে সেটার দিকে। বাবার দিকে দুহাত বাড়িয়ে বললে—বাবা, কোলে—

—কোলে আসবি?

—ভয় কব্‌বে—

—কিসের ভয় রে? এটা হল কাঠবেড়ালি—ও কিছু বলে না। ভয় নেই—চল্—

মতিলাল যে বন্ধুটির বাড়ী গেল, তারা ওকে এক পেয়ালা চা খেতে দিলে। মতিলালের ছেলেকে দিল একটুকরো মিছরি। খোকা মিছরি একটু মুখে দিয়েই মুখ থেকে বার করে

নিয়ে মতিলালের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বললে—বাবা, খা—

এখন এ ব্যাপারটার ভেতরের কথা এখানে বলা এ সময়েই দরকার। ছেলের বয়স যখন আরো কম, দশ-এগারো মাস কি বছরখানেক, তখন থেকেই সে নিজের মুখে কোনো জিনিষ মিষ্টি লাগলেই বাবার মুখের দিকে হাত বাড়িয়ে বলবে—বাবা, খা—

মতিলালেরও বিশেষ আপত্তি থাকত না তাতে।

অবশ্য একটিবার বাদে।

একবার মাতৃস্তন্য পান করতে করতে খোকা নিকটে উপবিষ্ট মতিলালকে বলেছিল—বাবা, মিস্ত খা—

মতিলালেরা স্বামী-স্ত্রী মিলে খুব হেসেছিল।

নিজের মুখে যা ভাল লাগবে, তাই সে দেবেই বাবার মুখে এবং মতিলাল তা খেয়েও এসেচে. মুশকিলে পড়ে যেতে হয় ওকে, লোকজন থাকলে।

এখানে যেমন হল।

মতিলাল সলজ্জভাবে বললে—না, না—আমি আবার কি, খাও না—

খোকা বাবার রাগের কারণ খুঁজে পেলে না, রোজ যে খায়, আজ খাচ্ছে না কেন? নিশ্চয়ই রাগ করেচে।

সে দ্বিগুণ উৎসাহে বাবার মুখের আরো কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বললে—বাবা, খা—

—না না। তুমি খাও—

—বাবা, খা না—

খোকার এবার কান্নার সুর। অমন মিষ্টি জিনিসটা বাবাকে সে খাওয়াবেই।

মতিলাল ধমক দিয়ে বললে—আঃ, খাও না। আমার মুখে কেন?

—বাবা, খা না—

এবার বোধ হয় সে কেঁদেই ফেলবে। অগত্যা মতিলাল খোকার হাত থেকে মিছরির টুকরোটা নিয়ে খাবার ভান করে আবার ওর হাতে দিলে। খোকাকে ভোলানো অত সহজ নয়। সে বাবার মুখের দিকে চেয়ে বললে—মিট্টি?

—খুব মিষ্টি।

—আবার খা—

—না রে বাপু, বিরক্ত করলে দেখচি—

বন্ধুর বাড়ীতে অনেকে বসে ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললে—খোকা কি বলচে?

মতিলাল বললে, মিছরি দিচ্ছে খেতে—

ওর বন্ধু বললে—ও খোকা, বাবাকে কি দিচ্চ? মিছরি? তুমি খাও।

এই সব স্থূলবুদ্ধি লোকে কি বুঝবে—খোকা তাকে কতখানি ভালবাসে বা সে খোকাকে কতখানি ভালবাসে। এদের কাছে কিছু বলে লাভ নেই। পিতাপুত্রের সেই সূক্ষ্ম অবিচ্ছেদ্য ভালবাসার গূঢ় তত্ত্ব, যা মুখে বলা যায় না, যার বলে এক বছরের শিশু তার অত বয়সে বড় বাপের মনের ভাব বুঝতে পারে, সে জিনিসের ব্যাখ্যা যার তার কাছে করে কি হবে?

মতিলাল বললে—খাও তুমি—

খোকা হাত বাড়িয়ে বললে—খা না বাবা—

মতিলাল খোকাকে কোলে নিয়ে বন্ধুর বাড়ী থেকে উঠলো। খোকার মনে বার বার কষ্ট দেওয়াও যায় না, অথচ ওদের সামনে খোকার মুখ থেকে বের করা তার লালঝোলমাখা মিছরি খায়ই বা কি করে?

ওরা পথে নামলো।

টুনুর ক্ষুদ্র জগতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। আশপাশের পথে, বনে, ভাঁটুইবনে অন্ধকার নেমেচে। জোনাকি জ্বলচে কালকাসুন্দে গাছের ঝোপের আশেপাশে, ষাঁড়াগাছের নিবিড় পত্রপুষ্পের মধ্যে, বনমরচে লতার চারু অগ্রভাগে। অন্ধকারের গহ্বর থেকে যেন ফুটে উঠচে একে একে জ্যোতির্লোক, নীহারিকালোক।

মতিলাল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ও কি জ্বলচে রে?

—জোনা পোকা। নিয়ে এসো বাবা—

—তুই নিবি একটা?

—হ্যাঁ।

খোকা হেঁটেই যাচ্ছিল, অন্ধকার বনঝোপের দিকে তাকিয়ে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ।

—কি হল রে?

—বিচন কাদা!

—না, মোটেই কাদা নেই, শুকনো পথ—

—ছিয়াল!

—কোথায়? কোথাও নেই, চলো—

—কোলে কর্—নে—ভয় কব্বে—

—এসো তবে—

খানিকটা গিয়ে খোকা বললে—বাবা!

—কি?

—ও বাবা—আমি মুকি খাবো—

—বেশ।

—সন্দেশ খাবো—

—বেশ।

—ও বাবা!

—বোকো না—চুপ করো।

—ও বাবা মতিলাল!

—কি বাবা?

—কি করচিস্?

—কি আবার করবো? পথ হাঁটচি।

—মা কোথায়—মা?

—বাড়ীতে আছে।

—মার কাছে যাই—

—সেখানেই তো যাচ্চি—

মতিলালের স্ত্রী ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়েছিল। ছুটে এসে ছেলেকে কোলে নিয়ে বললে—ও আমার সোনার খোকন, আমার রুপোর খোকন, আমার এতটুকু একটা খোকন—কোথায় গিইছিলি রে?

খোকা হাত দিয়ে একটা অনির্দিষ্ট বস্তু দেখিয়ে বললে—ওখেনে—

—ওখেনে? বেশ রে, বেশ। হ্যাঁগা, যা-তা খাওয়াও নি তো?

মতিলাল বললে—না না। কি দেবেই বা কে এ সব জায়গায়। একটু মিছরি খেয়েচে।

অন্নপূর্ণা ওকে দুধ খাইয়ে শুইয়ে দিলে। খোকা খানিকটা উসখুস করে বললে—বাবা কোথায়?

—কেন?

—ঘুম দেবে।

—আমি ঘুম দিচ্ছি।

—বাবা দেবে—বাবা দেবে।

মতিলালকে খোকার শিয়রে বসে বসে ঘুম পাড়াতে হয়। প্রতি সন্ধ্যাতেই এ রকম। আজ নতুন কিছু নয়। খোকা বলে—বাবা, জন্তি গাছটি—

—কি? জন্তি গাছটি? তবে শোনো—

ওপারের জন্তি গাছটি জন্তি বড় ফলে—
গোজন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে—

খানিকটা পরে খোকা নিস্তব্ধ ও নীরব হয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে

মতিলাল যেমন বাইরে এসে বসে বসে তামাক ধরিয়েছে, খোকা এমন সময়ে কেঁদে উঠলো —ও বাবা, কোথায় গেলি? ও বাবা—

মতিলাল তামাক খেতে খেতে হুঁকো নামিয়ে রেখে ছুটলো ছেলের কাছে।

অন্নপূর্ণা হেসে বলে—ও ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে পেছনদিকে হাত দিয়ে দেখে তুমি আছ কিনা। যদি বোঝে—নেই, তবে ওর ঘুম অমনি ভেঙে যায়—

বাইরের তামাকের ধোঁয়া পুড়ে পুড়ে শেষ হয়, মতিলালকে ঠায় বসে থাকতে হয় শিশুর শিয়রে।

পরদিন নাইতে যাচ্ছে তেল মেখে মতিলাল। খোকা বল্লে—আমি যাবো—বাবা— নদীতে যাই।

সে রোজই যায়। তাকে তেল মাখিয়ে নিয়ে গিয়ে ডাঙায় দাঁড় করিয়ে রাখে। যে ঘাটে মতিলাল যায়, সেটাতে লোকজন বড়-একটা যায় না। বড্ড বনজঙ্গল। খোকা জলে নামবার জন্যে ব্যস্ত হয়।

মতিলাল ওকে কোলে করে জলে নামে। মহাখুশিতে দুহাত দিয়ে খোকা খলবল করে জলে। কিছুতেই উঠতে চায় না। ওকে দুটো ডুব দেওয়ায় মতিলাল। এক একটা ডুবের পর খোকা শিউরে আড়ষ্টমত হয়, নাকে মুখে জল ঢুকে যায়। খানিক পরে সামলে নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে। নদীতে বর্ষার ঢল নেমেচে, বড় বড় শেওলা, কচুরি-পানা টোপাপানার দাম তীরবেগে ভেসে চলেচে।

খোকা বলে—ও কি বাবা?

—শেওলা।

—ও বাবা, গান কয়ি, গান কয়ি—

—করো।

—এ-এ-এ-এ, ঘটি বধনন—

খেলারাম বাবাজি বাবাজি—

—বেশ। বেশ গান। এবার জল থেকে ওঠো। হ্যাঁরে, তোকে ও গান শেখালে কে রে?

—ফুছু।

—হ্যাঁ—যতো সব কান্ড। আবার গান করো তো?

—ঘটি বধনন—

খেলারাম বাবাজি—

—বেশ গান শিখিচিস—জয় যদু-নন্দন, ঘটিবাটি-বন্ধন,

তুলোরাম খেলারাম বাবাজি—

খোকার বহু আপত্তি সত্ত্বেও মতিলাল খোকাকে গা মুছিয়ে ঘাটের ওপরে কুলগাছের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে নাইতে নামলো। ঢল-নামা বর্ষার নদীতে কামট-হাঙরের ভয়, জেলেরা প্রায়ই দেখতে পায়। কুমীর তো কাল না পরশু একটা দেখা দিয়েছিল বেলে-ডাঙার বাঁকে। খোকাকে বেশিক্ষণ জলে রাখা ঠিক নয়। ডাঙায় কুলতলা থেকে বাবাকে জলে ডুব দিতে ও হাত-পা ছুঁড়তে দেখে খোকা খুব খুশি। ক্রমে খোকাকে খুশি করবার জন্য মতিলাল খরস্রোতা বর্ষার নদীতে সাঁতার দিতে শুরু করলে।

খোকা ডাঙা থেকে ডাকলে—ও বাবা—বাবা—

দূর থেকে মতিলাল উত্তর দিলে—কি?

—আমি যাই—

—না, আর নদীতে নামে না। ঠিক থাকো।

—ও বাবা—

—থাক্ দাঁড়িয়ে ওখানে—

খানিকটা পরে বাবাকে আদৌ আর না দেখতে পেয়ে খোকা ডাকতে লাগলো—বাবা— বাবা—

কোনো সাড়া নেই।

—ও বাবা—ও মতিলাল—

কোনো দিকে মতিলালের দেখাও নেই।

—ও মতিলাল, ভয় কব্‌বে—

খানিকটা চুপ করে থেকে সে ভয়ের সুরে বললে—ছিয়াল! বাবা, ও বাবা—

অনেকক্ষণ পরে কে-একজন তরকারিওয়ালা নৌকো পার হবার জন্যে এসে দেখে, কুলতলায় একটা ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে কাঁদচে। অনেক দূর থেকেই সে শিশুকণ্ঠের আর্ত কান্না শুনতে পেয়েছিল। সে কাছে এসে বললে—কে গা? কি হয়েচে খোকা? তুমি কাদের ছেলে? এখানে কেন?

খোকা আকুল কান্নার মধ্যে হাত বাড়িয়ে নদীর দিকে দেখিয়ে বলে—বাবা মতিলাল—ভয় কব্‌বে—

এ আজ পাঁচ ছ'বছরের কথা।

মতিলাল সান্যাল বাজিতপুরের ঘাটে বর্ষার নদীতে কুমীর বা কামটের হাতে প্রাণ হারান, তখন তাঁর শিশুপুত্র একা নদীর ঘাটে কুলতলায় বসে 'বাবা মতিলাল' বলে কাঁদছিল, এ কথা অনেকেই জানেন বা শুনে থাকবেন। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত শুনে দেখতে এসেছিলেন জায়গাটা। কেউ কেউ খোকার ফোটো তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেই ঘাটের সেই কুলতলায় তাকে আবার দাঁড় করিয়ে। তার পিতৃহারা প্রাণের আকুল কান্না বাইরে কতটুকু বা প্রকাশ হয়েছিল। তিনদিন পরে মতিলালের অর্ধভুক্ত দেহ পাওয়া যায় সর্ষেখালির বাঁকে মাছধরা কোমরজলে। পুলিশের হাতে দেওয়া হয় মৃতদেহ।

খোকা আজ কোথায়, এ প্রশ্ন অনেকে করবেন জানি।

টুনু নেই। এক বছর পরে সেও বাবার সন্ধানে অজানা পথে বেরিয়ে পড়ে।

অন্নপূর্ণা আছেন। গাঁয়ের লোকে দেখাশুনো করে, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের কলমের জোরে গবর্ণমেণ্ট মাসিক কিছু বৃত্তি দেয়।

জাল

ঘুরতে ঘুরতে কি-ভাবে আমি যে রামলাল ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে পড়েছিলাম, তা আমি এখনো বলতে পারি না। হাজারিবাগের জঙ্গলে ঘুরছিলাম, জীবিকা অর্জনের চেষ্টায়। সামান্য অবস্থার গৃহস্থের ছেলে, ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে কত জায়গায় না গিয়েছি। কে যেন বলেছিল, হর্তুকী আমলকী বয়ড়া চালান দিলে অনেক লাভ হয়, তারই সন্ধানে ঘুরছি, রামগড় থেকে দামোদর নদ পার হয়ে—ক্রমোচ্চ মালভূমির অরণ্য-সঙ্কুল পথে পথে।

জল খাবো। বেজায় তৃষ্ণা। সে পাহাড়ের আর বনের অপূর্ব শোভার মধ্যে বনজকুসুম-সুবাস ভেসে আসতে পারে বাতাসে; কিন্তু জলের সঙ্গে খোঁজ নেই।

রাঁচির লাল মোটর-সার্ভিসের বাসগুলো মাঝে-মাঝে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। এক-জায়গায় একটা বড় বাড়ী দেখলাম রাস্তা থেকে কিছুদূরে বনের মধ্যে। বিস্মিত যে না হয়েছিলাম এমন নয়। এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে অন্তত দু'লক্ষ টাকা খরচ ক'রে বাড়ী করলে কে? তার আবার মস্ত-বড় তোরণ, সাঁচীস্তূপের তোরণের অনুকরণে। তার ওপরে হিন্দীতে লেখা—'ভরহেচ্ নগর'।

সে কি ব্যাপার?

নগর কোথায় এখানে? একখানা তো বড় বাড়ী ঐ অদূরে শোভা পাচ্ছে।

যাক্ গে। আমার তৃষ্ণার জল এক ঘটি পেলেই মিটে গেল।

ভরহেচ্ নগরের বিশাল তোরণ অতিক্রম ক'রে প্রশস্ত রাজপথে পদচারণা করতে করতে প্রাসাদের মর্মর খচিত প্রশস্ত অলিন্দে গিয়ে সোজা উঠে পড়ি। এত-বড় নগরীতে জনসমাগম তেমন যে খুব বিপুল তা নয়। এ পর্যন্ত পুড়িয়ে খেতে একটি প্রাণীর সঙ্গেও

সাক্ষাৎ হয় নি।

এখন দেখছি, ওই যে একটি বুড়োমত মানুষ বৈঠকখানায় ব'সে আছে বটে...

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললাম, থোড়া জল পিনে মাংতা।

বৃদ্ধলোকটি আমার দিকে চেয়ে দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠলো—ও, আপ পানি পিয়েঙ্গে? এই ভগীরথ, ই-ধার আও—আপ আইয়ে বৈঠিয়ে—আপ বাঙালী? আসুন, আসুন—বসেন। আমার বড়বাজারে কারবার ছিল। বাংলা জানি, বসেন।

এইভাবে রামলাল ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

—এই ভগীরথ, থোড়া পানি তো আগে পিলাও বাবুজিকো। চা খান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এই ভগীরথ, সাবিত্রীকে বোলো, চা বানানেকে লিয়ে। ভালো হয়ে বসুন। আপনার নাম কি আছে?

—আমার নাম হিতেন্দ্রনাথ কুশারী—দেশ বসিরহাট, চব্বিশ পরগণা।

—কুশারী? ব্রাহ্মণ আছে তো? না, কি আছে?

—ব্রাহ্মণ, রাঢ়ীশ্রেণী।

—ঠিক আছে। নোমোস্কার। আমিও ব্রাহ্মণ আছি, আমার নাম রামলাল ব্রাহ্মণ, দেশ ভরহেচ্ নগর, বিকানীর।

—ও, তাই বুঝি...

—ঠিক ধরিয়েছেন। বাঙালী-জাত বড় বুদ্ধিমান্ আছে। কথা গিরনেসে মালুম কর্‌লেতা হ্যায়—এ জায়গাটা আচ্ছা লাগে। বন আছে চারদিকে। গোলমাল নেই। তুলসীজি বলিয়েছেন, দণ্ডক-বনের শোভা কি আছে?—

শোভিত দণ্ডক বন কি রুচি বনী
ভাঁতিন ভাঁতিন সুন্দর ঘনী—

কুছু বুঝলেন? দণ্ডক-কাননের বড় শোভা আছে। বৃচ্ছ, ফল, পাত্তিসে, খুব সুন্দর। রামায়ণের কথা আছে। তা এই জায়গাটা তেমনি লাগে হামার। দেড়শো বিঘে লিয়েছি এখানে বহুৎ সুবিস্তাসে। তিশ্ টাকা বিঘা।

—বলেন কি!

—কেন না হোবে? বাঘ ভালু ছাড়া এখানে বাস করবে কে?

—কার জমি?

—শিরোহির এক মৌজাদারের। ধরতীনারান মুন্সি, পুরুলিয়ায় কারবার-ভি আছে। ওখানেই থাকে।

জল এলো। আমি বাইরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে জল পান করলাম। শরীর ঠাণ্ডা হল। শুধু-জল নিয়ে আসার জন্যে শুনলাম রামলাল ব্রাহ্মণ চাকরকে তাড়না করচে খাঁটি ঠেট্ হিন্দিতে, যার মর্ম হল—তোমার মগজে কোন বুদ্ধি নেই। চবুতারায় ভদ্রলোক এলো, তুমি শুধু এক লোটা পানি...কেন, এক মুঠো শুখা বুটও কি ছিল না ঘরে? এইরকম আদব শিক্ষা হচ্চে তোমার দিন-দিন। মাইজিকে কিংবা রংধারীমাইকে জিগ্যেস করলে না কেন?

আমি জল খেয়ে ঘরে ঢুকতেই বৃদ্ধ কথা বন্ধ ক'রে দিলে চাকরের সঙ্গে। আমার দিকে চেয়ে বললে—আউর পিয়েঙ্গে?...নেহি? ঠিক আছে।...পান?

—পান চলে, তবে থাক্ সে এখন।

—আচ্ছা, থোড়া মিঠাই তো খা লিজিয়ে! ও সাবিত্রী—

সাবিত্রী কোনো বড় মেয়ের নাম নয়। আট-নয় বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো একটা থালায় সাত-আটটা বড়-বড় লাড্ডু নিয়ে, বুঁদের লাড্ডু।

লাড্ডুগুলোর চেহারা এমন লোভনীয়, গা থেকে ঘি যেন ঝ'রে পড়ছে—কিশমিশ বাদাম দেখা যাচ্ছে লাড্ডুর গায়ে। বৃদ্ধ আমাকে পাঁচ-ছ'টা লাড্ডু খাইয়ে তবে ছাড়লে। ওর ভদ্রতা আমাকে মুগ্ধ করলো, আমি বাইরের লোক, সম্পূর্ণ অপরিচিত, জল খেতে চেয়েছিলাম এইমাত্র সম্বন্ধ।

এইবার আমি বিদায় নিতে উদ্যত হোলাম, বৃদ্ধ সে-কথায় কানও দিলে না।

—আরে কোথায় যাবেন আপনি? নেহি যাইয়ে-গা আজ। জংলী পথ, শেরকা বড় ডর। আজ-তো নেহি জানা চাহিয়ে।

—সে কি! আমি যাবো না?

—থোরা নাস্তা কর্ লেন, দাল-রোটি খান, গপ্‌সপ করুন। যাবেন। আমার মোটর আপনাকে পেঁাছিয়ে দেবে হাজারীবাগ্‌মে।

মোট কথা এই যে, আমার সেদিন যাওয়া হল না। বিকেল-বেলা আমাকে নিয়ে বৃদ্ধ ওদের ভরহেচ্ নগরের পশ্চিমপ্রান্তে বেড়াতে গেল। কি অপূর্ব শোভা চারিদিকে। কম্‌ব্রিটাস-লতার সাদা পাতার গুচ্ছ বড় বড় শালগাছের মাথায় এমনভাবে সাজানো, যেন দূর থেকে মনে হয় ওরা প্রাচীন শালতরুর পুষ্পস্তবক। পাহাড়ের পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্চে, নিঃশব্দে বনভূমিতে দূরে-দূরে রহস্যময় অন্ধকার নেমেছে। বনের মধ্যে ধনেশ-পাখী কু-স্বরে ডাকছে, বড় সম্বর হরিণের রব শোনা গেল একবার মাত্র। কি নির্জন চারিধার...মুক্তরূপা ধরিত্রীর জ্যোৎস্না, সূর্যাস্ত ও অরুণোদয় এখানে এক-একটি কাব্য। শুধুই সবুজ বনশীর্ষ, শুধুই ধূসরবর্ণ পাথরের তৈরী শিখরদেশ, অস্ত-দিগন্তের সিঁদুর ছোঁয়া...

রামলাল ব্রাহ্মণ বললে, এখানে বহুত জমিন আমি লিয়েছে। কলকাত্তা-মে বড়া ধকল আউর ঘিঞ্জি। এখানে জমিন লিয়ে বাড়ী করিয়েছে, কিন্তু ভালা আদমি নেই। বাঙ্গালী-লোক আনেসে হাম জমি মুফৎ-সে দে-দেঙ্গে। আপনারা আসবেন?

—তা আমি ব'লে দেখতে পারি।

—হাঁ, জরুর দেখিয়ে গা। এক পয়সা দাম হাম্ নেহি লেঙ্গে। তিন-তিন বিঘা দে-দেঙ্গে হর-এক ফ্যামিলিকো।

—বেশ। আপনাদের এখানে কতজন লোক থাকে?

—এই দশ-বারোঠো আদমি রহতা হ্যায়। নৌকর চাকর লে-কর-কে। লোক নেই, ঐ আমার বড় দুঃখু আছে।

—আমি ব'লে দেখবো, আসতে পারে, অনেকে জমি তো পাচ্চেই না। দশ-বিশগুণ দাম দিয়ে জমি কিনেচে।

—একপয়সা নেহি দেনে হোগা। যেত না জমি মাঙ্গে, ও হাম দে-দেঙ্গে। আপনি আসুন না?—আপনি এলে পাঁচ বিঘা জমি দেবো।

আমি জমি কি করবো এখানে? অবস্থা এমন-কিছু ভাল নয় যে, জমি কিনে বাড়ী করবো। কাকে নিয়েই-বা ঘর পাতবো? আমি হচ্চি ভবঘুরে ক্লাসের লোক। জমি-বাড়ী আমার জন্যে নয়। কথাটা বলেই ফেললাম।

বৃদ্ধ বললে—আপনি সাদি করেন নি?

—না।

—ঘরমে কৌন্ হ্যায়?

—কাকা আছেন, তাঁর ছেলেরা আছে।

—মা-বাপ-ভি নেহি?

—কিছু না।

—এখানে কোথায় যাচ্চেন?

—কোথাও না। ব্যবসা করবো ব'লে দেখে বেড়াচ্ছি।

রামলাল হেসে বললে—কুছু-কুছু লিখাপড়া তো জানেন?

—তা জানি।

—ব্যস্! তবে মিটেই গেল-তো। আপনি আমার এখানে আসুন।...সম্‌জা?

—কি সম্‌জাবো? এখানে কি ক'রে থাকবো, থাকলে পেট চলবে কোথা থেকে? খাবো কি?

বৃদ্ধ হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললে—খাবার কুছ তক্‌লিফ নেই হোবে. আমি খেতে দেবো। আপনাকে আমি রেখে দেবো এখানে। মৌজ-মে থাকবেন। খাবেন। আজসে রহ্

যাইয়ে। বড় খুশি হবো। দো-মনা মাৎ কিজিয়ে। একঠো ঘর আপ্‌কো দে দেঙ্গে বাসোকে লিয়ে। থাকতেই হবে আপনাকে।

ভবঘুরে আমি সেইদিন থেকে ভরুহেচ্‌ নগরে স্থায়ী নাগরিক হয়ে পড়লাম।

বৃদ্ধ রামলাল ও আমি কখনো বৈঠকখানায়, কখনো বনের প্রান্তে ব'সে ভবিষ্যতের ছবি আঁকতাম। ভরুহেচ্‌ নগর মস্ত জায়গা হবে...এখানে হবে সিমেন্টের কারখানা...ওখানে হবে কাঁচের কারখানা...এখান দিয়ে রাস্তা বেরুবে...বাসিন্দা-ভদ্রলোকদের জমি ওই দিকে হবে...কোনো-কোনো জমিতে তরি-তরকারির আবাদ হবে, ইত্যাদি। সবটাই আকাশ-কুসুম। কেউ আসবার কোনো আগ্রহ দেখালে না এখানে। দেখাবেও না, তা বেশ বুঝলাম।

ক্রমে আমি এদের পরিবারের সব খবর জানলাম। রামলাল ব্রাহ্মণের তিনটি পুত্র। কলকাতায় এই বৃদ্ধের বড় কারবার ছিল, সে-সব বেচে দিয়ে এই ভরুহেচ্‌ নগরের পত্তন হয়েচে। ব্যাঙ্কে এখনো অনেক টাকা। ছেলেরা কেউ রাঁচি, কেউ বিকানীরে থাকে। বড় ছেলের পুত্র দরিরাম এই ভরুহেচ্‌ নগরেই বাস করে। সাবিত্রী বলে ছোট্ট খুকী তারই মেয়ে। পুত্রবধূর নাম অনসূয়া, খুব মোটা, মাঝে-মাঝে ঝোলা ঘোমটা দিয়ে মোটরে কখনো রাঁচি, কখনো হাজারীবাগ যায়। রামলালের স্ত্রী নেই, অনসূয়া বাঈ খুব সেবা করে। আরও তিন-চারটি নাতি-নাতনী আছে, তারা ঠাকুরদাদার বড় একটা ঘেঁষ নেয় না।

অনসূয়া বাঈ আমাকেও আড়াল থেকে বেশ আদর-যত্ন করে, সেটা আমি বুঝতে পারি। লোক এরা খারাপ নয়। ঘি, পুরী, চাটনি, বড়-বড় লঙ্কার আচার, বাজরার রুটি, হালুয়া, কিশমিশ-মিশ্রিত দুধ, খুব খেয়ে পনেরো দিনের মধ্যে আয়নায় নিজের মুখ আর নিজে চিনতে পারিনে। একদিন খেতে বসেচি, অনসূয়া বাঈ আড়াল থেকে ব'লে পাঠালে, আমি অত কম খাই কেন?

আমি বললাম—সে কি! কত খাবো? খুব খাচ্চি।

খবর এলো—না। রাত্রে ওই ক'খানা পরোটা খেয়ে মানুষ বাঁচে? আরো বেশি খেতে হবে।

—মাসীমাকে বলো, তাঁর কথার ওপর আমি কথা বলতে পারিনে। তিনি যা বলবেন আমি করবো।

—বাঙালীরা খুব মছলি খায়, এখানে মছলি যখন মেলে না, তখন দুধ ঘিউ তার বদলে খুব খেতে হবে।

—যতটা পারি নিশ্চয় খাবো।

অনসূয়া বাঈয়ের যত্ন আমি ভুলবো না। যদিও কখনো আমার সামনে সে বেরোয় নি, তবু আমার সব-রকম সুখ-সুবিধা আড়াল থেকে এমন তদারক করতেও আমি কাউকে দেখিনি।

এরা সত্যি একটি অদ্ভুত ভালো পরিবার।

এ ধরণের মানুষের দল যে এই স্বার্থপর পৃথিবীতে এ-সব দিনেও বর্তমান আছে, তা জানতাম না। আমাকে ওরা জমি দিয়ে বাস করাবে, আমার উন্নতি ক'রে দেবে—রামলাল ব্রাহ্মণ এ-সব আশ্বাস কত দিতো আমাকে। রামলালের স্বপ্ন ভেঙে দিতে আমার কষ্ট হত। আমি বেশ দেখতে পেতাম ভরুহেচ্‌ নগরের পরিণাম। এই বুড়ো যতদিন বেঁচে, ততদিন এই নগরীর আয়ু। তার পরেই এই ভরুহেচ্‌ নগরের রাজপথে ছোটনাগপুর অরণ্যের নাম-করা বাঘের দল বায়ু সেবন করবে। অরণ্য তার পূর্ব-অধিকার আবার পত্তন করবে। ওর ছেলেরা বিলাসী-যুবক, এই জঙ্গলের মধ্যে এসে বাস করবার জন্যে তাদের রাত্রে ঘুম হচ্চে না!

কেউ এসে এখানে বাইরে থেকেও বাস করবে না।

কারণ, যারা আসবে, তাদের উপজীবিকা হবে কি এ নির্জন অরণ্যে? ভরুহেচ্‌ নগর তো তাদের খেতে দেবে না। রামলালের মত ব্যাঙ্কে টাকাও থাকবে না তাদের। এই প্রস্তর-সঙ্কুল মালভূমিতে চাষবাস করবে কিসের? আর যারা সত্যিই রামলালের মত ধনী, তারা শহরের শত সুখবিলাসের মোহ কাটিয়ে এই পাণ্ডববর্জিত স্থানে আসতে যাবে কেন? ওর ছেলেরাই তো আসে না।

রামলাল মাঝে মাঝে আমায় বলে—তোমার কি মনে হচ্চে? লোক কতদিনের মধ্যে এখানে হবে?

—শীগ্‌গির হবে।

—এক-একজন গৃহস্থকে কতটা জমি দেওয়া দরকার?

—কতটা মোট জমি আপনার?

—দেড়শো বিঘা। দরকার হোনেসে আউর বন্দ্‌বস্ত করেঙ্গে।

—ধরুন, পাঁচ বিঘে।

—তিন বিঘা হাম ঠিক কিয়া।

—জলের কি ব্যবস্থা হবে?

—ইন্দারামে ইলেকট্রিক পাম্প বসা দেগা, তামাম জায়গামে পানি সাপ্লাই হোগা—কুছ ভি নেহি—ওসব ঠিক হো যায়গা।

—ঠিক আছে।

—তোমায় সব্ দেখাশুনো করতে হবে।

—নিশ্চয় করবো। আনন্দের সঙ্গে করবো।

এ-ধরণের কথা প্রায়ই হত।

মুখে যাই বলি, বুড়ো রামলালের জন্যে আমার দুঃখ হয়। মনে যা আসে কখনো মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারিনে।

অনসূয়া বাঈ একদিন খাবার সময় ব'লে পাঠালে—থোকা-ফলের তরকারি খাবে?

—সে আবার কি?

—বিকানীরে হয়। শুকনো ফল দেশ থেকে এসেচে, ভিজিয়ে রেখে তরকারি হবে। খেয়ে দেখো খুব ভালো।

—মাসীমা যখন বলচেন, নিশ্চয়ই খাবো।

ওদের তরকারি কোনোটাই আমার ভালো লাগে না। অন্য-ধরণের রান্না, বাংলাদেশের মত খেতে নয় কোনোটাই। তবে, ঘি আর দুধের প্রাচুর্যে সব মানিয়ে যেতো। দিনকতক পরে ভাবলাম, এখানে ব'সে-ব'সে খাচ্চি কেন, এদের কি উপকার আমি করচি এর বদলে? ওরা আমায় যে কাজের জন্যে রেখেচে, সে কাজ কোনোদিনই তো হবে না এদের।

রামলালকে বললাম—আমি কি করবো, বলুন?

—কামকা-ওয়াস্তে ঘাবড়াও মাৎ, বহুৎ কাম মিল যায়গা।

—সাবিত্রীকে কেন পড়াই না?

—কি পড়াবে?

—ইংরিজি, বাংলা।

—হাঁ, ও হোনেসে বহুৎ আচ্ছা। পড়াও।

অনসূয়া বাঈ খুব খুশি। মেয়েকে খুব সাজিয়ে-গুছিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে। আমি মন দিয়ে তাকে পড়াতে শুরু করি। মুখে মুখে ইতিহাস শেখাই, গ্রহনক্ষত্রের কথা বলি। সাবিত্রী তেমন বুদ্ধিমতী নয়, পড়াশুনোর দিকে মন নেই তার। অনিচ্ছার সঙ্গে ব'সে ব'সে কথা শুনে যায়, শুধু ঘাড় নাড়ে। ওদের একটি ছেলের একবার অসুখ হয়েছিল, রাঁচি থেকে ডাক্তার নিয়ে এলাম, ওষুধ নিয়ে এলাম। নানারকম চেষ্টা করি ওদের সেবা করতে।

সারা বছর এইভাবে কেটে গেল।

ভরহেচ্ নগরের জনসংখ্যা আমি এসে সেই যে বাড়িয়েছিলাম, তারপর আর বাড়লো না।

একদিন অপূর্ব জ্যোৎস্নারাত্রে নগর-তোরণের পাশে প্রস্তর-বেদিকায় ব'সে আছি একা একা, এমন সময় দেখি, অনসূয়া বাঈ প্রশস্ত রাজপথে পদচারণা করতে করতে তোরণের কাছে এসে, আমায় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে থতমত খেয়ে গেল।

আমি বেদী থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার ক'রে বললাম—মাসীমা?

অনসূয়া হিন্দীতে বললে—এখানে একা ব'সে যে?

—এই একটু ব'সে আছি।

—খাওয়া হয়েচে, পেট ভরেচে তো?

—দেখুন তো! আপনি প্রায়ই অমন ব'লে পাঠান, আমার লজ্জা করে।

—এখানে আছো, তোমার মা নেই কাছে, আমাদের দেখতে হবে না?

—মায়ের জাত আপনারা। ঠিক কাজ আপনাদের।

—সাদি করোনি কেন?

—কি খাওয়াবো বলুন? আমি তো আপনাদের দয়ায় খেয়ে বেঁচে আছি।

—বেটা, এ-রকম কথা বোলো না, শুনলে কষ্ট হয়। তুমি কি আমাদের পর? আমাদের ঘরের একজন।

—সে আপনাদের দয়া।

—কিছু না বেটা। তোমাকে সাদি দিয়ে এই ভরহেচ্ নগরে বাস করাবো।

আবার সেই আকাশকুসুম। আবার ভরহেচ্ নগরের কথা। ওদের মন কি সুন্দর! কত জায়গায় গেলাম, এদের মত মন কোথাও পেলাম না। অনসূয়া বাঈ হেসে চ'লে গেল, আমাকে ব'লে গেল—ঠাণ্ডায় আর বেশিক্ষণ ব'সে থেকো না, বোখার এসে যাবে। তা-ছাড়া এত রাত্রে ফটকের বাইরে ব'সে থাকাও নিরাপদ নয়, বাঘ না আসে, ভালুক আসতে পারে।

আমি পেছন থেকে ডেকে বললাম—শুনুন, ও মাসীমা! বাঘ দেখেচেন এখানে কোনোদিন?

—দু-তিন দিন। বড়কা বাঘ। রাঁচি থেকে আসবার পথে দেখেচি, মোটরের হেড্-লাইটের সামনে। এই ফটকের বাইরে এই রাস্তার ওপরে সন্ধের পর দেখেচি। তুমি চলে এসো—শোনো আমার কথা।

—যাচ্চি এখুনি।

অনসূয়া চ'লে গেল, কিন্তু আমি তখনি উঠতে পারলাম না। নির্জন জ্যোৎস্না-রাত্রের শোভার সঙ্গে মিশে গেল হারানো-মায়ের কথা। মেয়েরা হচ্চে, আসলে মা, তারপর অন্য কিছু। কি ভালো লাগলো সে-রাত্রে অনসূয়া বাঈয়ের স্নেহসিক্ত ওই সামান্য দুটি কথা।

তারপর আমি একা কতক্ষণ তোরণের বহির্ভাগে সেই বেদিকায় ব'সে রইলাম। হু-হু বাতাস বইচে, সপ্তপর্ণ-পুষ্পের উগ্র সুবাস ভেসে আসচে বনের দিক থেকে, হৈমন্তী-জ্যোৎস্নাস্নাত এই বনান্তস্থলী স্বপ্ন-পুরীর মত মায়া বিস্তার করেচে ওই বৃদ্ধ রামলালের মনে, অনসূয়া বাঈয়ের মনে, সাবিত্রীর মনে...

কিন্তু আমার এ বিলাস কেন? ওরা বড়লোক, ওদের সব সাজে, সব মানাবে। আমি এখানে প'ড়ে থাকবো, ওদের মায়ায়, ভরহেচ্ নগরের নাগরিকের অধিকার নিয়ে—তাতে কি আমার পেট ভরবে?

বাড়ীতে আমার আত্মীয়স্বজন আছে, আমায় বিয়ে-থাওয়া ক'রে সংসার করতে হবে... মেয়ের বিয়ে, ছেলের পৈতে, ছেলের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা, সবই করতে হবে আমাকে। এখানে দুটি বেলা শুধু উদর পূরণের জন্য প'ড়ে আছি, বেতনের দাবী করবো কোন্ মুখে। কোনো কাজই এখানে করি না, কেবল সাবিত্রীকে একটু-আধটু পড়ানো ছাড়া। তার বদলে তো এরা রাজভোগ দু'বেলা জোগাচে।

যেতাম হয়তো একদিন।

কিন্তু বড় জড়িয়ে পড়েচি এদের সকলের মায়ায়। বৃদ্ধ রামলাল ব্রাহ্মণ আমার বুড়ো বাবার মত মনে হয়। সেইরকম খামখেয়ালী, সেইরকম স্নেহশীল। সাবিত্রীকে ছোট বোনের মত লাগে। অনসূয়া বাঈ নিতান্ত সরলা মহিলা, তেমনি স্নেহময়ী। মা মারা যাওয়ার পরে এমন স্নেহযত্ন আমি নিজের মামার বাড়ী পাইনি, কাকার বাড়ী পাইনি, কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ী পাইনি। অনাত্মীয়-জগতের নির্মমতার মধ্যে যেতে ইচ্ছে হয় না, আর শুধু সেইজন্যেই যাই-যাই ক'রেও এতদিন যাওয়া হয়নি।

অনেক রাত্রে এসে শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে-সঙ্গে গাঢ় নিদ্রা। এইভাবেই দিন কাটে। আলস্য এসে জোটে, কোনো সঙ্কল্পই দানা বাঁধে না—কাজে পরিণত করা তো দূরের কথা।

রামলাল আমায় বললে—আরে, তোমার একখানা ডেরা করিয়ে দেবো?

দুজনে সকালে বৈঠকখানায় ব'সে কথা হচ্ছিলো।

—কেন ?

—নিজের ঘর না হোলে মন টেকে না।

—আপনাদের ঘর কি আমার ঘর না?

—ও তো একটা কথার কথা হোলো।

—মোটেই কথার কথা নয়, আমি তাই ভাবি।

—সে তো বহুৎ আচ্ছা। তাহোলে একঠো সাদি করিয়ে আনো।

—বাবারে! নিজের চলে না, আবার সাদি।

—তুমি করিয়ে নিয়ে এসো, আমি যতদিন আছি, সব-কুছু করিয়ে দেবো। সে ভাবনা আমার।

—আমাকে এখানে বরাবর রাখতে চান?

বৃদ্ধ রামলাল বিস্ময়ের সুরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—নেই রহিয়ে-গা তো যায়গা কাঁহা? ইস্‌কা মানে ক্যা হ্যায়? তুমি তো আছই এখানে।

—কেন, নিজের দেশে যাবো?

—কাহে যায়গা? জমি আমি করিয়ে দেবো, ঘর-ভি তৈয়ার করিয়ে দেবো। সাদি-উদি করিয়ে, বহুকো ই'হাপর লেকে আওগে।

—সে বেশ মজার কথা।

—যো কুছ্‌ বাত বলবো, তো মজাকা কথা ছোড়্‌-কর দুস্‌রা তরহ বাত মুখ থিকে বাহার নেই হোবে। কেঁৎনা রোজ তুম্‌ হিঁয়াপর হ্যায়?

—দুবছর হবে সামনের ফাগুন মাসে।

—ব্যস্‌। তব তো হইয়ে গেলো। তুমি আমাদের আদমি বন্‌ গেলো। দুবছর যখন এখানে থাকা করিয়েসে, তখন তোমাকে এখানে ঘর বনানে পড়েগা, সাদি-ভি কর্‌নে পড়েগা।

কথা শেষ করেই বৃদ্ধ রামলাল খিল্‌ খিল্‌ শব্দে হেসেই খুন! এও একটি অদ্ভুত পাগল। বাইরের জগতের কোনো সন্ধান রাখে না, নিজের মধ্যেই আত্মসম্পূর্ণ হয়ে বেশ একটি মায়ার নীড় রচনা ক'রে ঊর্ণনাভের মত তার কেন্দ্রে ব'সে আছে। কি চমৎকার, কি সুন্দর জালটি বুনেচে। নাঃ, বড় ভালো এরা।

সে ফাগুন মাসও কেটে গেল। সেই জনহীন মালভূমির বনে বনে পলাশের ফুল আগুনের বন্যা নিয়ে এলো, মহুয়া ফুল নিয়ে এলো মাতাল-মধুর বন্যা। কুরচি আর করন্ধা নিয়ে এলো সুগন্ধের বন্যা। অথচ কেউ দেখলো না সেই অপরূপ ঋতু-উৎসব, কোনো দিকে তার খবর গেল না—খানিকটা দেখলে বুড়ো রামলাল, আওড়ায় রামচরিত-মানস থেকে—

শোভিত দণ্ডক কি রুচি বনী—

আর, অবিশ্যি খানিকটা দেখলুম আমি।

কিন্তু সেই বসন্তে যেমন প্রাণ চঞ্চল হল, মনও উতলা হল আমার। চ'লে যেতে হবে এখান থেকে আমাকে। আমি বুড়ো রামলাল নই, অনসূয়া বাঈয়ের মত বড়লোকের বৌ নই—আমার ভবিষ্যৎ আছে, এখানে যতই ভালো লাগুক, আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে এখানে থাকলে।

অনসূয়া বাঈ আমাকে ব'লে পাঠালে, তার সঙ্গে মোটরে রাঁচিতে যেতে হবে। এর আগেও দু'একবার হাজারিবাগে গিয়েচি। যেবার সঙ্গে টাকাকড়ি বেশি থাকে, সেবার আমাকে নেয়।

এবার ঠিক করলাম, রাঁচি গিয়ে পালাবো।

তারপর কি কাণ্ডটাই হল। রাঁচি বড় পোস্টঅফিসের সামনে আমি গা-ঢাকা দিলাম। অনসূয়া বাঈ তার দেওরের গদিতে গিয়েচে কি কাজে—মোটর ওখানেই ছিল। ফিরে এসে দেখলে, আমাকে ওর চাকর ও ড্রাইভার খোঁজাখুঁজি করচে। ও ধরে নিলে, আমি গেঁয়ো-লোক শহরে এসে হারিয়ে গিয়েচি। গদিতে গিয়ে জানিয়ে তোলপাড় করলে—টাকাপয়সা, পুলিস ও লোকজনের সাহায্যে রাঁচি শহর। মা যেমন হারানো সন্তানকে খোঁজে, তেমনি

ক'রে অনসূয়া বাঈ খুঁজলে তাদের অর্থবল ও লোকবল দিয়ে আমাকে। খুঁজে বারও করলে রাঁচি-চক্রধরপুর-সার্ভিসের বাস্ থেকে। এর কৈফিয়ৎ দিতে হল নানা রকমে বানিয়ে। ঘটনার দুতিন সপ্তাহ পর পর্যন্ত এ নিয়ে অনসূয়ার কত কথা আমার সঙ্গে। অনসূয়া বলতো—রাস্তা চিনতে পারলে না?

—না।

—তখন কি করলে? আমাদের গদির ঠিকানা মনে এলো না?

—নাঃ।

—আহা, তখন তোমার মনে কি হল! আমি জানতুম না তুমি ওরকম। আর কখনো তোমাকে রাঁচি নিয়ে আসবো না।

—তাই তো!

—মোটরবাসে উঠেছিলে কেন?

—ভাবলাম, ভরহেচ্ নগরে যাই। ভুল হয়ে গেল সেখানেও।

অনসূয়া বাঈ ও ওরা এই ঘটনার পরে যেন আমাকে বেশি ক'রে জড়িয়ে ধরলে। আমিও ওদের আঁকড়ে ধরলাম। এত যখন ওদের স্নেহ, তখন আর কোথাও ওদের ছেড়ে যাবো না। যা ঘটে ঘটুক ভবিষ্যতে, রইলাম এখানেই।

বৈশাখ মাসের শেষ। ভীষণ গরমের পর এক-পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে কুরচিফুলের সুবাস ভেসে আসচে বন থেকে।

রামলাল আমায় ডাকিয়ে বললে—পেট-মে থোড়া দরদ উঠা হ্যায়, দেখো তো ই-ধার আ-কর—

রামলালের মুখ-চোখের অবস্থা যেন কেমন-কেমন। রাত্রে কিছু খেতে বারণ করলাম। বুড়ো বয়সের অসুখ—ক্রমেই পেটের ব্যথার বৃদ্ধি...তার সঙ্গে জ্বর।

সে রাত্রে বুড়ো আমায় বললে—বেটা, তুমি এখানে রইলে। সব ভার তোমার ওপর। এ-জায়গাটাতে লোক বসাবে। বড় সুন্দর জায়গা এটা। তোমরা ছেড়ো না।

—আপনি মনে ভয় খাচ্চেন কেন? অসুখ সেরে যাবে। আমি রাঁচি চলে যাচ্চি এখুনি। ডাক্তার আনি—

—ও-সব বাত ছোড়ো। আমার বড় সুখ চৈন সে দিন বীত গিয়া এই বনের মধ্যে! তুলসীজি বলিয়েসেন—শোভিত দণ্ডক কি রুচি বনী—

—আচ্ছা থাক্ ও-সব কথা। এখন আমাকে ডাক্তার আনতে যেতে হবে।

শেষরাত্রে রামলাল শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর দু ঘণ্টা আগে, নয়তো ও ঠিক ভরহেচ্ নগরের কথা বলতো।

এর পরের কথা খুব সংক্ষিপ্ত। অনসূয়ার স্বামী এসে এদের নিয়ে গেল। অত-বড় বাড়ীতে চাকর-বাকর ছাড়া কেউ রইলো না। আমি ছিলাম, বৃদ্ধ রামলালের মৃত্যুর সময়ের ছবি মনে ক'রে। অনসূয়া বাঈ আমাকে থাকতে বলেছিল। থাকতাম হয়তো, দুমাস পরে ভরহেচ্ নগর বিক্রি হয়ে গেল ওদের ফার্মের দেনার দায়ে। বন আবার নগরীকে গ্রাস করেচে।

আবির্ভাব

দুলালের বাড়ীর পেছনে একটা বড় বাঁশবাগান। তার পেছনে ক্রোশখানেক ডাঙা মাঠ। এই মাঠে বহুকাল থেকে চাষবাস হয় না, নীলকুঠীর আমল চলে যাওয়ার পর থেকে এই সব মাঠ অনাবাদি পড়ে আছে—এই মাঠের পর ভাবনহাটি নামে একটি ক্ষুদ্র চাষা-গাঁ।

দুলাল কলকাতায় থাকে, ভবানীপুরে তাদের নিজেদের বাড়ী। কিন্তু আজ ক'মাস কি যেন একটা হয়েচে, বাড়ীর সবাই এসে আছে দেশের বাড়ীতে।

বেশ লাগছে সবারই। এমন সময় নামলো ভীষণ বর্ষা। দিনরাত একঘেয়ে বৃষ্টি হচ্চে সমানে। মাঠে ঘাটে থৈ-থৈ করচে বর্ষার জল। তোড়ে জলস্রোত নেমে চলেচে নামাল জমি

বেয়ে মাঠের দিকে। পূবে হাওয়ায় শীত করচে সবারই, ছেঁড়া ভিজে কাপড় গায়ে দিয়ে চাষা মজুর ক্ষেতে ধান পুঁতচে।

অমনি দুলালের জ্যাঠাইমা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

—বাবা গো, না খেয়ে মনু কলকাতায়, না কয়লা, না কিছু। সেও ছিল ভালো। এখানে আমার মাছ দুধে দরকার নেই, ঢের হয়েচে। ইদিকে যাই জোঁক উদিকে যাই মশা, সাপ, কাদা। একটু বেড়াবার জায়গা নেই, দুটো লোকের মুখ দেখবার জো নেই। সিনেমা দেখিনি আজ চার মাস। না একটা সিনেমা, না কিছু। এমন পোড়ারমুখো দেশে মানুষ থাকে!

জ্যাঠতুতো বোন কমলা বলে—সত্যি মা, কত ভালো ভালো ছবি যে হয়ে গেল কলকাতায়। 'ওরে যাত্রী' 'বঞ্চিতা' 'সর্বহারা'—চমৎকার চমৎকার ছবি।

তার ছোট বোন নমিতা বললে—কেন, 'উমার প্রেম'?

—'উমার প্রেম' তো আগেকার। আমি আনকোরা ছবির কথা বলচি—

—তা যদি বলতে হয় দিদি, তবে মীরা সরকার আর আরতি দাস যে ছবিতে নামে, সে ছবির চেহারাই হল আলাদা—

—আর জহর গাঙ্গুলী?

—সে তো আছেই। আর একজনের কথা বলি। 'দুঃখীর ইমান' ছবির মধ্যে—

দুলালের জ্যাঠাইমা বললেন—বাদ দে ও সব তক্কো। যা এখান থেকে! ওদিকে সুড়সুড় করা হয় এখানে আসবার জন্যে, আবার এদিকে ছবি হয়ে গেল, ছবি হয়ে গেল। হয়ে গেল তা কি হবে? চল্ সব কলকাতায়। এখানে বর্ষাকালে মানুষ টেকে!

দুলাল কিন্তু বলে উঠলো—জ্যাঠিমা, তোমার ভালো লাগচে না কেন জানিনে। আমার কিন্তু যাবার ইচ্ছে নেই।

জ্যাঠাইমা অপ্রসন্ন মুখে বললেন—কি জানি বাপু, তোমাদের সব ইংরেজী মেজাজ। আমরা সেকেলে লোক, আমাদের পক্ষে শহরই ভালো। তোমরা থাকো তোমাদের দেশ নিয়ে।

কমলা বললে—দুলালদা, আমাকেও রেখে এসো।

—সবসুদ্ধু চলো রবিবারে ঝেড়ে রেখে আসি।

নমিতা বললে—আমাকেও? বাবা শুনলে বকবেন। তা আমার মন খারাপ হবে না? কিন্তু যাবার ইচ্ছে নেই।

দুলাল বললে—চলো রেখে আসবো বলচি তো।

কিন্তু জ্যাঠতুতো ভাই বিমল ছিল তার মা-ভগ্নীদের চেয়ে একেবারে আলাদা। সে বিকেলে জলবৃষ্টির মুষলধারার বর্ষণের মধ্যে এসে বললে—চলো দুলালদা—

—কোথায়?

—মাছ ধরতে।

—তুই যাবি নাকি।

—আলবৎ যাবো। চলো বেরিয়ে পড়ি, ভাবনহাটির পদ্মবিলে মাছ উঠচে।

—বিলে তো মাছ থাকেই—

—বেনে জলে এইমাত্র ছুটলো। হাতে রয়েছে—কি যে বলে ঐ—ঐ—

—পোলো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পোলো পোলো। ওই কথাটা ওরাও বলছিল বটে। পোলো।

—ও দিয়ে মাছ ধরা তোমার-আমার সাধ্যি নেই।

দুলাল ও বিমল ছুটলো। ওরা কলকাতার ছেলে। মাছ ধরা দেখা একটা নতুন জিনিস ওদের কাছে।

তখনও ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি পড়ছে। ধারা-শ্রাবণ। বৃষ্টির বিরাম বিশ্রাম নেই।

বিমল বললে—রাস্তা চেনো দুলালদা?

—ঠিক নিয়ে যাবো, চলো।

—বেশি জঙ্গলের দিকে নিয়ে যেও না দুলালদা, সাপ আছে।

কিন্তু জঙ্গলের দিকেই ওদের যেতে হল। তারপর ফাঁকা জমি ও ষাঁড়াবেঁচির ঝোপ। অনেক দূরে বিল দেখা যাচ্ছে। ফাঁকা মাঠ বর্ষার দরুন অনেক জল বেধেছিল। বড় বড় ঘাস মাঠের মধ্যে। জলে জলাকার চারিদিক। বিমল খানিকদূর মাঠ দিয়ে যেতেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—সাপ! সাপ!

তারপর লাফিয়ে উঠলো মাটি থেকে হাত-দুই। সে কি বেজায় লাফ রে বাবা!

দুলাল বললে—কি? কি? কোথায় সাপ?

—আবার সাপ—সর্বনাশ! ও মা, ও বাবা, মেরে ফেললে—কিলবিল্ করচে সাপ!

—দেখি—এত সাপ কোত্থেকে আসবে—দেখি—

দুলাল পল্লীগ্রামে অনেকবার এসেচে, এত সাপের ভিড় ফাঁকা মাঠে, বিশ্বাস তো হয় না। মাথা নীচু করে জলের মধ্যে চেয়ে দেখেই দুলালের সারা গা যেন কেমন করে উঠলো, ওগুলো কি রে বাবা! অত সাপ? ঘাসের মধ্যে দুলাল ভালো দেখতেই পাচ্ছিল না।

বিমল ততক্ষণ দৌড়ে গিয়ে আর এক জায়গায় দাঁড়িয়েছে মাঠের মধ্যে।

দু সেকেন্ড দাঁড়াবার পরে সেখান থেকেও লাফিয়ে উঠলো। চেঁচিয়ে উঠলো—সাপ! সাপ! আমায় কামড়ে দিয়েছে—দুলালদা রে, মেরে ফেলেচে আমাকে—

দুলালের সন্দেহ হল। ভয় চলে গিয়েচে ততক্ষণে, তারও পায়ে কামড়েচে, পায়ের তলা দিয়ে তখনও চলে যাচ্চে। এত সাপ কোথা থেকে আসবে?

চেয়ে দেখলে ঘাসের মধ্যে ঘাড় নিচু করে। জলের মধ্যে ভাল দেখা যায় না। ঘোলা জল অনেক জায়গায়। একস্থানে দূর্বাঘাসের বনের ওপর অগভীর চওড়া স্থানে জল বেধেছে। সেখানে পৌঁছে চেয়ে দেখে দুলাল অবাক হয়ে গেল।

চোখকে বিশ্বাস করা যায় না।

মুখ তুলে বললে—বিমল, বিমল, দৌড়ো—শীগ্গির দ্যাখ এসে—

বিমল সাপের ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার বিশ্বাস হয়েছিল, তাকে একটা নয় অসংখ্য সাপে কামড়েচে। সে আর নেই। সে পঞ্চভূতে মিশে যাওয়ার প্রথম ধাপে।

দুলাল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে—শীগ্গির আয় হতভাগা—

দুজন ঘাড় নিচু করে ঘাসের মধ্যে দেখতে লাগলো—জল সেখানে অগভীর, কিন্তু দশ বিশ গণ্ডা বড় বড় কৈ মাছ সারবন্দী ভাবে সেই জল পার হয়ে চলেচে উত্তরমুখো। তার পাশে আর এক জায়গায় তেমনি দশ বিশ গণ্ডা।

দুলাল হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে, বিমল যেখানটিতে দাঁড়িয়ে সর্পদষ্ট হয়েছিল, সেখানে পৌঁছে জলের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে বললে—উঃ রে মাছের ঝাঁক! কত মাছ রে! দু পাঁচ শো!

বিমলও এসে দেখলে। দেখবে কি, পাগলের মত হয়ে উঠলো দুজনে।

এ কি মাছের বিপর্যয় ভিড়! এত লম্বা, এত ঘন মাছের ঝাঁক যে পৃথিবীতে থাকে, মেছোবাজারের বাইরে যে এত মাছ জীবন্ত অবস্থায় চলে বেড়ায়—এসব কথা কে জানতো?

মাছ! মাছ! যেদিকে চাওয়া যায়, শুধু কই মাছ। কার মুখ দেখে আজ ওরা সকালে বিছানা ছেড়ে উঠেছিল!

দুলাল বললে—এত মাছ ধরবার কি করা যাবে তাই ভাবো—

—আমার জামাটা খুলে ফেলি। তাই দিয়ে ছেঁকে মাছ ধরো—

যে কথা সেই কাজ।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দুই অনভিজ্ঞ শহুরে বালক বুঝতে পারলে এ রকম উপায়ে মাছ ধরা চলবে না। এত মাছ রাখবার স্থান নেই, ছোট জামায় ছেঁকে এ বিরাট মৎস্যবাহিনীর কতটুকু ভগ্নাংশ কাপড়ে বাঁধবে?

দুলালই প্রথমে সে কথা বুঝল।

বুঝে বললে—আয় গাঁয়ের মধ্যে খবর দিই মাছের ঝাঁকের। গাঁয়ের কত গরীব লোক মাছ খেতে পাবে এখন। আমরা যা মাছ ধরেচি ওই তো নিয়ে যেতে পারব না। বরং এগুলো পৌঁছে দিয়ে বাড়ী থেকে আলাদা পাত্র নিয়ে আসি—

দু'জনে কুড়ি দুই মাছ কাপড়ে বেঁধে নিয়ে ছুটলো বাড়ীর দিকে।

বিমল বললে—গরীব দুখীদের বাড়ী বাড়ী খবর দাও দুলালদা—চার টাকা মাছের সের—প্রাণপুরে মাছ থাক্—ওদের কিনে খাবার সাধ্য নেই।

ওরাও বড় ভাঁড় নিয়ে বাড়ীর মজুর কৃষাণের সঙ্গে এসে পড়লো মাঠে। এত-ক্ষণে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে সারা মাঠটা। শুধু হাত দিয়ে চেপে ধরে কৈ মাছ ধরচে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। যত বা ধরে, তত বা আবার ওঠে। অফুরন্ত কৈ মাছ উঠচে বিলের জল থেকে।

বুড়ো হৃষিকেশ বুনো বলে—ষাট বছর বয়েস হল, এমন তাজ্জবকাণ্ড কখনো দেখিনি বাবু—উজোন জলে কৈ মাছ হাঁটে শুনতাম—আজ চক্ষি দ্যাখলাম—

গাঁয়ের লোক মুচি, ডোম, বাগ্দী, জেলে, ব্রাহ্মণ, কুমোর কেউ বাকি ছিল না। কেউ এক কলসী, কেউ এক ঝুড়ি, কেউ দুকলসী, কেউ এক থলে, কেউ এক ছোট ভাঁড়—যে যা এনেচে তা ভর্তি করে মাছ নিয়ে গেল বাড়ীতে।

কেউ রেখে আবার নতুন ভাঁড় বা কলসী হাতে ছুটে ফিরে এল।

দামোদর সা বললে—ধরচো মাছ, ভাই সব, আড়াই টাকা তেলের সের সে কথা মনে রেখো। না খাও তো নষ্ট করো না—মাছ ছেড়ে দিয়ে যাও জলে—

কে একজন বললে—না খাই তো বিলিয়ে দেবো—বন্ধু-কুটুম্ব আছে, একি ছেড়ে দিয়ে যেতে আছে ভায়া?

বুদ্ধিমান মধু ঘোষ বললে—কই মাছ জ্যান্ত কতদিন থাকে জল দিয়ে জীইয়ে রাখলে জানো? দুমাস। যত ইচ্ছে ধরো, তবে বাড়ী নিয়ে গিয়ে যত্ন করে রেখো, মরে না যায়।

দুলাল বললে—বল্ দিকি বিমল, একে মাছের 'কি' বলবি—এই আক্রা চড়া মাছের বাজারের দিনে?

বিমল বললে—কি? 'প্রাচুর্য'?

—না।

—তবে 'প্রাদুর্ভাব'?

—না, 'আবির্ভাব'। দেবতার আবির্ভাবের মতই আনএক্স্পেক্টেড কিনা!

বে-নিয়ম

রাম চাটুয্যের স্ত্রী খুব বিপদে প'ড়েই প্রতুলকে খবর দিলেন। রাম চাটুয্যে প[illegible]রে লোক ছিল সবাই জানে। প্রতুলের যখন আঠারো উনিশ বছর বয়েস তখন এ সংসারে সে এসে-ছিলো রাম চাটুয্যের বাসের কন্ডাক্টর হিসাবে। দু'বছর পরে কি কারণে তার জবাব হয়ে যায়। সে আজ পাঁচ-ছ' বছর আগের কথা।

আজ তিন বছর রাম চাটুয্যে নিমোনিয়া রোগে মারা গিয়েছেন। দু'খানা বাস চলছিলো চাকদা থেকে রাণাঘাট হয়ে শান্তিপুর। মাসে হাজার খানেক টাকা আয় ছিলো দু'খানা বাসে। রাম চাটুয্যের মৃত্যুর পর তা এসে দাঁড়ালো দু'শো টাকায়। একখানা বাসের এঞ্জিনে নাকি কি গোলমাল হয়েছে—হাজার টাকার দরকার তা সারাতে। বর্তমানে দু'খানা বাসই বন্ধ।

সময় পেয়ে নানা আত্মীয়বন্ধু এসে জুটেছে। তারা সবাই হিতাকাঙ্ক্ষী। নানারকম সৎ-পরামর্শের চাপে রাম চাটুয্যের স্ত্রীর রাত্রে ঘুম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। প্রত্যেকে কিছু না কিছু বাগিয়ে নেবার চেষ্টায় আছে। ইতিমধ্যে বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে, হাতের টাকাও অর্ধেকের ওপর গিয়েছে। কেউ মেয়ের বিয়ের জন্যে একমাসের কড়ারে টাকা নিয়ে বেমালুম গা-ঢাকা দিয়েছে। কেউ ব্যবসার জন্যে টাকা নিয়ে আজও গিয়েছে কালও গিয়েছে, আর দু'টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা যে কতো গিয়েছে তার লেখাজোখা নেই। ওবেলা দিয়ে যাবো, কাল বিকেলে দিয়ে যাবো ভাই—এই ধরণের সব কড়ার। আপনা-আপনির মধ্যে, না দিয়েও পারা যায় না। রাম চাটুয্যের স্ত্রী এখন অনেক কিছু বুঝতে পেরেছেন, খুব আত্মীয়-স্বজনের মিষ্টি কথাও আর বিশ্বাস করেন না। তাঁর জ্যাঠতুতো বোনের স্বামী

একদিন এসে ধরে পড়লো—দিদি, নশো টাকা না দিলে নয়। হুণ্ডির ওয়াদা মেটাতে হবে কাল সকালে। বুধবারে নিজে এসে কিংবা হরিমতীকে আর বৃন্দাবনকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। তুমি ছাড়া আর কার কাছে যাবো বলো? এমন গঙ্গাজলে ধোয়া মন আর কার আছে?

রাম চাটুয্যের স্ত্রী টাকা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে ভগ্নীপতির দেখা আর কোনদিন পান নি তারপরে। আবশ্যি টাকাও পান নি।

সেদিন রাম চাটুয্যের নাবালক পুত্র হারাধন এসে মাকে বললে—মা, হাটে বেগুন সস্তা হয়েছে, কাল শুনেছি। আজ থেকে আর বেগুনের বাজরা বাসে যাবে না।

—কেন?

হরিপদ প্রত্যেক বাজরা পিছু চার আনা ক'রে জলপানি নেয়, ওরা আমাদের বাসে না গিয়ে লাহিড়ী কোম্পানীর বাসে যাচ্ছে।

—তুই হরিপদকে বললি কিছু?

—আমার কথা শোনে না। তুমি ডেকে বরং বলো।

এই হরিপদই এক হাজার টাকা চেয়ে রেখেছে বাসের এঞ্জিন সারাবার দোহাই দিয়ে। রাম চাটুয্যের স্ত্রী অনেক ভেবে দেখলেন। বাসের ব্যবসা যদি চালাতে হয়, তবে এসব লোক দিয়ে হবে না। হরিপদ সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁর কানে গিয়েছে। পুলিশকে দিতে হবে ব'লে দু'দুবার সে মোটা টাকা নিয়েছে, কিন্তু পুলিশকে দেয় নি। যদিও দিয়ে থাকে খুব কম, নিজে মেরে দিয়েছে টাকাটা। বিশেষ করে আজকাল যেন হরিপদ কি রকম হয়েছে। কেবলই আজ পাঁচ টাকা লাগবে, কাল আশি টাকা লাগবে, বাসের ভাড়ার টাকা ঠিকমতো আদায় দেয় না।—হিসাব চাইলেই চ'টে যায়। অর্থাৎ ব্যাপার এই, ও বুঝেছে ওকে ছাড়া আর চলবে না, বাসের কাজ আর কেউ জানে না, রাম চাটুয্যের স্ত্রীকে যদি বাসের ব্যবসা বজায় রাখতে হয়, তবে হরিপদ ভিন্ন কাজ চলবে না। কাজেই হরিপদর মেজাজ চড়বারই কথা।

হরিপদকে ডেকে বেগুনের বাজরার জলপানির কথা বলতেই সে চ'টে গেল। দু'এক কথার শেষে সে বললে—অনেক কিছু ঝুঁকি ঘাড়ে ক'রে নিয়ে লাইন বজায় রেখেছিলাম, কিন্তু আপনাদের অলক্ষ্মীতে ধরেছে বুঝতে পেরেছি। এ লাইন যাতে পাল কোম্পানী কিংবা লাহিড়ী কোম্পানী পায়, সে চেষ্টা আমি করবো। দেখি আপনাদের কতো ইয়ে হয়েছে।

হরিপদ চ'টে বেরিয়ে গেল। সেই থেকে বাস বন্ধ। সেই থেকে নগদ টাকা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই থেকে সংসারের অবনতির সূত্রপাত। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে আর কতদিন থাকে?

দুপুরবেলা বারাসাত থেকে প্রতুল এলো। রাম চাটুয্যের স্ত্রীকে প্রণাম ক'রে বললে—খুড়ীমা, ভালো আছেন? হারাধন ভালো আছে?

রাম চাটুয্যের স্ত্রী বললেন—এসো, এসো বাবা। ভালো আছো? বেঁচে থাকো বাবা।

—বাসের কাজ কেমন চলছে?

—সে সব অনেক কথা। বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হরিপদ রাগ ক'রে চলে গিয়েছে। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম এই জন্যেই। খাওয়া-দাওয়া করো, সব কথা বলছি।

প্রতুলকে ভাত দিলেন টক ডাল ও কাঁচকলা ভাজা দিয়ে। অসময়ে আর কিছু ছিল না ঘরে। খেয়ে দেয়ে উঠে প্রতুল বিশ্রাম করলে। তারপর উত্তরের বারান্দায় ব'সে রাম চাটুয্যের স্ত্রীর মুখে হরিপদর কীর্তিকলাপ সব শুনলে।

হারাধন এসে বললে—প্রতুলদা, আমাদের এখানে থাকবে তো?

—তাই তো ভাবছি।

—তোমাকে ছাড়ছি নে।

—বেশ, কাকীমা বললে কি না থেকে পারি?

—মা সেজন্যেই তো তোমায় আনলে। তুমি ছাড়া আর চলবে না। হরিপদ তো আমার কথা একেবারেই শোনে না, মার কথাও শোনে না, যা ইচ্ছে তাই করতো আজকাল। আমাকে

বললে দশটা টাকা দাও, চামড়ার ব্যাগটা সারাতে হবে। দিলাম। এখন দেখি যেমন ব্যাগ তেমনি আছে, গেল টাকাটা। জান্‌কি মুচি বললে, কই আমার কাছে তো কেউ ব্যাগ সারাতে যায় নি। আমি দশ টাকা সারাবার জন্যে নেবো, তা বলিও নি।

প্রতুল বললে—ঠিক ঠিক। দাঁড়াও, দেখি। কাকীমার মুখে সব শুনি, কি বলেন। আমার পোষাবে তবে তো থাকবো? বারাসতে আমি ব'সে ব'সে শুধু টাইম-কীপারী করি, আট ঘণ্টা কাজ, মধ্যে এক ঘণ্টা টিফিন, পঞ্চাশ টাকা মাইনে। তোমার মা কী দেবেন আগে বুঝি।

বোঝাবুঝি সেদিনই হয়ে গেল। প্রতুল কাজে লাগলো পরের দিন থেকে। হারাধন নির্বিঘ্নে স্কুলে পড়তে লাগলো! ওর মায়ের মনের উদ্বেগ ও সন্দেহ সামান্য কিছু কমলেও একেবারে কমলো না, স্বামীর মৃত্যুর পর জগৎটাকে তিনি যে চোখে দেখতে পেয়েছেন তাতে কমবার কথাও নয়।

প্রতুল গ্যারেজ থেকে বাস বার করতে গিয়েছে সকালে, পাশের পানের দোকানী বলরাম বললে, কি, প্রতুলবাবু যে! এলে কবে?

—এই যে—ভালো? কাল এসেছি।

—বাস বেরুবে নাকি? হরিপদর জায়গায় তুমি বুঝি এলে?

—হ্যাঁ। হরিপদও আসবে। সে এ লাইনে সাত আট বছর কাজ করেছে, সে না এলে চলে?

দিন তিনেকের মধ্যে বাজারের রামদুলাল স্বর্ণকার, বোস কোম্পানী ঘড়িওয়ালা, টুনু চক্কত্তি চায়ের দোকানী, কপিল আলুওয়ালা—মানে বাজারের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা দেখে অবাক হয়ে গেল রাম চাটুয্যের বাস সার্ভিস আবার চালু হয়েছে এতদিন পরে, বেশ দু'পয়সা আসছেও নিশ্চয়।

প্রতুলের চিঠি পেয়ে হরিপদ এলো। বললে—আমার তো কোনো অনিচ্ছা নেই, তবে হারাধনের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা আমি শুনতে রাজী নই। আমি চাটুয্যে-মহাশয়ের পুরনো লোক, আমার সঙ্গে সেই রকম কথা বলো, আমি সব করতে রাজী। তা বলে—

প্রতুল বললে—হরিপদদা, হারাধন ছেলেমানুষ। তুমি আমি যা করবো তাই হবে। কথায় চট্‌তে আছে—ছিঃ!

দিন সাতেকের পরে একদিন ক্যাশ বুঝিয়ে দিতে গিয়ে হরিপদ বললে একটু নীচু সুরে—সাতানব্বই টাকা তেরো আনা ক্যাশ। আমার কতো, তোমার কতো?

—মানে?

হরিপদ চোখ টিপে বললে—মানে তুমিও জানো, আমিও জানি। তুমি কি আর এখানে পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে খাটতে এসেছ, না আমি খাটতে এসেছি। যা হবে সে তো তুমিও—

—না দাদা, নাবালকের সম্পত্তি। আমি এসেছি ওরা ডেকেছে বলে। ওদের জিনিস বজায় রাখতে হবে, তবে তোমারও দু'পয়সা।

—সে পয়সাটা আসছে কোথা থেকে?

—কমিশন থেকে। আমি গিন্নিমার সঙ্গে কথা বলবো এ নিয়ে। আগে সাত পার্সেণ্ট পাওয়া যেতো কর্তার আমলে। এখন তুমি যা বলো।

—আরে তুমি ও বুঝবে না। নিজের হাতে কলমকাটি, আবার পরের খোশামোদ করতে যাবে কেন? কমিশন টমিশন, পার্সেণ্টেজ ফার্সেণ্টেজের কে ধার ধারছে? যা করবো তুমি আর আমি। গিন্নিমা আবার এর মধ্যে আসছেন কোথা থেকে?

হরিপদর এ অদ্বৈতবাদ প্রতুল বুঝতে পারলে না। কি জানি কেন গিন্নিমার অসহায় কান্না ওর অন্তর স্পর্শ করেছিল। নইলে সে বোকা নয়, দুজনে মিলে লুটেপুটে খেলে যে কমিশনের চেয়ে বেশি পয়সা হয় তা সে জানে। প্রতুল ক্রমে ক্রমে হরিপদর মনের ভাব বদলে দেবার চেষ্টা করলে। কিছু টাকা রোজ দিতে লাগলো রাম চাটুয্যের স্ত্রীর হাতে। অনেকদিন টাকার মুখ দেখতে পান নি তিনি।

একদিন প্রতুল বললে হরিপদকে—আচ্ছা, দাদা, চাকদা-বনগাঁ রুট্ তোমার কেমন মনে

হয়?

—নতুন রুট। কেউ তো এ পর্যন্ত চালায় নি। প্যাসেঞ্জার হবে কি না-হবে—

—করে দেখতে দোষ কি? লাগিয়ে দিই দরখাস্ত, কি বলো? ও রুটে কম্পিটিশন নেই। যে আগে অ্যাপ্লাই করবে তারই হবে।

—দেখতে পারো।

—তুমি অনেক অভিজ্ঞ আমার চেয়ে এ কাজে। তুমি কি বলো?

—নতুন দুখানা বাস কিনতে হবে, টাকা পাবো কোথায়? কম্‌সে কম চল্লিশ হাজার লাগবে।

—ডিস্‌পোজালের চ্যাসিস্‌ কিনে এঞ্জিন কিনে বডি তৈরী করে নিলে সস্তায় পড়বে। ভালো আমেরিকান লরীর ফ্রেম যদি কিনি—তুমি কি বলো?

—মন্দ না। এঞ্জিন দেখেশুনে কিনতে হবে। এ রুটে বড় কম্পিটিশন। বাইশ-চব্বিশখানা বাস চলচে, ভাবো? এ ঠেঙিয়ে বিশেষ উন্নতির কোনো আশা দেখছিনে।

—আচ্ছা বারাকপুর-কাঁচরাপাড়া রুট?

—বহু টাকার খেলা। দুখানা বাসে হবে না। আবার তেমনি কম্পিটিশন। তুমি বরং চাকদা রুটের জন্যে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারো।

—হয় যদি, তবে তোমাকে নতুন রুটে যেতে হবে হরিপদদা। ওটাকে গ'ড়ে তুলতে হলে তুমি ভিন্ন আর কেউ পারবে না। বাঁধা আসরে তো সবাই গাইতে পারে!

প্রতুলকে খুব পরিশ্রম করতে হল নতুন পথের সন্ধানে। ধানবাদে গিয়ে ওরা ডিসপোজাল থেকে আশানুরূপ জিনিস খুঁজে পেলে। নারকেলডাঙগার বসাক মোটর ওয়ার্কস থেকে বডি তৈরি করিয়ে নিয়ে এলো। রুটের লাইসেন্সের জন্যে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি, কারণ ও রুটে কোনো খদ্দের উপস্থিত ছিল না আদৌ। আপত্তি একটুখানি উঠেছিল কাজিপাড়ার ওসমান গনি মিঞার দিক থেকে। ওরা স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জমিদার, ওদের কোন জামাই নাকি বছর দুই পূর্বে লীগ মন্ত্রিত্বের সময় এ রুটের একটা লাইসেন্স পেয়েছিল, কিন্তু বাস চালায় নি, কারণ তখন পেট্রল এবং অন্যান্য মোটরের উপকরণ দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ছিল। প্রতুল নিজে বড় তরফের জমিদার সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে সব মিটিয়ে ফেলল। ঠিক হল, ভবিষ্যতে যদি কখনো ওদের জামাই বাস চালানোর ব্যবসায়ে নামে, তবে এরা যথেষ্ট সাহায্য করবে।

রাম চাটুয্যের স্ত্রী গহনা বন্ধক রেখে কিছু টাকা যোগাড় করলেন, শেষ পর্যন্ত বসতবাড়ী বাঁধা পড়লো কুণ্ডুদের কাছে। পাশের বাড়ীর অনেকে এসে নানা রকম কথা বলতে লাগলো। এ ভাবে একেবারে সর্বস্বান্ত হওয়া কি উচিত হল পরের কথা শুনে? হলই বা বিশ্বাসী পুরনো লোক।

কানাই দত্ত রাম চাটুয্যের পুরনো বন্ধু। তিনি স্থানীয় সম্ভ্রান্ত দোকানদার ও প্রবীণ ব্যক্তি। সেদিন এসে বললেন—ও বৌদিদি, শুনলাম নাকি প্রতুল ছোঁড়াটার হাতে অনেক টাকা তুলে দিচ্ছো? ব্যাপারটা কি?

—এসো বোসো ঠাকুরপো। তোমরা তো আর দেখলে না। ওই ছোঁড়াটা দেখতে এসেছে ব'লেই আজ না-হয় তোমরা সৎ-পরামর্শ দিতে এসেছো।

—একশোবার গালাগাল দেও, মারো বৌদিদি। ঠিক কথা। তবে আমার কথা যদি বলো, হাঁপানিতে আমার হাড়সার করেছে বৌদিদি। বড় ছেলেটা দোকান দেখাশুনো করে। গোবরা, ছোটটা, মাল গস্ত করে বড়বাজারে। আসবার দেখবার ইচ্ছা থাকলেও পেরে উঠিনে।

—কি বলছিলে?

—বলছিলাম, দেনা মহাজন মর্টগেজ—এ সব কি শুনছি? রামদাদার আমলে কখনো এ কেউ শোনে নি। কেন পরের হাতে নাচছো? দেনা ক'রে কেউ কখনো ব্যবসা করে, তাও পরের হাতে?...হারাধনকে নিয়ে পথে পথে বেড়াতে হবে শেষে। আমরা ঘুঘু ব্যবসাদার, আমার কথা শোনো।

সন্ধ্যাবেলা প্রতুল এসে বললে—টাকার কদ্দুর খুড়ীমা?

রাম চাটুয্যের স্ত্রী বললেন—টাকার যোগাড় তো হয়েছে। কিন্তু সকলে যে বড় ভয় দেখাচ্ছে প্রতুল।

—তোনো ভয় নেই খুড়ীমা, আপনি টাকা দিয়ে দিন আমার হাতে। দেখুন দুটো মাসে আমি কি করি।

—বেশ দ্যাখো। আমি কারো কথা শুনলাম না। তুমি যা হয় কোরো। তবে তুমি কিছু মনে কোরো না, আমার ছেলে এ কাজ করতে গেলেও তাকে আমি ঠিক এমনি কথাই বলতাম। যাও, মা মনসার পুজো দেবো ভবানীচকের বাজারে। মুখ তুলে চান যদি।

—একটা ভালো দিন দেখে সত্যনারায়ণের পুজো দিন খুড়ীমা। সেদিন থেকে কাজ আরম্ভ করবো। দত্ত বুড়োকে নেমন্তন্ন করবেন।

সত্যনারায়ণের সিন্নিতে গ্রামসুদ্ধ লোকে রাম চাটুয্যের বাড়ী দুখানা লুচি, নানা রকম কাটা ফল, কাঁচা সিন্নি, সন্দেশ ও রসগোল্লা খেয়ে গেল। কেউ বললে, গিন্নীর মন খুব ভালো। কেউ বললে, পরের হাতে খেলছে, এইবার পথে বসবে আর কি।

নতুন বাসের লাইন খুললো।

প্রতুল নিজে বাসে চ'ড়ে চাকদা থেকে বনগাঁ পর্যন্ত গেল। মুখে ভেঁপু দিয়ে একটি ছোকরা চীৎকার করতে করতে চলল—নতুন লাইন খুলেচে! চাকদা থেকে বনগাঁ! ভাড়া দশ আনা বেলের বাজার! এক টাকা বনগাঁ! দু'খানা বাস সারাদিনে যাবে! দুবেলা ছাড়বে! চাকদা থেকে কলকাতার ট্রেন ধরিয়ে দেওয়া হবে! তরকারির ভেণ্ডারদের অত্যন্ত সুবিধে ক'রে দেওয়া হচ্ছে—!

মাত্র সাতজন হল প্রথম দিন। সপ্তাহের শেষে উঠলো বাইশ জন।

হরিপদ বললে—অতগুলো টাকা শেষে জলাঞ্জলি না যায়। একজন ভেণ্ডারও তো হল না।

প্রতুল বললে—হরিপদদা, বেলের হাটের দিন আমরা আর বনগাঁ পর্যন্ত যাবো না। শুধু তরকারির বাজরা তুলবো—এদিকে চাকদা, ওদিকে রাণাঘাট।

—রাণাঘাট গেলে পুলিশ ধরবে, ও রুটের লাইসেন্স তোমার কই?

—সে তুমি ভেবো না দাদা। তোমার বাপ-মার আশীর্বাদে চালিয়ে নেবো।

সত্যিই হরিপদ ঠিক বলেছিল। পুলিশ ধরলে, থানায় নিয়ে গেল, প্রতুলের কোনো কথা শুনলে না, কেস্ কোর্টে দেবার জন্যে তৈরি হল। ওদের দুজনকে একরাত্রি থানার হাজতে বাস করতে হল। প্রতুল রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে বললে—বড্ড মশা, হরিপদদা—

—তোমার কথা শুনে এ কি নাকাল আমার! জীবনে কখনো হাজত-বাস করি নি।

—বিনা লাইসেন্সে গাড়ী চালিয়েছি তা হাজত-বাস করতে হবে কেন? আমরা চুরি করি নি তো।

—সে তুমি বোঝো। তুমি এত জানো, এত বোঝো, তাহলে নিশ্চয় এটাও জানো।

—কাল সকালে দেখবো।

—আমাকে ওভারটাইমের মাইনে দিতে হবে হাজত-বাসের জন্যে তা ব'লে দিচ্ছি। তোমাদের গাড়ীতে খাটতে এসেছি ব'লে চোরের মত হাজত-বাস করতে আসি নি, তা ব'লে দিচ্ছি.

—নিও, দেবো। এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাই আগে। মশায় খেয়ে ফেলে দিলে!

—বুদ্ধি তোমার বড্ড সরু কিনা! একশোবার বলি নি?

পরদিন সকালে প্রতুল অনেক কৌশলে পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেয়ে এলো। খরচ বাদে নগদ চল্লিশ টাকা লাভ এই একদিনে।

সেই থেকে প্রতি হাটবারে রাণাঘাট যাতায়াত করে প্রতুল বাস নিয়ে। পুলিশের কলকাঠিতে সবদিক ঠাণ্ডা আছে। ওদের হাজত-বাস আর করতে হয় না।

আর একটা গোলমাল খুব শীগগির বাধলো। সেটা খুব মারাত্মক রকমের গোলমাল।

মাস দুই পরে যখন চল্লিশ জন গড়ে যাত্রী হচ্ছে, মালপত্রও ভালো হচ্ছে—সেই সময় একদিন হরিপদ বললে—প্রতুলদা, এ রাস্তায় বাস চলবে না। লজ্ঝড় রাস্তা, টায়ার কতবার বদলাবে? এঞ্জিন খুব ভালো তাই, আমেরিকার এঞ্জিন, কিন্তু এ ধাক্কা কতদিন সইবে?

বর্ষা প'ড়ে গিয়েছে, একবার দেখে এসো একদিন।

প্রতুল একদিন নিজের চোখে দেখতে গেল। বাবাঃ, এই রাস্তার অবস্থা! ওর চোখ কপালে উঠলো আর কি। কে জানতো বর্ষার সময়ে রাস্তা এমন হবে? এখানে গর্ত, ওখানে এঁকেবেঁকে চালাতে গিয়ে একদিন হরিপদ এক গাছের গায়ে গাড়িসুদ্ধু মারলে তাল। বনেট্ বেঁকে দুমড়ে গেল। কারবুরেটরের ভীষণ ক্ষতি হল। হরিপদর বাঁ হাতখানা জখম হল।

আরও মুশ্‌কিল। বোঝাই গাড়ী, সেদিন ছিল বেলের হাট, পটল ও বেগুনের বাজরা ছিল কুড়িটা। গরুর গাড়ীতে রানাঘাট নিয়ে যাওয়ার খরচ বাইশ টাকা দিতে হল, টিকিট সব ফেরৎ দিতে হল, হরিপদকে মিশন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল। সবসুদ্ধ একশো ন' টাকা লোকসান এদিকে, বনেট্ ও কারবুরেটরের প্রশ্ন বাদ দিয়ে। দু'শো আড়াইশো টাকা সবসুদ্ধ।

রাম চাটুয্যের স্ত্রী সব শুনে বললেন—আমার সময় খারাপ পড়েছে। তোমাদের কোনো দোষ নেই প্রতুল। নইলে হরিপদই বা গাছের গায়ে তাল মারতে যাবে কেন? সে তো পুরনো ড্রাইভার। রাস্তা খারাপ, আগে দেখনি কেন?

—তখন এমন ছিল না সত্যি বলছি খুড়ীমা। বর্ষার আগে বুঝতেই পারিনি।

—কি করবে এখন? ও রাস্তায় আর গাড়ী চালিও না। গাড়ী দু'খানা ভাঙলে একেবারে সর্বস্বান্ত হতে হবে।

—লাইসেন্স নেওয়া রুট বন্ধ করা ঠিক হবে খুড়ীমা? বেশ প্যাসেঞ্জার হ'তে শুরু হয়েছে। এখন যদি ছেড়ে দিই—

—কি করবে তবে?

—আমাকে আরো দু'হাজার টাকা দিতে হবে খুড়ীমা।

—সে কি কথা বাবা?

—হ্যাঁ, আমাকে দিতেই হবে। আমার মতলব শুনুন। ও রাস্তা আমি মোটর কোম্পানীর পক্ষ থেকে তৈরী করে নেবো। দু'হাজার আমরা দেবো, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড আর রোড বোর্ড থেকে কিছু বার করবো। বাস ও-রাস্তাতে চালাবোই।

—তা তো বুঝলাম, টাকা দেবো কোথা থেকে?

—তাও আমি ভেবেছি। অন্য লাইনের বাস মর্টগেজ রাখতে হবে। তাহলে টাকা সবাই দেবে। নয় তো রুট সার্ভিস মর্টগেজ করা যেতে পারে—যতদিন দেনা শোধ না হয়, তাদের নিজের লোক থাকবে আমাদের গাড়ীতে ব'সে। ক্যাশ নেবে নিজের হাতে। তারও লোক আছে—আপনার হুকুম পেলেই আনি।

—যা ভালো বোঝো করো বাবা, তবে দেখো, হারাধন তোমার ছোট ভাই, সে যেন পথে না বসে।

এত সহজে কিন্তু কাজ মেটে নি।

এই কথা কি ভাবে গাঁয়ের মধ্যে প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে রাম চাটুয্যের স্ত্রীর কাছে বড় বড় বাড়ী থেকে মেয়ে, গিন্নি, কর্তারা উপদেশ দিতে আসতে যেতে লাগলেন। কানাই দত্ত বললে—চোখের ওপর এ কি সর্বনাশ করছো বৌদিদি? ছেলেটা তো পথে বসেছে, আর বাকি কি আছে? আমার কথা শোনো, ও ছোঁড়াটাকে দাও হাঁকিয়ে বিদায় ক'রে। তুমি না পারো আমি দিচ্ছি।

অনেক কিছু ব্যাপার হয়ে গেল। অনেক কথা কাটাকাটি, এমন কি ঝগড়া পর্যন্ত। তবুও প্রতুল দমল না। হারাধনকে ডেকে বললে, তোমার মাকে বোঝাও হারাধন। তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি বুঝবে। মেয়েছেলেকে বোঝানো এক মস্ত দায়, রাস্তা বানাতেই হবে। আমাদের।

মাসখানেক চাক্‌দা-বনগাঁ সার্ভিস একদম বন্ধ রইল এই সব নানা গোলমালে। শেষ পর্যন্ত প্রতুল জিতে গেল। দু' হাজার টাকা তার হাতে তুলে দিলেন রাম চাটুয্যের স্ত্রী।

চোখের জল দু'ফোঁটা পড়লো টাকা দেবার সময়।

প্রতুল রোড-বোর্ডের দু' একজন হোমরা-চোমরার কাছে চিঠি নিয়ে গিয়ে তাঁদের ধরলে। তাঁরা বললেন—ও রাস্তা মার্চ থেকে পি ডাব্লিউ ডি-র হাতে যাবে। তারাই দেবে। আমাদের কি স্বার্থ আছে ওতে? জেলা বোর্ডও সেই উত্তর দিলে। নদীয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে খুব বেশি ক'রে ধরতে তিনি বললেন—তুমি একলা মুভ করলে কিছু হবে না। ঐ অঞ্চলের স্কুলের ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং সাধারণ অধিবাসীদের সইওয়ালা এক দরখাস্ত দাও বোর্ডে। দেখি কি করতে পারি।

অনেক জল বেড়াবেড়ির পরে মাস-খানেক ধ'রে অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে নদীয়া জেলা বোর্ড তাদের সীমানার মধ্যের রাস্তাটুকু মেরামত ক'রে দিতে রাজী হল। তাও ঠিক হল, নারানপুর ও আকাইপুর হাই স্কুলের ছেলেদের অর্ধেক ভাড়ায় যাতায়াত করতে দিতে হবে। চব্বিশ পরগণা জেলা বোর্ড কিছুতেই রাজী হল না, অত বড় জায়গায় গিয়ে ধরাধরি করতে পারলেও না প্রতুল। রাম চাটুয্যের স্ত্রী বললে—লাইন তো বন্ধ রাখলে, রাস্তার কতদূর হল?

—যেখানে খুব খারাপ, সেখানে হয়ে গিয়েছে। চব্বিশ পরগণা না ক'রে দিলেও চ'লে যাবে একরকম। কিন্তু একটা কথা—

—কি?

প্রতুল মাথা চুলকে বললে—আর পাঁচশো টাকা দিতে হবে। আপনার পায়ে পড়ি খুড়ীমা, আমাকে ভুল বুঝবেন না। টাকার দরকার হয়েছে কেন, বলি শুনুন। বেলের হাটের সামনে ব্যাপারীদের জিনিস রাখবার জন্যে একটা টিনের চালা তৈরী না ক'রে দিলে ওদের বড় অসুবিধে হচ্ছে। যদি আমাদের তৈরী টিনের চালাতে বসে, তবে আমাদের গাড়ীতেই যেতে হবে। তরকারির বাজরাতেই তো পয়সা। এ-বাদে একটা সাঁকো সারাতে হবে। তাতেও শ'খানেক টাকা খরচ হবে।

রাম চাটুয্যের স্ত্রী খয়ে-বন্ধনে পড়েছেন বিবেচনা করলেন।

এ টাকা না দিলেও চলবে না, আগের টাকাগুলো জলাঞ্জলি যায় তাহলে। দিতেই হবে। এ কি মুশ্‌কিলের কথা, প্রতুল কেবলই বলে টাকা দাও। ওকে এনে কি শেষ পর্যন্ত ভুল ক'রেই বসলেন? কানাই দত্ত কি তাহলে ঠিক কথাই বলেছিল?

শেষ পর্যন্ত টাকা দিতে হল রাম চাটুয্যের স্ত্রীকে। বড় কষ্টেই এ টাকা দিলেন তিনি। সোনাদানা ঘরে আর এক কুঁচোও রইল না।

দু'মাস ধ'রে বহু চেষ্টার পরে লাইন খুললো। অনেক দিন ধ'রে বিজ্ঞাপনের ফলে লোক জানাজানি হয়েছিল বেশ, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীর ভিড় হ'তে লাগলো। হাটের চালা ক'রে দেওয়ার ফলে তরকারির ব্যাপারীদের এই বর্ষাকালে খুব সুবিধে হয়েছে। তারা সবাই বাসের খদ্দের হয়ে উঠলো।

সকাল বেলা। রাম চাটুয্যের স্ত্রী স্নান করে উঠে আহ্নিকে বসবেন এমন সময়ে প্রতুল এসে দাঁড়ালো সামনে।

রাম চাটুয্যের স্ত্রীর বুক কেঁপে উঠলো। আবার বুঝি টাকা চায়!

প্রতুল পকেট থেকে একশো টাকার নোট বার ক'রে ওঁর পায়ের কাছে রেখে বললে—এই নিন্। কাল প্রথম দিন লাইন খুলেছি। দিনের ক্যাশ।

—এক দিনের?

—আরও বাড়বে। সামনের মাস থেকে বোধ হয় দেড়শো টাকা ক'রে দিতে পারবো। হাটের ব্যাপারীদের খুব ভিড় হচ্ছে। সামনের বছরে একখানা বাস কিনতে হবে টাকা দেবেন—তাহলে দিন দু'শো টাকা বাঁধা রইলো। হারাধনকে মোটর এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে দিতে হবে খুড়ীমা। আমাদের আপিসের কর্তা হ'তে হলে মোটর এঞ্জিনিয়ার হ'তে হবে।

আমরা এক বৎসর পরের কথা বলছি। গত চৈত্র মাসে একবার আমরা রাম চাটুয্যের নতুন-কাটা পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। ৺রাম চাটুয্যের নামে তাঁর স্ত্রী পুষ্করিণী

প্রতিষ্ঠা করেছেন, গ্রামে জলের কষ্ট ছিল খুবই। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে যে একটা নতুন বাড়ী খানিকটা উঠে বন্ধ আছে সিমেন্টের অভাবে—রাম চাটুয্যের নতুন বাড়ী সেটা, প্রতুল ও হারাধন অনেক খাটছে বাড়ীটার পেছনে।

প্রতুলকে আমি কখনো দেখি নি। ওর সমস্ত গল্পটাই আমি শুনেছি স্থানীয় লোকদের কাছে। আজকালকার এই অসাধুতার যুগে প্রতুলের কাহিনী আমার খুব ভালো লেগেছিল, অদূর ভবিষ্যতে একবার আলাপ করবার ইচ্ছে আছে ওর সঙ্গে।

অভিমানী

কাশী থেকে মোগলসরাই এলাম একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায়।

এই ছ'মাস আগে আমি মুঙ্গেরের পিসিমার বাড়ী থেকে কাশী আসি এমনি নিঃসম্বলে। মুঙ্গেরে পিসিমার বাড়ীও এসেছিলাম নিঃসম্বলে নিজের দেশ যশোর জেলার এক অজ পাড়াগাঁ থেকে। উদ্দেশ্য, চাকরি খোঁজা। মুঙ্গেরে পিসেমশায় ও পিসতুতো ভাইয়েরা আশা দিয়েছিল চাকরি জুটিয়ে দেবে। তারা তা পারে নি কিংবা করে নি। পিসিমা কেবলই স্তোকবাক্য দিতেন, থাকো না বাপু দু'দিন। দেশ থেকে এয়েচ, জলে তো আর পড়ে নেই তুমি। এমন কিছু নয় যে ঘরে তোমার ছেলেমেয়ে কাঁদচে। বলে, আপনি আর কপ্‌নি। কিসের ভয় তোমার, একটা পেটের জন্যে? না চাকরি জোটে, পিসিমার কুঁড়েতে দুদিন রইলেই বা।

একথা আমার ভাল লাগলো না। কেনই বা আমি পরের বাড়িতে বরাবর থাকতে আর খেতে যাবো? তা হবে না। চাকরি না পাই, চলে যাবো এখান থেকে। চাকরি যদি না করবো, তবে দেশে কাকার স-সারে থাকলেই তো হত! কিছুতেই যখন কিছু হল না, তখন একদিন কাউকে না বলে মুঙ্গের থেকে রওনা দিলাম। কাশী এসে অবিশ্যি পত্র দিয়েছিলাম পিসিমাকে, আমি কাশী চলে এসেছি এবং ভালই আছি, তিনি না ভাবেন।

কাশীতে এই ছ'মাস থেকেও কিছু জোটাতে পারি নি। ছত্রে ছত্রে খেয়ে বেড়িয়েচি, যাত্রীদের মুটেগিরি করেচি, কখনো বা হোটেলে বাসন মাজার কাজ করেচি—কিন্তু স্থায়ী চাকরী কিছুই জোটাতে পারিনি। এখন এমন দশায় এসে পড়েচি যে আর কাশী থেকে কোন লাভ নেই, খেতে পাবো না।

আজ সকালে কাশী থেকে হেঁটে এসেচি মোগলসরাই।

বাংলাদেশেই ফিরবো। সকালে একমুঠো ছাতুর দলা খেয়ে পেট-ভরে জল খেয়েছিলাম। সন্ধ্যের সময় ডাউন পার্সেল এক্সপ্রেসে উঠবো ঠিক করে বসে আছি—অনেকে বললে ও ট্রেনে নাকি ভিড় কম হয়। আগে চার পাঁচখানা ট্রেনে ভিড়ের জন্যে উঠতে পারিনি। ভুল করে একখানা মিলিটারি স্পেশ্যালে উঠে বসেছিলাম, হাত ধরে জোর করে নামিয়ে দিয়েচে। তখন বেলা আড়াইটে।

বেজায় খিদে পেয়েচে। সন্ধ্যের বেশি দেরি নেই। আমি প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে বসে আছি। আমার কাছেই প্ল্যাটফর্মের নীচে কয়েকজন পশ্চিমা লোক আটা মাখচে ও ডাল বাছচে।

ওদের মধ্যে একজন আধবুড়ো লোক, রোগা, কালো, মাথায় একটা ময়লা নেকড়ার পাগড়ী জড়ানো—হিন্দিতে আমায় জিগ্যেস করলে, কোথায় যাবে?

—বাংলাদেশে।

—মকান?

—ওই বাংলাদেশেই।

—কোথায় এসেছিলে?

আমি সংক্ষেপে ওদের কাছে আমার কাহিনী সব বললুম।

ওদের মধ্যে আর একজন ছোকরামত লোক বললে, কিছু খাও নি সারাদিন?

—ছাতু খেয়েছি ওবেলা।

—এবেলা কি খাবে? হাতে পয়সা আছে কিছু?

—না।

ওদের মধ্যে কি কথার বিনিময় হল। একজন দল ছেড়ে উঠে কোথায় গেল, মিনিট পনেরো পরে ফিরে এসে বললে, "বন্ হো গৈল বা।"

ওরা সকলে মিলে আমার মুখের দিকে চাইলে। কি বন্ধ হয়ে গেল, কি ব্যাপার, ওদের জিগ্যেস করলাম। যে লোকটি উঠে গিয়েছিল সে বললে, এখানে ছত্র আছে, মুসাফিরদের জন্যে আধসের আটা আর আধপোয়া ডাল সেখান থেকে দেয়। তোমার জন্যে আনতে গিয়েছিলাম। তা বন্ধ হয়ে গিয়েচে।

সেই পাগড়ী-বাঁধা লোকটি বললে, গিয়েচে গিয়েচে। তুমি আমাদের এই খাবার থেকে খেয়ো এখন।

আমি বললাম, না না, তা হয় না। তোমরা খাও, তোমাদের খাবারে আমি ভাগ বসাবো কেন?

ওরা সকলে একযোগে আপত্তি করলে। রামজীর লীলা, তিনিই আমাকে ওদের সঙ্গে পরিচিত করিয়েচেন। তারা যদি না দিয়ে খায়, তবে ধর্ম থাকবে কোথায়?

আমার আপত্তির পেছনে যে খুব জোর ছিল, তাও নয়। ওরা হাতে চাপড়ে মোটা মোটা চাপাটি তৈরী করলে এবং একটা মাটির ভাঁড়ে কাঠ-কয়লার ঢিমে আঁচে অড়রের ডাল চাপিয়ে দিলে। আধ-ঘণ্টা পরে রান্না নামিয়ে আমায় দু'খানা চাপাটি এবং সেই চাপাটিরই ওপর খানিকটা অড়রের ডাল ঢেলে দিয়ে বললে, খা লিজিয়ে।

ওদের মধ্যে একজন বললে, জুঠা মাৎ কিজিয়ে, ঠাহরিয়ে থোড়া। এক গো নিম্কি লিজিয়ে।

নিম্কি অর্থাৎ একখণ্ড লেবুর আচার আমার চাপাটির এককোণে ফেলে দিলে ওপর থেকে, পাছে এঁটো করে থাকি এই ভয়ে।

সবাই একসঙ্গে ভোজন আরম্ভ করা গেল। ওদের ভদ্রতায় মুগ্ধ হলাম। কোথাকার কে তার ঠিক নেই, জাত নয়, জ্ঞাতি নয়, আমার জন্যে কি মাথাব্যথা? মানুষের মধ্যেই দেবতা বাস করেন, এ সেদিনও বুঝলাম, এর আগে কাশীতে নিঃসম্বল অবস্থাতেও কয়েক-বার বুঝেছিলাম।

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে ওদের মধ্যে একজন বললে, বাবুজি, আপ যায়গা হামলোককো সাথ?

—কোথায় যাবো?

—জিলা চম্পারন, থানা রামনগর, গাঁও মনিয়ারি।

—সেখানে গিয়ে কি করবো?

—তোমাকে আমরা থাকতে দেবো, খেতে দেবো, তুমি বাঙালী বাবু, আমাদের ছেলেদের ইংরিজি পড়াবে।

—বেশ, যাবো। মনে ভাবলুম আমার আবার কি, যেখানে ভাত জোটে সেইখানেই আমার বাড়ীঘর।

ওদের গাড়ী এল, আবার কাশীর দিকে যেতে হল। কাশী থেকে গোরখপুর, সেখান থেকে খেয়ায় গণ্ডক নদী পার হয়ে ও-টি-রেলওয়ের গাড়ীতে উঠে পরদিন রাত ন'টায় নামলাম নারকাটিয়াগঞ্জ। সেখান থেকে আবার ব্রাঞ্চ লাইন গেল রামনগর। রামনগর থেকে হাঁটা-পথে ওদের গ্রাম মনিয়ারি প্রায় বারো মাইল, মধ্যে সেচ বিভাগের খাল পার হতে হয় দু'বার।

দিন-তিনেক লাগলো সবসুদ্ধ। কিন্তু এখানে এসে বেশ লাগলো। বড় সুন্দর জায়গা। আমি যখন ওদের গ্রামে পেঁছেচি, তখন বেলা তিনটে। দূরে একটা সাদামত জিনিস পাহাড়ের মাথায় দেখা যাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। আমি মনিয়ারি ক্যানাল পার হবার সময় থেকে পর্যন্ত চেয়ে দেখচি।

বললাম, কি ওটা?

ওরা বললে, বর্ফ্। ও হিমালয় গিরি না হায়? হিমালয়মে যো বর্ফ গিরতা হ্যায়।

ঐ বরফাবৃত হিমালয়ের দৃশ্য? কখনো দেখি নি। অমন দেখায় নাকি? কি অদ্ভুত। কি সুন্দর! এদেশে আমি না খেয়েও পড়ে থাকবো।

দিন দুই কাটলো। ওদের মধ্যে পাগড়ীপরা আধাবয়সী লোকটির নাম মাধোলাল। অতি ভদ্রলোক, অবস্থাও বেশ ভাল। পাড়াগাঁ অঞ্চলের বড় চাষী গৃহস্থ। পঁচিশ ছাব্বিশটা দুগ্ধবতী গরু বাড়ীতে. দুধ দেয় প্রায় এক মন। ধান ও গম যথেষ্ট।

মাধোলালের বাড়ীতে ওর মেয়ে রাখনি আমাকে বড় যত্ন করে। কেমন সুন্দর মেয়ে, আর কি শান্ত মুখশ্রী। এদেশের সকলের মুখেই সারল্য ও নিষ্কলুষতার ছাপ। স্থানটি সভ্য জগৎ থেকে অনেক দূরে, হিমালয়ের পাদপ্রান্তে অরণ্যভূমির প্রান্তদেশে। মাছ মাংস ডিম খুব মেলে। তবে এখানে মাছ বা মাংস সাধারণ লোক খায় না। দুধ ঘি প্রচুর— আগের চেয়ে এখানে এখন আক্রা হয়ে গেলেও অন্যদেশের তুলনায় যথেষ্ট সস্তা।

এখানে এসে যেন একটা অদ্ভুত মায়ারাজ্যে এসেছি বলে মনে হল। যেমন সকালের রোদে তেমনি বিকেলের রাঙা সূর্যালোকে দূরের তুষারাবৃত হিমালয় কি অদ্ভুত দেখায়! আমি গ্রাম থেকে বেরিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বনের ধারে পাহাড়ী নদী কুস্‌মাইয়ের ধারে শিলাখণ্ডে বসে থাকি। নদীটার ভাল নাম কি কুসুমবতী? এ যদি হয়, তবে ওর নাম সার্থক বটে। কত কি পুষ্পিত বন্যলতা ও গাছ যে ঝুঁকে পড়েছে কাঁচ-স্বচ্ছ জলের ওপর। যেখানে সেখানে শিলাখণ্ড ছড়ানো, যেখানে খুশি বসে থাকো। খুব বড় শিলাখণ্ড আছে, যার ওপরে আট দশ জন লোক স্বচ্ছন্দে বসে থাকতে পারে। সেখানে ছায়ায় বসতাম আপন মনে। ঘন জঙ্গল ও দূরের তুষারাবৃত শৈলশৃঙ্গের দিকে চেয়ে কত কি ভাবতাম নির্জনে।

খেতে পেতাম না কাশীতে। তার আগেও কাকার সংসারে কি হেনস্থা, কি লাঞ্ছনা না গিয়েচে। হাতে পয়সা না থাকলে সবাই নীচুচোখে দেখে। এখানে এসে আনন্দ পেয়েচি শান্তি পেয়েচি। মাধোলাল আমায় ছেলের মত যত্ন করে, আমি ওকে কাকা বলে ডাকি। এ কাকা আর আপন কাকায় কি তফাৎ তাই ভাবি। দু-চারটি ছেলে-মেয়েকে ইংরিজি পড়াই। সারা গ্রামে মুন্সী চমনলাল আর আমি, এই দুটি মহাজ্ঞানী পণ্ডিত-ব্যক্তি বিদ্যমান। বাকী যারা, তারা কায়ক্লেশে নাম সই করতে পারে।

রাখনি সন্ধ্যায় বলে, বাঙালী বাবু. আমি আজ তোমার জন্যে ভাওরা পাকাবো। খাবে তো?

—সে কি?

—ভাওরার নাম শোনো নি?

রাখনি খুব অবাক হয়ে যায়! এ আবার কোন্ দেশের লোক, যে ভাওরার নাম শোনে নি! সে হাত নেড়ে দেখিয়ে বললে, আটার হয়. এমনি গোল গোল। ঘুঁটের আগুনে পোড়াতে হয়। ঘি জবজবে, আলুর চোখা দিয়ে খেতে হয়।

—আলু ভাতে দিয়ে ভাল লাগে?

—খুব। খেয়ে দেখো। আর বাঙালী বাবু—

—কি?

—তুমি বাপজীকে বলো, তোমার কাছে আমি অংরেজি পড়বো।

—আজই বলবো।

তারপর রাখনি আমার সঙ্গে বসে গল্প করে। বাঙালী বাবু. এখানে থাকো. কোথাও যেতে দেবো না। মাঠা খাওয়াবো. ছাতুর লাড্ডু খাওয়াবো. মালাইমিঠা খাওয়াবো।

—তা না হয় খেলাম, কিন্তু মাছ? মাছ না খেলে বাঙালীর শরীর টিকবে কত দিন?

রাখনি খিল খিল করে হেসে ওঠে। ঝক্ ঝক্ করে ওর মুক্তোর মত দাঁতগুলি— চৌদ্দ পনেরো বছরের সুশ্রী মেয়ের মুখের প্রাণখোলা হাসি।

বলে. মছলি কত আছে কস্‌মাইয়ে. পাটনডন্ডীর নহরে মাছ ধরতে পাবে?

—সে গবর্ণমেণ্টের খাল। সেখানে ওদের লোক বসে আছে। মাছ ধরতে দেবে কেন?

—আমি ধরবো। তোমাকে ধরে দেবো। মেয়েমানুষকে নহরের চৌকিদার কিছু বলবে না।

এবার আমি হেসে ফেলি। বললাম গবর্ণমেণ্টের চৌকিদার মেয়ে পুরুষ বাছবে না

রাখনি। চুরি যে করে তার আবার মেয়ে-মানুষ। দুজনেই খুব হাসি। আমোদ লেগেচে দুজনেরই।

রাখনি এত ভালো মেয়ে, তার আপন-পর জ্ঞান ছিল না। আমি ওদের বাড়ীতে কেউ না, অন্নদাস বলা যেতে পারে, রাখনি কিন্তু আমাকে বড় আপনার জন ভাবতো। তার সর্বদা চেষ্টা ছিল যাতে আমি অভুক্ত না থাকি, খেয়ে আমার পেট ভারে। এজন্যে তারা কত যত্ন, কত অসম্ভব হাস্যকর প্রয়াস।

আমি বলতাম, রাখনি, আমি বিদেশী লোক। আজ এয়েচি কাল চলে যাবো। তুমি আমাকে অত ভালোবাসো কেন? আমি চলে গেলে কষ্ট পাবে।

রাখনি বলতো, ইস্! চলে যাবে বইকি!

—তবে কি?

—বিয়ে করবো তোমাকে। দুজনে বাস করবো আমাদের বাড়ীর পাশে।

—চলবে কিসে?

—বাবার কাছ থেকে জমি চেয়ে নেবো। তুমি জমি চাষ করবে।

ওইটুকু মেয়ের কি বুদ্ধি। আমার এমনি হাসি পেত। এর মধ্যে সব ঠিকঠাক করে বসেচে। রাখনিকে আমারও বড্ড ভাল লাগতো। ওর স্নেহ-যত্ন ভোলবার নয়। অবিশ্যি ওর বাবাও খুব ভালো, একদিনের জন্যেও আমার প্রতি তাঁর অযত্নও দেখি নি।

আমি ওখানে মাস ছয়েক থাকবার পরেই এক ঘটনা ঘটলো।

একদিন সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে এসে দেখি বাড়ীর সকলের ব্যস্ত চঞ্চল ভাব, মুখ গম্ভীর। শোনা গেল মাধোলালের স্ত্রীর প্লেগ হয়েচে। প্লেগকে ওখানকার লোক বড্ড ভয় করে। বাড়ীতে লোকজন আসা বন্ধ হয়ে গেল। গ্রামের চৌকিদার এগারো মাইল দূরবর্তী থানায় খবর দিতে ছুটলো। পরদিন সন্ধ্যায় মাধোলালের স্ত্রী মারা গেল, মাধোলালকে ধরলো প্লেগে। তৃতীয় দিনে মাধোলালও মারা গেল। একই সঙ্গে মাধোলালের এক বৃদ্ধা পিসিও দেহ রাখলেন। ছ'সাত দিনের মধ্যে মাধোলালের বাড়ীর সকলেই কাবার হলো—রাখনি বাদে। প্লেগ তখন আশেপাশের দু-একটি বাড়ীতেও ধরেছে। ইতিমধ্যে একদিন ডাক্তার এসে সকলকে প্লেগের টিকেও দিয়ে গেল।

বেঁচে গেলাম আমি ও রাখনি। আধমরা অবস্থায় বাঁচা। আমার তখন কোনো জ্ঞান-চৈতন্য নেই এমন অবস্থা। এমন দুর্দিনের মুখ কখনও দেখিনি, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েচি। মৃত্যুর সে কি করুণ দৃশ্য দেখেছি চোখের সামনে! রাখনিকে নিয়ে আরও মুশকিল—তাকে সান্ত্বনা দেব কি, নিজের চোখের জল থামে না।

যখন সব মিটে শেষ হয়ে গেল, প্লেগ থামলো, তখন ওদের বাড়ীতে আমি আর রাখনি আর ভক্তদাস বলে ওদের এক পুরনো চাকর—এই তিন জনে টিম্ টিম্ করচি।

কয়েকদিন কেটে গেল। সরকারী লোকেরা এসে ঘরদোর ধুয়ে ধোঁয়া দিয়ে ওষুধ ছড়িয়ে দিয়ে পুরনো কাপড়চোপড় পুড়িয়ে দিয়ে গেল। আমার আর ভালো লাগচে না, এখান থেকে বেরিয়ে পড়তাম, কিন্তু রাখনিকে কার কাছে ফেলে দিয়ে যাই—এই হয়েচে মহাসমস্যা।

এ আবার কি বিষম বন্ধনে ভগবান আমায় জড়ালেন তাই ভাবি। বেশ ছিলাম স্বাধীন, খাই না খাই কোন বন্ধন বা দায়িত্ব ছিল না।

গ্রামের লোক বলে, তুমি রাখনিকে বিয়ে করে ওদের বাড়ী থাকো। অবস্থা ওদের সত্যিই ভালো। যথেষ্ট জমিজমা, গরুবাছুর, গোলাভরা ধান, গম, যব, সর্ষে। এ সবের মালিক হয়ে থাকা বড় কম কথা নয়। ভেবে দ্যাখো বাংগালী বাবু, এ বড় চাট্টিখানি কথা নয় আজকার দিনে।

রাখনি? তার কথা কি বলবো। সে তো আমাকে বেশ ভালোবাসে। দিনরাত কান্না-কাটি করে, আমি তাকে বোঝাই, সান্ত্বনা দিই।

একদিন রাত্রে হল কি, সেই কুসুমবতী নদীর ধারে বসে আছি, রাত বেশী নয়—সবে সন্ধ্যা উৎরেছে, ঘুলি-ঘুলি অন্ধকার ঘন গাছের তলায়—এমন সময় রাখনি সেখানে এসে পেছন থেকে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ালো।

চমকে উঠে বললাম, কে রে? ও! তুমি! এমন করে আসতে হয়? ভয় করে না আমার?

—ভয় কিসের?

—ভূতের।

—তুমি তো ভূত মানো না বাবুজি—

—মানি নে, আবার ভূত না মানলেও ভয় করে এই অন্ধকার রাত্রে। বসো রাখনি, একটা কথা।

ও বসলো আমারই পাশে। বসে বললে, কি?

—আমি ভাবচি, এখান থেকে চলে যাবো। অনেকদিন হল এসেচি।

—যাবে? আর আমি? আমাদের বাড়ীঘর?

—ভক্তদাস তো রইল। ও তোমার দেখাশুনো করবে। আমিও মাঝে মাঝে সময় পেলে এসে দেখে যাবো।

—আমিও যাবো তোমার সঙ্গে—

—কোথায় যাবে? তা ছাড়া—ঘরবাড়ী, গরুবাছুর, গোলা, জমিজমা এসব কি হবে?

ওসব ভক্তদাস নিক্। আমার ওতে দরকার নেই। সত্যি বলচি বাবুজি। কি হবে গরুবাছুর আর ঘরদোরে? তুমি যাকে হয় বিলিয়ে দিয়ে যাও। আমি এখানে থাকবো না—আমার ভালো লাগবে না—

কথা শেষ করে ও মিনতির সুরে আমার হাত দুটি ধরে বললে—আমায় ফেলে কোথাও যেও না বাবুজি! বলো, যাবে না? আর যদি যাও আমায় নিয়ে যাবে? এখানে থাকবো কার কাছে তা বলো?

—কেন, ভক্তদাস?

—না, আমি থাকবো না। ভক্তদাস মরে গেলে তখন কার কাছে থাকবো?

—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে তখন।

—না, ব্যবস্থাতে দরকার নেই বাবুজি! আমি তোমার সঙ্গে যাবোই।

আমি পড়ে গেলাম মহা ফাঁপরে ওর কথা শুনে। এতক্ষণ নির্জনে বসে এই কথাই কিন্তু আমি ভাবছিলাম। রাখনিকে নিয়ে কি করি এই হয়েচে আজকাল আমার বড় ভাবনার কথা। আমি চুপ করে আছি দেখে রাখনি বললে, শুনবে বাবুজি আমার একটা কথা?

—কি?

—আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। আমাকে শাদি করতে হবে না তোমাকে। চলো তুমি আর আমি কোথাও গিয়ে ভগবানের নাম করি। কি হবে এখানে থেকে? ভালো লাগে না।

আমি ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চাইলাম। পনেরো বছরের মেয়ের মুখে এ কথা সত্যিই আশ্চর্য। রাখনি এই বয়সে সংসার-বিরাগিণী হয়ে উঠলো কি ভাবে!

আমি বললাম—সত্যি? যাবে?

ও জোর করে বললে—নিশ্চয়ই যাবো—নিয়ে চলো আমাকে। এখানকার বিষয়-আশয় বিলিয়ে দাও, কাউকে, নয়তো ভক্তদাসকে দাও, ও থাকুক এ বাড়ীতে। ভগবানের নাম করিগে চলো।

গেলাম একদিন সত্যিই ওকে নিয়ে চলে। এলাম গণ্ডক নদী পার হয়ে, গোরখপুর হয়ে, কাশী। সঙ্গে ছিল প্রায় চার পাঁচশো টাকা আর রাখনির মায়ের অনেক সোনার গহনা। কাশী থেকে গেলাম হরিদ্বারে। এদিকে তখন আমার মনে হয়েচে নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে চলে এসেচি—পুলিশে হয়তো উৎপাত করতে পারে।

এক ধর্মশালায় উঠে দিন-তিনেক থেকেই রাখনিকে নিয়ে কনখলে গেলাম। এক পাণ্ডার বাড়ী ওকে রাখলাম। রাখনি বলে, তোমার কাছে থাকবো, এখানে কেন? তুমি জায়গা ঠিক কর। আমরা দুজনে সেখানে থেকে ভগবানের নাম করবো।

দিন দিন একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করতে লাগলাম। হরিদ্বারে এসে পর্যন্ত ভগবানের পথে যাবার জন্যে ওর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগলো।

এক বাঙালী সাধুর সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল গঙ্গার ধারের ঘাটে। তাঁর নাম স্বামী বাসুদেবানন্দ। তাঁর আশ্রমেও আমরা গেলাম। কনখলে গঙ্গার ধারে একটা পুরনো দোতলা বাড়ীতে তিনি থাকেন। স্থানটি নির্জন, বাঁধানো ঘাট পুরনো বাড়ীর নিচেই, পুরনো মন্দির ঘাটের ওপরই। কিভাবে আলাপ হল তা বলি।

আমরা সেই পুরনো ভাঙা ঘাটে গিয়ে বসেছিলাম। সন্ধ্যেবেলা। ওপারে কি একটা পাহাড়, পরে নাম শুনেছিলাম চন্ডীর পাহাড়। রাখিনর বেশ গলা, ও গুন গুন করে ওর বাবার মুখে শেখা একটা রামজীর ভজন ধরলে। দেখি ওর চোখ ছলছল করচে।

বললাম—রাখিন, আর একটু জোরে গাও, বেশ লাগচে—

—না, গাইবো না।

—মার খাবে জোরে না গাইলে।

দুজনেই হেসে উঠি।

সত্যি, কি সুন্দর কেটেচে এই হরিদ্বারের গঙ্গার ধারের দিনগুলি মনে মনে তাই ভাবি। কি সুন্দর সন্ধ্যা, কি চমৎকার জ্যোৎস্নার আলো গঙ্গার নীলধারার ওপর।

আমরা বসে আছি, এমন সময়ে ঘাটের ওপরের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠলো। আমরা ঘাট থেকে উঠে আরতি দেখতে গেলাম। সুন্দর কৃষ্ণমূর্তি। আরতির পরে বৃদ্ধ পূজারী আমাদের হাতে প্রসাদের বাতাসা বিতরণ করলেন। স্বজাতীয় চেহারা দেখে মনে হল তিনি বাঙালী। দেখলেই ভক্তি হয়। রাখিন বললে, জিগ্যেস করো না উনি কি এ মন্দিরে থাকেন?

আমি বিনীত ভাবে বললাম—আচ্ছা, আপনি কি বাঙালী?

তিনি হেসে বললেন, হ্যাঁ। তুমিও তো বাঙালী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কোথায় উঠেচ এখানে?

—এক পান্ডার বাড়ী।

আমি তাঁকে রাখিনর বিবরণ সব খুলে বললাম। রাখিনও ছলছল চোখে দেহাতি-হিন্দিতে তার মনের কথা খুলে বললে। আমরা তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করলাম। তাঁর আশ্রমে আমাদের স্থান দিলেন।

রাখিন কি খুশি! সাতদিনের মধ্যে সে সাধিকা সন্ন্যাসিনী ব'নে গেল, পনেরো বছরের মেয়ে!

কি তার ভজনগানে নিষ্ঠা! মন্দির-মার্জনা করতে লাগলো যেন প্রাণ ঢেলে দিয়ে। বিগ্রহের পুজোর সমস্ত আয়োজন, ফুল তোলা, পুজোর বাসন ধোয়া মাজা, ধূপধুনো দেওয়া—সব ও করবে কি একাগ্র মনে, কি ভক্তির সঙ্গে! এখানে এসে ও ভাবতে লাগলো যেন নিজের স্থানটিতে এসে পেঁছেচে এতদিনে!

বাসুদেবানন্দ সন্ধ্যাবেলা ওর মুখে হিন্দি ভজন শুনে বড় খুশি। একটি না দুটি মাত্র ভজন সে জানে, তার বাবার মুখে শোনা। তার মধ্যে একটা হল তুলসীদাসের:

"পঙ্গু চঢ়ে গিরি'পর গহন মূক করে বাচাল"

বাসুদেবানন্দ ওর পিঠ সস্নেহে চাপড়ে বলতেন—পাগলি, আর জন্মে তুই ব্রজের গোপী ছিলি। এই বয়সে এত কৃষ্ণভক্তি এল কোথা থেকে তাই ভাবি।

তার ফুলের মত পবিত্র বালিকামনটি সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে এতটুকু ভক্তির আলো পাবার জন্যে। মন্দিরের বিগ্রহের অমন প্রাণঢালা সেবা দেখে স্বামীজি নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। রাখিনর চেহারা দিনে দিনে বদলাচ্চে। সে যেন ওই মন্দিরে চিহ্নিত দেবদাসী কতকাল থেকে।

রাখিন আর আমার সঙ্গে কথা বলে না। দিন দিন সে মন্দিরের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে। ও দূরে সরে যাচ্চে ক্রমশই আমার কাছ থেকে।

একদিন ওকে বলি, রাখিন, আমি ভাবচি এখান থেকে চলে যাবো।

ভেবেছিলুম, ও বোধ হয় বলবে, আমাকেও নিয়ে চলো।

কিন্তু ও নির্বিকার ভাবে বললে—কবে?

—দু একদিনের মধ্যেই।

—আবার কবে আসবে?

—দেখি।

এতেও ও কিছু বললে না। রাখনির মন অন্যদিকে চলে গিয়েচে। আমায় আর ও চায় না। বড় দুঃখ হল মনে। মনে পড়ল কুসুমবতীর তীরে সেই সব সন্ধ্যার কথা। কি মধুর হয়েই আছে সেগুলির স্মৃতি মনের কোণে। কতদূরে চলে গিয়েচে সে-সব দিন। আর কোনোদিন ফিরবে না। বেশ বুঝতে পারি আর ফিরবে না।

এক এক সময় ভাবি, ভুল আমিই করেচি। রাখনিকে বিয়ে করে ওদের গ্রামেই বাস করতে পারতাম। সকলেই বলেছিল, রাখনিও বলেছিল। কারো কথা শুনি নি।

একদিন কাউকে কিছু না বলে কনখল থেকে রওনা হলাম। আজ সাত আট মাস হয়ে গেল, আর যাই নি, চিঠিপত্রও দিই নি।

যাবোও না।

আশা করি রাখনি সুখী হয়েচে।

তবুও ভুলতে পারিনে কুসমাইয়ের ধারের সেই অপূর্ব সন্ধ্যাগুলি। রাখনি আমার হাত ধরে বলেছিল, কোথায় চলে যাবে বাবুজি? যাও তো আমায় নিয়ে যেও।

পেছনের দিন পেছনেই পড়ে থাকে, আর কোনদিনই সামনে এসে এগিয়ে দাঁড়ায় না।

আমি এসে আবার কাকার বাড়ী ঢুকেচি। কাকার গরুবাছুর বাঁধি, হাটবাজার করি, খুড়ীমার মুখনাড়া খাই, সঙ্গে সঙ্গে দুটো ভাতও। নয়তো এ বাজারে ভাত পাচ্চি কোথায়।

পরিহাস

অনেক বছর ব্যবধানে মানবজীবনে যে নাটক অভিনীত হয়, যে সূক্ষ্ম আবেদনের সৃষ্টি করে, এ গল্পটি তারই গল্প।

রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মারা যান, ১২৬৫ সালে, তখন তাঁর সম্পত্তি বেশ ভালোই ছিল কুড়ুলগাছিতে। রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী-পুত্র ছিল না। তিনি তাঁর সম্পত্তি ছোট ভাই রামগতিকে দিয়ে গেলেন। সন্ধ্যার সময় ছোট ভাইকে ডেকে বললেন—কিছু মনে করিস নে রামা—অনেক মামলা করেছি তোর সঙ্গে বিষয় নিয়ে। সব তো রেখে যেতে হল। সঙ্গে কিছুই নিয়ে যেতে পারলাম না। এখন সব বুঝতে পেরেছি ভাই, কিছুই কিছু না। নকলের জন্যে আসল হারিয়ে বসে আছি। একটা কথা বলি শোন্। উঠোনের ঐ জবাতলায় আমার শ-পাঁচেক টাকা পোঁতা আছে। তুলে নিস্—

রামগতির সঙ্গে দাদার মুখ-দেখাদেখি ছিল না বহুদিন থেকে। কেউ কারো বাড়ীতে যেতো না, যদিও পাশাপাশি বাড়ী।

রামগতি কেঁদে ফেলে বললেন—দাদা, তুমি কি বলচো, আমি যশাইকাটি থেকে নীলমণি কবিরাজকে কাল সকালেই নিয়ে আসবো। কোনো ভয় নেই দাদা, তুমি ভালো হয়ে উঠবে।

রামতারক ম্লান হেসে বললেন—এদিকে আয়, আশীর্বাদ করি—

নীলমণি কবিরাজকে আর আনতে হয়নি। শেষরাত্রের টাল আর সামলে ওঠেনি বৃদ্ধ রামতারক।

দাদার শ্রাদ্ধ-শান্তি রামগতি পল্লীগ্রামের হিসেবে ভালোভাবেই করালেন। লোকে তাঁকে ভালোই বললে। এতদিন দাদা মামলা-মোকদ্দমা করে ছোট ভাইকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন, অনেক ফাঁকি দিয়েছিল বুড়ো। রামগতি ভালো প্রতিশোধই নিয়েচে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার পরে একদিন রামগতি তাঁর চাকর হারাধনকে ডেকে বললেন—হারাধন, একটা কোদাল নিয়ে চল্ তো আমার সঙ্গে দাদার বাড়ী।

—কেন গো ছোটবাবু? কি হবে কোদাল?

—চল্ না বলচি।

দাদার বাড়ীর উঠোনে পেঁছে হারাধনকে বললেন—এই জবাগাছের তলায় খোঁড় দিকি ভালো করে।

—কেন ?

—দাদা বলে গিয়েছিল, টাকা পোঁতা আছে ওর তলায়।

—তুমিও যেমন পাগল! টাকা পুঁতে রেখে গিয়েচে তোমার জন্যি?

—তুই খোঁড় দিকি ভালো করে! বকিস্ নে।

হারাধন এ সংসারের বিশ্বাসী পুরনো চাকর। অনেকদিন থেকে রামগতির কাছে আছে। মনিবের ওপর অনেক সময় সে হুকুম চালায়। ভালোমানুষ রামগতি হাসিমুখে সহ্য করে।

অনেকক্ষণ ধরে খোঁড়া হল, কিছুই পাওয়া গেল না। রামগতি বললেন—উত্তর দিকে খোঁড় দিকি—

আবার খানিক পরে বললেন—পেলি নে? আচ্ছা, দক্ষিণ দিকে খোঁড়—

ছ' ঘণ্টা খোঁড়া-খুঁড়ির পরেও কিছু পাওয়া গেল না। রামগতি এই টাকার ওপর নির্ভর করে দাদার শ্রাদ্ধে কিছু বেশী খরচ করে ফেলেছিলেন। হারাধন বললে—তখুনি বললাম ছোটবাবু, ওঃ—বড়বাবুর আর খেয়ে দেয়ে কাম নেই—আপনার জন্যি ট্যাকা পুঁতে রেখে যাবে!

—তাই তো! বললে যে দাদা মৃত্যুর কিছু আগে?

—অমন বলে—রোগের সময় কে কি বলে তাই কি আর দেখতি গেলি চলে?

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রামগতির মৃত্যু হল। রামগতির একমাত্র শিশুপুত্রের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর।

রামগতির বিধবা পত্নী ছেলেটিকে নিয়ে চুয়াডাঙায় তার বাপের বাড়ী চলে গেল। যাবার সময় প্রতিবেশীদের বাড়ী বাসন-কোসন, পিঁড়ি, খাট, বালতি রেখে চলে গেল।

চুয়াডাঙ্গায় রামগতির স্ত্রীর বাপের বাড়ীতে শুধু তার এক ভাই ছাড়া আর কেউ ছিল না। ভাইটি মূর্খ এবং গুলিখোর। অবস্থা ভাল নয়। অতিকষ্টে সংসার চলে।

গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াতেই রামগতির স্ত্রীর ভাজ উঁকি মেরে বললে—কে গা? ওমা এ যে ঠাকুরঝি! আহা, এসো এসো—এ বুঝি খোকন? এসো বাবা—

রামগতির স্ত্রীর চোখে জল এল। সে যে সংসারের বধূরূপে ঢুকেছিল সেখানকার অবস্থা এদের চেয়ে অনেক সচ্ছল, অনেক ভালো। রামগতির অংশে ত্রিশ বিঘে জমি ছিল প্রজাবিলি। কিছু খাজনা এবং কিছু ধান পাওয়া যেতো। খাওয়া-দাওয়ার অবস্থাও ছিল অনেক ভালো।

কিন্তু রামগতির স্ত্রী শিশুপুত্র নিয়ে সেখানে থাকতে সাহস করে নি বলেই দাদার আশ্রয়ে এসে পড়লো। গোড়া থেকেই সে ভুল করেছিল।

গুলিখোর দাদার ঘরে সর্বদিন চাল থাকে না। মামীমা রামগতির ছেলে সতুকে বলে —তোর মামার কাছে গিয়ে বল্, ঘরে চাল নেই—নইলে খাওয়া হবে না—

সতু গুলির আড্ডার দোরের কাছে ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়িয়ে বলতো—ও মামা?

কেউ কথা বলে না। আড্ডার রকম দেখে সতুর মুখ দিয়েও কথা বেরুতে চাইতো না। সেখানে দেওয়ালে হেলান দিয়ে সারি সারি লোক বসে আছে—মুখে তাদের লম্বা প্যাঁকাটির নল, কলসীর কানাভাঙার ওপর বসানো থেলো হুঁকোর সঙ্গে সেই নল লাগানো। কারো বিশেষ হুঁশ নেই। চোখ বোজানো অবস্থায় গল্প চলচে ওদের মধ্যে—সতু বুঝতে পারতো না সে সব গল্পের মানে। তখন তার বয়স আট ন' বছর হবে।

মামাকে আবার ডাকতো—ও মামা?

মামা আস্তে আস্তে চোখ চেয়ে বল্তো—কে রে?

—আমি সতু। মামীমা পাঠিয়ে দিলে। ঘরে মোটে চাল নেই।

—চাল নেই? আচ্ছা বোস। এমন চাল খাওয়াবো তোর মামীকে বুঝতে পারবে চাল

কাকে বলে।

আবার আধ ঘণ্টা। মামার সাড়াসংজ্ঞা নেই। বেলা হয়ে যাচ্ছে, মামী ভাত চড়াবে কখন? তারও খিদেতে পেট জ্বলচে। সে আবার ডাক দিলে—ও মামা'?

—কে রে?

—আমি সতু। চালের পয়সা দাও মামা। ঘরে চাল নেই কিছু।

—দাঁড়া। হাতী বিক্রি কার আগে। হাতীটা বিক্রি করেই তোকে চাল তো চাল—

ঘরের মধ্যে ও-কোণ থেকে কে একজন টেনে টেনে বললে—হাতী কেন দাদা, আম-বাগানটা বিক্রি করে দ্যাও না—

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল।

সতু ডাকলে—ও মামা?

—কি রে?

—চালের পয়সা দাও—

মামা ট্যাঁক থেকে দু আনা পয়সা বার করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—যা—আর নেই। ওই দিয়ে চালাতে বল্‌গে যে করে হোক্—

এই রকম ছিল মামাবাড়ীর সংসার।

মামী খুব ভাল লোক ছিলেন না। ভাত দুটো দিতেন বটে, কিন্তু হাজার মুখনাড়া দিয়ে আর হাড়ভাঙা খাটিয়ে নিয়ে।

সতুর মা ইতিমধ্যে একবার কুড়ুলগাছিতে গিয়ে দেখেন তাঁদের জমিজমা অপরে দিব্যি দখল করে ভোগ করচে। তাঁর হয়ে কথা বলে এমন লোক পাওয়া গেল না। মামলা করা একা মেয়েমানুষের কর্ম নয়। দেখেশুনে তিনি আবার বাপের বাড়ী চলে এলেন। সতু গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শিখে দু' ক্রোশ দূরবর্তী চুয়াডাঙ্গার হাইস্কুলে ভর্তি হল। কয়েক বছর অতি কষ্টে পড়াশুনো করে সে দ্বিতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ করলে। তার বয়েস তখন আঠারো বছর। এই সময় সতুর মা পরলোকগমন করলেন। সতুর মামীমা ওকে বললেন—এইবার একটা চাকরি-টাকরি দেখে নাও বাবা। সংসার আর চলে না। তোমার মামাও বুড়ো হয়েচেন। আর তাঁর ক্ষমতা নেই চালাবার!

মামাতো ভাই দুটি ছিল অজমূর্খ, বর্ণজ্ঞান পর্যন্ত তাদের হয় নি। পরের গাছের আম কাঁঠাল চুরি, মাছ ধরা, এই ছিল তাদের কাজ। সতুর চেয়ে বয়সেও ওরা ছোট ছিল; সুতরাং সতুর ওপর পড়লো গোটা সংসারের দায়িত্ব।

একদিন ওর মামী বললেন—সতু, একবার যা কুড়ুলগাছিতে। ঠাকুরজামাইয়ের অনেক সম্পত্তি ছিল, ঠাকুরঝি অনেক বাসন-কোসন পরের বাড়ী রেখে এসেছিল শুনতাম। দেখে আয় দিকি বাবা—

সতুর মাও তাকে মরবার সময় এ কথা বলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—অমুক অমুকের বাড়ী বাসন আছে। রুপোর খাড়ু আছে। দাদার তো এই সংসার, কখনো আনতে ভরসা পাই নি। উড়ে যেতো এতদিন। তারা খুব বিশ্বাসী। আমার নাম করে জিনিসগুলো ফেরত নিবি তাদের কাছ থেকে। বৌমাকে তো দেখতে পেলাম না, বৌমাকে দিয়ে বলবি, আমি দিইচি তাকে।

অনেক দিন পরে সতু এল কুড়ুলগাছিতে। পাঁচ বছর বয়সে এখান থেকে চলে গিয়েছিল, সে কথা কিছুই মনে নেই। বাবার কথা মনে প'ড়ে ওর চোখে জল এল। হারানো শৈশবের কত আবছায়া অস্পষ্ট স্মৃতি মনে জাগে। যেন ওই জানলার ধারে রোয়াকের কোণে কবে বাবা তাকে কোলে নিয়ে আদর করেছিল, সেই মুখখানা যেন আজও মনে পড়ে।

পুরোনো বাড়ীতে ঢোকা যায় না। ঘন জঙ্গলে উঠোন ঢেকে ফেলেচে। ছাদের কার্নিসে জিউলি গাছ মস্ত বড় হয়ে, আঠা ঝরাচ্চে। বটগাছ গজিয়ে ফল প্রসবের অবস্থায় এসে পৌঁছেচে।

তবুও সে পরের বাড়ী থাকলো না।

জন ধ'রে বনজঙ্গল কাটিয়ে এবং একটা ঘর পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে সেখানেই থাকলো। সঙ্গে এনেছিল একটা ছোট বিছানা, মশারি, বালিশ।

যাদের নাম মা করেছিল মৃত্যুর আগে—সে সব জায়গায় গিয়ে বাসন চাইলে সতু।

তারা বললে—হ্যাঁ বাবা, সোক কথা। আমাদের কাছে বাসন? সে কবে নিয়ে গিয়েচে তোমার মা! সে কি আজকের কথা বাবা? না, না, থাকলে যে দেবো না, তেমন অধর্ম কাজ কখনো হবে না আমার হাড়ে। না বাবা, সে সব তোমার মা নিয়ে গিয়েছিল।

কেউ কিছু দিলে না। অথচ তাদের অবস্থা ভাল, কোঠা বাড়ী—দু'একজনের দোতলা বাড়ী। সবাই হাসিমুখে মিষ্টি কথায় ফাঁকি দিলে ওকে।

দুটো বাঁশঝাড় গ্রামের শ্যাম চক্কত্তি দিব্যি ভোগ-দখল করচেন খবর পেয়ে সেখানে যেতে বৃদ্ধ শ্যাম চক্কত্তি হেসে বললেন—এসো বাবা, এসো। ও বাঁশঝাড় আমারই। সীমা-ছাড়া হয়ে পড়েছিল বলে তোমার বাবার সঙ্গে গোলমাল হয় ওই নিয়ে। গাঁয়ের পাঁচজনকে জিগ্যেস করে দেখো। ও আমার পৈতৃক আমলের বাঁশঝাড়।

মিটে গেল।

সতু ছেলেমানুষ, বিষয়-সম্পত্তির কিই বা বোঝে, কিই বা জানে ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই ফাঁকি দিল ওকে।

কেবল মুড়োরপাড়ার জীবন ডাক্তারদের বাড়ী ও সত্যিকারের স্নেহ পেলে খানিকটা। জীবন ডাক্তারের স্ত্রী ওকে বললেন—তুই তখন এতটুকু, এখানে আসতিস। তালশাঁস দিতাম হাতে, খেতিস বসে বসে। আহা তোর মা'র তো আর মরবার বয়স হয় নি, অল্প বয়সে মারা গেল। অল্পভুগী লোক—বোস, দুটো মুড়ি খা—

কে একজন একদিন ওকে এসে বললে—বাবু, আপনারে ডাকচে আপনাদের পুরানো চাকর হারাধন। সে উঠতে পারে না বিছানা থেকে, আপনি এসেছেন শুনে ক'দিন কেবল আমাকে বলচে আপনাকে ডাকতে। তা আমার সময় হয় না—

সতু হারাধনের নাম শুনেছিল তার মায়ের মুখে। ছেলেবেলায় দেখলেও সে কথা তার মনে ছিল না।

লোকটা ওকে একটা ভাঙা কুঁড়েঘরে নিয়ে গেল। উঠোনে একটা কামরাঙা গাছে পাকা পাকা কামরাঙা ঝুলচে। ঘরের দাওয়ায় একটা মাছ-ধরা ঘুনি উপুড় করা আছে।

ঘরের মধ্যে অন্ধকারে মেঝের ওপর বিছানায় একটা লোক শুয়ে ছিল। সতু ঘরে ঢুকতে লোকটা বিছানায় উঠে বসবার চেষ্টা করলে। মুখের দিকে চোখ চেয়ে চেয়ে বললে—কে, খোকন? আমার খোকন-সোনা? আয়, কাছে আয়, ভালো করে দেখি—কোলে পিঠে মানুষ করেচি রে তোরে।

লোকটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। সতু তো অবাক। চুপ করেই রইল সে।

লোকটা বললে—বাবা, তোমারে ডেকেচি কেন বলি। আমি মহাপাপ করেছিলাম। তোমার কাছে সেটা বলি। আমার সব গায়ে ঘা হয়েচে, তার ওপর জ্বর। খেতে পাইনে। কেউ একটু জল মুখে দেবার লোক নেই। তোমার জ্যাঠামশাই মরবার সময়ে তোমার বাবারে বলে, তাদের উঠোনে জবাতলায় পাঁচশো ট্যাকা পোঁতা আছে। আমারে সে ট্যাকা তুলতে বলে তোমার বাবা। আমি মাটি খুঁড়ে দ্যাখলাম একটা পেতলের বোগনোর কানা দেখা যাচ্চে। আমি তার ওপর অমনি মাটি চাপা দিয়ে ফেললাম। কুবুদ্ধি চাপলো মাথায়। তোমার বাবাও দ্যাখলে না। ভাবলে, আমি অনেক দিনের বিশ্বিসী লোক, আমি কি আর ফাঁকি দেবো? রাতারাতি সেই টাকার বোগনো আমি তুলে নিয়ে গিয়ে—তোমার কাছে বলতি লজ্জা করে—আমার এক বিটি হয়েছিল—তার হাতে নিয়ে গিয়ে দেলাম। সে ট্যাকা আমার ভোগে হয় নি বাবা। সেই মেরে দেলে টাকাটা। দিন পনেরো পরে ট্যাকা নিয়ে সে গঙ্গার ওপারে তার বোন-ভগ্নীপতির কাছে চলে গেল। তোমরাও এখান থেকে চলে গেলে। আমার সেই থেকেই খারাপ অবস্থা, এখন আর খেতে পাইনে। যতদিন শরীরে শক্তি ছেল, জন খেটে পেটের ভাত চালিয়েচি। এখন বুড়ো হয়ে গিইচি, রোগগ্রস্ত, আর খেতে পাইনে। আমার এমন হবেই যে, বিশ্বেসঘাতুকি কাজ করিচি, পুরনো মনিবের ট্যাকা চুরি করিচি, আমার এমন হবে না তো কার হবে বাবা! আজ তোমার কাছ বললাম, যদি তাতে পাপের বোঝা কমে...আর, আমার হয়ে এল, খোকন, বড্ড জোর দুটো একটা মাস

—তোরে যে দ্যাখলাম মরবার আগে—

সতু কিছুক্ষণ সেখানে বসে দু'একটা সান্ত্বনার কথা ওকে বললে। তারপর পকেটে হাত দিয়ে যা কিছু ছিল, ওর বিছানার পাশে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এল।

সীতানাথের বাড়ী ফেরা

সীতানাথ আজ দুমাস পরে বাড়ী যাচ্ছে। ট্রেন ছাড়তেই সে আনন্দে একটা গান ধরলে গুন গুন করে। কিন্তু তখনই মনে হল, উঃ, খোকার কাছে পৌঁছুবে সে কি আজ? বাবাঃ, আজ সারারাত ট্রেনে কাটবে। এ দুমাস সে যে কি করে ছিল, সেই জানে। যখন সে চলে আসে, বাড়ীর কাছে ইস্টিশান, আড়াই বছরের খোকা পিটু তার জামা আঁকড়ে ধরে বললে—বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

—তুই যাবি, তবে তোর মা যে কাঁদবে?

—কাল আসব ন'টার গাড়ীতে।

খোকার কাছে যত গাড়ীই যায়, সব ন'টার গাড়ী। আর ভবিষ্যৎ কাল মাত্রেই 'কাল'।

—বাবা, তুই ন'টার গাড়ীতে যাবি?

—হ্যাঁ।

—আমি যাবো কাল।

—মার কাছে থাকবে কে?

—কাল আসবো।

ওর মাও ওকে বুঝিয়ে বলেছিল—খোকা, তুই যাবি আমি কার কাছে থাকবো?

—কাল আসবো।

—না, আমি থাকতে পারবো না।

—তোমার জন্যে মুকি (মুড়কি) কিনে নিয়ে আসবো।

যেদিন আসে, সেদিন সকাল থেকে খোকা ব্যস্ত হয়ে মাকে বলতে লাগলো—মা, আমার জামা দ্যাও।

—কেন রে?

—বাবার সঙ্গে যাবো।

—কোথায় যাবি?

—কলকাতা।

—আবার আসবি কবে?

—কাল আসবো।

কিছুতেই ছাড়লে না খোকা, জামা গায়ে দিয়ে ইস্টিশানে এল। গাড়ী এলে বাবার কোল আঁকড়ে জামা টেনে ধরে রাখলো। এঞ্জিনটা সশব্দে প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাবার জামা মোক্ষম এঁটে ধরলে—খানিকটা এঞ্জিনের ভয়ে, খানিকটা বাবা পাছে পালায় ওকে ফেলে সেই ভয়ে। তখন সে দিশেহারা হয়ে বলচে—ও বাবা, আমি যাবো আমি ন'টার গাড়ীতে যাবো—আমি তোর সঙ্গে যাবো বাবা।

গাড়ী বাঁশি দিলে। কত বোঝালে সীতানাথ, খোকার এক বুলি তার আকুল কান্নার মধ্যে—আমি তোমার সঙ্গে যাবো বাবা—আমি ন'টার গাড়ীতে যাবা—

গাড়ীর লোক এবং স্টেশনের লোক হাসতে লাগলো ব্যাপার দেখে। সীতানাথ নির্মম ভাবে খাকার হাত জোর করে ছাড়িয়ে দিলে এবং খোকাকে তার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের মেয়ের কোলে দিয়ে ছুটে এসে ট্রেনে উঠলো। ধীরে ধীরে ট্রেন স্টেশন ছাড়লো। খোকা আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে আর্তনাদ করচে বীণার কোলে—ও বাবা, আমাকে নিয়ে যা, আমি ন'টার গাড়ীতে যাবো—আমায় নিয়ে যা—

গাড়ীতে উঠে পেছন দিকে সীতানাথ চেয়ে দেখলে খোকাকে।

ক্রমে ওর মূর্তি মিলিয়ে গেল। স্টেশন দূরে চলে গেল।

সীতানাথের চোখ জলে ভরে এসেচে। পাছে গাড়ীর লোক টের পায়, সে জানলার বাইরে চেয়ে রইল। একজন কে বললে—আপনার ছেলে বুঝি?

—হ্যাঁ।

অপরিচিত লোকের সংগে এ নিয়ে বেশি আলোচনা করবার ইচ্ছে নেই সীতানাথের। তা ছাড়া তখন কান্নায় তার গলার স্বর আড়ষ্ট। সে তাড়াতাড়ি জানলার বাইরে চেয়ে যেন মনোযোগের সংগে আকাশের মেঘ লক্ষ্য করতে লাগলো। নইলে তার চোখের জল সবাই টের পেয়ে যাবে। সকলে ভাববে, ছেলেকে ফেলে রেখে আসতে হল বলে অত বড় মানুষটা কাঁদচে! এরা কি কিছু বুঝবে তার মনের ব্যথা? এরা কি বুঝবে খোকাকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে কাল সারারাত তার ভালো ঘুম হয়নি। কাল সারাদিন খোকাকে সে কাছছাড়া করেনি, খোকাও তার কাছছাড়া হয়নি। কেবল বলেচে—বাবা, কাল তোর সংগে আমি ন'টার গাড়ীতে যাবো। নিয়ে যাবি তো?

—কেন, তুই মার কাছে থাকবি।

—না, তাহলে আমি কাঁদবো।

—তোকে না দেখলে তোর মা কাঁদবে।

—কাল আসবো!

—রাত্রে কার কাছে শুবি?

—তোর কাছে।

—খাবি কি?

—মুকি।

দু-তিনটে স্টেশন গেল সীতানাথের কান্না সামলাতে। ওকে না দেখে খোকা এই দু মাস কেমন করে থাকবে? ওই বা কেমন করে থাকবে খোকাকে না দেখে? চাকরিতেও ছুটি পাবে না, তেমন অবস্থাও নয় যে অতদূর থেকে খোকাকে সে দেখতে আসবে।

এ দু' মাসের প্রত্যেকটা দিন, প্রত্যেকটা মুহূর্ত সে খোকার কথা ভেবেচে। এক এক সময় বড্ড অসহ্য হত, হাতের কলম ফেলে দিয়ে সে চোখের জল চাপতে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো সে সময়। একদিন তার মুখ দিয়ে যন্ত্রণার চোটে উঃ শব্দ বেরিয়ে গিয়েছিল। পাশে নলিনী গুহ বসে, সে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি হল?

ও বললে—পেটে বড় যন্ত্রণা হচ্চে ভাই।

—পেটে? কি খেয়েছিলেন?

—ইলিশ মাছ।

—ভাই নরেশবাবুর কাছ থেকে হোমিও-প্যাথিক ওষুধ এক ডোজ খেয়ে আসুন না? বড্ড কষ্ট হচ্চে?

—এখন একটু কম।

মহা মুশকিল। কিছু ভাববারও জো নেই লোকের মাঝখানে বসে। খোকার কথা ওদের কাছে বলে লাভ নেই। ওরা কিছুই বুঝবে না। তার মনের সে নিদারুণ কষ্ট—শুধু দাঁত বের করে হাসবে।

খোকা অত ভালবাসে কেন তাকে? খেলা করবে, নিজের বয়সী ছেলেমেয়ে কত এসেচে—তাও বলবে, বাবা খেলা করবি আয়—

—তোরা খেল্।

—না বাবা—আয়, খেলা কর্‌বি।

ওর কাপড় ধরে টেনে নিয়ে খেলায় নামিয়ে তবে ছাড়বে। খাবার সময় তার হাতে ভিন্ন খাবে না। কোথাও যেতে দেবে না। জামা গায়ে দিলেই অমনি হেসে বলবে—বাবা, বেড়াতে যাবি? আমায় নিয়ে যাবি তো?

—চলো।

—আমায় বকবি নে তো?

একবার খোকাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে কি কারণে ওকে এক চড় মেরেছিল। খোকা সেই কথা মনে করে রেখে দিয়েচে। বাবার সংগে বেরুবার আগেই বলবে—আমায় বকবি

নে তো?

—না বকবো না, চল।

—আমায় মুকি কিনে দিস।

—দেবো।

—এক পয়সার মুকি।

—আমায় কি কিনে দিবি?

—এক পয়সার মুকি কিনে দেবো। কাল কিনে দেবো।

—তাই দিস।

কতদূর গাড়ী এল। মোটে বারহারোয়া? গাড়ী যেন আর চলচে না। ঘুমুবার চেষ্টা করে দেখলে সীতানাথ। ঘুমুলেই অমনি খোকা এসে হাসিমুখে সামনে দাঁড়ায়। ওর মুখ যেন স্পষ্ট মনে হয় না। যেন ভুলে গিয়েচে খোকার মুখ। কতক্ষণে গাড়ীটা গিয়ে পেঁছিবে?

আজ পনেরো-কুড়ি দিন দেশের চিঠি পায়নি। কেন এমন হল, দু'তিনখানা পত্র দিয়েচে তারও কোনো উত্তর পায় নি। এমন তো কখনো হয় না।

ওঃ এ ক'দিন সাহেবগঞ্জে কি ছটফট করেই কেটেচে!

রোজ ভেবেচে। দিন গুনেচে। আর ক'দিন আছে? আর সাতদিন। আর ছ'দিন। আর পাঁচদিন। দিন যেন আর যেতে চায় না।

এক একটা দিন এত লম্বা হয় কেন?

আগে তো দিনগুলো আসতো আর যেতো—তত বোঝা যেতো না যে দিনগুলো এত লম্বা হয়। তারপর গতকাল রাতে যখন সে বিছানায় শুতে গেল—তখন সে শুধু প্রতীক্ষা করেচে কতক্ষণে সকাল হবে। ভালো ঘুম হয় নি। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখেচে ঘুম ভেঙে উঠে। একবার উঠলো, তখন ঘড়িতে টুং টুং করে বাজলো দুটো। একবার উঠলো, তার কিছু পরে বাজলো তিনটে।...এক ঘুমে রাত ভোর হয় অন্য দিন—আজ এমন হয় কেন? আবার ঘুমুলো। তখন চেয়ে দেখলো জানলা দিয়ে বাইরে চমৎকার জ্যোৎস্না। প্রথমটা জ্যোৎস্না বলে বোঝা যায় নি, ভোরের আলো বলে মনে হল...ওর বহুপ্রতীক্ষিত প্রত্যূষটি... যেদিন ও বলতে পারবে, আজ আমার খোকার কাছে যাওয়ার দিন। কিন্তু না, ওটা শেষ-রাতের জ্যোৎস্না—সকালের এখনো বিলম্ব আছে। টং টং করে বাজলো চারটে একটু পরেই। এইবার সে ঘুমুবে—এইবার উঠে দেখবে সকাল হয়ে গিয়েচে......দু' মাসের আকুল প্রতীক্ষার সেই সকালটি, যে সকাল কোনদিন আসবে বলে বিশ্বাসই হয় নি ওর। যে সকাল ছিল কামনার সপ্ত সমুদ্রের পারে—তা এল ওর চোখের সামনে রূপ ধরে, সত্যিকার পাখী-ডাকা সেই অপরূপ সকালটি।

তারপর কত কষ্টে সকাল হল।

আজ সে রওনা হবে খোকার কাছে।

পৃথিবীতে এমন অপূর্ব সকাল নামে!

ট্রেন কতদূর এল? গাড়ীর মধ্যে বড্ড গরম। ঘুম আসে কই? সীতানাথ শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো নৈহাটি থেকে খোকার জন্যে নিতে হবে লেবেঞ্চুস, খেজুর। কোন একটা খেলনা। একটা জামা। স্ত্রীর জন্যে একখানা কাপড়। খোকা কেমন বলতো কোন জায়গা থেকে ফিরলে—বাবা, কোথায় গিইলে?

—অমুক জায়গায়।

—আমার জন্যে কি আনলি? মুকি?

ভালো কথা। ও মুড়কি বড় ভালবাসে, মুড়কি কোথা থেকে নেবে ওর জন্যে? রাণাঘাটের মুড়কি ভালো, সেখান থেকেই নেবে।...

আর কি খাবার নেওয়া যাবে? খোকার জন্যে কিছু রসগোল্লা।

আবার সীতানাথ ঘুমিয়ে পড়লো।...

নৈহাটি পেঁাছে গেল গাড়ী। রাণাঘাটের ট্রেনের এখনো অনেক অনেক দেরি। হাত-মুখ ধুয়ে সে চা খেয়ে নিলে। তারপর খোকার জন্যে বাজার করলে। ট্রেন এল বেলা ন'টায়। তখুনি সে উঠে বসলো।...ট্রেনগুলো আজকাল এমন আস্তে আস্তে যায়। স্বাধীনতা-লাভের পর সব গোলমাল হয়ে গিয়েচে। আগেকার ট্রেন অনেক জোরে চলতো। এক একটা স্টেশনে যদি বা দয়া করে থামে—ছাড়তে আর চায় না। তাড়াতাড়ি ঘণ্টা দিয়ে দে না কেন বাপু? এত কি তোমাদের কাজ?

"চাই কেক্, ভাল কেক্? এতে আছে মাখন, ডিম, কিশমিশ, বাদাম, পেস্তা। বাজারে যার দাম দু' আনা, আমাদের কোম্পানী প্রচারের জন্যে তাই দিচ্চে এক আনায়। বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের জন্যে নিয়ে যান, আগে খান পরে দাম। ভাই সকল! ভালো কেক্, প্রতুল কোম্পানীর ইংলিশ কেক্!"

—এই কেক্! এদিকে এসো! কত করে? ভালো হবে তো?

—নিয়ে যান না মশায়। এই গাড়ীতে আজ এক বছর ধরে আমি কেক্ বিক্রী করচি। সবাই আমায় জানে। প্রতুল কোম্পানীর কেক্ বললে সবাই চেনে। ভালো না লাগে লাইনের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিন, দাম ফেরৎ দেবো—

—আচ্ছা দাও চারখানা। চোদ্দ পয়সা দিই—

খোকা এ জিনিস কখনো খায় নি। পাড়াগাঁয়ের শিশু—সে চিনেচে শুধু মুড়কি। বড় খুশি হবে। এ কোন্ স্টেশন? এখনো মদনপুর আসে নি? নাঃ, এদের নিয়ে আর পারা গেল না! এঞ্জিনের কয়লার আঁচ কি নিবে গেল নাকি?

রা-ণা-ঘা-ট!...

তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো সে। ওদিকের লাইনের গাড়ীর কত দেরি? আচ্ছা আগে মুড়কি-টুড়কি কেনা যাক না? পাকা কলা বিক্রী হচ্চে। খোকা কলা খেতে ভালবাসে। একবার খোকা বলেছিল—আমাকে একটা পয়সা দিও।

—কেন রে খোকন?

—আমি তোকে কলা কিনে দেবো!

হায়রে! খোকা, তুই জানিস নে, এক পয়সায় আজকাল কোন্ জিনিসটা পাওয়া যায়? তুই সেকেলে সরল শিশু, কিছুই বুঝিস নে। সাড়ে তেরো আনা গেল মুড়কি আর কলা কিনতে। তাও মাত্র চারটি পাকা কলা খোকনের জন্যে। পাঁচ পয়সা করে এক একটি কলা।

মুশকিল হল টিকিট করতে এসে। ওর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। বন্যার জলে হরিনারানপুরের নীচে কোদলা নদীর পুল ভেঙে গিয়েচে—লাইনের ওপর জল। ট্রেন চলাচল তিন দিন বন্ধ আছে। কবে খুলবে তা কেউ বলতে পারলে না। দেশ বন্যাতে নাকি ভেসে গিয়েচে।

সর্বনাশ! সীতানাথের কান্না এল প্রায়। এখন সে কি করে? তিন দিন সে থাকবে কোথায়? তাকে তাহলে আবার সাহেবগঞ্জে ফিরে যেতে হবে।

কত জিনিস যে খোকার জন্যে কিনেছিল। মুড়কি, কলা, লেবেঞ্চুস। সে সব কি হবে?

একজন লোকের সঙ্গে হঠাৎ ওর দেখা হয়ে গেল। তার মুখে ও শুনলে চুর্নী নদীর ঘাট থেকে নৌকো ভাড়া পাওয়া যায় ওদিকে যাওয়ার জন্যে। সে নিজে যাবে কোলা-কুলবেড়ে গ্রামে। সীতানাথের গ্রাম কুলবেড়ে থেকে কোলা-কুলবেড়ে পাঁচ ছ' ক্রোশ উত্তরে। একখানা নৌকো ওরা ভাড়া করলে চুর্নী নদীর ঘাট থেকে।

বেলা ন'টার সময় নৌকো ছাড়লো। মাঝির মুখে শুনলে তাদের গাঁয়ের দিকে বন্যা নেই। হরিনারানপুরের নীচে পুল ভেঙেচে কোদলা নদী ও ভাঙড় নদীর বানে। মাঝিকে বললে—কতক্ষণে কুলবেড়েতে ভেড়াতে পারবে?

—তা কি বলা যায় বাবু। জলের কাণ্ড। সাঁজ হতি পারে।

চুর্নী নদীর জলে ঢল নেমেচে। রাণাঘাট টাউন ছাড়িয়ে দুধারে পাড়াগাঁ। ভাদ্রের নদী কূলে কূলে ভর্তি, বাবলা গাছে হলদে ফুল ফুটেচে, বুনো কচুর লম্বা লম্বা ফুল ফুটেচে জলের ধারে। আউশ ধান কাটচে চাষীরা নদীর দুধারে হলদে ক্ষেতে। সীতানাথ

চূর্নী দিয়ে নৌকো করে জীবনে প্রথম এল এদিকে। মাঝে মাঝে গ্রামের ঘাটে মেয়েরা ঘড়া ভরে জল নিয়ে ভিজে কাপড়ে ডাঙায় উঠচে, বাঁশবনের পথে অদৃশ্য হয়ে যাচ্চে। ওর বেশ লাগছিল। কালকাসুন্দির ফুলে নদীর ধার ছেয়ে গিয়েচে এক এক জায়গায়। কাশের ফুল বর্ষার হাওয়ায় দুলচে। সাদা কাশফুলে বনবনানী নদীতীর যেন শুভ্র বর্ণের হাসি হাসচে! নীল আকাশ। গাং-চিল ছোঁ মেরে মাছ ধরচে। জেলেরা দোয়াড়ী পাতচে জলে নেমে।

ও জিগ্যেস করলে—কি মাছ হবে হ্যাঁগো?

—চিংড়ি। নৌকো কোথাকার?

—রাণাঘাটের।

—কনে যাবে?

এবার সীতানাথকে কথা বলতে না দিয়ে মাঝি ধমক দিয়ে বললে—তোমার সে খোঁজে দরকার কি? যেখানেই যাই।

লোকটা অপ্রতিভের সুরে বললে—ওমা, তা জিগ্যেস করলিও দোষ!

ক্রমে বেলা পড়ে গেল। বাঁশবনে সোনার সড়কির মত নতুন বাঁশের কোঁড় নীল আকাশে ঠেলে উঠেচে চারিদিকে। বনধুঁধুলের হলুদবরণ ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে প্রজাপতির নৃত্য। বনসিমের নীল ফুল ঝোপের মাথায়। অনুকূল স্রোতে তরতর বেগে নৌকো চলে যাচ্চে। মাঝির জন্যে এক গাঁ থেকে ওরা মুড়ি কিনে দিলে, নিজেরাও দুটো খেয়ে নিলে।

—হ্যাঁ মাঝি, কুলবেড়ে আর কতদূর?

—এখনো দূর আছে। পানচিতের বাঁওড়ে গিয়ে পড়বো! তারপর কুলবেড়ে।

—সন্দে হবে?

—সন্দের পর একদন্ড রাত্তির হবে।

একটা গাঁয়ের পাশে কি গাছে মাকাল লতার ফল পেকে টুকটুক করে দুলচে। হঠাৎ ওর মনটা কেমন করে উঠলো। সেবার ওদের গ্রামে পুরনো ডুমুরগাছে মাকালফল পেকে অমনিধারা লাল টুকটুক করছিল। তখন পিটু আরো ছোট। ও বললে—ওই দ্যাখ খোকা। ইবু (লেবু)।—

খোকা বললে—ইবু দিবি বাবা?

—দাঁড়া পাড়ি।

—পাড়ো। আমি কাল ইবু দিয়ে ভাত খাবো।

—খেও।

—আমায় বকবি না তো?

—না।

—কাল ইবু দিবি?

—এখনই দিচ্চি, আবার কাল কেন। দাঁড়া। একটা কঞ্চি পাচ্চি নে—বড় উঁচু।

মনটার মধ্যে কেমন করে উঠলো। মাঝিকে বললে—গোটাকতক পাকা মাকাল ফল নিলে হত—থামাও নৌকো—

—ও কি হবে বাবু?

—কিছু না। ছেলেপুলেরা খেলা করবে।

—চলুন, আগে অনেক আছে। এখন বেলা পড়ে গিয়েচে, বন-ঝোপের মধ্যে নামে না।

মনে পড়লো কোন দোষ করে ফেলে খোকা ওর কাছে এসে ভয়ে ভয়ে বলতো (যেমন সেবার ওর হাতঘড়িটা নিয়ে নাড়তে গিয়ে হঠাৎ হাত থেকে ফেলে দিয়ে এবং মায়ের বকুনি খেয়ে)—বাবা, আমি দুত্তু করি নি—আমি ভালো?

—খুব ভালো। তুমি দুত্তু করনি তো? কে দুত্তু করে তবে?

—না। রবি দুত্তু করে, চন্দন দুত্তু করে। বাবা, আমি ভালো?

—খুব ভালো। ঘড়িটা কে ভেঙেচে?

—মা।

—ও, বটে।

একবার খোকার টাইফয়েড হয়েছিল। জ্বরের ঘোরে সে কেবল বলতো—বাবা, অসুখ সেরে গেলে ভালো-তেল মেখে নদী থেকে নেয়ে আসবো—

সীতানাথের বুক কেঁপে উঠতো। নদীতে নাইবার কথা বলচে কেন? এটা কি খারাপ লক্ষণ?

জ্বরের ঘোরে কেবল ডাকতো—বাবাই—ও বাবাই—

—এই যে খোকা—

—বাবাই, আমার কাছে বোস্। কোথাও যাস নে।

আবার খানিক পরে বালিশ থেকে মুখ উঠিয়ে বলতো—বাবাই, নয়েচ তো?

—আছি।

—শুয়ে নয়েচ নাকি?

—বসে আছি।

—থাক্। আমি ঘুমুই—

—ঘুমোও!

কি একটা দুর্গন্ধ বেরুলো হঠাৎ। মাঝি ও তার সহযাত্রী নাকে কাপড় দিলে। ও বললে—কিসের গন্ধটা হে?

মাঝি কিছু না বলে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। ডাঙার দিকে শিমুলতলায় জলচুড়ির দামে একটা মড়া আটকে রয়েচে। পাখানা উঁচু হয়ে আছে আকাশের দিকে। হাঁটু মুড়ে যেন দুপুরের আহারের পর বিশ্রাম করচে। একটা চওড়া ঘাসের ডগা ওর সাদাটে ছাতা-ধরা হাঁ-করা মুখের মধ্যে। মড়াটার ওপরকার ডাঙায় শিমুল গাছটাতে শকুনি বসে।

ওর মনটা ছাঁৎ করে উঠলো। এসব বড় অলক্ষণ। কেন ওটা দেখলে সে? এই ভরা সন্দেবেলাতে ওটা দেখবার কি দরকার ছিল?

বামে শব শিবা কুম্ভ,
দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ।

আচ্ছা মড়াটা যখন প্রথম দেখলো তখন মড়াটা ওর কোন্ দিকে ছিল। বাঁ দিকে। বাঁ দিকে—না ডান দিকে? না, বাঁ দিকেই?

—এই বাবু চন্দনতলায় ঠাকুরবাড়ীর ঘাট।

—সে কি। তাহলে তো বেশি দূর নেই!

মনে মনে সে চন্দনতলার জাগ্রত কালীঠাকুরের কাছে কত প্রার্থনা করলে। খোকা যেন ভালো থাকে, গিয়ে ওকে ভালো দেখতে পায় সে। আর বেশি দূর নেই। ওর বুকের কাছে কি যেন দুলে উঠলো। আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অগ্নিরেখা বিরাট প্রশ্ন নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এসে গেল ওদের গ্রামের ঘাটে। এবার খোকার সঙ্গে দেখা হবে।

কতদিন খোকাকে সে দেখেনি। ওর মুখ যেন আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। খোকার মুখ যেন সে ভুলে গিয়েছে! খোকার মুখের কথা এতদিন যেন আরব্য রজনীর উপকথা ছিল—আজ তা কি এতকাল পরে বাস্তবে রূপ নেবে? সত্যিকার খোকা ওর সামনে এসে দাঁড়াবে? স্বপ্নের খোকা নয়, কত বিনিদ্র রজনীর স্বপ্নের সঙ্গে তার তফাৎ থাকবে তো? এই পরম মুহূর্তটির জন্যে যেন বিশ্ব সৃষ্টি। সমস্ত বিরাট নভোমণ্ডলের ঘূর্ণ্যমান নেবুলারাজি, মৃগশিরা, সপ্তর্ষি, শুকতারা, কালপুরুষ, সব নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণশীল, শুধু তার এই পরম মুহূর্তটি সম্ভব ও সার্থক করে তুলবার জন্যে। নইলে ওসব অসার, মিথ্যে, অর্থহীন। প্রেম নেই যে-বিশ্বে, সেটা আবার কি একটা বিশ্ব? সে ধূমভস্ম হয়ে মহাব্যোমে মিলিয়ে যাক না, কে দেখচে! কিসের সার্থকতা ওর অস্তিত্বের? সর্বংসহা ধরিত্রীমাতার কোলে যাপিত এই মধুর মুহূর্তগুলি প্রেমের বাণী দিক্ থেকে দিগন্তরে, নীহারিকা থেকে নীহারিকান্তরে, এক নাক্ষত্রিক দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ছড়িয়ে পড়চে, তাই বিশ্ব বেঁচে আছে, বিশ্ব দীর্ঘজীবী হয়ে আছে। নতুবা বিশ্ব নাভিশ্বাস তুলে খাবি খেতো।

ওদের পাড়ার ঘাটে নৌকো লাগলো। কচুবনে ঝিঁঝিঁ ডাকচে। অন্ধকার বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে পথ। শেয়াল ডাকলো কেন? শেয়াল ডাকা কি ভালো? জোনাকি জ্বলচে তেলাকুচোর ঝোপে।

নিমাই জেলের সঙ্গে দেখা, সে জাল কাঁধে নিয়ে নদীর দিকে যাচ্চে। বললে—কেডা যায়?

ও বললে—আমি সীতেনাথ। নিমাই ভালো আছ?

—কে, খুড়োমশায় আলেন? ভালো আছেন?

নিমাই যেন দ্রুতপদে চলে গেল। আর কোনো কথা বললে না কেন? বাড়ীর সবাই ভালো আছে তো? নিমাই অত তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন? যেন সামনে থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে! হয়তো তা নয়—হয়তো ওর মাছ ধরবার সময় বয়ে যাচ্চে, এই জন্যেই সে ছুটেচে নদীর দিকে।

এই তো কাঁটালতলা দিয়ে রাস্তা। সামনে শম্ভু চক্কত্তির বাড়ী। শম্ভুদা চন্ডী-মন্ডপে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—কে? সীতেনাথ? বাড়ী এলে? নৌকোয়?

—হ্যাঁ দাদা!

—আচ্ছা। যাও।

আর কিছু বললে না কেন শম্ভুদা? বাড়ীতে খোকা কেমন আছে এ কথা জিগ্যেস করতে সাহস হল না ওর। আচ্ছা, শম্ভুদার মুখে একটা—কি একটা ঢাকবার চেষ্টা করচে বলে মনে হল না?

বামে শব শিবা কুম্ভ,
দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ!

মড়াটা তখন কোন্ দিকে ছিল, যখন ও প্রথম মড়াটাকে দেখলে?

ঐ তো বাড়ী। অন্ধকার মত কেন? আলো জ্বলচে না কেন রান্নাঘরে? ওর পা বেজায় ভারী হয়ে গিয়েচে। পা আর চলচে না। গলা আড়ষ্ট হয়ে আর সুর বার হচ্চে না। বাড়ীতে সুধা আর খোকা আর একটা ঝি ছাড়া আর কেউ থাকে না! কার নাম ধরে ডাকবে? ঝিয়ের না সুধার? না খোকনের?...

...না। পা এত ভারী কেন? ডাকতে গিয়ে গলা দিয়ে সুর বার হয় না কেন? সারা পথ সাহেবগঞ্জ থেকে আজ দুদিন একরাত্রির আকুল প্রতীক্ষার পরে নিজের ঘরের দোরে এসে প্রাণের ধারা শুকিয়ে গেল কেন? কি হয়েচে বাড়ীতে? নিমাই জেলে কথা বললে না কেন? শম্ভু চক্কত্তির সঙ্গে এতকাল পরে দেখা, সেও ভাল করে কথা কইলে না কেন?

বাঁশবন, তেঁতুল গাছের নীচে অন্ধকার বাড়ীটা ওর আড়ষ্ট মুখের ও মরা ছাগলের চোখের মত অর্থহীন চোখের দিকে চেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

কোনো কথা বললে না।

তেঁতুলের ডালে লক্ষ্মী-পেঁচার কর্কশ আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে ঝট্‌পট্ করে উড়ে যাওয়ার শব্দ।

চমকে শিউরে উঠলো সীতানাথ।

এমন সময়ে পথের ওপর আলো এসে পড়লো। কারা আসচে ওদিক থেকে। গলার স্বর শোনা যাচ্চে।

সুধার গলা যেন?

পরক্ষণে বিনোদের মা—ঝি লণ্ঠন নিয়ে পথের সামনে এসে পড়লো। পেছনে সুধা ও তার কোলে খোকা। লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল স্পষ্ট। বিনোদের মা চেঁচিয়ে বলে উঠলো—ও মা, এ যে দাদাবাবু অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়ে! আমরা গিইলাম রায়-বাড়ী সত্যনারানের সিন্নির পেসাত পেতে বাড়ী চাবি দিয়ে—

আর কোন কথা ওর কানে গেল না।

খোকা হঠাৎ অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে দেখছিল। পরক্ষণেই সে মার কোল থেকে নেমে দৌড়ে হাত বাড়িয়ে ওর দিকে ছুটে আসতে আসতে বললে—বাবা—ও বাবা—তুই কোথায় গেইলি? আমার জন্যে মুকি এনেচ?...ও বাবা—

তারপরে ওর গলা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো, সীতানাথ নীচু হয়ে ওকে কোলে তুলতে গেল। খোকা আদরের সুরে বললে—বাবাই—মুকি এনেচ বাবাই?

হরিকাকা

হরিকাকার আসল নাম ছিল হরিপ্রাণ মুখুজ্জে। নামটা শুনতে ভক্তের মত হলেও হরিকাকা আদৌ ভক্ত ছিলেন না। ছিলেন অত্যন্ত দুঁদে, মাতাল, প্রবল-প্রতাপান্বিত, কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য, পরপীড়নদক্ষ, আরও কত কি। অল্প কিছু জমিদারী ছিল, তারই আয়ে দিন চলে যেত। স্বর্গে মর্ত্যে হরিকাকা কাউকে গ্রাহ্য করতেন না, অথচ তাঁর দাপটে মেদিনী কাঁপতো।

রাস্তা দিয়ে কেউ হয়তো টেরি কেটে গান গাইতে গাইতে চলেচে, হরিকাকা হুকুম দিতেন—ধরে নিয়ে এসো তো ব্যাটাকে। এই, কে যাচ্চ, শোনো ইদিকি।

রয়ে জেলের ছেলে শ্যামাচরণ। আজকালকার ছেলে বলে সে একটু শৌখীন মেজাজের, একখানা রাঙা গামছা কাঁধে, পান চিবুতে চিবুতে সে যাচ্ছিল সৌরভী জেলেনীর বাড়ী আড্ডা দিতে।

হরিকাকা বললেন—কে, শ্যামাচরণ? টেরি কেটে রাগিণী ভেঁজে যাচ্চ কোথায়? বাপের পয়সাডা কি আজকাল বেড়েচে?

শ্যামাচরণ নিরুত্তর।

—বলি, কানে কথা গেল না? উত্তর দাও।

শ্যামাচরণ অধোমুখে দণ্ডায়মান।

—টেরি ভাঙো আমার সামনে? মুখ বুজে চলে যাও আস্তে আস্তে। কখনো আর অমন না দেখি।

শ্যামাচরণের ধীরে ধীরে প্রস্থান।

একবার গ্রামের বৃদ্ধ প্রসন্ন রায়ের কাছ থেকে হৃদয় ঘোষের ছেলে বাবুরাম দু'টাকার বাঁশ কেনে। প্রসন্ন রায়ের অবস্থা খুব খারাপ, তার ওপর তিনি চোখে ভালো দেখেন না। বাঁশের টাকার জন্যে বাবুরামের বাড়ী হেঁটে প্রসন্ন রায়ের পায়ে ব্যথা হয়ে গেল, তবুও টাকা আদায় করা গেল না। আজ বলে কাল দেবো, কাল বলে শনিবার দেবো। দুমাস এভাবে কাটাবার পরে একদিন প্রসন্ন রায় লাঠি ধরে অতি কষ্টে তার বাড়ী গিয়ে তাগাদা করতেই বাবুরাম রেগে উঠে বুঝি বলেছিল—যান যান ঠাকুর, অত তাগাদা কেন? দুট্যাকার বাঁশ নিয়ে মুই তো আর পেলিয়ে যাই নি। মোর যখন হাতে হবে তখন টাকা দেবো। যান আপনি—

এর উত্তরে প্রসন্ন রায় দু এক কথা কি বলে থাকবেন।

তখন সে প্রায় মারে আর কি প্রসন্ন রায়কে। চেঁচিয়ে উঠে বলে—যাও ঠাকুর, তোমার এক পয়সা ধারিনে! কি করবে করগে যাও।

প্রসন্ন রায় এসে হরি রায়ের দরবারে অভিযোগ জানালেন। হরিকাকা অঘোর মুচিকে হুকুম দিলেন—ধরে নিয়ে এসো তো ব্যাটাকে। দেখি ওর কতদূর প্রতাপ হয়েচে।

অঘোর মুচি বিখ্যাত লাঠিয়াল, সে হুকুম পেয়ে ঘাড় ধরে নিয়ে এল বাবুরাম ঘোষকে।

হরিকাকা বললেন—তুমি প্রসন্নদার বাঁশের টাকা ধারো?

বাবুরাম তখন ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপচে। সে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

—তবে দাও নি কেন?

—আজ্ঞে হাতে নেই।

—তবে গরিব ব্রাহ্মণের বাঁশ কিনতে গিয়েছিলে কেন?

—আজ্ঞে ভুল হয়ে গিয়েচে।

—ও সব বাজে কথা ছাড়ো। আজ তুমি ওঁকে যা তা বলেচো কেন? বড্ড নবাব হয়ে

গিয়েচো নাকি? কানমলা খাও।

তখুনি বাবুরাম কানমলা খেলে বিনা প্রতিবাদে।

—আচ্ছা যাও, এই দু'টাকা আমি এখুনি দিয়ে দিচ্ছি। তুমি আমাকে কাল সন্দের মধ্যে যেখান থেকে পারো টাকা দিয়ে যাবে। যাও চলে যাও।

এই রকম ছিল হরিকাকার বিচার।

গ্রামের বিপদে আপদে হরিকাকা সকলের আশ্রয়স্থল ছিলেন। পর-পীড়নে যেমন দক্ষ, পরোপকারেও তেমনি অগ্রণী। গায়ে শক্তি ছিল অসাধারণ। চামটার বিল করার সময় জমিদারের পক্ষ হয়ে নিজে লাঠি ধরে প্রতিপক্ষ মুসলমানদের হটিয়ে দিয়েছিলেন শোনা যায়। মুসলমানরাও খুব মানতো হরিকাকাকে। তাদের পারিবারিক বিবাদে হরিকাকা সালিশি করে গোলমাল মিটিয়ে দিতেন। পাঁচ গ্রামের মোড়লরা তাঁর কাছে এসে পরামর্শ করতো, খেতে না পেলে এসে ধান নিয়ে যেতো। এমনও হয়েচে অভাবগ্রস্তদের ধান বিলিয়ে দিয়ে নিজের গোলা শূন্য করে ফেলেচেন হরিকাকা, তখন অপরের ওপর জুলুমবাজি করে ধান নিয়ে এসেচেন, দাম দেন নি। পরের স্ত্রী বা পরের মেয়ের দিকে একবার কেউ আড়-চোখে তাকিয়েচে ঘাটের পথে, কিংবা টপ্পা-গানের এক কলি গেয়ে উঠেচে, অমনি সেই মেয়ের কর্তৃপক্ষের অভিযোগে সেই হতভাগ্য প্রণয়লোভী যুবককে চণ্ডীমণ্ডপের সামনের বকুলতলায় যেদিন আগাগোড়া জুতোপেটা করে ছাড়লেন—সেই দিনই হয়তো গ্রামের কুমোর-পাড়ার কেষ্ট কুমোরের বিধবা মেয়ে কুসীর ঘরে তাঁকে মদ খেয়ে ডুগিতবলা বাজাতে শোনা গেল রাত একটা পর্যন্ত।

একদিন হয়তো দেখা গেল কুসীকে নিয়ে নৌকোয় হরিকাকা হার্মোনিয়াম বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে মহকুমা শহরের দিকে বাচ খেলে চলেচেন—সঙ্গে অবিশ্যি বন্ধুবান্ধব দু'চারটি আছে। সেই বন্ধু আবার কেমন? হরে মাইতি, বনোদর ঘরামির বড় ছেলে হাফেজ, রসুকে মাল, দীনু সর্দার ইত্যাদি।

নবীন চক্কত্তি গ্রামের পুরোহিত ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি শুনে ঘাড় নেড়ে বলতেন —নাঃ, রামপ্রাণ দাদার ছেলে। অমন নিষ্টেকাষ্টা হিন্দু এ দিগরে ছিল না। তার ছেলে কিনা মুচি মোচনমান এয়ার নিয়ে মাইফেল করে বেড়াচ্ছে! লজ্জাও করে না!

এর এক হপ্তা পরেই পড়লো দুর্গাপুজো। বারোয়ারী তলায় দুর্গোৎসবের ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ, নৈবেদ্য সাজানো, ভোগ রাঁধা, বলিদানের ব্যবস্থা, প্রসাদ বণ্টন, মায় আরতির আয়োজন, সমাগত মহিলাদের মধ্যে শেতলের ফলমূল বিতরণ প্রভৃতি সমস্ত কাজের মধ্যে রাঙা গামছা মাজায় বেঁধে ঘর্মাক্ত দেহে কে ঐ দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, পৈতে-গলায়-মালা-করে-পরা লোকটি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সকাল থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত?

হরিকাকা।

দীননাথ মুখুজ্জের মাতৃশ্রাদ্ধে ঐ রাঙা গামছা মাজায় বেঁধে, ঐ পৈতে মালা করে গলায় পরে সারাদিন ব্রাহ্মণ-ভোজনের সারিতে ভীষণ খেটে পরিবেশন করচে কে? সামান্য একটু চিনির পানা খেয়ে?—হরিকাকা।

হরিকাকার এই অবস্থা দেখে কে বলবে ইনি কর্মী ও ভক্ত-পুরুষ নন!

মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া হরিকাকার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। যে কোনো মোকদ্দমায় যে কোনো বিষয়ে সাক্ষী দিতে ওঁর মত ওস্তাদ বড় কেউ ছিল না গ্রামে। মহকুমার কোর্টেও সবাই ওঁকে চিনতো। প্রতিপক্ষের উকিলের সাধ্য কি জেরা করে হরিকাকাকে দমিয়ে দেয়। সেই জন্যে মিথ্যে সাক্ষী দিতে সবাই ডাকে ওঁকে। সকলের কাছে খুব আদর। বেশ কিছু আয়ও হয়, আর বিষ্ণু ময়রার দোকানে গরম লুচি, তরকারী, সন্দেশ পেটভরে খাওয়াও চলে।

সারাজীবন এইভাবে কাটিয়ে হরিকাকার এক অদ্ভুত পরিবর্তন এল আটচল্লিশ বৎসর বয়সে। সেই কথাটা বলবার জন্যেই হরিকাকার এই ইতিহাসের অবতারণা।

আমাদের গ্রাম থেকে দুক্রোশ দূরে নিবান্ধামদনগঞ্জের বাঁওড়। এখানে অনেক দিন থেকে এক পুরনো শিবমন্দির আছে। সেবার সংবাদ রটে গেল কোথা থেকে এক ভৈরবী এসে বাঁওড়ের ধারের মন্দিরে রয়েচেন। এও রটে গেল ভৈরবীর বয়স কম, এবং নাকি

সুন্দরী। এই গুজব চাউর হবার পর দলে দলে লোক রওনা দিতে লাগলো ভৈরবীর দর্শনের আশায়।

ভৈরবীর কাছে লোক-যাতায়াতের ফলে কথাটা আরো বেশি রটে গেল যে ভৈরবীটি তরুণী, রূপসী!

হরিকাকা মাছ ধরতে যেতেন নৌকো করে নিবান্ধার বাঁওড়ে। তাঁরা বর্ষার প্রথমে, গাঙে ঘোলা আসবার প্রথম সপ্তাহে, ভীম মাঝির সতেরো পদ ডিঙি ভাড়া করে রাম পাল এবং ছিবাস কর্মকারের সঙ্গে তামাক, টিকে, হুঁকো, কল্কে, ছিপ, হুইল, বোতল ইত্যাদি আয়োজন ও উপকরণ সমভিব্যাহারে প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে নিবান্ধা-মদনগঞ্জের খেয়াঘাটের বাঁ পাশে একটা পুরনো জামগাছের তলায় মাছ ধরতে বসতেন। এবারও গিয়েছিলেন। গিয়ে সুন্দরী ভৈরবীর কথা শুনেছিলেন নিশ্চয়।

হরিকাকা নাকি একাই একদিন মন্দিরে যান ভৈরবীকে দর্শন করতে। যাঁরা হরি-কাকাকে জানেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন হরিকাকার সেখানে যাওয়াটার আধ্যাত্মিক কৌতূহল ততটা ছিল না, যতটা ছিল একটি নিঃসহায় সুন্দরী নারীকে ভালো ক'রে দেখবার ও ফাঁদে ফেলবার দুষ্ট মতলব।

কিন্তু এই যাওয়ার ফল কি হয়েছিল, সেটা এ অঞ্চলের লোকের কাছে এখনো মানুষের জীবনের একটি রহস্যময় ঘটনা হিসেবে বিখ্যাত।

এই সময়টা আমি মহকুমার বড়স্কুলে ভর্তি হয়ে স্কুলের বোর্ডিং-এ চ'লে যাই। পুজোর ছুটিতে বাড়ী এসেচি, হরিকাকার মস্ত বড় চন্ডীমণ্ডপের সামনে দিয়ে আসবার সময় দেখি বকুলতলায় লোকজন নেই, চন্ডীমন্ডপের আগড় বন্ধ, বকুলতলায় কাঠের বেঞ্চিগুলো পাতা নেই—যেন ভোঁ ভাঁ—ব্যাপার কি?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবচি, এমন সময় বাড়ীর মধ্যে থেকে একটা কাঠা হাতে রাঙা খুড়ীমা বার হয়ে এলেন! আমাকে সদর রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন—কে, নিপু? বাবা এলি? ভালো আছিস? আর বাবা, কি দেখচো, আমার যা হবার খুব হয়ে গিয়েচে—

আমি এত অবাক হয়ে গিয়েচি যে প্রণাম করতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম। রাঙা খুড়ীমার তো বিধবার বেশ নয় দেখচি। তবে কান্নার কারণ কি? বললাম—কি হয়েচে খুড়ীমা? কাকা কোথায়?

—সে সব শুনবে বাড়ী গিয়ে। সবাই জানে। আর বাবা, আমার কপালে যা হবার ছিল, খুব হল।

বাড়ী গিয়ে প্রথমেই মাকে জিজ্ঞেস করলাম—হরিকাকার কি হয়েচে মা? রাঙা খুড়ীমা কাঁদছিলেন কেন?

—ভালোই হয়েচে তো। রাঙাদিদির মিথ্যে কান্না।

—কি হয়েচে?

—সন্নিসি হয়ে গিয়েচে।

—কোথায়?

—তা কে জানে। সন্ধান নেই!

—সে কি!

—অনেক সন্ধান করা হয়েচে। কেউ কিছু জানে না।

—হরিকাকা সন্নিসি হয়েচে, একদম নিরুদ্দেশ, কদ্দিনের কথা এসব?

—মাস দুই হল একদম নিরুদ্দেশ।

—তার আগে কোথায় ছিলেন?

—নিবান্ধার সেই ভৈরবীর নাম শুনে গিয়েছিলি?

—মনে হচ্চে কথাটা।

—সেই ভৈরবীর ওখানে পড়ে থাকতো।

—ভৈরবী কোথায়?

—নিবান্ধার মন্দিরেই আছে। কালও আমাদের পাড়া দিয়ে ভিক্ষে করে গেল। রূপে গাঁ আলো করে গেল একেবারে। হরি ঠাকুরপো ভৈরবীর কাছে মন্ত্র নিয়ে না কি নিয়ে

ভগবান জানেন, একদম উধাও। রাঙাদিদি কেঁদে কেঁদে খুন—একটা কথাও বলে যায় নি বেচারীকে। একে ছেলেপুলে নেই, কি বিপদে যে পড়েচে!

না, কেউ কোনো অপবাদ রটাতে পারে নি হরিকাকার নামে, গাঁয়ে সকলের মুখেই এক কথা। ধন্য ভৈরবীর ক্ষমতা! এমন লোকের এমন অদ্ভুত পরিবর্তন বুড়ো বয়েসে। সারা জীবন মদ-ভাং খেয়ে। সুন্দরী ভৈরবী তো এখানেই রয়েচে! কারো কিছু বলবার উপায় কি? ধন্য ধন্য করচে সবাই এবং আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার, রাঙা খুড়ীমার ওপর কারো তেমন সহানুভূতি নেই। বেশ তো, একটা অসৎ লোকের যদি সৎ পথে পা দেবার প্রবৃত্তি হয়ে থাকে, তাতে রাঙাদিদি দুঃখ না করে বরং আহ্লাদ করুন—ভাবটা এই রকম সাধারণের মনের।

ক্রমে ক্রমে সব শুনলাম ঘটনাটা। তবে একটা কথা, এই সব ঘটনার পক্ষে সাক্ষী কেউ ছিল না। ভৈরবীর সঙ্গে হরিকাকার সাক্ষাৎকারের ইতিহাস চিরকাল লুপ্ত থেকে যেতো, যদি না সেখানে আরামডাঙার মধু হাড়ি উপস্থিত থাকতো। জনকয়েক লোক সব সময়েই ভৈরবীর ওখানে জুটতো গাঁজা খাওয়ার লোভে।

প্রথম দর্শনের ঘটনাটা এই রকম ঘটে—

ভৈরবী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে হরিকাকার দিকে।

হরিকাকা খানিকটা অবাক হয়ে চেয়ে ছিলেন ভৈরবীর দিকে। মুখে খানিকক্ষণ কথা ছিল না।

ভৈরবী বললে—কোথা থেকে আসা হচ্চে?

—আজ্ঞে, কইখালি থেকে।

—ও।

—আপনাকে দর্শন করতে এলাম।

—বোসো বাবা।

—বসি।

—কি কর?

—আজ্ঞে, বিষয়-কর্ম করা হয়।

—ব্রাহ্মণ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কুলীন ব্রাহ্মণ?

—হ্যাঁ মা, আমার নাম হরিপ্রাণ মুখুজ্জে, তিনপুরুষে ভঙ্গ। সদানন্দ মুখুজ্জের সন্তান। বাঁওন-ঘাটি গাঁই।

—আমাকে প্রণাম করলে কেন বাবা, তুমি কুলীন ব্রাহ্মণ? আমি তোমার কত ছোট। বলেই ভৈরবী নাকি হরিকাকাকে গড় হয়ে প্রণাম করেছিল।

হরিকাকা নীরবে সেখানে বসে ছিলেন অনেকক্ষণ, এমন কি মধু হাড়ির দল যখন সন্ধ্যার আগে সেখান থেকে উঠে চলে এল—তখনো হরিকাকা সেখানে চুপ করে বসে আছেন। অনেক রাত্রে সেদিন তিনি বাড়ী এলেন, চোখে কেমন যেন ফ্যালফেলে দৃষ্টি। রাঙা খুড়ীমার মুখে একথা শোনা। সারারাত হরিকাকা কেবল নাকি পায়চারি করেচেন আর বার বার বাইরের দাওয়ায় গিয়ে বসেচেন। জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, বড্ড গরম হচ্চে। সকালে উঠেই কোথায় চলে গেলেন—দুপুর গড়িয়ে গিয়েচে তখন বাড়ী এলেন। কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাব। খুড়ীমাকে বললেন—দশটা টাকা দিতে পারো?

—কেন গা?

—ঠাকুরের পুজো দেবো।

—কি ঠাকুরের?

—নিবান্ধার মন্দিরে যে ঠাকুর ছিল, এ্যাদ্দিন কেউ জানতো না। ভৈরবী জাগ্রত করেচে সেই ঠাকুর।

—ভৈরবী তোমায় তুকগুণ করেনি তো?

—পাগল!

—আমার ভয় করচে কিন্তু।

—যেদিন বুঝবে সেদিন আর ভয় করবে না। ভয় কিসের? কোনো ভয় নেই।

এর কয়েক মাস পর পর্যন্ত হরিকাকা রোজই বাড়ী আসতেন, কিন্তু ক্রমশ তাঁর ধরন-ধারণ বদলাতে লাগলো। অন্য কোনো বাইরের পরিবর্তন—গেরুয়া বস্ত্র ধারণ, বা নিরামিষ আহার—এসব নয়। মদ খাওয়া একদম বন্ধ হল। বাজে লোক নিয়ে আড্ডা আদৌ দেন না। পরকে শাসন করা, চোখ রাঙানো ভুলেই গেলেন।

একদিন ঘাটের পথে নির্জন বাঁশবনে সন্ধ্যার কিছু আগে রামযাদু জেলের বিধবা অল্পবয়সী পুত্রবধূ তার আড়াই বছরের ছেলের সঙ্গে নদীর ঘাট থেকে ফিরচে—এমন সময় হঠাৎ হরিকাকাকে সামনে দেখে মেয়েটি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। হরিকাকার ভয়ে পাড়ার ঝি-বৌয়েরা অনেকদিন থেকে একা নদীর ঘাটে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, একথাটি আগে বলা দরকার।

মেয়েটি থমকে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সর্বনাশ! হরি মুখুজ্জে যে এগিয়ে আসেন তার দিকে! খোকা পিছিয়ে এসে ততক্ষণ মায়ের আঁচল মোক্ষম জড়িয়ে ধরেচে, তার ভীত দৃষ্টি হরিকাকার মুখের দিকে নিবদ্ধ।

হরিকাকা কিন্তু মেয়েটির কাছে এগিয়ে এসে সস্নেহ সুরে বললেন—মা, ভয় কি? নির্ভয়ে ঘাটে পথে বেরিও মা। এই খোকাকে কষ্ট দিয়ে কেন সঙ্গে এনেচ? ও কি এতটা পথ হাঁটতে পারে? ছিঃ—কোন ভয় নেই। তুমি আমার মেয়ের সমান। আমি তোমার বাবা, বাবাকে দেখে ভয় কি মা? যাও।

মেয়েটি হেঁট হয়ে হরিকাকাকে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এসে পাড়ার মেয়ে-মহলে একথা জানায়। এর দুতিন দিন পরে রামযাদু একটা কাতলা মাছ হাতে হরিকাকার বাড়ী এসে তাঁকে দিয়ে বললে—আপনার মেয়ে পেটিয়ে দিয়েচে। বললে, মোর বাবা-ঠাকুরকে দিয়ে এসো। তা নেন দয়া ক'রে।

হরিকাকা চন্ডীমন্ডপে বসে তেল মাখছিলেন, কাছে নিরু গোয়ালিনী বসে দুধের হিসাব করছিল, চোখ তুলে বললেন—কি? কিসের মাছ?

—আপনার মেয়ে পেটিয়েচে। জেয়ানাতে পেয়েলাম, আপনার মেয়ে বললে, বাবাকে দিয়ে এসো—

—ও হবে না।

—কেন বাবা ঠাকুর?

—গরিব লোকের মাছ আমি বিনি পয়সায় নিতে পারবো না।

এ ধরনের কথা এ অঞ্চলে কেউ কখনো বলে না, বিশেষ করে হরিকাকা তো এমন প্রকৃতির লোকই নয়। রামযাদু একটু অবাক না হয়ে পারলে না। তবুও মাছটা সে নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল, হরিকাকা বললেন—না, শোন, ও রামযাদু, মাছ আমি নেবো না। ওর ন্যায্য দাম দেওয়ার আমার ক্ষমতা নেই। সুতরাং মাছও আমি নেবো না—

শেষ পর্যন্ত রামযাদুকে মাছ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হল। রামযাদুর স্ত্রী এর পর এক-সময়ে এসে খানিকটা কাটা মাছ রাঙা খুড়ীমার কাছে লুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

এই রকম দু'একটা নতুন ধরনের কাজ করার পর হরিকাকা একদিন সকালে উঠে ভৈরবীর মন্দিরে চলে গেলেন—আর ফিরলেন না। ভৈরবীর কাছে সন্ধান নেওয়া হয়েছিল। সেখানকার সকলেই বললে, ধোপার বাড়ী কাপড় দেবেন বলে তিনি সকাল সকাল উঠে চলে গিয়েছিলেন।

অনেক দিন কেটে গেল তারপর।

রাঙা খুড়ীমা আরো কিছুদিন পরে বাপের বাড়ী চলে গেলেন। বছর-দুই পরে তাঁর এক ভাইপো এসে এখানকার বিষয়-আশয় বিক্রী করে চলে গেল, তার মুখে শুনলাম রাঙা খুড়ীমার মৃত্যু হয়েচে।

জিনিসটা মিটে গেল। আমাদের গ্রামের মধ্যে হরিকাকার ইতিহাস একটা মনোহর

কাহিনীতে পর্যবসিত হয়ে গেল। ওদের ভিটেতে ঘন জঙ্গল হয়ে গেল, দিনমানে সেখানে নাকি বাঘ লুকিয়ে থাকে, শুধু দাঁড়িয়ে রইল সিংদরজাটা—কাঠ-থামালের মাথায় দুটো বড় জিউলি গাছ আর একটা অশথ গাছ নিয়ে। কাঠের কবাট দুটোও কারা খুলে নিয়ে গেল কিছুকাল পরে।

আমি কলকাতায় চাকরি করি, সস্তা ভাড়ায় দেশভ্রমণ করতে বেরিয়েচি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। সারনাথ যাবার পথে পাঁড়েপুর নেমেচি আমরা, সেখানকার বিখ্যাত ক্ষীরের পানতুয়া খাবার জন্যে। রামলীলা উৎসবের জন্যে পাঁড়েপুর চৌমাথার মোড়ে একটা উঁচু মাচা বেঁধেচে, সেটা রঙিন কাগজের মালায় সাজাবে, লোকজনও অনেক জমেচে তার চারিধারে। আমাদের টাঙাওয়ালা দুজন বললে—বাবুজি, টাঙা এগিয়ে গাছতলায় রাখি।

—কেন?

—ইঁহাপর বহুৎ ভিড় জমতা। লেকিন দেরি মাৎ কিজিয়ে আপলোগ, সাম হো যায়গা—

আধঘণ্টা পরে যখন পেট পুরে সস্তা ক্ষীরের পানতুয়া খেয়ে আমরা সাতজন বন্ধু টাঙার সন্ধান করলাম, টাঙা আর নেই! সে কি, টাঙা গেল কোথায়?

হরিধন বললে—এগিয়ে দেখা যাক আরো। গাছতলায় থাকবে বলেছিল—এই তো গাছতলা। দেখি কতদূর গেল।

রশি-দুই পথ এগিয়ে বাঁকের মাথায় টাঙা দুখানা দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল। সেই-খানে গাছতলায় এক সাধুর আসনের চারপাশে অনেকগুলি লোক জুটেচে, টাঙাওয়ালা দুজনও সেখানে জমেচে।

আমরা বকাবকি করতে একজন টাঙাওয়ালা বললে—বাবুজি, বাঙালী সাধু হ্যায়!

সবাই কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। কোথায়, ওই সাধু নাকি? বাঙালী?

এইভাবে আবার হরিকাকার দেখা পেলাম।

আমি চিনি নি, তিনি আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—বিষ্টু দাদার ছেলে অমল না?

আমি অবাক। বন্ধুরা অবাক। আমি কখনই এই অপরিচিত পরিবেশে এই জটা-জুটধারী দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ সাধুকে আমাদের সেই হরিকাকা বলে চিনে নিতে পারতাম না, দীর্ঘ তেরো চোদ্দ বছর পরে। কিন্তু তাঁর গালের আঁচিল আমার অত্যন্ত পরিচিত, শৈশবের আবেষ্টনীতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে ফেললো। রাঙা খুড়ীমার কান্নাভরা চোখ মনে এল, কি জানি কেন ওঁদের সেই জঙ্গলে-ভরা সিংদরজাটার কথা মনে হল। আমিও দেশের বাড়ী ছেড়েচি পাঁচ ছ' বছর। হঠাৎ এভাবে বাল্যের হরিকাকার দেখা পেয়ে সারনাথ ভুলে গেলাম, বন্ধুবান্ধবদের ভুলে গেলাম, গণেশ মহল্লার প্রসিদ্ধ রামলীলা উৎসবের কথা ভুলে গেলাম। বন্ধুদের বললাম—তোমরা সারনাথ যাও, আসবার সময় আমায় নিয়ে নিও—কিংবা আমি আজ না হয় পাঁড়েপুর থেকেই যাই—

ওরা বললে—কোথায় থাকবি এখানে?

—একটা হোটেল কিংবা সরাই—

—না, সে সবে দরকার নেই! আচ্ছা তুমি গল্প কর দেশের লোকের সঙ্গে। যাবার সময় যেও।

ওরা চলে গেল। নীল প্রশান্ত আকাশ। বড় আমগাছের ছায়াভরা বীথি। বুদ্ধদেবের চরণপূত সারনাথ কাছে। সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ মাতাল হরিকাকা সন্ন্যাসী। কি অদ্ভুত লাগছিল আজ'কর এই দিনটা।

আমি আমতলায় বসে পড়লাম। বৃদ্ধ সাধু বললেন—তুমি এখানে কি ভাবে?

—সারনাথ যাচ্ছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে।

—কি কর?

—টেকনিকেল স্কুলে মাস্টারি করি বালিগঞ্জে। আপনি কি এখানে থাকেন?

—না। দিন পনেরো আগে এসেচি কাশী থেকে।

কত কথা মনে হচ্ছিল। কোন্‌টা আগে বলবো, কোন্‌টা জানতে চাইব? রাঙা কাকীমার মৃত্যুসংবাদ দিলাম। হরিকাকার মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হল না। চুপ করে রইলেন। বললেন—তোমার বাবা কেমন আছেন?

—মারা গেছেন আজ সাত বছর।

—গাঁয়ের আর সবাইকার কি খবর?

মোটামুটি বললাম যতদূর সম্ভব। গত পাঁচ বছরের খবর আমিও ঠিকমত জানি না বললাম। বেশী কিছু কথা হবার পূর্বেই বন্ধুরা পাছে এসে পড়ে—এই ছিল আমার ভয়। কোন্ কথাটা আগে জিগ্যেস করবো? হঠাৎ বললাম—কেমন আছেন হরিকাকা? হরিকাকা ধীরে ধীরে বললেন—খুব শান্তিতে, খুব আনন্দে আছি বাবা।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—অনেক অপরাধ করেছিলাম জীবনে না বুঝতে পেরে। তিনি দয়াময়, সব ক্ষমা করবেন। আমরা তাঁর সন্তান। তিনি না ক্ষমা করলে যাচ্ছি কোথায়।

—এখন এখানেই থাকবেন?

—বাবা, আমরা এখনো বহুদক। কুটীচকে পেঁাছতে এখনো দেরি আছে। কবে কোথায় থাকি ঠিক নেই। তিনি যেখানে নিয়ে যান সেখানে যাবো। তিনি এখানে এনেছিলেন তাই তোমার সঙ্গে দেখা হল।

—গাঁয়ে ফিরতে ইচ্ছে হয় না কাকাবাবু?

—আগে আগে হত, এখন আর হয় না বাবা। তোমার খুড়ীমা চলে গিয়েচেন, এখন আর কোন বন্ধনই নেই। কি দেখতে যাবো?

—খুড়ীমা মারা গিয়েচেন আমার মুখে শুনলেন তো?

—না।

—কেউ চিঠি লিখেছিল?

—না। থাক সে কথা বাবা।

ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধবদের দল এসে পড়লো। হরিকাকাকে তারা পাঁড়েপুরের পানতুয়া কিনে দিলে এক ভাঁড়। হাসিমুখে গ্রহণ করলেন। আমরা সবাই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলাম। ওঁকে একা গাছতলায় ছেড়ে দিয়ে আসতে ইচ্ছে করছিল না। আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করলেন। টাঙায় উঠবার সময় আমার চোখে জল এল।

এমনিই হয়

আমার ছেলেবেলায় 'কামার-বাড়ী' বলতে আমাদের গাঁয়ে সাতু কর্মকারের বড় কোঠাবাড়ীটা বোঝাতো।

অন্য যে সব কর্মকার ছিল আমাদের গ্রামে, তাদের অবস্থা ছিল গাঁয়ের আর পাঁচজনেরই মত। কিন্তু ওদের ঘোড়ার গাড়ীর কারখানা ছিল, কলকাতায় বাড়ী ছিল। আমাদের গরিব গাঁয়ের লোকের পক্ষে স্বপ্ন।

ওদের বাড়ীটা বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময় চাবি-বন্ধ থাকতো। এক-আধ মাসের জন্যে সাতকড়ি কর্মকার স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ী করে বাড়ী আসতো।

এই বাড়ী আসার কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি।

সাতকড়ি ও নিবারণ দুই ভাই। তারা বছরের মধ্যে এগারো মাস কলকাতায় থাকে। বাধ্য হয়ে থাকতে হয়, ব্যবসার খাতিরে। কিন্তু তারা যে এ গাঁয়ের নামকরা, রাশভারী, অনেক লোকের চেয়েই বড়, সব বিষয়েই বড়লোক—এটা না দেখাতে পারলে গ্রামের লোকে বুঝবে কেন?

কিন্তু তার অবসর মেলে না। মেলে বছরের মধ্যে মাত্র একটি মাস।

সুতরাং এই একমাসের মধ্যে চালে চলনে, পোশাকে পরিচ্ছদে, আচারে ব্যবহারে, গ্রামের

—না। দিন পনেরো আগে এসেচি কাশী থেকে।

কত কথা মনে হচ্ছিল। কোন্‌টা আগে বলবো, কোন্‌টা জানতে চাইব? রাঙা কাকী-মার মৃত্যুসংবাদ দিলাম। হরিকাকার মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হল না। চুপ করে রইলেন। বললেন—তোমার বাবা কেমন আছেন?

—মারা গেছেন আজ সাত বছর।

—গাঁয়ের আর সবাইকার কি খবর?

মোটামুটি বললাম যতদূর সম্ভব। গত পাঁচ বছরের খবর আমিও ঠিকমত জানি না বললাম। বেশী কিছু কথা হবার পূর্বেই বন্ধুরা পাছে এসে পড়ে—এই ছিল আমার ভয়। কোন্ কথাটা আগে জিগ্যেস করবো? হঠাৎ বললাম—কেমন আছেন হরিকাকা? হরিকাকা ধীরে ধীরে বললেন—খুব শান্তিতে, খুব আনন্দে আছি বাবা।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—অনেক অপরাধ করেছিলাম জীবনে না বুঝতে পেরে। তিনি দয়াময়, সব ক্ষমা করবেন। আমরা তাঁর সন্তান। তিনি না ক্ষমা করলে যাচ্চি কোথায়।

—এখন এখানেই থাকবেন?

—বাবা, আমরা এখনো বহুদূর। কুটীচকে পেঁছিতে এখনো দেরি আছে। কবে কোথায় থাকি ঠিক নেই। তিনি যেখানে নিয়ে যান সেখানে যাবো। তিনি এখানে এনেছিলেন তাই তোমার সঙ্গে দেখা হল।

—গাঁয়ে ফিরতে ইচ্ছে হয় না কাকাবাবু?

—আগে আগে হত, এখন আর হয় না বাবা। তোমার খুড়ীমা চলে গিয়েচেন, এখন আর কোন বন্ধনই নেই। কি দেখতে যাবো?

—খুড়ীমা মারা গিয়েচেন আমার মুখে শুনলেন তো?

—না।

—কেউ চিঠি লিখেছিল?

—না। থাক সে কথা বাবা।

ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধবদের দল এসে পড়লো। হরিকাকাকে তারা পাঁড়েপুরের পানতুয়া কিনে দিলে এক ভাঁড়। হাসিমুখে গ্রহণ করলেন। আমরা সবাই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলাম। ওঁকে একা গাছতলায় ছেড়ে দিয়ে আসতে ইচ্ছে করছিল না। আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করলেন। টাঙায় উঠবার সময় আমার চোখে জল এল।

এমনিই হয়

আমার ছেলেবেলায় 'কামার-বাড়ী' বলতে আমাদের গাঁয়ে সাতু কর্মকারের বড় কোঠাবাড়ীটা বোঝাতো।

অন্য যে সব কর্মকার ছিল আমাদের গ্রামে, তাদের অবস্থা ছিল গাঁয়ের আর পাঁচজনেরই মত। কিন্তু ওদের ঘোড়ার গাড়ীর কারখানা ছিল, কলকাতায় বাড়ী ছিল। আমাদের গরিব গাঁয়ের লোকের পক্ষে স্বপ্ন।

ওদের বাড়ীটা বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময় চাবি-বন্ধ থাকতো। এক-আধ মাসের জন্যে সাতকড়ি কর্মকার স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ী করে বাড়ী আসতো।

এই বাড়ী আসার কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি।

সাতকড়ি ও নিবারণ দুই ভাই। তারা বছরের মধ্যে এগারো মাস কলকাতায় থাকে। বাধ্য হয়ে থাকতে হয়, ব্যবসার খাতিরে। কিন্তু তারা যে এ গাঁয়ের নামকরা, রাশভারী, অনেক লোকের চেয়েই বড়, সব বিষয়েই বড়লোক—এটা না দেখাতে পারলে গ্রামের লোকে বুঝবে কেন?

কিন্তু তার অবসর মেলে না। মেলে বছরের মধ্যে মাত্র একটি মাস।

সুতরাং এই একমাসের মধ্যে চালে চলনে, পোশাকে পরিচ্ছদে, আচারে ব্যবহারে, গ্রামের

লোককে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াই চাই যে ওরা বড়লোক। কলকাতায় তাদের কি আছে না আছে, গ্রামের লোক দেখতে যাচ্ছে না।

ওরা বেশ তৈরী হয়ে আসতো বড়-মানুষি দেখাবার জন্যে। যা দেখাবার এই একমাসের মধ্যেই দেখিয়ে যেতে হবে। ঐশ্বর্যের পাঁচিল তুলে গ্রামের রায়মশায়, গাঙ্গুলি মশায়, বোসজা, দত্ত মশায়, ননী পালিত, গদাধর বিশ্বাসদের সঙ্গে নিজেদের পৃথক করে রাখতে হবে এবং বুঝিয়ে দিতে হবে যে তোমরা গাঁয়ে বসে যতই জমি-জমা নাড়ো আর প্রজা শাসন করো—আসলে তোমরা আমাদের তুলনায় কিছুই নয়।

এই ঘোষণা করবার আর্টটা ছিল ওদের চমৎকার। বিদেশে যারা অবস্থাপন্ন হয়ে বাস করে, তারা নিজেদের গ্রামে এসে নিজেদের বড়ত্ব প্রচার করবার যে সাধারণ প্রণালী অবলম্বন করে, সেটা হচ্ছে পুজোর সময় বাড়ী এসে ধুমধামে দুর্গোৎসব করা। কিংবা একটা পুকুর কাটা। কিংবা দুটোই একসঙ্গে।

এদের প্রণালী ছিল আরো সূক্ষ্ম। তত ব্যয়সাধ্য নয়, অথচ আবেদনের গুরুত্বে সফলতর।

স্টেশনে নেমে এরা দু'খানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে বাড়ী আসতো, সঙ্গে থাকতো দুটি চাকর, একটা ঠাকুর, একটা ঝি। দামী বিছানাপত্রের মোট ঘোড়ার গাড়ীর ছাদে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। ঠাকুর-চাকরেরা বসে থাকতো ছাদে কোচম্যানের সঙ্গে। ওদের পরনে থাকতো ধপধপে ফর্সা কাপড়। একটা ঝুড়িতে নানারকমের ফল বোঝাই থাকতো। গাড়ী থেকে জিনিসপত্র নামবার সময় নিবারণ হেঁকে বলতো—ওরে, ফলের ঝুড়িটা সাবধানে নামা। রাঁচির পেঁপেগুলো যেন নষ্ট না হয়ে যায়—আনারস ক'টা দেখেশুনে নামা—

চারিপাশে ইতিমধ্যে গাঁয়ের ছেলেপিলেরা তৎক্ষণে ভিড় করত। দু-একজন পথ-চলতি লোকও হাঁ করে তাকিয়ে দেখতো ভিড়ের মধ্যে থেকে।

তাদের মধ্যে হয়তো কেউ বলতো—কর্মকারমশাই বাড়ী আলেন?

হয়তো সাতকড়ি বলতো—তা তো এলাম। কি যে কষ্ট কলকাতা থেকে জিনিসপত্তর নিয়ে আসা, তবু তো সেকেন ক্লাস রিজার্ভ করে এলাম। তাও মধুপুরের কুঁজোটা নামাতে গিয়ে ভেঙে গেল—ও ঠাকুর, এই বাক্সটা ধরে নামাও, কাঁচের বাসন আছে—

এ প্রণালীর আবেদন সূক্ষ্মতর, কিন্তু আদৌ ব্যয়সাধ্য নয়।

আমরা যে যার বাড়ী এসে ঘটা করে বর্ণনা করতাম আমাদের গরিব বাপ-মায়ের কাছে ওদের ঐশ্বর্যবহুল সাড়ম্বর গৃহ-প্রবেশ। লোকের মুখে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়তো। তারপর ওরা যতদিন থাকতো, প্রতিদিনে নানা ঘটনায় ওরা বুঝিয়ে দিত ওদের সঙ্গে এ গ্রামের লোকের তফাৎ কতখানি।

সাতকড়ি ছিল বড় ভাই, নিবারণ ছোট। নিবারণের ছেলে ছিল মাত্র একটি, তার নাম সতীশ। তখন তার বয়েস উনিশ কুড়ি। পড়াশুনো কতদূর করেছিল জানি নে, বাবা ও জ্যাঠামশাইয়ের ব্যবসায়ে শিক্ষানবিসি করতো সে সময়। সাতকড়ি ছিল নিঃসন্তান।

দুই বড়লোক ভায়ের এই এক ছেলে, তার কাপড় জামা জুতো যে ধরনের ছিল আমরা তেমন কখনো চক্ষেও দেখি নি।

হয়তো আমরা তাকে ঘিরে হাঁ করে ওদের বাড়ীর সামনে পথে দাঁড়িয়ে কলকাতার গল্প শুনচি, ওর জ্যাঠামশায় হেঁকে ডাক দিলে—ও সতে, লুচি জুড়িয়ে গেল যে, ঠাকুর কতক্ষণ বসে থাকবে তোমার খাবার নিয়ে—সকলের খাওয়া হয়ে গেল, তোমার কেবল গল্প—

আমাদের গ্রামের অনেকে ওদের বৈঠকখানায় গিয়ে বসতেন, ওরা বাড়ী এলে। সাতকড়ি দামী শাল গায়ে দিয়ে, আট আঙুলে দশটা সোনার আংটি পরে, রুপোর গড়গড়া টানতে টানতে তাঁদের সঙ্গে কলকাতার ব্যবসার গল্প করতো, তার মধ্যে লাখ দুলাখের নীচে কোনো টাকার অঙ্কই ছিল না। আমাদের পাড়ার রায় মহাশয়, বিশ্বাস মশায়, গাঙ্গুলি মশায়রা হাঁ করে অবাক হয়ে শুনতেন, আর বোধ হয় ভাবতেন—এত টাকাও জগতে আছে?

সাতকড়ি কর্মকার এই ভাবে গল্প শুরু করতো।

—আসুন গাঙ্গুলি দাদা, প্রাতঃপ্রণাম! বসুন। চা খাবেন?

—না ভায়া, এখনো আহ্নিক হয় নি, থাক।

—তাহলে সন্দের সময় অবিশ্যি এসে চা খেয়ে যাবেন। ভালো চা। আমার এক খদ্দের চা-বাগানের মালিক, রায় বাহাদুর বটকৃষ্ণ দত্ত, লেবুবাগান। তিনিই পাঠিয়ে দেন ফি বছর। বাজারে এ চা নেই, এর নাম অরেঞ্জ পিকো—চা গাছের পাতার কুঁড়ি থেকে হয়—

অনিল চক্রবর্তী বল্লেন—তারপর, নিবারণ, কেমন কাটলো এবার কলকাতায়?

নিবারণ গলা ঝেড়ে নিয়ে গম্ভীর সুরে বললে—কাটলো ভালোই। তবে খাটতে খাটতে জান বেরিয়ে গিয়েচে। এখানে এসে একটু জিরিয়ে নিয়ে বাঁচলাম।

—কেন?

—দাদা, সে কথা আর বলবেন না। পঞ্চাশ হাজার টাকার লোহা কিনে ফেলে রেখে এসেছিলাম পাটনায় এক হিন্দুস্থানী লোহাওয়ালার দোকানে। তারপর সে লোহা আর আসে না। তিনবার সেজন্যে ছুটোছুটি করলাম সেখানে। আমাকে পাটনার সকলেই চেনে, সকলে খাতির করে। বাজারে বেরুলেই বলবে, আসুন বাবু। বাবু ছাড়া নাম ধরে কেউ ডাকবে না। তারা বললে—এমন জুয়াচোরের ফাঁদেও আপনি গিয়ে পড়েচেন! সে-লোহা বেশি দাম পেয়ে ও অন্য জায়গায় বেচে দিয়েছে—

—তারপর?

—তারপর নালিশ মোকদ্দমার ভয় দেখিয়ে, উকিলের চিঠি দিয়ে অনেক কান্ড করে তবে সে লোহা উদ্ধার করলাম। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল তাতে—

সাতকড়ি অমনি উঁচিয়ে বসে আছে। সে অমনি বলবে—টাকা খরচের কথা আর শুনে কি হবে ভায়া। আমাদের পড়তা পড়েচে খারাপ। শুধু বাজে টাকা-খরচ লেগেই আছে। পোস্তায় লঙ্কার মহাজন আছে এক মাদ্রাজী। তার হয়ে মাল গস্ত করতে গেলাম চাটগাঁয়ে। জুড়ন বণিক আর হারাধন বণিক চাটগাঁতে বড় আড়ৎদার। দুজনের আড়ৎ থেকে সত্তর হাজার টাকার লঙ্কা খরিদ করলাম। হুন্ডিতে টাকা দেবো। হুন্ডি বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে মাদ্রাজী টাকা পাঠায় না। আমি ঠায় চাটগাঁয়ে বসে। টেলিগ্রাম করলাম, জবাব নেই। তখন নিজে কলকাতায় এসে মহাজনের সঙ্গে দেখা করে খুব বকাঝকা দিলাম। তা বললে, বাবু, কসুর হয়েচে, ছেলের অসুখের খবর পেয়ে দেশে চলে গিয়েছিলাম, এই নিন্ টাকা। আবার সেই টাকা নিয়ে চাটগাঁ ছুটি। টাকা দিতে যাবো, অন্য আড়ৎদারেরা ডেকে বললে, বাবু, মাল নেবেন না। বাজার পড়ে গিয়েচে। কলম্বো থেকে লঙ্কার অর্ডার একদম বন্ধ। বায়না যা দিয়েছেন, যায় যাক্। মহাজনের টাকা বাঁচান। আমি জুড়ন বণিকের সঙ্গে দেখা না করে সেই রাতেই চলে এলাম চাটগাঁ থেকে—

এইবার নিবারণ একটা কিছু বলবে ঠিক করে বসে ছিল কিন্তু চাকর এসে জানালে, ভেতরে তাকে মা কি জন্যে ডাকচেন। বাধ্য হয়ে তাকে উঠে যেতে হল।

সাতকড়ি কর্মকার সম্বন্ধে একটা গল্প আজও আমাদের গ্রামে প্রচলিত আছে।

একবার ওরা বাড়ী এসেচে। সাতকড়ি রাস্তায় পায়চারি করচে গায়ের শাল বাড়ীতে খুলে রেখে এসে, এমন সময় পাশের গ্রাম বেলডাঙার হীরু বাগদি চুপড়ি মাথায় কই মাগুর বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছে। সাতকড়ি ডেকে বললে—এই, কি মাছ?

হীরু বাগদি ভিন্ গাঁয়ের লোক, সে সাতকড়িকে চিনতো না। গ্রামে সাধারণত ওরা মাছ বেচতে চায় না। কারণ গ্রামের লোকে ঠিক দর দিতে চায় না, তার ওপর বাকী রাখে। তিন হপ্তা হাঁটাহাঁটি না করলে সে দাম আদায় হয় না। কাজেই সে বললে—মাছ হাটে নিয়ে যাচ্ছি, এখানে মুই নামাবো না।

—নামাও।

কণ্ঠস্বরে গম্ভীর কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট প্রকাশে বোধ হয় ভয় পেয়েই হীরু বাগদি মাছের চুপড়ি রাস্তার ওপরে নামালো। অমনি চারিধারে ছেলের দল ছুটে গেল মজা দেখবার জন্যে।

সাতকড়ি হীরে-বসানো আংটি দিয়ে মাছ দেখিয়ে বললে—কত দর?

—দর কম হবে না বাবু! হাটের যা দাম তাই নেবো। মাগুর ন'আনা আর কই আট আনা—

সাতকড়ি আংটি নেড়ে বললে—দশ-বিশ হাজারে মরিনে, দশ-বিশ হাজারে মরিনে—

যত মাছ আছে সবগুলো নামিয়ে দিয়ে যাও। হীরু বাগদি এতক্ষণ মানুষ চেনে নি। সামান্য এক আধ সের মাছ কিনতে গিয়ে দশ বিশ হাজারের কথা বলে, এমন লোকও সে কখনো দেখেনি। মাছ নামিয়ে দিয়ে সে তখন পালাবার পথ খুঁজে পায় না।

বাইরে এসে আমাদের বললে—উনি কেডা গো?

আমরা বললাম—কামারবাড়ীর কর্তা।

—তা কি আর মুই চিনি? বাবা! বলে কিনা, দশ-বিশ হাজারে মরিনে। মরা বাঁচার কথা মুই কি বললাম—মাছ কিনতি এসে অমন কথা বলবার দরকারডাই বা কি। মুই আর আসবো না ইদিকি মাছ বেচতি।

বছর দুই পরে ওরা সতীশের বিয়ে দিলে গ্রামে এসে মহাধুমধামে। ইংরিজি বাজনার দল এলো, গ্যাসের আলো এসে আলোয় আলো হয়ে গেল বাঁশবনের আমবনের মাথা। এ অঞ্চলে অমন জাঁকজমক কখনো দেখা যায় নি। খাওয়ালেও খুব ওরা গ্রামের সবাইকে। কলকাতা থেকে রাবড়ি এলো, বাগবাজারের রসগোল্লা এলো। শখের কেষ্ট-যাত্রার দল একদিন গাইলে ওদের বাড়ীর উঠোনে। কলকাতা থেকে যে সব আত্মীয়বন্ধু এলো, তাদের সোনার চেন, ঘড়ি আর ডবল-ব্রেস্ট শার্টের বাহার দেখে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। পুরুষ মানুষ যে গলায় সোনার হার পরে, সেই আমরা প্রথম দেখলাম।

এসব হল আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

তারপর বছর তিনেক কাটলো। সতীশ তখন ব্যবসায়ে ঢুকেচে। দেশের সম্পত্তি দেখাশোনার ভারও নাকি তার ওপর। সে উপলক্ষে সতীশ একটু ঘন ঘন দেশে আসতে লাগলো। আমাদের অনেক বড়, আমরা সমীহ করে কথা বলতাম। ও কখনো নিয়ে আসতো কলের গান—তখন নতুন জিনিস—এসব পাড়াগাঁয়ে আনকোরা নতুন। বৈঠকখানায় বসে যখন কলের গান বাজাতো, তখন লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো।

কেউ হয় তো জিগ্যেস করতো—কলের কত দাম খোকাবাবু?

—সাড়ে তিনশো টাকা।

সতীশ সংক্ষেপে উত্তর দিয়েই আর একখানা রেকর্ড তুলে দিতো কলে। নরম বুরুশ দিয়ে আগের রেকর্ডখানা যত্ন করে মুছতো। আমাদের বলতো—কাছে এসে ভিড় কোরো না, দামী জিনিস সব। একখানা ভেঙে গেলে সাড়ে পাঁচ টাকার ঘাড়ে জল—

আমরা সভয়ে সরে যেতাম।

সতীশের গায়ে সিল্কের শার্ট, সব আঙুলগুলোতে আংটি, ঘাড়-কামানো বাবু-ছাঁট চুল, রুমালে বিলিতি এসেন্স, মুখে বার্ডসাই। তখনকার দিনে সিগারেটের ওই নাম ছিল।

আমরা বলতাম—ওর দাম কত সতীশদা?

—সাড়ে তিনটাকা কৌটো।

—তুমি রোজ রোজ খাও?

—তিন দিন যায় এক কৌটোয়। মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা লাগে।

এ অবস্থায় কিছু কিছু মোসাহেব জুটে গেল। তাদের নিয়ে যে কদিন বাড়ী থাকতো খুব হৈ হৈ করতো। আজ নৌকোয় উঠে বাচ খেলা, কাল দল বেঁধে বন-ভোজন। ওর বাড়ীতেও মাঝে মাঝে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতো—মাংস লুচি দই মিষ্টি। আমরা অবিশ্যি বাদ পড়তাম, কারণ বড়লোকের ছেলের অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়ার আনুষঙ্গিক গুণ আমাদের ছিল না, বয়সও ছিল কম।

তারপর স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশুনো করতে ব্যস্ত হয়ে রইলাম।

ইতিমধ্যে সাতকড়িবাবুর মৃত্যু হল।

গ্রামে ধুমধাম করে তার শ্রাদ্ধ করলে নিবারণ এসে। ইউরোপের প্রথম মহাযুদ্ধ উপলক্ষে ওদের ব্যবসা নাকি খুব ভাল চলছে। বেশ মোটা টাকা লাভ হচ্ছে লোহার বাজারে।

তখন স্কুলে ওপর-ক্লাসে পড়ি, মনে তত সঙ্কোচ নেই, একদিন নিবারণ কর্মকারের কাছে গিয়ে বসলাম। যেমন হয়ে থাকে, তার বৈঠকখানায় গ্রামের অনেক লোক, কেউ চা খেতে, কেউ মন রাখতে।

আমি বললাম—কাকা, আপনাদের সেই মাদ্রাজী মহাজন আছেন?

—তিনি নেই। তাঁর ছেলে এখন ব্যবসা দেখে। এই তো সেদিন বিয়ে হল, দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে।

—দেড় লক্ষ!

—সে কি আর এমন বেশি টাকা?

—নাম কি মহাজনের?

—কর্তার নাম কে, বি, রামনাথন্ চেট্টি। সেই নামেই ফার্ম। মস্ত বড় কারবার! ঝাল, হলুদ, তেঁতুল, চাল এই সব চালান দেয়। বম্বে, কলম্বো, রেঙ্গুন আর সিঙ্গাপুরে ওদের ব্রাঞ্চ। আমি তো বড় ব্রোকার ওদের ফার্মের। এ বছর পঞ্চান্ন হাজার টাকার ঝাল কিনলাম পূর্ববঙ্গের মোকাম থেকে। আমি না হলে ওদের কাজ চলে না। ঝাল খরিদ আর কেউ করতে পারে না, বড় শক্ত কাজ। সতীশকে লাগিয়েছি আমার কাজে। ওকে পাঠালাম দৌলত খাঁ মোকামে, আমি রইলাম বরিশালে। মহাজন বললে, যত পার কেনো। আমি টেলিগ্রাম করলাম, ঝালের বাজার এবার খারাপ, কিনবো না। সাড়ে পঞ্চান্ন হাজার টাকার মাল কিনলাম বাপ-বেটায়।

আমাদের গ্রামের ভদ্রলোকেরা সাড়ে পঞ্চান্ন টাকা এক জায়গায় ক্বচিৎ কখনো দেখেচে টাকার অঙ্ক শুনে শুধু হাঁ করে চেয়ে থাকে।

একদিন দেখি সাতকড়ি বৈঠকখানায় বসে লোকজনের মাঝখানে কি একটা নক্সা বার করে সকলকে বোঝাচ্ছে। সেটা নাকি কলকাতার হবু বাড়ীর নক্সা। কটা ঘর হবে, কোথায় মোটরের গ্যারেজ হবে, এই সব বোঝাচ্চে সমবেত গ্রাম্য ভদ্রলোকদের।

এইভাবে চলতো ওদের কাজ, আমার স্কুল ও কলেজের দিনগুলোতে। ভাগ্যলক্ষ্মী ওদের ললাটে নিজের হাতে তিলক এঁকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, নিজে শাঁক বাজিয়ে টাকার থলি তুলে দিয়েছেন ওদের কলকাতার বাড়ীর দামী লোহার সিন্দুকে।

এরপর অনেক দিন কেটে গেল।

বিদেশে বেরিয়েছি চাকরি করতে, গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধ কম। ওদের খবর তত কানে পেঁছোয় না। তবে এটুকু শুনেছি, সতীশের বাবা ঝালের ও লোহার কারবার ফেলে পরলোকে প্রস্থান করেচেন। সতীশই এখন কারবারের মালিক।

একবার পুজোর সময় দেশে এসেছিলাম সাত দিনের জন্যে। সতীশও সেবার এল তার স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঝকমকে এক নতুন মোটরে চড়ে কলকাতা থেকে। ছ'দিন মাত্র রইল। দুজন কলকাতার বন্ধুও সঙ্গে এসেছে। খুব হৈ-হৈ করলে।

সন্ধ্যাবেলা ওদের বৈঠকখানায় গেলাম। গিয়ে দেখি বন্ধুদের নিয়ে সতীশ মদ খাচ্ছে। আমাকে দেখে বললে, আরে এসো এসো রামলাল, আজকাল কোথায় আছ?

—শিলিগুড়ি। ভাল আছ সতীশদা?

—চলে যাচ্ছে।

—গাড়ী নতুন কিনলে?

—হ্যাঁ। পুরনো অস্টিনখানা বেচে নতুন মডেলের নিলাম।

—মদ খাও নাকি?

সতীশ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে—ও তো গায়ের ব্যথা মারতে। যে খাটুনি খাটি, সন্দে বেলাটা একটুখানি না খেলে বাঁচবো কি করে? এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্চেন বাবু কৃষ্ণপদ কুন্ডু, হাটখোলায় গদি আছে, মস্ত বড় লোক। আর এঁর নাম কুমুদবন্ধু সরকার, হাওড়ায় রাইস মিল আছে—বড় ধনী ওখানকার—সাতখানা বাড়ী গঙ্গার এপারে—

বন্ধুটি বিনয়ের সঙ্গে বললে—না, না, শুনবেন না। ধনী না ইয়ে, ওসব বাদ দাও সতীশ। অন্য কথা পাড়ো!

—ব্রিজ খেলতে জানো রামলাল?

—না সতীশদা।

—চা চলবে? তোমার তো এসব চলবে না।

—চাও খাবো না। খেয়ে এলাম। তোমরা বোসো, আমি উঠি।

আমি সেখান থেকে সরে পড়লাম, কারণ সে সময় বাড়ীর মধ্যে থেকে চাকর ডিশভর্তি খাবার নিয়ে এলো ওদের জন্যে।

তার পরদিন দেখি সতীশ নদীতে নৌকো করে বন্ধুদের নিয়ে বন্দুক হাতে পাখী-শিকারে বেরিয়েচে। সে যে বাড়ীতে বসে মদ খায়, এতে গ্রামের লোকে দেখলাম দোষ ধরে না। বড়লোক তো খাবেই, ওদের সব শোভা পায়, ভাবটা এই রকম। সতীশ পাখী শিকার করে, বারোয়ারীর চাঁদা দিয়ে, ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলে, গ্রাম গুলজার করে তার ঝকঝকে নতুন মডেলের অস্টিন হাঁকিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খুব আমোদ করে বেড়ালে এই পাঁচ ছ' দিন! ছ'টা দিনে ছ'বছরের ফুর্তি ওড়ালে। আমাকে বললে—একদিন যেও হে রামলাল, আমাদের কলকাতার বাড়ীতে।

—কবে যাবো সতীশদা? সাতদিনের ছুটিতে এসেছি, আবার চলে যাবো। তুমি ক'দিন আছ?

—আছি কই? একটা থিয়েটার খুলবো ভাবছি। তা নিয়ে বড় ব্যস্ত। অ্যাকটর অ্যাকট্রেস্ ঠিক করতে হবে। অনেক কাজ।

—নতুন খুলবে?

—হ্যাঁ ভাই। আর্ট থিয়েটার। একেবারে নতুন জিনিস। হয় যদি তবে একটা নতুন জিনিস হবে। ঝাল হলুদ নিয়ে আর ভালো লাগে না। এবার অন্য পথ ধরবো।

—আগের ব্যবসা একেবারে ছেড়ে দেবে?

—না। সেও থাকবে। বিখ্যাত অ্যাক্টর শরৎবাবুর নাম শুনেচ? তিনি হোলেন আমার এই বন্ধু কুমুদের শালা। কুমুদকে দিয়েই তাঁকে নামাবো আমার থিয়েটারে।

—তোমাদের সেই মাদ্রাজী মহাজন আছে?

—তাদের সঙ্গে আমার একটু গোলমাল চলচে। জ্যাঠামশায় আর বাবাকে তারা খাটিয়ে নিতো। সে মেক্দারে টাকা দিতো না। আমার সঙ্গে তো তা চলবে না? বাবা জ্যাঠামশাই ছিলেন সেকেলে মানুষ। তাঁরা অতশত বুঝতেন না।

—তা তো বটেই।

—আমি সিঙ্গাপুরের একটা ফার্মের সঙ্গে সরাসরি কারবার করবার চেষ্টা করচি। নিজে খরিদ করে অপরকে মুনাফা খাওয়াবো, বাবা জ্যাঠামশায়ের মত অত বোকা আমি নই।

—তা তো বটেই।

বড়লোকদের সঙ্গে মতভেদ তর্কাতর্কি আমাদের মত গরিব লোকের সাজে না। অন্য কথা পাড়লাম। সতীশ টিন খুলে সিগারেট ধরালে। ও কোথায় একটা জমি কিনচে, সেখানে ফুল আর টোমাটোর চাষ করবে, সে সব গল্প করলে। আমি বললাম—সতীশদা, ছেলেবেলায় তুমি বার্ডসাই খেতে, মনে আছে?

—তখন তাই ছিল। সে সব কি আজকের কথা! তখন আমার বয়েস কুড়ি কি বাইশ! এখন হল সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। মাথার চুলে পাক ধরেচে।

—এখানে লাগচে ভালো সতীশদা?

—আচ্ছা, বলতে পারো, ট্যাংরার বিল পর্যন্ত মোটর চলবে?

—এই বর্ষাকালে? না বোধ হয়। যাবে নাকি?

—যেতুম। সেখানে জলপিপি আর হাঁস বেশ পাওয়া যায়। জানো?

—আমি ও খবর রাখিনে। বলতে পারবো না।

দিন-দুই পরে যথেষ্ট ফটো তুলে, যথেষ্ট শিকার করে, নতুন মডেলের অস্টিনে চড়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সতীশ চলে গেল কলকাতায়। আমি চলে গেলাম আমার চাকুরি-স্থল শিলিগুড়িতে।

এর পর প্রায় সুদীর্ঘ আঠারো-উনিশ বছরের পরে নানাদেশ ঘুরে নানা জায়গায় চাকরি করে আমি দেশে ফিরে এলাম। বাড়ীঘর ভেঙেচুরে গিয়েছিল, কিছু কিছু মেরামত করে নিতে হল। মাঝে মাঝে যে বাড়ী আসিনি তা নয়, সে খুব কম, বছর দু-বছর

অন্তর। ইদানীং তাও আসা ঘটতো না!

এসে দেখি সতীশ তার বাড়ীতে আছে।—কিন্তু এ কোন্ সতীশ?

সে সতীশ আর নেই।

তাকে প্রথম দিন বেলতলার মাঠে দেখে চিনতে পারলাম না হঠাৎ। রোগা হয়ে গিয়েচে, বুড়ো হয়ে গিয়েচে। পরনে আধময়লা ছেঁড়া কাপড়। ময়লা গেঞ্জি।

সতীশ বললে—কে? রামলাল? আরে বেশ বেশ। শুনলাম তুমি বাড়ীতে আসবে।

—তোমার এ রকম চেহারা হল কেমন করে সতীশদা?

—এক দিনে হয়নি, অনেক দিনে হয়েচে। তুমি অনেক দিন পরে দেখলে, তাই নতুন লাগছে।

—এখানে আছ নাকি আজকাল?

—তা প্রায় আট-ন'বছর বাড়ীতে আছি। বড় কষ্ট পাচ্চি ভাই। কঠিন হাঁপানি রোগ। সেই সঙ্গে লিভারের বেদনা। যখন ধরে তখন শেষ করে দেয়। ইদিকে এসেছিলাম গরুটা খুঁজতে। তা পেলাম না। যেও সন্দেবেলা।

সতীশের খবর মাঝে মাঝে বিদেশে আমার কানে যে একেবারে পেঁছিয় নি তা নয়। শুনেছিলাম ওদের ব্যবসা নেই, কলকাতার বাড়ী বিক্রী হয়ে গিয়েচে। পাওনাদারেরা সব বেচে-কিনে নিয়েচে। থিয়েটার করতে গিয়েই সব গেল।

তবে সেই সতীশ যে একেবারে এমন অবস্থায় পেঁছিচে তা বুঝিনি।

রাসবিহারী মুখুজ্যের কাছে কথাটা বলতেই রাসবিহারী বলে—ও, কে, সতীশের কথা বলচো? এখনো কিছু বোঝো নি বাপু। সতীশের মা কি বৌ তোমার কাছে যায় নি?

—কেন?

—ওই দ্যাখো, আবার বলে 'কেন'? ভিক্ষে করতে। নইলে পেট চলবে কি করে?

—বলেন কি? এতদূর হয়েচে, তা তো ভাবি নি।

—এখনো খবর পায় নি তুমি বাড়ী এসেচ। কাল সকালেই যাবে। আমরা তো বাপু বিরক্ত হয়ে গেলাম। বলে, নিত্যি নেই দ্যায় কে, আর নিত্য রোগী দ্যাখে কে? ওর মা সর্বদা যাবে, চাল দাও, পয়সা দাও, তেল দাও।

—ওদের অবস্থা এমন হল কেন?

—আবার বলে, কেন। তা হবে না? মদে বদখেয়ালে ইয়েতে বাপ-জ্যাঠার পয়সাগুলো ঘোচালে। থিয়েটার করতে গিয়ে বাড়ীখানা গেল কলকাতার। পাওনাদারেরা ডিগ্রি করে যথাসর্বস্ব নিয়েচে, এখানকার জমি-জমাও ক্রোক দিয়ে নিয়েচে। ক'বিঘে ধানের জমি বুঝি আছে, তাও সারা বছরের ভাত হয় না তাতে। এখন ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো সেই গাঁয়ের ভিটে। আর যাবে কোথায়? তা ছাড়া ও বাঁচবে না। কঠিন রোগ, পথ্য নেই, চিকিচ্ছে নেই।

সতীশের বাড়ী সন্দেবেলা গিয়ে বসতাম। প্রায়ই যেতাম।

ছেঁড়া মাদুরে বসে হাঁপাতো। এই সময় নাকি হাঁপানির টান বাড়ে। আজ দশ বছর হল সতীশ গ্রামে বাস করচে, হিসেব করে দেখলাম। এই দশ বছরে দারিদ্র্যে, অনাহারে আর রোগে ওকে এই অবস্থায় নিয়ে এসে ফেলেচে। পুরনো দিনের কথা আমি কিছু কিছু তুলতাম।

একদিন বললাম—তোমার বিয়েতে এ গাঁয়েতে প্রথম ইংরিজি বাজনা এসেছিল, আর গ্যাসের আলো জ্বলেছিল, মনে পড়ে?

সতীশ হাঁপাতে হাঁপাতে বলতো, আর ভাই! বাদ দ্যাও ওসব কথা। এখন গেলেই বাঁচি। আর সহ্য হয় না কষ্ট। সে সব মনে নেই ভাই।

—মনে নেই?

—আর মনে থাকে! কোথা থেকে মনে থাকবে? রোজ একটা করে টাকা না হোলে সংসার চলে না। তাও নুন ভাত খেয়ে। কোথা থেকে মনে থাকবে? বলো কি!

—তা তো বটেই।

সকালে একদিন বাড়ী বসে আছি, সতীশের মা এসে বললেন—বাবা একটা কথা

বলবো। আমায় চার আনা পয়সা দিতে পারো? আফিং চাই রোজ চার আনার। কাল যোগাড় করতে পারিনি। খোকা পেট ফুলে দম আটকে যায় আর কি। মা হয়ে দেখতে পারিনে—তাই তোমার কাছে এলুম বাবা।

আবার একদিন ওর বৌ।

আর একদিন ওর মা।

শুধু খোকার আফিঙের পয়সা চার আনা।

বাড়ীতে স্ত্রীকে বলে দিলাম, এরা এলে যেন ফিরিও না, চার আনাই দিও।

স্ত্রী বললে—তুমি শুধু দ্যাখো চার আনা। ভেতরের খবর তো জানো না। কামার বৌ এসে চায়ের দুধ নিয়ে যায়, চাল নিয়ে যায়। একখানা পুরোনো শাড়ী দিলাম। বললে—পরবার কাপড় নেই, দিন, না হোলে মান যাবে। কি করি—দিলাম। ওরা নাকি খুব বড়লোক ছিল?

গৃহিণীকে বললাম পুরোনো দিনের কথা। আমি তখন বালক। সাতকড়ি ও নিবারণ কর্মকারের শালের জোড়া ও দাসদাসীর বাহার। দশ-বিশ হাজারে মরতো না নিবারণ কর্মকার।

একদিন ওকে দেখতে গেলাম। তখন আমি বছর খানেক হল দেশে এসেছি। সতীশ বললে—আর বাঁচবো না। একটা জিনিস খেতে বড্ড ইচ্ছে, খাওয়াবে?

—কি?

—বড্ড ভালবাসতুম মাংসের কাটলেট। কতকাল খাইনি!

—খাওয়াবো। তবে তোমার কিছু খারাপ হবে না তো?

ও হেসে বললে—আর আমার খারাপ আর ভালো! শোন, বৌটাকে একটু দেখো, বুঝলে? ভালো মানুষের মেয়ে। বড় খোয়ার করলাম। কষ্ট হয়। তুমি বরং—

হাঁপের টানে ও আর বেশী কিছু বলতে পারলে না। আমি বাধা দিয়ে বললাম—ওসব কি কথা! কিছু ভয় নেই তোমার।

কাটলেট খেয়ে খুব খুশি। বেশি খেতে পারলে না। দু'একখানা খেয়ে ওর স্ত্রীকে দিয়ে দিলে। বললে, আঃ, কতকাল খাইনি! আগে আগে—

একটু ম্লান হাসি হেসে চুপ করলে।

সতীশ আরো এক বছর ধুঁকতে ধুঁকতে টিকে গেল। হাঁপানিতে কষ্ট পায়, সহজে মরে না। ওর স্ত্রীও সেই বছরের মধ্যেই মারা গেল। গ্রামের লোক চাঁদা করে গঙ্গায় দিয়েছিল দু'জনকেই।

সতীশের মা কিন্তু আজও বেঁচে আছেন। কোন অসুখ নেই, দিব্যি শরীর। মুখুজ্যে-বাড়ী বাসন মেজে আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখে সেখানে দুবেলা খেতে পান।

ঝড়ের রাতে

যাচ্ছিলাম রাজস্থান বই আনতে ভূপেনদের বাড়ী। পড়ি নীচের ক্লাসে, বয়েস বারো বছর। বই পড়ার বড্ড ঝোঁক। পাড়াগাঁ জায়গা, বই তেমন মেলে না। আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে—নাম তার ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বাড়ী নদীর ওপারে সুখপুকুর ঘাটবাঁওড়—একদিন বললে তার বাড়ী দু'তিনখানা বই আছে। নাম কি? ভেবে বললে, একখানার নাম রাজস্থান। মোটা বই, না সরু? মোটা, খুব মোটা।

আর যাবি কোথায়! রাজস্থান বইয়ের নাম আমার শোনা আছে। বই দিবি তো? হাঁ দেবে, যদি তার বাড়ী আমি যাই।

—কিন্তু তাহোলে সেদিন বাড়ী ফিরবো কি করে?

—কেন, সেদিন আমাদের বাড়ীতে থাকবে।

এই শর্তে রাজি হয়ে বই আনতে যাচ্ছি ভূপেনদের বাড়ী। নদীর ওপারে, আমাদের স্কুল থেকে পাঁচ মাইল পথ। সময়টা বোধ হয় পুজোর পর। দিন ছোট, নদী পার

হোতে না হোতে বেলা গেল। সঙ্গে সঙ্গে নামলো বৃষ্টি। মেঘ অনেকক্ষণ থেকে জমে ছিল আকাশে।

দৌড়ে গিয়ে একটা আমগাছের তলায় দাঁড়ালাম। ছাতি আনিনি সঙ্গে। এটা বর্ষাকাল নয়, ওবেলা চমৎকার রোদ ছিল। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি নামবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়নি। আমতলায় খানিকটা দাঁড়িয়ে বুঝলাম আমগাছের শাখাপত্র বৃষ্টির জল থেকে বাঁচতে পারবে না। বাড়ীঘর আছে কিনা দেখবার আগ্রহে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি কিছুদূরে আমবাগানের ফাঁকে একটা পুরোনো কোঠাবাড়ী যেন বৃষ্টির মধ্যে আবছায়া দেখা যাচ্ছে।

এক দৌড় দিলাম বাড়ীটা লক্ষ্য করে এবং সর্বাঙ্গ ভিজে জুবড়ি হয়ে হুড়মুড় করে বারান্দার দোর ঠেলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বাড়ী কাদের, কে আছে না আছে সেখানে, এদিকে আমার কোনো লক্ষ্যই নেই।

কে যেন একজন বারান্দার ও-কোণ থেকে রুক্ষস্বরে বলে উঠলো—কে হে?

চম্‌কে চেয়ে দেখি একজন বুড়ো মানুষ একটা মাদুরের ওপর ঝুঁকে বসে কি করছিল, মুখ ঈষৎ তুলে আমার দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করছে।

অপ্রতিভের সুরে বললাম—আমি একজন স্কুলের ছেলে। সুখপুকুর যাবো।

—সুখপুকুরে যাবে তা এখানে কি?

—আজ্ঞে, বিষ্টিটা এল কিনা, ওই আমতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছিলাম।

—কোন্ আমতলায়?

—ওই রাস্তার ধারের।

—ভালো আম। বড্ড ভালো আম ওর।

এ কথাটা যেন আমি ছেলেমানুষ হোলেও কানে কেমন একটু অসংলগ্ন ঠেকলো। তবুও প্রবীণ ব্যক্তির কথার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর জন্যে বললাম—ও!

বৃদ্ধ রাগত ভাবে বলে উঠলেন—ও? কি ও? ও মানে কি? ও?

আমি অবাক! চুপ করে রইলাম। অন্যায় কথা বলে ফেলেছি নাকি? 'ও' বলা উচিত হয়নি!

—তোমার নাম কি হে?

—আজ্ঞে দুলালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—এঃ! দুলাল! আদরের দুলাল! কোন্ ক্লাসে পড়?

—সিক্স ক্লাসে।

—সিক্স ক্লাসে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সিক্স ক্লাসে।

কি আশ্চর্যের কাণ্ড, এই কথার পর বৃদ্ধের রাগী মেজাজ হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। নয়তো আমি সত্যি ভাবছিলাম বৃষ্টি একটুখানি থামলেই এখান থেকে চলে যাবো। যা থাকে কপালে। এমন রাগী লোকের ঘরে থাকবার কোনো দরকার নেই। বুড়ো শান্ত হয়ে বললে—সিক্স ক্লাসে পড়ো? আচ্ছা এসে বোসো এখানে।

সিক্স ক্লাসে অধ্যয়নের অধিকারবর্গে আমি গিয়ে মাদুরটার এক পাশে বসলাম।

—নাম কি?

আবার বিনীত ভাবে নামটি বলি।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। বাইরে বেশ অন্ধকার হয়ে উঠেছে।

বৃদ্ধ বললেন—খাবে কিছু?

—আজ্ঞে—না।

—না কেন? খাও না! ওই কোণে উঠে গিয়ে দ্যাখো শুকনো নারকোল আছে। নিয়ে এসো, দা দিচ্ছি কেটে খাও।

—আমি ঝুনো নারকোল কুড়তে জানিনে।

—জানো না? গেরস্ত ঘরের ছেলের সব জানা দরকার। তবে খাবে কি? আর তো কিছু নেই।

—থাক গে। খাবো না কিছু।

—না না, তা কি হয়। ছেলেমানুষ, খিদে পেয়েচে বই কি। ওবেলা তো কখন খেয়ে বেরিয়েচ। সুখপুকুর যাচ্ছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেন?

—একখানা বই আনতে।

—কি বই?

—রাজস্থান বলে একটা বই।

বৃদ্ধ রাগের সুরে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজস্থান জানি। অমন করে বলে নাকি? একটা বই! ও কি রকম কথা? রাজস্থানের নাম কে না জানে। তুমিই বুঝি সিক্স ক্লাসে পড়ো, আর কেউ কিছু জানে না?

আমার এবার রাগ হল, ভয়ও হল। নাঃ, এখানে আর থাকা নয়। এ রকম বদ-মেজাজী বুড়োর কাছে কেউ থাকে?

বুড়ো আবার তখুনি সুর নরম করে বললে—যাক্ গে। ছেলেমানুষের সঙ্গে আর কি হবে বকে। এখন খাবে কি তাই বলো।

—আপনি যা বলেন।

—তাই তো, কিছুই ঘরে নেই।

—আপনি কি খাবেন ?

—আমি? ওবেলার পান্ত ভাত আছে, নেবু দিয়ে তাই খাবো। এসো ভাগ করে দুজনে খাই।

সত্যিই আমার বড় খিদে পেয়েছিল। কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছিলুম বাড়ী থেকে। পান্ত ভাত, পান্ত ভাতই সই। বুড়ো আমাকে বড় খাটালে। হাঁড়ি পেড়ে আনলাম ওর কথায়, কলার পাতা কেটে আনালে, ভাত বাড়িয়ে নিলে। কিছু তরকারী নেই, শুধু নুন আর ভাত। গপ-গপ করে বুড়ো গিলতে লাগলো সেই ভাত। নেবু দিয়ে খাবে বলেছিল, তাই বা কই? তা হোলেও তো হত। কোনো রকমে খাওয়া শেষ হল।

আমার তখন ভয় হয়েছে বৃদ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় আমার গলা টিপে না মারে। সুতরাং যখন বুড়ো বললে ঘুমুতে, তখন আমার মনে ভয় ও অস্বস্তি দুই-ই এসে জুটলো।

বললাম—শোবো কোন্ ঘরে?

—ঘর? ঘর তো মোটে এই একটা।

—এটা তো দালান।

—দালানও যা, ঘরও তাই। এখানে মাদুর পেতে নাও। ওই দেওয়ালের কোণে মাদুর আছে।

—আপনি শোবেন না?

—না। আমি কাজ করছি, দেখচো না?

এতক্ষণ কিছুই দেখিনি লক্ষ্য করে। এইবার একটু কৌতূহলের সঙ্গে চাইতেই তিনি বললেন—যাও, শুয়ে পড়ো। এদিকে তাকাতে হবে না।

আমি ভয়ে ভয়ে শুয়ে পড়লাম বটে কিন্তু আমার চোখ-কান রইল বুড়োর দিকে। আমি ঘুমুলাম না, ঘুম আমার হলও না—শুয়ে আড়চোখে বুড়োর দিকে চেয়ে রইলাম।

বুড়ো কি যে করছে, অনেকক্ষণ অবধি আমি ঠাওর করতেই পারলাম না।

অবশেষে মনে হল, বুড়ো ছবি আঁকছে!

খুব মন দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ছবি আঁকছে।

ভালো করে দেখবার সাহস আমার হয় নি। ছবি আঁকছে নিশ্চয়ই। সেটা বুঝতে পারলাম। আমারও ঘুম হল না। বুড়ো প্রায় রাত তিনটে পর্যন্ত ছবি আঁকলে, ভোরের কিছু আগে ঘুমিয়ে পড়লো। আমিও ঘুমিয়ে পড়লুম।

জেগে উঠে দেখি রোদ উঠেচে। বুড়ো তখনো ওঠে নি। আস্তে আস্তে উঠে বুড়োর

মাদুরের কাছে এসে দেখি মাদুরের ওপর মাটির খুরি অনেকগুলো সারি সারি সাজানো, তাতে নানা রং। সরু মোটা কতগুলো তুলি একটা পিঁড়িতে কাতভাবে সাজানো, কতকগুলো তুলি মাদুরের ওপর ছড়িয়ে পড়ে আছে—আর সামনে একখানা তক্তার ওপর পেরেক দিয়ে আঁটা কাগজ কিংবা চটের ওপর একখানা যা ছবি!

ছবিখানা কোন একটি মেয়েছেলের।

কার এমন সুন্দর মুখ, এমন বড় বড় টানা চোখ—কি জানি?

আধখানা মাত্র আঁকা হয়েছে—তাও সব যেন হয় নি, কিছু কিছু বাকি আছে। কিন্তু এমন সুন্দর ছবি আঁকতে পারে এ বুড়ো? এমন ছবি যে মানুষ আঁকতে পারে সে বিশ্বাস আমার ছিল না। ক্লাসে ইন্দু মাস্টারের দেওয়া আতা পাখী চেয়ারের ড্রইং আঁকি, তাও মনের মত হয় না আমার নিজেরই। ভাবি আতা আঁকবো, হয়ে যায় যে জিনিস, তাকে বেলও বলা চলে, আমও বলা চলে, হয়তো কুমড়ো বলাও যেতে পারে। সুতরাং তলায় 'আতা' বলে লিখে দিতে হয়।

কিন্তু এই খিটখিটে মেজাজের বুড়ো এ এমন ছবি আঁকতে পারে।

অবাক হয়ে গেলাম। বুড়োকে ডেকে বলবো সে কথা? দরকার নেই, ঘুমুচ্চে ঘুমুক। আমার বিদায় নেবার সময় হয়েচে। কিন্তু ঘুমন্ত বুড়োকে জাগাতেও সাহস হল না। না জানিয়েই বা যাই কি করে? আবার ভয় হল, বুড়োর ছবি দেখে ফেলেছি, একথা ও না জানে। যে বদরাগী আর খিটখিটে, কি জানি হয়তো মেরেই বসবে।

বাইরে আমগাছটার তলায় গিয়ে বসলুম। আধঘন্টা পরে ঘরের মধ্যে শব্দ পেয়ে বুঝলাম বুড়ো উঠেছে। তখনি আমি আস্তে আস্তে পা টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম।

বুড়ো মাদুরের ওপর বসে ছবিখানা দেখছিল, চমকে উঠে পেছনে চেয়ে বললে—কে?

—আজ্ঞে আমি।

—ও, তুমি এখনো যাও নি?

—আপনি ঘুমুচ্ছিলেন, না দেখা করে—

—ঠিক ঠিক। তুমি বেশ ভালো ছেলে। ভাল ছেলে।

—তা হোলে আমি যাই এখন?

—আমার ছবি দেখেছ?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

—আচ্ছা এসো, দেখবে।

আমি দেখলুম অনেকক্ষণ ধরে।

বুড়ো বললে—কি রকম হয়েছে?

—খুব ভালো।

—ভালো লেগেচে?

—আজ্ঞে, তা আর বলতে! কখনো এমন দেখি নি।

—আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো। দাঁড়াও, কি খাবে সকালবেলা?

—আজ্ঞে কিছু না। আমি যাদের বাড়ি যাচ্ছি, সেখানে খাবো।

—না না, তা হয় না। পান্ত ভাত হাঁড়িতে ছিল?

—আজ্ঞে না। সব খেয়েছি কাল দুজনে।

—নারকোল একটা নিয়ে এসো, কেটে দিই।

—আজ্ঞে আপনাকে কষ্ট দেবো না। আমি খাবো না কিছু।

বলেই হন্ হন্ করে বেরিয়ে পড়লুম বাড়ী থেকে।

বুড়ো দেখি পেছনে ডাকছে—ও খোকা, শোনো! ও খোকা, যেও না—

আমি পেছন ফিরে চেঁচিয়ে বলি—আজ্ঞে, আমি নারকোল খাবো না।

সেই দিনই বিকালে বই নিয়ে আসবার পথে বুড়োর ওখানে যেতে বড় ইচ্ছে হল। বুড়োকে দেখবার জন্যই ঘরের জানালায় উঁকি-ঝুঁকি মারি।

বুড়োকে কিন্তু দেখতে পেলাম না। ঘুমুচ্চে নাকি?

ফি'র আসচি এমন সময় কে ডাকলে—কে?

বললাম—আমি।

—শোনো খোকা, শোনো।

গেলাম। বুড়ো বালিশ ঠেস্ দিয়ে চোখ বুজে বসে ছিল। আমায় বললে—আজ রাত্রে এখানে থাকো।

—থাকবো না।

—কেন? থাকো। আজ তোমাকে নারকোল খাওয়াবো, চিঁড়ে খাওয়াবো।

কি স্নেহের সুর ওর কথার মধ্যে। সে রাতেও আমার থাকার ইচ্ছে ছিল সেখানে, কিন্তু আমার বাড়ীর লোকের ভয় ছিল, না বলে এসেচি। আমি বললাম—মা বকবে।

বুড়ো আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—ঠিক ঠিক। মা রয়েচেন? তাহলে যাও। নারকোল খেয়ে যাবে না?

—আমি নারকোল কাটতে জানিনে।

—আমার হাতে ব্যথা, নইলে আমি তোমাকে নিজেই নারকোল কেটে দিতাম।

আমি চলে এলাম বটে কিন্তু বুড়োর কথা ভুলতে পারলাম না কতদিন। অনেকদিন কেটে গেল।

বালক থেকে আমি হয়ে উঠেচি যুবক।

পাথুরেঘাটার এক বড়লোকের বাড়ী যাতায়াত করি। সেখানে মস্ত বড় একখানা অয়েল পেণ্টিং ছবি দেখে হঠাৎ চমকে উঠলাম। এই ছবি যার, তাকে আমি কোথায় দেখেচি? বাড়ীর লোককে বললাম—ইনি কে?

তারা বললে—এঁকে চেনেন নাকি? ইনি বিখ্যাত চিত্রকর দুর্গাচরণ সান্যাল। এঁকে নিয়ে খবরের কাগজে হৈ-চৈ হয় খুব।

—দুর্গাচরণ সান্যাল?

—নামকরা লোক। বড় বৈঠকখানায় যত অয়েল পেণ্টিং দেখবেন সব ওঁর করা। দেড় দু'হাজার টাকা নিতেন ছবি পিছু। সব বড় লোক খদ্দের ছিল। এ ছবি তাঁর নিজের, নিজেই এঁকেছিলেন। মেজবাবু বেঁচে থাকতে শিল্পীর নিজের ছবি অনেক টাকা খরচ করে আঁকিয়ে নেন। আপনি এঁকে চিনতেন?

—আমি কোথাও এঁকে দেখেচি ঠিক মনে করতে পারচিনে। ইনি থাকতেন কোথায়?

—থাকতেন কলকাতাতে। বরানগরে। শেষ বয়সে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যান। এত টাকা রোজগার ফেলে, বড় বড় মক্কেল ছেড়ে দিয়ে কোথায় যে চলে গেলেন তার কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি। সে আজ বিশ-পঁচিশ বছর আগের কথা। কেউ খুঁজে পায় নি। খবরের কাগজে হৈ-চৈ হয় তাঁর অন্তর্ধান নিয়ে। অত নামকরা আর্টিস্ট! সে এক রহস্য সেকালকার।

আমার হঠাৎ মনে পড়লো। চিত্রশিল্পী দুর্গাচরণ সান্যালের রহস্য আমি জানি। সুখপুখুর ঘাটবাঁওড়ের সেই বুড়ো। সেই ঝড়বৃষ্টির রাত্রি, সেই অপূর্ব ছবি, আধ-আঁকা সেই ছবিখানা।

আর্টিস্ট

হঠাৎ অশ্বিনীকে দেখে শ্যামচাঁদগঞ্জের বাজারে আমি বড়ই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমাদের গ্রামের লোক অশ্বিনী। তবে আজ বহুকাল ও দেশছাড়া। অশ্বিনী আমাদেরই বয়সী হবে। ওর বাবা অভয় দাস ভিক্ষে করে সংসার চালাতো। আমাদের গ্রামে তাকে বলতো 'অবাই দাস'। অবাই দাস খঞ্জনী বাজিয়ে হরিনাম করে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করতো এ আমি নিজে দেখেচি। তারপর অবাই দাস কতকগুলি অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে মারা গেল। ওর বিধবা স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল তা কেউ খোঁজ রাখে না। ওদের বাড়ীঘর গ্রামের হরিনাথ চৌধুরী মহাশয় নিজের জমির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে সেখানে তরি-তরকারীর বাগান করেছিলেন। অবাই দাসের স্ত্রী যখন এ গ্রাম ছেড়ে

চলে যায়, তখন অশ্বিনীর বয়স হবে আট বছর। আমার সঙ্গে ওর বড় ভাব ছিল। অশ্বিনী সকালে এসে আমাদের বাড়ীর ডোবাতে কঞ্চির ছিপ ফেলে বসতো বর্ষার দিনে। আমরা জিগ্যেস করলে বলতো উল্কো মাছ ধরচে। কিন্তু সবাই জানি ও ডোবাটায় মাছের চিহ্নও নেই আর অশ্বিনীর ছিপেও না আছে সত্যিকারের সুতো, না আছে সত্যিকার বঁড়শি।

তারপর ষোল-সতেরো বছর চলে গিয়েচে। অশ্বিনীকে ভুলে গিয়েছিলাম। ইতি-মধ্যে আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন। আমরা দু'ভাই পয়সা ওড়াতে লাগলাম, জমিজমা বিক্রি করে ফুর্তি করতে লাগলাম। সেও আজ সাত বছর আগেকার কথা হবে--যে সময়ের কথা বলচি তখন বাবার তিনটি গোলা শূন্য করে ফেলেচি, অর্ধেক ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি মৌরুসি দিয়েচি বা বিক্রি করেচি, মায়ের গহনাগাঁটি প্রায় সব বন্ধক পড়েচে। সুতরাং আমাদের ফুর্তির সমুদ্রে কিছু ভাঁটা পড়ে এসেচে।

শ্যামচাঁদগঞ্জে গিয়েছিলাম ফুর্তির সন্ধানে। খুব জাঁকের বারোয়ারি হয় শ্যামচাঁদ-গঞ্জে। অনেক রকম ফুর্তির সন্ধান এখানে পাওয়া যাবে শুধু এই আশাতেই গিয়েছিলাম সেখানে। আমি একাই গিয়েছিলাম, দাদা আসেনি। কলাই বুনবার জন্য বাড়ীতেই আছে।

হঠাৎ অশ্বিনীকে এতদিন পরে দেখে ভারি অবাক হয়ে গেলাম। অশ্বিনী আমাকে বললে—চিনতে পারেন বাবু?

—হুঁ! তুই তো অশ্বিনী, অবাই দাসের ছেলে।

—ঠিক চিনেচেন। এখানে কি মনে করে?

—যাত্রা শুনতে।

—যাত্রা শুনবেন? কিসে এলেন?

—তুই আপনি-আজ্ঞে ক'রে কথা বলচিস কেন অশ্বিনী? ভুলে গেলি নাকি আমাকে?

—না বাবু, এতকাল পরে দেখা। এখন আপনারা বড় হয়ে গিয়েচেন, এখন কি আর ছেলেবেলার মত কথাবার্তা আপনার সঙ্গে শোভা পায়? এখন আর সেটা ভাল দেখায় না। কি করছেন আজকাল?

—বাড়ীতেই থাকি।

—তা আপনাদের ভাবনা কি। জমিদার মানুষ। কাকা বেঁচে আছেন?

—না। বাবা আজ আট-ন'বছর মারা গিয়েচেন।

আমাকে দাঁড় করিয়ে অশ্বিনী কোথায় চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে এসে বললে—চলে আসুন আমার সঙ্গে।

—ও কি? মদ?

—ভাল জিনিস, আসুন।

আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম—হ্যাঁরে, সে কি! তুই অবাই দাস বোষ্টমের ছেলে. তোর বাবা হরিনাম না করে জল খেত না, তুই মদ খাস? আমাদের কথা বাদ দে. আমরা তো উছন্ন গিয়েচি—

অশ্বিনী হেসে বললে—চলুন বাবু।

—এখন ও সব খাব না। আসরে ভিড় হয়ে গেলে জায়গা পাব না বসবার। এখানে আমাকে চেনে কে? কেউ খাতির করবে না।

—বসবার জন্যে কোন ভাবনা নেই বাবু। সে ভার আমার উপর রইল!

—না, তুমি আমাকে মাপ করো। আমি এই বিদেশ-বিভুয়ে এসে মদটা খাবো না। মা বাড়ী থেকে বেরোবার সময় বারণ করে দিয়েচে—মাইরি বলচি।

—আচ্ছা তবে খাবারের দোকানে আসুন। খানকতক সিঙ্গাড়া খাবেন চলুন—

খাবার-দোকানে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল। এদিকে আমি খেতে খেতেই দেখচি আসর লোকে ভর্তি হয়ে গেল। সেখানে আমার মত বিদেশী লোককে কেউ বসতে জায়গা দেবে না। অশ্বিনী বড় গোলমাল বাধালে দেখচি। অশ্বিনীকে কথাটা বলতে সে হেসে বললে—কেন ভাবচেন বাবু। আমি যখন আছি, তখন আপনি নির্ভাবনায় থাকুন। খুব

ভাল জায়গায় আপনাকে না বসিয়ে দিতে পারি তবে আমি অবাই দাস বৈরাগীর ছেলে নই।

অশ্বিনীর এ আশ্বাস-বাণীতে আমার কিন্তু ভরসার উদ্রেক হল না বিন্দুমাত্রও। ও নেশার ঝোঁকে দায়িত্বহীন আবোল-তাবোল বকচে। ওকে কে পুছবে এত বড় আসরের মধ্যে? আজ এত কষ্ট করে এত দূরে যাত্রা শুনতে আসা দেখচি নিরর্থক হয়ে গেল। কি হাঙ্গামা বাধালে অশ্বিনী।

অশ্বিনী আমার হাতে দুটো পান এনে দিয়ে বললে—খান, আমি জামাটা গায়ে দিয়ে আসি।

—আরও দেরি করবে অশ্বিনী? আমার আজ আর যাত্রা দেখা হল না।

—না হয় তো তখন জুতো খাব আপনার কাছে।

সে চলে গেল। আমি নিরুপায় হয়ে সেই পানের দোকানের সামনে বসেই রইলাম, কারণ তখন আমার একার কর্ম নয়—এত বড় আসরে ভিড় ঠেলে ঢুকে জায়গা করে নেওয়া। যখন ও আবার ফিরে এল তখন আসরে কনসার্ট বাজনা শুরু হয়ে গিয়েছে। দেখি ও বেশ সেজেগুজে এসেচে। গায়ে একটা মটকার পাঞ্জাবি, মাথায় একখানা চাদর পাগড়ির মত করে বাঁধা, দিব্যি ফর্সা ধুতি পরনে! ও কি বিষয়-কর্ম করে তাও জানিনে, একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল।

ওর পেছনে পেছনে আসরে ঢুকলাম। যেখানে যাত্রার দল বসে কনসার্ট বাজাচ্চে সেই ফটকে জনকয়েক ভলান্টিয়ার দাঁড়িয়ে ফটক পাহারা দিচ্চে। অশ্বিনী গিয়ে সেই ফটকে দাঁড়ালো। ভলান্টিয়াররা ভাবলো, আমরা যাত্রাদলের লোক। পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালো এক পাশে। তার একটু আগে প্রথম দফা কনসার্ট বাজনা থেমেচে সবে।

এমন সময়ে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো।

দলের পাখোয়াজ-বাজিয়ে হঠাৎ ফটকের দিকে চেয়ে অশ্বিনীকে দেখতে পেয়ে সচকিতভাবে পাশের ফুলুট-বাজিয়েকে বললে—অশ্বিনীবাবু—

—কে?

—ঐ যে অশ্বিনীবাবু—

অমনি ফুলুট-বাজিয়ে বাঁশিটা নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে অশ্বিনীর কাছে এসে হাতজোড় করে বললে—আসুন, আসুন অশ্বিনীবাবু, আসুন! আপনি এখানে?

অশ্বিনীর দিকে চেয়ে দেখি ওর গলার সুর ও মুখের ভাব বদলে গেচে। আমার সঙ্গে খানিক আগে যে-সুরে কথা বলছিল সে-সুর আর গলায় নেই. সে মানুষই আর ও নয়। গম্ভীর সুরে বললে—একটু কাজে এসেছিলাম এখানে—আপনি বোধ হয় দলের ম্যানেজার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের সৌভাগ্য যে আপনার মত লোক আজ এখানে।

আমি মনে মনে ভাবচি, ব্যাপার কি? অশ্বিনী কি কাজ করে? এত বড় দলের ম্যানেজার স্বয়ং এসে ওকে অভ্যর্থনা করচে—নবাব খান্‌জা খাঁ হয়ে গেল নাকি অশ্বিনী, অবাই দাস বোষ্টমের ছেলে?

অশ্বিনী আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে এসে বললে—ইনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু, ব্রাহ্মণের ছেলে, এঁকে একটু ভাল জায়গায় বসিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে—ইনি বসবার জায়গা পাচ্ছেন না।

আমি লক্ষ্য করছি, যাত্রাদলের বাজিয়েরা সকলে এ ওকে আঙুল দিয়ে অশ্বিনীকে দেখাচ্চে আর সকলেই কৌতূহলের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে। যেন কি দুর্লভ বস্তুর দর্শনলাভ আজ ঘটেচে ওদের ভাগ্যে, ভাবখানা এই রকম। আমি নিজেও আশ্চর্য হয়েছি মনে মনে। কেন অশ্বিনীকে এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করি নি যে ও কি করে? না, সে আর জিগ্যেস করাই হবে না। ও-ই বা কি মনে করবে। আমাকে ত ওরা পরম যত্নে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালে, সেই সঙ্গে অশ্বিনীকেও।

দলের কে একজন আমার হাতে একটা সিগারেট দিয়ে বললে, খান।

অশ্বিনীকেও দিতে গেল, অশ্বিনী আমাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বললে—বাপ্‌রে ওঁর সামনে খাইনে। আমাদের গ্রামের জমিদারের ছেলে।

এই সময় ম্যানেজার হাতজোড় করে অশ্বিনীকে বললে—এইবার আপনি একটু বাজান দয়া করে। আপনি এখানে বসে থাকতে কেউ পাখোয়াজে হাত দিতে সাহস করচে না।

—না না, তাতে কি। হোক, আমি শুনি। বেশ বাজান উনি।

মুরুব্বিয়ানা চালে এটা বললে অশ্বিনী।

—আজ্ঞে না, আপনি আসরে বসে থাকতে কারো সাহস হচ্চে না বাজাতে। একখানা বাজিয়ে দিন আপনি।

পাখোয়াজ-বাজিয়েও একবার এসে হাতজোড় করে বললে—আপনি আমাদের গুরু-স্থানীয়, মাথার মণি! আজ্ঞে, আপনি এখানে থাকতে বাবু, আমাদের কি যন্তরে হাত দেওয়া সাজে?

অশ্বিনী মৃদু হেসে (তাও মুরুব্বিয়ানা চালে, আগেকার সে অশ্বিনী যেন আর নেই) পাখোয়াজ ধরে এগিয়ে নিয়ে বসলো। কানে কানে কথা ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে, সাজঘর থেকে পর্যন্ত যাত্রার দলের লোক এসে ফটকের কাছে জড়ো হয়ে কৌতূহলে অশ্বিনীর বাজানো দেখতে ভিড় করলে। বাজনাও বটে অশ্বিনীর। বাপের বিষয় উড়িয়ে ফুর্তি করবার সময়ে গানবাজনার দিকেও একটু-আধটু মন দিয়েছিলাম, খুব বেশি না বুঝলেও গানবাজনা সম্বন্ধে নিতান্ত অর্বাচীন নই। পাখোয়াজ ধরে অশ্বিনী যখন ঘা দিতে লাগলো, তখন যেন মনে হল, গুরু গুরু শব্দে মেঘগর্জন হচ্চে কোথাও আকাশে। মেঘে মেঘে তার ধ্বনি, ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি। আসর এক মুহূর্তে জমে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল লোকজনের কোলাহল। সবাই উৎসুক নয়নে চেয়ে দেখচে, সবারই কানে গিয়েচে—ওই যে-লোকটি পাখোয়াজ বাজাচ্ছে, উনিই অশ্বিনীবাবু স্বয়ং! লোকের দৃষ্টিতে কি ঔৎসুক্য কি আনন্দ, মুখে কি সম্ভ্রম আর শ্রদ্ধা! আমি শিল্পী নই, কিন্তু ওস্তাদ শিল্পীর প্রতি এই মৌন শ্রদ্ধা আমার অন্তর স্পর্শ করলে। আমি নিজেও গর্ব অনুভব করলাম যে, অশ্বিনী আমার বাল্যবন্ধু। এতক্ষণ একে ভিখিরি অবাই দাস বোষ্টমের ছেলে বলে মনে মনে যে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেছিলুম, তার স্থান অধিকার করলে ওর প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়। এই বিস্ময়টা যেন আমি কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। এই সেই অশ্বিনী, অবাই দাসের ছেলে, দোচালা ঘরে বাস করতো, ভিক্ষে করে সংসার চালাতো ওর বাপ-মা।

অশ্বিনীর বাজনা থামলে পাখোয়াজ-বাজিয়ে ওর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—আশীর্বাদ করুন যেন আপনার মত হাত হয়। ম্যানেজার গদ্‌গদ কণ্ঠে বললে—সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে হয় হাত আপনার। দয়া করে একবার ডুগিতবলাটা—

অশ্বিনীকে এতক্ষণ দু'দিক থেকে দু'জনে পাখার বাতাস করেচে। আসরে বড় গরম। পাখোয়াজ-বাজনার শ্রমে অশ্বিনী ঘেমে উঠেচে। গ্রামের জমিদারের ছেলে আমি, ওর পাশে বসে নিজেকে নিতান্ত নগণ্য মনে করতে লাগলুম। পালা আরম্ভ হয়ে গেল। অশ্বিনী ওদের অনুরোধে বার-কয়েক পাখোয়াজ আর ডুগি-তবলা বাজালে। ওস্তাদের হাত দেখলুম বটে ওর সমস্ত বাজনার মধ্যে।

তৃতীয় অঙ্কের শেষে দুজনে বার হয়ে এলুম ফাঁকায়।

অশ্বিনী বললে—বাবু, এবার একটু চলবে?

—না ভাই। আমায় অনুরোধ কোরো না।

—কি খাবেন?

—কিছু খাবো না। চলো একটু চা খাই।

—উঁহু, ওতে আমার মৌতাত থাকবে না। আপনি খান। আসরে ওরা বাজাতে বলবে। সাদা চোখে হাত খোলে না—

আমি কৌতূহলের সুরে বললাম—অশ্বিনী, আজ বড্ড আনন্দ পেলাম। কতদিন তোরা গ্রাম ছেড়েছিস, তোদের কোনো সংবাদও পাইনি—তুই যে এত বড় হয়ে উঠেছিস তা আজ তোকে দেখে—

অশ্বিনী আমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। বললে—চলুন কিছু খেতে হবে।

—তা হবে না। আমি তোকে আজ খাওয়াব।

—তা কি হয়! আপনার খেয়ে তো আমরা মানুষ। আজ আমি খাওয়াব আপনাকে। আমি যেদিন আপনাদের বাড়ী যাবো, সেদিন খাওয়াবেন আপনি।

অশ্বিনীকে জোর করে খাওয়ালুম একটা খাবারের দোকানে সিংগাড়া আর সন্দেশ। ও ছাড়লে না আমাকে খাওয়াতে।

বাল্যকালের কথা, আমাদের গ্রামের কথা ও অনেক বলতে লাগলো। ওর মা বেঁচে নেই। ছোট ভাইকে কোথাকার দোকানে কাজে ভর্তি করে দিয়েচে। কালনার কাছে গোপীনাথপুরে অশ্বিনী বিবাহ করেচে। শ্বশুরের কাপড়ের দোকান কালনা বাজারে। একমাত্র মেয়ে, শ্বশুর চোখ বুজলে ওর স্ত্রীই সম্পত্তি পাবে।

বললাম, বাজনা শিখলে কোথায়?

ও হেঁসে বললে—ঝোঁক ছিল ওদিকে। ওস্তাদের দয়ায় আর আপনাদের আশীর্বাদে। বাবা ছিলেন গাইয়ে-বাজিয়ে, তাঁর সেই গুণটা অর্শেচে আমাতে। ওস্তাদ পেয়েছিলাম যাত্রার দলের বড় বাজিয়ে দুর্লভরাম সাধুখাঁকে। তিনি আমাকে হাতে ধরে শেখান। যজ্ঞেশ্বর নন্দীর কাছে তবলা শিক্ষা করি। আজ্ঞে, তা আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে এমন সব ওস্তাদ পেয়েছিলাম, যাদের এক ডাকে লোকে চেনে। পয়সাও রোজগার করি। কেন মিথ্যে বলবো, যেদিন যে আসরে ঠিকে বাজাবো, তিন টাকা রাত; আর খোরাকী—দুধ আর ইয়ে—ওই যা বললাম—মৌতাত। তা বায়না লেগেই আছে দাদাবাবু। মাসে একশ টাকা কেউ মারে না, রাজার হালে খাওয়া-দাওয়া—আর সে আর আপনাদের সামনে কি বলবো—খাতিরও কিছু করে লোকে।

এই ঘটনার পরে অনেক দিন হয়ে গিয়েচে। প্রায় পনেরো-ষোলো বছর হবে।

অশ্বিনীর সংগে আমার আর কখনো দেখা হয়নি।

গত বৈশাখ মাসে একদিন বাইরের ঘরে বসে আছি, একটি গরিব স্ত্রীলোক একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে আমাদের বাড়ীর নীচে ভিক্ষে করতে ঢুকলো। আমার অবস্থাও যথেষ্ট খারাপ হয়ে গিয়েচে, যৌবনের সে উদ্দাম স্রোত আমাকে এক শুষ্ক বালুচরে বসিয়ে কোন্ দিক দিয়ে যে নিঃশব্দে অন্তর্হিত হয়েচে তার সন্ধানও পাই নি।

বেশ একটু পরে স্ত্রীলোকটি আধখানা কুমড়ো আর কিছু চাল আঁচলে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

আমার বড় মেয়েকে জিগ্যেস করলাম ডেকে—ও কে? ওকে তো কখনো দেখিনি?

বড় মেয়ে যা বললে তার মোট মর্ম এই, ওরা ওপাড়ার গৌরদাস বৈরাগীর বাড়ী এসেচে। এই গ্রামেই আগে ওর শ্বশুরের বাড়ী ছিল। ওর স্বামীর নাম ছিল অশ্বিনী। যাত্রাদলে বাজনা বাজাতো। ওর স্বামী মারা গিয়েচে আজ চার পাঁচ বছর। কিছু রেখে যায়নি, নেশাভাঙ করে সব উড়িয়ে দিয়ে গিয়েচে। কেউ কোথাও নেই ওদের। গৌরদাস ওই বৌটার কি রকমের ভাশুর, তাই ওদের আশ্রয়ে এসে উঠেচে। গৌরদাসেরও তো অবস্থা খারাপ, কাজেই ওকে ভিক্ষে করে চালাতে হয়—নইলে উপায় কি।

উপায় যে কিছু নেই, তা নিজেকে দেখেই আজকাল বেশ বুঝতে পারি।

সেকথা অবিশ্যি আর বড় মেয়েকে বললুম না।

ননীবালা

ননীবালা মেয়েকে বললে, সুপুরি কুড়িয়ে আন তো কালী রায়ের গাছের তলা থেকে!

মেয়ে বললে—হ্যাঁ, খান্ডা পিসি দাঁড়িয়ে আছে, বলেছে এবার সুপুরি কুড়ুতে হ'লে পয়সা দিয়ে যাও। সুপুরি এমনি পাওয়া যায় না বাজারে।

ননীবালা এ গাঁয়েরই মেয়ে, তার রাগ হয়ে গেল খুব। কালী রায়ের বুড়ী দিদিকে ঘাটের পথে পেয়ে খুব করে শুনিয়ে দিলে।

বুড়ী বললে—তুমি ভাই অনর্থক তিলকে তাল কোরো না। সুপুরি কুড়ুতে এসেছিল সেদিন, সর্বদা কুড়ুতে আসে, তাই বললাম আমাদেরও তো দরকার আছে, কেন আস রোজ রোজ?

—সর্বদা কুড়ুতে যাবার দায় পড়েছে!

—রোজ আসে, আমি বলছি। তুমি ভাই জানো না।

—কে বললে রোজ যায়?

—আমি জানি। রোজ দেখি যেতে।

—আচ্ছা বেশ। এবার যায় যদি, পয়সা নিয়ে যাবে।

কালী রায়ের দিদি পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াতে লাগলো—বড্ড গোমর হয়েছে ঐ ননীর। পয়সা দেখাতে আসে আমার কাছে! এমনি আদ্দেক দিন হাঁড়ি চড়ে না, আবার পয়সার গোমর! ঝি-গিরি করে তো চালাচ্ছিস্—পয়সা দেখাতে লজ্জা করে না?

ননীর মেয়ের নাম নালু, ভালো নাম সরবালা। নালু এর গাছের লিচু, ওর গাছের কুমড়োর জালি, শশার জালি চুরি করে আনে। পাড়ার কারো গাছে এঁচোড় আর পাকবার জো নেই নালুর জন্যে।

ননী কিন্তু তা জানে না। খিদের জ্বালায় সরবালা যা চুরি করে, রাস্তাতেই তা খেয়ে ফেলে। বিকেলে কি ভীষণ খিদে পায়, কে দেয় একগাল চাল ভাজা? রায়েদের গাছে কি মাদার পেকে আছে! পাকা যেমনি, বড়ও তেমনি। ঠেলে উঠলো গাছে। রায়ঠাকুরমা দেখে বললে—ও মা, গেছো মেয়েছেলে কখনো দেখিনি! তুই এমন গেছো হলি কবে? নাম নাম—

—দুটো মাদার পাড়চি ঠাক্‌মা—

—খেলেই জ্বর! কেন ওসব ছাই খাবি?

কেন সে খাবে সে-ই জানে। মা ও-পাড়ার দামাির কাকার বাড়ি গোয়াল পরিষ্কার করে ও বিচালি কেটে জল তুলে আটটা গরুকে জাব দেয়। এসব করতে সন্ধ্যে। সন্ধ্যের পর মা বাড়ি এসে ভাত রান্না করবে, তবে খেতে দেবে। পেট যে এখুনি জ্বলবে, তার কি? কি খাবে সে, ভেবে পায় না। শুধু সে নয়, পলটু, হাবু, নন্তু, ননকু, রেপু, নেপু সবাই আসে। ওদেরও বাড়িতে ওই অবস্থা। দুপুরে ভাত খাও, তারপর বিকেলে হাজার খিদে পাক না কেন, খাবার নেই। তবে সে একটু আসে ঘন ঘন। তার মা বাড়িতেই থাকে না যে। সে কি করবে? ওরা চাইলে পায়, তার তো চাইবার লোকই নেই। অথচ খিদে —কি ভীষণ খিদে! পেটের মধ্যে কেমন যেন কামড়ায় খিদের জ্বালায়।

রাত্রে নালুর জ্বর হ'ল।

ননী পড়ে গেল মুশকিলে। মেয়ের গা দেখলে পুড়ে যাচ্ছে। কি খেতে দেবে, রুগীর পথ্যি কি আছে ঘরে? ডাক্তারই বা কোথায়? এক আছে সুরেন ডাক্তার। দু টাকার কম এ রাত্রে আসবে না। মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখে বললে—যেমন তুমি তেমনি হয়েছে আমার অবস্থা। কি যে করি—

রাত্রে বড্ড জ্বরটা বাড়তে সে চেঁচিয়ে ডাক দিলে প্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রীকে—ও জ্যাঠাইমা—জ্যাঠাইমা—ইদিকে একবার আসুন, খুকীর বড্ড জ্বর—

প্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রী চোখ মুছতে মুছতে উঠে এলেন ঘুম থেকে। অনেক রাত। দেখে বললেন—তাই তো, বড্ড জ্বরটা বেড়েছে। কুইনেনের বড়ি আছে আমার কাছে। কাল সকালে খাইয়ে দিও—

—দেখুন তো জ্যাঠাইমা, গরীবের ঘরে কি কাণ্ড—

—তাই তো বাপু। সবই অদেষ্ট তোমার। তোমার বাবা ভালো দেখেই বিয়ে দিয়েছিলেন। দোজবরে তাই কি? দিব্যি চেহারা। কলকাতায় বাসা। ইন্‌জিনিয়ার লোক। দু পয়সা আয় ছিলো, সইলো না তো কি হবে! অল্প বয়সে কপাল পুড়লো।

—সে তো একশোবার জ্যাঠাইমা। নইলে খুকীকে আজ দুটো পেট ভরে ভাত দিতে পারি নে! এ কি কম দুঃখু? পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি, তাতে আমার এ গাঁয়ে অপমান নেই। এ গাঁয়ের মেয়ে যখন আমি। বলুন—ঠিক কি না?

—সে কথা তো বটেই মা। তার আর কি হবে বলো। সবই অদেষ্ট। আমি গিয়ে কুইলেনের বাড় নিয়ে আসছি—

—এখন দরকার নেই জ্যাঠাইমা, কাল সকালে পাঠাবেন।

—মা, রাতটা আজ এখানেই থাকবো?

—না জ্যাঠাইমা। আমি বেশ থাকবো এখন। আপনি মায়ের মত, তাই কথাটা বললেন। এ গাঁয়ে ও কথাও কেউ বলবে না।

ননীবালা সত্যিই পরের বাড়ি ঝি-গিরি করে মাসে পাঁচ টাকা আর একবেলা ভাত পায় এক থালা। ভাত সে বাড়ি নিয়ে আসে। যে বাড়িতে কাজ করে, তারা ভাত দিতে কৃপণতা করে না, বড় বড় ধানের গোলা তাদের বাড়িতে পাঁচ-সাতটা, বাগান, পুকুর, জমি-জমা সব আছে। মা আর মেয়ে সেই একথালা ভাত খায়।

ননীবালার বিয়ে হয়েছিল কলকাতার এক বড় ইনজিনিয়ারের সঙ্গে। দোজবরে পাত্র হোলে কি হবে, বেশ ছিলেন তিনি দেখতে শুনতে। বয়েসটা একটু বেশী ছিল, ননীবালা গিয়ে দেখেছিল তার বয়েসের দুটি সৎমেয়ে আছে তার। সৎমেয়ে দুটি কোথায় থেকে পড়তো, বাড়িতে আসতো খুব কম। মাত্র দু বছর স্বামীর সঙ্গে সে তেতলার বাসায় কাটিয়েছিল পরম সুখে, এর মধ্যে বার কয়েক দেখা হয়েছিল সৎমেয়ে দুটির সঙ্গে।

বড় মেয়েটির বিয়ের সব ঠিকঠাক। সে সময়েই স্বামীর অসুখ করলো। বিয়েও হ'ল, মাসখানেকের মধ্যেই স্বামী মারা গেলেন। তারপর বড় মেয়ের স্বামী ছোট মেয়েটিকেও নিয়ে গেল সুদূর পশ্চিমে তার কর্মস্থলে।

সংশাশুড়ী একা বাসায়। ননীকে কেউ বললেও না সে কি করবে, কোথায় যাবে, কি খাবে। সরবালা তখন এক বছরের শিশু।

দরজায় এসে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছে, বড় সৎমেয়ে সুললিতা তার ছোট বোন সীমাকে নিয়ে উঠছে মোটরে স্বামীর সঙ্গে। ননীবালা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছে।

সুললিতা কাছে এসে দাঁড়ালো। ননীর প্রায় সমবয়সী তার এই সৎমেয়েটি, বরং কিছু বড়। সীমাই ননীর সমবয়সী। সুললিতার পরনে দামী ভয়েলের শাড়ি, হাতে পুঁতির মালা দিয়ে তৈরি ভ্যানিটি ব্যাগ।

ননীবালা বললে—এসো মা, সাবধানে থেকো। চিঠিপত্তর দিও।

ননীবালা পাড়াগাঁয়ের লাজুক মেয়ে, নিজের কথা কিছু বলতে জানে না। সুললিতা বলেছিল একদিন তার স্বামীকে—ওর অভাব কি, বাবা সর্বস্ব ওর পেটে ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছেন।

ননীবালার পেঁটরাতে নগদ বাইশ টাকা আছে। ঐ তার শেষ সম্বল। ভগবান জানেন।

ননীবালার গহনাগুলো সৎমেয়ে দুটি চেয়ে নিয়েছিল বিয়ের সময়। বিশেষ করে সুললিতা। ওগুলো নাকি তার নিজের মায়ের গায়ের আদরের গয়না। ন্যায্যমত নাকি ওরই প্রাপ্য।

সুললিতা বেশী কিছু না বলেই বিদায় নিলে।

জামাই এসে প্রণাম করলে। এই লোকটিই প্রথম তার সঙ্গে কথা বললে যাবার সময়।

—মা, তাহলে আসি।

—এসো বাবা। চিঠি দিও।

—আপনি সাবধানে থাকবেন কিন্তু। একা রইলেন এখানে। দিনকাল বড্ড খারাপ পড়েছে!

—তা তো বটেই।

—চিঠি দেবেন—

—তোমরা আগে দিও—

পেছন থেকে সুললিতা বলে উঠলো—'ওগো, দেরি করো না। সাড়ে দশটা বাজে।'

ননীবালা ফিরে এসে ঘরে ঢুকে মেয়েকে কোলে তুলে নিলে। বললে—খুকী, ওরা চলে গেল। আমাদের ফেলে রেখে চলে গেল। কার কাছে ফেলে রেখে চলে গেল রে? দেওয়ালে স্বামীর ফটোখানার দিকে চেয়ে ওর চোখ দুটি বেয়ে ঝরঝর করে জল পড়লো।

এর মাস দুই পরে মেয়েকে নিয়ে ননী বাপের বাড়ি চলে এসেছিলো এবং সেই থেকেই এখানে আছে।

আজ দশ বছর আগেকার কথা এসব।

সৎমেয়েরা কোনো চিঠিপত্র দেয় নি, কোনো খোঁজখবরও নেয় নি।

সরবালা সেরে উঠলো না। সেই থেকে রোজ সন্ধ্যার সময় একটু একটু জ্বর হয়। না আছে ওষুধ, না আছে পথ্যি।

ননী যখন পরের বাড়ি কাজ করতে যায়, তখন সরবালা একাই বাড়িতে বিছানায় শুয়ে থাকে। কোনোদিন জ্বর আসে, কোনোদিন আসে না। যেদিন ভালো থাকে, সেদিন কামার-বাড়ির হর আর মতি তার সঙ্গে কড়ি খেলতে আসে। যেদিন জ্বর আসে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। একাই শুয়ে থাকে।

ননী কিন্তু খুব শক্ত মেয়েমানুষ। কিছুতেই সে দমে না। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে সে বেটে কাটে রোজ। আগে বেটে কাটাতে জানতো না, ক্রমে শিখে ফেললে। এক পোয়া থেকে দেড় পোয়া দড়ি কাটতো প্রথম প্রথম, ক্রমে এক সের পর্যন্ত কাটতে লাগলো। রাত দশটার মধ্যে এক সের দড়ি বেশ সরু করে কাটতে পারে। প্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রী একদিন এসে বললে, বেটে কাটছো মা? বেশ বেশ।

—শিখিচি জ্যাঠাইমা। কিছু আয় করা তো চাই।

—কোথায় শিখলি?

—বাড়িতে। কে আবার শেখাবে। সন্নিসি কাকা বুড়ো বয়সে বেটে কাটতো। তার কাটা দেখেছিলাম অনেক দিন আগে। সেই থেকে শিখেছি।

সরবালার পা ফুললো, মুখ ফুললো, পুরনো ঘুষঘুষে জ্বর। সকলে বললে—এর একটা ব্যবস্থা কর, নইলে খারাপের দিকে যাবে।

ননী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে একদিন অন্তর যেতে লাগলো। ডাক্তার সাহেবকে বুঝিয়ে বললে, মেয়ের রোগের ইতিহাস।

মাস দুই ধরে একদিন অন্তর কামাই করবার ফলে চাকুরি গেল ননীর। একথালা ভাত আসে না, টাকা ক'টাও গেল। এমন হ'ল খাওয়া জোটে না। সরবালা সেরে উঠেছে একটু, কিন্তু খাবার অভাবে শুধু কাঁচা পেয়ারা খায় হিমি ঠাকরুণের পেয়ারাতলায় বসে বসে।

এর ওপর এক নতুন বিপদ বাধলো।

যাদের বাড়ীতে ননী ঝি-গিরি করতো, কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তারা খুব চটে গেল। তাদের হাতে গ্রামের কনট্রোলের দোকানের কাপড় দেওয়ার ভার। তিন মাসের মধ্যে একখানা গামছাও তারা দিলে না ননীবালাকে। কত অনুনয় করেও তাদের মন গলানো গেল না। বাইরে বেরুনো যায় না আর কাপড়ের অভাবে। তালির ওপর তালি লাগিয়ে যতদিন চালানো যায় চললো, আর চলে না, এমন অবস্থায় এসে পেঁছুলো।

বিকেল বেলা ননী মেয়েকে বললে—হ্যাঁ রে, বেটের দড়ি কাটতে বসবি?

—সন্ধ্যের সময় বসবো মা।

—তেল নেই, অন্ধকারে হবে না। এখন বোস। তবু আনা চারেক পয়সা হবে সকালবেলা।

—মা, একটা কথা শুনবে? আমি ঢ্যাঁপের বীচি আনবো মদ্‌লার বিল থেকে। তুমি ঢ্যাঁপের খই করতে জানো?

—খুব জানি। তুই আনতে পারবি? কার সঙ্গে যাবি সেখানে? বিলের জলে কেউটে সাপের আড্ডা।

—বাগ্দি-বৌ যাবে, আর আমি যাবো। বাগ্দি-বৌ বলছিল, ঢ্যাঁপের খই খেলে এক বেলা কেটে যাবে। রাত্রে আমরা ঢ্যাঁপের খই খাবো।

ননীর মুখে দুঃখের হাসি দেখা দিল। তার আদরের মেয়ে আজ দুলে-বাগ্দিদের মেয়ের মত ঢ্যাঁপের খই খেয়ে রাত কাটানো খুসির ব্যাপার বলে মনে করছে।

মেয়েকে বললে,—নালু, কাউকে বলিস্‌নে যে ঢ্যাঁপ তুলতে যাবি। এ গাঁয়ে আবার ইদিকে নেই, ওদিকে আছে কি না।

সরবালা চলে গেল বাগ্দি-বৌ নীলার সঙ্গে।

ননী বললে,—ও নীলি, দেখিস্ দিদি, নালু যেন বেশী জলে যায় না। পদ্ম গাছে বড্ড সাপ থাকে।

সরবালার মন খুশিতে ভরে উঠলো। মাদ্‌লার মস্ত বড় বিল পদ্ম আর নালফুলের বনে ভরে আছে। নীল আকাশ উপুড় হয়ে আছে বিলের ওপর। যদিও বর্ষাকাল, আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। শরতের আমেজ আছে রুদ্দুরের গায়!

বিলের ধারে নল-খাগড়ার ঝোপে তিত্‌পল্লার ফুল ফুটেছে। বাগ্দি-বৌ বললে—নালু, করমচা খাবে মা? আয় এই ঝোপে কত করমচা আছে—

—খাবো খাবো। তবে নীলি একটা কথা। মাকে কিন্তু বললে খাবো না। করমচা খাওয়ার কথা শুনলে মা বকবে। জ্বর হচ্ছিল কিছুদিন আগে।

—তবে খেও না মা। থাক গে।

—না খাবো। তুই তবে বললি কেন? আমি ঠিক খাবো—

এক মুঠো ডাঁশা করমচা চিবোতে চিবোতে নালু ও নীলি জলের ধারে এসে দাঁড়ালো। নালু তো অবাক। কত বড় বিলটা! কত পদ্ম ফুটে আছে! ওপারে ওরা কি করছে? মাছ ধরছে? কি মাছ? কই, মাগুর?

নালু ডাক দিয়ে বললে,—কি দর, ও জেলে-কাকা?

—মাছ নেবা খুকী?

—দর বলো না।

—বাছা বাছা বিলির কই, তিন টাকা সের। আর মাগুর মাছ সাড়ে তিন টাকা।

দাম শুনে কিনবার বাসনা উবে গেল সরবালার। বাপ রে, মাসে মা মোটে পাঁচ টাকা মাইনে পেতো, আমি কিনবো তিন টাকা সেরের মাছ! সে পাঁচ টাকাও আজকাল আর পায় না।

হঠাৎ বাগ্দি-বৌ বললে,—নালু মা, মাছ ধরবো?

—তুমি?

—তুমি আর আমি। একজনের কাপড় খুলতে হবে। তুই ছেলেমানুষ, কাপড় খুলে ফেল।

—যাঃ!

—কে দেখছে? কোন লোক নেই এ দিগরে। বিল আর মাঠ।

নালুর কাপড় খুলে নিয়ে বাগদি-বৌ ওকে জলে নামালে। ছাঁকা দিয়ে দুজনে মাছ ধরতে লাগলো। পদ্ম গাছের তলায় আর শেওলার দামের মধ্যে। বৃথা পরিশ্রম। আধ ঘণ্টা জল-কাদা মাখাই সার হ'ল। সন্ধ্যা হবার দেরি নেই। বকের দল ছায়াভরা নীল আকাশের গা বেয়ে পাল্লার বড় বিলের দিকে চলেছে। বিলের উত্তর পাড়ে বন-জাম গাছের ডালে ডালে কালো বাদুড় ঝুলছে। ঘুংরি পোকা ঘুর্-র্-র্ শব্দ করে ডাক শুরু করে দিয়েছে ঘাসের বনে।

নালু বললে, চল নীলি। মা বকবে—এমন সময় তার পায়ের তলায় পদ্মবনের মধ্যে কি একটা জিনিস পিছলে গেল, সেটাকে সে পা দিয়ে চেপে ধরেছিল অন্যমনস্ক হয়ে।

চক্ষের পলকে নালু চেঁচিয়ে উঠলো, সাপ! সাপ!—আমাকে খেয়ে ফেললে। ওমা—ওমা—উঁহু—উ—হু—

নীলি লাফিয়ে এল ওর কাছে—ভয় কি? ভয় কি? কোথায় সাপ?

—আমাকে একেবারে খেয়ে ফেলেছে--ও নীলি—আমি মরে গেলাম—মাকে বোলো—

পা দিয়ে চেপে ধরিছি—উ'হ্হ্—

নীলি জলে ডুব দিয়ে তার নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে নালুর পায়ের তলা দেখতে গেলো এবং পরক্ষণেই প্রায় আধসের-আড়াইপোয়া ওজনের মস্ত একটা মাগুর হাতে তুলে ভেসে উঠলো, হাঁপাতে হাঁপাতে হাসিমুখে বললে,—এই দেখো তোমার সাপ—মাগুর মাছ কাঁটা হেনেছে। আর ও ভাবছে সাপে খেয়ে ফেললে—সাপ অত সোজা নয়—

—দেখি, দেখি। ওঃ, এ যে মস্ত বড় মাগুর—

নালু পা দিয়ে কাদার মধ্যে সেটাকে চেপে ধরাতে মাছটা উপরি উপরি কাঁটা হেনেছে। পা টনটন করছে ওর। মাছটা ডাঙায় তুলে এনে ওর সব যন্ত্রণা সেরে গেল। ওরা অন্ধকার বাঁশবনের আমবনের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরলো।

নীলি বললে, মাছটা তুমিই নেও সবটা নালু। তোমাকে কাঁটা হেনেছে,—আর তুমিই পা দিয়ে চেপে ধরলে—

—না নীলি। তোমার আদ্দেক আমার আদ্দেক। এসো আমার সঙ্গে—

অন্ধকার উঠোনে পা দিয়েই নালু চেঁচিয়ে উঠলো—মাগো—কি এনেছি মা, মস্ত এক মাগুর মাছ—তার পরেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কে একজন চমৎকার মেয়েমানুষ সেজে-গুজে ওদের ঘরের ছোট্ট বারান্দাতে বসে মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। ওর মা বললে,—এদিকে এসো। দিদি এসেছেন, প্রণাম করো। তোমার মেজদিদি—

নীলি পেছন থেকে জিগ্যেস করলে—কে উনি দিদি?

ননীবালা গর্বের সুরে বললে,—আমার মেজ মেয়ে সীমা। তিনটে পাস। কলকাতার মেয়ে-ইস্কুলে কাজ করে। সোনার টুকরো মেয়ে। নালুকে নিতে এসেছে। বলছে, মা, আমার কাছে দাও, আমি নিয়ে গিয়ে ওকে লেখাপড়া শেখাবো। ছোট বোনটাকে এভাবে গাঁয়ে ফেলে রাখতে দেবো না। তা আমি বলছি,—তোমাদের জিনিস তোমরা নিয়ে যাবে, আমার বলবার কি আছে! তোমরাই তো ওর অভিভাবক, আমি কি বুঝি, মুখ্যু মা তোমাদের—

সীমা উঠে এসে নালুকে জড়িয়ে ধরলে দু'হাত দিয়ে।

ওর মা বললে—তোমার কাপড়ে কাদা লাগবে, বোসো মা সীমা, আমি আগে ওকে ধুইয়ে মুছিয়ে দিই।—

সীমা বললে,—আমি দিচ্ছি। কেন, ও কি আমার বোন নয়? কি চমৎকার দেখতে হয়েছে খুকী! নাম কি বিচ্ছিরি রেখেছো মা! সরবালা! সরবালা আবার কি? আমি নাম রাখবো শকুন্তলা, কি সুন্দর চোখ দুটি। এক বছরের ছোট্ট খুকী দেখেছিলাম—

সত্যি, আজ কি অদ্ভুত সকালটা হয়েছিল! কার মুখ দেখে উঠেছিল ননী তাই ভাবছে। বিকেলে সে পুকুর থেকে কাপড় কেচে এসেছে সবে, এমন সময় একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসে ওর দরজার সামনে দাঁড়ালো। বেলা তখন আর নেই। ননী একদম চিনতে পারেনি। দশ বছর পরে সে দেখলে সীমাকে। উনিশ বছরের সীমার বয়েস আজ উনত্রিশ। চোখে আবার সোনা-বাঁধানো চশমা।

সীমা রাতে কত কথা বললে। সুললিতা দিদি মজঃফরপুরে থাকে তার স্বামীর কর্মস্থলে। সীমা কলকাতার বোর্ডিংয়ে থেকে পড়েছে। বাবার বাক্সে টাকা ছিল, ডাকঘরে টাকা ছিল, সব নিয়েছে বড়দি আর তার স্বামী। সীমা জানতে পেরে বলেছিল, তোমরা গরীব মাকে ফাঁকি দিলে। তাঁর কি আছে? তিনি তাঁর ছোট্ট মেয়েটাকে কি করে মানুষ করবেন? সুললিতা নাকি বলেছিল—যা, যা, বড্ড যুধিষ্ঠির তুমি! সৎমা গেঁয়ো মেয়ে না হলে সেই আমাদের সব গপ্‌পায় পুরতো কিনা? সৎমা, সৎবোন কখনো আপন হয় না।

সীমাকে খেতে দিয়ে ননী বললে,—কিছু খেতে দেবার ছিল না। ভাগ্যিস, মাগুর মাছটা এনেছিল নালু বিল থেকে ধরে! বুঝলি নালু, তোর মাছ ধরা সাত্যোক হ'ল।

সীমা পরদিন বিকেলে সরবালাকে নিয়ে নৌকোয় উঠলো। যাবার সময়ে বললে,—মা, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। বাসা ঠিক করি আগে। বাসাটা ছোট। শকুন্তলার জন্য (এর মধ্যেই সে নালুর নতুন নাম দিয়ে ফেলেছে) ভেবো না। ওকে গিয়েই ইস্কুলে ভর্তি করে দেবো। জন্মাষ্টমীর ছুটিতে নিয়ে এসে দেখিয়ে যাবো একবার। ও যে আমার বাবার

মেয়ে, তা আমি কি ভুলতে পারি মা? পুজোর পর তোমাকেও যেতে হবে। রান্নার ডিপার্টমেণ্ট তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমরা দুই বোন লেখাপড়া নিয়ে থাকবো।—কি বলিস্ শকুন্তলা?

আমার ডাক্তারী

আমাকে দত্তমশায় ডেকে বললেন—ও ডাক্তারবাবু, জল খেয়ে নিন একটু—

আমি বললাম—এখন থাক্, এর পরে হবে।

—না, না, সে কি হয়? আসুন সামান্য কিছু।

আমার এ সম্বন্ধে একটু বাধ-বাধ ঠেকে। রোজ রোজ আমাকে বাইরের ঘর থেকে ডেকে এনে জলখাবার খাওয়ানো চাই-ই। আমি ডাক্তারী করি পাড়াগাঁয়ে—নলিনী দত্ত-মশায়ের বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে থাকি। আমার কাছে ভাড়া তিনি নেন না। বলেন—না, না, ব্রাহ্মণ দেবতা। আপনি আমার বাড়িতে দয়া করে বাস করচেন, এতেই আমার ভিটে পবিত্র হয়ে যাচ্ছে। আবার ভাড়া নেবো এই পাড়াগাঁয়ে আপনার কাছে?

সে যাক্ গে। ভাড়া না হয় না নিলেন। কিন্তু রোজ সকালবেলা ডেকে আমায় জল-খাবার খাওয়ানো চাই। মুড়ি, গুড়, চিঁড়ে, নারকোল—যেদিন যা জোটে, একটি পাথরের খোরা ভর্তি করে দেবেন। অত খাওয়া আমার অভ্যাস নেই বললেও শুনবে না। আমার লজ্জা করে রোজ রোজ খেতে। ভাড়া নেবেন না, তার ওপর রোজ জলখাবার! এও এক-রকম জুলুম ছাড়া আর কি?

দত্তমশায়ের মেয়ে এসে বললে—ডাক্তারবাবু, আপনি না খেলে বাবা কি কিছু খাবেন? দাঁতে কুটো দেবেন না।

—কেন?

—ব্রাহ্মণ বাড়িতে অভুক্ত থাকলে বাবা খাবেন না।

—বটে! আচ্ছা চলো।

সেদিন গিয়ে দেখি চালভাজা, ছোলাভাজা, আর ঝুনো নারকোল কোরা। পৃথক বাটিতে খেজুর গুড়। চায়ের ব্যবস্থা এদের বাড়িতে নেই, সেকেলে গৃহস্থ, চা খাওয়ার রেওয়াজ গোড়া থেকেই গড়ে ওঠেনি।

আমি পাস-করা ডাক্তার নই। বাড়িতে বই দেখে হোমিওপ্যাথিক শিখে আগে গ্রামেই ডাক্তারি করতাম। কিন্তু গ্রামের লোক পয়সা দিতে চায় না। ধার বাকি ফেলে আর শোধ করে না। তাই দেখেশুনে এই রঘুনাথপুরে এসে বসেচি আজ প্রায় তিন চার মাস। আমাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে—আট-ন' ক্রোশ। রেল নেই, হাঁটা-পথে আসতে হয়। এ গ্রামে এসে প্রথমে এক চাষী-কৈবর্ত গৃহস্থবাড়িতে দিন পনরো ছিলাম। হঠাৎ একদিন সকালে নলিনী দত্তমশায় গিয়ে আমায় বললেন—প্রাতঃপ্রণাম হই ডাক্তারবাবু। আপনার নিবাস কোথায়?

—আসুন, বসুন। আপনার এ গ্রামে বাড়ি?

আমার বাড়ির মালিক আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে—উনি এ গাঁয়ের একজন কর্তা-ব্যক্তি লোক। ওঁর নাম নলিনী দত্ত।

দত্তমশায় তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—না, না, কর্তা না হাতী! ও সব কিছু না। তা গিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম একটা অনুরোধ করতে।

—কি, বলুন।

—আমার বাড়িতে দয়া করে আপনাকে থাকতে হবে। আমার বাইরের ঘর আছে। কোনো অসুবিধে হবে না।

—ভাড়া কিরকম দিতে হবে?

—আপনার নিজের বাড়ি। ভাড়া দেবেন কাকে? চলুন দিকি জিনিসপত্তর নিয়ে!

ভারি অদ্ভুত লোক তো! কিছুতে ছাড়লেন না। লোক পাঠিয়ে জিনিসপত্তর নিয়ে

গেলেন মুকুন্দের বাড়ি থেকে। গত মাঘ মাসের কথা। সেই পর্যন্ত এখানেই আছি।

আজ নলিনী দত্ত বাইরে এসে বললেন—এখন কোথাও যাবেন?

—না।

—রুগী কি রকম হচ্ছে?

—মন্দ না।

—রোজ কি রকম হয়?

—তার কিছু ঠিক নেই।

—দৈনিক দুটো করে টাকা তো হওয়া চাই-ই।

—তা এখনো হয়নি।

—ইয়ে, রাঁধবেন আজ একটু দেরিতে।

আমি তখনই বুঝেচি, কোনো একটা কিছু দিতে চাইচেন। রোজ রোজ নেওয়াটা ঠিক নয়। চক্ষুলজ্জায় বাধে না? কি একটা ওজর করব ভাবচি, এমন সময়ে দত্তমশায় বললেন—একটা বড় মাছ আজ নেদের বাগান পুকুর থেকে ধরতে বলেচি। রসিক সর্দার বলে আমার এক বাল্যবন্ধু, সে-ই নিয়ে আসবে। আপনাকে মাছ একটু দেবো।

—ও, আচ্ছা বেশ।

আর কি বলি। রোজই এই রকম চলচে।

দুপুরের পর হঠাৎ চারজন লোক এসে হাজির। হাতে পোঁটলা, কাঁধে ছাতি। দত্তমশায়ের কাছে খবর গেল। তিনি খেয়ে একটু শুয়েছিলেন। শুনে বাইরে এলেন। ওঁদের দেখে আনন্দে বিগলিত ও কৃতার্থপ্রায় হয়ে বিনীত সুরে হাতজোড় করে বললেন—আসুন আসুন। পরম সৌভাগ্য। ওরে, ও দীপু, গা-পা ধোবার জল দিয়ে যা—

দীপু দত্তমশায়ের বিধবা মেয়ে। বাড়িতে অন্য মেয়েমানুষ নেই। হাত-মুখ ধোওয়ার জল সে-ই নিয়ে এল। দত্তমশায় বললেন—তা হলে আপনাদের আহারের যোগাড় করি?

ওঁদের মধ্যে একজন বললেন—হ্যাঁ, তা হোক।

আবার বেচারী দীপুকে অসময়ে আগত এই চারজন জোয়ান অতিথির জন্যে রান্না করতে হয়। তাই কি ভাতে-ভাত রান্না? তা হবার জো নেই। দত্তমশায় বসে তদারক করবেন, অতিথিদের পান থেকে চুন না খসে। এরা নেয়ে এসে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে রইল। দত্তমশায় ধোপদস্ত চারখানা ধুতি বের করে দিলে তবে পরলে। তারপর জলযোগ সেরে ওরা যখন বসে তামাক খাচ্চে তখন কৌতূহল আর না চাপতে পেরে জিগ্যেস করলাম—আপনাদের নিবাস?

দুজনে বললে, হাটগাছা। অন্য দুজনের বাড়ি অন্য এক গাঁয়ে—বললাম—দত্তমশায় বুঝি আত্মীয়?

একজন বললেন—না, আত্মীয় নন।

পরে শুনলাম ওঁরা এখানে আসেন খাজনা আদায় করতে।

বছরে একবার বা দুবার আসেন এবং এখানেই ওঠেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামে এঁদের নিজের নিজের বিষয়সম্পত্তি আছে। প্রতিবার এসে দশ-বারো দিন থাকেন। খাজনা হঠাৎ তো আদায় হয় না, একজন প্রজার কাছে একবারের জায়গায় দশবার ছুটতে হয়, তবে তারা পয়সা বের করে।

এবারও রইলেন প্রায় দশ দিন। যতক্ষণ একটি প্রজার কাছেও খাজনা বাকি থাকবে, ততদিন এঁরা নড়লেন না। আর অসীম ধৈর্য আর আতিথেয়তা দেখলাম দত্তমশায়ের। এক একবার মনে হোত পায়ের ধুলো নিই দত্তমশায়ের।

সকাল থেকে ছুটোছুটি করচেন কোথা থেকে গলদা চিংড়ি মাছ আনা যায়, ভালো কই মাছ কি করে সংগ্রহ করা যায়, অমুকের বাড়ি থেকে পটল আনচেন, অমুকের বাড়ি থেকে মানকচু আনচেন। সর্বদা চেষ্টা অতিথিদের কি করে খুশী করবেন, কি করে ভালো খাওয়াবেন। এরাও জানে দত্তমশায়ের হোটেলে যতদিন ইচ্ছে থাকো, কেউ বারণ করবার নেই।

আমার কষ্ট হোত দীপু বেচারীর জন্যে।

হোটেলের রাঁধুনী তো আর দ্বিতীয় নেই।

দুবেলা রান্না, তাও কি সোজা রান্না, হরেক রকমের রান্না, গরমজল, কাপড়ে সাবান দেওয়া, সর্দিকাশির পাঁচন জ্বাল দেওয়া—সব ঐ বেচারীর ঘাড়ে।

—ওরে দীপু, সরকার মশায়ের বড্ড সর্দি হয়েচে, একটু পাঁচন করে দিস্ তো।

দীপু অমনি বেরুলো গুলঞ্চের লতা আর বাসক ছাল যোগাড় করতে।

একদিন দেখি বকচেন মেয়েকে।

—তোর একটু হুঁশ করে চলা উচিত। কাল বিশ্বেস মশায়কে মশারি টাঙিয়ে দিলি—তা দেখলিনে কোথায় ছেঁড়া, তিনি সারারাত ঘুমুতে পারেননি মশার উপদ্রবে। কেন, দেখে তখনই একটু সেলাই করে দিলেই মিটে যায়। তোর হুঁশ বড় কম—

মনে মনে ভাবলাম, ওর হুঁশ যদি কম হোত তবে আপনার এ অবারিত-দ্বার হোটেল কোন্‌কালে দরজা বন্ধ করে লালবাতি জ্বালতো। কি রত্ন পেয়েছেন ঘরে, তা ভালো করে চোখ চেয়ে দেখুন।

একদিন দেখি, বাড়ির সামনের জঙ্গলের মধ্যে দীপু কি করচে। বেলা পড়ে গিয়েচে, সন্দে হয় হয়, বললাম—কি ওখানে দীপু?

—কচুর ডাঁটা কাটবো।

—এখন কেন?

—ওনারা কাল কচুর শাক খাবেন বাবা বললেন। তাই এখন তুলে ধুয়ে রাত্রে কুটে রেখে দি। সকালে সময় পাবো না।

—এখন অবেলায় ওখানে না যাওয়াই ভালো। সাপ বেরুতে পারে।

—এখন না তুললে তুলবো কখন? কাল সময় পাবো না। আজ সারাদিনের মধ্যে এখন একটু যা সময় পেলাম।

—দত্তমশায় কোথায়?

—তিনি ইলিশ মাছ আনতে গিয়েচেন পাঁচঘরার হাটে। কাল কচুর শাক দিয়ে রান্না হবে কিনা।

—আজ ইলিশ মাছ এনে কাল রান্না হবে?

—কেন হবে না? আজ বেশ করে ভেজে রাখবো রাতে। কাল মাছ পাবেন কোথায় হাট ছাড়া? কাল না খাওয়ালে ওঁদের কচুর শাক খাওয়ানো হবে না। পরশু চলে যাবেন সব।

—যাবেন সত্যি? আমার মনে হচ্চে না।

দীপু আমার কথার শ্লেষ বুঝতে না পেরে বললে—কেন মনে হচ্চে না?

মেয়েও তো দত্তমশায়েরই। বাপের মতই সরল। বললাম—না, তাই বলচি।

—বাবা বলছিলেন কালকের দিনটা ওঁরা আছেন, পরশু চলে যাবেন। কাল রাতে তাদের বড়া করে খাওয়াতে।

—বেশ বেশ। খাওয়াও। অতিথিসেবায় পরম পুণ্যি।

—কত রকমের রান্না হচ্চে বাড়িতে। কিন্তু আপনাকে দিতে পারিনে বলে কষ্ট হয়।

—দিতে বাধা দিচ্চে কে? আমি বাধা দিইনি অন্তত।

—কি যে বলেন! ব্রাহ্মণের পাতে রান্না তরকারি দেবো সে ভাগ্যি কি আর করে এসিচি?

—তা হোলে মিটেই গেল।

—একটা জিনিস কাল খাওয়াবো।

—কি?

—বলুন না?

দীপুর চোখে কৌতুকের হাসি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও কি জিনিসের কথা বলচে। তবুও মজা দেখবার জন্যে বললাম—তুমি বলো। আমি বুঝতে পারলাম না। কচুর শাক?

দীপু হিহি করে হেসে বললে—না। আহা, কি বুদ্ধি আপনার। কচুর শাক তো সকড়ি। আমার রান্না কচুর শাক আপনার পাতে দেবো?

আমি কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম—সে আমার অদৃষ্ট!

—আহা! আপনার অদৃষ্ট না আমাদের অদৃষ্ট! আপনি ভারি—

—কি জিনিসটা কাল খাওয়াবে বললে না?

—তালের বড়া।

—ওটা বুঝি সক্‌ড়ি নয়? তবুও মাথা রক্ষে। বাঁচলুম।

—থাক্, আপনাকে আর ব্যাখ্যান করতে হবে না। চলি এখন, অনেক কাজ।

দীপুকে দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ওর বয়েস হবে, কিন্তু বালিকার মত সরল। মুখ বুজে কি খাটুনিটাই খাটে দিনরাত! বাবার মন যুগিয়ে চলতে ওর জোড়া নেই, দত্তমশায় মুখের কথা খসালেই হোল। ও কি খায় সারাদিন খাটুনির পর তা কে দেখচে? দত্তমশায় নিজের অতিথিদের নিয়েই ব্যস্ত। তাদের বেলা পান থেকে চুন না খসে।

পরের দিন শুনলাম অতিথিরা আরো দিন চার-পাঁচ থেকে যাবেন। খবরটা পেলাম দত্তমশায়ের মেয়ের কাছ থেকেই। সে এসে বললে—আমার পাপ হবে, না ডাক্তারবাবু?

অবাক্ হয়ে বললাম—পাপ? কিসের পাপ?

—আপনার কাছে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলাম না, সেইজন্যে?

—কি কথা?

দীপু কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। আমি ওর কথা শুনি মন দিয়ে। সায় দিই ওর কথায়, বোধ হয় ওর ভালো লাগে। কথা বলবার মানুষ এ বাড়িতে আর ওর কেউ নেই আমি ছাড়া।

ও বললে—ভুলো কেন ও-রকম আপনি? তালের বড়া খাওয়াতে চেয়েছিলাম আজ, মনে আছে? তা আজ হোল না।

—তা হোলে অতিথিদের তালের বড়া খাওয়ানো হোল না?

—সেইজন্যেই তো। ওঁরা কাল যাবেন না। আরো দিন চার-পাঁচ থাকবেন কিনা, তাই বাবা বললেন আজ না করে ওঁদের যাবার আগের দিন করলেই হবে।

—খুব ভালো কথা।—কিন্তু ওঁদের তো কালই যাবার দিন ধার্য ছিল?

—কি নাকি বাঁশঝাড় নিয়ে গোলমাল বেধেচে ওঁদের মধ্যে একজনের। সে গোলমাল না মিটিয়ে তো যাওয়া হয় না।

—সে তো বটেই। একজনের কাজ যখন বাকি, তখন বাকি তিনজন একযাত্রায় পৃথক্ ফল করে আর যান কি ভাবে? যাওয়া উচিত নয়।

—সে আবার কি?

—ওই একটা কথার কথা ধরো।

—ভারি মজার কথা বলেন আপনি কিন্তু। হাসি পায় এমন!

—সে যাক্, তাহলে তালের বড়া হচ্ছে কবে?

—সেই যেদিন যাবেন, তার আগের দিন। তবে শুনুন একটা কথা বলি। আপনার জন্যে ছোট্ট একটা তাল এনে রেখেচি। সেইটেই গোলা করে অল্প চাট্টি বড়া আপনাকে ভেজে দেবো এখন সন্দেবেলা।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম—না না, দীপু। লক্ষ্মী, আমার কথা শোনো। আমার জন্যে আলাদা ক'রে তোমায় কিছু করতে হবে না। কেন করতে যাবে তা? আমি ওতে রাগ করবো। না, করবে না।

দীপু না দাঁড়িয়ে চলে গেল। ও কখন আসে, কখন যায়, বোঝা যায় না। নাঃ, এর সঙ্গে পারা যাবে না। আমার কোনো দরকার নেই তালের বড়ার। ও কি শুনবে কোনো কথা? যেমন বাবা, তেমনি মেয়ে।

অতিথিদের ওপর ভারি রাগ হোল আমার।

এসেচ নিজেদের খাজনা আদায় করতে, বিষয়আশয় দেখতে, তা পরের ঘাড়ে কেন রে বাপু? মানুষের একটা চক্ষুলজ্জা থাকা উচিত। বাবা আর মেয়েকে সরল আর ভালোমানুষ পেয়ে—হোত অন্য জায়গা, এতদিন সেখানে বসে আজ পায়েস, কাল রুইমাছ

খেতে কেমন দেখতাম।

অতিথিদের একজনের নাম জনার্দন সরকার, ধূর্ত দৃষ্টি চোখে, কূট বিষয়ী আর মামলাবাজ, দেখলেই বোঝা যায়। আমায় বিকেলের দিকে ডেকে বললে—ও ডাক্তারবাবু, বলি কি হচ্চে?

নীরস সুরে বললাম—কিছুই না। বসে আছি।

—এখানে রুগীপত্তর কেমন?

—মন্দ না।

—কতদিন আছেন এখানে?

ভালো বিপদ! আমার গল্প করবার ইচ্ছে নেই ওর সঙ্গে!

আছি না আছি, সে খোঁজে কি দরকার তোমার? তোমার গলা জড়িয়ে ধরে সে সব বর্ণনা করবার ইচ্ছেও আমার নেই। বললাম—কেন বলুন তো?

—না, সেবার এসে আপনাকে দেখিনি কিনা তাই।

—আপনারা ফি-বছর আসেন বুঝি এখানে?

—তা আমরা আসচি আজ দশ এগারো বছর। নরসিংহপুরে আমার তালুক আছে। এই সময় খাজনা আদায় করতে আসি। আমরা ক'জনই আসি। সকলেরই বিষয় আছে পাশাপাশি মৌজায়। এসে দত্তমশায়ের বাড়ি উঠি। উনি স্বজাতি আর বড় ভালো লোক। আর কোথায় যাই বলুন।

—তা তো বটেই। কোথায় আর যাবেন। আজকাল কেউ কাউকে জায়গা দেয় না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। আমি ঘরের দাওয়ায় বসে ভাবচি এইবার রান্নার আয়োজন করা যাক। এমন সময় দীপু হাসিমুখে দাওয়ায় উঠে একটা পাথরের বাটি আমার সামনে রেখে বললে—এই নিন। আলো জ্বালেননি?

বললাম—না, এই ভাত রান্না করবো ভাবচি এখুনি। এবার জ্বালাবো। এতে কি?

ব'লে বাটিটা হাতে তুলে নিয়ে দেখি তালের বড়া। সদ্য ভাজা, গরম। আমি কিছু বলবার আগেই ও বললে—ব্রাহ্মণকে কথা দিয়েছিলাম খাওয়াবো। তাই ছোট্ট একটা তালের গোলা করে আপনার জন্যে গোটাকতক ভেজে এনেচি। গণ্ডা দশ-বারো সবসুদ্ধু। আমি যাই, রান্নাবান্না সব পড়ে রয়েচে।

—শোনো দীপু, যেও না, আমার আলোটা জেলে দিয়ে যাও।

—অত কুঁড়ে কেন? কই কোথায় দেশলাই দেখি?

—আচ্ছা, কেন তুমি আমার জন্যে তালের বড়া করতে গেলে? আর কারো জন্যে না?

—না, না, শুধু আপনার জন্যে। বাবার কাছে বলবেন না। কেউ জানেন না! সব লুকিয়ে ফেলেচি। তালের খোসা তালের গোলা—চললাম। কেউ যেন জানে না।

দীপু চ'লে গেল। ওর তালের বড়ার বাটি আমার সামনে পড়ে রইল। জোনাকি-জ্বলা অন্ধকারে কোথায় কি নৈশ পুষ্প ফুটেচে তার সুবাস বেরুচ্চে।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

দীপুর মনের ভেতরটা আমি এই নির্জন আঁধার সন্ধ্যায় বসে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ওর মুখের হাসিতে তা ধরা দিয়েচে। ওর মন আমি বুঝতে পেরেছি—ও নিজে হয়তো বোঝেইনি।

এখানে আমি আর থাকবো না। থাকা উচিত হবে না। অতিথির দলকে দত্তমশায় তোয়াজ করুন যত খুশি, তারা তালুকমৌজার বৈষয়িক সুবন্দোবস্ত যতদিন ধরে করুক বসে, কিন্তু আমাকে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। দত্তমশায় অতি সরল, ভালো লোক। দীপুও তাই। ওদের নামে কোনো কথা উঠলে আমি কখনো নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না। তা ছাড়া, জালে জড়াই কেন নিজেকে? আমার বাড়িতেও স্ত্রীপুত্র আছে।

সেই সপ্তাহের শেষেই নির্মমভাবে জাল গোটালাম।

দত্তমশায় এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন—বলা কওয়া না, হঠাৎ

চললেন, মানে? কি অপরাধ হোল আমার?

কোনো লম্বা কৈফিয়ৎ দেবার আবশ্যক বিবেচনা করিনি। ডাক্তারী ভালো চলচে না, রুগী-পত্তর সুবিধে হচ্ছে না। দীপু যাবার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা এলো। বললে—আপনি নাকি চলে যাচ্চেন, সত্যি?

—হ্যাঁ।

—কেন যাবেন?

—চলচে না।

—কেন, বেশ তো রুগী আসে?

—ওতে ডাক্তারী চলে না।

—যাবেন সত্যি?

—হুঁ।

দীপু কেঁদে ফেললে। চোখের জলে ভিজে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। আমি চলে যাবার সময় দত্তমশায়ের ডাকাডাকি সত্ত্বেও সে আমার সঙ্গে দেখা করেনি।

সাত মাস পরে দত্তমশায়ের এক চিঠি পেলাম। দীপুর খুব অসুখ। আমি যেন একবার দেখতে যাই। ইতিমধ্যে আমাদের গ্রামেই ডাক্তারখানা খুলে বসেচি। দু'একদিন যেতে দেরি হোল। গিয়ে দেখি দীপু বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েচে। আগেকার স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী দীপুকে আর চেনা যায় না। আমায় দেখে দীপুর রোগশীর্ণ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিছানার পাশে ওর হাত দুটি ধরে বললাম—কি হয়েচে দীপু? দেখি হাত?

ও বললে—কিছু হয়নি।

—তবে এমন চেহারা হয়েচে কি করে? দাঁড়াও দেখি।

দত্তমশায় বোধ হয় অতিথির জন্য চা ও খাবারের যোগাড় করতে বাইরে গেলেন। আমি ওর হাত দেখলাম। জ্বর রয়েচে নাড়িতে। পুরনো ম্যালেরিয়া জ্বর, ভালো চিকিৎসা হয়নি। সংসারের খাটুনি একদিনের জন্যে কামাই যায় নি। অতিথি তো লেগেই আছে। অনুমানে বুঝলাম সব। শরীর ওর একেবারে ভেঙে গিয়েচে।

দীপু আমার দিকে তাকিয়ে বললে—কি রকম দেখলেন?

—ভালো। সেরে যাবে। গোটাকতক ইন্‌জেক্‌শন নিয়মিত দিলেই হবে। শক্ত অসুখ কিছু না।

—একটা কথা বলবো?

—কি?

—আপনি এসে আমাদের বাড়ি আবার থাকুন না কেন?

—আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। দাঁড়াও একটা ইন্‌জেকশন দিতে হবে এখুনি।

—দেবেন এখন। আপনি আসবেন বলুন। সত্যি, বলুন!

দীপুকে বাঁচাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত রানাঘাট মিশন হাসপাতালে আমি ও দত্তমশায় নিয়ে গেলাম ওকে। শেষদিন আমার হাত ধরে বলেছিল—আমি সেরে উঠলে আমাদের বাড়ি এসে থাকবেন, সত্যি? অনেক রুগী হবে এবার—

চুর্ণী নদীর ধারে ওর সৎকার করার পরে আমরা দুজনে ফিরে এলাম দেশে। দত্তমশায় আমার হাত ধরে কাঁদতে লাগলেন। বললেন—একলা থাকতে পারবো না ডাক্তারবাবু। আমার বাড়ি এসে আপনাকে থাকতে হবে। আমার আর কেউ নেই।

দীপুকে কথা দিয়েছিলাম হাসপাতালে। দত্তমশায়ের বাড়ি এসে আবার ডাক্তারখানা খুলেচি। দীপুর মুখের কথা সত্যি হয়েচে বটে, আজকাল রুগীর ভিড় খুব।

বর্শেলের বিড়ম্বনা

'বর্শেল' অর্থাৎ ব'ড়শি ও ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে যে পটু। এক কথায় ওস্তাদ মৎস্য-শিকারী। লাঠি যে চালাতে পটু সে হোল 'লেঠেল', ছিপ-ব'ড়শি বাইতে যে পটু সে হোল 'বর্শেল'।

এই সামান্য ভূমিকার দরকার ছিল এই জন্যে যে অনেকেরই 'বর্শেল' কথাটির অর্থ জানা নেই হয়তো—প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা প্রয়োজন যে, যেমন লাঠি হাতে নিয়ে সবাই বেড়ায়, কিন্তু সবাই লেঠেল নয়, তেমনি ছিপ দিয়ে মাছ সবাই ধরে, কিন্তু তারা বর্শেল নয়।

আমাদের গাঁয়ের রামহরি হোড় নামজাদা বর্শেল, আশপাশের দশখানা গাঁয়ের মধ্যে তাঁর নাম বর্শেল হিসাবে প্রসিদ্ধ। 'তাঁর' ব্যবহার করলাম এজন্যে যে, রামহরি বনেদী ব্রাহ্মণ-ঘরের সন্তান আমাদের গাঁয়ের—লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারা, বড় বড় গোঁফ, চোখ বড় বড় ও রাঙা। আমরা ছেলেপুলের দল তাঁকে যথেষ্ট ভয় করে চলি, বড্ড রাশভারী লোক। আগে অবস্থা খুব ভাল ছিল, এখন বিষয়-সম্পত্তির সামান্যই অবশিষ্ট আছে; তারই আয়ে অতি কষ্টে সব সংসার চলে। রামহরি জীবনে কারো চাকুরি করেননি, এখন তিনি পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেচেন—সুতরাং এ বয়সে পরের দাসত্ব আর স্বীকার করবেন না এটা নিশ্চয়।

কিন্তু মাছ ধরা সম্বন্ধে একজন 'অথরিটি' তিনি। বহুলোক এ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতে আসে।

—হ্যাঁ হোড়মশাই, গাঙে কি চার করে রাখবো আজ?

—কি চার দিচ্ছ?

—গোবর আর কেঁচো।

—নতুন বর্ষার জল, তুঁষ আর কুঁড়ো দাও।

তাঁর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বিস্তৃত। কে তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে সাহস করবে? হোড় মশায় জীবনে অনেক আশ্চর্য ধরণের মাছ ধরেচেন, তাঁর মুখে সে-সব গল্প শুনলে আহারনিদ্রা ভুলে যেতে হয়। অবিশ্যি আমাদের মত ছেলেমানুষের সঙ্গে সে-সব গল্প তিনি কখনো করতেন না, বড় লোকেদের সঙ্গে বসে বলতেন, আমরা বসে শুনতাম।

এ সব পঁচিশ বছর আগেকার কথা বলচি, আগেই বলে রাখি।

আমার তখন বারো-তেরো বছর বয়েস। আষাঢ় মাস, খুব বর্ষা হয়ে গিয়েচে, মাঠে-ডোবায় জল থৈ-থৈ করচে।

হাবুল বললে, মাছ ধরতে যাবি সন্তুদা? জটেমারির খালে বড় বড় বান মাছ আর জিওল মাছ পড়চে।

—কে বললে?

—কাল গোপাল আর নেড়াকাকা এই বড় বড় বান মাছ ধরে এনেচে।

—তোর বড় ছিপ আছে? আমায় একখানা দিবি?

—দুখানা মোটে আছে—বাকি তিনখানা পুঁটিমাছ ধরা ছিপ।

বেলা তিনটের পর আমরা চারজন সমবয়সী বন্ধু জটেমারির খালে কাঠের পুলের নীচে মাছ ধরতে গিয়ে দেখি—রামহরি হোড় সেখানে তাঁর লম্বা লম্বা ছিপগুলো নিয়ে দস্তুরমত চারকাঠি পুঁতে একমনে গম্ভীর মুখে একা বসে।

সন্তু প্রশংসাসূচক বিস্ময়ের সুরে বললে—রামহরি জ্যাঠা মাছ ধরচে!

আমি বললাম—কই?

—ঐ দ্যাখ ঐ গাছের নীচে।

আমার মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি জাগলো। মস্ত-বড় বর্শেল রামহরি জ্যাঠা দস্তুরমত চারকাঠি পুঁতে মাছ ধরতে বসেচেন। যদি মাছ ধরতে হয়, তবে ওঁর আশেপাশে বসে। নয়তো মাছ হবে না। যে যে-সাধনায় সিদ্ধ, তার শরণাপন্ন না হোলে সে-সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করা যায় না।

আমি বললাম—চল্, রামহরি জ্যাঠার ডাইনে ওই ফাঁকা জায়গাটায় ছিপ ফেলি।

হাবুল বললে—উনি যদি বকেন?

—বকেন তো বকবেন, দেখছিস্ নে, ওঁর চারে বড় বড় মাছ সব আসতে শুরু করেচে! অমন ওস্তাদ এ দেশে নেই। কি দিয়ে চার করতে হয়, কিসে বড় মাছ আসে, এ উনি যেমন জানেন, এমন কেউ জানে না।

আমরা পাশে বসবার উদ্যোগ করচি, রামহরি বর্শেল কিন্তু সেটা তত প্রীতির চক্ষে দেখলেন না। একটা কারণ হচ্চে, তিনি মাছ জড়ো করবার মশলা ছাড়িয়েচেন জলে, এখন অন্য কেউ এসে তাঁর তৈরি জমিতে চাষ করুক, এটা তিনি পছন্দ করলেন না। দ্বিতীয়তঃ আমরা চঞ্চল বালক, তাঁর মত চুপচাপ বসে থাকতে পারবো না, গোলমাল করবোই। তা হোলে মাছ আসবে না চারে। ভয় পেয়ে ভেসে যাবে।

রামহরি হোড় তুরীয় অবস্থা থেকে নেমে এসে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—এই! ওখানে বসবি নাকি?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশায়। আপনার পায়ে পড়ি কিছু বলবেন না আমাদের।

রামহরি বিরক্তিপূর্ণ মুখে বললেন—যতো আপোদ! আর জায়গা পেলি নে? আচ্ছা, চুপ করে বোস্। কেউ কথাটি কইবি নে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। প্রায় আধঘণ্টা ছিপ ফেলেচি আমরা, কিন্তু একটা মাছও ঠোকরায় নি। গোলমাল না করি, কথাবার্তা চলছে সমানে। ক্রমে কথাবার্তার সুর চড়লো।

পচা বললে—ওই ক্ষেতটাতে কাঁকুড় হয়েচে, সন্তু যা, গোটা-চারেক কাঁচা দেখে কাঁকুড় তুলে আন—

রামহরি বর্শেল ওদিক থেকে ধমকে দিয়ে বললেন—এই সব, কি হচ্চে?

আমরা ধমক খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। ইতিমধ্যে হাবুল এবং পচা বাবলা-কাঁটার নীচু বেড়া ডিঙিয়ে অদূরবর্তী কাঁকুড়ের ক্ষেতে ঢুকে পড়লো এবং তিনটি বড় বড় কাঁকুড় নিয়ে আমাদের কাছে ফিরে এল।

গণ্ডগোল বাধলো কাঁকুড়ের ভাগ নিয়ে।

আমি বললাম—তোমরা ভাগ বেশী নেবে কেন? সমান ভাগ করো। আমি তোমাদের ছিপ নিয়ে চৌকি না দিলে তোমরা কাঁকুড় আনতে পারতে?

পচা বললে—আমি বড়টা তুলেচি, ওটা আমার।

যতীশ নাপিতের ছেলে কেষ্ট বললে—তা কেন? সমান ভাগ হবে।

রামহরি আবার ধমক দিয়ে বললেন—ও সব কি হচ্চে রে? মাছ ধরতে এসেছিস্ না কাঁকুড় খেতে এসেছিস্ এখানে?

আমি বললাম—মাছ মোটে ঠোকরাচ্চে না জ্যাঠামশায়!

—কি করে মাছ ঠোকরাবে? তোমাদের তো মাছ ধরা নয়, মাছ ধরা খেলা। কি জানিস্ তোরা মাছ ধরার? সব কটাতে জুটে হুটোপাটি করচিস্ আর কাঁকুড় চুরি করচিস্ পরের ক্ষেত থেকে। মাঝে প'ড়ে আমারও মাছ হোল না তোদের গোলমালে। নইলে যা চার করেছিলাম, কুঁড়ো দিয়ে আর পুরোনো তেঁতুল—

রামহরি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। উত্তেজনার মুখে মৎস্য-শিকারের গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করে ফেলেছিলেন আর একটু হোলে।

আমি চুপি চুপি বললাম—ওই শুনে রাখ, কুঁড়ো আর পুরোনো তেঁতুল এই নিয়ে চার করতে হবে, বুঝলি তো! ভুলে বলে ফেলে দিয়েচেন—

হাবুল ছিপ একখানা জল থেকে তুলে বললে—মাছ মোটে ঠোকরাচ্চে না!

রামহরি তাচ্ছিল্যের সংগে ছিপটার দিকে চেয়ে বললেন—ও কি বহর দিয়েছিস্? তোদের সবই হোল ছেলেখেলা! জল মেপে বহর দিতে হয়।

আমি আগ্রহের সুরে বললাম—সে কি করে করতে হয় জ্যাঠামশায়?

—জল মেপে নিস্ নি?

—তা তো জানিনে।

রামহরি দাঁত খিঁচিয়ে বললেন—তা জানবে কেন? জানো কাঁকুড় চুরি করতে। ঢিল

বেঁধে সুতো জলে ছেড়ে দ্যাখো কতটা ভিজেছে—সেখানে ফাত্না তুলে বাঁধো—তাকে বহর দেওয়া বলে। দেখি?

আমি ছিপ তুলে দেখাতে রামহরি বর্শেল সেদিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—আড়াই হাত বহর দে।

সম্ভ্রমে আমার মন পূর্ণ হয়ে গেল। রামহরি বর্শেল স্বয়ং আমাদের বহর সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েচেন। এইবার মাছ না হয়ে যায়?

কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পরে আমাদের মধ্যে আবার গুঞ্জন-রব উত্থিত হোল এবং খুব শীগ্গির সে গুঞ্জন কলরবে পরিণত হয়ে গেল। এবার গোলমাল বাধলো ছিপের বহর নিয়ে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের দোষ ধরতে ব্যগ্র।

পচা বললে—আমায় ছিপ দাও—আমি নিজে বহর দিই।

আমি বললাম—তুই কি বুঝিস্ বহরের? আমায় দে, দিয়ে দিচ্চি।

—থাক্, তোর আর ওস্তাদি করতে হবে না—ঢের হয়েচে।

—মুখ সাম্‌লে কথা কবি সন্তু!

—তুই মুখ সাম্‌লে—

আমাদের সুর তখন পঞ্চমে উঠেচে। রামহরি বললেন—কি বিপদেই পড়েছি এদের নিয়ে! আজ যে আমার চার করাই মাটি হোল দেখচি এদের জ্বালায়! তোরা বাপু অন্য জায়গায় যা—ওঠ ওখান থেকে—বেরো—

আমরা তাড়া খেয়ে ছিপ গুটিয়ে সেখান থেকে উঠে আর কিছু দূরে গিয়ে বসলাম। একটা কাশঝোপের আড়াল থাকার দরুন সেখান থেকে রামহরি বর্শেলকে ভাল করে দেখা যায় না।

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল।

সামনের ছোট খালে কচুরিপানার দামে নীল ফুল ফুটেচে, বর্ষার জল থৈ-থৈ করচে খালের কানায় কানায়। ওপারের চরে আরামডাঙা গ্রামের বাঁশ-খেজুর-তালগাছের শীর্ষ বৃষ্টিধোয়া নীল আকাশের তলায় একটি শ্যামল সরলরেখা রচনা করেচে। দু-একটা সাদা বক জলের ধারে পানা-শেওলার দামের ওপর চরে বেড়াচ্চে।

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট চীৎকার শুনে আমরা রামহরি জ্যাঠার দিকে চাইলাম। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে একটা বড় ছিপ দু-হাতে হ্যাঁচকা টান মেরে তুললেন—এটুকু আমরা দেখলাম। তারপর তিনি বলে উঠলেন—যাঃ—

হাবুল বললে—রামহরি জ্যাঠা মস্ত-বড় মাছ বাধিয়েচে, চল্ গিয়ে দেখি—

সবাই মিলে তখনি ছুটে গিয়ে শুনলাম প্রকাণ্ড মাছ বেধেছিল ওঁর ছিপে, কিন্তু উনি টান দিতেই ছিপের আগা ভেঙে নিয়ে মাছটা পালিয়েচে। সত্যিই দেখি, বড় একটা ছিপের আগার দিকটা ভাঙা, ছিপটা হাতে করে বোকার মত রামহরি দাঁড়িয়ে।

আমাদের দেখে বিরক্তির সুরে ঝাঁজের সঙ্গে তিনি বললেন—তোদের জন্যে আজ সব মাটি। না দিলি চারে মাছ আসতে, না দিলি সুস্থ হয়ে মাছ ধরতে। সেই বেলা তিনটে থেকে পেছনে লেগেচিস্ বাপু, মাছ ধরতে আসিস্ কেন তোরা? কি বুঝিস্ মাছ ধরার? এ কি ছেলের হাতে পিঠে? এত বড় মাছ খেলে, শুধু তোদের জ্বালায় তুলতে পারলাম না, সুতো কেটে নিয়ে পালিয়ে গেল। নাঃ, আজ আর মাছই ধরবো না। কাল থেকে আমার ত্রিসীমানায় বসতে দেবো না বলে দিচ্চি—

রামহরি জ্যাঠার যত রাগ আমাদের ওপর এসে পড়েচে বুঝলাম। নইলে তাঁর মাছ পালিয়ে গেল সুতো কেটে, তাতে আমাদের অপরাধ কোথায়? হাবুল নীচু সুরে বললে—বা রে, উনি পচা সুতো নিয়ে মাছ ধরতে এসেচেন, তাতে আমাদের দোষ বুঝি? আমরা মাছকে শিখিয়ে দিই নি তো—

যাহোক্, রামহরি জ্যাঠা তো ছিপ গুটিয়ে চলে গেলেন। তারপরেই যে ঘটনাটি ঘটলো, আমাদের মত বালকের জীবনে সেরূপ ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।

রামহরি জ্যাঠা চলে যাওয়ার মিনিট পনেরো পরে হঠাৎ আমার নজর গেল বাঁ-দিকের শেওলা-দামের ধারে একটা সাদা শরের ফাত্না একবার ডুবচে একবার উঠচে। আমার

কথায় হাবুলও সেদিকে চেয়ে দেখলে। ফাতনাটা ক্রমেই যেন ডাঙার দিকে আসতে লাগলো। —অথচ খালের স্রোত তো এখন উল্টোদিকে বইচে, তবে ফাতনা ডাঙার ধারে আসচে কিসের জোরে?

হাবুল বললে—তাই তো সন্তুদা, ওটা কি হচ্চে?

হঠাৎ আমি জিনিসটা বুঝতে পারলাম। রামহরি জ্যাঠার সেই ছিপের ফাতনা! বড় মাছ ওর তলায় বঁড়শিতে বেধে আছে।

কথাটা যেমন মনে হওয়া, আমার সমস্ত শরীর দিয়ে যেন কিসের ঝাঁজ বেরিয়ে গেল! ততক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেচি। হাবুলকে বললাম—রামহরি জ্যাঠার সেই মাছটা! ও জখম হয়ে এসেচে বলে অবসন্ন হয়ে ডাঙার দিকে আসচে। জলে নামো সবাই—

হাবুল বললে—পচা, তুই ছেলেমানুষ আছিস্, পরনের কাপড় খুলে ফেল্, মাছটাকে কাপড় দিয়ে জাপটে ধরতে হবে।

আমি বললাম—ভারী মাছ, খুব সাবধানে তুলবার চেষ্টা করো। জলের তলায় ওর কুমীরের মত শক্তি।

সবাই মিলে জলে নামলাম। ফাতনা ধরে সন্তর্পণে টান দিতেই জলের তলায় প্রকাণ্ড মাছ ঝটপট করে উঠে জল ছিটিয়ে আমাদের সারা গা ভিজিয়ে দিলে। আমাকে তো টেনেই নিয়ে গেল কিছুদূর—হাবুল আমার কোমর জড়িয়ে টেনে রাখলে। বললে—টান দিস নে, সুতো ছিঁড়ে যাবে—মস্ত মাছ—সাবধানে তোল্।

প্রায় মিনিট পনরো ধরে মাছটা যুঝল। যারা কখনো বড় মাছ ছিপে ধরেচে, তারাই জানে এ ব্যাপার কি! এক-একবার এমন হোল যে, মাছ বুঝি আর থাকে না, চোঁ-চোঁ ছুটলো বেশী জলের দিকে। তার চেয়েও ভয় ছিল ঘন কচুরিপানার দামের নীচে গিয়ে লুকুলে এ মাছের আর সন্ধান পাওয়া যাবে না।

অবশেষে মাছটা ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগলো। মুখে আড়াই ইঞ্চি বঁড়শি নিয়ে কতক্ষণ পারবে? মাছ অবসন্ন হোলে ক্রমশঃ আপনিই ডাঙার কাছে আসে। পচা সেই সময় কাপড় দিয়ে মাছটা জাপটে ধরলো—আমরা সবাই গিয়ে পড়লাম মাছটার ওপরে। টেনে ডাঙায় তুলে দেখি সেরপাঁচেক আন্দাজ ওজনের রুইমাছ!

গ্রামে ঢুকবার পথেই রামহরি বর্শেলের ঘর। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে এসেচে, রামহরি জ্যাঠা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্চেন। আমরা হৈ-হৈ করে আসচি দেখে তিনি জিগ্যেস করলেন—কি রে? মাছ পেলি নাকি?

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাই। রামহরি জ্যাঠার নাকের সামনে দিয়ে বড় মাছটা নিয়ে যাবো!

দাওয়া থেকে নেমে এসে রামহরি বললেন, এত বড় মাছটা তোরা কোন ছিপে ধরলি? তোদের সঙ্গে তো বড় ছিপ ছিল না!

আমি বললাম—হরকওলা বঁড়শির একখানা ছিপ আছে—এই যে!

রামহরি হাজার হোক, ওস্তাদ বর্শেল তো! আশ্চর্য হয়ে বললেন—মাছটার নিতান্তই তা হোলে মরণ ছিল। হরকওলা বঁড়শিতে পাঁচ সের রুইমাছ ওঠে, এ কখনো সম্ভব হয় না। তোদেরও ছেলেখেলা করতে গিয়ে এত বড় মাছটা জুটে গেল অমনি অমনি—নইলে ও-মাছ হরকওলা ছিপে ডাঙায় ওঠানো তোদের সাধ্যি ছিল? ওই যে বললাম, মাছটার কপালে নিতান্তই মৃত্যু ছিল আজ!

বাড়ি ফিরে রামহরি জ্যাঠার বাড়ি আমরা সের দেড়েক কাটা মাছ আর মুড়োটা পাঠিয়ে দিলাম।

কাদা

একঘেয়ে গ্রাম্যজীবনের মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল আমাদের পাশের বাড়ির শ্যামাকান্ত চক্কত্তির বিয়ে। শ্যামাকান্ত চক্কত্তি আমার কাকা হন, অবিশ্যি গ্রামসম্পর্কে। শ্যামাকাকার

বয়েস কত তা জানিনে, তিনি নাকি কলেজে পড়েন কলকাতায় না কোথায়। গ্রামে আসেন মাঝে মাঝে দেখতে পাই।

বিয়ে হচ্চে আমাদের গ্রামের কাছে নসরাপুর।

নসরাপুর গ্রামের বীরেশ্বর ভট্চাজের মেয়ে। বীরেশ্বর ভট্চাজকে দেখেছি, বুড়ো-মানুষ, ঐ গ্রামেরই পাঠশালার পণ্ডিত। আমাদের গাঁয়ে এসেছিলেনও বারকয়েক।

বিয়ে হবে সামনের সোমবারে।

হৈ হৈ পড়ে গেল পাড়ার ছেলেদের মধ্যে।

আমাদের দল ঠিক করলে একটা উৎসব করতে হবে এই বিয়ের দিনে। আমার উৎসাহটা সব চেয়ে বেশি। আমি ভেবেচিন্তে দক্ষিণ মাঠের বিলের ধার থেকে কতকগুলো পাকাটি নিয়ে এলাম এবং পথের ধারের প্রত্যেক গাছে একগাছা করে পাকাটি নোনার ডালের ছোটা দিয়ে বাঁধলাম।

হরি জ্যাঠামশায় দেখে বললেন—ও কি হচ্চে?

বড় বড় মোটা কাঁচের পরকলা বসানো চশমার ভেতর দিয়ে দেখি হরি জ্যাঠামশায় আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্চেন। ভয়ে ভয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লাম।

বলি—ও—এই—

—কি?

—বাজি আলো করবো শ্যামাকাকার বিয়েতে। তাই পাকাটি বাঁধচি।

—ইঃ। যত ছেলেমানুষি! ওই একটা সরু পাকাটি জেবলে আলো হবে? কতক্ষণ জবলবে ওটা?

—যতক্ষণ হয়।

—ছাই হবে। বুদ্ধি কত! ও কখনো জবলে?

হরি জ্যাঠামশায় চলে গেলেন। আমার রাগ হোল মনে মনে। উনি সব জানেন কিনা? পাকাটি জবলবে না তো কি জবলবে?

ক্রমে বিয়ের দিন এসে পড়লো। যেদিন বিয়ের বর রওনা হয়ে চলে গেল, সেদিন পাকাটি জবালতে সঙ্গী সতু ও হীরু বারণ করলে। আজ জেবলে কি হবে? যেদিন বর আসবে বৌ নিয়ে, সেদিন জেবলে দিবি। দেখাবে ভালো। বিয়ের বরযাত্রী গেল গাঁসুদ্ধ ঝেঁটিয়ে। কিন্তু আমার যে অত উৎসাহ, আমারই যাওয়া হোল না। কেন যে যাওয়া হোল না, কি জানি। বাবা গেলেন অথচ আমায় নিয়ে গেলেন না।

তার জন্যে কোনো কান্নাকাটি করলাম না।

খাওয়ার ওপর আমার বিশেষ কোন লোভ নেই। খেয়ে আমি সহ্য করতে পারিনে, পেটের অসুখ করে। ওই জন্যেই বোধ হয় বাবা আমায় নিয়ে গেলেন না, কে জানে?

মঙ্গলবারে সন্ধ্যের আগে বর-বৌ আসবে, বরযাত্রীরা ফিরে এসে বললে।

আমি ঠিক করলাম যেমন ওরা আসবে অমনি যে পথে আসবে ওরা, সে পথের দুধারের গাছে যত পাকাটি বেঁধেছি, সবগুলো জবালবো।

কেবল ঘর-বার করছি, একে ওকে কেবল জিগ্যেস করছি, কখন বর আসবে।

বেলা যায়-যায়।

এমন সময় নীলু এসে বললে—ওরে, শীগগির চল—বৌ আসচে—

আমি বললাম—কে বললে?

নীলু আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চললো। গোয়ালাপাড়ার মোড়ে গিয়ে বাজনার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল যথেষ্ট। বললাম—কদ্দূর রে?

—তা বুনোপাড়ার কাছে হবে। অনেক দূর এখনো।

দেখতে দেখতে শ্যামাকাকার ঘোড়ার গাড়ি কাছে এসে গেল।

আমরা ঘোড়ার গাড়ি বেশি দেখিনি. দু-একখানা কালেভদ্রে শহর থেকে এ গ্রামে ঢোকে. তাও আমাদের জীবনে সবসুদ্ধু মিলে বার-দুই দেখেছি মাত্র।

ছেলের দল কলরব করে উঠলো—ওই রে ঘোড়ার গাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে বর-বৌ সুদ্ধু গাড়ি কাছে এসে পড়লো।

এইবার কিন্তু বাধলো মুশকিল।

পাকা রাস্তা ছেড়ে খানিকটা রাস্তা গেলে তবে আমাদের গ্রাম। শ্রাবণ মাসের শেষ, বেজায় কাদা হয়েছে কাঁচা রাস্তায়। বিশেষ করে একটা জায়গায় হাবড় কাদা—সেটার নাম ষাঁড়াতলার দ'। গাড়ি সেখানে এসে সেই হাবড়ে প'ড় প'ড়ে গেল। মোষের গাড়ি সে কাদায় পড়লে ওঠে না, শহুরে ঘোড়ার সাধ্যি কি সে হাবড় থেকে গাড়ি ওঠায়?

ননী বললে—এ রামকাদা থেকে বাছাধনের আর উঠতে হবে না। ও রোগা ঘ্যানা ঘোড়ার কম্মো এই হাবড় ঠেলে ওঠা?

তখন সবাই মিলে চাকা ঠেলতে লাগলাম। গাড়ি চলে এলো শ্যামাকাকাদের বাড়ি। শ্যামাকাকার মা, বৌ বরণ করে ঘরে তুললেন।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। বর্ষাকাল, রোদ আছে কি নেই বোঝা যায় না—যদিও তিন চারদিন বৃষ্টি হয়নি। আমাদের আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েচে ঘোড়ার গাড়িখানা। সেখানা বকুলতলায় দাঁড়িয়ে, তার চারিপাশ ঘিরে গ্রামের যত ছেলেপিলে। গাড়োয়ান বলচে, যদি আমরা ষাঁড়াতলার দ'-এর হাবড় পর্যন্ত গিয়ে চাকা ঠেলে গাড়ি উঠিয়ে দিতে রাজী হই, তবে সে আমাদের গাড়িতে চড়তে দেবে পাকা রাস্তা পর্যন্ত।

আমরা সবাই হৈ হৈ করে গাড়িতে উঠলাম, কতক গাড়ির ছাদে, কতক পেছনে, কতক ভেতরে। ষাঁড়াতলার দ'-এর কাদা থেকে সবাই মিলে ঠেলে গাড়ি উঠিয়ে দিলাম, তার বদলে পাকা রাস্তা পর্যন্ত আমাদের গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে গেল। কি মজা!

আমরা যখন পাকা রাস্তায়, তখন সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নামলো। ননী বললে—গা ধোবো কোথায়? সব্বো অঙ্গে কাদা।

আমাকে বললে—তুই মশাল জ্বালবিনে? চুপ কর্, কে ডাকচে।

সর্বনাশ! আমার বাবার গলা।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েচে। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। বাবা আমায় খুঁজতে বেরিয়েচেন। তিনিই ডাকাডাকি করচেন। সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরিনি, বাবা ডাকতে বেরিয়েচেন।

ননী বললে—আলো দিবিনে গাছে গাছে?

আর আলো! আমার মুখ শুকিয়ে গিয়েচে। বাবা কাছে এসে পড়েচেন ডাকতে ডাকতে।

আমি উত্তর দিলাম—যা-ই-ই—

এই সন্ধ্যেবেলা সারা গায়ে কাদা মেখে আমি ভূত হয়ে আছি। আপাদমস্তক কাদা। চালাক গাড়োয়ান একটুখানি গাড়িতে চড়বার লোভ দেখিয়ে কাজ গুছিয়ে চলে গিয়েচে। এখন আমায় ঠেকায় কে?

বাবা এসে আমার কান ধরলেন। বললেন—হতভাগা বাঁদর, পড়া নেই শুনো নেই—এত রাত পর্যন্ত বাঁদরের দলে মিশে—এ কি? গায়ে এত কাদা কেন?

আমি কাঁদো-কাঁদো সুরে বললাম—এই গাড়োয়ান বললে—আমার গাড়িটা একটু ঠেলে দাও—বড্ড কাদা—তাই সবাই মিলে—আমি আসতে চাইনি...আমায় ওরা নিয়ে এল—ওই ননী, নিন্তে, শশী—

বলে সাক্ষ্যপ্রমাণের চেষ্টায় সঙ্গীদের দিকে ফিরে চাইতে গিয়ে দেখি জনপ্রাণী সেখানে নেই। কে কোথা দিয়ে সরে পড়েচে এরি মধ্যে।

বাবা বললে—তোমার দোষ নেই? তোমাকে সবাই নিয়ে গিয়েছিল? তুমি বুড়ো-দামড়া কিছু জানো না—না? ঘোড়ার গাড়িতে না চড়লে তোমার—

কথা শেষ না করেই দুড়দাড় মার। চড় ও কিল। বিষম মার। চোখে সর্ষের ফুল।

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এলাম বাবার আগে আগে। মা বললেন—আচ্ছা তোমার কি ভীমরতি হয়েছে? না কি? এই ভর সন্ধ্যেবেলায় ছেলেটাকে অমন ভূতোনন্দি মার—ওমা, তা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে না হয় গিয়েইচে একটু, আজ একটা আনন্দের দিন ওদের, তোমার মত বুড়ো তো ওরা নয়—ছি ছি—নে, এদিকে সরে আয়, খুব আমোদ করেচ! এসো—

সে-রাত্রে পাকাটি জ্বালিয়ে রোশনাই করা আমার দ্বারা আর সম্ভব হয়নি।

এর ত্রিশ বছর পরের কথা।

আমি কলকাতায় চাকরি করি। বর্ষাকাল। মহকুমার স্টেশনে নেমে বাড়ি যাবো, এমন সময় শ্যামাকাকার ছেলের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হোল।

শ্যামাকাকা মারা গিয়েচেন আজ দশ-বারো বছর, গ্রাম ছেড়ে তাঁর ছেলেরা আজকাল শহরে বাস করে, শ্যামাকাকার বড় ছেলেটি এখানে চাকুরি করে। ওর নাম অরুণ।

অরুণ বললে—বাড়ি যাচ্ছেন দাদা? দীপ্তির বিয়ে পরশু। আপনাকে আসতে হবে অবিশ্যি অবিশ্যি। আসুন না একবার আমাদের বাসায়—

গেলাম। দীপ্তি ষোল-সতেরো বছরের সুশ্রী মেয়ে। আমাদের দেখে খুশী হয়ে এগিয়ে এল। বললাম—কোথায় তোর বিয়ে হচ্ছে রে দীপ্তি?

দীপ্তি মুখভঙ্গি করে বললে—আহা-হা!

—তার মানে?

—তার মানে আপনার মুণ্ডু।

—কথার কি যে ছিরি!

—হবে না ছিরি? আপনার কথার ছিরিই বা কি এমন?

—বল্ না কোথায় বিয়ে হচ্চে?

—ফের?

—দ্যাখ দীপ্তি, চালাকি যদি করবি—বল, কথার উত্তর দে—

দীপ্তি আঁচল নাড়তে নাড়তে বললে—আহা, যেন জানেন না আর কি।

আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম—সেখানে নাকি? সে-ই?

—হুঁ!

—ভালো। খুশী হোলাম।

—খুশী কিসের?

—আবার চালাকি করবি দীপা! হোস্‌নি খুশী তুই?

—ওরকম বললে আমি মরবো আপিং খেয়ে। সত্যি বলচি।

—আচ্ছা যা, আর কিছু বলবো না। এখন একটু চা করে খাওয়াবি, না এমনি চলে যাবো?

—খাওয়াচ্ছি, ওমা! ঘোড়ায় জিন দিয়ে যে! এমন তো কখনো দেখিনি—

—দেখিস্‌নি দেখলি। নিয়ে আয় চা।

—খাবেন কিছু?

—তোর খুশী।

একটু পরে চা ও খাবার হাতে দীপ্তি এসে ঢুকে বললে—সোমবারে কিন্তু আসতে হবে। আপনাকে থাকতে বলতাম এখানে, কিন্তু বলবো না। বাড়িতে বড্ড ভিড়। আপনার কষ্ট হবে। সোমবার আসবেন অবিশ্যি অবিশ্যি—

—আচ্ছা—

—কথা দিলেন?

—নিশ্চয়। বরযাত্র না কনেযাত্র?

—দুই-ই। আপনাদের গাঁয়ের যখন বর, তখন বরযাত্র তো হোতেই হবে।

—কনেযাত্র কার অনুরোধে?

—আমার।

—আচ্ছা আসি—

—ঠিক আসবেন পরশু?

—ঠিক।

—ঠিক?

—ঠিক।

দীপ্তি থাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল, যখন আমি চলে এসে রাস্তার ওপর উঠেচি।

যার সঙ্গে দীপ্তির বিবাহ, সে আমাদের গ্রামেরই ছেলে বটে কিন্তু তারা পশ্চিম-

প্রবাসী। দেশের বাড়িতে জ্ঞাতি-ভাইরা থাকে। এই বিবাহ উপলক্ষে বহুকাল পরে ওরা সবাই দেশে এসেচে, বিয়ের পরই আবার চলে যাবে। গ্রামে আমিও গেলাম অনেকদিন পরে, আমিও গ্রাম ছেড়েছি দশ-পনেরো বৎসর। গ্রামে যেতেই ওদের দল এসে আমায় বরযাত্রী হওয়ার নিমন্ত্রণ করে গেল।

বিবাহের দিন এসে পড়লো।

বিবাহের লগ্ন সন্ধ্যার অন্ধকারেই।

অন্যান্য বরযাত্রী কতক নৌকোতে, কতক গরুর গাড়িতে রওনা হয়ে কনের বাড়ি চলে গেল। শহর থেকে একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসেচে, সেখানাতে বর, বরকর্তা, পুরুত ও আমি যাবো এই স্থির হয়েছে।

বর বললে—নিতাইদা, চা খেয়ে নাও, আর বেশি দেরি না হয়, বাবাকে বলো—তুমিই সব গুছিয়ে নাও!

—সে ভাবনা তোমার কেন? যা করবার করচি।

—শোনো একটা কথা। দীপ্তি তোমায় কিছু বলেছিল?

—না।

—বিয়ের বিষয়ে?

—না।

—দেখা হয়নি আসবার দিন?

—না। কেন?

—তাই জিগ্যেস করচি।

সন্ধ্যের অল্পই দেরি আছে, তখন আমরা ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠলাম ; গাড়িও ছেড়ে দিলে।

আমাদের পিছনে শাঁক বাজতে লাগলো, হুলু পড়তে লাগলো।

গাড়ি গাঁ ছাড়িয়ে খানিকদূরে যেতে না যেতে অন্ধকার নামলো, সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়াতলার দ'য়ের কাদায় গিয়ে পড়লো গাড়ি। কিছুতেই আর ওঠে না। ঝাড়া পনেরো মিনিট বৃথা চেষ্টার পর গাড়োয়ান বললে—বাবু, একটু নামতে হবে। খালি গাড়ি তখন নিয়ে গিয়েছিলাম, এখন বোঝাই গাড়ি যাবে না। আপনারা একটু নামুন—

অগত্যা নামা গেল—কিন্তু তখন গাড়ির চার চাকা যা পুঁতবার পুঁতে গিয়েচে।

ঘোড়াকে চাবুক মারলে কি হবে, গাড়ি নড়ে না।

তখন আমি আর বরকর্তা দুজনে সেই কাদায় নেমে চাকা ঠেলি। কোনো লোক নেই। বরকে বা পুরুতমশায়কে অনুরোধ করা যায় না চাকা ঠেলতে। আমরা দুজন ছাড়া ঠেলবে কে?

দীপ্তির বিয়ের সুলগ্ন উত্তীর্ণ না হয়ে যায়, তার বিয়েতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে. প্রাণপণে ঠেলতে লাগলুম সেই চাকা, সেই ষাঁড়াতলার হাবড়ের মধ্যে। আপাদমস্তক কাদায় মাখামাখি হোল। বরকর্তা বুড়োমানুষ, তাঁকে আমি বেশী ঠেলতে দিলাম না। নিজেই ঠেলে কাদা পার করে তুললুম।

বর বললে—এঃ, তোমার এ কি চেহারা হোল? কাদায় যে—

আমি বললাম—তোমরা যাও, আমি যাচ্চিনে—

সবাই বলে উঠলো—সে কি? সে কি? সে কি হয় নাকি?

—আচ্ছা, এগোন আপনারা। পেছনে আসছি। জামাকাপড় ছেড়ে আসি—

গাড়ি চলে গেল।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম সেদিকে চেয়ে। আর আমি যাবো না। দীপ্তির বিয়ে সুলগ্নে হোক, বাধাশূন্য হোক।

হঠাৎ আমার মনে পড়লো একদিনের কথা। দীপ্তির বাবা বিয়ে করে যেদিন ওর মাকে নিয়ে ফিরছিলেন। ত্রিশ বছর আগের ঠিক এমনি এক অন্ধকার সন্ধ্যা।

সেই শ্রাবণ মাস ষাঁড়াতলা দ'-এর কাদা ঠেলে গাড়ি উঠিয়েছিলাম কাদায় মাখামাখি হয়ে। বাবার কাছে মার খেয়েছিলাম।

আজ আবার তাদেরই মেয়ের বিয়েতে সেই রকমই গাড়ি ঠেলাচ, গাড়িও যাচ্ছে শহরের দিকেই। তাঁদেরই মেয়ে দীপ্তি। হয়তো সে আজ খুব রাগ করবে আমি না—

জীবনে কি আশ্চর্য ঘটনাই সব ঘটে।

অনুসন্ধান

নারাণ মাস্টার সকালে উঠে স্ত্রীকে চা দিতে বললেন। স্ত্রী মনোরমা বললেন,—চাও নেই, চিনিও নেই। দুধ তো দিয়ে যায় নি গোয়ালা। দু-মাস তাকে টাকা দেওয়া হয় নি। তুমি সংসারের কিছুই দেখ না। আমি কি করে একা সংসার চালাই?

বাইরে থেকে ছেলেরা বললে, বাড়ী আছেন স্যার? নারাণ মাস্টার হন্তদন্ত হয়ে স্ত্রীকে বলেন, একটু চা করে দাও যা হয় করে। ওরা সব এসে গেল।

মনোরমা মুখঝামটা দিয়ে বলেন, এলে কি হবে? শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। তোমার হয়েছে তাই। কারো কাছে পিত্যেস নেই, ওদের পেছনে ভূতের মত খাটুনি। এর চেয়ে টুইশানি ধরলে তো কাজ হয়, দু-পয়সা আসে।

বাইরে একখানা চালাঘরে গ্রামের চাষাভুষোদের অনেকগুলো ছেলে জুটেছে। নারাণ মাস্টার তাদের কাউকে অক্ষর পরিচয় করান, কাউকে ভাঙা একটা গ্লোবে ভূগোল শেখান, একজনকে কবিতা পড়তে শেখান। একটি গরীব ছেলেকে বলেন,—কি খেয়ে এসেচিস্ সকালে? কিছু না? শোন্, তোর কাকীমার কাছে গিয়ে বল দুটি মুড়ি দিতে। আমি বলে দিয়েচি যেন বলিস্ নে!

ছেলেটি ইতস্ততঃ করে। সে তার কাকীমাকে চেনে। সেখানে যেতে তার সাহসে কুলোয় না, তবু নারাণ মাস্টারের মনস্তুষ্টি করবার জন্যে পায়ে পায়ে অন্দরের দিকে এগোয়। মনোরমা বসে ধান সিদ্ধ করচেন রান্নাঘরে। ছেলেটি ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। ডাকতে সাহস হয় না। মনোরমা হঠাৎ এগিয়ে বলেন,—কে? বিষ্টু? কি রে?

—এই—এই—

—কি?

—মাস্টার মশায় বলে দিলেন, এই—মোরে দুটি মুড়ি দিতি!

—তা আর বলে দেবেন না কেন? তাঁর কি? কোথা থেকে কি জোটে তাঁর সেদিকে কতটুকু খেয়াল থাকে? যা মুড়ি নেই। বল্ গে যা—

নারাণ মাস্টার খেতে বসেচেন। বাড়ীর পাশের এক গরীব গেরস্তবাড়ীর ছোটো ছেলে ওৎ পেতে থাকে, কখন তিনি খেতে বসবেন। যদি না আসে, নারাণ মাস্টার ডাকেন—আয় বিলু, আয়—

বিলু বলে—কি? হ্যাঁ?

সে ওই দটো কথা বলতে শিখেচে।

হেঁটে স্কুলে যেতে হয় অনেক দূর। দেরি হয়ে যায়, পথে যেতে যেতে শোনেন স্কুলের ঘণ্টা বাজচে। সাত মিনিট লেট। হেড মাস্টার নীরোদ রায় বড় কড়া লোক, বয়স পঞ্চাশের ওপর, চোখে চশমা, লম্বা দোহারা চেহারা।

—এত দেরি হোলে রোজ রোজ চলবে না, নারাণবাবু—

নারাণবাবু অপ্রতিভ মুখে হাজিরা খাতাখানা টেনে নেন। কিন্তু আরও পাঁচ মিনিট পরে হেড মাস্টারের প্রিয়পাত্র সারদাবাবু এসে একগাল হেসে বলেন,—উঃ, কি রোদ আজকে স্যার। গা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে।

হেড মাস্টার বলেন,—আপনার মেয়ের বিয়ে ঠিক হোল হুগলীতেই? বসুন, বসুন—

—দুটো পান নিন স্যার।

একটি ছেলে ক্লাসের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। নাম ইন্দুভূষণ। সুন্দর চেহারা। নারাণবাবুকে এগিয়ে এসে ক্লাসে নিয়ে যায়। ক্লাসে ছেলেদের ভিড়। নারাণবাবুকে সবাই ভালবাসে। পছন্দ করে, ভয়ও করে। ক্লাস চুপ হয়ে যায়—একবার মৃদু ভর্ৎসনায় অঙ্ক কষান, বোর্ডে খড়ি দিয়ে।

ইন্দুভূষণ বলে—অঙ্ক কষার পরে সেই গল্পটা বলুন স্যার।

সব ছেলে সায় দেয়। নারাণবাবু বলেন, জানলাগুলো খুলে দাও, দেখো তো কেমন সুন্দর। মাঠ, গাছপালা ভগবানের তৈরি সুন্দর পৃথিবীকে চোখ ভরে দেখতে শেখো। শুধু বইয়ের পড়া পড়লে মানুষ হবে না! চোখের দৃষ্টি ফুটুক।

ইন্দুভূষণ বলে—ঐ দেখুন বাঁশঝাড়ের আকাশটা কেমন ময়ূরকণ্ঠী রং। নদীর ওপারে কি রকম কাশফুল ফুটেচে!

নারাণবাবুর মন আনন্দে ভরে ওঠে। এই একটি ছেলেকে তিনি অন্ততঃ দৃষ্টিদান করতে পারবেন হয় তো। ইন্দুভূষণ স্কুল ম্যাগাজিনের জন্যে লেখা—নিজের রচনা পড়ে শোনাচ্ছে. এমন সময়ে হেড মাস্টার দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে কড়া নজরে এক চমক ক্লাস রুমের দিকে চাইলেন। ইন্দুভূষণের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। নারাণবাবু থতমত খেয়ে গেলেন।

পাশে অন্য একটি ক্লাস। হেড মাস্টারের প্রিয়পাত্র সারদাবাবু চেয়ারে বসে ঢুলছিলেন।

মনোরমা স্বামীর জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন অপেক্ষা করে। ও বেলা সত্যিই কিছু ছিল না খেতে দেবার। ভর্ৎসনার সুরে কথা বলেচেন। দুপুরে সেই দুঃখ মনে বড় বেজেচে। একটু চা দিতেও পারেন নি।

নারাণ মাস্টার বলেন,—অত হাসি-হাসি মুখ কেন? কি খেতে দিচ্ছ?

মনোরমা বলেন,—হাত পা ধুয়ে নাও, এসো। স্বামীকে জল এগিয়ে দেন। পাখার বাতাস করেন।

নারাণবাবু জিজ্ঞেস করেন—ননী আজ ইস্কুলে যায় নি কেন?

মনোরমা মিথ্যে করে বলেন—পেটের অসুখ হয়েছিল। কিন্তু তা নয়, ননীমাধব অত্যন্ত অবাধ্য প্রকৃতির ছেলে, এ বয়সে অনেক রকম ছল-চাতুরি শিখেচে। ভাদ্র মাসে বিলে জল বেড়েচে। সেখানে মাছ ধরতে গিয়েচে, পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে।

স্বামীর জলখাবার ও চা দেন মনোরমা। তালের বড়া আর চা। গরম গরম বড়া ভাজেন, আর ভালো ভালো দেখে স্বামীর পাতে তুলে দেন।

বাইরে ছেলেরা এসে ডাকে—বাড়ী আছেন স্যার? নারাণবাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

মনোরমা বলেন,—বোসো বোসো। অত খাটলে শরীর থাকবে কেন? একটু বোসো। আর দুখানা ভেজে দিই।

সেই ছোট ছেলেটি এসে টলতে টলতে নারাণবাবুর পাশে বসে যায়। ওর মুখে তুলে দিয়ে খাওয়ান।

নদীতীরে প্রতিদিন একটু করে বেড়াবার অভ্যেস আছে নারাণ মাস্টারের। ইন্দুভূষণ ও আরো দুটি ছেলেকে নিয়ে নক্ষত্র সংস্থান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্চেন আজ।

ইন্দুভূষণ বলেচে, ভেনাস কোন্‌টা স্যার?

নারাণ মাস্টার বলচেন—এই বাঁশঝাড়ের মাথার ওপরে—ঐ দ্যাখো।

—বেশ বড় নক্ষত্র—

—ওটিকে নক্ষত্র বলো না। ওটি গ্রহ। সৌর জগতের একটা গ্রহ। অন্য অন্য গ্রহ-গুলির নাম করো তো? তোরা দেখেচিস্ শুক্র গ্রহ?

—ঐ বাঁশঝাড়ের মাথায়?

হঠাৎ সেদিকে দেখা গেল ননীমাধব জলের ধারে ছিপ নিয়ে মাছ ধরচে। বাপকে দেখে ননীমাধব ততক্ষণ ছিপ গুটিয়ে ফেলে। নারাণ মাস্টার দুঃখিত হন। বলেন—তুই তো আজ ইস্কুলেও যাস নি—অথচ তোর দিদির বাড়ী গিয়েচিস্ শুনলাম বাড়ীতে।

ননী চুপ করে রইল। নারাণ মাস্টারের মেয়ের বিয়ে হয়েচে পাশের গ্রামেই।

—তোর মার কাছে বলে এসেচিস্ দিদির বাড়ী যাচ্চি?

—হ্যাঁ।

—কেন মিথ্যে কথা বলতে গেলি? অমন আর কখনো বলবে না। মিথ্যে কথা কারো কাছে কখনো বলবে না। সত্য কথা বলবে, এতে যদি কোনো ক্ষতিও হয়, তাও ভালো। সর্বদা মনে রাখবে এটি। কেমন তো? আচ্ছা বাড়ী যাও।

বাড়ীতে মনোরমা সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখিয়ে প্রণাম করলেন। পাশের বাড়ীর গাঙ্গুলী-বৌ ও শুভদা ঠাকরুণের কাছে সংসারের দুঃখকষ্টের কথা বলেন। শুভদা এসেচেন তেল ধার নিতে। গরীব বিধবা। মনোরমা যেটুকু তেল আছে, তার বেশি অংশটা শুভদাকে ঢেলে দিলেন। স্বামীর কথা বলেন ওঁদের কাছে।

—এমন লোক যদি দেখে থাকি কখনো পিসি। সংসারের দিকে নজর নেই; কোনো দিকে নজর নেই। কি নিয়ে যে লোকটা থাকে দিনরাত! মেয়েটার ওই কষ্ট, তখুনি বলেছিলাম দোরের কাছে কুটুম্ব করতে নেই। দু-বেলা কথা শুনতে হবে, তখন তা শুনলেন না। এখন তাই হচ্ছে, যা বলেছিলাম।

শুভদা ঠাকরুণ বললেন—শাশুড়ী খারাপ না হয় বুঝলাম। কিন্তু জামাই তো শুনেচি বড় ভালো ছেলে?

—ভালো হলে কি হবে পিসি, মায়ের কাছে জুজু। মার সামনে কথা বলতে পারে ছেলে? উনি বলেন, মায়ের বাধ্য হয়ে থাকা ছেলের উচিত। বললাম যে, কোনোদিকে নজর নেই ওঁর—চাল নেই, তেল নেই, আজ বাদে কাল সকালে কি হবে ঠিক নেই—কে শুনচে সে সব কথা। ছাত্রদের নিয়েই ব্যস্ত। কেউ এক পয়সা দেবে না, ভূতের ব্যাগার খেটেই খুশি। আচ্ছা, বলো তো পিসি, এ কি রকম কান্ড?

নারাণ মাস্টার বাইরে থেকে হাঁক দেন এই সময়ে—একটা আলো ধরো। বাইরের দিকে বড্ড অন্ধকার।

মনোরমা মুখঝামটা দিয়ে বলেন—হ্যাঁ, সাতটা লণ্ঠনে আলো জেবলে তোমার জন্য বসে আছি যে! পিপে পিপে তেলের ব্যবস্থা ঘরে রেখেচ যে! এলে কোত্থেকে আমার মাথা কিনে, জিগ্যেস করি?

নারাণ মাস্টার লজ্জিত মুখে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হোঁচট খান। মনোরমা বলেন—লাগলো নাকি? তোমার দেহটা এমনি করেই সাতখোয়ারে যাবে। দেখি কোথায় লাগলো?...

মনোরমা রান্নাঘরে গিয়ে চা তৈরি করচেন। ননীমাধব খিড়কী দোর দিয়ে চুপি চুপি ঢুকে বললে, মা, বাবা কোথায়?...বাটিতে কি?

—ওঁর জন্যে দুটো চিঁড়ে ভাজা করেচি ঘি দিয়ে। না খেয়ে খেটে খেটে ওঁর শরীরটা যে গেল। এই খানিক আগে এমন হোঁচট খেলেন যে পা ভেঙে যেতে যেতে রয়ে গেল। ও থেকে তোমাকে না। তোমার জন্যে চালভাজা আছে—তেল মেখে দিচ্ছি। দিদির বাড়ী যাস নি?

—হুঁ।

—কেমন আছে সে? এতক্ষণ সেখানে ছিলি? কি খেতে দিলে?

—কিছুই না। ঘণ্টাকর্ণ। দাও চিঁড়েভাজা—দিদি ভাল আছে।

—না—না। এ ওঁর জন্যে ঘি দিয়ে ভাজা। তোকে এর পরে দেবো এখন। বোসো গে যাও।

নারাণ মাস্টার চিঁড়েভাজা খেতে খেতে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করেন।

মনোরমা বলেন—ননী এই এল অমলার শ্বশুরবাড়ী থেকে। অনেকক্ষণ ছিল সেখানে। অমলা ভাল আছে।

নারাণ মাস্টার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কে বললে এ সব কথা?

—কেন ননী বললে, আবার কে বলবে। সে এই তো এল ওর দিদির বাড়ী থেকে। রান্নাঘরে বসে খাবার খাচ্ছে।

নারাণ মাস্টার একবার ভাবলেন স্ত্রীকে ছেলের গুণের কথা সব খুলে বলেন। তাঁর উপদেশ সত্ত্বেও সে আবার তার মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলেচে। কিন্তু সরলা পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে নারাণ মাস্টার সে কথা চেপে গেলেন।

বাইরে থেকে ছেলেরা ডাক দিলে—বাড়ী আছেন স্যার? ছেলেরা পড়তে এসেছে। ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নারাণ মাস্টার।

নারাণ মাস্টার স্কুলে গেলেন। হেড মাস্টার আজ আর কিছু বলেন না। ক্লাসে ক্লাসে ছেলেরা তাঁকে নিজের নিজের ক্লাসে পাবার জন্যে যথেষ্ট আগ্রহ দেখায়। ইন্দুভূষণের ক্লাসে নারাণ মাস্টার ঢোকেন। একটু পরে হেড মাস্টার এসে গম্ভীরভাবে ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে গেলেন, এ ক্লাসটা তাঁর নয়। রুটিনটা দেখে ঢুকলেই তো হয়।

অঙ্ক কষাতে কষাতে কি করে এসে পড়ে সূর্যের কথা। সূর্য আছে বলে, জগতে রঙের খেলা অদ্ভুত—নারাণ মাস্টার বোঝান। তা থেকে নিউটনের কথা এসে পড়লো—জ্ঞান-তপস্বী নিউটন।

বাইরে দাঁড়িয়ে হেড মাস্টার শোনেন। নারাণ মাস্টারের জনপ্রিয়তা হেড মাস্টারের চক্ষুশূল।

একটু পরে মাখনলাল সুর স্কুলে এসে ক্লাসে ক্লাসে বেড়াতে বেরুলেন। মাখনলাল সুর দু-তিনটি তেলের কলের মালিক। কালো, মোটাসোটা চেহারা, মুখখানিতে দাম্ভিকতা মাখানো। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানেন না, টাকার জোরে স্কুলের সেক্রেটারি হয়েচেন বলে শিক্ষকদের ওপর প্রভুত্ব একটু বেশি করেই খাটান।

বিভিন্ন ক্লাসে ঢুকে পরীক্ষা করেন। প্রথমে ক্ষেত্রবাবুর ক্লাস। ক্ষেত্রবাবু সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ান। বলেন, পড়িয়ে যান—আমি শুনি। বাংলা সাহিত্য পড়াচ্ছেন ক্ষেত্রবাবু। সুরমশায় বলেন, ও সব কি আর কবিতা? কবিতা ছিল সেকালে যদু মুখুয্যের। কুব্জপৃষ্ঠ নুব্জদেহ উষ্ট্র সারি সারি, কি আশ্চর্য শোভাময় যাই বলিহারি, ইত্যাদি।

কৌটো খুলে পান খান ক্লাসের মধ্যেই।

তারপরে যদুবাবুর ক্লাস। ইতিহাস পড়াচ্ছেন যদুবাবু, মন দিয়ে শিবাজির জীবনী বর্ণনা করচেন ছেলেদের কাছে।

মাখন সুর এক অবান্তর প্রশ্ন করে বসলেন—বলো দিকি, দাশু রায় পাঁচালি লিখে-ছিলেন কত সালে? মাস্টার, বলে দাও না ওদের। দাশু রায়—আহা, অমন গান আর কেউ বাঁধতে পারবে না—

তারপরে নারাণবাবুর ক্লাস। নারাণবাবু মশগুল হয়ে গিয়েচেন অধ্যাপনায়: কিন্তু তিনি অঙ্ক ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করচেন ক্লাসে। মাখন সুর ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি না অঙ্কের মাস্টার? আমি শুনেচি আপনি ক্লাসের পড়া না করিয়ে ছেলে-দের কাছে বাজে গল্প করেন।

নারাণবাবু বললেন,—কথাটা উঠলো কিনা, আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী, বিশেষতঃ কবিতার। তাই আবৃত্তির নিয়মটা ওদের—

—তা শেখবার কোনো দরকার নেই। আপনি যে জন্যে আছেন, তাই করুন! আমি

অনেকদিন থেকে এরকম শুনে আসচি, কিন্তু আজ স্বচক্ষে দেখলাম!

একটু পরে চাকরে এসে একটা স্লিপ দিয়ে গেল। নারাণবাবুর তলব হয়েচে হেড মাস্টারের ঘরে।

নারাণবাবু পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে দেখেন হেড মাস্টার অপ্রসন্ন ও বিরক্ত মুখে বসে। বললেন—আপনি কোনো কাজ করেন না ক্লাসে—ছেলেদের যা পড়ান তা সিলেবাসের বাইরে। সেকেন্ড ক্লাসে এ্যালজেব্রা কতদূর করিয়েছেন দেখি এ বছর। মোটে সিম্পল ইকোয়েশান ধরাচ্ছেন? তা' হোলে কবে কোর্স শেষ করবেন আপনি? আপনাকে নিয়ে বড় মুশকিল হোল দেখচি। আপনার পুরোনো রোগ গেল না। সেই বাজে গল্প করা।

নারাণবাবু বললেন—আমি বাজে গল্প করি নে—ছেলেদের উদার দৃষ্টি যাতে খোলে তার চেষ্টা করি।

—টেক্স্ট বইয়ের যে একটা জগৎ আছে—তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে আপনাকে রাখা হয় নি এখানে? Know this school to be a machine for turning out matriculates—আপনাকে আর কত শেখাবো বলুন—

যদুবাবু, ক্ষেত্রবাবু ও রাখালবাবু নারাণবাবুকে জিগ্যেস করেন শিক্ষকদের বিশ্রাম ঘরে—ব্যাপারটা কি হয়েছিল নারাণবাবু? সব শুনে যদুবাবু খুব লাফঝাঁপ দেন।

—আমি হোলে অমন হেডমাস্টারকে দেখিয়ে দিতাম। দু-কথা দিতাম শুনিয়ে আচ্ছা করে। সিলেবাস শেখাতে এসেচে? সিলেবাস্? অন্ত্যজ কোথাকার! মুখের মত জবাব দিয়ে দিতাম আজ—

ক্ষেত্রবাবু বলেন—একটু আস্তে—আস্তে—

—কিসের আস্তে, ভয় করি নাকি? এ শর্মা কাউকে থোড়াই কেয়ার করে না বলে দিচ্ছি।

স্কুলের চাপরাসী এসে ডাকলে—হেডমাস্টারবাবু যদুবাবুকে ডেকেচেন—

যদুবাবু হঠাৎ বাতাস-বের-হওয়া বেলুনের মত চুপসে গেলেন। হেড মাস্টারের ঘরে জড়িত পদে ঢুকে বললেন, আমাকে ডাকচেন?

—হ্যাঁ, আপনি শনিবার ফোর্থ ক্লাসের উইকলি পরীক্ষার নম্বর এখনো কেন দেন নি?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

—না, যদুবাবু। আজ ন'দিন হয়ে গেল—কাজে আপনার বড় গাফিলতি হচ্চে। গতবারও এমনি করেছিলেন আপনি। এ রকম আর কখনও করবেন না আশা করি। ওতে ছেলেদের অসুবিধে হয়। বুঝলেন!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। স্যার, আমার শরীরটা একটু খারাপ ছিল বলেই, নইলে এতদিন—

—আচ্ছা, এখন আসুন তবে।

শিক্ষকদের বিশ্রামঘরে ফিরে আসতেই অন্য সব মাস্টার আগ্রহে জিগ্যেস করেন—কর্তা কি জন্যে ডেকেছিলেন হে? যদুবাবু হাত পা নেড়ে বলেন—দিয়ে এলুম শুনিয়ে দু-কথা। আমায় বলে কিনা ফোর্থ ক্লাসের খাতা ফেরত দিতে অত দেরি হোল কেন? আমি মুখের ওপর বলে এলাম মশাই, চল্লিশ টাকা মাইনেতে তো চলে না, আমাদের টুইশানি করে খেতে হয়। সময় পাই কখন যে খাতা সকাল সকাল দেখে দেবো? দিলাম শুনিয়ে।

—বললেন ওই কথা?

—বলবো না? এ শর্মা থোড়াই কেয়ার করে। হি মাস্ট বি টোল্ড সাম হোম ট্রুথ—

পাশের বাড়ীতে রেডিওতে গান হয়। ও যেন একটি অন্য জগৎ, রসের জগৎ। যে জগতের সঙ্গে শিক্ষকদের কোনো পরিচয় নেই। শিক্ষকেরা কান পেতে শোনেন।

বেরিয়ে এসে সবাই একটা চায়ের দোকানে বসেন। ভাঙা পেয়ালায় চা খান। নারাণবাবুর অপমানে সবাই দুঃখিত। রাখালবাবু বলেন—যেদিন এদেশে শিক্ষকতার কাজ সম্মানিত বলে বিবেচিত হবে, সেদিন বুঝতে হবে জাতি হিসেবে আমরা জেগেছি। আজ আমাদের স্থান কোথায়, নারাণবাবুর ওপর মাখনবাবুর ব্যবহারেই বুঝে নেওয়া যাবে।

রাখালবাবু নারাণবাবুকে নিজের বাড়ী নিয়ে যান। বড় শ্রদ্ধা করেন তিনি তাঁর এই সরল অকপট উদার-দৃষ্টিসম্পন্ন সহকর্মীটিকে। রাখালবাবু বিদেশী শিক্ষক, এখানে তাঁর বাসা। বাসাতে তাঁর স্ত্রী, তিনটি ছেলেমেয়ে ও ভাইঝি নিভা থাকে। নিভার বয়স বছর আট-নয়, ফ্রক পরা ফুটফুটে মেয়েটি। নারাণবাবু তাকে কাছে ডেকে আদর করেন।

নারাণবাবুর মেয়ে অমলার শ্বশুরবাড়ী। অমলার শাশুড়ী তার ওপর অত্যন্ত কুব্যবহার করে। ছেলে সুকুমারের সঙ্গে অমলার দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ। অমলা সেজেগুজে জানলায় বসে আছে—আজ স্বামী কলকাতা থেকে আসবে অনেকদিন পরে।

শাশুড়ী এসে বলেন—বলি, হ্যাঁগা বৌমা, বিকেলে ঝাঁট নেই, পাট নেই—দোরে জল দেওয়া নেই—অমন পটের বিবি সেজে জানলায় বসে রয়েছ কেন? সে গুড়ে বালি। সুকু আজ আসবে না চিঠি লিখেচে। তুমি উঠে গিয়ে ছাদ থেকে কাপড়গুলো নিয়ে এসো আর এ বেলার ভাত চড়িয়ে দাও গে।

অমলা সলজ্জ মুখে উঠে গেল রান্নাঘরে। তার মন ভেঙে গিয়েছে। স্বামী সে কথা তো গতবার বলে যান নি? শাশুড়ী মিথ্যে কথা বলেছিলেন।

সন্ধ্যার ট্রেনে সুকুমার এল। অমলার জন্যে শাড়ী নিয়ে—নিজে আহ্লাদ করে দেখাতে গেল। মা কাপড়খানা ছিনিয়ে নেন ছেলের হাত থেকে। বলেন—এ আমার পাঁচীর সাধের সময় তাকে দেবো। বৌয়ের জন্যে আর রোজ রোজ কাপড় আনতে হবে না। যে গুণধর বৌ। সংসারের কুটোটুকু দু-খানা করে উপকার নেই। সারা বিকেল সেজেগুজে ঠায় বসে রইল জানলায়। বলে, কোনো কাজ করতে পারবো না। যেমন হেজল-দাগড়া তেমনি বদমাইস। হবে না? ছোট ঘরের মেয়ে যে! ওর বাবার নাম পাগলা মাস্টার।

অমলা আড়াল থেকে স্বামীকে দেখবার জন্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাবার প্রতি অমন অপমানসূচক শব্দ প্রয়োগে সে আর স্থির থাকতে পারে না।

সামনে এসে বলে—বাবার নামে অমন যা তা বলবেন না আপনি। আমি কি করেচি না করেচি আপনাদের তা জানি নে, কিন্তু আমার বাবা যে কারো কোনো অনিষ্ট করেন নি বা করতে পারেন না এটা আমি ভালো করেই জানি।

শাশুড়ী ঠাকরুণ রণচন্ডী মূর্তি ধারণ করলেন। ছেলেকে দিব্যি দিলেন সে যেন ও বৌয়ের মুখদর্শন না করে। অনেকরাত্রি জেগে দু-জন দু-জানলায় বসে রইল।

সেদিন নারাণবাবু আহার করতে বসে বললেন—এঁচড় কোথা থেকে পেলে? অসময়ে এঁচড়!

মনোরমা বললেন—আমি জানি নে, ননীমাধব কোথা থেকে এনেচে।

নারাণ মাস্টার বললেন—কোথা থেকে আনবে? এ নিশ্চয় অন্য কারো গাছ থেকে চুরি করে এনেচে। আমাদের নিজেদের গাছ নেই—কেই বা দেবে অসময়ে? বলি শোনো, চুরির জিনিস আমার পেটে সইবে না। আমার সংসারে কেউ খাবে না। ফেলে দাও সবটুকু।

মনোরমা অনেক যত্ন করে দরিদ্র সংসারে অসময়ের এঁচড় রেঁধেছিলেন। স্বামী খেতে ভালোবাসেন বলে তাঁর অত আগ্রহ। এই আগ্রহের জিনিসটা নির্মমভাবে ফেলে দিতে তাঁর চোখে জল এল। কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না মুখে। তিনি তাঁর স্বামীকে খুব ভাল ভাবেই চেনেন। অনুনয় বিনয়ে এক্ষেত্রে কোনো ফল হবে না। অভিমান করে চুপ করে

রইলেন।

মনোরমাকে বুঝিয়ে বললেন নারাণ মাস্টার—দেখো, ছেলেকে শুধু উপদেশ দিলে কাজ হবে না। "আপনি আচরি ধর্ম পরের শিখায়"—আমরা পিতামাতা, এই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া দরকার। মুখে বলি, অথচ চুরির এঁচড় রেঁধে খাই—এতে ছেলেপিলে ভালো উপদেশ কখনো নেবে না। আমি জানি তোমার মনে কষ্ট হয়েচে, কিন্তু আমি যে পিতা, তুমি যে মা—আমরা যে শিক্ষক।

নারাণ মাস্টারের ক্লাসে জানলা বন্ধ ছিল। তিনি ক্লাসে গিয়েই জানলা খুলে দিতে বলেন।

ছেলেদের বলেন—মনের জানলাও সব সময়ে ঐ রকম খুলে রাখতে হবে। দ্যাখো তো কেমন নীল আকাশ? চোখকে তৈরি করো বাইরের সৌন্দর্য দেখতে। জীবনে মস্ত আনন্দ পাবে।

হেডমাস্টার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। একটু পরে ডেকে পাঠালেন।

—কেন ডেকেচেন স্যার?

—এদিকে আসুন, বসুন দয়া করে।

নারাণ মাস্টার বসেন। হেড মাস্টার বলেন—আপনাকে কথাটা বলি। আপনার অঙ্কের ফল অত্যন্ত খারাপ এবার। কাল পরীক্ষার নম্বর আনিয়েচি ইউনিভার্সিটি থেকে। ছ-টা ফেল অঙ্কে। আপনি এদিকে দেখি ক্লাসে বসে আর্টের চর্চা করেন। সেজন্যে কি আপনাকে রাখা হয়েচে স্কুলে? কতবার না আপনাকে একথা আমি বলেচি? বড় দুঃখের বিষয় নারাণবাবু।

নারাণবাবু চুপ করে থাকেন। সাহস করে কিছু বলতে পারলেন না।

রাখালবাবু টিচার্স রুমে বসে সব কথা শুনে বলেন—ও, আর ওঁর সাবজেক্টে যে এগারটা ফেল! তার বুঝি কোনো কৈফিয়ত নেই? গরীবের ওপর যত জুলুম। বেশ!

বাজারে এসে সেই দোকানে মাস্টারেরা ভাঙা পেয়ালায় চা খান। সেখানে রাখালবাবু কথাটা তোলেন। স্কুল কমিটির অবিচার সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। একজন মাস্টার (যদু-বাবু) বলেন, শুধু টিউশনি করি সকাল থেকে পাঁচটা। বিকেলে আরো পাঁচটা। তাতেও কি সংসার সুচারু রূপে চলে? একটি মেয়ে ঘাড়ে। দেশের তরুণদের যাঁরা গড়ে তুলবেন, গোটা জাতিটিকেই তাঁরা গড়ে তুলচেন—তাঁদের দিকে কে তাকায়?

ভগ্নমনে যে যাঁর বাড়ী যান। সন্ধ্যা হয়ে আসে।

যদুবাবু বলেন—তোমরা যাও, আমি আবার গুণী মল্লিকের বাড়ী প্রাইভেট পড়াতে যাবো।

—খেলেন না কিছু? বাড়ী যাবেন না?

—বাড়ী গেলে সময় পাবো কখন? ওই কোনোদিন রাস্তায় খেতে খেতেই পথ চলি—দু-এক পয়সার বিস্কুট কি মুড়ি। কোনোদিন তারও সময় হয় না। আমাদের আবার খাওয়া, তুমিও যেমন ভায়া!

স্কুলে প্রাইজ বিতরণ উপলক্ষে সভা। সভায় নারাণ মাস্টারের ছাত্র ইন্দুভূষণ চমৎকার আবৃত্তি করলে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন—এমন আবৃত্তি শিখিয়েচে কে?

—নারাণ মাস্টার মশাই।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নাম মিঃ কান্‌ওয়ার। পাঞ্জাবী। কেম্ব্রিজের গ্রাজুয়েট। নারাণ মাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওঁর বাড়ী আসেন। পথে মাখন সুর কি একটা কথা

বলতে গেলেন খোশামুদের ভাবে হাত জোড় করে—স্যার, আমাদের অয়েল মিলের লাই-সেন্সটার বিষয় একবার—

মিঃ কান্‌ওয়ার বিরক্তির সুরে বললেন—আভি নেই—নট নাউ—কাম এ্যান্ড সি মি ইন্‌ মাই অফিস্‌—

মিঃ কান্‌ওয়ারকে নারাণ মাস্টার পল্লী-প্রকৃতির সৌন্দর্য বোঝান। জ্যোৎস্না রাত্রি। মিঃ কান্‌ওয়ার বলেন—মিঃ গাঙ্গুলি, আপনি একজন আইডিয়াল টিচার—আপনি আমাকেও Rural Bengal-এর রূপটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন—আমি আপনাকে মনে রাখবো—

মনোরমা ভাঙা পেয়ালায় দুজনকে চা দেন।

মাখন সুরের বাড়ীতে ক্রিয়াকান্ড। সব মাস্টার ভূতের মত খাটচেন। কেউ অভ্যর্থনা করচেন, কেউ রান্নার তদারক করতেন।

নারাণ মাস্টারকে মাখনবাবু বলেচেন চা দেওয়া পরিদর্শন করতে। সার্কেল অফিসার মিঃ সুধীন বসুকে চা নিজের হাতে দিতে বলেন। নারাণবাবু চা দিতে গেলে তরুণ মিঃ বসু উঠে চায়ের কাপ নিয়ে বলেন—স্যার আপনি কেন? রাখুন, রাখুন—আমায় চিনতে পারলেন? আমি সুধীন। আপনার ছাত্র।

নারাণ মাস্টার বলেন—কোন্‌ বছর পাস করেছিলে বাপু, এসো এসো, দীর্ঘজীবী হও। মনে তো হচ্ছে না।

—মানিকদের ব্যাচ, উনিশশো ত্রিশ সালে ম্যাট্রিক পাস করি স্যার। আপনি আমার গুরু।

—বেশ, বেশ, বেঁচে থাকো বাবা, আজকাল তুমি কি আমাদের সার্কেল অফিসার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।

—আমাদের বাগদিপাড়ায় একটা টিউবওয়েল করে দিতে পারো বাবা? খালের নোংরা জল খেয়ে সব কলেরায় মরেচে। আমার দুটি ছাত্র মারা গিয়েচে। ওরা গরীব, তোমাদের সামনে অভাব অভিযোগ জানাতে পারে না। এই কাজটি তোমার গুরু-দক্ষিণা হবে বাবা, যখন গুরু বলে ডাকলে তখন বলি।

ছেলেটি খাতা বের করে বললে—গ্রামের নাম আর পাড়াটা বলুন স্যার। টুকে নি। আজকাল ভালো কাজ করবো বললেও করা যায় না, আপনি পণ্ডিত লোক, আপনাকে কি বোঝাবো! বিদেশী শাসন চলেচে শোষণের জন্যে, প্রজার মঙ্গলের জন্যে নয়। গভর্ণ-মেন্টের কাজে ঢুকে সেটা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝচি—আচ্ছা স্যার প্রণাম। পায়ের ধুলো দিন আর একবার।

ছেলেটি বিদায় নিতে উদ্যত হোলে মাখন সুর হাত কচলাতে কচলাতে তার পেছন পেছন খানিক দূর গেলেন।

আরো খানিকক্ষণ খেটে বেলা গেলে নারাণ মাস্টার অভুক্ত অবস্থায় বাড়ী চলে গেলেন। কেউ জিগ্যেসও করলে না তিনি খেয়েচেন কিনা।

মাখন সুর যাবার আগে কেবল বললেন—নারাণবাবু, কাল একটু সকাল সকাল আসবেন, ভাল চন্ডীর গানের আসর হবে কিনা। থানার বড় দারোগাবাবু আসবেন খবর দিয়েচেন।

ছ বছর পরে।

রাখালবাবুর বাড়ী তাঁর স্ত্রীর কলেরা। নারাণ মাস্টার ছাত্রদল নিয়ে সেবা করচেন। ছেলেদের মধ্যে ইন্দুভূষণই পরিচালক। সবাই ব্যস্ত, কেউ জল গরম করচে, কেউ ডাক্তার বাবুর হাতে সাবান দিয়ে জল ঢেলে দিচ্ছে। রাখাল মাস্টারের মেয়ে প্রীতি ইন্দুভূষণকে সাহায্য করে। কৃতজ্ঞতায় প্রীতির তরুণ হৃদয় কানায় কানায় ভরা। রাখালবাবুর স্ত্রী রাত্রে মারা গেলেন। প্রীতিকে ইন্দু বোঝায়। এর আগেও ইন্দুর সঙ্গে প্রীতির দেখা হয়েচে দু-একবার। নারাণ মাস্টার রাখালবাবুর বাসায় খবরের কাগজ আনতে পাঠাতেন,

প্রীতিই কাগজখানা ইন্দুভূষণের হাতে দিত।

কৃতজ্ঞতা প্রেমে পরিণত হোল ক্রমশঃ। মাতৃবিয়োগের পর শোকাচ্ছন্ন দিনগুলিতে ইন্দুভূষণ সান্ত্বনা দিত ওকে। রাখাল মাস্টার বাড়ী থাকতেন না। দু-জনের প্রেম গড়ে উঠলো। ইন্দুভূষণ ম্যাট্রিক পাস করে তখন কলেজের ছাত্র। কিন্তু নারাণবাবুর বাড়ীতে সে নিয়মিত আসে।

মনোরমা বয়স ও দারিদ্র্যের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েচেন। ছেলে অবাধ্য, লেখাপড়া করলে না, দুবার ম্যাট্রিক ফেল করেচে। মাকে এসে বলেচে, মা একটা কলের গান কিনবো, টাকা দাও। মা বললেন—কি করে বলিস এসব কথা ননী? ওঁর বয়স হয়েচে, সংসারের জন্যে ওঁর এখন চিন্তা এসে পড়েচে, আগে তো গায়ে আঁচড় লাগাতে দিতাম না। এখন ভালো করে একবাটি দুধ খেতে দিতে পারি নে। তোকে কলের গান কেনবার টাকা কোথা থেকে দেব।

ছেলে মার সঙ্গে ঝগড়া করে—সমানে উত্তর করে। অবশেষে বাবার পায়ের শব্দ পেয়ে খিড়কি দোর দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়।

নারাণ মাস্টার ঢুকে স্ত্রীকে চোখ মুছতে দেখে বললেন—কি হোল, চোখে কি? তিনি তো সংসারের কিছু খবর রাখেন না।

স্ত্রী বলেন—চোখে কি হয়েচে, সব সময় জল পড়চে।

ওঁর মেয়ে আবার চিঠি দিয়েচে। মনোরমা বলেন সে কথা স্বামীকে। ওকে একবার দেখে এসো না গো! ওদিকে তো যাও। নারাণ মাস্টারের মনটা কেমন করে ওঠে। পাশের গ্রামে যাবার সময় ওর শ্বশুরবাড়ীর সামনে দিয়ে যান। মেয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। জামাইয়ের সঙ্গে দেখা। জামাই বলে, আসুন বাড়ীতে। নারাণবাবু বলেন—সময় নেই, যাবো না, অমলাকে বুঝিও।

বাড়ী এলে মনোরমা বলেন,—হ্যাঁগা, তুমি গিয়েছিলে? নারাণবাবু বলেন—হ্যাঁ, খুব যত্ন করলে। অমলার শাশুড়ী নিজে এসে কত কথা বললে। জল খাওয়ালে।

প্রীতি ও ইন্দুভূষণের শেষ দেখা। প্রীতির বিয়ে অন্য স্থানে স্থির হয়েচে। প্রীতির অভিভাবকদের হাত এতে সম্পূর্ণ; বেচারী প্রীতি নিরুপায়া, সে শুধু জানাতে এসেচে গোপনে ইন্দুভূষণকে। বাড়ীর পিছনে এক জামতলায় দু-জনে এসে দাঁড়িয়েচে। প্রীতি বললে—আমি কি করবো ইন্দুদা, আমি কি করতে পারি? আমি তোমার সঙ্গে পালাতে পারি, কিন্তু বাবা তাতে মরে যাবেন। তা করতে পারবো না।

প্রীতির বিবাহের পরদিনই সকালে উঠে মনোরমা দেখলেন ছেলে ননীমাধব ঘরের দোর খুলে রেখে মায়ের বাক্স ভেঙে তিনশো টাকা ও বাবার সাবেক আমলের ঘড়িটা নিয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে। একখানা চিঠি খুঁজে পাওয়া গেল, তাতে সে লিখেছে, বৃহত্তর জগতের আহ্বানে আজ সে বাড়ী ছেড়ে চললো, বাবা-মা যেন কিছু মনে না করেন। নারাণ মাস্টার স্ত্রীকে বোঝান।

মনোরমা বলেন—হ্যাঁগা, তুমি যাও, ওকে এনে দাও।

—যাবো, ভেবো না।

—হ্যাঁগা, সে কোথায় গেল?

—ভেবো না।

—তাকে এনে দেবে?

—হ্যাঁ এনে দেবো।

এমন একদিনে নারাণবাবুর চাকরি গেল। এর মস্ত কারণ একজন দেশসেবকের মৃত্যুতে নারাণবাবু ছেলেদের নিয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে সভা করেছিলেন।

ছেলেদের বিদায় অভিনন্দন হোল গাছতলাতেই। নারাণবাবু গ্রহণ করলেন। হেড মাস্টার ও মাখন সুর স্কুল-গৃহে উক্ত অভিনন্দনের অনুষ্ঠান করতে দিতে রাজী হোলেন না। বিদায়ের সময় নারাণবাবুর মর্মস্পর্শী বাণীতে সকলের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

নারাণবাবু অভিনন্দন-পত্র হাতে হেঁটে আসচেন, মাখন সুর পাশ দিয়ে ফিটন গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের সভা। মাখন সুর এলে সবাই দাঁড়িয়ে উঠলো—অথচ নারাণবাবু যে বেঞ্চিতে বসে, সেই বেঞ্চিতে বসে সাধারণ লোকে বিড়ি খাচ্চে। পেছনের বেঞ্চিতে বসে আছেন নারাণবাবু, জায়গা না পেয়ে। মাখন সুরের বক্তৃতা শুনচেন।

মাখন সুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার হবেন, জনসাধারণের ভোট চান। বক্তৃতায় তিনি বলচেন, তিনি আজ অনেকদিন ধরে দেশের সেবক ও ভৃত্য তা সকলেই জানেন। স্কুল ও সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় নিয়ে তিনি কি রকম প্রাণপাত পরিশ্রম করেচেন, তা যে সার্থক হয়েচে—এতেই তিনি ধন্য। অন্য কোনো প্রতিদান তিনি চান না, কেবল দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ছাড়া...ইত্যাদি। খুব চটাচট হাততালি পড়চে।

বাইরে এসে নারাণবাবু বিড়ি টানতে টানতে অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলেন। লোকের কাছে বলেন—চমৎকার লোক মাখনবাবু। কেমন চমৎকার বক্তৃতা দিলে। দেশের মধ্যে অমন লোক আর নেই। বড় ভদ্র লোক।

এক জায়গায় বসে ছেলের কথা ভাবেন। পরের ছেলে মানুষ করেচেন অথচ নিজের ছেলের কিছুই করতে পারলেন না। চোখের সামনে ছবি ভেসে উঠলো। ছেলেটা হয়তো পথে ভিক্ষে করচে। হয়তো অনাহারে কষ্ট পাচ্চে। চোখের জল মুছলেন চাদরের খুঁটে।

মনোরমা বৈকালে অন্যমনস্ক ভাবে একলা বসে বাড়ীতে। স্ত্রীর চেহারা দেখে নারাণ-বাবুর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। পতিব্রতা স্ত্রী বাইরে কিছু প্রকাশ করে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার সমস্ত অন্তর পুড়ে উঠচে আজ নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্যে।

পেছন থেকে নারাণবাবু স্ত্রীর শোকাচ্ছন্ন বিষাদ-মলিন মূর্তি দেখেন।

তাঁকে আসতে দেখে মনোরমা ধড়মড় করে উঠে বলেন—ওমা, কখন এলে তুমি? আমি টের পাই নি।

—এই তো এলাম। লেবুর আচার করবে বলে লেবুর সন্ধানে গিয়েছিলাম।

—সত্যি তাই নাকি? পেলে?

মনোরমা কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে বলেন—দাঁড়াও, তোমার মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, দুটো মুড়ি মেখে দিই।

নারাণ মাস্টার বলেন—বসো বসো। একটু গল্প করো। খেটে খেটেই গেলে।

মিনতিভরা সুরে মনোরমা বলেন—হ্যাঁগা, ননীর কোনো সন্ধান পেলে?

ইন্দুভূষণ একটা ঘাটে একদিন বসে আছে, সেখানে বিখ্যাত সিনেমা-অভিনেত্রী সুরমার সঙ্গে তার আলাপ হয়। সুরমা ও তার দলবল পল্লীগ্রামের দৃশ্য তুলতে এসেছিল। ওর সাহায্য চাইলে। সেই সূত্রে সুরমার সঙ্গে আলাপ।

সুরমা ওকে কলকাতায় গিয়ে দেখা করতে বললে বার বার—আসবেন তো? ঠিক বলুন?—বালিগঞ্জের একটা ঠিকানা দিলে। সেখানে ইন্দুভূষণ দেখা করতে গেল এবং প্রথম পদার্পণের দিনই সুরমার জালে আবদ্ধ হোল। সুরমা সুন্দরী সুগায়িকা, ইন্দুভূষণ তরুণ ও সুদর্শন। দু-জনই দু-জনের প্রতি আকৃষ্ট হোল। সুরমা বার বার আসতে বললে ওকে, জানলায় দাঁড়িয়ে রইল!

বাড়ী এসে ইন্দুভূষণ মনমরা, উদাস হয়ে রইল। সুরমার চিঠি এল—একবার অতি শীঘ্র যেতে বলেচে।

সে গেল আবার। সুরমা ওকে খুব আদর আপ্যায়ন করলে। নিজের হাতে তৈরী সন্দেশ খাওয়ায়। গান শোনায়। শেষে সুরমা বলে—অনেক রাত হয়েচে, কোথায় যাবেন আজ? এখানেই থাকুন। কোনো অসুবিধে হবে না। দু-জনে সারারাত গল্প করি

আসবেন। সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে বড় ভাল লাগে।

ইন্দুভূষণ রইল না। সুরমা বার বার বলে দিলে—সামনের শনিবারে আমার জন্মদিন। নেমন্তন্ন রইলো আপনার। কথা দিন আসবেন?

গেল ইন্দুভূষণ জন্মদিনের উৎসবে। গান, আহার-বিহার। আরো কয়েকটি অভিনেত্রী নিমন্ত্রিতা। তারা ওদের দু-জনের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে অভিনন্দন জানায়। সেদিন সুরমা ইন্দুভূষণকে বাড়ী যেতে দেয় না। ছাদে বসে দুজনে গল্প করে।

সুরমা ও ইন্দুভূষণ মোটরে যায়, নারাণ মাস্টার পথ দিয়ে যান। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ছেলের সন্ধানে, মনোরমার মিনতিতে। সারাদিন নানাস্থানে ঘুরেচেন সন্ধান করে, কোথাও সন্ধান পান নি। সামান্য পয়সা হাতে, পেট ভরে জলখাবারও খেতে পারেন নি। ভবানীপুরে বকুলবাগান রোডের মোড়ে গাড়ীখানা হঠাৎ বেগে সামনে এসে দাঁড়ালো। নারাণ মাস্টার থমকে দাঁড়ালেন। কাদাজল জমেছিল রাস্তার এক জায়গায়, ছিটকে তাঁর গায়ে লাগলো। নারাণবাবু চেয়ে দেখলেন ইন্দুভূষণ ও একটি সুবেশা তরুণী গাড়ীতে বসে। পাশের একটি লোক বলে উঠলো—রগড় দেখলেন মশাই? চিনেচেন তো?

নারাণ মাস্টার পাড়াগেঁয়ে মানুষ। তিনি কি করে চিনবেন?

—চিনলেন না? সুরমা দেবী?

—সে কে?

—কোথায় বাড়ী আপনার? সুরমা দেবী বিখ্যাত চিত্রতারকা—নামও শোনেন নি? এঃ! আপনার কাপড়খানা একেবারে নষ্ট করে দিয়েচে যে!

নারাণবাবু চিনতে পারলেন। সরল মানুষ, জিনিসটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। অবাক হয়ে গেলেন। একজন চিত্র-অভিনেত্রীর সঙ্গে ইন্দুভূষণ কি করচে? ও কি কোনো ফিল্ম কোম্পানীতে কাজ নিল নাকি? কিন্তু তাঁর ছাত্র, অমন যত্নে-গড়ে-তোলা ছাত্র শেষে একটি অভিনেত্রীর সঙ্গে বেড়াবে এভাবে?

ইন্দুভূষণ চিনতে পেরেছিল নারাণ মাস্টারকে। সে চমকে উঠে, তার পর থেকে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

সুরমা বললে—আচ্ছা, হাজরার মোড়ে সেই যে এক পাড়াগেঁয়ে বুড়ো লোক আমাদের মোটরের সামনে পড়লো—ওমা, কি কাদাই লেগে গেল ওর গায়ে। ভাবলেও হাসি পায়। ব্রেক কষেছিল সময়ে—তাই খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েচে, তার পর থেকেই তুমি অমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলে কেন? আর ভাল করে কথা কইচ না? চেন নাকি ও বুড়োকে?

ইন্দুভূষণ চুপ করে থেকে বললে—আচ্ছা, তোমার আবার যত বাজে কথা! ইয়ে, আমি তোমার সঙ্গে এখন আর যাবো না সুরমা।

—কেন?

—আমায় একটু নামিয়ে দাও। একটু কাজ আছে।

—কোথায় যাবে?

—সে বলবো এখন। তুমি যাও আমি নামি।

অনেকক্ষণ ধরে খুঁজলে ইন্দুভূষণ নারাণ মাস্টারকে। এদিক ওদিক। কিন্তু কোথাও খুঁজে না পেয়ে একটা পার্কে এসে ক্লান্ত হয়ে বসলো। নিজেকে কোথায় যেন অপরাধী বলে মনে হোতে লাগলো—নিজের কাছেই নিজেকে। না, সে সুরমার কাছে আর যাবে না। বাড়ীর ছেলে বাড়ী ফিরে যাবে আজই।

এইখানে একটু পরে প্রীতি ওকে দেখতে পেলে সামনের জানলা থেকে। সেটা প্রীতিদের বাসা। একটি ছোট ছেলে এসে ওকে ডাকলে। ইন্দুভূষণ দ্বিধাজড়িত পদে

অপরিচিত দ্বারদেশে গিয়ে দাঁড়াতেই দোর খুলে দাঁড়ালো প্রীতি হাসিমুখে।

—ইন্দুদা!

—প্রীতি!

—এসো বাড়ীর মধ্যে। কবে কলকাতায় এলে? কি করচো আজকাল? তুমি এসো বাড়ীর মধ্যে।

—বাড়ীতে আর কে আছেন?

—কেউ নেই। কেবল এক ননদ ও বুড়ী খুড়শাশুড়ী। উনিও আসবেন এখুনি। তুমি এসো ইন্দুদা।

—আমি যাবো না প্রীতি। একটু বিশেষ ব্যস্ত আছি। অন্য সময়ে এসে দেখা করবো।

—তা হবে না। এক পেয়ালা চা অন্ততঃ খেয়ে যেতেই হবে।

এই প্রীতিকে ভুলতেই সে সুরমার ফাঁদে পা দিয়েছিল। সেই প্রীতি আজ তার সামনে।

গ্রামের সম্বন্ধে অনেক কথা হোল। তারপর ইন্দুভূষণ বিদায় নিলে।

নিয়েই সোজা সুরমার ওখানে গিয়ে উঠলো সে।

মনোরমা ছেলের জন্যে ভেবে ভেবে শয্যা গ্রহণ করেচেন। নারাণ মাস্টার বাড়ী এলে তিনি উঠে স্বামীকে জল দেন হাত-পা ধোবার। প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে চা এনে চা করে খাওয়ান—কারণ ঘরে কিছু নেই। মূর্তিমান দারিদ্র্য সংসারের প্রতি রন্ধ্রে তার পাশ বিস্তার করেচে। চাকরি নেই নারাণবাবুর। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সব টাকা আদায় হয় নি।

মনোরমা করুণ মিনতির সুরে বলেন—হ্যাঁগো, ননীর কোনো সন্ধান পেলে? নারাণবাবু কি জবাব দেবেন। কোনো সন্ধানই মেলে নি। সে কথা বলতেও কষ্ট হয়।

নারাণবাবু কাছে বসে স্ত্রীকে বোঝান।—ভগবানের নাম করো। সংসারে সব দুঃখ-কষ্টকে যে জয় করতে পারে, সেই তো যথার্থ মানুষ। সংসার পরীক্ষার স্থল। এই মনে করে চলবে যে আমাদের সত্যকার স্বাধীনতাকে কেউ হরণ করতে পারে না।

হাতে পয়সা নেই। স্কুলে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা বাকি। স্কুলে যান নারাণবাবু। ছেলেরা সবাই ক্লাস থেকে বার হয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে, উল্লাস প্রদর্শন করে।

হেড মাস্টার সদয় ব্যবহার করেন। চেয়ারে বসিয়ে বলেন—আপনি শুনলাম কলকাতায় গিয়েছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলেন?

—না।

—শুনলাম আপনার স্ত্রী অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েচেন? আহা, তা তো হোতেই পারেন। I Offer my sympathy Naran Babu—কিন্তু কি করবেন বলুন। সবই তাঁর ইচ্ছা।

হেড মাস্টারের কথায় মাখন সুরের সঙ্গে দেখা করেন।

মাখন সুর বৈঠকখানায় বসে আছেন মোসাহেব নিয়ে। নারাণবাবুকে তাঁরা বসতেও বলেন না। তিনি গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়িয়েই থাকেন।

মাখনবাবু বললেন—এই যে আসুন মাস্টার মশাই—ভাল আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এক রকম চলে যাচ্চে।

—তারপরে কি মনে করে?

—আমার সেই প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা অনেক দিন হয়ে গেল। সংসারে এখন বড় অভাব। টাকাটা আমার দেওয়ার ব্যবস্থা করুন দয়া করে।

—নিশ্চয়ই, সে টাকা দিতে হবে বই কি। আপনার ওপর স্কুল-লাইব্রেরির ভার ছিল,

তার অনেকগুলো বই পাওয়া যাচ্ছে না। সেগুলি আপনি মীমাংসা করে দিয়ে টাকা নিয়ে যান।

—সে কি কথা? এতদিন তো হেড মাস্টার কিছু বলেন নি? আর আমার ওপর লাইব্রেরির চার্জও ছিল না। সে ছিল ক্ষেত্রবাবুর ওপর। আপনি হেড মাস্টারের সার্কুলার দেখবেন।

—আচ্ছা, এখন যান। আমি বড় ব্যস্ত।

—আমার হাত খালি। বাড়ীতে স্ত্রী অসুস্থ। ছেলেটিকে সন্ধান করতে গিয়ে খরচ-পত্র হয়ে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে। বড্ড উপকার হোত এই সময় টাকাটা পেলে।

—সবই বুঝলাম। কিন্তু আমিও তো বেনিয়মে বেহিসেবে টাকা দিতে পারি নে? আমার এখন সময় নেই। এখন যান আপনি।

বাড়ী ফিরে এলেন নারাণ মাস্টার।

মনোরমার শরীর খারাপ। তার জন্যে কিছু ফল নিয়ে আসতে পারলেন না। এক দোকানে জোড়া সন্দেশ বিক্রি হচ্চে, চার আনা জোড়া, মনোরমা এসব খেতে পান না, গরীবের ঘরের স্ত্রী। বড় ইচ্ছে হোল ঐ জোড়া সন্দেশ একখানা নেবেন। কিন্তু পয়সায় না কুলোনোতে শুধু হাতে চলে আসেন।

মনোরমা আগে আগে এসে আগ্রহপূর্ণ ভাবে বাজারের থলি খুলে দেখতেন—জিজ্ঞেস করতেন—কি আনলে দেখি? আজ তিনি নিরুৎসাহ, মনমরা উদাস। নারাণবাবু দেখে ব্যথিত হয়ে ওঠেন।

বাইরের ছেলেরা এসে ঠিক ডাকে প্রতিদিনের মত। এখন আবার অন্য ছেলেদের নক্ষত্র বোঝান। ভাবেন ইন্দুভূষণের গাড়ীর চাকায় সেদিন কাদা ছিটকে লাগার দৃশ্য, সঙ্গে অভিনেত্রী শ্রেণীর একটি মেয়ে। দুঃখ হয় তাঁর।

সুরমাকে নক্ষত্র চেনাচ্ছে ইন্দুভূষণ। ছাদের ওপর অন্ধকার। তারা-ভরা আকাশ।

সুরমা বললে—এই সব শিখে কি হবে? তার চেয়ে চলো—

—জানো আমার এক মাস্টার মশাই ছিলেন। তিনি আমার ছেলেবেলায় আমায় এসব চিনিয়ে ছিলেন। তিনি বলতেন, মানুষের দৃষ্টি যত প্রসারতা লাভ করবে, ততই সে অমরত্বের সম্মুখীন হবে। মানুষ বড় কিসে? এই বৃহতের সন্ধান—ভূমার সন্ধান সে পেয়েচে বলে—আমার গুরুর এই উপদেশ।

—তোমার গুরু কে? কোথায় থাকেন?

—তুমি তাঁকে দেখেচ।

—দেখেচি? কোথায়?

—সে বলবো না।

—একদিন তাঁকে এখানে আনবে?

—আসবেন না তিনি। জীবনে বৃহতের সন্ধান তিনিই আমায় দিয়েছিলেন, এতদিন তত বুঝতে পারি নি। কিন্তু আজকাল যেন বেশি করে বুঝচি সুরমা।

সুরমার বিলাসিনী পল্লবগ্রাহী মন এ উক্তির গভীরত্ব বুঝতে পারলে না।

সে বললে—চলো নিচে যাই—তোমাকে গান শোনাই। ঠাণ্ডা লাগচে। মাঝে মাঝে তোমার মুখ গম্ভীর দেখি কেন বলো তো। তোমার কি অভাব এখানে? কোনো অসুবিধার মধ্যে কি আমি রেখেচি তোমাকে? চলো!

সুরমার গানে কথায় ইন্দুভূষণ জীবনের গভীর তত্ত্ব আবার বিস্মৃত হোল।

মনোরমা শয্যাগত। পুত্রের বিচ্ছেদশোক-কাতরা মাতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নারাণ-বাবু নিজেই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ঠিক সেই সময় টেলিগ্রাম এল আলিপুরের জেলহাজত থেকে। তাঁর ছেলে ননীমাধব চুরির চার্জে অভিযুক্ত হয়ে আলিপুরে আছে।

স্ত্রীকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে নারাণ মাস্টার চলেন আলিপুরের দিকে। মনে পড়লো তাঁর একটি পুরনো গান—

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
বাহির হনু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া
অরুণ আজি উঠেছে
অশোক আজি ফুটেছে
না যদি উঠে, না যদি ফুটে
তবুও আমি চলিব ছুটে
তোমার মুখে চাহিয়া।

আলিপুরের জেলহাজতে ছেলের সঙ্গে দেখা হোল।

ওখানে গিয়ে শুনলেন তার ছ-মাস জেলের আদেশ হয়েচে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দিলে সবাই। নারাণ মাস্টার গিয়ে দেখেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পূর্ব-পরিচিত মিঃ কান্‌ওয়ার।

খুব খাতির করলেন তিনি। বললেন, তিনি জানেন না যে আসামী তাঁর ছেলে। খুব বিস্ময় প্রকাশ করলেন এ কথা শুনে। কেন এমন হোল?

নারাণ মাস্টার চুপ করে থাকেন। পরে নারাণবাবু সব বললেন।

দুঃখ করে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—আমি জানি, এরকমই হয়। পণ্ডিতের বংশে পণ্ডিত ও সৎ ছেলে জন্মগ্রহণ করলে তো পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যেতো।

—আচ্ছা আমি চলি, বললেন নারাণবাবু।

মিঃ কান্‌ওয়ার বললেন—আপনি আমাকে Rural Bengal চিনিয়েছিলেন। প্রকৃত বাংলা দেশ কি তা আমাকে চিনিয়েছিলেন আপনি। আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। আমি যদি জানতাম আসামী আপনার ছেলে, তাহোলে ওকে কনভিকশন দিতাম না। বড়ই দুঃখিত আমি যে আমার অজ্ঞাতসারে আপনার ছেলের জেল হোল। আমার বাসায় যাবেন না! আমার স্ত্রী আপনাকে দেখলে বড় খুশী হবেন।

—এখন আমার সময় হবে না মিঃ কান্‌ওয়ার। আমার স্ত্রী পুত্রের শোকে শয্যাগত। একা ফেলে রেখে এসেচি। আমায় আজই ফিরতে হবে।

—Really, I am so sorry! আপনার মত ভালো লোকেরা সংসারে কষ্ট ভোগ করে কেন বলতে পারেন মিঃ গাঙ্গুলী? আপনি তো একজন দার্শনিক।

—কর্মফল।

—আমার কি মনে হয় জানেন, এই দুঃখ দহনের মধ্যে প্রভিডেন্স আপনাদের শেষ মালিন্যটুকু পুড়িয়ে খাঁটি নিষ্পাপ করে নিচ্ছেন। গ্যেটের ফাউস্টের সেই লাইন স্মরণ করুন—একদিন আসবেন, আপনার সঙ্গে বসে আমার বাংলোতে কথাবার্তা বলা যাবে। Good bye।

নারাণবাবু বাড়ী এলেন।

মনোরমা সাগ্রহে জিগ্যেস করেন—হ্যাঁ গা, ছেলে কেমন আছে? তাকে দেখলে?

—দেখলাম। ভালো আছে—

—তাকে আনলে না কেন? ঠিক বলো—তোমার মুখ দেখে আমার ভালো মনে হচ্চে না—সে আছে তো?

—নিশ্চয়ই আছে—আমার কথা বিশ্বাস করো।

—হ্যাঁগো, তবে তাকে আনলে না কেন? আমার বুকের এইখানটাতে হাত দিয়ে দ্যাখো। আমি থাকতে পারচি নে।

নারাণবাবু কিন্তু মুখ বুজে শুয়ে পড়ে থাকেন।

অসুস্থ স্ত্রীকে নারাণবাবু সত্যকথা বলতে পারেন না। নিজে সেবা করেন স্ত্রীর। স্ত্রী সেই অবস্থায় উঠে নিজে চা করে দিতে যান স্বামীকে। নারাণবাবু বাধা দেন।

একখানি চিঠি এল, ছেলে জেলের মধ্যে মনের ঘৃণায় আত্মহত্যা করেচে।
মিঃ কান্‌ওয়ার দুঃখ করে পত্র লিখেচেন।
নারাণবাবু গেলেন, পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিলেন। মুখাগ্নি করলেন।

বাড়ী ফিরে এলে মনোরমা ব্যস্তভাবে বলেন—ওগো, খোকা আমার কাছে রাত্রে এসেছিল। তুমি কোথায় গিয়েছিলে? বলো না? সত্যি করে বলো না? কথা বলো না কেন? কি হয়েচে? প্রায়-মিনতির সুরে বলেন—হ্যাঁগা বলো না আমায়? বলো না সে কেমন আছে?

নারাণবাবু রোগশয্যাগত স্ত্রীকে নিজে বার্লি করে খাওয়ান।

—দাঁড়াও, আমি নিজে উঠে তোমায় চা করে দিই—

—উঠো না। উঠো না। শুয়ে থাকো।

—হ্যাঁগা, ননী কেমন আছে? খোকা কেমন আছে? বলো না—

—ভালো আছে। তার চিঠি পেয়েছি। সে বাড়ী আসবে। এই দ্যাখো চিঠি। কান্‌ওয়ারের ইংরিজি চিঠিখানা নারাণ মাস্টার স্ত্রীর সামনে মেলে ধরেন।

সন্ধ্যা হয়ে এল।

বাইরে থেকে ছেলেরা এসে হাঁক দেয়,—স্যার, বাড়ী আছেন?

নারাণবাবু স্ত্রীকে শুইয়ে দিয়ে ছেলে পড়াতে যান বাইরে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, তিনি একদল গ্রাম্য বালকদের মধ্যে বসে ভূগোল ব্যাখ্যা করচেন—

পৃথিবীর এক ভাগ স্থল, তিন ভাগ জল—

ভূত

কি বাদামই হোত শ্রীশ পরামাণিকের বাগানে। রাস্তার ধারেই বড় বাগানটা। অনেক দিনের প্রাচীন গাছপালায় ভর্তি। নিবিড় অন্ধকার বাগানের মধ্যে—দিনের বেলাতেই।

একটু দূরে আমাদের উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালা। রাখাল মাস্টারের স্কুল। একটা বড় তুঁত গাছ আছে স্কুলের প্রাঙ্গণে। সেজন্যে আমরা বলি 'তুঁততলার স্কুল'।

দুজন মাস্টার আমাদের স্কুলে। একজন হলেন হীরালাল চক্রবর্তী। স্কুলের পাশেই এঁর একটা হাঁড়ির দোকান আছে, তাই এঁর নাম 'হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার'।

মাস্টার তো নয়, সাক্ষাৎ যম। বেতের বহর দেখলে পিলে চমকে যায় আমাদের। টিফিনের সময় মাস্টার মশায়েরা সব ঘুমুতেন। আমরা নিজের ইচ্ছে-মতো মাঠে-বাগানে বেড়িয়ে ঘণ্টাখানেক পরেও এসে হয়তো দেখি তখনও মাস্টার মশায়দের ঘুম ভাঙে নি। সুতরাং তখন আমাদের টিফিন শেষ হোল না—টিফিনের মানে হচ্ছে ছুটি মাস্টার মশায়দের, ঘুমুবার ছুটি।

সেদিনও এমনি হোল।

রেল লাইন আমাদের স্কুল থেকে অনেক দূরে। আমরা মাৎলার পুল বেড়িয়ে এলাম, রেল লাইন বেড়িয়ে এলাম—ঘণ্টাখানেক পরে এসেও দেখি এখনও হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের নাক ডাকচে।

নারাণ বললে—ওরে চুপ চুপ, চেঁচাস নি, চল ততক্ষণ পরামানিকদের বাগানে বাদাম খেয়ে আসি—

আমাদের দলে সবাই মত দিলে।

আমি বললাম—বাদাম পাড়া সোজা কথা?

—তলায় কত পড়ে থাকে এ সময়—

—চল তো দেখি—

এইবার আমরা সবাই মিলে পরামাণিকদের বাগানে ঢুকলাম পুলের তলার রাস্তা

দিয়ে। দুপুর দুটো, রোদ ঝম্ ঝম্ করচে। শরৎকাল, রোদের তেজও খুব বেশি।

গত বর্ষায় আগাছার জঙ্গল ও কাঁটা ঝোপের বেজায় বৃদ্ধি হয়েচে বাগানের মধ্যে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সুঁড়ি পথ। এখানে-ওখানে মোটা লতা গাছের ডাল থেকে নেমে নিচেকার ঝোপের মাথায় দুলচে। আমরা এ বাগানের সব অংশে যাই নি, মস্ত বড় বাগানটা। পাকা রাস্তা থেকে গিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত লম্বা।

পেয়ারাও ছিল কোনো কোনো গাছে। কিন্তু অসময়ের পেয়ারা তেমন বড় হয় নি। ফল আরও যদি কোনো রকম কিছু থাকে, খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারের দিকে চলে গেলাম। বাদাম তো মিললোই না। যা বা পাওয়া গেল, ইঁট দিয়ে ছেঁচে তার শাঁস বের করবার ধৈর্য আমার ছিল না। সুতরাং দলের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। নদীর দিকে বন বেজায় ঘন। এদিকে বড় একটা কেউ আসে না।

খস্ খস্ শব্দে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে শেয়াল চলে যাচ্চে। কুল্লো পাখি ডাকচে উঁচু তেঁতুল গাছের মাথায়। আমার যেন কেমন ভয়-ভয় করচে।

আমাদের স্কুলের ছেলেরা কানে হাত দিয়ে গায়—

ঠিক দুক্খুর বেলা—
ভূতে মারে ঢ্যালা—
ভূতের নাম রসি
হাঁটু গেড়ে বসি—

সঙ্গে সঙ্গে তারা অমনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। এসব করলে নাকি ভূতের ভয় চলে যায়।

আমার সঙ্গে কেউ নেই—ঠিক দুপুর বেলাও বটে! মন্তরটা মুখে আউড়ে হাঁটু গেড়ে বসবো? কিন্তু ভূতের নাম রসি হোল কেন, শ্যামও হতে পারতো, কালো হোতে পারতো, নিবারণ হোতেই বা আপত্তি কি ছিল?

একটা বাঁক ঘুরে বড় একটা বাঁশবন আর নিবিড় ঝোপ তার তলায়।

সেখানটায় গিয়ে আমার বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

একটা আমড়া গাছের তলায় ঘন ঝোপের মধ্যে আমড়া গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে বসে আছে বরো বাগদিনী।

ভালো করে উঁকি মেরে দেখলাম। হ্যাঁ, ঠিক—বরো বাগদিনী বটে, সর্বনাশ!

সে যে মরে গিয়েছে।

বরো বাগদিনীর বাড়ী আমাদের গাঁয়ের গোঁসাই পাড়ায়। অশত্থতলার মাঠে একখানা দোচালা কুঁড়ে ঘরে সে থাকতো, কেউ ছিল না তার। পাল মশায়ের বাড়ী ঝি-গিরি করতো অনেক দিন থেকে। তারপর তার জ্বর হয়, এই পর্যন্ত জানি। একদিন তাকে আর দেখা যায় না।

মাস দুই আগের কথা। একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেল বাঁওড়ের ধারে বাঁশবনে—শেয়াল কুকুরে তাকে খেয়েছে অনেকটা। সেই রকমই কালো রোগা-মত দেহটা, বরো বাগদিনীর মতো। সকলে বললে, জ্বরের ঘোরে বাঁওড়ে জল তুলতে গিয়ে বরো গিয়েচে।

সেই বরো বাগদিনী আমড়া গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে দিব্যি বসে!

আমি এক ছুটে বনবাগান ভেঙে দিলাম ছুট পাকা রাস্তার দিকে। যখন বাদামতলায় দলের মধ্যে এসে পেঁৗছলাম তখন আমার গা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

ছে'লরা বললে—কি হয়েছে রে? অমন কচ্ছিস কেন?

আমি বললাম—ভূত।

—কোথায় রে? সে কি? দূর—

—বরো বাগদিনী বসে আছে ঝোপের মধ্যে আমড়াতলায়—সেই নদীর ধারের দিকে। স্পষ্ট বসে আছে দেখলাম।

—সে কি রে? তা কখনো হয়?

—নিজের চোখে দেখলাম। একেবারে স্পষ্ট বরো বাগদিনী—

—দূর—চল তো যাই—দেখি কেমন? তোর মিথ্যে কথা—

সবাই মিলে যেতে উদ্যত হোল—কিন্তু সেই সময় দলের চাঁই নিমাই কলু বললে—না ভাই। ওর কথায় বিশ্বাস করে অতদূর গিয়ে স্কুলে ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। এতক্ষণ মাস্টারদের ঘুম ভেঙেছে। হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের বেতের বহর জানো তো! সে ঠ্যালা সামলাবে কে? আমি ভাই যাবো না—তোমরা যাও—ওর সব মিথ্যে কথা—

ছেলের দলের কৌতূহল মিটে গেল হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের বেতের বহর স্মরণ করে। একে একে সবাই স্কুলের দিকে চললো। আমিও চললাম।

আমরা গিয়ে দেখি মাস্টার মশায়দের ঘুম খানিক আগেই ভেঙেচে—ওঁদের গতিক দেখে মনে হোল। হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার আমাদের শূন্য ক্লাস রুমের সামনে অধীরভাবে পায়চারি করছিলেন—আমাদের আসতে দেখে বলে উঠলেন—এই যে! খেলা ভাঙলো?

আমরাও বলতে পারতাম, আপনার ঘুম ভাঙলো? কিন্তু সেকথা বলে কে? তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে আমরা তখন সবাই এতটুকু হয়ে গিয়েছি।

ক্লাসে ঢুকেই তিনি হাঁকলেন—রত্না! অথাৎ আমি এগিয়ে গেলুম।

—কোথায় থাকা হয়েছিল?

আমি তখন নবমীর পাঁঠার মতো জড়সড় হয়ে কাঁপচি। এদিকে বরো বাগদিনী ওদিকে হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার। আমার অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়ে উঠেচে! কিন্তু শেষ অস্ত্র ছিল আমার হাতে, তা ত্যাগ করলাম।

বললাম—পণ্ডিত মশাই, দেরি হয়ে গেল কেন ওরা জানে। এই সর্ব পরামাণিকের বাগানে বাদাম কুড়ুতে গিয়ে ভূত দেখেছিলাম—তাই—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের মুখে অবিশ্বাস ও আতঙ্ক যুগপৎ ফুটে উঠলো। বললেন—ভূত? ভূত কি রে?

—আজ্ঞে, ভূত—সেই যারা—

—বুঝলাম বাঁদর। কোথায় ভূত? কি রকম ভূত?

সবিস্তারে বললাম। আমার সঙ্গীরা আমায় সমর্থন করলে। আমায় কি রকম হাঁপাতে হাঁপাতে আসতে দেখেছিল, বললে সে কথা। হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার ডেকে বললেন—শুনচেন দাদা?

রাখাল মাস্টার তামাক খাওয়ার যোগাড় করছিলেন, বললেন—কি?

—ওই কি বলে শুনুন। রত্না নাকি এখুনি ভূত দেখে এসেচে সর্ব পরামাণিকের বাগানে।

—সর্ব পরামাণিক কে?

—আরে, ঐ শ্রীশ পরামাণিকের বাবার নাম। ওদেরই বাগান।

আবার বর্ণনা করি সবিস্তারে।

রাখাল মাস্টার গোঁড়া ব্রাহ্মণ,—হাঁচি, টিকটিকি, জল-পড়া, তেল-পড়া সব বিশ্বাস করতেন। গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলেন—তা হবে না? অপঘাত মৃত্যু—গতি হয় নি—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার একটু নাস্তিক প্রকৃতির লোক। অবিশ্বাসের সুর তখনও তাঁর কথার মধ্যে থেকে দূর হয় নি। তিনি বললেন—কিন্তু দাদা, এই দুপুর বেলা, ভূত থাকবে বাগানে বসে গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে!

—তাতে কি? তা থাকবে না ভূত এমন কিছু লেখাপড়া করে দিয়েচে নাকি? তোমাদের আবার যত সব ইয়ে—

—আচ্ছা চলুন গিয়ে দেখে আসি!

ছেলেরা সবাই সমস্বরে চীৎকার করে সমর্থন করলে।

রাখাল মাস্টার বলেন,—হ্যাঁ, যত সব ইয়ে—ভূত তোমাদের জন্যে সেখানে এখনো বসে আছে কিনা? ওরা হোল কি বলে অশরীরী—মানে ওদের শরীর নেই—ওরা মানে বিশেষ অবস্থায়—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার বললেন—চলুন না দেখে আসি গিয়ে কি রকম কাণ্ডটা, যেতে দোষ কি?

আমরা সকলে তো এই চাই। এঁরা গেলে এখুনি ইস্কুলের ছুটি হবে এখন। সেদিকেই আমাদের ঝোঁকটা বেশি।

খাওয়া হোল সবাই মিলে।

হুড়মুড় করে ছেলের পাল চললো মাস্টারদের সঙ্গে।

আমি আগে আগে, ওরা আমাদের পেছনে।

সেই নিবিড় ঝোপটাতে আমি নিয়ে গেলাম ওদের সকলকে। যে-দৃশ্য চোখে পড়লো, তা কখনো ভুলবো না—এত বৎসর পরেও সে দৃশ্য আবার যেন চোখের সামনে দেখতে পাই এখনো!

সবাই মিলে ঝোপ-ঝাপ ভেঙে সেই আমড়াতলায় গিয়ে পেঁছিলাম।

যা দেখলাম, তা অবিকল এই।

আমড়াগাছের তলায় একটা ছেঁড়া, অতি-মলিন, অতি-দুর্গন্ধ কাঁথা পাতা, পাশে একটা ভাঁড়ে আধ ভাঁড়টাক জল। একরাশ আমড়ার খোসা ও আঁটি জড় হয়েচে পাশে—কতক টাটকা, কতক কিছু দিন আগে খাওয়া, একরাশ কাঁচা তেঁতুলের ছিবড়ে, পাকা চালতার ছিবড়ে—শুকনো।

ছিন্ন কাঁথার ওপর জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধা বরো বাগদিনী মরে পড়ে আছে। খানিকটা আগে মারা গিয়েচে।

এ সমস্যার কোন মীমাংসা হয়নি।

আমরা হৈ হৈ করে বাইরে গিয়ে খবর দিলাম। গ্রাম্য চৌকিদার ও দফাদার দেখতে এল। কেন যে বরো বাগদিনী এই জঙ্গলে এসে লুকিয়ে ছিল নিজের ঘর ছেড়ে—এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে! কেউ বললে, ওর মাথা হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কেউ বললে, ভূতে পেয়েছিল।

কিন্তু বরো বাগদিনী মরেছে অনাহারের শীর্ণতায় ও সম্ভবত আশ্বিন কার্তিক মাসের ম্যালেরিয়ায় ভুগে। কেউ একটু জল দেয়নি তার মুখে।

কে-ই বা দেবে এ জঙ্গলে? জানতোই বা কে?

বরো বাগদিনীর এ আত্মগোপনের রহস্য তার সঙ্গেই পরপারে চলে গেল।

বিপদ

সন ১৩০১ সাল। আশ্বিন মাস।

রাধারমণ ভট্টাচার্য দুর্গোৎসবের সময় তল্পীবাহক শিবু ঘোষকে লইয়া সোনার গাঁয়ের জমিদার বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ী পূজো করিতে যাইতেছিলেন।

শিবুর কাঁধে একটি বোঁচকা, হাতে ভট্টাচার্য মহাশয়ের কেম্বিসের ব্যাগ। তাঁহার থেলো হুঁকা, দা-কাটা তামাক, কয়লা, সোলা ও চকমকি পাথর সুদ্ধু থলেটি তাঁর নিজের হাতে ঝুলানো। বগলে সাদা কাপড় বসানো ছাতি।

বেলা চড়িয়াছে। সোনার গাঁ পেঁছিতে বেলা চারটার কম নয়। সতেরো ক্রোশ পথ।

রাস্তাঘাট ভালো নয়, দেশে চালের দাম চড়ার দরুণ দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছে, আউশ ধান সুবিধা হয় নাই। অতিরিক্ত বন্যার ফলে বহুস্থানে আউশ ফসল নষ্ট হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। চুরি ডাকাতি বাড়িয়াছে।

শিবু আজ বিশ বৎসর ভট্টাচার্য মহাশয়ের তল্পীবাহক। যে-যে শিষ্য বাড়ী তাঁর সাধারণতঃ যাতায়াত, সে-সব বাড়ীর প্রত্যেকের সঙ্গে সে পরিচিত।

এ-সব রাস্তায় সে গত বিশ বৎসর ধরিয়া এ সময়ে গিয়া থাকে। পথে কোথায় কি আছে সব জানে। ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিষ্ঠা সে জানে, বাহিরে কোথাও গেলে স্বপাক ভিন্ন তিনি আহার করেন না। যেখানে সেখানে জলগ্রহণ করেন না, সাত্বিক প্রকৃতির ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পন্ডিত তিনি।

আজ কয়দিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। রাস্তাঘাট কর্দমশূন্য, নদীর জল কমিয়াছে। বন-

ঝিঙের ফুল ফুটিয়াছে। ফিঙে ও দোয়েলের গানে বাঁশ-বন, আম-বাগান মুখর। ঝোপের মাথায় বন-কলমীর নীল ফুল।

আরামডাঙার বড় বট গাছটা ওই মাঠের মধ্যে দেখা গিয়াছে। শিবু জানে ওই বট গাছের পাশে একটা পুকুর আছে, জলটা খুব ভালো।

—ঠাকুর মশাই, বটতলায় রসুই চড়িয়ে দিতে হবে—নইলে পেসাদ পাওয়া আর এবেলা অদৃষ্টে নেই।

—চাল সঙ্গে আছে?

—আনা হয় নি তো সঙ্গে?

—কেন আনিস নি রে গাধা উল্লুক?

—ঠাকুর মশাই, চাল কি ঘরে ছেল যে আনবো? মা ঠাকরুণ বললেন, চাল বাড়ন্ত, শিবু।

—তোকে বললে?

—হ্যাঁ ঠাকুর মশাই। মিছে কথা বলবো না। আড়াই টাকা মণের চাল হয়েচে চার টাকা। মানুষের কি আর কিনে খাবার খ্যামতা আছে? সব হয়েচে দিন আনি, দিন খাই।

—বিষ্ণুপুরের সে চাল কোথায় গেল?

—মা ঠাকরুণের কাণ্ড! তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে ভাত রেঁধে পাড়ার ছেলেমেয়েদের ডেকে ডেকে সেই পুকুরের ধারে নিয়ে গিয়ে খেতি দেতেন। কতদিন বারণ করে দ্যাখলাম। তা মা ঠাকরুণ পরের চোখে জল দেখলি আর থাকতি পারেন না। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-ঠাকরুণ যে!

—যাক, তা সেই লক্ষ্মী-ঠাকরুণকে বলে কয়ে এক বেলার মতো দুটো চাল আনতে পারলে না, বুড়ো ভূত?

—বকবেন না ঠাকুর মশাই। চাল আমি যোগাড় করে দেবানি আরামডাঙার বুনোপাড়া থেকি। কিন্তু ঠাকুর মশাই, একডা কথা ভাবচি—

—কি কথা রে?

—বললে ভয় পাবেন না তো? আপনি আবার যে ভীতু!

—কি বল না?

—আরামডাঙার বুনো সব ব্যাটা ডাকাত। ঠ্যাঙাড়ে, খুনী। আরামডাঙার ওধারে যে সনেকপুরের পাঁচকুড়োর বিল, ওই বিলে যে কত মানুষের মুণ্ডু আর দেহ পোঁতা—তার লেখা-জোখা নেই!

—তাতে কি? আমাদের কাছে কি আছে যে নেবে? আমি ভীতু, না তুই ভীতু? কর্মফল আর প্রাক্তন, এ দুটো ছাড়িয়ে কোন্ মানুষটা কবে উঠেচে বলতে পারিস?

—হুঁ!

—এ সব কথা তোকে বলা আর বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো।

ভট্টাচার্য মশাইকে বটতলায় বসাইয়া শিবু ঘোষ চাউল আনিতে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে তিন জন জোয়ান লোককে সঙ্গে করিয়া ফিরিল।

তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল—ঠাকুর মশাই, দু-কাঠা চাল এনেলাম আর দু-কাঠা সোনামুগির ডাল। আপনি রাঁধুন। আমরা পেসাদ পাবো। ঘি, তেল, মশলা, মাছ, আলু, পটল, বেগুন সব আসচে। আমাদের গাঁ থেকে সিধে দিচ্চি আপনাকে।

রাধারমণ ভট্টাচার্য চমকাইয়া উঠিলেন।

সর্বনাশ! বলে কি? তিনি শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ নহেন, জীবনে কখনো শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নি—তাহা হইলে রানী রাসমণির বাড়ী হইতে সেবার দান লইয়া তিনি বড় মানুষ হইতে পারিতেন। শিবু ঘোষ সব জানে, জানিয়া শুনিয়া ইহাদিগকে জুটাইয়া

আনিবার হেতু কি?

শিবুর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, শিবু উহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—তাহার মুখে এক অদ্ভুত ভাব, চোখে যেন ভয়ের দৃষ্টি।

রাধারমণ ভট্টাচার্য বলিলেন—বাপু সকল, আমি তোমাদের সিধে নিতে পারবো না। প্রসাদ পেতে চাও, আমি যা রাঁধবো, তাই খেয়ো এখন। পয়সা নিয়ে এই চাল থেকে সের খানেক আমায় দিয়ে যাও—

ওদের পিছন দিকে দাঁড়াইয়া শিবু চোখ টিপিতেছে কেন? ভট্টাচার্য মশাই কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

আগের জোয়ান লোকটি এবার বুক ফুলাইয়া এক পা সামনে আসিয়া বলিল—ওসব হবে না ঠাকুর। তোমাকে রাঁধতে হবে, আমাদের সিধে নিতে হবে। আমার নাম শোনা আছে কি? আমার নাম ভৈরব সর্দার।

সর্বনাশ! ভট্টাচার্য মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন। ভৈরব ডাকাতের নাম এ অঞ্চলে কে না জানে? সেদিনও হলুদপুকুরের মজুমদারদের বাড়ী চিঠি দিয়া ডাকাতি করিতে গিয়া গ্রামের লোকের সঙ্গে লড়াই করিয়া দুটিকে খুন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে।

ভৈরব ডাকাতের নাম করিয়া এদেশে মায়েরা দুষ্ট ছেলেদের ঘুম পাড়ায়। ভৈরব ডাকাত যে কোথায় থাকে তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। আজ এ গ্রাম, কাল ও গ্রাম। গ্রামবাসীদের সাধ্য কি যে তাহারা পুলিশে খবর দেয়? কে অকারণে প্রাণ হারাইতে চায়?

ভট্টাচার্য মশাই নিরীহ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ। কখনো কোনো গোলমালের মধ্যে থাকেন নাই জীবনে। শুধু শাস্ত্রপাঠ ও পূজার্চনায় দিন কাটাইয়া আসিয়াছেন।

একি বিপদ তাঁহার জীবনে আজ অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত, তিনি কোনো কথা বলিলেন না। চুপ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিলেন লোকটার দিকে। বাঘের সামনে হরিণের চোখের মত সম্মোহিত দৃষ্টি তাঁর চোখে।

দস্যু আবার বলিল—বলি কানে গেল না কথা ঠাকুর মশাই? সিধে নিতে হবে তোমাকে —রাঁধতে হবে।

ঠিক এই সময় দু-জন লোক একটি বৃহৎ কাঠের বারকোশে সিধা বহন করিয়া বটতলায় আনিয়া হাজির করিল। একটি রুই মাছ, আলু, পটল, বেগুন, পাকা কলা, সন্দেশ, দই প্রভৃতি বারকোশে সাজানো। অগ্রবর্তী লোকটা ট্যাঁক হইতে দশটি টাকা বাহির করিয়া বারকোশে রাখিয়া বলিল—তোমার দক্ষিণে ঠাকুর মশাই। এই সব নাও। নিয়ে রাঁধো, খাও, আমাদের একটু পেসাদ দিলেই চলবে। টাকা দশটা চাদরের মুড়োয় বেঁধে নাও, ঠাকুর।

ভট্টাচার্য মশায় বোকার মত চাহিয়া রহিলেন মাত্র। কোনো কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। লোকটা বলিল—কি, কথা কইচ না যে? এ-সব নেবে না?

ভট্টাচার্য মহাশয়ের মুখে কোনো কথা নাই।

লোকটা এবার রাগিয়া উঠিল। তাহার চোখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মুখ-চোখের ভাব কঠিন ও ভীষণ। বলিল—তবে রে বিটলে বামুন, তুমি ঘুঘু দেখেচ, ফাঁদ দ্যাখো নি?

সে হঠাৎ হাঁক দিয়া বলিল—আবদুল জব্বর—

যমদূতের মত একজন আগাইয়া বলিল—কি হুকুম, সর্দার—

—এই বামুনকে এককোপে কেটে বিলের জলে ভাসিয়ে দাও। ধরো এর হাত—দুলো, ধর্ এসে এর পা—

—এখুনি মুণ্ডু ঝটকে দেবো? দা দিয়ে?

—এখ্খুনি। ওর বামনাগিরি এখ্খুনি ঘুচিয়ে তবে আমার নাম ভৈরব সর্দার—

তারপর সে হাঁকিয়া বলিল—কেমন? এইবার শেষ। ঠাকুর, শেষ বারের মত জিজ্ঞেস করচি—সিধে নেবে? নিতে রাজি হও। কেমন তো? আবদুল জব্বরও রাজি হোলেই ছেড়ে দেবে। কেমন রাজি?

ভট্টাচার্য মহাশয় উহাদের কথা শুনিতে পাইতেছিলেন না। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের

শুভ নবমীতে তাঁহার জন্ম। রামচন্দ্রের মত।

মাঘ মাসে সিতে পক্ষে নবম্যাং কর্কটে শুভে।
কৌশল্যা জনয়াল্রামং বিষ্ণুতুল্যাং পরাক্রমং॥

শেষকালে এই তাঁর শুভ জন্মতিথির পরিণাম? শূদ্র-যাজন তিনি করেন না, এই অপরাধে এই দস্যুদের হাতে অপমৃত্যু ছিল তাঁর ললাট-লিপি? কত দুর্গা-ষষ্ঠীর বোধনে চন্ডীপাঠের সময় তিনি নিজেই আবৃত্তি করিতেন যজমানের বাড়ী—

যা দেবী সর্বভূতেষু মৃত্যুরূপেণ সংস্থিতা—

যদি করালবেশিনী নৃমুন্ডমালিনী, কৃপানহস্তা সেই দেবীর আবির্ভাব তাঁহার জীবনে আসন্ন হইয়াই থাকে, তাঁহাকে তিনি আবাহন করিয়া লইবেন। খোকার মুখ মনে পড়িল। সে আসিবার সময় বলিয়াছিল—বাবা, আমার জন্যে কি আনবে?

—কি আনবো—তুই বল?

—বাসোতা এনো—

অর্থাৎ বাতাসা।

কাদম্বিনীকে আর দেখিবেন না, খোকাকে না, শৈল, জবা, মানদাকেও নয়।

আবদুল জব্বর আসিয়া রাধারমণ ভট্টাচার্যের হাত চাপিয়া ধরিল, আর একজন কালো জোয়ান মত লোক তাঁহার পা দুইখানা ধরিল এবং তাঁহাকে চ্যাংদোলা করিয়া বিলের জলের ধারে লইয়া চলিল।

তাহার পর একটা উঁচু ছোট ঢিপির ওপর তাঁহার গলাটা রাখিল। কে একজন বলিল—গামছা দিয়ে চোখ বেঁধে দাও—

ভট্টাচার্য মহাশয়ের গলার পাশে চোরকাঁটা লাগিয়া কুটকুট করিয়া উঠিল।

একবার তিনি ভাবিলেন চোরকাঁটার মধ্যে কেন এরা এনে ফেললে! গামছা দিয়া ততক্ষণ তাহারা তাঁহার চোখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। অন্ধকার...চারিদিকে অন্ধকার... অন্ধকারের মধ্যে শুধু খোকার মুখ দেখা যাইতেছে...

মনে পড়িল ঈশোপনিষদের পুঁথিখানার নকল করার কাজ এখনো বাকি।

পুঁথিখানা আর শেষ হলো না।

অন্ধকার...সব অন্ধকার।...

আমোদ

রামধন সকালে উঠে ঝিঙের ক্ষেত নিড়ুচ্ছিল। হঠাৎ তার কাছে তার ছেলে ফণি এসে বললে—বাবা, আজ বড় মজা হবে বাজারে। শুনেচ কিছু?

—কি রে?

—ভালো যাত্রা আসবে কলকেতা থেকে। বড় দল। যাবা নাকি দেখতি?

—যাবা না! বলিস কিরে? তুই আমি দু-জনেই যাবা নি। কলকেতার দলের গাওনা কতদিন শুনিনি বল তো?

—পান্তভাত খেয়ে নিয়ে চলো সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ি। নইলি জায়গা পাওয়া যাবে না। জানো তো কি রকম ভিড় হয়?

মহা উৎসাহে রামধন ঝিঙের ক্ষেতের উত্তর আলের বেড়া বেঁধে বললে—আজ দশ বারো দিন হোল বেড়াটা ভেঙেচে, বাবলা কাঁটা আর কুল কাঁটা দিয়ে বাঁধতে হবে কিন্তু, সম্প্রতি সে খুব অপমান হয়েচে হৃদয় বিশ্বাসের জমির বাবলা কাঁটা কাটতে গিয়ে। হৃদয় বিশ্বেসের জামাই মাখন ওকে বলেছিল।—বলি, এবার কিন্তু ফৌজদারি হবে মনে রেখো। মোরা বাবলা গাছ রেখিচি তোমার বেড়ার কাঁটা দেবার জন্যি নয়। মনে রাখবা।

সে বলেছিল—দুটো ডাল নেবানি তোমার গাছ থেকে। নইলে বেড়া দেবানি কি করে?

মাখন রেগে বলেছিল—এ তো বড্ড আবদার দেখি,—তোমার? ঘাড় ধরে বার করে দেবো জমি থেকে বলে দিচ্চি। তোমার বাবার জমি তো নয় এটা?

—বাবা তোলবার দরকার কি জামাইবাবু? না হয় চলে যাচ্চি।

—তাই যা—

ভালো বলতে হয় সীতেনাথ পোদের ভাই হরিকে। সে পাশের কলাবাগান থেকে নিম্ন-স্বরে ওকে ডেকে বললে—বলি, বড়লোকের জমিতে কেন যাও দাদা? আলের মাথায় আমাদের বড় বাবলা গাছটা থেকে যত ইচ্ছে ডাল কেটে নিয়ে যাও।

—দ্যাখো দিকি ভাই, কি অপমান সকালে করলে মোরে?

—বাদ দ্যাও। সাত খাদা জমিতে ধান বুনে মাথা একেবারে স্বগ্গে উঠে গিয়েচে ওদের। বড়লোকের দোরে যাওয়ার দরকার কি তোমার দাদা? নিয়ে যাও ডাল যত ইচ্ছে।

সেই ডাল দিয়ে আজ দশ পনেরো দিন পরে বেড়া বাঁধলো রামধন। সেও জাতে পোদ, নিতান্ত গরিব। একটা ধানের ছোট্ট আউড়িও নেই বাড়ীতে। এমন লোকের কি আর খাতির হয় গাঁয়ের বড়লোকদের মধ্যে?

কাছারীর নায়েব ঘনশ্যাম সরকারকে অনেক খোশামোদ করে বাঁধাল জমা দিয়ে গত আশ্বিন মাসে মাছ ধরে সামান্য কিছু পেয়েছিল। তাই দিয়ে ধান কিনে এতদিন চলেচে। এইবার ভরসা এই ঝিঙের ক্ষেত। ঝিঙের দাম আছে বাজারে এবার। ষোল টাকা মণ। ফি হাটে একমণ ঝিঙে বিক্রি হোলেও ওদের সংসার হেসেখেলে চলবে। এ জমিতে ঝিঙে ফলবেও ভালো।

দুপুরের পর ভাতটাত খেয়ে রামধন আর তার ছেলে ফণি পাঁচঘরার বাজারে যাত্রা দেখতে যাবার জন্যে তৈরি হোল। এখান থেকে ছ-কোশ পথ। পথে বামুনদহর বিল পার হতে হবে। কোদালে নদী পার হতে হবে, রাস্তা নেই, শুধু মাঠের আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে। মস্ত বড় শ্মশান পড়বে নকফুল-রামনগরের। কষাড় বন তিন পোয়া পথ।

ফণি বললে—বাবা, রাত্তিরি কি খাবো?

—চিঁড়ে সঙ্গে নিয়ো। তাই ভিজিয়ে বাপ-পোতে খেয়ে নেবো।

—চল সকাল-সকাল বেরিয়ে যাই।

গেল ওরা বেরিয়ে দুপুরের পর।

রামধন পোদ একসময়ে যাত্রার বড় ভক্ত ছিল। একবার তার ছোটবেলায় মতি রায়ের বিখ্যাত যাত্রা-দল এসে 'তরণীসেন বধ' গান করে সাহাপুরের বিশ্বাসদের বাড়ী। অমন গান কখনো এদেশে কেউ শোনে নি নাকি। রামধন সেই থেকে যাত্রা গাওনার কত বড় বড় দল যে দেখলে জীবনে!

মতি রায়ের দল গেল, তাঁর ছেলে ধর্মদাস রায়ের দল হোল। ধর্মদাস নারদ সেজে কি সুন্দর অ্যাক্টো করতো, শুনলে চোখে জল আসতো।—গান কি একখানা!...

কতকগুলো গান তার চিরকাল মনে থাকবে।

সাঁতরা কোম্পানির দলের পাঁচুলাল বাগ্দীর কথা সে কখনো ভুলবে? অমন জুড়ির গান, 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ' পালায় মুমূর্ষু অজামিলের সামনে দাঁড়িয়ে 'চেয়ে দেখো ঐ মহাপ্রস্থান' গানখানা!—সেই দুই হাত ওপরের দিকে তুলে একটা আঙুল দিয়ে

বার বার অচেতন অজামিলের দিকে দেখিয়ে দেখিয়ে, বার বার মাথা দুলিয়ে—নাঃ, সে সব জুড়িও আজকাল আর যাত্রাদলে নেই, তেমন গানও কেউ আর গায় না।

যাদব বাঁড়ুযোর দলের রাজার অ্যাক্টো করতো সেই একটি লোক—ঠিক একেবারে কি রাজা-মশাই?—আচ্ছা কোথায় ওসব লোক যোগাড় করে যাত্রা-দলের লোকেরা? হাত-পা নেড়ে কি তার কথাবার্তা। হাঁ করে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো রামধন পোদ...এই রকম না হলি রাজা? রাজা এরেই বলে। কি তরোয়ালের ঝনঝনানি। মাথায় মুকুটের একটা সাদা পালক উঁচু হয়ে থাকতো, যেন ময়ূরের পেখম!

একবার একটা স্বদেশী গান হয়েছিল, ভূষণ দাসের 'মাতৃপূজা'। রামধন ভালো বুঝতে পারে নি, দেববালকগণ যখন সবাই হাত বাড়িয়ে অসুররাজের সেনাপতিকে বলতে লাগল—'আমায় বাঁধ, আমায় বাঁধ'...বৃদ্ধ ব্রহ্মাকে যখন অপমান করলে অসুররাজের কর্ম-চারীরা—খুব ভালোই লেগেছিলো। আসরের ভদ্দর লোকেরা ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছিল—রামধন পোদ তখন চুপ করে বসেছিল, জিনিসটা তার মাথায় ভালো ঢোকে নি যেন; বাইরে এসে সে একজনকে জিগ্যেস করেছিল—সুরেন্দর বলচে কাকে ওরা?

—আহা, জানো না! সুরেন বাঁড়ুয্যে। মস্ত স্বদেশী। সাহেব মেরেছিল, ধরে নিয়ে গিয়েছিল বরিশালের সভায়।

—কেন গো বাবু?

—স্বদেশী করবার জন্যে, আবার কেন?

—ব্রহ্মা কে?

—বরিশালের অশ্বিনী দত্ত।

—তিনি কে গো?

—নাম শোনো নি? মস্ত বড় স্বদেশী? মহাপুরুষ লোক।

পূর্বদিকে ফরসা হয়েচে। কাক কোকিলের ডাক শুরু হোল ডালে-ডালে। রামধন পোদ এইটুকু তথ্য সংগ্রহ করেই মহা হৃষ্টমনে গঞ্জের বাজার থেকে চলে এসেছিল। তখন দুবলহাটের গঞ্জে কলকাতার ফড়ে মহাজনেরা বেগুন মাপাতো আড়াই টাকা মণ—কিন্তু জিনিস-পত্তর সস্তা কত, একসের একটা কাতলা মাছ দু-আনা দিয়ে কিনে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এল দুবল হাটির বাজার থেকে।

কোথায় গেল সে সব দিন!

তারপর এল নতুন ধরনের যাত্রার যুগ।

জুড়ি উঠে গেল, গান হোত নতুন ধরনের, সাবেক ধরনের পালাও আর নেই। পালার শেষে আজকাল রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন একদম উঠে গিয়েচে—রামধনের যেন কেমন কেমন লাগে। ঠাকুর-দেবতার পালা আর হয় না—

এখন কি সব এসেচে—তার মানে ভালো বুঝতেই পারে না রামধন। সাজ-পোশাকেরও তেমন জাঁক-জমক নেই।

বেলা তিনটের সময় বামুনদ'র বড় বিলের পাড়ে এসে পেঁছিলো দু-জনে। ওপারে বড় একটা বটগাছ, কষাড় ঘাসের ঝোপ সবুজ হয়ে উঠেচে, টোপাপানা আর কলমীর দাম ডাঙার কাছে, বেশি জলে পদ্মফুলের খেলা, ঘন বর্ষা এ বছর, তারও পরে ধারা শ্রাবণ, তেমন জাঁক-জমক নেই।

ফণি বললে—বাবা, একদিন ঘুনি পাতবা বামুনদ'তে—দ্যাখো মাছের বহর।

—কি মাছ রে?

—জলের ধারে এসে দ্যাখো। ঐ দ্যাখো পানার দামের তলায়।

রামধন সবুজ ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে দেখে বললে—মায়া আর ঘেঁস্না—

—দু-একটা বড় গজাড় দু-বার এ্যালানি দিয়েচে—

—কত বড়?

—দু-সেরের ওপর হবে।

—তা এখন আর করি কি বল! তেতস্পর হয়ে গেল। যাত্রা শুনতে গেলি মাছ আর ধরা হয় না আজ।

—পার হবা কি করে? বড্ড জল বেড়েচে বিলের।

—তালের ডোঙা-টোঙা দ্যাখ দিনি! কোনোদিকে আছে কি না?

বিলের ধার দিয়ে দিয়ে প্রায় একপোয়া পথ গিয়ে তবে নাজির মালতের কলাবাগানের নিচে তাদের তালের ডোঙা পাওয়া গেল।

হাতে হুঁকো, সত্তর বছরের ওপর বয়েস। তাকে ডেকে বললে—ও মালতে ভাই, ডোঙাটা নেবো?

—কনে যাবা ?

—যাবো যাত্রা শুনতি রামনগরের বাজারে।

—মাছ ধরবা না এ বছর বিলি'? বড্ড মাছ উঠচে।

—দ্যাখলাম। তা খাজনা বড্ড বেশি করেচে এ বছর জমিদার—চোদ্দ টাকা দিয়ে নাকি লাইকিন করতে হবে। মোরা গরিব লোক, অত ট্যাকা কনে—

—ধরো না মাছ। আমি আছি, কেউ কিছু বলবে না।

নাজির মালতে এ অঞ্চলের মধ্যে অবস্থাপন্ন ধনী গৃহস্থ—চল্লিশ-পঞ্চাশটা ধানের গোলা বাড়ীতে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চুল কেটে নিলে কি 'পরঘাট' করলে মালতে বাড়ী জানান দিতে আসে দূর দূরান্তর থেকে—তা থেকেও বেশ দু-পয়সা উপার্জন হয় ওদের। লোকও খুব ভালো। অনেক নিরন্ন দরিদ্র পরিবার গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে ওদের গোলার ধান নিয়ে গিয়েচে।

মালতে বললে—তামাক খাবা না রামধন?

—না মালতে ভাই, সময় হবে না। এখুনি পার না হলি জায়গা করতি পারবো না।

ওরা শক্ত হাতে ডোঙা চালিয়ে বিলের মাঝখানের কষাড় দ্বীপে এবং তারপর সেখান থেকে সবুজ উলুঘাস ভরা ওপারে চলে গিয়ে একটা হিজল গাছের গায়ে ডোঙার দড়ি বেঁধে মাঠের পথ বেয়ে হেঁটে চললো—আমিনপুরের দিকে। আমিনপুরের হরিহর সর্দার জাতে বুনো, রাস্তার ধারে বসে আউশের ক্ষেতে চৌকি দিচ্চে, ওদের দেখে বললে—যাত্রা শুনতি?

—রামধন বললে—তামাক আছে'?

—বোসো। খাওয়াই।

—যাত্রা শুনতি যাবা না?

—কি করে যাই ? গরুর এখনো ম্যালা মাঠ। যদি ছেড়ে যাই, সব ব্যাটাদের গরুতি শেষ করে দেবে। একে তো এবার ধানই হবে না দেশে, তার ওপরে ম্যালা মাঠ করে বসেচে এই ছেরাবন মাসেও। ভাবো দিকি।

তামাক খেয়ে আবার ওরা রওনা হোল। ক্রোশখানেক গিয়ে ছোট্ট নদী কোদলা। ওপারে কাজি সাহেবদের বাড়ী। কাজি সাহেবদের নিজের খেয়া, বিনি পয়সায় পারাপার করে। রামধন ডাক দিতে ওদের লোক নৌকো নিয়ে এসে পার করে দিয়ে গেল।

বেলা একেবারে যায়।

পশ্চিম দিকে মস্ত কালো মেঘ উঠেচে।

ফণি দেখেই বললে—বাবা, হেঁড়ে চোমরা মেঘ! বিষ্টি হবে।

—চল, নকফুলের জেলেপাড়ার সামনে। ওখানে বসবো।

—শ্মশান পেরিয়ে গেলে হোত না সন্ধেবেলা?

—ভিজে যাবি যে।

—তা হোক বাবা। শ্মশানে বড্ড ভয় করে। এগিয়ে যতটা নেওয়া যায়। সর্দারদের ওখানে তামাক খেতি দেরি করে ফেললে যে!

ভীষণ মেঘ উঠেচে, ঝড়ে একপাল মিশকালো মেঘ ওদের দিকে উড়ে এসে সারা আকাশ অন্ধকার করে মাঠময় তার কালো ছায়া ফেললে। সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে। সজল বাতাস বইচে। উলুখড়ের মাথা দুলচে—রামধন বললে—দৌড়ো বাবা ফণি, দৌড়ো—

কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় বৃষ্টি না হয়ে মেঘ উড়ে শ্মশানের বড় বটগাছটার উঁচু মাথা পেরিয়ে উত্তর পূব কোণের দিকে উড়ে বেরিয়ে গেল। ফণি খুব জোরে জোরে হাঁটতে লাগলো, সন্দের অন্ধকারের আগে শ্মশান পেছনে ফেলতেই হবে। ও বড় যে-সে শ্মশান নয়।

এ অঞ্চলের নামডাকী শ্মশান। কি নেই ওখানে।

ভূত আছে, গোদান আছে, বেঁকি আছে, পেত্নী আছে, এত ভূত আছে দিনমানেই প্রাণ হাতে করে যেতে হয়।

রামধন বললে—ফণি, ভয়ডর কিছু নেই। আমার তাগায় বাবার মাদুলি।

—আমার কাছেও ফুলে-নবলার কবচ।

—কোনো ভয় নেই। এগিয়ে পড়ো।

—কারা বোধহয় মড়া পোড়াতে এসেচে।

রামধন বললে—কে রে ফণি?

ফণি ভয়ে ভয়ে বললে—ওরা কারা? কি জানে কি করচে?

রামধন বললে—কেডা গো তোমরা?

চার-পাঁচটি লোক শ্মশানে কি খুঁজচে যেন।

কে একজন বললে—নড়াল বাড়ী। পাকিস্তানের লোক।

—ওখানে কি করচে?

—হাঁটা দাও ফণি। আমাগোর সে পেঁচাতে দরকার কি?

ফণি বললে—বাবা, আমি জানি ওরা কি খুঁজচে। মড়ার কাপড় নিয়ে গিয়ে তাই কেচে পরবে। ওদের বড্ড কষ্ট। কি করবে বলো।

—নাঃ নাঃ, মড়ার কাপড় খুঁজবে কেন?

—হ্যাঁ বাবা, মড়ার কাপড় খুঁজচে আমি জানি। সেদিন খয়রামারির শ্মশান থেকে দু-জন লোক কাপড় নিয়ে গিয়েচে। অনেকে অমন করচে—

আকাশে নক্ষত্র উঠেচে। বড় বটগাছটায় বাদুড় ঝটপট করচে। দূরে শেয়ালের পাল প্রহর ঘোষণা করলে। ঝিঁকুড় ফুলের বদ গন্ধ বেরুচ্ছে বর্ষার জোলো বাতাসে। ফণির গা কেমন করতে লাগলো, ওই তেতো, কড়া, বোটকা গন্ধ নাকে এলে, যেন মনে হল তার জ্বর হলো। আরও ক্রোশ খানিক পথ হাঁটলো ওরা।

এইবার রামনগরের বাজার পড়বে সামনে।

রাস্তার ধারে ঝুলনের বাজার বসেচে, পাঁপর ভাজা, মাটির ছোবা, পুতুল। পিঁপিঁ বাঁশি। মুড়ি-মুড়কি, ফুলুরি, তালের বড়া। হাঁড়ি, কলসী, সরা। তালপাখা, ঘুনসি, ফিতে, চিরুনি। বিড়ী পান দেশলাই।

লোকে লোকারণ্য। রামনগরের ঝুলনের মেলা এদেশের বিখ্যাত ব্যাপার। আশে-পাশের অনেক গ্রাম থেকে লোক এসে জুটেচে।

রামধন ও ফণি তাড়াতাড়ি আসরের দিকে চললো।

দূর থেকে একটা হট্টগোল শোনা যাচে, আর শুধু দেখা যাচে লোকের মাথা।

বড় বড় হ্যাজাক লণ্ঠনের আলো জ্বলচে আসরে।

রামধন বললে—ও বাবা ফণি, ক্যামন আসর সাজিয়েচে দেখ। চলো শীগগির এগিয়ে চলো।

কিন্তু যাত্রার আসরের গেটে ওদের দু-জন শার্ট-পরা ভদ্রলোক আটকে ফেলে বললে—কোথায় যাচ্চ?

রামধন ভয়ে ভয়ে বললে—আসরে।

—হবে না, ফিরে যাও—

—আজ্ঞে, অনেক দূর থেকে আসচি—বড্ড কষ্ট করে।

—যাও যাও। এ কি মামার বাড়ীর আবদার—ভাগো—

রামধন হাত জোড় করে বললে—বাবু, একটু জায়গা পাবো না?

ওদের মধ্যে একজন রেগে বললে—না না। হবে না। ভদ্দর লোকের আর মেয়েদের আগে—তারপর তোমাদের।

—বাবু—

—গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দাও তো পরেশ? ওকে বসতে না দিলে চলচে না আর—ভাগো এখান থেকে।

তার চেয়েও দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

রামধনের ছেলে যুবক এবং তার রক্ত গরম। সে প্রতিবাদের উত্তরে কি বোধ হয় বলেছিল গেটের ওপাশে।

হঠাৎ কিল চড়ের শব্দে মুখ ঘুরিয়ে দেখলে রামধন, ওর ছেলেকে ঘিরে ফেলে কারা মারধর করচে। সে ছুটে গিয়ে, লোকজনের পায়ে পড়ে ছেলেকে ভিড় থেকে বার করে নিয়ে এলো।

ফণির চোখের কোণ দিয়ে রক্ত পড়চে। মাথার চুল উসকো-খুসকো—বড্ড মার খেয়েচে সে।

রামধন ছেলেকে নিয়ে একটা দোকান থেকে জল চেয়ে নিয়ে ওকে খেতে দিলে, ওর চোখে-মুখে দিলে। কিছু সুস্থ হোলে ওকে গরম এক পেয়ালা চা ছ-পয়সা দিয়ে খাওয়ালে।

বললে—দুটো চিঁড়ে ভিজিয়ে দি বাবা—

—না, এখন কিছু খাবো না। চলো যাত্রা দেখি।

—কি করে যাবি ওখানে? আর যাবো না। ঢের হয়েচে।

—চলো দূর থেকে দেখবানি—

আসর থেকে বহুদূরে লোকের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওরা সতৃষ্ণ নয়নে আসরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

কলকাতার দলের যাত্রা। গান করছিলো একটা ছোকরা হাত-পা নেড়ে। সাহেব সেজে কে একজন দাঁড়িয়ে খুব চেঁচিয়ে কি বলছিলো, রানী দাঁড়িয়ে ছিলেন সামনে। কিছু শোনা যাচ্ছিল না।

মাঝে মাঝে সামনে এসে লোকের দল দাঁড়িয়ে যায় আর কিছুই নজরে পড়ে না। আবার একচমক হয়তো দেখা যায়—রানী চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদচেন।

সারারাত ওদের এভাবেই কাটলো। স্রেফ দাঁড়িয়ে।

ভোরবেলা যাত্রা ভাঙলে রামধন ছেলেকে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হোল। সমস্ত রাস্তা বলে বলে এল—কি পস্কার! যাত্রার মতন যাত্রা! দেখলি চোখ জুড়িয়ে যায়! সত্যি, না হয় আর কলকেতার দল বলেচে কি সাধে?

সতীশ

আজ বছর চারেক আগে সতীশ আমাদের স্কুলে ছাত্র ছিল।

টেস্ট পরীক্ষায় উপরি-উপরি দু-বছর ফেল করে সে স্কুল ছেড়ে দেয়। এর পর আর অনেক দিন ওকে দেখি নি।

একদিন আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি, কে একজন এসে পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করে বলল—ভাল আছেন স্যার?

মুখ তুলতেই দেখলুম সতীশ। অনেকদিন পরে দেখা, খুশি হলুম। কুশল-প্রশ্নাদির আদান-প্রদানের পর বললুম—কি কর আজকাল?

সতীশ বিনয়ে মুখখানা কাঁচুমাচু করে বললে—আজ্ঞে, আজকাল দমদম এরোড্রামে পাইলটের কাজ শিখচি।

আশ্চর্য হলুম খুব খুশীও হলুম। একজন বাঙালী তরুণ যুবক টাইপিস্ট কেরানী-

গিরি, টেলিগ্রাফ বা হোমিওপ্যাথি শিক্ষার গতানুগতিক পথ ছেড়ে দিয়ে এরোপ্লেন চালানো শিখচে—এ সত্যিই আনন্দের বিষয়। তার ওপরে সে আবার আমাদেরই স্কুলের ছাত্র! মনে মনে ভাবলুম—ছেলেটার মধ্যে তো বেশ জিনিস আছে! যা ভাবতুম তা নয়!...

স্কুলে গিয়ে মাস্টারদের মধ্যে বললুম ব্যাপারটা।

সেদিন টিফিনের সময় টিচারদের 'কমন রুমে' সতীশের কথা ছাড়া আর কোনো আলোচনাই নেই। কেউ বললে—দেখুন, কিসের মধ্যে কি থাকে!

—সেই সতীশ! এখন কি না—

অঙ্কের মাস্টার বিপিনবাবু বললেন—আমার হাতে কুড়ির বেশী নম্বর ওঠে নি টেস্টে—দু-বারই—

যদুবাবু বললেন—আর ইংরিজি ফার্স্ট পেপারেই কি, সেকেন্ড পেপারেই কি—পঁচিশের বেশী কখনো পেতে দেখি নি—আর কি দুষ্টুই ছিল! সরস্বতী পুজোর সময় ভাঁড়ার থেকে একটিন রসগোল্লা সরিয়ে—

ইতিহাসের ছোকরা টিচার অরুণবাবু বললেন—তাই হয় মশাই। হিস্ট্রিতে যারা-যারা বড় হয়েছে—নেপোলিয়ান বলুন, আলেকজান্ডার বলুন, লর্ড ক্লাইভ বলুন, ও গিয়ে ইয়ে বলুন—সব গিয়ে দেখুন বিবেচনা করে—

সেকেন্ড পন্ডিত বৃদ্ধ অঘোরবাবু বললেন—মাইনে কত হবে পাস করতে পারলে?

অরুণবাবু বাইরের খবর টিচারদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী রাখতেন। তিনি বললেন—তা সেকেন্ড ক্লাস পাইলটের সার্টিফিকেট পেলেও ধরুন গিয়ে দেড়শো টাকা থেকে শুরু।

—লুফে নেবে মশাই—তিন শো চার শো...আর ফার্স্ট ক্লাস সার্টিফিকেট পেলে তো কথাই নেই—চারশো থেকে আরম্ভ, সাত শো, হাজার, দেড় হাজার—

অঘোরবাবু আপন মনে ঘাড় দুলিয়ে বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন—ওঃ কত বেত ভেঙেচি ওর পিঠে...যেমন ছিল গাধা, তেমনি দুষ্টু!...সেই সতীশ কি না—

বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তাঁর মনে হোল যে আজ সাতাশ বছর ধরে তিনি এই স্কুলে নাম-সই করার ডাকটিকিটের দাম বাদ দিয়ে, চৌত্রিশ টাকা পনেরো আনা মাইনেতে কাটিয়ে গেলেন।

এর পরে আর একদিন সতীশের সঙ্গে দেখা, মাসখানেক পরে রাস্তার ধারে একটা রোয়াকে বসেছিল, আমায় দেখে নেমে এল।

বললুম—সার্টিফিকেট পেতে আর কত দেরি?

সতীশ পূর্বের মত বিনয়ের সঙ্গে বললে—আজ্ঞে, এখানে তো হয়ে গেল! এইবার করাচী গিয়ে ছ-মাস ট্রেনিং-এ থাকতে হবে। তা হোলেই আপনাদের আশীর্বাদে—

বলেই সে খপ্ করে আমার পায়ের ধুলো নিলে। তারপর আমার সঙ্গে কিছুদূর গল্প করতে করতে এল। এরোপ্লেনের ব্যাপার নিয়েও দু-একটা কথা বললে।

আমি বললুম—আচ্ছা, পাইলটের কাজে বিপদও আছে, কি বলো?

—স্যার, আর কিছু বিপদ না, এরোপ্লেন চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে লাইট্নিং পড়তে পারে—ঐ এক ভয়—

—বল কি! এ রকম তোমার হয়েচে নাকি কখনো?

—হয় নি স্যার? কতবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েচি।

—আচ্ছা একটা ঘটনা বল দিকি? বড় ভাল লাগচে তোমার কথা—

—আর একদিন বলবো স্যার, আজ মামা বসে আছেন দাড়ি কামাবেন বলে, আমায় নাপিত ডাকতে পাঠিয়েচেন।—বেলা হয়ে যাচ্চে—

মধ্যে মাস কয়েক আর ওর সঙ্গে দেখা হয়নি।

তারপর একদিন হঠাৎ আমহার্স্ট স্ট্রীটের সেই গলির মোড়ে দেখা।

আগ্রহের সহিত বললুম—এই যে সতীশ, করাচী থেকে কবে এলে?

সতীশ আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আগে প্রণাম করলে। ভারী বিনয়ী ছোকরা! তারপর বললে—ছুটিতে আছি, স্যার। এরোড্রামের কাজ ছেড়ে দিলুম করাচী গিয়ে।

দেখলুম ও আমাদের পোষায় না। সঙ্গে সঙ্গে বম্বেতে একটা ভাল চাকরি পেয়েও গেলাম কিনা?—এই রেলে। এই তো মঙ্গলবারে এসেচি ছুটি নিয়ে। আবার সামনের হপ্তাতেই যাবো।

বললুম--তা বেশ। কত টাকা মাইনে হোল?

—আজ্ঞে আশি টাকা।

—ও তোমার ভালই হয়েচে।

—আর স্যার উন্নতিও আছে খুব। আশি থেকে শীগগিরই একশো হবে, দুশো পর্যন্ত গ্রেড। তবে বড় খাটুনি। সকালে উঠে যাই, আর বেলা বারোটা—ওদিকে তিনটে থেকে রাত আটটা। তবে উপরি আছে।

—কিসের কাজ?

—আজ্ঞে গুডসের। যত ফরেন পার্শেল—

তারপর সে পার্শেলের কাজের নানা খুঁটিনাটি বর্ণনা করে গেল। ওদের বড় সাহেব খুব ভালবাসে ওকে। বড় সাহেব একদিন ওকে ডেকে বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করেছিল। বাঙালীর খুব খাতির সেখানে, বাঙালী বেশী নেই কিনা?

এর পরে মাসখানেক ধরে সতীশের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। দেখা হলেই তাকে বোম্বাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করি, সেখানে কেমন থাকার সুবিধে ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথাই হয়।

তারপরে পড়লো পুজোর ছুটি।

ছুটির পরে এসে মাস দুই পরে আবার অতীশের সঙ্গে দেখা। বললুম—কি হে, আবার ছুটি নিলে নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, কাল সবে এসেচি, মার অসুখ কিনা? আবার যাবো একটু ভাল দেখলেই—

মাসখানেক রোজই সতীশকে দেখি। ওর মায়ের অসুখ নাকি এখনও সারে নি।

আবার কিছুকাল দেখলুম না। তাহোলে ও বোম্বাই চলে গিয়েচে।

হঠাৎ শীতকালের দিকে একদিন দেখি সতীশ ময়লা একখানা ছিট কাপড় পরণে, পাঁচড়ায় পঙ্গু অবস্থায় গলির মোড়ে সেই চায়ের দোকানের সামনে উবু হয়ে বসে রোদ পোয়াচ্চে।

ওকে এ অবস্থায় দেখে বিস্মিত হলুম। পাঁচড়ার জন্যে ছুটি নিয়ে বোম্বে থেকে চলে এসেচে নাকি?

ও আমায় দেখে যেন থতমত খেয়ে গেল। আমি কোন কথা বলবার আগেই চায়ের দোকান ও গলির মোড়ের সান্নিধ্য থেকে আমার সঙ্গে খানিকটা দূর পর্যন্ত এল।

বললে হাওড়ায় ট্রান্সফার হয়েচি স্যার—ওই গত মাস থেকে। বোম্বাই বড্ড দূরে, মা অতদূর থাকতে...তাই এখানেই—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।

তারপর সে বোম্বাইয়ের নানা নিন্দাবাদ আরম্ভ করলে! সে দেশের লোকের সঙ্গে বাঙালীর পোষায় না! জিনিসপত্র আক্রা। থাকার অসুবিধে।

বললুম—থাকতে কোথায়?

—আজ্ঞে রেলওয়ে কোয়ার্টারে।

এলোমেলো গল্প করতে করতে হঠাৎ কথায় কথায় প্রশ্ন করলুম—সমুদ্র তোমাদের বাসা থেকে কতদূরে?

ও বলে—সমুদ্র! সে তো অনেক দূরে। বোম্বাইয়ের কাছে তো সমুদ্র নেই—ওখান থেকে পনেরো কুড়ি মাইল রাস্তা। মোটর বাস করে যেতে হয়।

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলুম। বলে কি? বোম্বাই শহর থেকে সমুদ্র কুড়ি মাইল মোটর বাসে যেতে হয়?

ভাবলুম, হতেও পারে—ও কাজে ব্যস্ত থাকতো, কখনো সমুদ্রে যাওয়ার সুবিধে হয় নি হয় তো। কিন্ত কারো কাছে শোনেও নি কি?

বললুম—তুমি কি সমুদ্রে যাও নি?

—কেন যাবো না স্যার? ছুটির দিন হলেই রেল-কোম্পানীর মোটর বাসে কতবার সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েচি। দু-ঘণ্টা লাগে শহর থেকে মোটরে।

আমি কোনোদিক থেকেই কোনো হদিস্ না পেয়ে চুপ করে রইলুম। আমার মনে অনেক রকম সন্দেহ দেখা দিলে।

পাঁচড়া অবস্থাতেই দিনকতক দেখলুম ওকে—তারপর পাঁচড়া সেরে-টেরে গেলে সুস্থ অবস্থাতেও বেলা সাড়ে দশটার পর ফুটপাথে রোদ পোয়াতে দেখলুম কয়েকদিন।

একদিন আমায় বললে—স্যার, মার বড় অসুখ কিনা, তাই আপিসে যাই নে। সেদিন আমাদের ডিপার্টমেণ্টের বড় সাহেব মাকে দেখতে এসেছিলেন যে! আমায় বললেন—মুখুয্যে, তুমি মায়ের অসুখ না সারা পর্যন্ত ছুটি নাও। কোনো ভয় নেই। আমি ছুটি দিচ্ছি। বড় ভালবাসেন আমাকে।

মাঘ মাসের প্রথম থেকেই ওকে আর দেখলুম না প্রায় দিন কুড়ি।

একদিন সেই চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করলুম—সতীশ কি আবার বোম্বাই চলে গেল নাকি?

ওরা বললে—কোন্ সতীশ? এ গলির মধ্যে থাকে? রোগাপানা, ফর্সামত? সে বোম্বাই যাবে কেন বুঝতে পারলাম না।

বললুম—না, সে বোম্বাইয়ে চাকরি করতো কিনা। হাওড়ায় আসে—বদলি হয়ে—তাই বলচি।

চায়ের দোকানী অবাক হয়ে বললে—সতীশ বোম্বাইয়ে চাকরি করতো?

—করতো না? হাওড়ায় আসবার আগে?

—হাওড়ায় বা সে কি করতো, কবে মশাই? কি সব বলচেন আপনি? আপনার কাছে টাকাকড়ি নেয় নি তো? সতীশ তো এখানে মামার বাড়ী থাকতো। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়ী বসে খেতো। চাকরি-বাকরি করতো না বলে ওর মামা তিনকড়িবাবু প্রায়ই ওকে বকতেন। অতি কুঁড়ে আর বাজে বকুনির জাহাজ। এই চায়ের দোকানে দিনরাত বসে থাকবে আর বক্ বক্ করবে। আমি বলতাম—সতীশবাবু, আমার খদ্দের আসবে, তুমি অতো বকো নি, এখন বাড়ী যাও। সে আবার বোম্বাইয়ে চাকরি করবে?

—আচ্ছা সে করাচীতে গিয়েছিল না এরোপ্লেনের কাজ শিখতে?

—তার মাথা! কোথাও নড়ে নি মশাই, এই তিন বছরের মধ্যে, কোথাও যেতে দেখি নি। তবে দিন কতক আমার দোকানে চা তৈরির কাজ করতো—মাসে জলপানি পাঁচটাকা করে দিতাম।

—এখন সে কোথায়?

—মামা ঝগড়াঝাঁটি করে সেদিন বাড়ী থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েচে। মা তো নেই, অমন ভাগ্নেকে জায়গা দিয়েছিল মামারা এই ঢের। আজ আট-দশ বছর ওর মা মারা গিয়েচে—এই আট-দশ বছর মামারা বসিয়ে খাওয়াচ্ছিল তো, এখন বড় হয়েচিস, আর বসে খেলে তারা শোনে কি? আপনি বলুন না মশাই!

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না।

অভিনন্দন-সভা

এবার দেশে গিয়ে দেখি, গৌর পিওন পেনসন্ নিয়েচে। কতকাল পরে? বহুদিন... বহুদিন।

বায়ুমণ্ডলে যখন প্রজ্বলন্ত উল্কা ছুটে চলে, তখন গোটা ফটোগ্রাফ প্লেটটা সে এক সেকেণ্ডে পার হয়ে যায়। কিন্তু ছ-ঘণ্টা কি সাত ঘণ্টা ঠায় আকাশের দিকে ক্যামেরার মুখ ফিরিয়ে রাখলেও, নীহারিকা একচুল নড়ে না।

গৌর পিওন (গৌরচন্দ্র হালদার, জেলে) আমাদের জীবনে সেই বহুদূরবর্তী নীহারিকার মতো অনড় ও অচল অবস্থায় এক ডাকঘরে, এক ডাকের ব্যাগ ঘাড়ে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর ডাকহরকরার কাজ করে আসচে। মধ্যে তিন বছরের জন্যে সে কেবল কোটচাঁদপুর গিয়েছিল, তাও তার মন সেখানে টেকে নি। ওভারসিয়ারের কাছে কান্নাকাটি করে আবার চলে এসেছিল আমাদের এই ডাকঘরে।

১৯১২ সালের ৭ই জুলাই সে প্রথম ভর্তি হয়েছিল এখানকার ডাকঘরে।

তার মুখেই শুনেচি, আমি তখন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। বাবা বিদেশ থেকে টাকা পাঠাতেন, ও আমাদের বাড়ী এসে বলতো—টাকা নিয়ে যান বাবাঠাকুর!

আমি বলতাম—ক-টাকা?

—ন-টাকা।

—কোন্ ডাকঘর থেকে?

—বহরমপুর।

একবার এক বুড়ো-পিওন আমাদের গাঁয়ের বিটে বদলি হোলো, গৌর পিওনের পড়লো অন্য বিট। বুড়ো বাড়ী এসে আগেই বলতো—কট্হর নিয়ে এসো। সড়া কট্হর দেবে না, আচ্ছা কট্হর নিয়ে এসো—খাবো।

তার নাম পাঁড়েজি। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। অনেকদিন এদিকে ছিল। অমনিধারা বাংলা বলতো। কিন্তু তার দোষ ছিল, দূরের গাঁয়ের চিঠি থাকলে হাঁটবার ভয়ে যেতো না।

একবার বাঁওড়ের ধারের ঝোপ থেকে এই রকম অনেক চিঠি কুড়িয়ে পাওয়া যায়। বুড়ো পাঁড়েজির নামে নালিশ গেল ওপরে। তাকে এখান থেকে বদলি করে দিলে।

গৌর পিওন এলো এরই পরে। সেই থেকেই ও এখানে আছে, মাত্র তিন বছর ছাড়া।

গৌর পিওন তিন-চার বছর কাজ করবার পরই আমি গ্রাম ছেড়ে চলে গেলাম। পুনরায় ফিরলাম, দীর্ঘ আঠারো বছর পরে।

সেদিনই বিকেলে দেখি, গৌর পিওন চিঠি বিলি করতে এলো আমাদের বাড়ী।

সত্যি আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি আশা করি নি এতকাল পরে সেই বাল্যের গৌর পিওন, পুরনো দিনের মত চিঠি বিলি করতে আসবে।

গৌর উঠোন থেকে রোয়াকে উঠে এসে বললে—প্রাতঃপেন্নাম বাবাঠাকুর।

—গৌর যে! ভালো আছো? এখনো তুমি এখানে ডাক বিলি কর্যচা?

—আপনাদের আশীব্বাদে এক রকম চলে যাচ্চে বাবাঠাকুর। বাড়ী ঘর আপনার একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল যে, না থাকার জন্যে!

গৌর কিন্তু অবিকল সেই রকম আছে। বয়েস ষাটের কাছাকাছি হোলো হিসেব মত।

গবর্নমেণ্টের খাতায় যে-বয়েসই লেখা থাকুক না কেন, মাথার একটি চুলও পাকে নি। তবে সামান্য একটু কুঁজো হয়ে পড়েচে। গলায় তুলসীর ত্রিকণ্ঠী মালা বার্ধক্যর একমাত্র সুস্পষ্ট চিহ্ন।

—কতদিন চাকরি হোলো গৌর-কাকা?

—তা, একত্রিশ-বত্রিশ বছর।

—রোজ ক-খানা গাঁ বেড়াতে হয়?

—পাঁচ-ছখানা গাঁয়ে বিট থাকে রোজ। পাঁচ-ছ ক্রোশ হাঁটতে হয় দৈনিক। জলে-কাদায় হানিভাঙা, দুগগোপুর, সরভোগ, দেকাটি এসব জায়গায় যেতে বড্ড কষ্ট। পা হেজে যায়, পাঁকুই হয়।

কতদিন পরে ওকে ডাক বিলি করতে দেখে এমন এক আনন্দ হোলো।

এতদিন পরে দেশে এলাম, বাইরের জগতে কত পরিবর্তন ঘটে গেল, আমার নিজের জীবনেও কত কি ওলট-পালট হোলো—কিন্তু সেই পুরাতন গ্রামে ফিরে এসে দেখি, সময় এখানেও অচঞ্চল। বাঁশ আম বনের ছায়ায় ছায়ায় পুরাতন-জীবন সেইরকমই বয়ে চলেচে—গৌর পিওন সেই পুরনো দিনের মতই চিঠি বিলি করচে!

গৌর পিওন রোজ আসে, রোজ খানিকটা বসে গল্প করে। কোনোদিন একটা নারকোল, কোনদিন বা একটা কাঁঠাল চেয়ে নিয়ে যায়।

মাস আট-নয় সেবার বড় আনন্দেই কেটেছিল গ্রামে।

তারপরই আবার চলে যেতে হোলো বিদেশে। কাটলো সেখানে কয়েক বছর।

এইবার আষাঢ় মাসে দেশে ফিরে এলাম আবার।

এসে দেখি, বাড়ীর কি ছিরিই হয়েছে। না থাকলে যা হয়। কয়েক বছরের বর্ষার জলে পুষ্ট হয়ে আগাছার জঙ্গল বাড়ীর ছাদ পর্যন্ত নিবিড় ঝোপের সৃষ্টি করেচে। সিমেণ্ট উঠে গিয়ে রোয়াকে কাঁটানটের জঙ্গল গজিয়েচে। ঘরের মধ্যে কড়িকাঠে মৌমাছিরা চাক বেঁধেচে। কলা-বাদুড় কড়িতে-বরগাতে ঝুলচে। চামচিকের নাদি দু-ইঞ্চি পুরু হয়ে জমেচে মেঝের ওপর।

পরদিন সকালে গৌর পিওন চিঠি বিলি করতে এলো। এসে সে বললে—আজই আমার চাকরির শেষ দিন বাবাঠাকুর। বাড়ী এসেচেন, তবুও শেষ দিনটা আপনাকে চিঠি দিয়ে গেলাম।

—আজই শেষ দিন?

—আজই বাবাঠাকুর। পঁয়ত্রিশ বছর তিনমাস পূর্ণ হোলো। আর কতদিন রাখবে গবর্নমেণ্ট।

—বোসো। একটা পাকা আনারস নিয়ে যাও। বাঁশবাগানে জঙলি আনারস অনেক হয়ে আছে, বেশ মিষ্টি।

গৌর কিছুক্ষণ বসে গল্প করে চলে গেল।

পরদিনও দেখি সে ডাকব্যাগ ঝুলিয়ে চিঠি বিলি করে বেড়াচ্চে, সঙ্গে একজন ছোকরা বয়সের পিওন।

বললাম—কি গৌর, আজ আবার যে?

গৌর প্রণাম করে বললে—নতুন লোক এসেচে, ও-তো বাড়ীঘর চেনে না, তাই ওকে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি।

কিছুদিন কেটে গেল।

গৌর পিওনের বাড়ীতে ওর স্ত্রী অনেকদিন মারা গিয়েচে। একটি মেয়ে আছে, সেই রান্নাবাড়া করে। অবস্থা অতি দীনহীন।

একদিন ওর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি ও পরের বাড়ীতে দুধ দুয়ে বেড়াচ্চে।

গৌর বললে—বাবাঠাকুর, সামান্য পেনসনে কি চলে? আজকাল এই বাজার। তাই দেখি, দুধ দুয়ে কিছু যদি উপরি পাই।

—একটা ছোটখাটো ব্যবসা করো না কেন?

—বাবাঠাকুর, যথেষ্ট বয়েস হয়েচে! হাতে টাকাপয়সাও নেই যে ব্যবসা করবো। এই রকম করে আপনাদের আশীর্ব্বাদে একরকম চলে যাবে।

সত্যিকার দীনতামাখা মুখ ওর। দীনতা যদি বৈষ্ণবসুলভ গুণ হয়, তবে ও একজন খাঁটি বৈষ্ণব।

তারপর একটি মজার ঘটনা ঘটে গেল।

ব্যাপার এই: মহকুমা হাকিম বদলি হয়ে যাচ্চেন, তাঁর বিদায় অভিনন্দনের সভায় আমার ডাক পড়লো। খুব বক্তৃতা ও প্রচুর জলযোগের আয়োজন ছিল সেখানে। এমন সহৃদয় রাজকর্মচারী জীবনেও নাকি কেউ দেখেন নি। তিনি মহকুমার যে উপকার করে

গেলেন, এখানকার অধিবাসীরা কখনো তা বিস্মৃত হবে না। (কি উপকার? আজকের দিনটি ছাড়া কারো মুখে এতদিন সেই মহদুপকারের বার্তা শোনা যায় নি। কেন?) বীরেনবাবু বক্তৃতা করতে উঠলে—কানে কানে বললাম, আর কেন বেশি কথা খরচ করেন অস্তগামী সূর্যের পিছনে, সংক্ষেপে সারুন। লুচি ঠান্ডা করেন কেন অকারণে।

বিদায়ী মহকুমা-হাকিম তাঁর বক্তৃতায় বললেন—তিনি এই মহকুমার জন্যে বিশেষ কিছু করেন নি (খাঁটি সত্য), তাঁর বন্ধুরা তাঁকে স্নেহ করেন বলেই এত ভালো উক্তি তাঁর সম্বন্ধে করলেন (মিথ্যে কথা হয়ে গেল, স্নেহ করেন বলে নয়)। তিনি এখানকার কথা কখনো ভুলতে পারবেন না, ইত্যাদি।

সেখান থেকে ফেরবার পথে বার-বার মনে হোলো, এসব বিদায় অভিনন্দন ব্যাপারটা আগাগোড়া মিথ্যে ও অসার। মহকুমা হাকিমকে তোষামোদ করতে হবে বলেই এর আয়োজন। আমি গৌর পিওনকে অভিনন্দন দেবো না কেন? সত্যিকার সমাজসেবক সে; পঁয়ত্রিশ বছর ধরে গ্রামে গ্রামে চিঠি বিলি করে এসেচে জলঝড়কে তুচ্ছ করে—শীত মানে নি, গ্রীষ্ম মানে নি। বিনয়ের সঙ্গে, দীনতার সঙ্গে, মুখে কখনো একটা উঁচু কথা শোনা যায় নি তার।

গ্রামের তরুণ-সঙ্ঘের ছেলেদের কাছে কথাটা পাড়তেই তারা তক্ষুনি রাজী হয়ে গেল। সঙ্গের কর্মী নিতাই বললে—খুব ভাল কথা কাকা। নতুন জিনিস আমাদের দেশে।

বিনয় আর একজন ভালো কর্মী, সঙ্ঘের সেক্রেটারি। তার খুব উৎসাহ দেখা গেল এতে; সে বললে—রসিক চক্কত্তি দারোগাকে আমরা ও-বছর অভিনন্দন দিইচি কাকা, বাহাত্তর টাকা চাঁদা তুলে। আপনি জানেন না, সে অতি ধড়িবাজ লোক ছিল, ঘুষ যেতো দু-তরফ থেকেই। তাকে যখন অভিনন্দন দিয়েচি!

—সে সভার সভাপতি কে ছিল?

—বরেন দাঁ, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।

—ঐ যার দোকান?

—আজ্ঞে, যে এ-বাজারে কাপড়ের চোরা-বাজারে লাল হয়ে গেল। সে একাই পঁচিশ টাকা চাঁদা দিয়েছিল।

—দেবেই তো। দারোগার সঙ্গে ভাব না থাকলে চোরাবাজার হয় কি করে।

সন্ধ্যার সময় তরুণ-সঙ্ঘের কর্মীরা এসে জানালে, কাজ তারা আরম্ভ করে দিয়েচে। তবে বাজারের অনেকেই হাসচে। বরেন দাঁ সবচেয়ে বেশি। বরেন দাঁ চাঁদা দেবে না। সে বলে—গৌর পিওনের অভিনন্দন? এ মতলব কার মাথায় এলো? দূর! তোমরা বাবা লোক হাসালে দেখ্‌চি। লোকে কি বলবে? কে কবে শুনেচে ডাকহরকরা পেনসন পেলে তাকে আবার ফেয়ার-ওয়েল-পার্টি দেওয়া হয়? হাকিমদারোগাদের দেওয়া হয় জানি।

বিনয় বলচে—আপনাদের কাল চলে গিয়েচে বরেন জ্যাঠা। একালে গরীব লোকেরাই অভিনন্দন পাবে। দিন চাঁদা। আমরা শুনবো না। দশ টাকা দেবেন আপনি। কেন দেবেন না?

এই নিয়ে উভয়পক্ষের তর্ক হয়ে গিয়েচে। বরেন চাঁদা দেয় নি, শেষ পর্যন্ত নাকি বলেছিল আট আনা নিয়ে যাও! বিনয় না নিয়ে চলে এসেচে।

তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। বিনয়কে বললাম—বুধবার অভিনন্দন সভা, বাজারের বড় চাঁদনীতে সবাইকে জানিয়ে দাও—

বিনয় বললে—আপনি শুধু পেছনে থাকুন, আমাদের ওপর কাজ করবার ভার রইলো।

দু-তিন দিন খুব বর্ষা হোলো। আমি আর কোথাও বেরুতে পারি নি। ব্যাপারটা কতদূর এগিয়েচে তা খোঁজ নিতে পারলাম না। বুধবার দিন বিকেলের দিকে সেজেগুজে বাজারের দিকে বেরুলাম।

জিনিসটা কি আমিই নষ্ট করে দিলাম? একবার দেখা দরকার।

বাজারে যেতেই দেখি, কেম্বিসের জুতো পায়ে, গায়ে জামা, গৌর পিওন আমার আগে-আগে চলেচে।

বড় চাঁদনিতে গিয়ে দেখলাম, ছোকরার দল দিব্যি সভা সাজিয়েচে। রঙিন কাগজের মালা, দেবদারু পাতা, মায় কলাগাছ—কিছু বাদ যায় নি। স্কুল থেকে চেয়ার-বেঞ্চ আনিয়েচে। ভেঁপু মুখে দিয়ে তারা বলে বেড়াচ্চে—'আজ বেলা পাঁচটায় অবসরপ্রাপ্ত পিওন—শ্রীগৌরচন্দ্র হালদারের বিদায়-অভিনন্দন-সভা হবে বড় চাঁদনিতে—আপনারা দলে দলে যোগদান করুন।'

স্কুলের ছেলেরা ভিড় করে এলো সভায়। মাস্টারদের মধ্যে কেউ বাদ রইলেন না। বাজারের লোকেও সকলে এলো—কি হয় দেখতে। ফলে, সভা আরম্ভ হবার আগেই বসবার আসন সব ভর্তি হয়ে গেল। লোকে চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে আরম্ভ করলে।

বিনয় নিয়ে এলো বরেন দাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে। স্মিতমুখে বরেন দাঁ সভায় ঢুকে আমাকে দেখে একটু যেন দমে গেল।

তাহোলে কি সভাপতি তাকে করা হবে না? আমাকে বললে—ভায়া যে! কবে এলে?

—আমি তো এসেচি চার-পাঁচদিন হোলো।

—তাই।

—তার মানে বরেন-দা?

—এখন সব বুঝলাম ভায়া। তুমি যে এসেচো জানতাম না। এখন বুঝলাম।

—কি বুঝলে?

তোমারই কাজ। নইলে গৌর পিওনের অভিনন্দন! এমন উদ্‌ঘুট্টি কাণ্ড আবার কার মাথায় আসবে? তা ভায়া আজকের সভাপতিত্বটা তুমিই করো।

আমি পল্লীগ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের মনের ভাব বুঝি নে? এত বোকা আমি নই।

তৎক্ষণাৎ বললাম, ক্ষেপেচ বরেন-দা? তুমি হাজির থাকতে, আমি? কিসে আর কিসে! তা হয় না। চলো দাদা, তোমাকে আজকের দিনের—

—না, না, শোনা ভায়া...

বরেন দাঁর মুখে খুশির ঔজ্জ্বল্য। আমি ওকে হাত ধরে টেনে সভাপতির চেয়ারে এনে বসালাম।

আমার ইঙ্গিতে গৌর পিওনকে সভাপতির আসনের পাশে বসানো হোলো। একেবারে প্রেসিডেন্টের পাশের চেয়ারে...জনমণ্ডলীর উন্মুক্ত দৃষ্টির সামনে।

এ-ও আজ সম্ভব হোলো। গৌর পিওনের দিকে চেয়ে দেখলাম। ওর মুখও খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে।

গৌর চারিধারে চেয়ে চেয়ে দেখচে, একি ব্যাপার? সে বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারে নি যে, তার সভা এমন চেহারার হবে, বা অতে এত লোকসমাগম হবে। বরেন দাঁর মত বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্কুলের হেডমাস্টারের মত বিশিষ্ট ব্যক্তি, আড়তদার নৃপেন সরকারের মত বিশিষ্ট ব্যক্তি সে-সভা অলংকৃত করবেন তাঁদের মহিমময় উপস্থিতির দ্বারা। ছেলেরা সভায় দল বেঁধে এলো, প্রত্যেকের হাতে একগাছা করে ফুলের মালা, একজনের হাতে চন্দনের বাটি। উদ্বোধনী-সঙ্গীত শুরু হোলোঃ

'শরতে আজ কোন্ অতিথি এলো প্রাণের দ্বারে'

রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেই হবে, যার যা জানা আছে, সভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল হোলো, বা না হোলো। পাড়াগাঁয়ে কে কটি রবীন্দ্রনাথের গান জানে? যা জানে ওই ভালো। লাগাও—

আমি সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব করবার সময় বললাম—

আজকের এই জনসভায় বিশিষ্ট সমাজ-সেবক শ্রীগৌরচন্দ্র হালদার মহাশয়ের অভিনন্দন উৎসবে পৌরোহিত্য করবার জন্যে দেশের অলঙ্কারস্বরূপ (কিসে?) উদারহৃদয় (একদম বাজে) কর্মী আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের সুযোগ্য (নির্জলা মিথ্যে) প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে (মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান আর কি) অনুরোধ করচি, তিনি দয়া

করে অদ্য (দয়া করবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছেন)—ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটি ছোট মেয়ে সভাপতির গলায় ফুলের মালা দিলে। কার্যসূচীর প্রথমেই আমি লিখে রেখেচি, 'সভাপতি কর্তৃক শ্রীগৌরচন্দ্র হালদার মহাশয়কে মাল্য-চন্দন দান। অতএব সভাপতিকে গৌর পিওনের কপালে চন্দন মাখিয়ে দিতে হোলো (কেমন মজা, বরেন দাঁ) এবং মালা পরিয়ে দিতে হোলো। সে কি হাততালির বহর চারিদিকে। বেচারী গৌর পিওন বিমূঢ় বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। একে একে বক্তাদের নাম ডাকা হোতে লাগলো। আমিই নাম-তালিকায় একের পর এক বক্তার নাম লিখি দিয়েচি। যথা—

১। স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার—গদাধরবাবু।
২। স্কুলের শিক্ষক, মহাদেববাবু।
৩। স্টেশন মাস্টার।
৪। পোস্ট মাস্টার।
৫। আড়তদার নৃপেন সরকার।
৬। কবিরাজ মশাই।
৭। প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত মশাই।
৮। চামড়ার খটিওয়ালা রজবালি বিশ্বাস।
৯। বস্ত্র-ব্যবসায়ী রামবিষ্ণু পাল।
১০। আমি।
১১। সভাপতি।

এদের মধ্যে অনেকে সভায় বক্তৃতা কখনও দেয় নি। সভায় দাঁড়িয়ে উঠে, মুখ শুকিয়ে গলা কাঠ হয়ে, চোখে সর্ষের ফুল দেখে বক্তারা কিছু বলবার না পেয়ে গৌর পিওনকে একেবারে আকাশে তুলে দিলে।

না, গদাধর ডাক্তার মন্দ বললেন না। মহাদেববাবু বৃদ্ধ হলেও শিক্ষিত ব্যক্তি, মোটা-মুটি গুছিয়ে দু-চার কথা যা হোক একরকম হোলো। স্টেশন মাস্টার হাত-পা কেঁপে অস্থির। পোস্ট মাস্টার খুব ভালো বললেন, তবে অনভ্যাসের দরুণ একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

বক্তৃতার শেষে তিনি ঝোঁকের মাথায় একেবারে ছুটে এসে—'ভাই রে গৌর! আজ আর তুমি ছোট আমি বড়ো নই, আজ তুমি আমার ভাই।' —বলে একেবারে নিবিড় আলিঙ্গনে গৌর পিওনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দস্তুরমত 'সিন' যাকে বলে। লোকে মজা দেখে খুব হাততালি দিয়ে উঠলো।

তারপরই আড়তদার নৃপেন সরকার। বেচারী অত হাততালির পরের বক্তা। জীবনে সর্বপ্রথম তিনি সভায় দশজনের উৎসুকদৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়েছেন। বেচারী প্রথমেই বলে ফেললেন 'আমরা একজন মহাপুরুষের বিদায়-উৎসব সভায় একত্র হোয়েচি।' যাকে বলা হচ্চে সে পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল।

কবিরাজ মশাই সংস্কৃত শ্লোক-টোক আবৃত্তি করে সভাটাকে কুশণ্ডিকার আসর করে তুললেন। মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম বাস করেন, অতএব গৌর পিওন ছোট কাজ করতো বলে ছোট নয়, সেও ব্রহ্ম। উপনিষদের ঋষিদের তপোবনের এই আবহাওয়া বইয়ে দেবার পরে প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত বেচারী মহাফাঁপরে পড়লেন, কিন্তু তার চেয়েও ফাঁপরে পড়লো চামড়ার খটিওয়ালা—রজব আলি বিশ্বাস।

স্কুলের পণ্ডিত ভালোমানুষ লোক, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের গুণ ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা শেষ করলেন।

নানা কারণে তাঁকে বরেন দাঁর মুখের দিকে চাইতে হয়।

রজবালি বিশ্বাস বললে, এ পর্যন্ত তার চিঠিগুলো ঠিকমতো বিলি করেচে গৌর, অমন পিওন আর হয় না। এইখানেই ইতি।

আর কোন কথা বার হয় না তার মুখ দিয়ে। ঘেমে উঠলো আর অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো। পরে হঠাৎ ধপ করে বসে পড়ে বক্তৃতার উপসংহার করলে।

রামবিষ্ণু পাল বৃদ্ধ ব্যবসায়ী, সৎলোক, গৌরকে তিনি বন্ধু বলে সম্বোধন করলেন। বাল্যে গৌর পাঠশালায় তাঁর সহপাঠী ছিল, এইটুকু মাত্র বললেন। আমি এক মানপত্র লিখে এনেছিলাম, তাতে গৌর পিওনের সম্বন্ধে অনেক কথা ভালো ভালো বলা ছিল। মানপত্র পড়ে আমি গৌরের হাতে দিলাম।

সভাপতি বরেন দাঁ ঘুঘু লোক, সভার গতি কোন্‌দিকে সে অনেকক্ষণ বুঝেচে।

সভাপতির অভিভাষণে সে গৌর পিওনের এমন সব গুণের বর্ণনা করে গেল, যা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। গৌর পিওন প্রকৃতই দেখলাম লজ্জিত হয়ে উঠেচে ওর সব কথা শুনে এবং বিস্মিত সে নিশ্চিতই হোতো, কিন্তু তার বিস্ময়-বোধের শক্তি আজ অনেকক্ষণ সে হারিয়ে ফেলেচে।

গৌর পিওন কিছু বলতে উঠে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। শুধু সে হাত জোড় করে সভার সকলের দিকে চেয়ে দু-তিনবার বললে—বাবুরা—বাবুরা...

তারপর সবাইকে করজোড়ে বার বার প্রণাম করে সে ধপ করে বসে পড়লো।

এবার সভা ভংগ হবে। ছোকরার দল অমনি গেয়ে উঠলোঃ

'তোমার বিদায় বেলার মালাখানি আমার গলে'

—না, রবীন্দ্রনাথের গান চাই।

বিনয়কে বললাম—খাইয়েচো?

চাঁদনির পাশে হরি ময়রার দোকানে হাত ধরে গৌর পিওনকে নিয়ে যাওয়া হোল। গেল সে। সে চলে যাচ্ছিলো বাড়ীর দিকে। আমিও গেলাম ওদের পেছনে পেছনে। তা ছেলেরা আয়োজন করেচে ভালো।

দুটো ফজলি আম, দই, সন্দেশ, নিমকি। বড় রাজভোগ যে-কটা পারে গৌর খেতে। খেয়ে কি খুশী বেচারী। চোখে তার প্রায় জল এসে গেল আবার।

আমার দিকে চেয়ে সে বললে—এমন দিনডা যে হবে, তা ভাবি নি। সব আপনার কাণ্ড। আমি তা বুঝিচি। কি খাওয়াডাই খাওয়ালেন, কি ভালো কথাই বললেন অমার সম্বন্ধে। বড্ড গুরুবল আমার।

বললাম—খুশী হয়েচো গৌর?

—ওই যে বললাম বাবাঠাকুর। এমনধারা দিনডা যে আমার আসবে তা...

ওর গলায় এখনো সেই ফুলের মালা।

মরফোলজি

নির্মলার সংগে মেডিকেল কলেজে যেদিন ঢুকি সেদিনই প্রথম দেখা। আমি আই-এস-সি পাস করে মেডিকেল কলেজে ঢুকেচি, বয়েস উনিশ।

চোখে প্রথম যৌবনের রঙীন নেশাটেশা একেবারেই ছিল না বললে ভুল বলা হবে, যতই কেন অধ্যয়নপরায়ণ ভালো ছেলে হই না কেন। সেই নেশার ঘোরেই বোধহয় নির্মলাকে স্বর্গের দেবী বলে মনে হোল প্রথম দর্শনেই। ছিপছিপে সুন্দর মেয়ে, টানা-টানা চোখ, জোড়া ভুরু দিব্যি দেখতে মুখখানি। নীল রংয়ের শাড়ী পরণে, গায়ে ফুল-হাতা ব্লাউজ, সরু চুড়ি ক-গাছা হাতে। চোখে মুখে একটা দীপ্ত বুদ্ধির ছাপ। নারী-সুলভ লজ্জা তার মধ্যে মোটেই নেই। আছে বিদ্রোহিনীর উগ্র চ্যালেঞ্জ। আমার মনে হোত ওর সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি পুরুষজাতকে চ্যালেঞ্জ করচে যে, আমার সংগে বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে এসো না, আমি সে ধরনের মেয়ে নই। খবরদার!

সেইজন্যেই যত দিন যেতে লাগলো তত আমি ওর দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলাম। তখন জানি নে যে, আমার জীবনটা একেবারে মাটি করে দেবার জন্যে ও এসেচে। কার জন্যে আজ আমি এই পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ়তায় পদার্পণ করেও অকৃতদার,

সন্তানসন্ততিহীন, ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া মানুষ? কার জন্যে সারা জীবন তৃপ্তি পেলুম না, সুখ পেলুম না, আপনার বলতে কাউকে পেলুম না, টাকা রোজগার করতে হয় করে যাচ্ছি, খেতে হয় খেয়ে যাচ্ছি, কলেজে অধ্যাপনা করতে হয় করে যাচ্ছি, জীবনের না আছে কোনো উদ্দেশ্য, না আছে কোনো অবলম্বন।

শুনেচি অনেকের এরকম হয়, প্রেমের নেশায় পড়ে অল্প বয়সে, সে নেশা কাটিয়েও ওঠে। কিন্তু আমার মত এমন উচ্ছন্ন যায় কি?

যাক সে সব কথা।

কেমন করে কি হলো বলি।

আমাদের ক্লাসে অনেকগুলি মেয়ে ছিল। কেউ বি-এসসি কেউ আই-এসসি পাস করে এসে মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছিল। পাঁচটি মেয়েকে আমার আজও বেশ মনে আছে। একজনের নাম শকুন্তলা সেন, শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারা, বড় বড় চোখ ও মুখশ্রী মন্দ নয়—হাতের কব্জির কাছটা বড্ড মোটা বলে মনে হোত। শকুন্তলা ছিল বড় শান্ত মেয়ে, কোনোদিকে চাইতো না, একমনে প্রফেসরের বক্তৃতা শুনে নোট করে যেতো। একজনের নাম সুনীতি, তার উপাধি আমার মনে নেই, ওর রং ছিল খুব ফর্সা, গোল চাঁদের মত মুখখানা, ফ্লার্ট টাইপের মেয়ে, ক্লাসের ছেলেদের নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতো। একটির নাম ছিল মহামায়া বন্দ্যোপাধ্যায়—সেকেলে নাম কিন্তু বড্ড একেলে মেয়ে—সুন্দরী হিসেবে মন্দ নয়, অতি চমৎকার গঠন-পারিপাট্য শরীরের, খুব শৌখীন, চোখে চশমা' কথায় কথায় হেসে লুটিয়ে পড়তো, এটিও ফ্লার্ট টাইপের মেয়ে! মহামায়ার সঙ্গে একসঙ্গে আসতো, ওরই কি রকম বোন হয়, চপলা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখতে শুনতে মহামায়ার চেয়েও ভালো, কিন্তু বড় নিরীহ, ভালমানুষ, সাত চড়ে কথা বের হোত না। আর একটি গরীব ঘরের মেয়ে ছিল, ওর নাম বেলা চক্রবর্তী। মোটাসোটা, ফর্সা, সাদাসিধে সুতীর শাড়ী পরে আসতো, সাদা ব্লাউজ ফুল হাতা—সকলের সঙ্গেই মিশতো সকলের সঙ্গেই হেসে কথা বলতো—বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম বলেই মনে হোত। এদের সকলেরই বয়েস উনিশ-কুড়ির মধ্যে। সেদিক থেকে আমরা প্রায় সকলে সমবয়সী, এক-আধ বছরের বেশি বা কম, এক শকুন্তলা ছাড়া, তার বয়েস ছিল আমাদের চেয়ে তিন-চার বছর বেশি। আমরা আড়ালে নিজেদের মধ্যে বলতাম—শকুন্তলাদি।

যেমন হয়ে থাকে। ক্লাসসুদ্ধু ছেলে ঝুঁকে পড়লো মেয়েদের দিকে। যে যার সঙ্গে জমিয়ে নিতে পারে, প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো। মাস দুই অগ্রসর হয় নি, ফার্স্ট ইয়ার এম-বি ক্লাস! এরই মধ্যে বেধে গেল প্রণয়ের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঝগড়া, রেষারেষি। এক এক মেয়ের পেছনে চার-পাঁচটি বা ততোধিক ছেলে। থার্ড ইয়ার ক্লাসে সেবার বিখ্যাত সুন্দরী ফিরিঙ্গি মেয়ে মিস ইভশ্যাম পড়তো—আমরা কলেজে ঢুকেই শুনি, মেডিকেল কলেজসুদ্ধ ছাত্র তার জন্যে পাগল। এই ফিরিঙ্গি মেয়েটির নাম চিরকাল লেখা থাকা উচিত মেডিকেল কলেজের অলিখিত ইতিহাসে। অন্ততঃ দুটি আত্মহত্যা ও বহু সংখ্যক ছেলের উচ্ছন্ন যাওয়ার জন্যে এই মেয়েটি দায়ী। চার-পাঁচটি পিতার বিষয় পুত্র কর্তৃক সমর্পিত হয়েচে এই দেবীর বেদীমূলে অর্ঘ্যস্বরূপ। তবুও এঁর আকাঙ্ক্ষা মেটে নি।

আমি মিস ইভশ্যামকে দেখলুম কলেজের বার্ষিক উৎসবে ছাত্রীদের গ্যালারিতে। এই প্রথম তাকে দেখি—খুব চটকদার সুন্দরী বটে। বয়েস বাইশের বেশি নয়। বিদ্যুৎলতা। তবে আমি দূর থেকে দেখেচি এই পর্যন্ত। আরও অনেকবার দেখেচি, লম্বা করিডরে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে—কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের সঙ্গে কথা কইবার বা নড করবার মত সহৃদয়তা মিস্ ইভশ্যামের ছিল না। ফার্স্ট বা সেকেণ্ড ইয়ারের কোনো ছেলেকে সে পুঁছতো না। কেনই বা পুঁছবে? তার স্তাবকবর্গের মধ্যে পাস-করা হাউস-সার্জেনরাও ছিল, উঁচু ক্লাসের ধনী ছাত্র ছিল, শোনা যায় দু-একজন অধ্যাপকও ছিলেন।

আমি ছিলাম লাজুক ও গম্ভীর প্রকৃতির। আই-এসসিতে স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্র। লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু বুঝতামও না, মেয়েদের সসংকোচে পাশ কাটিয়ে যেতেই চিরদিন অভ্যস্ত। লজ্জায় চোখ তুলে অপরিচিতা মেয়েদের দিকে চাওয়া ছিল আমার পক্ষে সুকঠিন ব্যাপার। আজকার দিনের কথা নয়, কথা হচ্চে আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগের। তখন মেয়েরা বেথুন কলেজ ছাড়া অন্য কোনো কলেজে পড়তো না—আর পড়তো মেডিকেল কলেজে। মেয়েরা তখন অনেক ছাত্রের কাছেই অন্য জাতের জীব বা দেবী-টেবী বলে গণ্য হোত।

মেডিকেল কলেজে ঢুকে প্রথম সহপাঠিনীরূপে ওদের পেয়ে ছাত্রদল যদি ঝুঁকে পড়েই ওদের দিকে, ওদের নিয়ে যদি বাধিয়ে দেয় হুড়োহুড়ি—তবে আশ্চর্যের কথাটা এমন কি?

এই আবহাওয়ার মধ্যে আমি ভালো ছেলেরূপে ফার্স্ট ইয়ারের তিন-চার মাস দিলাম কাটিয়ে। এর মধ্যেই নির্মলাকে নিয়ে ক্লাসে অনেক কিছু হয়ে গিয়েচে। ধনী ছাত্র শশধর মুহুরী নির্মলার সংগে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করতে গিয়ে সেই চ্যালেঞ্জপূর্ণ উগ্র দৃষ্টির সামনে এতটুকু হয়ে গিয়েচে। আরও কয়েকটি ছাত্র চোখরাঙানি খেয়েছে রীতিমত। অথচ ওরাই মহামায়াকে বা সুনীতিকে নিয়ে মোটরবিহার করতো, কলেজ রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে একসংগে খেতো, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সংগে করে ট্রামে উঠতো।

আমার কি ছিল, ক্লাসে এসে নির্মলার দিকে চেয়ে থাকতাম যখনই সুবিধে হোত চেয়ে দেখবার। ভয় হোত, বুক ঢিপ-ঢিপ করতো, পাছে নির্মলা কিছু মনে করে। একদিন আমি ওর দিকে চেয়ে আছি, ওর সংগে চোখাচোখি হয়ে গেল। সেও এক অপ্রত্যাশিত ধরনের আশ্চর্য ব্যাপার! আমি ওর দিকে চাইতে গিয়ে দেখি ও-ও আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার আগে থেকেও ও আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার সারা শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কেন নির্মলা আমার দিকে চেয়ে আছে?

আমাকে কি ওর ভাল লাগে?

নইলে কেন আমার দিকে চাইলে ও!

আমার চেহারা বলতো সকলে ভালো। চিরকাল শুনে এসেচি এই কথা আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মুখ থেকে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখেও খারাপ মনে হয় নি কোনোদিন। দেখতে ভালো বলে বিয়ের সম্বন্ধও দু-একটি আসতে আরম্ভ করেছিলো বড় ঘর থেকে। আমাদের অবস্থাটা ভালো, কলকাতায় তিন-চারখানা বাড়ী, ভাড়া থেকে মাসিক আয় হোত মন্দ নয়। তারপর আমিও স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে। পড়াশুনোয় নামকরা ভালো ছেলে। বিয়ের সম্বন্ধ আসবার অপরাধ কি?

একদিনের কথা আমার আজও মনে আছে।

শ্রাবণ মাসের দিন। কেমিস্ট্রি ক্লাস থেকে বেরিয়ে মাঠে নেমেচি, উদ্দেশ্য কলেজ-রেস্টুরেন্ট থেকে এক পেয়ালা চা খেয়ে নেবো, এমন সময়ে হঠাৎ আমার পেছনে কে মৃদু-স্বরে ডাকলে—

—শুনুন—

আমি চমকে উঠে পেছনে চাইলুম।

নির্মলা!

নির্মলা আমায় ডাকচে!

আমি এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম। না, আর কেউ কোনোদিকে নেই তো? আমাকেই ডাকচে বটে।

আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম—আমাকে ডাকচেন!

নির্মলা বোধ হয় আমার আনাড়ি ও আড়ষ্ট ভাব দেখে হাসতে যাচ্ছিল, হাসির রেখা ওর মুখে ফুটে উঠে তখুনি মিলিয়ে গেল।

বললে—আপনাকেই ডাকচি—

—ও, বলুন—

—আপনি প্রফেসার গুপ্তের নোট টুকেচেন?

—হ্যাঁ, টুকেচি।

—খাতাখানা কাইন্ডলি দেবেন একদিনের জন্যে? কালই ফেরত দেবো।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! এই নিন। আপনি যে ক-দিন ইচ্ছে রাখতে পারেন।

—না, আমি কালই ফেরত দেবো। থ্যাঙ্কস।

আমি যে সময় ওর হাতে খাতা দিচ্ছি, ঠিক সেই সময় আমাদের ক্লাসের বিশ্ববখাটে ছোকরা সোমেশ্বর গুহঠাকুরতা অদূরে আবির্ভূত হোল, কোথা থেকে কি জানি!

পায়ের শব্দে নির্মলা খাতা নিতে নিতে যেন চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকালো। পরক্ষণেই খাতা নিয়ে আর কোনো কথা না বলে হন হন করে চলে গেল।

সোমেশ্বর আমার কাছে এসে দাঁত বের করে হেসে বললে—কি বাবা ভালো ছেলে, ডুবে ডুবে জল খাওয়া?

আমার রাগ হোল, লজ্জাও হোল। সোমেশ্বরের সঙ্গে আমার এমন কিছু ঘনিষ্ঠতা নেই। অত ঘন-ঘন সিগারেট খাওয়া দেখে আমি ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করতে ঘৃণা করতাম। ওরাও ভালো ছেলে বলে আমায় ঘৃণা করতো। সব কলেজেই বখাটে ছেলেরা ভালো ছেলেদের ঘৃণা করে থাকে।

আমি বললাম—কি?

—মানে ধরে ফেলেচি। নির্মলা সরকারের সঙ্গে জমালে কবে থেকে তলায়-তলায়?

—হুঁ হুঁ বাবা—হাতে-হাতে ধরে ফেলেচি আজ—

—কি বলচেন বাজে কথা? উনি আমার কাছে আজই কেমিস্ট্রির নোট চেয়ে নিলেন।

—আজই? মানে আজই? সোমেশ্বর শর্মা যেদিন দেখে ফেলেচে সেই দিনই?

—সত্যি বলচি।

—বেশ বাবা বেশ। তবে বলে দিচ্চি, বেশি ওদিকে নজর দিও না। হরিপ্রসাদকে চেনো তো? হরিপ্রসাদ ডুয়েল লড়বে তোমার সঙ্গে। সে বড়লোকের ছেলে. নির্মলার জন্যে সে নিজের জমিদারী বিলিয়ে দেবে বলেচে। পয়সা খরচ করতে সে হটবে না।

—বাপের জমিদারী আমারও আছে জেনে রাখবেন।

কথা শেষ করে আমি রেস্টুরেন্টের দিকে চলে গেলাম। ওদের মত ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা-কাটাকাটি করতে আমি ঘৃণা বোধ করি। কলেজ থেকে বের হবে একটা নির্জন স্থান খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলুম গড়ের মাঠে। চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে কতক্ষণ ভাবলাম আজকের কথাটা। নির্মলা সরকার কি ধরনের মেয়ে আমি জানি। সে দেবী, আমার চোখে অতি পবিত্র। তার নামে কেউ কিছু বললে আমার সহ্য হয় না। এতো মেয়ে তো আছে কলেজে কিন্তু ওকে আমার অত ভাল লাগে কেন? এর জবাব নেই।

সেই নির্মলা আজ আমার সঙ্গে কথা বলচে? নিজের থেকে? নোট চেয়ে নিয়ে গেল? কেন আমারই নোট নিয়ে গেল, কলেজে তো কত ছেলে রয়েচে? ভালো ছেলে বলে নিয়ে থাকে যদি! মধুপ্রসাদ বা মাধোপ্রসাদ বলে একটি জৈন ছাত্র নাকি আমার চেয়ে ভালো—অবিশ্যি এটা শুনেচি আমি তাদের কাছে, যারা ক্লাসে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারলে খুশী হয়। যাই হোক সে রয়েচে তো?

আজ কি সুন্দর দিনটি আমার! কার মুখ দেখে না-জানি উঠেছিলাম!

পরদিন রবিবার নেশার ঘোরে সারাদিন কেটে গেল। আমার মনে সেই এক ভাবনা—নির্মলা আমার সঙ্গে ডেকে কথা বলেচে। ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না। চলে যাবো বহুদূর বিদেশে। অনেকদিন পরে ফিরে আসবো। ওকে দেখিয়ে দেবো আমি কত বড় ত্যাগী। হঠাৎ আমায় দেখে ও অবাক হয়ে যাবে।

এসব সঙ্কল্প অবশ্য সঙ্কল্পই থেকে গেল। সোমবার ক্লাসে আবার ওর সঙ্গে দেখা হোল। সহজভাবেই ও আমার খাতা ফেরত দিলে এবং আমিও সহজভাবে নিলুম।

এর পরে মাঝে মাঝে ও আমার কাছ থেকে খাতা নিয়ে যায়। আবার ফেরত দেয় দু-তিন দিন পরে। আমি ভাবি ওকে একদিন নির্জনে দেখা করতে বলবো। কিন্তু খাতা ফেরত নেবার সময় মুখ শুকিয়ে যায়, বুক ঢিপ ঢিপ করে, কোনো কথাই মুখ দিয়ে বেরোয় না। কোনো একটি কথাও বেরোয় না। সহজভাবে আমি ওর সঙ্গে ব্যবহার করতে পারি নে দেখলুম। সহজভাবে চলতে চেষ্টা করি, বাইরে দেখাই সম্পূর্ণ সহজভাবেই চলছে—কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভয়ানক আড়ষ্ট ও মুখচোরা হয়ে যাই। জিভ শুকিয়ে আসে কেন কে বলবে? বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ যেন ও শুনতে পাবে মনে হয়। কিসের একটা ঢেউ গলা পর্যন্ত পৌঁছে গলার স্বর আটকে দেয়।

গোটা ফার্স্ট ইয়ার এভাবে কেটে গেল।

অন্য কোনো মেয়ের দিকে আমার মন নেই, তাদের মধ্যে অনেকে কথা বলে আমার সঙ্গে। অত্যন্ত সহজভাবে তাদের সঙ্গে মিশি। দু-একজনকে চা-ও খাওয়াই কলেজের মধ্যে ও বাইরে। কিন্তু নির্মলার বেলা সব গোলমাল হয়ে যায়।

কিন্তু এসব তো সাধারণ কথা।

আসল ব্যাপার হচ্ছে আমার প্রতিদিনের ভীষণ বেদনা ও মনোকষ্ট। সে যন্ত্রণা দিন দিন আমার বাড়চে। ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে যাচ্ছি। অথচ কাউকে বলতে পারি নে সে দারুণ যন্ত্রণা। সকাল থেকে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করি সে সময়টির, আবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে।

আটটা বাজলো। এখনো তিন ঘণ্টা। এগারোটায় ক্লাস।

দশটা বাজলো অমনি শুরু হলো। কিছুতেই মনকে শান্ত করতে পারি নে।

প্রতিদিন ভাবি, আজ কলেজ গিয়ে ওর সঙ্গে সব কথা খুলে বলবো। কিম্বা আশা করি ও আজ হয়তো আমাকে বলবে, চলুন আপনি ও আমি বেড়িয়ে আসি। কিছুই ঘটে না কোনোদিন।

কি যে সব যন্ত্রণার দিন আমার গিয়েচে, এখনো মনে করলে আমার হৃৎকম্প হয়। ভগবানের কাছে বলি, অমন অবস্থা যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়। পুরো দেড়বৎসর সহ্য করলাম সে যন্ত্রণা।

সেকেণ্ড ইয়ারে উঠে ঠিক করলাম মেডিকেল কলেজ ছেড়ে দেবো। এরকম যন্ত্রণা আর বেশি দিন সহ্য করতে পারবো না। অসহ্য হয়ে উঠেচে আমার পক্ষে। সত্যই অসহ্য হয়ে উঠেচে।

বাড়ীতে বলে সব রাজি করলুম। বললুম ডাক্তারি পড়ায় মন নেই আমার। এবার মড়া-কাটা শুরু হবে। মড়া-কাটা আমার দ্বারা হবে না। ছেড়ে দেবো মেডিকেল কলেজ। বি-এসসি পড়বো।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটলো একদিন।

আমার একটা নোটবই চার-পাঁচদিন হোল নির্মলার কাছে ছিল। হঠাৎ ভাবলুম ওর হোস্টেলে গিয়ে খাতাখানা নিয়ে আসবো। খুব দুঃসাহসিক সংকল্প। মেডিকেল কলেজের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই মেয়েদের হোস্টেল।

বেলা সাড়ে চারটে। কিছুক্ষণ আগে য়্যানাটমির ক্লাস শেষ হয়েচে। দেওয়ান বাহাদুর হীরালালবাবুর নাম-করা ক্লাস, টুঁ শব্দটি করবার যো ছিল না কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর। ফিরিঙ্গি ছাত্রগুলো পর্যন্ত চুপ করে থাকতো।

গার্লস হোস্টেলের দরজায় যেতেই দরোয়ান বললে—কাকে খুঁজচেন বাবু?

আমি বললাম—মিস নির্মলা সরকার, সেকেণ্ড ইয়ার।

—নামঠো লিখ দিজিয়ে বাবু ইস স্লিপ মে। মেট্রনকো পাস লে যানে হোগা।

দরোয়ান স্লিপ নিয়ে চলে গেল মেট্রনের কাছে। আমার বুকের মধ্যে ততক্ষণ বিরাট তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েচে। মুখ শুকুতে আরম্ভ করেচে। মনকে বোঝালুম, কেন! আমি তো ছেড়েই যাচ্চি কলেজ। নির্মলার জন্যে আসি নি। আমি এসেচি আমার

নোটবই নিতে। নির্মলার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? বা রে, আমার নোট-বই আমি চেয়ে নেবো না? এতে আর কি হয়েচে? নির্মলা কিছু মনে করে করুক।

একটু পরে দরোয়ান দেখি ফিরে আসচে। আমার বুকের মধ্যে যেন গর্ত হয়ে খানিকটা বসে গিয়ে একটা ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি হোল হঠাৎ। দরোয়ান কি বলবে? নির্মলা বিরক্ত হয়ে হয়তো বলে পাঠিয়েচে, এখানে কেন? কাল ক্লাসে দেখা করবেন। ভারি বিরক্ত হয়েচে আমার ওপর। আমার নোটবইয়ে আমার দরকার থাকতে পারে না? জরুরী দরকার থাকতে পারে না? তুমি এনেছিলে কেন আমার নোট-বই? বেশ তো?

দরোয়ান এসে বললে—আইয়ে বাবু। ভিজিটার্স রুমমে বৈঠিয়ে।

ভিজিটার্স রুমে বসতে বলে যে! 'তাহোলে নির্মলা চটে নি? না, তা কেন চটবে? চটবার কি আছে এর মধ্যে?

ভিজিটার্স রুমে গিয়ে বসবার একটু পরেই একখানা ফিকে নীলরঙের শাড়ী পরে স্যান্ডাল পায়ে দিয়ে নির্মলা হাসিমুখে ঘরে ঢুকলো। পিঠে চুল খুলে এলিয়ে দেওয়া। ক্লাস থেকে ফিরে স্নান করেচে।

ও ঘরে ঢুকে বললে—কি ব্যাপার? আপনি যে হঠাৎ?

আমার মনের অবদমিত আবেগ যেন উত্তাল হয়ে উঠলো বুকের মধ্যে। এখানে তো কেউ নেই। নির্মলা—নির্মলা সরকার আমার সামনে। শুধু দু-জন এই ঘরের মধ্যে। কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই। বলে ফেলি। এমন সুযোগ জীবনে আর আসবে না। দেড় বৎসরের মধ্যে মহা প্রতীক্ষিত সেই পরম শুভ মুহূর্তটি আজ সমাগত এই মেয়েদের হোস্টেলের নির্জন ভিজিটার্স রুমে। ছেড়ো না এ সুযোগ। যা হয় হবে। হয় এস্‌পার—নয় ওস্‌পার।

আমি ওর চোখের দিকে চাইলাম। নির্মলাও আমার চোখের দিকে দেখি চেয়ে আছে। আমার মনে হোল, অবশ্য আমার ভুল হোতে পারে, তবে আমার আজও তাই ধারণা—যে ওরই চোখে সেদিন প্রতীক্ষার দৃষ্টি দেখেছিলাম। অতি অল্পক্ষণের জন্যে একথা আমার মনে হয়েছিল। তার পরেই ওর দিকে চেয়ে আমি বললাম—নোটবইখানা নিতে এসেচি—

—ও!

—কাল একবার ভেবেছিলুম আসবো—

নির্মলা আবার যেন প্রতীক্ষা ও আহ্বানের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে। দেবীর মত রূপ। কি উজ্জ্বল মুখ-চোখ, কি ঢেউ খেলানো কালো মেঘের মত একরাশ চুল। অপূর্ব রূপ ফুটেচে ওর। আমি চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। কেন চোখ নামিয়ে নিলাম? আজ আমার মনে হয় আমি ভুল করেছিলাম। মেয়েদের রূপ পুরুষের পুজোর জন্যে নয়। তাকে আকৃষ্ট করবার জন্যে। নির্মলা আশা করে এসেছিলো সেদিন। ওর আশা আমি ভঙ্গ করেছিলুম সেদিন—নিজের ভীরুতার জন্যে।

ও বললে—তবে এলেন না কেন!

—আসতে পারি নি শেষ পর্যন্ত, কাজ ছিল।

আর একটি আশ্চর্য কথা ও বললে। সে কথা ও যে আমাকে বলবে এমন আশা করি নি। তবুও বলি, এ কথার গুরুত্ব তখন তত বুঝি নি, পরে যত বুঝেছিলাম।

ও বললে—কাজ থাকলে বুঝি আমার কাছে আসা যায় না?

আমি শুধু বোকার মত হাসলাম।

নির্মলা আবার বললে—বলুন না?

—না-না-না—তাই দেরি হয়ে গেল কি-না?

আমার উত্তরের বিশেষ কোনো মানে হয় না। অসংবদ্ধ প্রলাপ।

—কিসের দেরি হয়ে গেল?

—না, দেরি হয় নি। এমনি বলচি।

—আপনি অদ্ভুত লোক।

—কেন?

—কেন? আপনাকে কি বোঝাবো। নিজে বুঝতে পারেন না? বসুন, আমি খাতাখানা আনি।

আমি তো বুঝতে পারলুম না, কিসে আমি অদ্ভুত লোক হোলাম। নির্মলার এ কথার মানে কি?

একটু পরে ও ফিরে এলো। এসে একটি অদ্ভুত কান্ড করলে। খাতাখানা আমার হাতে দিয়ে হঠাৎ ঈষৎ নিচু হয়ে যেন আমার দিকে এগিয়ে ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের ওপর দৃষ্টিপাত করে মুখ সরিয়ে নিলে। আর মুখ ফিরিয়ে নিয়েই সরে গেলো এবং খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

আমার মাথা ঘুরে উঠলো। গম্ভীর ও সংযত মেয়ে নির্মলা ক্লাসের মধ্যে। তার এ কি লীলা! আমি খাতা হাতে নিয়ে উঠে বললুম—তবে আজ আসি।

নির্মলার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, বললে—বসুন না?

—যাই। বেলা গিয়েচে। কাজ আছে বাড়ীতে।

—চললেন তা হোলে? ডিসেক্‌শ্যান রুমে দেখা হবে কাল তো?

—হ্যাঁ, যাই।

—কাল ডিসেক্‌শ্যান রুমে আসবেন তো ঠিক?

—আসবো।

নির্মলা ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এল। আমি টলতে টলতে বাইরে এলাম। বাইরে এসে বাড়ী যাবার পথে কতবার ভাবলাম নির্মলার এ অদ্ভুত আচরণের অর্থ কি? ও তো অতি গম্ভীর মেয়ে। অন্য কারো সঙ্গে তো কথাই কয় না ভালো করে। আমাকে কি অন্য চোখে দেখে? কি জানি।

বাড়ীতে তখন আমার বিয়ের জন্যে খুব পীড়াপীড়ি চলচে। বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

নির্মল আমার চোখে ও মনে জ্বলজ্বল করচে। অন্য মেয়েকে ওর আসনে বসাতে হবে?

নির্মলা খুব বড়লোকের মেয়ে। অভিজাত ও উচ্চশিক্ষিত পরিবারের মেয়ে ও। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেচি। ওকে পেতে যাওয়া মানে বামন হয়ে চাঁদে হাত। আমার মত একজন নগণ্য ছেলেকে মেয়ে দেবে—ওর মা-বাপ?

আমি কলেজ ছেড়ে দিলাম...

কলেজে তিলে তিলে দগ্ধ হোতে পারবো না আমি। মেডিকেল কলেজে মড়া-কাটা আমার দ্বারা হবে না।

বি-এসসি পড়লুম, প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেলুম। এম-এসসিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বটে, কিন্তু সেবার আমার বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে কেউ ছিল না।

কলকাতায় একটা কলেজের অধ্যাপকের চাকরি জুটে গেল সহজেই। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া কঠিন হোত না, কিন্তু আমি নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাতে চাই জীবন। পয়সার অভাব নেই আমার ভগবানের ইচ্ছায়। কার জন্যেই বা অত খাটতে যাবো? না বিয়ে-থাওয়া, না ছেলেপুলে, বেশ আছি।

নির্মলার কথা ভুলি নি। তার জন্যেই বিয়ে করতে পারলুম না। এ যে কি টান, কি মোহ, কি করে বলবো। মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারলাম কই?

নির্মলার বিয়ে হয়েছিল একজন বিলেত-ফেরত ডাক্তারের সঙ্গে। নিজে সে একজন লেডি ডাক্তার। একবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিভাবে তা বলি।

লেডি ডাফরিন হাসপাতালে নির্মলা তখন কাজ করে, আমি জানতাম।

রোজ কলেজ থেকে বেরিয়ে লেডি ডাফরিন হাসপাতালের কাছে এসে মুখ উঁচু করে করে দাঁড়াই। সম্পূর্ণ অকারণে, কেন দাঁড়াই নিজেই তা জানি নে। কলেজের ছুটির পর পা দু-খানার গতি হয় লেডি ডাফরিন হাসপাতালের দিকে—আপনিই হয়।

যে সময়ের কথা বলচি, তখনও নির্মলার বিবাহ হয় নি।

একদিন ওই রকম অভ্যাসমত এসে দাঁড়িয়েচি স্কট্‌স্ লেনে, হাসপাতালের ঠিক নিচে। এমন সময়ে এল বর্ষা। সেটা ছিল আশ্বিন মাস। আমার কাছে ছাতি নেই—ছাতি বওয়া আমার অভ্যাস নেই। দাঁড়িয়ে ভিজচি, সরে যেতে ইচ্ছে করচে না, ভিজে যাচ্ছি তবুও কিসের আশায় চাতক-পাখীর মত আকুল আগ্রহ নিয়ে মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়েই অসাড়ে ভিজচি—বোধহয় সাধনার কঠোরতায় সিদ্ধি আসে সর্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের কাছ থেকে। তিনিই দক্ষিণ পাণি প্রসারিত করে অকপট সাধনার ফল হাতে-হাতে দেন। তাই শব-সাধনার এত নাম আমাদের দেশে। রাতারাতি সিদ্ধিলাভ!

শব-সাধনা টব-সাধনা যাক গে।

আমার ফল এল সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ভাবে। এখনও তা ভেবে অবাক হয়ে যাই।

হঠাৎ রাস্তার দিকের জানলা খুলে গেল হাসপাতালের দোতলায়। একটি মেয়ে উঁকি মেরে রাস্তায় আমায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখলে। আমি চিনলাম, সে নির্মলা।

নির্মলা কিন্তু আমাকে একবার দেখেই হাত দিয়ে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করেই জানলা থেকে তখুনি সরে গেল।

আমি তো অবাক। আমার রক্ত তখন দ্রুত স্রোতে বুকের দিকে ঠেলে উঠচে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। হাসপাতালের গেটের কাছে নির্মলা দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা ছাতি। আমি এগিয়ে গেলাম, কতকাল পরে দেখা। ও হাত জোড় করে বললে—নমস্কার, কোথায় আছেন, কি করচেন? কতদিন পরে দেখা—

—হ্যাঁ—ইয়ে—তাই—

—কি করচেন আজকাল?

—কলেজে প্রোফেসরি করি। ছুটির পরে এ পথে আসছিলাম, তাই, বৃষ্টি এল হাসপাতালের কাছে, ওই জায়গায়—তাই—

—এম-এসসিতে তো ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্ট করেছিলেন! বিলেত গেলেন না কেন? আপনি তো স্টেট স্কলারসিপ পেতেন—

—না, কি হবে গিয়ে?

পরক্ষণেই সংশোধন করে নিয়ে বললাম—বাবার শরীর খারাপ। আপনি এখানে কি করচেন?

—রেসিডেণ্ট হাউস সার্জেন। আমি তো আর বছর পাস করে বেরিয়েচি—

নির্মলার দিকে চেয়ে দেখলাম ভাল করে। বালিকার চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নেই ওর মধ্যে, এসেচে সুন্দরী পূর্ণ-যৌবনার দীপ্তি ও গাম্ভীর্য। একটু যেন মোটা হয়ে পড়েচে তবে আমারই চোখে পড়লো, অন্য কেউ হঠাৎ দেখলে ওকে মোটা বলবে না। মধুশ্রীতে পূর্ণিমার চন্দ্রের পূর্ণতা।

নির্মলাও দেখি আমার দিকে চেয়ে আছে। নির্মলা কি বুঝতে পেরেচে আমি রোজ ওর হাসপাতালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকি? আরও কোনোদিন দেখেচে নাকি?

আমি বললাম—ভালো আছেন?

—মন্দ নয়। আপনি মেডিকেল কলেজ ছাড়লেন কেন? ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছেলে ছিলেন তো।

আমি ওর কথা উড়িয়ে দেওয়া সূচক হেসে বললাম—ও কিছু না। কত ভাল ছেলে ছিল। আপনিও তো খুব ভাল ছাত্রী ছিলেন। আমার মড়া-কাটা পছন্দ হোল না।

ও খপ করে একটা প্রশ্ন করে বসলো। এ প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। বড় ব্যথা দিলে প্রশ্নটা করে—বিয়ে করেচেন?

—না। আচ্ছা—নমস্কার—

—দাঁড়ান, দাঁড়ান—ছাতিটা নিয়ে যান। ভিজচেন দেখে ছাতিটা নিয়ে এলাম। কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

চলে এলুম ছাতি নিয়ে। নিজে যাই নি। ছাতি অন্যের হাত দিয়েই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

এর পরের বছরই কি সেই বছরই নির্মলার বিবাহের সংবাদ পাই। এর পরে নির্মলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল আর একটিবার।

আমহার্স্ট স্ট্রীট বেয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি। হঠাৎ একটা মোটর দাঁড়িয়ে গেল পাশে।

নারীকণ্ঠে কে বললে—এই যে, নমস্কার—। চেয়ে দেখি নির্মলা। বেশ মোটা হয়েছে। আমার লজ্জা হোল হঠাৎ এভাবে ওর সঙ্গে দেখা হওয়াতে। কারণ আমিও মেদবৃদ্ধির পথে কম অগ্রসর হই নি। ওর চেয়ে দু-জনের পাল্লোপাল্লিতে বোধহয় আমিই জিতবো।

—কোথায় যাচ্ছেন? আসুন গাড়ীতে—উঠুন—

ও একাই ছিল গাড়ীতে।

—না, আর গাড়ীতে উঠবো না। ধন্যবাদ। এই তো সুকিয়া স্ট্রীটে যাবো—

—গাড়ীতে আসুন না? নামিয়ে দেবো ওখানে—সুকিয়া স্ট্রীটের কোথায় বলুন।

—না না থাক, থ্যাংকস্—ওই তো পাশের গলি, মোড়ের মাথায়। কতটুকু—নমস্কার—

নির্মলা আমার দিকে কেমন যেন একপ্রকার করুণা ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে চাইছিল, সেটাই আমার অসহ্য হোল। আর দাঁড়াতে পারলুম না। নিজে মোটা হয়েচি বলে লজ্জাও হোল ওর সামনে দাঁড়াতে।

এর পর আর ওর সঙ্গে দেখা হয়নি।

*　　　　*　　　　*

সে আজ বহু বৎসরের কথা। সতেরো-আঠারো বছর আগের কথা। দিন যায় যত, নির্মলার কথাও তত ভুলি। ক্রমে নির্মলার ছবিও অস্পষ্ট হয়ে এসেচে।

এমন সময় সেদিন এক ব্যাপার হয়ে গেল। মাস-খানেকও হয় নি।

মাদের কলেজে বি-এস্সি প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা হচ্চে। অন্য কলেজের কয়েকটি মেয়ে পরীক্ষা দিচ্চে। মেয়েদের পরীক্ষা আমি তত্ত্বাবধান করচি ও পাহারা দিচ্চি সেই রুমে।

একটি মেয়েকে দেখেই আমার মন ছাঁৎ করে উঠলো। আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। এর মুখ আমার সুপরিচিত। মনে হোল অনেকদিন আগে একে চিনতাম। আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে ভাবচি একে কোথায় দেখেছিলাম প্রথম যৌবনের কোন দিনে।

হঠাৎ আমার চমক ভাঙলো। কি মনে করবে। আমি প্রৌঢ় অধ্যাপক। ওরা অন্য কলেজের মেয়ে, আমাকে চেনে না, কি ভাবতে পারে।

মেয়েটির ব্যাপার দেখে বুঝলুম সে ফাঁপড়ে পড়েচে। দুটি প্রশ্ন আছে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের। একটি হিস্টোলজির, অপরটি মরফোলজির। মেয়েটি একটি লতার অংশ সরু করে কেটেচে। কিন্তু কিছুতেই সেটাকে রাঙাতে পারচে না। তিনবার, চারবার ধরে চেষ্টা করলে। ওর হাত কাঁপচে, চোখে জল টলমল করচে।

আমি দেখলুম মেয়েটি এ কাজ কখনো মন দিয়ে করে নি। সিনেমা দেখে বেড়িয়েচে, ক্লাসে ফাঁকি দিয়ে এসে এখন নিজেই ফাঁকে পড়ে গিয়েচে!

কাছে গিয়ে বললুম—কি হচ্চে খুকী?

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো সুরে বললে—সেকশানটা স্টেইন্ নিচ্চে না—জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে—

আমি হেসে বললাম—তুমি কোন্ কলেজের স্টুডেন্ট?

—স্কটিশচার্চ।

—সেকশান কাটতে শেখো নি তো? অত মোটা করে সেকশান কাটে? তাছাড়া দেখচো না এ লতায় লাল হড়হড়ে আঠা রয়েচে। ওটা অ্যালকোহলে ধুয়ে না নিলে কখনো স্টেইন্ নেয়? ওটা অ্যালকোহলে ওয়াশ করে নাও।

মেয়েটি আমার কথায় অ্যালকোহলে ধুতে গেল। কিন্তু মা লক্ষ্মী দেখলুম সিনেমা

দেখেই কাটিয়েচেন। লেখাপড়া কিছুই করেন নি।

বললাম—ও কি হচ্চে? তুমি অ্যালকোহলে ধুতে জানো না? গ্রেডে তোলা—নইলে সেকশানটা গলিয়ে যাবে যে। আগে কুড়ি, তারপরে পঞ্চাশ, তারপরে সত্তর, তারপরে নব্বই—তারপর অ্যাবসলুট অ্যালকোহলে তোলো—

—কেন, লাইজল দিয়ে ধুয়ে ফেলবো না?

—পাগল, লাইজল দিয়ে এখন ধোবে কেন? অ্যাবসলুট অ্যালকোহলে আগে তোলো।

ওর হাত কাঁপচে। কখনো একাজ করে নি। গ্রেডে তোলা কাকে বলে তাই ভালো করে শেখেনি হাতে-কলমে করতে, আমার মায়া হোল। বললুম—ছেড়ে দাও খুকী—তুমি মরফোলজির কোশ্চেনটা ট্রাই করো—আমি দেখচি—

আমি ল্যাবরেটরীর হেড য়্যাসিস্টাণ্ট নরেনকে ডাকলুম। নরেন আমারই ছাত্র, প্র্যাকটিকাল কালে ঘুণ। তাকে বললাম—নরেন, এই সেকশানটা মাউণ্ট করে নিয়ে এসে দাও তো?

নরেন আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে সেকশানটা হাতে নিয়ে চলে গেল। হয়তো ভাবলে প্রৌঢ় অধ্যাপকের এ দুর্বলতা কেন? সুন্দরী মেয়ে দেখে তাকে পরীক্ষায় বে-আইনি সাহায্য করচেন?

একটু পরে নরেন বেশ চমৎকার ভাবে নিপুন হস্তে সেকশানটা স্লাইডের ওপর বসিয়ে কানাদা বালমম্ দিয়ে বন্ধ করে আমার হাতে এনে দিলে। আমি নিয়ে গিয়ে বললাম—এই নাও খুকী।

তার প্রশ্নের উত্তর বে-আইনি ভাবে পেয়ে মেয়েটি কৃতজ্ঞতামূলক হাসলে। অনেকদিন আগে এ হাসি কোথায় দেখেচি। এ হাসি আমার কুয়াসাচ্ছন্ন জীবন-দিনের প্রথম অরুণ-রাগের হাসি। বিস্মৃত অরুণরাগের সে শুভ ক্ষণটি আজও কি ভুলেচি?

মৃদু কৌতূহলের সুরে প্রশ্ন করলুম—তোমার নাম তো নীলিমা বসু লেখা রয়েচে—তোমাদের বাড়ী কোথায়?

—লোয়ার সারকুলার রোডে, ডাক্তার বিভাস বসুকে চেনেন?

—ডাক্তার বি. বসু—আই-স্পেশালিস্ট?

—হ্যাঁ, তিনি আমার বাবা।

—ও।

আমার মাথা ঘুরে উঠলো। ডাক্তার বিভাস বসু নির্মলার স্বামী।

মেয়েটি হেসে বললে—আসবেন আমাদের বাড়ী। বাবা বড় খুশী হবেন।

ডালুর বিপদ

মস্তবড় কাঠের নৌকাটা সারা গ্রামের বালক-বালিকাদের নিকট একটি বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছে গত কয়েকদিন হইতে। চালানি কাঠের নৌকা, বড় বড় গুঁড়ি পড়িয়া আছে নদীর ধারে, হাতীর মত বড় বড় গুঁড়ি। কয়েকদিন হইতেই দেখিতেছে ডালু। মা হাঁক দেয়—ও ডালু, সাণ্টু মুড়ি খেয়ে যা—উহাদের দুজনের পাত্তা নাই।

মা বলে—ওরা বসে আছে গিয়ে দ্যাখো সেই নদীর ধারে। শুধু খাবো আর গাঙের ধারে টো-টো করবো। কি বিপদেই পড়েচি এদের নিয়ে!

কিন্তু নৌকার মোহ হঠাৎ এদের পরিত্যাগ করে না। নদীর ধারে যেখানে ঝিঙের ক্ষেতে বর্ষাকালের সন্ধ্যায় ফুল ফুটিয়া আলো করিয়া আছে, সেখানেই বড় নৌকাখানা বাধা।

দেখিয়া দেখিয়া ডালু-সাণ্টুর আশ মেটে না। অতবড় নৌকা গড়ায় কি করিয়া?

কারা গড়ায়? নৌকার গলুই-এর দু পাশে দুটি বড় বড় পেতলের চোখ। তার একটু ওপরে সিঁদুর লাগানো। ডালু সান্টুকে বলে—নৌকো দেখলি?

—মস্ত বড়—আচ্ছা, ঐখানে চোখ কেন? নৌকো কি দেখতে পায়, দাদা?

—দূর বোকা! ও অমনি করে রেখেচে! সব নৌকোর কি চোখ থাকে? থাকে না।

—কি করে জানলি?

—আমি তোর চেয়ে বড় যে! তুই কবে জন্মেচিস, আর আমি কবে জন্মেচি!

সেদিন নদীর নিচু পাড়ে বসিয়া দুই ভাই হাঁ করিয়া দুই চক্ষু ভরিয়া নৌকা দেখিতেছে। নৌকার মাঝি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কি নাম?

—ডালু।

—উটি কেডা?

—আমার ভাই সান্টু।

—কি জাত?

—ব্রাহ্মণ।

—বাড়ী কনে?

—এই গ্রামে।

—এসো, মোদের নৌকো দেখতি আসবা না?

ডালুর খুব ইচ্ছা নৌকা দেখিবার, কিন্তু মা যদি বকে! সাহস করিয়া উঠিতে পারিলে মজা হইত বটে, কিন্তু সাহস হয় না। এখন ঘাটে লোকজনের যাতায়াত, ইহাদের মধ্যে কেহ গিয়া মাকে বলিয়া দিতে পারে। এমন সময়ে আসিতে হইবে যখন ঘাটে কেউ থাকে না। ডালু উদাসীন সুরে বলিল—চল্‌রে সান্টু, বাড়ী যাই।

ভাইয়ের হাত ধরিয়া ডালু বাড়ী চলিয়া গেল।

পথের বাঁদিকে উঁচু ভাঙামত জায়গা, তাতে বড় বড় আম কাঁঠালের গাছ। কোনকালে এখানে ডিঙি-নৌকা আর বড় নৌকার কারখানা ছিল। অর্জুন মাঝির কারখানা। কত ধরনের ছোট নৌকা, বড় মহাজনী নৌকা এখানে তৈরি হইত আগে—ডালু কারখানা দেখে নাই, দেখিয়াছে অর্জুন মাঝিকে। মাজাভাঙা বাঁকাচোরা বুড়ো তেঁতুলতলার ঘাটে বসিয়া তামাক খায় আর মাছ ধরিবার দোয়াড়ি বোনে। কত ধরনের নৌকার গল্প ও নৌকা-ভ্রমণের গল্প করে অর্জুন বুড়ো। ওর মুখে গল্প শুনিয়া পর্যন্ত নৌকার উপর অত্যন্ত মোহ। বড় মহাজনী নৌকা দেখিলে সে যেন কেমন হইয়া যায়!

সান্টু বলিল—দাদা, যাবি নে নৌকো দেখতে?

—এখন না, সবাই চলে যাক্‌ ঘাট থেকে।

—ওরা নৌকোতে উঠতে বললে—উঠলি নে?

—মা বকবে।

—আমাকে নিয়ে আসবি তো?

—তুই আর আমি দু-জনেই তো আসবো। সন্দেবেলা।

সান্টুর ভাল লাগিল না প্রস্তাবটা। সন্দেবেলা এই নদীর ধারে আসা যায়? চিন্তে বাগ্‌দির ভিটের ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটাতে হাঁড়াকাটার মা থাকে, ছোট ছোট ছেলেকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গাছের মগডালে তোলে। সময়টা বড় খারাপ। সান্টু ভয়ের কথাটা দাদাকে বলিয়াই ফেলিল।

ডালু ধমক দিয়া বলিল—তুই বড্ড বোকা!

—কেন দাদা? আর তুমি বুঝি বোকা নও?

—তোর মত না।

দিনের বাকি সময়টা কোনোরকমে কাটিল। ডালু ভাবে কখন যে সন্ধ্যা হইবে, কখন নৌকা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যা আর হয় না, ডালুর মন ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। সান্টু অতশত বোঝে না। দাদা যেখানে, সেও সেখানে।

ডালু দু-গাছা ছিপ লইয়া সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক আগে নদীর ধারে গেল। সঙ্গে চলিল সান্টু। বড় নৌকাখানা সেখানে বাঁধা ছিল।

কাঠের নৌকার মাঝি বলিল—খোকা, নৌকো দেখবে নাকি?

ডালুকে দু-বার বলিতে হইল না। সান্টুকে লইয়া তখনি নৌকায় উঠিল।

নৌকার মধ্যে কত কি যে জিনিস! মস্ত নৌকার খোলে লোকেদের বসিবার ও শুইবার জায়গা! রান্নার জন্যে উনুন আছে, হাঁড়ি আছে। বড় একটা বিলিতি কুমড়ো দড়ির শিকেতে ঝুলানো।

মাঝিকে ডালু বলিল—তোমরা এখানে খাও?

—হ্যাঁ।

—কি রাঁধো?

—যা, পাই খোকা! আমরা গরীব লোক, কিনবার ক্ষ্যামতা নেই তো!

—আচ্ছা, তোমরা কত জায়গায় গিয়েচ?

—তুমি চিনবে না সে সব জায়গা। বরিশাল জেলার নাম শুনেছ? সেই বরিশাল জেলা।

—কি আছে সেখানে?

—হাঙর আছে, কুমীর আছে, দু-মুখো সাপ আছে। কত রকমের জানোয়ার আছে। লালমুখো বানর আছে। দু-মাথাওয়ালা তালগাছ আছে।

সান্টুর চোখ বিস্ময়ে ও কৌতূহলে ডাগর-ডাগর হইয়া উঠিল। এমন কথা সে কখনো শোনে নাই। লালমুখো বানর ও দু-মাথাওয়ালা তালগাছ না জানি দেখিতে কি রকম!

সে বলিল—তালগাছে হাঁড়াকাটার মা আছে?

—হ্যাঁ!

—হাঁড়াকাটার মা আছে তালগাছে?

—সে আবার কি?

ডালু বিজ্ঞের মত মুখখানা করিয়া বলিল—ও ছেলেমানুষ, ওর কথা ছেড়ে দাও। কি বাজে কথা বলচে।

মাঝি বলিল—মস্তবড় কুমীর আছে সেখানে, বুঝলে? তেমন কখনো দেখো নি।

ডালু বা সান্টু কোনোদিন একটি অতি ক্ষুদ্র গিরগিটির মত কুমীরও দেখে নাই, মস্তবড় কুমীর তো দূরের কথা! দু-জনেই চুপ করিয়া রহিল।

একজন বুড়ো মাঝি নৌকার গলুইতে বসিয়া বেগুন কুটিতেছিল। সে বেগুন-কোটা ফেলিয়া রাখিয়া এদিকে আগাইয়া আসিয়া বলিল—ও কি শুনচো খোকাবাবুরা? আমি নিজের চোখে যা সাপ দেখেচি সুঁদরবনের—

ডালু ও সান্টু উভয়েই অধীর আগ্রহে বলিল—কত বড়?

—তালগাছের মত মোটা।

ডালু বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—উঃ রে! আর কত লম্বা?

—হাত ত্রিশ-চল্লিশ।

ডালু বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল! এতবড় সাপ হয়, কেউ কখনো শোনে নাই। সুন্দরবনের কাণ্ডই আলাদা! সত্যই কি আশ্চর্য দেশ!

বুড়ো মাঝি গল্প করিতে লাগিল—সেসব সুন্দরবনে সুঁদরি কাঠ আনতি গিয়েছিলাম। চোরামুখোর কাছারি থেকে তিন ভাটি গেলে তবে ভাঙনডাঙার জঙ্গল, রানীতলার জঙ্গল, বড্ড ভারি জঙ্গল।

—তারপর—

এখানে বৃদ্ধ গল্প বন্ধ করিয়া তামাক সাজিতে আরম্ভ করিল। ডালু-সান্টুর আর সহ্য হয় না, তামাক খাইবার কি এই সময়?

ডালু অধীর আগ্রহের সুরে বলিল—তার পর?

—তারপর আমরা খালে নৌকো নোঙর করে ভাঙনডাঙার জঙ্গলে গিইচি মৌচাক ভাঙতি। একটা তালগাছের গুঁড়ির মত জিনিস এক জায়গায় পড়ে আছে। তার ওপর লতাপাতা। আমরা হেঁটে হেঁটে গিইছিলাম। যেমন বসলাম, অমনি দেখি নড়ে উঠেচে! ও মা তারপরে দেখি সরে সরে যাচ্চে গাছের গুঁড়িটা। তখন দেখি গুঁড়ি নয়। মস্তবড়

সাপ নড়চে। তখনি দেলাম ছুট। হাঁ করে নিঃশ্বেস ফেলে সেই সাপে। নিঃশ্বেস টানার জোরে ছোট ছোট জানোয়ার এসে ওর মুখের মধ্যি ঢুকে যায়।

—তারপর কি হোল হ্যাঁগো?

—আবার কি হবে! পালালাম মোরা সোজা। আর কি সেখানে দাঁড়াই? বাঘও দেখিচি বড় বড়—কিন্তু বাঘের চেয়েও বড্ড ভীষণ জানোয়ার খোকাবাবুর।

—কেন? বাঘের চেয়েও ভয়ানক?

—সাপ যে নিঃশ্বেসে টেনে নেয় কিনা? ঘাপটি মেরে থাকে জলের ধারে ঝোপঝাড়ের আড়ালে। কেউ টের পায় না আগে থেকে, হঠাৎ টেনে নেয়। পাকে-পাকে জড়িয়ে ওর হাড়গোড় গুঁড়ো-গুঁড়ো করে ফেলে বাবু! পিন্ডি পাকিয়ে দেয় একেবারে।

বাহিরে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল। কেরোসিনের টেমিটা টিম-টিম করিয়া জ্বলিতেছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় নৌকার খোল প্রায় ভরিয়া আসিল। ডালুর গা যেন শিহরিয়া উঠিল! তাহার কেমন ভয়-ভয় করিতেছে, এখানে এ সন্ধ্যায় না আসিলেই হইত। হঠাৎ সে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

যখন ঘুম ভাঙিয়ে, সে দেখিল নদীর ধার হইতে কিছু দূরে একটা আম-কাঠের বড় গুঁড়ির উপর শুইয়া আছে। ডালু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। এখানে সে কেমন করিয়া আসিল?

সে দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া লইল। রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে মাথার উপর বাদুড় ঝটপট করিতেছে, তারাভরা আকাশ। সে এখানে কেন? নৌকা কোথায়? সান্টু কোথায়? ডালু ছুটিয়া গেল নদীর ধারে। ওই তো সেই বেনার ঝোপ নদীর পাড়ে। ওইখানেই ওই বেনার ঝোপের মধ্যেই তো লোহার বড় নোঙর ফেলিয়া নৌকাটি দাঁড়াইয়া ছিল! সে নৌকা তো নাই! সান্টু কোথায়? ডালু ভাইয়ের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—সান্টু—উ-উ-উ—ও-ও সান্টু—উ-উ—কেহ উত্তর দিল না। নৌকাই নাই, উত্তর দিবে কোথা হইতে! ডালুর বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়িতে লাগিল।

নৌকাওয়ালা সান্টুকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহাকে নামাইয়া দিয়া ভাইটিকে লইয়া পলাইয়াছে। ছোট ভাইটিকে মারিয়া ফেলিবে হয়তো! ডালু ছুটিতে ছুটিতে আসিল। ডালুর মা রান্নাঘরে কি কাজ করিতেছেন। ডালুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—এসো তোমার পিঠের ছালচামড়া তুলি। বের করচি তোমার পাড়া বেড়ানো। সান্টু কই?

ডালু বলিল সব কথা। কাঁদিয়া বলিল—মা, সান্টুকে ওরা চুরি করে নিয়ে গিয়েচে। মেরে ফেলবে। সে কি ভীষণ কান্না! কান্নার বেগে ডালু ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মাও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

এমন সময় বুকের পাঁজরে ঘা খাইয়া ডালুর কান্না থামিয়া গেল।

সে চাহিয়া দেখিল, বুড়ো মাঝিটা তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি বলিতেছে। সেই দাড়িওয়ালা বুড়ো মাঝিটা। ডালু বলিয়া উঠিল—সান্টু—আমার ভাই সান্টুকে কোথায় নিয়ে গিয়েচ?

—অ্যাঁ?

—চালাকি করো না! আমার ভাই সান্টু—কোথায় সে? মেরো না ওকে।

—আরে খোকাবাবু বলে কি? ঘুমের ঘোরে কি রকম গোঙাচ্চে আর বিড়বিড় করচে। এখনো ঘুমের ঘোর কাটেনি দেখচি!

নৌকার ও-খোল হইতে একজন মাঝি বলিয়া উঠিল—চাকি জল দাও। ছেলেমানুষ স্বপন দেখেচে।

ডালু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।—সেই নৌকা। সেই নৌকার খোল। সেই বৃদ্ধ মাঝি তাহার সামনে। ওই তো সান্টু ঘুমাইতেছে! সান্টুই তো! সে ডাকিল—এই সান্টু, ওঠ্ ওঠ্! দুই ভাই নৌকা হইতে নামিল। মাঝিরা বলিল—কি ঘুম রে বাবা! ছেলেমানুষ সব। যাও খোকাবাবুরা। সাবধানে বাড়ী যাও। বড্ড অন্ধকার।

পথে আসিয়া ডালু ঠাস করিয়া ছোট ভাইকে এক চড় কষাইয়া বলিল—কেবল ঘুম,

কেবল ঘুম! বাঁদর কোথাকার! আবার তোমাকে কোনোদিন সঙ্গে নিয়ে আসবো, এসো আবার।—ঘুমুলি কি বলে নৌকার মধ্যে তুই?

চ্যালারাম

দিল্লীর এক পার্কে চ্যালারামের সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

ভীষণ জোয়ান, পুরো ছ-ফুট দু-ইঞ্চি লম্বা, হাতের কব্জি এই মোটা, এই গোঁফ দাড়ি। এই বুকের ছাতি। কথায়-কথায় জানতে দেরি হোল না যে চ্যালারাম একজন অসাধারণ লোক। তাঁর মুখের ভাব এমনি যে, দেখলে মনে হয়, জীবনের অনেকখানি এ দেখেচে। এমন ব্যাপার ঘটেচে এর জীবনে, যা সচরাচর মানুষের জীবনে ঘটতে দেখা যায় না।

তার ওপর মুশকিল হয়েচে আমরা বাঙালী, আমাদের জীবনে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এত সংকীর্ণ! তবুও অমৃতসরে, দিল্লীতে, করাচীতে, ডেরাগাজিখাঁতে যারা জন্মায়—তারা অনেক কিছু দেখে অনেক কিছু করে। আমরা যারা খুব কিছু করি, বাপের পয়সার খই ছড়াতে ছড়াতে বিলেতে গিয়ে উঠি। আমাদের চেয়ে মাদ্রাজী, তেলেগু, নোয়াখালি ও চাটগাঁয়ের মুসলমানেরা ভালো—তারা তবুও পাঁচটা দেশ দেখে, জাহাজের খালাসী-টালাসী হয়, যা হোক তবুও কিছু।

চ্যালারাম আমার কৌতূহল আকৃষ্ট করবে বেশী কথা নয় যখন সে প্রথমেই বললে সে ফ্রান্সে গিয়েছিল যুদ্ধের সময়, যুদ্ধ শেষ হবার পরে সে আবার একটা কিসে ভর্তি হয়ে মেসোপটেমিয়ায় যায়। মরুভূমিতে আরবদের হাতে পড়েছিল, টাইগ্রিসে নৌকোর বাচ খেলে এসেছে। বেবিলনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে চুরোট খেয়েচে।

আমি বললুম—তোমার জীবনে সকলের চেয়ে একটা বড় ঘটনার কথা বলো না, শুনি।

চ্যালারাম বলতে আরম্ভ করলে—

অমৃতসর জেলায় আমাদের বাড়ী। আমাদের গ্রামে সবাই এমন গরীব যে একজন একুশ টাকা মাইনে পেতো কলকাতায় কি কাজ করে—গ্রামের মধ্যে সেই ছিল বড় লোক ও বড় চাকরে। সে বলতো কলকাতায় সে পুলিশের দারোগা।

আমার স্বভাব ছিল দুঁদে ও নির্ভীক। আঠারো বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দিয়ে কিছু টাকা যোগাড় করে কলকাতায় এলাম। ভাবলাম, পুলিশের দারোগা যদি হঠাৎ না হতে পারি, হেড কনস্টেবল হওয়া কে আটকাবে?

কলকাতা এসেই ভুল ভেঙে গেল। গ্রামের সেই লোকটাকে খুঁজে বার করে দেখলাম সে এক বড়লোকের বাড়ীর দারোয়ান। সে আমার কলকাতায় থাকবার একমাসের খরচ দিতে চাইলে, যদি গাঁয়ে ফিরে কাউকে তার দরওয়ানী করার কথাটা বলে না বেড়াই। তারই পরামর্শে মোটর গাড়ীর কাজ শিখলাম। কিছুদিন কলকাতায় মোটর চালাবার পরে ইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধলো। আমি সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে করাচী ও সেখান থেকে গেলুম ফ্রান্সে। এসব দিনের অভিজ্ঞতা খুব চিত্রিত হোলেও বিস্তৃত বর্ণনা করার দরকার নেই! যুদ্ধ শেষ হবার পরে গ্রামে ফিরে গেলাম, কিন্তু বেশীদিন ভাল লাগল না। আবার একটা চাকরিতে ভর্তি হয়ে গেলুম মেসোপটেমিয়া। তিন বছর পরে মেসোপটেমিয়া থেকে ফিরে বম্বে এলাম। হাতে তখন কিছু টাকা হয়েচে, ভাবলাম একটা ট্যাক্সি গাড়ী কিনে বম্বে কি কলকাতার রাস্তায় চালাবো। কিন্তু দু-তিন দিন পরে একটা সরাইখানায় জনকয়েক পাঠান গুণ্ডার সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বেধে ছুরি মারামারি হোল। তাতে একজন পাঠান জখম হোল। আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধু ছিল। পুলিশের ভয়ে দু'জনে রাতারাতি বম্বে ছেড়ে চম্পট দিলাম।

অনেক বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে দু-জনে আমরা কোয়েটা হয়ে মরুভূমির পথে কাবুল

পেঁাছে গেলাম। তখন নতুন বাস ও লরি চলচে কাবুলে অনেক বড়লোকের মোটর হয়েচে। কিন্তু ভালো মোটর ড্রাইভারের সংখ্যা তত বেশী নয়। আমাদের মোটর চালানোর কাজ পেতে দেরি হোল না।

কয়েক বছর কেটে গেল। বেশ সুখেই আছি! আগের পয়সা হাতে ছিল, সেই পয়সায় নিজে একটা লরি কিনে কাবুল কান্দাহারের পথে চালাই। জিনিসপত্র সস্তা, অনেক বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেল, লরি চালিয়ে ক্রমশঃ উন্নতি হতে লাগলো। কাবুলে ভোলানাথ বলে একজন লোক ছিল, বিখ্যাত লোক। সে জাতে গুজরাটী ব্রাহ্মণ, অনেক দিন থেকে কাবুলে আছে। এখানে পুরুতের কাজ করে। মীরমক্‌দ্‌ বাজারের দক্ষিণে ছোট একটা গলির মধ্যে তার একটা ছোট মন্দির আর বাড়ী।

ভোলানাথের মন্দিরটি এক অদ্ভুত জায়গা।

সন্ধ্যার পর থেকে নানা ধরনের লোক সেখানে এসে আড্ডা দিতে আরম্ভ করে। চা হরদম চলচে। মোটা কড়া তামাকের ধোঁয়ায় মন্দিরের চাতাল অন্ধকার হয়ে যায়। এদিকে ঘণ্টা বাজে, আরতি হয়, প্রসাদ বিতরণ হয়। রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত লোকের পর লোক আসচে। তার মধ্যে খুব বড় প্রতিপত্তিশালী ব্যবসাদার থেকে আমার মত বাজে লোকও আছে। আর সবারই ওপর ভোলানাথের প্রভাব খুব বেশী। সবাই তাকে মানে, খাতির করে, তার কাছে পরামর্শ নেয়।

একদিন রাত আটটার সময়ে ভোলানাথের মন্দিরে গিয়েচি।

চা পান শেষ হয়ে গিয়েচে। ভোলানাথ আমায় বললে—চা খাবে নাকি?

বললাম—থাক, রাত হয়েচে এখন আর চা খাবো না।

হঠাৎ আমার নজরে পড়লো দলের মধ্যে একজন আফগান রাজকর্মচারী বসে। আমি তাঁকে অনেকবার পথে ঘাটে মোটর হাঁকিয়ে যেতে দেখেচি। অত বড় লোককে এখানে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু মুখে কোনো কথা কাউকে বলা উচিত বিবেচনা না করে চুপ করে রইলাম।

একটু পরে আফগান অফিসারটি চলে গেলেন।

শুনলাম আমাদের মধ্যে কে কে মেসিনগান চালাতে জানে আফগান অফিসার তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন।

ব্যাপার কি? মেসিনগান কি হবে? লড়াই কোথায়?

অনেক রাত্রে উঠে আসচি, আমার এক বিশেষ বন্ধু জোয়ালাপ্রসাদ আমায় চুপি চুপি বললে—টাকাকড়ি যদি ব্যাঙ্কে থাকে, উঠিয়ে নাও এই বেলা—

অবাক হয়ে বললাম—কেন, কি হয়েচে?

—আমানুল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবে শীগ্‌গির।

—কে বিদ্রোহ করবে!

—আমার কাছে অত খবর তো পেঁাছোয় নি। তুমি নিজে সাবধান হও, মিটে গেল! দু-একদিনের মধ্যে আগুন জ্বলবে। বেশী রাতে রাস্তায় চলাফেরা কোরো না।

মীরমক্‌দ্‌ বাজারের নীচ শ্রেণীর কাফিখানাগুলোতে তখনও আমোদ-প্রমোদ চলচে। এসবগুলো ভয়ানক জায়গা রাতে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বেখাপ্পায় ছোরার ঘায়ে কত লোক যে প্রাণ হারিয়েচে তার ঠিকানা নেই।

বাজার ছাড়িয়েচি, এমন সময় হঠাৎ দূরে দুমদাম বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পট্‌-পট্‌-পট্‌-পট্‌ মেশিনগানের আওয়াজ।

বাচ্চা-ই-সাকোর বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল।

মীরমক্‌দ্‌ বাজারের লোকজন হুড় হুড় করে দোকান কাফিখানা ছেড়ে বার হয়ে এল, কেউ কিছু জানে না, সবাই কানখাড়া করে শুনচে।...

বিদ্রোহ কথাটা কিন্তু শীগগির তুলোর আগুনের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই সন্ত্রস্ত ভীত হয়ে উঠলো—বিদ্রোহ মানে খুন, মানে লুটপাট, মানে গৃহদাহ, মানে

পৈশাচিক অরাজকতা ও নিষ্ঠুরতা। বিশেষতঃ এই সব জায়গায়।

ঠিক তাই ঘটল। বাচ্চা-ই-সাকোর বিদ্রোহ যখন পুরোমাত্রায় চলেচে, তখনকার কথা সবই জানি, কিন্তু সে সব কথা বলবো না। চোখের সামনে যে সব ব্যাপার দেখেচি, এতদিন পরেও সেকথা ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে। মীরমক্দ্ বাজারে রক্তের স্রোত বইল। কে যে কাকে মারে, তার ঠিকানা নেই কিছু। সুযোগ পেয়ে বদ্মাইস খুনী গুণ্ডার দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেচে—বাচ্চা-ই-সাকোর সৈন্যেরা করেচে রাজনৈতিক বিদ্রোহ—সুবিধা পেয়ে শহরের সাধারণ গুণ্ডা ও দস্যুর দল দিন-দুপুরে খুন রাহাজানি শুরু করে দিলে। আরও কত কি করলে, তার আর উল্লেখ না করাই ভালো।

একদিন রাত্রে আমার বন্ধু জোয়ালাপ্রসাদ এসে আমায় বললে—চুপি চুপি উঠে এসো ভোলানাথের ডেরায়—কোনো কথা জিজ্ঞেস কোরো না।

মীরমক্দ্ বাজার পার হবার সময়ে তার অন্ধকার চেহারা দেখে মনটা দমে গেল। ভোলানাথের মন্দিরে গিয়ে দেখি শিখ ও জাঠ যে ক-জন ড্রাইভার কাবুলে উপস্থিত ছিল, সবাই জড় হয়েচে—জনদশেক সবসুদ্ধু। আর উপস্থিত আছেন সেই আফগান অফিসার আর তার সঙ্গে আর একজন দীর্ঘকায় সুপুরুষ আফগান, সাহেবী পোশাক পরা। মন্দিরের অস্পষ্ট আলোয় ওদের মুখ ভাল দেখা যায় না।

আফগান সর্দার বললেন—তোমাদের মধ্যে কে কে এই রাত্রেই কাবুল থেকে কান্দাহারের পথে মোটর নিয়ে যেতে পারবে? সেখান থেকে কে কে বোম্বাই পৌঁছুতে পারবে?

আমি তো অবাক। কোথায় কান্দাহার, আর কোথায় বোম্বাই। তাছাড়া যাবার পথ কৈ?

বিদ্রোহীরা তো খাইবারের পথ আটকেচে। আপাততঃ কাবুল নদী পেরুনো যাবে কিনা সন্দেহ। কেন, কাকে নিয়ে যেতে হবে?

আফগান অফিসার বললেন—চামানের পথে কোয়েটা হয়ে বোম্বাই পৌঁছুতে হবে। দশখানা লরি চাই। প্রাইভেট মোটর দু-খানা থাকবে। তা চালাবার লোক চাই। যত টাকা চাও পাবে।

আমরা সবাই ঘাড় নাড়লুম। অসম্ভব। চামানের পথে কোয়েটা হয়ে বোম্বাই! এই ভীষণ দিনে।

আফগান অফিসারটি অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক করলেন, ভয়ও দেখালেন—কোনো ফল হোলো না।

এমন সময় সাহেবী পোশাক পরা সেই সুপুরুষ লোকটি অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন, তোমাদের আপত্তিটা কি?

আমার ডাইনে বাঁয়ে দু-তিন জন শিখ ও জাঠ চমকে উঠেই আভূমি নত হয়ে সেলাম করলে। জোয়ালাপ্রসাদ বিস্ময়ে কাঠ হয়ে কলের পুতুলের মত বলে উঠল—জাঁহাপনা!... আমিও তখন চিনলাম। কি সর্বনাশ! স্বয়ং রাজা আমানুল্লা।

আমানুল্লা বললেন—শোনো। যা চাও তাই পাবে, আমার দশখানা লরি দরকার। কে কে রাজী আছ? আমাকে বোম্বাই পৌঁছে দিতে হবে। বড় বিপদে পড়ে তোমাদের ডেকেচি। তোমাদের বিশ্বাস করতে পারি?

আমরা সমস্বরে বলে উঠলুম—জান কবুল, হুজুরালি—আমরা তৈয়ার। হুকুম করুন কোথায় গাড়ী আনতে হবে। আমানুল্লা রিস্টওয়াচে সময় দেখে বললেন—একঘণ্টার মধ্যে গাড়ী এইখানে নিয়ে এসো। তারপর কোথায় যেতে হবে ইনি বলে দেবেন।

সেই রাত্রে দশখানা লরি ও দু-খানা প্রাইভেট মোটর চুপি চুপি কাবুল ছেড়ে কান্দাহারের পথে রওনা হোল। চারখানা লরিতে বোঝাই হোল শুধু টাকা—তামার চওড়া পাতে আঁটা কাঠের ভারী বাক্স বোঝাই নগদ টাকা। প্রাইভেট মোটর দু-খানায় রাজা, রানী, ছেলেমেয়ে। সামনে পেছনে দু-খানা লরিতে তেরপল চাপা মেসিনগান।

শেষ রাত্রে কুয়াশার মধ্যে কাবুলের নিঃশব্দ রাজপথ দিয়ে দেশের রাজা রানীকে নিয়ে আমরা তীরের বেগে গাড়ী উড়িয়ে দিলাম।

কাবুল নদী পেরিয়ে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর বিদ্রোহীদের একটা ঘাঁটি। এতগুলো

গাড়ী গেলে নিশ্চয়ই ওরা সন্দেহ করে পথ আটকাবে। জাঠ পূরণমল মেসিনগানের পেছনে তৈরী হয়ে বসলো। আমরা কি করবো ভাবচি—স্বয়ং আমানুল্লা হুকুম দিলেন কেটে বেরিয়ে চলো—

গম্বুজের কাছে ওরা অনেকে জড় হয়েচে দূর থেকে দেখতে পাচ্চি। আমরা য়্যাকসিলারেটারে পা দিয়ে সজোরে চাপলাম—চালাও! হু হু করে স্পিডোমিটারে ত্রিশ মাইল থেকে ঠেলে উঠল চল্লিশ...পঞ্চাশ—চক্ষের নিমেষে ওদের ঘাঁটিটা একটা রাঙা কালো আবছায়ার মত পাশ দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল—দুমদাম রাইফেল চললো—পট্ পট্ মেসিনগান উত্তর দিলে আমাদের দিক থেকে। একখানা টাকা বোঝাই লরি টায়ার ফেটে অচল হয়ে পড়লো। রইলো সেটা পড়েই—কেউ তার দিকে চাইলাম না।

পেছনে ওরা এবার তাড়া করবে নিশ্চয়ই। আমাদের সময় ছিল না; কান্দাহারের খবর পেলাম, কোয়েটা যাবার পথ বিদ্রোহীরা আটকেছে। ঘুরে হেলমন্দ নদী পার হয়ে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে আমরা আফগানিস্থানের সীমানা পার হই। তারপর বেলুচিস্তানের দুর্গম মরুভূমি...কালো কালো গাছপালাহীন পাহাড় আর কটা বালির মরুভূমি—মরুভূমি আর পাহাড়।

এই মরুভূমির মধ্যে কালাত থেকে চামানের পথে বেলুচ দস্যুরা আমাদের আক্রমণ করলে, ভাবলে লরি বোঝাই সওদাগরী মাল যাচ্চে। মেসিনগান খেয়ে হটে গেল। একবার জল গেল ফুরিয়ে। এঞ্জিনের ট্যাঙ্কের গরম জল রাজা রানীকে খেতে দিলাম নিজেদের বঞ্চিত করে। হয়তো সেবার সবসুদ্ধ মরতে হোত মরুভূমির মধ্যে; কারণ ঠিক সেই সময় বেজায় বালির ঝড় উঠলো। রাস্তা নেই, দিক মুছে গেল, তার ওপর মুশকিল একখানা সেলুন গাড়ীর এঞ্জিন অকর্মণ্য হয়ে পড়লো, কি যে সেটার ঘটল, কিছুতেই আমরা তা ধরতে পারলাম না। বাকী গাড়ীখানায় ঐ গাড়ীর ছেলেমেয়েদের তুলে দিলাম—সেই ভীষণ গরমে, তৃষ্ণায় আর ঠাসাঠাসিতে তাদের কি কষ্ট! একেবারে নেতিয়ে পড়লো গাড়ীর মধ্যে। আমানুল্লা নেমে এসে লরিতে ড্রাইভারের পাশে বসলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যে কালাত থেকে করাচীগামী গবর্ণমেণ্টের ডাক মোটরের সঙ্গে আমাদের দেখা হোল। ডাক পাহারা দেবার জন্যে সঙ্গে একখানা সাঁজোয়া গাড়ী, কারণ ঐ সময়টা বেলুচ দস্যুদের বড় উৎপাত চলছিল মরুভূমির পথে। একদিনে চামান, পরদিন দুপুরে করাচী। ঠিক হোল সেখান থেকে ট্রেনে রাজা রানী বম্বেতে যাবেন। আমরা ফিরলাম সেই দিনেই কাবুলে। জনপিছু দুশো টাকা বকশিশ মিললো, গাড়ীভাড়া ও তেলের দাম বাদে। বিদায় নেবার সময় আমানুল্লা আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন যদি কখনও ফিরি, তোমাদের ভুলবো না। চেয়ে দেখি রানীমার চোখে জল। আমাদেরও কারো চোখ সে সময় শুষ্ক ছিল না, বোধ হয় কঠোরপ্রাণ দুর্ধর্ষ জাঠ পূরণমলেরও না—নইলে সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল কেন?

স্বপ্ন-বাসুদেব

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের কথা। আজ থেকে প্রায় বাইশ শ' বছর আগের তক্ষশিলা।

নগরীর রাজপথ কোলাহলমুখর। নবারুণোদয় নিজ মহিমায় ধীরে ধীরে উচ্চ চূড়ায় ও স্তম্ভে নবপ্রভাতের বাণী ঘোষণা করচে। তক্ষশিলায় সম্প্রতি দেবী মিনার্ভার এক মন্দির তৈরী হচ্চে, পার্থেননের অনুকরণে—গম্বুজ বা ডোম কোথাও নেই—ছাদ সমতল, অগণিত সুসমঞ্জস বিরাট স্তম্ভশ্রেণী। গ্রীক স্থাপত্য গম্বুজের খিলান গড়তে অভ্যস্ত ছিল না। বহু পরবর্তী কালে সারাসেন সভ্যতার যুগে ইউরোপে এর উৎপত্তি, সারাসেন কথা মুর সভ্যতার দান এটি।

বড় বড় স্প্রিংবিহীন মঠ ও লোহার তৈরী এক্কার ধরণের গাড়ীতে মাঝে মাঝে দু' চারজন ধনী বণিক ও গ্রীক জমিদারগণ যাতায়াত করচেন। সুন্দরী গ্রীক বালিকাও মাঝে মাঝে রথে চড়ে চলেচে—দেবী এথেনির মত। ব্রোঞ্জের বিরাট জুপিটারমূর্তি প্রস্তরের

ছত্রাবরণতলে শোভা পাচ্চে রাজপথের মোড়ে। বণিকগণের আপণশ্রেণীতে কত কি জিনিস—কত দেশ থেকে আহরণ করে আনা।

একটি সুবেশ বালক ভৃত্য একটি দোকানে এসে বললে—কলা আছে?

—আছে, দাম বেশি পড়বে।

—কোথাকার কলা?

—এই কাছের গাঁয়ের। বুড়ো রোজ টাটকা দিয়ে যায়।

—আর আঙুর?

—মদ তৈরী করবার জন্যে সামান্য কিছু এনেছিলাম,—নিয়ে যাও।

হঠাৎ রাজপথকে চমকিত করে তূর্য বেজে উঠলো। মহারাজ এ্যান্টিআলকিডাসের মহামাত্য ডিওন ভ্রমণে বেরিয়েচেন—রাজপথ কাঁপিয়ে শ্বেতাশ্ববাহিত টাঙায় রাজপুরুষ ডিওন চলে গেলেন—বালক ভৃত্যটি হাঁ করে চেয়ে রইল।

দোকানদার বললে—তোমার কর্তা কোথায় চললেন?

বালক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—কি জানি বাপু! সে খোঁজে আমার দরকার কি?

—ওঁর ছেলে কি এখনো সেই বিদেশে?

—তিনি কাল এসেচেন মালব থেকে। সেখান থেকে এসেই অসুখ বাধিয়েছেন বলেই ফল নিতে এসেচি এত সকালে। বলবো কি—পয়সাকড়ির অবস্থা ভালো না। রাজা মাইনে দেন না ঠিকমত—লুটে-পুটে নিয়ে যা চলে।

দোকানদার অধীরভাবে বলে উঠলো—যাও, যাও—আমরা গরীব লোক, আমার দোকানে ওসব—এক্ষুনি কে শুনবে। তোমার কি, বড়লোকের চাকর—সুন্দর মুখের সব মাপ—

এই কথার মধ্যে কিঞ্চিৎ বক্রোক্তি ছিল। ভৃত্য সে উক্তি গায়ে না মেখেই চলে গেল। একটু পরে স্বয়ং ডিওনপুত্র হেলিওডোরাস এসে ফলের দোকানের সামনে দাঁড়াল। সুগঠিত দেহ সৌম্যকান্তি গ্রীক যুবক, রঙ অনেকটা আধুনিককালের পেশোয়ারী মুসলমানের মত। দীর্ঘ দেহ, ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ, চক্ষু দুটি নীল নয়—কটা। হেলিওডোরাস চাকা ছুঁড়বার প্রতিযোগিতায় দু'বার সকলকে পরাজিত করে মহারাজ এ্যান্টিআলকিডাসের প্রকাশ্য সভায় পুরস্কার পেয়েচেন। তক্ষশিলার অনেক লোকে তাঁকে চেনে। কপিলা থেকে আনীত বিদেশী সুরা খুব চড়া মূল্যে বিক্রী হয় তক্ষশিলার বাজারে। সাধারণ লোককের সাধ্য নেই তা কেনে—কিন্তু হেলিওডোরাস বন্ধুবান্ধব নিয়ে সরাইখানায় বসে ফুর্তি করবার সময়ে কপিলার সুরা ব্যতীত অন্য কিছু চায় না।

ফলের দোকানের মালিক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বললে—আসুন ছোটকর্তা, আমার আজ বড় সৌভাগ্য—এত সকালে আপনার পায়ের ধুলো পড়লো এ গরীবের দোকানে।

হেলিওডোরাস ঈষৎ গর্বিত সুরে বললে—জুজু এখানে এসেছিল?

—হাঁ কর্তা এইমাত্র চলে গেল।

—আঙুর দিয়েচ তাকে?

কথার উত্তরে দোকানীর কাছ থেকে শুনবার আগেই হেলিওডোরাস চলে গেল। দোকানী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে হেলিওডোরাসের অপসৃয়মাণ সুন্দর চেহারার দিকে চেয়ে রইল।

ডিওনের আর্থিক অবস্থা আজকাল সত্যই ভালো নয়। রাজার দরবারে তিনি সভাসদ বটে কিন্তু রাজা এ্যান্টিআলকিডাসের নিজেরই আর্থিক অবস্থা যা, তাতে সভাসদদের অর্থসাহায্য করবার অবস্থা নয় তাঁর। গান্ধারের রাজা জোজিফাস ও পুরুষপুরের গ্রীক তালুকদার হিরাক্লিয়াসের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ লেগেই আছে—রাজকোষের যাবতীয় অর্থ এখন ওদিকেই ওড়ে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম, সুতরাং ডিওন এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ ঠিকমত বেতন পান না, বাজারের বণিক ও প্রজাদের নিকট নানা ছলে অর্থশোষণ করেন। এঁদের মধ্যে ডিওন প্রধান সভাসদ, সুতরাং তাঁর

অত্যাচারে তক্ষশিলার বিত্তশালী প্রজা ও বণিক মাত্রেই তাঁর ওপর যথেষ্ট বিরক্ত।

রাজা এ্যান্টিআলকিডাস ব্যাক্‌ট্রিয়ান গ্রীক—সুতরাং ভারতীয় প্রজা যত বেশি উৎপীড়িত হয়—গ্রীক ব্যবসায়ী বা প্রজা তার অর্ধেকও না। দু'বার ভারতীয় বণিকসঙ্ঘ প্রতিবাদ করেছিল সভাসদদের এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সভাসদ তাই কি, বিনা পয়সায় জিনিস দেওয়া হবে না—তিনি যিনিই হোন। ধার নিয়ে উপুড় হাত করবেন না সব। কিসের খাতির? এ ব্যবস্থা টেকে নি। গান্ধার থেকে স্বার্থবাহ বণিক সম্প্রদায় উষ্ট্র-পৃষ্ঠে উৎকৃষ্ট সুরা ও বিদেশী ফল নিয়ে আসতো—এরা তার উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসালে, বাজারে অত চড়া দামে সে সব খাবার লোক রইল না। দু'বার বাজারে দোকান লুঠ হোল—এই সব নানা উপদ্রব। গ্রীক বণিকগণও যে, এ অত্যাচার থেকে একেবারে মুক্ত তা নয়, তবুও তাদের প্রতি অত্যাচার এদের তুলনায় অত্যন্ত কম।

হেলিওডোরাসকে ঠিক এই জন্যে কোনো ভারতীয় প্রজা পছন্দ করতো না। সে ছিল উচ্ছৃংখল ও উদ্ধত—'গ্রীক ছাড়া অন্য কেউ মানুষ নয়' এই তার মত। তার আদর্শ পুরুষ হ'ল লিওনিডাস, যিনি থর্মপলির গিরিসংকটে অমর হয়ে আছেন, থেমেস্টোক্লিস যিনি টেম্পি গিরিবর্ত্ম রক্ষা করেছিলেন দশ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হয়ে—দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডার,—যাঁর বাহুবলে আজ ভারতে গ্রীক রাজ্য সম্ভব হয়েচে।

ব্যাক্‌ট্রিয়ান গ্রীকদের জীবনযাত্রা ও আচারব্যবহার অনেক সময় তার চোখে ভালো লাগতো না। একজন খাঁটি গ্রীক স্কুলমাস্টার তক্ষশিলার রাজসভায় দিনকতক এসে-ছিলেন, ছেলে পড়াতেন বড়লোকের বাড়ীর, তাঁর নাম পলিফাইলস্—রীতিমত পণ্ডিত। তাঁকে নিয়ে সে সময় কাড়াকাড়ি পড়ে গেল বড়লোকদের মধ্যে, কে তাঁকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতে পারে, কারণ এথেন্স থেকে তিনি এসেছিলেন। হেলিওডোরাস তখন বালক, তাকে তিনি বলতেন—তোমাকে দেখে আমার প্রাচীন যুগের গ্রীক যুবকদের কথা মনে পড়ে। শরীরটা স্পার্টার ছেলেদের মত শক্ত করো। এদেশে কিছু নেই। নামেই গ্রীক্।

—কেন?

—গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এদেশের গ্রীকরা অতিরিক্ত বিলাসী ও আরামপ্রিয় হয়ে পড়েচে। পূর্বপুরুষের রক্তের সে তেজ নেই এদের মধ্যে। শুধু তা নয়, এরা দেশী লোকের সংগে যেভাবে মেশে, অনেক দেশী খাদ্য খায় ও পরিচ্ছদ ধারণ করে, যেমন সেদিন এক গ্রীক ভদ্রলোকের গায়ে কাশ্মীরী শাল দেখলাম—ছিঃ ছিঃ, লজ্জাও করে না!...বেশি কথা কি বলবো, অনেকে এদেশী মেয়েদের সংগে—

এই সময় স্কুলমাস্টারের হঠাৎ মনে পড়তো যে তাঁর শ্রোতা বালক এবং ছাত্র। স্বজাতির অধঃপতনের দুঃখে যা বলে ফেলেচেন তা যথেষ্ট। বলে উঠলেন—তা ছাড়া, দেখচো না গ্রীক রাজধানী তক্ষশিলা বৌদ্ধবিহারে ভরা। যাক্‌গে। কবিতা মুখস্থ বলে যাও—

কখনো কখনো ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে তক্ষশিলার কোনো প্রমোদ-উদ্যানের মধ্যে নিভৃত কুঞ্জে ছায়াসনে তিনি ছাত্রদের নিয়ে বসতেন। অতীত যুগের গ্রীকদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ প্রভৃতি জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করে যেতেন ইউরিপিডিস্ ও সাফোর কবিতা আবৃত্তি করতেন, প্লেটোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশাবলী বুঝিয়ে দিতেন। কয়েক বছর তক্ষশিলায় থাকার পরে তিনি হঠাৎ কোথায় চলে যান। জনশ্রুতি যে, তিনি এইসময় স্বদেশে ফিরতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে আর একবার তিনি প্রিয় জন্মভূমির পবিত্র মৃত্তিকা স্পর্শ করতে চান।

সেই থেকে হেলিওডোরাস পূর্বপুরুষের গৌরবে গৌরবান্বিত, ভারতীয়দের সে ঘৃণাই করে—স্পার্টার যুবকদের আদর্শে শরীর গড়ে তুলেচে—ভারতীয়দের সঙ্গে গ্রীকরা যে বেশি মেলামেশা করে, এটা সে পছন্দ করে না—এমন কি তার পিতা ডিওনকে পর্যন্ত এজন্য সে ঠিক শ্রদ্ধা করতে পারে না। কারণ দু'তিনটি ভারতীয় নর্তকীর বাড়ীতে এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর যাতায়াত। যাক্ সে সব কথা। এদিকে হেলিওডোরাসের উচ্ছৃংখলতা ও অত্যাচারে তক্ষশিলার অনেকেই অতিষ্ঠ। সে লম্পট নয়, কিন্তু সুরাপায়ী, উদ্ধত—

লোকের মান রাখে না, দোকানের জিনিস ধারে নিয়ে গিয়ে দাম দেয় না—দুর্নীতি, নরহত্যা পর্যন্ত করেচে সুরার ঝোঁকে।

কেন তা বলি।

মেলিবিয়া নামে একটি রূপসী গ্রীক গায়িকা আজ বছর দুই হ'ল ব্যাক্‌ট্রিয়া ও গান্ধার হয়ে এখানে আসে উপার্জনের চেষ্টায়। গান্ধাররাজ জোজিফাসের সভায় খুব নাম কিনে এসেছিল। এখানে সে পদার্পণ করার দিনটি থেকে তক্ষশিলার অনেক যুবক ও প্রৌঢ়ের নজরে পড়ে গেল। প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার হিড়িক শুরু হ'ল। বহু গ্রীক যুবক, প্রৌঢ়, এমন কি বৃদ্ধের প্রণয় উপেক্ষা করে (এদের দলে হেলিওডোরাসও ছিল) সুন্দরী মেলিবিয়া প্রসন্নদৃষ্টিতে চাইল সুমঙ্গল বলে এক ভারতীয় বণিকের প্রতি, এমনি অদৃষ্টের ফের। প্রকাশ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে হেলিওডোরাস সুমঙ্গলকে। মেলিবিয়া এতে বাধা দেয়—তার পর একদিন এক সরাইখানায় সামান্য ছলে ঝগড়া বাধিয়ে হেলিও-ডোরাস সুমঙ্গলকে হত্যা করে। খুব গোলমাল বাধে এ নিয়ে।

রাজদরবারে অভিযোগ উপস্থিত হ'ল হেলিওডোরাসের বিরুদ্ধে। ভারতীয় বণিক-সঙ্ঘ রাজাকে ধরলে এর সুবিচার করতেই হবে। তাদের কাছে টাকা ধার না করলে রাজার চলে না। ফলে মহারাজ এ্যান্টিআলকিডাস্ তাঁর সভাসদ ডিওনকে ডেকে বলে দিলেন কিছুদিনের জন্য হেলিওডোরাসকে সরিয়ে দেওয়া দরকার তক্ষশিলা থেকে। মালবের রাজা ভাগভদ্রের সভায় যে গ্রীকদূত ছিল, তার মৃত্যু হয়েছিল সম্প্রতি—সেখানেই আপাতত ওকে পাঠানো হোক। বলা হবে রাজার বিচারে ওর নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হ'ল।

সুতরাং গত শীত ঋতুর প্রারম্ভে হেলিওডোরাস মালবের রাজা ভাগভদ্রের রাজসভায় প্রেরিত হয়।

তক্ষশিলায় পুনরায় আসার উদ্দেশ্য ছিল—মেলিবিয়ার সন্ধানে; কিন্তু হায়! সেই কেলেঙ্কারির পরে বেচারি গ্রীক গায়িকাকে এ রাজ্য ছাড়তে হয়েচে। মেলিবিয়া এখন পুরুষপুরের তালুকদার হিরাক্লিয়াসের অতিথি, অন্তত সেই রকম জনপ্রবাদ।

ডিওন বললে—হেলিওডোর এখানে আবার এসে ঘুরঘুর করচো কেন? বুড়ো বয়সে কি চাকরিটা খোয়াবো তোমার জন্যে?

—আজ্ঞে না, আমি এসেছিলাম শরীর সারাতে। ওখানে যে দিশি বদ্যি আছে তাদের হাতের শেকড়বাকড় ওষুধ খেলে হাতি মারা পড়ে, মানুষ কোন্ ছার! আর দেশটাতেও বড় বিষম জ্বরের—

—বাবা, তুমি আমার নয়নের আনন্দ। কিন্তু জুপিটারের শপথ করে বলচি, আমার হাতে একটি পয়সা নেই যা' তোমার জন্যে রেখে যেতে পারবো। এ হতভাগা রাজ্যে কিছু উন্নতি নেই, এদের ঘুণে ধরেচে। ঋণের বোঝা রাজকোষকে ছাপিয়ে উঠেচে। নতুন দেশে যদি কিছু উপার্জন করতে পারো—আখেরে ভালো হবে।

শরতের অপূর্ব জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। ডিওন তার প্রণয়িনীর বাড়ীতে আরও কয়েকটি বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করতে গেলেন। তক্ষশিলার মধ্যেই এক সংকীর্ণ রাস্তার ধারে বাড়িটি। কার্নিসে পাথরের ছোট ছোট থামের মাঝে মাঝে ফোকরকাটা ইটের নিচু পাঁচিল।

একজন বললে—শুনেচ হে, কাঞ্চীনগরের তালুকদারের ছেলে এ্যারিস্টোস্ সম্প্রতি বৌদ্ধ হয়েচে!

অন্য বন্ধু বললে—তুমি যা শুনেচ ন্যানিফাস্, সত্যি হওয়া আশ্চর্য নয়। রাজা মিনান্ডার গ্রীক কুলাঙ্গার, নইলে গ্রীক রক্ত যার গায়ে আছে, সে দেশী ধর্ম গ্রহণ করে কি হিসেবে? ওর শ্বশুরকে আমি জানি, ব্যাকট্রিয়ায় তাঁর অনেক তালুকমুলুক, ভালো বংশের ছেলে—এ্যান্টিগোনাস গোনাটাসের মাসতুতো ভাইয়ের শালার বংশ।

—কে?

—ওই রাজা মিনান্ডারের শ্বশুর। জামাইয়ের এই কুমতি শুনবার পরে বেচারী

একেবারে শয্যা গ্রহণ করেচেন।

—নিয়ারা কোথায় গেল?...

ডিওন আজ বেশি সুরা পান করেননি। মন তাঁর ভালো নয়, ছেলেটা আজ কি কাল বাড়ী থেকে চলে যাবে, সঙ্গে এবার তিনি তাঁর প্রিয় বালকভৃত্য জোজিফাস ওরফে জুজুকে প্রবাসে ছেলের সেবা করতে পাঠাবেন। ডিওন অনেক দিন বিপত্নীক, বাড়ীতে প্রিয়দর্শন পুত্র ও বালক-ভৃত্যটিও অনুপস্থিত থাকবে। একপাল দাসদাসীর মধ্যে (তাদের মধ্যে অনেকেই অসন্তুষ্ট, কারণ সময়মত বেতন পায় না) সন্ধ্যা কাটানো এই বয়সে ভাল লাগে?... কি যে করবেন—

নিয়ারা প্রবেশ করলে, বয়সে সে ডিওনের চেয়ে অনেক ছোট, তবুও চল্লিশের কম নয়, কিন্তু দেখায় ত্রিশ। সোনালীপাড় দামী রেশমী অঙ্গাবরণ, দুটি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ওর গৌর অঙ্গের শোভা বর্দ্ধিত করচে। কিন্তু মাথায় গ্রীক মহিলাদের ন্যায় পুষ্পমালা, সুন্দর চোখের ভুরু কাশ্মীরী জাফ্রানের রেণু, চন্দন ও বার্জ বৃক্ষের আটা মিশিয়ে চিত্রিত করা। তাতে চোখের ভুরু দুটি কালো না দেখিয়ে হলদে দেখাচ্চে। নিয়ারার পিতা ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক, কিন্তু মাতা পারস্যদেশীয়া।

ন্যানিফাসের কথার উত্তরে নিয়ারা বললে—আমার গুরু এসেচেন, তাই আনন্দে কথাবার্তা বলছিলুম তাঁর সঙ্গে।

ন্যানিফাস বললে—সে আবার কে?

—তিনি একজন ভারতীয় যোগী। বারাণসী থেকে এসেচেন—

সবাই একবাক্যে বলে উঠলো—আমরা একবার দেখবো—

—তিনি কাউকে দেখা দেন না। কারো কাছে কিছু চান না তো তিনি।

ন্যানিফাস বললে—আচ্ছা নিয়ারা তুমি একজন এদেশী ধাপ্পাবাজের পাল্লায় পড়ে গেলে কি বলে? এ যে-রকম শুরু হোল দেখচি, কবে আমাদের বন্ধু ডিওন মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু না হয়ে দাঁড়ায়!

সুরাপায়ী, বিলাসী, স্থূলদেহ ডিওন পক্ককেশে পুষ্পমাল্য ধারণ করে একপাশে পর্য্যঙ্কে শুয়ে ছিলেন, তাঁকে মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে কল্পনা করে সর্বপ্রথমে প্রৌঢ়া সুন্দরী নিয়ারা হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়লো, পরে ডিওনের সব বন্ধুই সেই হাসিতে যোগদান করলে।

এমন সময়ে দেখা গেল, একজন দীর্ঘদেহ কৌপীনধারী লোক, সর্বাঙ্গে বিভূতি মাখা, হাতে কমণ্ডলু, আয়ত চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিষ্মান্—কোন্ সময়ে ছাদের ওপর এসে দাঁড়িয়েচে। সকলে চমকে উঠলো—ডিওন বললে—কে তুমি?

সন্ন্যাসী বললেন—বাবাজিদের জয় হোক।

—কি?......এ উত্তর শুধু ডিওন দিলেন।

—এই মেয়েটি আমায় বড় মানে। আমি একে এই পাপজীবন থেকে উদ্ধার করতে চাই। আপনারা এখানে আর আসবেন না।

—কোথায় যাবো আমরা? তুমি কোন্ নবাব এলে জানতে পারি কি?

সন্ন্যাসী রোষকষায়িত নেত্রে বললেন—বৃদ্ধ লম্পট! পরকালের দিন সমাগত, ভয় হয় না? এখনও এই সব—

সবাই মিলে হুংকার দিয়ে ঠেলে উঠলো—এত বড় স্পর্দ্ধা!......কিন্তু আশ্চর্য, কারো সাধ্য নেই যে নিজ নিজ আসন ছেড়ে উত্থিত হয়। ডিওনকে দেখা গেল তাঁর স্থূলদেহ নিয়ে তিনি পর্যঙ্ক থেকে উঠবার চেষ্টায় নানারূপ হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করচেন—এ যেন এক রাত্রির দুঃস্বপ্ন।...সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বললেন—নিয়ারাকে আমি কন্যার মত দেখি মা বলে সম্বোধন করি। ওর পারলৌকিক উন্নতির জন্যে আমি দায়ী। তোমাদের মত সুরাসক্ত লম্পট ওকে অধঃপতনের পথে নিয়ে চলেচ। তোমাদের সাবধান করে দিয়ে গেলাম। এর পরেও যদি এসো, বিপদে পড়ে যাবে। পরে ন্যানিফাসের দিকে চেয়ে বললেন—শোনো, তোমার দিন আসন্ন। এই সুরা ও নারী তোমাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যাবে। পরকালের কথা চিন্তা কর। এখন থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে একটি প্রশস্ত রাজ-

পথের পার্শ্ববর্তী পুরাতন কূপে তোমার মৃতদেহ ভাসচে আমি দেখতে পাচ্চি—

ন্যানিফাসের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ, পাণ্ডুর হয়ে উঠলো। সুরার নেশা ততক্ষণ তার এবং সকলেরই কেটে গিয়েচে।

—আর ডিওন, তোমার বংশে একটি অদ্ভুত পরিবর্তন আসন্ন। কিন্তু সেজন্যে তুমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিও—বিদায়।...আমি চলে গেলে তোমরা পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হবে—বিদায়!...

সন্ন্যাসী অন্তর্ধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিজ নিজ অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হ'লেন। দোরের কাছে নিয়ারা দাঁড়িয়ে, তার মুখে মৃদু হাস্য।

ডিওন বললে—কি?

ন্যানিফাস বললে—কি?

অন্য সবাই বললে—কি?

নিয়ারা নিরুত্তর। একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মতই অতি ক্ষীণ একটি হাস্যরেখা তার ওষ্ঠপ্রান্তে মিশে রইল।

২

শরৎ ঋতু শেষ হয়েচে, প্রথম হেমন্তের সুশীতল বাতাস গত গ্রীষ্মদিনগুলির দাবদাহ স্মৃতিতে পর্যবসিত করে তুলেচে। হেলিওডোরাস মালবে আজ মাস দুই ফিরে এসেচে। রাজধানী বিদিশার উপকণ্ঠে একটি বৃহৎ উদ্যানবাটিকা দূর থেকে তার বড় ভালো লাগে। প্রাচীন অশোক, বকুল, বট, নাগকেশর ও সপ্তপর্ণ তরুশ্রেণীর নিবিড় উদ্যানটি যেন নিভৃত তপোবনের মত শান্তিপ্রদ ও মনোরম। কত পক্ষিকুলের সমাবেশ ও বিচিত্র কলতানে ছায়াবিতানগুলি যেন মুখর।

কয়েকদিন সেদিকে সে একাই গ্রীক রথ হাঁকিয়ে বেড়াতে যায়। টাঙা-জাতীয় এই গ্রীক যানগুলির চলন তক্ষশিলা এবং প্রায় সর্বত্র সভ্য সভ্য নগর-নগরীতে দেখা যায় আজ-কাল। স্প্রিং নেই, বড় একটা কাঠের বা লোহার খুরোর ওপরে শকটের যতটুকু বসানো,—তাতে বড় জোর দু'জন লোকের স্থান সংকুলান হতে পারে। একদিন সে কি ভেবে প্রাচীরের একটি নিম্নস্থান উল্লঙ্ঘন করে উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করলে। উদ্যান তো নয় যেন নিবিড় বন। বহুকালের উদ্যান, বড় বড় গাছগুলিতে নিভৃত কোণ ও ছায়া রচনা করেচে নানাস্থানে—পাষাণ-বাঁধানো বাপীতটে সুন্দর লতাগৃহ, অশোককুঞ্জ, উৎস, যক্ষমূর্তি ইত্যাদি খবারা শোভিত নির্জন উদ্যানের মধ্যে কিছু দূরে প্রাচীন দিনের ভারতীয় স্থাপত্য প্রণালীতে নির্মিত একটি বিশাল অট্টালিকা বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ে—কিন্তু সেখানে কেউ বাস করে বলে মনে হ'ল না। হেলিওডোরাস আপন মনে পরিভ্রমণ করতে করতে একটি পাষাণবেদীতে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলে—তারপর সেখান থেকে বের হয়ে এসে রথ হাঁকিয়ে চলে এল। সেই থেকে মাঝে মাঝে উদ্যানটিতে যায়—কখনও মধ্যাহ্নে, কখনও সন্ধ্যায়, কখনও একাই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে!

বৎসর প্রায় ঘুরে গেল। শীত এল, চলেও গেল। পুরুষপুরে এবার তুষারপাতের সংবাদ পাওয়া গিয়েচে—অতি দুর্দান্ত শীত দিন এবার! ফাল্গুনী চতুর্দশী তিথির মনোরম জ্যোৎস্নালোকে, অজস্র বিহঙ্গকাকলী ও পুষ্পপর্যাপ্তির মধ্যে হেলিওডোরাসের দিনগুলি যেন স্বপ্নের মত কাটচে—রাজকার্যের অবসানে নিজের রথটি নিয়ে বার হয়ে নগরীর বাইরে বহুদূর পর্যন্ত চলে যায়। এখানে সে প্রায় একা, তবে দু'একটি ভারতীয় কর্মচারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েচে এবং মালবের ভাষা সে একরকম আয়ত্ত ক'রে ফেলেচে এক বৎসরে।

এই সময়ে একদিন সে তার সেই পরিচিত উদ্যানবাটিকাতে ঢুকলো পথের পাশে রথ থামিয়ে। পুষ্পে পুষ্পে, নববল্লীপল্লবে, চূতমুকুলের সুবাসে, কোকিল-ঝঙ্কারে, প্রাচীন উদ্যান তার বৃদ্ধত্ব পরিহার করে নবযৌবনের রূপ পরিগ্রহ করেচে, নিভৃত লতাগৃহ যেন

গ্রীক রতি-দেবতার আসন্ন পাদস্পর্শের আগ্রহে উৎসববেশে সজ্জিত হয়েচে। এই পাষাণ-বেদীতে সে মুগ্ধ মনে চুপ করে বসে আছে, এমন সময় কার পদক্ষেপের শব্দে চমকে পিছন ফিরে যা দেখলে তাতে সে বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে উঠলো।

একটি রূপসী তরুণী তার পিছনে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে। অপূর্ব তার অঙ্গলাবণ্য, ক্ষীণ কটিতে রত্নমেখলা, নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশে টাটকা তোলা যূথীগুচ্ছ, গ্রীক মেয়েদের মত দীর্ঘদেহা অথচ তন্বী। মেয়েটি অবশ্য ভারতীয়া, সাজপোশাকেই হেলিওডোরাস বুঝল।

মেয়েটিও ওকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েচে মনে হ'ল হেলিওডোরাসের। বিস্ময়ে তার চারু আয়ত কৃষ্ণ নেত্র দুটি স্তব্ধ অচঞ্চল। কিছুক্ষণ দু'জনের কেউ কথা বললে না।

তারপর হেলিওডোরাস উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ভদ্র, এ উদ্যান বোধ হয় আপনাদের। আমি পথিক, বেড়াতে এসে একটু বসেছিলাম—

মেয়েটি কোন কথা না বলে ফিরে চলে যেতে উদ্যত হ'ল।

হেলিওডোরাসের মূঢ়তা ততক্ষণ ঘুচেছে। সে হাজার হ'লেও গ্রীক ভদ্রলোক। বিনীত সুরে বললে—একটু দাঁড়াবেন দয়া করে? আমার এই অনধিকার প্রবেশের জন্যে আমি বিশেষ লজ্জিত—আমায় যদি ক্ষমা করেন—

মেয়েটি যেন কম্পিত অগ্নিশিখা, নিজের মহিমায় নিজে দীপ্তিমতী। হেলিওডোরাস এই ভারতীয় মেয়েটির অপরূপ রূপমাধুরীতে কেমন বিস্মিত হয়ে উঠেচে। এত রূপ হয় এদেশের মেয়ের? এমন শ্বেতাঙ্গ সুন্দর দেহকান্তি যে-কোনো সুন্দরী গ্রীক তরুণীর পক্ষেও দুর্লভ।...মৌলিবিয়া কোথায় লাগে!

হেলিওডোরাস সসঙ্কোচে তার কথা শেষ করবার অতি অল্পক্ষণ পরেই মেয়েটি নম্রসুরে বললে—আপনি কি গ্রীক্?

—হাঁ, ভদ্রে—

—অল্প দিন এসেচেন এখানে?

—না ভদ্রে। এক বৎসর হ'ল—আমি রাজসভার তক্ষশিলার গ্রীকদূত—আমার নাম হেলিওডোরাস—

রূপসী বালিকা বিস্ময়ে কৃষ্ণ ভ্রূযুগল ঊর্ধ্বদিকে ঈষৎ তুলে হোডওডোরাসের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—ও!...

—কেন? আমার কথা কি আপনি শুনেছিলেন?

—হাঁ। বাবার মুখে শুনেছিলাম সভায় একজন রাজদূত—

হেলিওডোরাস মনে মনে ভাবলে, ইনি বোধ হয় কোনো রাজ-অমাত্যের কন্যা হবেন। বললে—আপনার পিতা রাজসভায় কি পদে—আমি অনেককেই চিনি—

মেয়েটি কিছু বলবার পূর্বেই আরও দুটি সুন্দরী মেয়ে—ওরই প্রায় সমবয়সী—সেখানে এসে পড়লো কোথা থেকে। ওদের দু'জনকে দেখে তারাও যেন অবাক্ হয়ে গিয়েচে। একজন বললে—কত খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে—বাবাঃ—এখানে কি হচ্ছে?

মেয়ে দুটি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে হেলিওডোরাসের দিকে চাইলে। সে দৃষ্টির মধ্যে প্রশ্নও ছিল।

হেলিওডোরাস বললে—আমি এখানে 'বেড়াতে এসে একটু বসেছিলাম। আমি জানতাম না যে, আপনাদের বাগান। সেই সময় আপনাদের সখী—

মেয়ে দুটি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই মুখ ঘুরিয়ে তাদের সখীর দিকে চেয়ে বললে—চলো! মহাদেবী ভাববেন—কতক্ষণ বেরিয়েচি—

এমন সময় আরও তিন-চারটি তরুণী সেখানে এসে দাঁড়ালো। তাদের পেছনে দেখা গেল আরও দুটি আসচে। পেছনের মেয়েগুলি কলরব করতে করতে আসছিল। ওদের মধ্যে কে বললে—কি হচ্চে সব জটলা ওখানে? কি হয়েচে?

নব বসন্তের বাতাস যেন মদির হয়ে উঠেচে ওদের সম্মিলিত কণ্ঠের তরল হাস্য-কলরবে চূতমঞ্জরী এই পুষ্পেলাবনী তন্বী বালিকাদের নূপুর-নিক্বণে।

হেলিওডোরাস প্রথমদৃষ্টা, সেই অপরূপ রূপসীকে সম্বোধন করে বললে—আমি

চলে যাচ্চি, আমায় ক্ষমা করুন—আপনার পিতার নামটি তো শুনতে পেলাম না ভদ্রে?

একজন মেয়ে ভালো করে মুখ না ফিরিয়েই ঈষৎ উদ্ধত স্বরে বললে—ওঁর পিতার নাম মহারাজ ভাগভদ্র।

তারপর সবাই মিলে একদল বন্যহংসীর মত লঘু পদক্ষেপে লতাবিতানের অন্তরালে অদৃশ্য হ'ল।

হেলিওডোরাস কোনোরকমে বাগান থেকে বার হয়ে এল।

স্বয়ং রাজকন্যা মালবিকা। এঁর রূপের খ্যাতি বিদিশায় এসে পর্যন্ত সমবয়সী দু' একজন বন্ধুবান্ধবের মুখে সে যথেষ্ট শুনে এসেচে। নগরচত্বরে ভ্রমণশীল অনেক মেয়েকে দেখে মনে হয়েচে, রাজকন্যা কেমন রূপসী? এই রকম?

আজ এভাবে...

আশ্চর্য! কিন্তু—

হেলিওডোরাসের মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্চে। উঃ কি গরম আজ! বিশ্রী জায়গা এই বেশনগর। এমন গরমে মানুষ টেঁকে?

অপূর্ব রূপসী এই রাজকন্যা মালবিকা। অপূর্ব...অপূর্ব...অপূর্ব—দেবী মিনার্ভার মত মহিমময়ী, এ্যাফ্রদিতির মত লাস্যময়ী, রূপবতী সাক্ষাৎ রতিদেবী, এ্যাফ্রদিতি, মূর্তিমতী প্রণয়-কবিতা, সাফোর বহ্নিজ্বালাময়ী প্রেমের কবিতা—সাফোর—

৩

আরও এক মাস কেটে গেল। গ্রীষ্মকাল এসে পড়েচে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা মাথায় করে ঝাঁকে ঝাঁকে খরমুজা বিক্রী করতে আনচে বাজারে। এই একমাস কি কষ্টে যাপন করচে হেলিওডোরাস—সেই জানে। কাউকে বলতে পারেনি যে, তার সঙ্গে রাজকন্যা মালবিকার দেখা হয়েছিল, কে কি মনে করবে, কার কানে কি কথা উঠবে। এ-সব হিন্দু-রাজ্যের আইনকানুন বড় কড়া—কথায় কথায় প্রাণদণ্ড। মৃত্যুকে সে ভয় করে না—কিন্তু নির্বোধের মত মৃত্যুকে ডেকে আনার দরকার কি।...সেইদিনটি থেকে তার শয়নে স্বপনে রাজকন্যা মালবিকা। কতবার সেই উদ্যানের আশেপাশে বেড়িয়েচে...দু'দিন প্রাণ তুচ্ছ করে ঢুকেও ছিল, সেই পাষাণবেদীতে গিয়ে বসেছিল কিন্তু সে উদ্যান যেমন সে দিনটির পূর্বে ছিল জনহীন, তেমনি তখনও। অবহেলিত উৎসমুখ, ভগ্ন যক্ষমূর্তি, বনেজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন পুষ্পবাটিকা, লতাগৃহ...শৈবালাচ্ছন্ন পাষাণ-প্রাসাদ...জনশূন্য অলিন্দ...কিন্তু হেলিওডোরাস আর বাঁচে না...সত্যিকার প্রেম জীবনে এই প্রথম এসেচে তার বহ্নিজ্বালা নিয়ে। জীবনে আর সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গিয়েচে...আর একটিবার সেই অপরূপ রূপসী তরুণী দেবীর সঙ্গে দেখা হয় না? সব কিছু দিয়ে দিতে পারে হেলিওডোরাস...একটি-বার চোখের দেখা...সব দিক থেকে অসম্ভব...সে সামান্য রাজদূত, কর্মচারী মাত্র—তাতে বিদেশী, বিধর্মী...অন্যদিকে প্রবলপ্রতাপ মহারাজ ভাগভদ্রের কন্যা সে...

বৈশাখের শেষের দিকে গ্রীষ্মের দাবদাহ আরও বেড়েচে, হেলিওডোরাস কি মনে করে অপরাহ্ণের দিকে সেই উদ্যানবাটিকাতে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করতে করতে গিয়ে হাজির হ'ল। পক্ক আম্রফলের গন্ধ—বৈশাখ-অপরাহ্ণের উষ্ণ বাতাসে। সেই পাষাণবেদীতে আগেকার আরও দু'বারের মত এবারও বসলো। দু'বার নিষ্ফল হয়েচে এই বৃথা প্রতীক্ষা, এবারও হবে সে জানে। তা নয়, সেজন্যে সে আসে নি—কিন্তু এই লতাগৃহের বাতাসে যেন তার দেহগন্ধ মিশিয়ে আছে—পক্ক আম্রফলের গন্ধ যেমন মিশে রয়েচে এই নিদাঘ-অপরাহ্ণের বাতাসে। সে স্বপ্ন দেখতে চায়—ভাবতে চায়—কোথায় কোন্ সুখী প্রেমিকযুগল এমনি জনহীন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পরস্পরের হাত ধরে যূথীবনে বিচরণশীল—কত কথা, কত প্রণয়-গুঞ্জন, কত চুম্বন উভয়ের মধ্যে,—সে আর রাজকন্যা মালবিকা।...এমন যদি কোনদিন—

ভাবতে ভাবতে বোধ হয় তার তন্দ্রাকর্ষণ হয়ে থাকবে। গরম তো বটেই...

হঠাৎ যেন একটি সুন্দর হাস্যমুখ কিশোরমূর্তি তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাকে

এক ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলে বললে—আমি কতকাল অপেক্ষা করবো তোমার জন্যে? ওঠো, ওঠো—

কত এলোমেলো স্বপ্ন থাকে মাথায়।

হেলিওডোরাস জেগে উঠলো। বেদীর গায়ে তার খড়্গখানা ঠেসানো রয়েচে, হাতে নিয়ে বাগানের বাইরে তার রথের কাছে এল।

সত্যিই সে উদ্‌ভ্রান্ত, এমন অবস্থায় সে বেশিদিন এখানে কাটাতে পারবে না। পাগল হয়ে যাবে নাকি শেষে?

পথে পা দিতেই একটি বৃদ্ধ ভিক্ষুক ওর কাছে ভিক্ষা চাইলে। ও অন্যমনস্কভাবে কিছু মুদ্রা ওর হাতে দিতে গেল—দেখলে, সেটি একটি স্বর্ণমুদ্রা—ফিরিয়ে নিতে যাবে, কিন্তু পরক্ষণেই অপরিসীম ঔদাসীন্যের সঙ্গে মুদ্রাটি ভিক্ষুকের হাতে ফেলে দিলে। কি হবে অর্থ তার জীবনে? নীরস জীবন, মরুময় জীবন। পিতা ডিওন সুখে থাকুন, কিন্তু তাঁর বংশের পাপ...প্রজাদের অর্থশোষণ, তাদের উপর অত্যাচার—

ভিক্ষুক স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়ে অপ্রত্যাশিত আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলো—বাসুদেব আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন—

হেলিওডোরাসের অন্যমনস্কতা এক চমকে কেটে গেল। বললে—কি বলচিস তুই? এই, দাঁড়া—

ভিক্ষুক ভয়ে ভয়ে বললে—খারাপ কিছু বলি নি বাবা, বাসুদেব আপনার মনের বাসনা পূর্ণ করুন তাই বলচি—

—কে তিনি?

—মস্ত বড় মন্দির বাসুদেবের—জানেন না?

—খুব জানি। কেন জানবো না—ভারতীয় দেবতার মন্দির। দেখেচি—

—তিনি যে জাগ্রত দেবতা বাবা, যে যা ভেবে মানত করে, তিনি তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। আমি একবার—

হেলিওডোরাস আর একটি মুদ্রা তার হাতে দিয়ে বললে—যা পালা—মুণ্ডু কেটে ফেলে দেবো, আর একটি কথা বললে—

সেই বৈশাখী জ্যোৎস্নারাত্রে উদ্‌ভ্রান্ত হেলিওডোরাসের মনে ভিখিরীর এই কথা যেন দৈববাণীর আশ্বাস নিয়ে এলো। বাসুদেব...ভারতীয় দেবতা বাসুদেব...

মনের বাসনা পূর্ণ হবে তার? সে যা চায়? মালবিকাকে না পেলে বিশাল ইরিথিয়ান সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ছাগপদ বনদেবতাদের খুঁজে বের করবে সামোস দ্বীপের বন্য দ্রাক্ষা-কুঞ্জের নিভৃত আশ্রয়ে, জলপাই ও মার্টল বৃক্ষের ঝোপে ঝোপে আর্দ্র পাষাণমঞ্চে শুয়ে ওক পাইনের তলে সারাজীবন কাটিয়ে দেবে বন্যফল খেয়ে—ছাগপদ স্যাটিরদের দলে মিশে চিরযৌবনা বনদেবীদের সন্ধানে...অথবা, বনদেবীদের প্রয়োজন নেই...রাজনন্দিনী মালবিকার সন্ধানে সে চিরযুগ ঘুরবে—

পরদিন বৈশাখী পূর্ণিমা। সন্ধ্যার সময় সে গিয়ে বাসুদেবের মন্দিরের বিশাল চত্বরের একপাশে এক গাছতলায় দাঁড়ালো। বিরাট পাষাণমন্দিরের চূড়া ঊর্ধ্বাকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—মন্দিরের অভ্যন্তরে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি—মন্দিরের প্রাঙ্গণে শত শত নরনারীর ভিড়—স্থানে স্থানে পুষ্পবিক্রেতা বসে আছে নানা বর্ণের পুষ্পের ডালি সাজিয়ে, দলে দলে মেয়েপুরুষ চলেচে মন্দিরে। সে জানে তাকে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়তো বাধা দেবে। তবুও সে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো সন্ধ্যার অন্ধকারে গা মিশিয়ে। বেশি দূর যেতে সাহস হ'ল না কিন্তু।

দূর থেকে দেখা গেল গর্ভদেউলের অন্ধকারে ধাতুপ্রদীপের আলোয় বাসুদেবের প্রস্তরমূর্তির মুখ। কোথায় যেন সে এ মুখ দেখেচে, ঠিক মনে করতে পারলে না। কোথায়?...কবে?

অন্য লোকের দেখাদেখি হাত জোড় করে প্রার্থনা করলে—হে বাসুদেব, আমি বিদেশী,

বিধর্মী। তোমার কাছে এসেচি। তুমি নাকি মানুষের মনের বাসনা পূর্ণ কর। আমার মনের বাসনা তুমি জানো, আমি অন্য ধর্মের লোক বলে তুমি আমার প্রার্থনা অবহেলা করতে পারবে না কিন্তু। আমার নাম হেলিওডোরাস—তক্ষশিলায় আমার বাড়ী। মনে করে রেখো—

বাসুদেবের বিশাল মন্দিরের পাষাণচূড়া বৈশাখী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেচে। নরনারীর ভিড় ক্রমশই বাড়চে—হয়তো এখানে আজ কোনো উৎসব আছে। নরনারীদের মধ্যে কেউ কেউ তার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে গেল—হয়তো ভাবলে একজন গ্রীক যুবক বাসুদেবের মন্দিরে কি করচে?

একটি লোককে দেখে হেলিওডোরাস তাকে ডাক দিলে। লোকটি ছুটে এল তার কাছে, তার গলায় উপবীত, কপালে চন্দনের ফোঁটা, শিখায় পুষ্প বাঁধা।

হেলিওডোরাসের অনুমান যথার্থ, সে মন্দিরের একজন পরিচারক ব্রাহ্মণ বটে।

লোকটিকে সে বললে—কত লাগে তোমাদের দেবতাকে কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন কিনে দিতে?

একজন গ্রীকের এত ভক্তি দেখে বোধ হয় লোকটি একটু অবাক্ হয়ে ওর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আপনি কি পূজো দেবেন?

—হাঁ।

—যা দেবেন আপনি। দু দীনার, দশ দীনার—

—তক্ষশিলার স্বর্ণমুদ্রা এখানে চলবে ?

—কেন চলবে না হুজুর? শ্রেষ্ঠীর দোকানে ভাঙিয়ে নিলেই চলবে—

—আচ্ছা নিয়ে যাও। আমার নাম হেলিওডোরাস, নাম মনে থাকবে? আমার নামে এই মুদ্রার পরিমাণ ফলফুল মিষ্টান্ন কিনে দেবে—কেমন তো?

—নিশ্চয়ই। বাসুদেবের নামে দিচ্চেন—আপনি দেখচি একজন ভক্ত।

—আচ্ছা যাও—

—আমার দক্ষিণাটা—

হেলিওডোরাস পূজারীকে আরও কিছু দিয়ে সেখান থেকে বার হয়ে মন্দিরের সিংহদ্বারের কাছে এল।

সেই দিনটির পর সে মাঝে মাঝে প্রায়ই বাসুদেবের মন্দিরে এসে একবার করে দেবতাকে তার প্রার্থনা জানিয়ে যায়। মাসের পর মাস চলে গেল, মন্দিরের দেবতা তার প্রার্থনা শুনলেন কই? কোথায় তার মানসী প্রতিমা...যার জন্যে এত আকুল প্রতীক্ষা—কেবল হাঁটাহাঁটিই সার।

৪

একদিন এই অবস্থায় মন্দির থেকে বাড়ী ফিরে দেখলে তক্ষশিলা থেকে দূত এসেচে রাজা এ্যান্টিআলকিডাসের সেনাপতি এ্যারিওস্টোসের পত্র নিয়ে। পত্র খুলে পড়লে, এক্ষুণি তাকে আসতে হবে তক্ষশিলায়। জরুরী দরকার।

হেলিওডোরাস বিস্মিত হ'ল। দূতকে বললে—তুমি কিছু জানো?

সে ব্যক্তি বিশেষ কিছু জানে না। কোন গোপনীয় রাজকার্য হবে।

সেইদিনই হেলিওডোরাস তক্ষশিলায় প্রত্যাবর্তন করলে। সেখানে গিয়ে শুনলে, ব্যাপার গুরুতর বটে। মধ্য এশিয়া থেকে যুদ্ধদুর্মদ শ্বেতকায় হূণদল গান্ধার আক্রমণ করে ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্চে। তাদের অত্যাচারে গান্ধার ও কপিলার বহু গ্রাম জনপদ ধ্বংস হয়েচে, বহু নগরী বিধ্বস্ত হয়েচে। পুরুষপুর, বেণুপত্র, মাত্রাবতী, বলভী প্রভৃতি রাজ্য বিপন্ন। পুরুষপুরের গ্রীকরাজ হিরাক্লিয়াস ও বেণুপত্রের মহা-সামন্ত কুব্জ বিষ্ণুবর্ধন তক্ষশিলার সাহায্য প্রার্থনা করেচেন। রাজা সৈন্যদল পাঠাচ্চেন—হেলিওডোরাসকে যেতে হবে যুদ্ধে। হেলিওডোরাস আদেশ পেলে—সেনাপতি

এ্যারিওস্টোস ও মহাসামন্ত কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনের অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য 'চন্দ্রভাগা' পার হয়ে গান্ধারের দিকে অগ্রসর হচ্চে—ওদের সঙ্গে অবিলম্বে যোগ দিতে হবে।

তিন বছর কাটলো। আজ বলভী, কাল অন্যত্র, পরশু কপিলা। পর্বত, প্রান্তর, নদী। গান্ধার থেকে পুরুষপুর, পুরুষপুর থেকে গান্ধার। শ্বেতকায় হূণেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত—অনেকবার তাদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হ'ল মরুভূমিতে, পর্বতের সংকীর্ণ অধিত্যকায়, কত গণ্ডগ্রামের রাজপথে। মানুষ ম'রে পাহাড় হয়ে গেল—যত না যুদ্ধে তত দুঃখে কষ্টে অনাহারে। হূণের দল রক্তলোলুপ পশুর মত জনপদবাসীদের উপর অত্যাচার করতে লাগলো। রাত্রের আকাশ আলো হয়ে ওঠে দহ্যমান শস্যক্ষেত্রের বা গ্রাম-জনপদের বাসগৃহের রক্ত অগ্নিশিখায়। মানুষ নৃশংস হত্যার লালসায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেচে। যুধ্যমান সৈন্যবাহিনীর নির্মম রথচক্রতলে শত শত নিরীহ নারী, শিশু, অসহায় বৃদ্ধ পিষ্ট হয়ে মেদরক্তে পথের ধূলি কর্দমাক্ত করে তোলে। সর্বগ্রাসী প্রলয়দেব করাল কৃপাণ দুহাতে বন্ বন্ করে ঘোরান—শাণিত খড়্গের ফলকে ফলকে সূর্যকিরণ ঠিক্‌রে পড়ে। কপিলার উত্তর ভাগ শ্মশান হয়ে গেল এই তিন বৎসরে। গভীর নিশীথে সেখানে মুণ্ডমালিনী করালিনী কালভৈরবীর রক্তসিক্ত জিহ্বা লক্‌লক্ করে অন্ধকারে। শিবা-দলের অমঙ্গল চীৎকারে অন্তরাত্মা কাঁপে।

একটি খণ্ডযুদ্ধে হেলিওডোরাস হূণদের হাতে বন্দী হ'ল। কেন তারা তাকে হত্যা করলে না, সে নিজেই জানে না...অবাক হয়ে গেল সে। পশুচর্মের তাঁবুতে উটের দুধ ও ছাতু খেয়ে, পর্যুষিত পশুমাংস খেয়ে সে এক মাস অতি কষ্টে কাটালো। প্রতিক্ষণেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে—অথচ কেন তাকে ওরা মারে না কে জানে? একদিন সে শুয়ে আছে তাঁবুতে, স্বপ্ন দেখলে এক সুন্দর তরুণ তাকে ঠেলা মেরে উঠিয়ে বলচে—আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমায় পথ দেখিয়ে দিচ্ছি পালাবার—

বাইরে অন্ধকার ছুরি দিয়ে কাটা যায়। এখানে ওখানে হূণ-প্রহরীদের অগ্নিকুণ্ড। আব্‌ছায়া অন্ধকারে চলেচে দুজনে, তরুণ আগে—ও পিছনে। পথপ্রদর্শক তরুণের মূর্তি অন্ধকারে অস্পষ্ট, ভালো দেখা যায় না। সম্মুখেই অজিরাবতী নদী।...

—নামো নামো, জলে নামো। মাভৈঃ—

স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো নামচে হেলিওডোরাস। কন্‌কনে বরফগলা জল, প্রথমে এক হাঁটু, পরে কোমর, তারপরে একগলা।

আগে যে যাচ্ছে সে বলচে,—ভয় নেই। চলে এসো। এই জায়গায় নদীর জল কম. চিনে রাখো এই শালগাছ। ডুবে যাবে না।

একগলা জলে পড়তেই হেলিওডোরাসের ঘুম ভেঙে গেল...ভোর হয়েচে। স্বপ্নের কথা সে ভাবল। কে এই কিশোর, এঁকে সে কোথায় আরও স্বপ্নে দেখেচে—পরিচিত মুখ। হঠাৎ মনে পড়লো—সেই বিদিশার প্রাচীন উদ্যানবীথি...সেই বাপীতট (স্বপ্ন-যোগে উদ্‌ভ্রান্ত সে একদিন একেই দেখেছিল)। কেন সে বার বার এই কিশোরকে স্বপ্নে দেখে? কে এই তরুণ?

সারাদিন সে স্বপ্নের কথা ভাবলে। তার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল. আজ রাত্রে সে পালাতে চেষ্টা করলে কৃতকার্য হবে। গভীর নিশীথে তাঁবুর বার হয়ে এল সে—হাতে পায়ে শৃঙ্খল ছিল না। আসবপানমত্ত হূণ প্রহরীরা অগ্নিকুণ্ডের ধারে তন্দ্রামগ্ন। অদূরে অজিরাবতী নদী, ওই সেই শালগাছ। নিঃশব্দ জলে নেমে চক্ষের নিমেষে সে ওপারে উঠলো গিয়ে শালবনের মধ্যে কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনের স্কন্ধাবারে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল সেই শীতকালের প্রথমেই। দীর্ঘকাল পরে হেলিওডোরাস তক্ষশিলায় ফির'ল। মাসখানেকের মধ্যেই রাজার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে মালবে সে পূর্বপদে ফিরে এল। কিসের যেন আকর্ষণ. কে যেন টানে।

একদিন সে নগরীর বাইরে বেড়াতে বেড়াতে সেই উদ্যানবাটীতে প্রবেশ করলে। সেই শৈবালাচ্ছাদিত পাষাণবেদী, সেই লতাগৃহ, সেই যক্ষমূর্তি-শোভিত বাপীতট—সব তেমনি

আছে। যেন কতকাল আগের স্বপ্ন। একদিন সেই রূপসীকে যেন স্বপ্নে দেখেছিল এখানে—সেই বসন্তকালের পুষ্পসৌরভ, সেদিনকার সে সন্ধ্যাটি—সব যেন হিপোলিটাসের সেই করুণ কবিতাটি স্মরণ করিয়ে দেয়—'আপেলগাছের ছায়া, রূপসী-কণ্ঠের গান, সুবর্ণের দ্যুতি—' প্রথম যৌবনের হারানো দিনগুলির দূরাগত বংশীধ্বনি। হায় ভারতীয় দেবতা বাসুদেব! তোমার পাষাণ-দেউলের মত তুমিও কি কঠিন? কিংবা আমি গ্রীক বলে, বিধর্মী বলে, আমায় অবহেলা করলে? কথা কানে তুললে না?...সে আজ নেই। সে রূপসী কোনো দূর-রাজের রাজমহিষী। জীবনে আর তার সঙ্গে দেখা হবে না, সে জানে। কেউ বসে নেই তার জন্যে তিন বৎসর পরে।

৫

আবার বসন্তকাল। সুদীর্ঘ তিন বৎসর পূর্বে এই বসন্তকালে এই সময় মালবিকার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। হেলিওডোরাস কি মনে ক'রে এবার ঠিক তেমনি প্রস্ফুটিত-কুসুমগন্ধে আমোদিত পথ দিয়ে যেতে যেতে রথ থামিয়ে সেই উদ্যানটিতে প্রবেশ করলে। কতদিন এখানে আসেনি। সম্পূর্ণ বাস্তব এই পাষাণবেদী। স্বপ্ন তো নয়—বিশাল রাজপুরীর অন্তঃপুর-প্রান্তে সেই রূপবতী তরুণী রাজনন্দিনীও তো স্বপ্ন নয়। এখানে এসে তবু' যেন কেমন একটু স্পর্শ...একদিন এখানকার এই মৃত্তিকায় তো সে এসে দাঁড়িয়েছিল। আজ সে হয়তো বিবাহিতা—কোনো দূর রাজ্যের রাজমহিষী।

কতক্ষণ কেটে গেল। অপরাহ্ণ অবসান-প্রায়। বনলক্ষ্মী স্নিগ্ধ বাতাস কুসুমগন্ধে ভরে দিয়েচেন।

হিপোলিটাসের সেই কবিতা—'আপেলগাছের ছায়া, তরুণীকণ্ঠের গীতধ্বনি, সুবর্ণের দ্যুতি—'

হঠাৎ পাষাণ-বেদিকার পিছনে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে কার পদধ্বনি শোনা গেল। তবে কি সেই কৃষ্ণকায় উদ্যানরক্ষক যাকে একবার সে কিছু পুরস্কার দিয়েছিল! মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখেই হেলিওডোরাস স্তব্ধ হয়ে রইল বিস্ময়ে, ঘটনার অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতায়। সেই অপরূপ রূপসী তরুণী স্বয়ং।

হেলিওডোরাস উঠে দাঁড়ালো। মেঘাবরোধ ছিন্ন করে বিদ্যুৎশিখা একেবারে তার সামনে—কতদিনের স্বপ্নে চাওয়া তার সেই মানসী প্রতিমা! দীর্ঘ তিন বৎসরে তার রূপ এতটুকু ম্লান হয়নি—বরং বেড়েচে।

তার চেয়েও আশ্চর্য, তরুণী তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললে—ও, আপনি!

হেলিওডোরাসের ঘোর তখনো যেন কাটেনি—মাথা ও শরীর ঝিমঝিম করচে। সে উত্তর দিলে, হাঁ ভদ্রে—

মেয়েটি বললে—আপনি অনেকদিন এদিকে আসেন নি—আপনি ছিলেন না এখানে তাও জানি। হূণদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। বীর আপনি। কিন্তু ফিরেছেন কবে তা শুনিনি।

হেলিওডোরাসের গ্রীক রক্ত শরীরের মধ্যকার শিরায় উপশিরায় আগুন ছুটিয়ে দিলে। সে স্থির দৃষ্টিতে তার প্রেমাস্পদার দিকে চেয়ে বললে—আমি ফিরে এসেচি এবং এই উদ্যানেও এসেচি কয়েকবার, কিন্তু আপনাকে দেখিনি—

মেয়েটি অবাক হয়ে বললে—আমাকে—

—আপনাকে খুঁজেচি যে—এই তিন মাস ধরে। গান্ধার থেকে ফিরে পর্যন্ত কতদিন এসেচি।

মেয়েটির মুখে যেন অতি অল্প সময়ের জন্য কিসের দীপ্তি, ওর শ্বেতপদ্মের আভা-যুক্ত গণ্ডস্থল যেন অতি অল্প সময়ের জন্য রক্তিম হয়ে উঠলো—সে বললে—আচ্ছা, আমি শুনেচি, আপনি নাকি যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে বাসুদেবের মন্দিরে যাতায়াত করতেন প্রায়ই—

—হাঁ, ভদ্রে—কে বললে?

—সবাই বলে। আপনি গ্রীক, আপনার ওখানে যাতায়াত নিয়ে নগরীর লোকজনের মধ্যে একটা কৌতূহলের সৃষ্টি হবেই তো—আপনি কি আমাদের দেবতা মানেন?

—মানি। আজ বিশেষ করে মানচি। বাসুদেব অতি দয়ালু দেবতা, মানুষের প্রার্থনা উনি শোনেন, আজ বুঝলাম।

মেয়েটি বিস্ময়ের সুরে বললে—আজ? কেন?

—আজই। অভয় দেবেন ভদ্রে? মার্জনা করবেন একজন বিদেশী লোকের প্রগল্‌ভতা?

মেয়েটির মুখ হঠাৎ যেন বিবর্ণ হয়ে গেল, পরক্ষণেই সে-মুখে সাহস ও কৌতূহলের দীপ্তি ফুটে উঠলো—সেই সঙ্গে যেন লজ্জাও। মেয়েটি যেন আগে থেকে অনুমান করেচে—সে কি শুনবে এই রূপবান গ্রীক যুবকের মুখ থেকে।

হেলিওডোরাস বললে—ভদ্রে, আপনাকে আর একটিবার দেখবো এই প্রার্থনা করেছিলাম দেবতার কাছে।

মেয়েটি রক্তিম মুখে চুপ করে রইল মাটির দিকে চেয়ে। কি দীপ্তিময়ী, মহিমময়ী মূর্তি! নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশে সেদিনকার মতই রক্তজবা ও যূথীগুচ্ছ। গ্রীবার কি অদ্ভুত ভঙ্গি!

হেলিওডোরাস বললে—আপনাকে না দেখলে বাঁচবো না। আমি এই তিন বৎসর উদ্‌ভ্রান্তের মত বেড়িয়েচি।

মেয়েটি প্রসন্নহাস্যে বললে—কি হবে দেখে বলুন।

দেবী যেন জাগ্রতা হয়ে উঠেচেন—এই অদ্ভুত প্রসন্ন হাসির মধ্য দিয়ে অন্তরশয্যা থেকে সদ্যজাগ্রতা প্রেমের ও করুণার দেবী যেন মূর্ত হয়ে উঠেচেন।

হেলিওডোরাস সহাস্যে বললে—শুধু দেখবো দেবী, আমার হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ—যদি কোনো দিন—

—এই জন্যে যেতেন আপনি বাসুদেবের মন্দিরে? ঠিক বলচেন?

—মিথ্যা বলিনি। কত পুজো দিয়েচি পূজারীদের হাতে—আর—

হেলিওডোরাস কুণ্ঠিত মুখে চুপ করে রইল।

—আর কি?

—মনোবাসনা পূর্ণ হ'লে বাসুদেবকে মূল্যবান কিছু উপহার দেবো—।

রাজকন্যার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। বাসুদেব ওর মূল্যবান উপহার পাবার প্রত্যাশা করেন কি না! এই বিদেশী যুবক বড় সরল। মায়া হয় ওর ওপর।

মুখে বললেন মৃদু হেসে—তারপর বাসুদেবকে ভুলে যাবেন বুঝি?

—জীবন থাকতে নয় দেবী, আপনি আর বাসুদেব এক তারে গাঁথা রইলেন আমার হৃদয়ে। দুজনের কাউকেই ভুলবো না।

রাজকন্যা বললেন—একদিন আমরা বাসুদেবের মন্দিরে গিয়ে আপনাকে দেখি।

হেলিওডোরাস বললে—আমাকে?

—মন্দিরের সিংহদ্বারের কাছে আপনি একজন পূজারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি আমার সখীদের সঙ্গে মন্দিরে ঢুকচি—সুনেত্রা আমাকে দেখালে। সুনেত্রাকে ডাকি—

একটু পরে যে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে রাজকন্যা ফিরলেন, তাকে প্রথম দিন হেলিওডোরাস এখানে দেখেচে।

সুনেত্রা এসেই হেসে বললে—আপনাকে আমরা কতদিন এখানে খোঁজ করেচি—আমার সখী—

রাজকন্যা তর্জনী তুলে শাসনের ছলে লজ্জারুণ মুখে বললেন—চুপ—সাবধান!

সুনেত্রা বললে—এখানে আর আসতেন না কেন? যুদ্ধে গিয়েছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ—কিন্তু ফিরে এসেও ত কতবার এসেচি ভদ্রে—রোজ রোজ তো আর পরের বাগানে আসতে পারি না?

সুনেত্রা ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—রোজ রোজ কি আমরা আপনার সন্ধান করতাম নাকি? আপনি দেখচি বড় ধৃষ্ট—যান এখান থেকে আজ। জানেন এটা আমাদের সখীর মাতামহ

সঞ্জয় দত্তের বাগান? নাৎনীকে দিয়ে গিয়েচেন তিনি। এ শুধু আমার সখীর নিজস্ব বাগান—কার অনুমতি নিয়ে আপনি এখানে ঢুকেছেন জিগ্যেস করতে পারি কি?

রাজকন্যা সকুণ্ঠ প্রতিবাদের সুরে বললেন—ও কি সুনেত্রা!

পরে হাসিমুখে হেলিওডোরাসের দিকে চেয়ে বললেন—আমাদের হূণযুদ্ধের গল্প শোনাবেন?

৬

হায় দেবতা এ্যাপোলো বেলভেডিয়ার। প্রতিদিন চতুরশ্বযোজিত রথে সারা আকাশ পরিভ্রমণ করে সন্ধ্যায় ফিরে আসেন নিজ গৃহে—আপনি দেখেন নি হেলিওডোরাসের দুঃখ...ডিওন-পুত্র হেলিওডোরাসের? আপনি কি এখন আবার দেখচেন না, কত দুপুরে কত সুন্দর শরৎ ও শীতের অপরাহ্ণে বিদিশার পূর্বতন মহামাত্য সঞ্জয় দত্তের প্রাচীন উদ্যানবাটিকায় দুটি প্রেমিক হৃদয়ের গোপন লীলা-খেলা, শুনচেন না তাদের আনন্দ-গুঞ্জন? মাধবীপুষ্পমঞ্জরীর আড়ালে যার বিকাশ, উদ্যানবাটিকার অরণ্যছায়ায় তার ব্যাপ্তি—দুটি তরুণ হৃদয়ে সে সসঙ্কোচ প্রেম, বিচ্ছেদকালীন ব্যাকুলতা—দেখেন নি এ সব? না দেখেচেন না দেখেচেন, হেলিওডোরাস আর আপনাকে চায় না। দুঃখের দিনে যিনি কৃপা করে তার মনোবাসনা পূর্ণ করেচেন, সেই দেবতাই হেলিওডোরাসের একমাত্র উপাস্য। ভারতবর্ষের পবিত্র মৃত্তিকায় সেই দেবতার অপার করুণার এ ইতিহাস সে অক্ষয় ক'রে রেখে যাবে—যদি গ্রীক রক্ত তার দেহে থাকে।

একদিন মালবিকা বললে—হেলিওডোর, বাবাকে বলো—

—মহারাজ কি শুনবেন?

—তাহ'লেও তুমি বলো—গুপ্তভাবে আমাদের এমন সাক্ষাৎ আর বেশিদিন চলবে না।

—আমিও তোমাকে চাই মালবিকা—আমারও চলবে না তোমাকে না পেলে—

—সব হয়ে যাবে বাসুদেবের কৃপায়। চলো আজ দুজনে মন্দিরে যাই—তুমি একদিক থেকে, আমি অন্যদিক থেকে। মানত করে আসি তাঁর কাছে। তাঁর কৃপায় সব সম্ভব।

হেলিওডোরাস ইতিমধ্যে রাজসভায় যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিল নানাদিক থেকে। তক্ষশিলার প্রধান অমাত্যের পুত্র সে—উভয় রাজ্যের মধ্যে একটা মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হয়ে উঠেচে হেলিওডোরাসের রাজদূতরূপে উপস্থিতিতে। তরুণ দলের সে একজন নেতা—তার সুঠাম দেহকান্তি ও পুরুষোচিত ক্রীড়া ও ব্যায়ামনৈপুণ্যের জন্য তরুণ নাগরিকগণ তাকে অত্যন্ত মানে। তার ওপর হেলিওডোরাসের খ্যাতি রটে গিয়েছিল যে, সে গ্রীক হ'লেও বাসুদেবের একজন ভক্ত।...

নৃপতি ভাগভদ্র প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হঠাৎ কেন এ বিবাহে সম্মতি দিলেন তা কেউ জানে না।

স্বয়ং মহারাণী পট্টমহাদেবী কুমারললিতা তার খবর রাখেন।

সেদিন নিশীথরাত্রে রাজা ঘর্মাক্ত-কলেবরে পর্যঙ্ক থেকে ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে উঠলেন।

রাজ্ঞী ব্যস্তভাবে বললেন—কি হয়েচে গো, অমন করচো কেন?

—একটু জল দাও—উঃ কি ভীষণ—! জল দাও—

রাজ্ঞী স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে জল দিয়ে বললেন—কি হয়েচে—কি হয়েচে—

নৃপতি এক দুঃস্বপ্ন দেখেচেন। এক চণ্ডপুরুষ তাঁর কাছে এসে এক বিশাল শূল আস্ফালন করে হুঙ্কার দিয়ে বলচেন...রে ভাগভদ্র, আমি কে চেনো? তোমার বংশের কুলদেবতা। হেলিওডোরাসের সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহে যদি সম্মতি না দাও—তবে তোমার মালবরাজ্য এই শূলের আগায় উড়িয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে ফেলে দেবো—ও আমার জন্ম-

জন্মান্তরের ভক্ত। বলেই সেই চণ্ডপুরুষ কি ভীষণ হুঙ্কার ছাড়লে!...শূলের অগ্রভাগ থেকে রক্ত অগ্নিশিখা যেন দাউ দাউ করে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়লো ঘরে ঘরে...উঃ, কি ভীষণ দুঃস্বপ্ন।

রাজ্ঞী বললেন—বেশ তো। হেলিওডোরাস সুন্দর ছেলেটি, তাকে আমি দেখেচি—মালবিকার সঙ্গে বড় সুন্দর মানাবে। তোমার মেয়েরও সম্পূর্ণ ইচ্ছে—

—বল কি রাজ্ঞী! মেয়ে কি ওকে দেখেচে?

রাজ্ঞী হতাশার সুরে হাত-দুটি শূন্যের দিকে ছুঁড়ে বললেন—নির্বোধ নিয়ে ঘর করা যায় তো অল্পবুদ্ধি নিয়ে ঘর করা চলে না—কথাতেই বলেচে। ওরা হ'ল আজকালকার মেয়ে—আর কি আমাদের মত সেকাল আছে? কোনো অমত করো না। হেলিওডোরাস আমাদের ধর্ম গ্রহণ করবে বিয়ে হ'লেই, তুমি দেখো। আর ওরকম আজকাল তো হচ্চেই। তক্ষশিলায় আমার এক পিসতুতো বোনের ননদের যে একজন গ্রীক তালুকদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েচে—

অতএব হেলিওডোরাসের সঙ্গে মালবিকার বিবাহে বাধা রইল না।

পিতা ডিওন পত্রবাহকের হাতে লিখে পাঠালেন—খুব সুখের কথা বাবা। আমি তোমাকে এক পয়সা দিয়ে যেতে পারবো না। নিজের আখের যাতে ভাল হয় তাই করো। অর্থই গান্ধারের আপেল, কপিলার সুরা এবং কাশ্মীরী শাল। রাজকন্যাকে বিবাহ কর, ক্ষতি নেই, আখের দেখে নিও।

হেলিওডোরাসের সঙ্গে মালবিকার বিবাহের কয়েকদিন পরে রাত্রে গভীর সুষুপ্তির মধ্যে হেলিওডোরাস দেখলে, সেই নবীন সুন্দর কিশোর তাকে ঘুমের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আবদারের সুরে অভিমানে রাঙা ঠোঁট ফুলিয়ে বলচে—আমার কথা মনে আছে? আমায় যা দেবে—কবে দেবে? মনে থাকবে?

হেলিওডোরাস চিনলে—দু-বৎসর পূর্বে মহামাত্য সঞ্জয় দত্তের উদ্যানে এই কিশোরকে সে স্বপ্নে দেখেছিল—হূণ-তাঁবুতে রাতের অন্ধকারে এ'কেই সে স্বপ্নে দেখে। একদিন মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহের মুখ দেখে তার মনে হয়েছিল কোথায় যেন এ মুখ সে দেখেচে। আজ সে বুঝেচে—

হেলিওডোরাস বিস্ময়ে ও আনন্দে শিউরে উঠলো ঘুমের মধ্যে। ইনিই সেই পরম করুণাময় বাসুদেব! জয় হোক তাঁর। জয় হোক স্বপ্ন-বাসুদেবের! হেলিওডোরাস তোমাকে ভুলবে না।

হেলিওডোরাস ভোলেওনি।

দু হাজার বছর মহাকালের বীথিপথের অস্পষ্ট কুজ্ঝটিকায় কোথায় মিলিয়ে গিয়েচে। বিদিশা নগরী ও তার বাসুদেবমন্দির আজ অতীতের ভগ্নস্তূপ—কিন্তু তার প্রাঙ্গণতলে পরম ভাগবত হেলিওডোরাসের বিশাল গরুড়-স্তম্ভ ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।...ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।...

রাজপুত্র

কাণ্ডীর রাজপুত্র এবার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। রাজ্যময় ধুমধাম পড়ে গেছে। কাণ্ডীর উত্তর প্রান্তে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুমন্দির। পুরোহিত গেছেন সেখানকার আশীর্বাদী নির্মাল্য আনতে, লোক পাঠানো হয়েছে প্রয়াগতীর্থ থেকে জল আনবার জন্যে। সেই জলে স্নান করিয়ে বিষ্ণুর পূজা-নির্মাল্য তাঁর কপালে ঠেকিয়ে রাজপুত্রকে পুরনারীরা বরণ করবেন।

রাজা বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করেচেন। রাত্রে প্রায় দ্বিপ্রহর। কৌশলরাজের দূত কি এক প্রস্তাব নিয়ে এসেচে, রাজা তাই আজ সারাদিন ধরে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন—শরীর ও মন দুইই বড় ক্লান্ত। এমন সময়ে রাজকুমার কক্ষে ঢুকে পিতাকে প্রণাম করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা বললেন, "চন্দ্রসেন, তোমার কিছু বলবার আছে?"

রাজপুত্র বিনীত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, "বাবা, গত বছর যখন গুরুগৃহ থেকে ফিরে আসি তখন আপনি বলেছিলেন আমায় কিছুদিন দেশভ্রমণে যাবার অনুমতি দেবেন। আপনার অসুখের জন্যে এতদিন কোন কথা বলি নি। আমি এইবার সে বিষয়ে অনুমতি চাই।"

মহারাজ বিস্মিতস্বরে বললেন, "কি বিষয়ে অনুমতি চাই বলো?"

"আমি দেশভ্রমণে যেতে চাই বাবা।"

"তুমি জানো তোমার যৌবরাজ্যের অভিষেকের সব আয়োজন করা হয়েচে?"

"সেই জন্যেই তো আরও বেশি করে যেতে চাই, বাবা। আমি কাঞ্চী ছাড়া জীবনে কখনও কিছু দেখলুম না, কিছু জানলুম না,—কানে শুনেচি উত্তরে হিমবান পর্বত আছে, দক্ষিণে সমুদ্র আছে, পশ্চিমে সিন্ধুনদ আছে—কাঞ্চী ছাড়া আরও কত রাজ্যদেশ আছে, কিন্তু উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সে আমি চোখ থেকেও অন্ধ। যার জীবনে কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তাকে দিয়ে দেশ-শাসন কি করে হবে! আমায় যেতে দিন বাবা!"

এর দুদিন পরে রাজ্যের লোক সবিস্ময়ে শুনলে রাজকুমার চন্দ্রসেনের অভিষেক-উৎসব সম্প্রতি স্থগিত থাকলো—কারণ তিনি চলেচেন বিদেশভ্রমণে—একা, সঙ্গে তিনি কাউকে নিতে রাজী নন। সত্যই রাজকুমার কাউকে সঙ্গে নেন্ নি।

আজ সপ্তাহ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, চন্দ্রসেন তাঁর প্রিয় সাদা ঘোড়াটিতে চড়ে একা পথ চলেচেন। আর সঙ্গে থাকবার মধ্যে বাঁদিকে খাপে-ঝোলানো পিতৃ-দত্ত তলোয়ারখানি। আর আছে চোখে অসীম তৃষ্ণা, বুকে অদম্য সাহস ও নির্ভীকতা। কাঞ্চী রাজ্যের সীমা ছাড়িয়েও দুদিনের পথ চলে এসেছেন, কত গ্রাম, মাঠ, বন, নদী পার হয়ে চলেচেন—সবই অচেনা, এ তাঁর নিজের রাজ্য কাঞ্চী নয়, এখানে তিনি একজন অজানা পথিক মাত্র।

তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। এক নদীর ধারে তাঁর ঘোড়া এসে পৌঁছুলো তাঁকে নিয়ে। প্রকান্ড নদী—বৈকালের রাঙা আলোয় ওপারের বনরেখা অপূর্ব দেখাচ্ছে। অতবড় নদী কি করে পার হবেন, রাজকুমার চিন্তায় পড়লেন। কোনোদিকে মানুষের বাসের চিহ্ন নেই—সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে ধূসর হয়ে এলো। বিজন নদী—তীরের ছন্নছাড়া চেহারাটা সুমুখ-আঁধার রাতে গাঢ় ছায়ায় যেন আরও বেশি ছন্নছাড়া হয়ে ফুটে উঠলো।

ওপারে বহু দূরে একটা পাহাড়—নীল চূড়া একটু একটু চোখে পড়ে। রাজকুমার চেয়ে থাকতে থাকতে পাহাড়ের ওপর থেকে আগুনের রাঙা একটা হল্‌কা হঠাৎ আকাশের পানে লক্ লক্ করে জ্বলে উঠেই দপ্ করে নিবে গেল। রাজপুত্র অবাক্ হয়ে সেদিকে চেয়েই আছেন এমন সময়ে একটা প্রকান্ড বাজপক্ষী সন্ধ্যার আকাশে ডানা মেলে নদীর উজান দিক থেকে উড়ে এসে তাঁর মাথার ওপর তিন চার বার চক্রাকারে ঘুরে আবার কোন্‌দিকে অদৃশ্য হোল।

রাজকুমারের নির্ভীক মনও একটুখানি কেঁপে উঠলো। তিনি জানতেন তাঁদের বংশে কারুর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মাথার ওপর গৃধ্রজাতীয় পাখী তিনবার ওড়ে—কেউ কেউ বলেচেন, বিশেষ করে শাকুন-শাস্ত্রবিৎ কোন গণৎকার সেবার বলেছিলেন যে, এই গৃধ্র তাঁদের পূর্বপুরুষদের হাতে অন্যায়ভাবে অবিচারে নিহত কোনো শত্রুর আত্মা—বহুকাল ধরে সে পৈশাচিক উল্লাসের সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যায় নিজ শত্রুর বংশধরের মৃত্যুর পূর্বাভাস। কোথা থেকে আসে, কোথায় আবার উড়ে চলে যায়—কেউ বলতে পারে না।

রাতের সঙ্গে সঙ্গে এল হাড়কাঁপুনে ধারালো শীত। একটা বড় গাছও কোথাও নেই যার তলায় আশ্রয় নিতে পারেন। অবশেষে একটা মাটির ঢিপির পেছনে ঘোড়া থেকে নেমে রাজপুত্র নিজের আসন বিছালেন—সেখানটাতে হাওয়া বেশি লাগে না—শুক্‌নো লতাকাঠি

কুড়িয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করে সে রাত্রের মতো তিনি সেখানেই রইলেন। উপায় কি?

গভীর রাত্রে রাজপুত্রের ঘুম ভেঙে গেল। বহুদূরে যেন কাদের আর্তনাদ—মৃত্যু-পথের পথিকদের অন্তিম চীৎকারের মতো করুণ। রাজপুত্র নিজের অলক্ষিতে একবার শিউরে উঠলেন। শয্যার পাশের আগুন নিবে গিয়েচে, উঠে ভালো ক'রে আগুন জ্বাললেন। সারারাত্রির মধ্যে ঘুম আর এলো না কিন্তু।

ভোরের দিকে একটা ডিঙি পাওয়া গেল। তাতে পার হয়ে রাজকুমার ওপারে গিয়ে উঠলেন। ডিঙির মাঝি আধ-পাগল এবং বোধ হয় কানে আদৌ শুনতে পায় না। রাজ-কুমারের প্রশ্নের কোন উত্তর সে দিতে পারলে না!

প্রথমে একটা মরুভূমির মতো মাঠ—ঘাস, খড়, গাছপালা কিছুই নেই—কটা-রঙের বালির পাহাড় এখানে-ওখানে। অনেক দূর গিয়ে একটা জনপদ। কিন্তু কেমন একটা নিরানন্দ ভাব চারিদিকে। পথ দিয়ে পথিক চলে না, দোকান-পসারে খদ্দের নেই, নদীর ঘাটে স্নানার্থীর দল নেই, মাঠে চাষারা চাষ করে না—যেন কেমন একটা বিষাদ ও অমঙ্গলের ছায়া চারিদিকে।

রাজকুমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বড় কাতর হয়েছিলেন। নিকটেই একটি গৃহস্থের বাড়ী। সেখানে গিয়ে আশ্রয় চাইতেই তারা খুব যত্নের সঙ্গে আশ্রয় দিলে। অনেকদিন পরে রাজকুমার ভালো খাবার খেলেন, ভালো বিছানায় বিশ্রাম করতে পেলেন, মানুষের সঙ্গ অনেক দিন পরে বড় প্রিয় মনে হ'ল। কয়েকদিন সেখানে রয়ে গেলেন তিনি। গৃহস্থের একটি ছোট মেয়ে ও ছোট ছেলের সঙ্গে রাজকুমারের বড় ভাব হ'ল। তারা তাঁকে ফুল তুলে মালা গেঁথে দেয়, দুপুরে তাঁর কাছে বসে গল্প শোনে, তাদের শত আব্দার প্রতি-দিন তাঁকে সহ্য করতে হয়। ছোট ছেলেটির উপদ্রবের তো আর অন্ত নেই।

অল্পদিনের মধ্যে রাজকুমার সে বাড়ীর সবারই তো বটেই, গ্রামেরও সকল লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলেন। এত সুন্দর মুখশ্রী, এমন সুন্দর কান্তি, এমন মিষ্টি স্বভাবের মানুষ তারা কখনও দেখেনি। রাজকুমারের আসল পরিচয় কেউ জানে নি। তিনি কাউকে সে সব কথা বলেন নি—সবাই ভাবে তিনি একজন গৃহহীন পথিক—হয়তো তাঁর কেউ কোথাও নেই। এতে সবারই স্নেহ তাঁর ওপর আরও বেড়ে যায়, কিসে তিনি সুখে থাকবেন, কিসে আত্মীয়হীন নিঃসঙ্গ প্রবাস-কষ্ট তাঁর কমবে—সবারই এ চেষ্টা।

তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, এমন সুন্দর চেহারার ছেলে নিশ্চয়ই কোন বড় ঘরের হবে। গ্রামের যিনি মণ্ডল, তাঁর এক মেয়ে পরমাসুন্দরী—সবাই বলে ওই ছেলেই এ মেয়ের উপযুক্ত পাত্র। বিধাতা ওর জন্যেই যেন এ দেবতার মতো সৌম্যকান্তি ছেলেটিকে কোথা থেকে জুটিয়ে এনেচেন। মণ্ডলগৃহিণীও রাজকুমারকে একদিন দূর থেকে দেখে এত পছন্দ করলেন যে, তিনি স্বামীকে জানিয়ে দিলেন—যদি ঐ ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয় ভালোই—নইলে মেয়ে চিরকুমারী থাকুক, তাঁর আপত্তি নেই।

রাজকুমার কিন্তু কিছুতেই তেমন আমোদ পান না। তাঁর মনে কি একটা বিপদের ছায়া সকল আনন্দকে ম্লান করে রাখে। একবার ভাবেন হয়তো বাপ-মাকে অনেকদিন দেখেন নি বলে এমন হয়—কিন্তু তাঁর মন বলে তা নয়, তা নয়—ওসব সামান্য সুখ-দুঃখের ব্যাপার এ নয়—এ এমন একটা কিছু, যার কারণ আরও গভীর, জীবন-মরণ নিয়ে এর কারবার।

ক্রমে এলো সে মাসের কৃষ্ণপক্ষ। রাজকুমার অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন বাড়ীতে সবারই চোখে জল—গ্রামসুদ্ধ লোক সকলে বিষণ্ণ, নিরানন্দ। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলে না, কারণ জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর পাওয়া যায় না। সবাই কিসের ভয়ে জুজু হয়ে আছে যেন।

অবশেষে রাজকুমার কথাটা শুনলেন। এখান থেকে এক যোজন দূরে গৃধ্রকূট পাহাড়ের ওপর রাজগুরু এক কাপালিকের সাধন-পীঠ। প্রতি অমাবস্যায় সেখানে নরবলির জন্য প্রতি গ্রাম থেকে পালাক্রমে একটি তরুণবয়স্ক লোক পাঠানো চাই-ই। রাজার হুকুম। এবার এ গ্রামের পালা।

শোনা মাত্র রাজকুমার কর্তব্যে স্থির করে ফেললেন। তাঁর পিতৃদত্ত তূণের তীক্ষ্ণ

ইস্পাতের ফলা পরানো যে বাণ তা কি শুধু নিরীহ পশুপক্ষী শিকারের জন্যে? "ক্ষতি হতে ত্রাণ করে এই সে কারণ—মহান ক্ষত্রিয় নাম বিদিত জগতে।"—অস্ত্রগুরুর সে উপদেশ রাজকুমার কি ভুলে গিয়েচেন এত শীগ্‌গির!

অমাবস্যার দিন মন্ডলের বাড়ীতে পাশার সাহায্যে নির্ধারিত হবে এবার কে গ্রাম থেকে যাবে। রাজকুমার একথা শুনলেন। অমাবস্যার পূর্বদিন গভীর রাত্রের অন্ধকারে তিনি চুপি চুপি শয্যাত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন—কেউ জানে না। সকালে উঠে তাঁকে আর কেউ দেখতে পেলে না।

মন্ডলের বাড়ীতে পাশার মজ্‌লিসে যার নাম উঠল সে এক গৃহস্থের একমাত্র পুত্র। সবাই চোখের জলে ভেসে তাকে বিদায় দিলে। তার বৃদ্ধ পিতা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চললো কাপালিকের কাছে—যদি হাতে-পায়ে ধরে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে পারে এই দুরাশায়।

গৃধ্রকূট পর্বতের পাদদেশে গিয়ে তারা যা দেখলে, তাতে তারা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল। বড় জামগাছটার তলায় দুটো মৃতদেহঃ একটা তাদের গ্রামের সেই তরুণ অতিথির, আর একটি কাপালিকের—দেখে মনে হয় দুজনেই পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করেচে। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ সবাই ছুটে এলো দেখতে। যে নিজের প্রাণ দিয়ে তাদের চিরকালের জন্য বিপদমুক্ত করে গেল—রাজার ভয়ে গোপনে চোখের জলে ভেসে তার শেষ সৎকার সম্পন্ন করলে।

রাজকুমারের সত্যিকার পরিচয় সে দেশের লোক তখনো জানে নি।

শেষ লেখা

গৃহপ্রাঙ্গণে ভবনশিখী পাখা মেলে নেচে বেড়াচ্ছে অতিমুক্তলতার পাশে পাশে। কাল রাত্রে প্রমোদগৃহে যে জাতিপুষ্পের সুগন্ধি মাল্য ব্যবহৃত হয়েছিল, সেটি বাতায়ন-বলভিতে প্রলম্বিত বোধ হয় পরিত্যক্ত। আর সেটির কি দরকার!

অতিমুক্তলতার ফাঁকে ফাঁকে দূরের নীল শ্রশলশ্রেণীর তুষার-মুকুট চোখে পড়ে। মাসটা চৈত্র কিন্তু বেশ শীত!

সুন্দরী ভদ্রা প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হয়ে বহির্দ্বারের কাছে এসে তরুণ স্বামীর দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, রও, তুমি কখন ফিরবে বলে যাও।

নন্দকে অত্যন্ত অনিচ্ছায় যেতে হচ্ছে গৃহ ছেড়ে। তিনি যেতে আদৌ ইচ্ছুক নন, নবপরিণীতা সুন্দরী বধূ প্রাসাদঅলিন্দে আলুলায়িতকুন্তল অবস্থায় দণ্ডায়মানা, শাক্য-বংশের প্রাসাদ একাই যেন আলো করেছে এই প্রভাতকালে, নবোদিত সূর্যের আলো ম্লান হয়েছে ওর সপ্রেম চাহনির আলোয়!

রাজকুমার নন্দ একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। উপায় নেই, যেতেই হবে। কাল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান জিন তথাগত ন্যগ্রোধারাম বিহার থেকে শাক্যদেব প্রাসাদে কনিষ্ঠ নন্দের আলয়ে ভিক্ষা করতে এসেছিলেন।

দাদা কতকাল পরে আবার শাক্যদের প্রাসাদ আলো করেছেন ফিরে এসে। মহাপ্রজাপতি গোতমী যদিও নন্দকে অঙ্কে পেয়েছিলেন প্রৌঢ় বয়সে, তবুও শাক্যকুলগৌরব ভগবান্ বুদ্ধকে তিনিই মানুষ করেছিলেন তাঁর মাতার মৃত্যুর পর থেকে। কুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে যাওয়ার পরে তাঁর দুঃখের সীমা ছিল না। নন্দকে কোলে পেয়েছিলেন, তাই—নয়তো বাঁচতেই পারতেন না। সুন্দর, সুঠাম, সুশীল নন্দ। তাঁর চোখের পুতুল, তাঁর কত-দিনের স্বপ্ন!

মহাপ্রজাপতি গোতমীর কৈশোরকালের নাম ছিল মায়া। যখন তিনি প্রথমে শাক্য-রাজপ্রাসাদে আসেন নববধূরূপে, তার আগেই তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী মহামায়ার বিবাহ হয়েছিল এখানে। যখন মহামায়ার কোন পুত্রসন্তান হল না অনেকদিন পর্যন্ত, তখন প্রজারা রাজা শুদ্ধোদনকে পুনরায় বিবাহ দিলে মহামায়ার বড়দিদি মায়ার সঙ্গে। তার

পর মহামায়ার কোলে এলেন সিদ্ধার্থ। তার কতদিন পরে মায়া পেলেন আয়ুষ্মান নন্দকে নিজের ক্রোড়ে।

সেই নন্দ!

কপিলাবাস্তু নগরীর সমাজস্থান, চতুষ্পথ, হট্ট, ক্রীড়াস্থান অন্ধকার ক'রে যেদিন রাজকুমার সিদ্ধার্থ গভীর নিশীথে গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন, সেদিন এই নন্দই ছিলেন রাজা শুদ্ধোদনের ও মায়ার একমাত্র ভরসা। নন্দ তখন বালক, দাদা গৃহত্যাগ করাতে তিনি কেঁদে আকুল হয়েছিলেন। বড় ভালবাসতেন তিনি দাদাকে। কপিলাবাস্তুর রাজভবন, প্রাচীর, গোপুর ও চত্বর হাহাকারে ভরে গিয়েছিল সেদিন।

ইতিমধ্যে আয়ুষ্মান রাজকুমার নন্দ যৌবনাবস্থায় উপনীত হয়েছেন, জ্যেষ্ঠের গুণগান ও যশঃসৌরভ সুদূর কাশী, রাজগৃহ ও পাটলিপুত্র থেকে বাতাসে বহন ক'রে এনেছে কপিলাবাস্তুর চতুষ্পথে। ভগবান জিন দেবতা, তিনি মহাবাণী প্রচার করেছেন দিকে দিকে। রাজগৃহের নৃপতি ও শ্রেষ্ঠীদের শিরোভূষণ তাঁর সেই দাদার পদপ্রান্তে আনমিত হয়েছে— এ কথাও কত লোকের মুখে মুখে এসে পেঁীছেচে এখানে।

কতকাল পরে সেই তাঁর দাদা প্রত্যাগমন করেছেন কপিলাবাস্তুতে। আজ কত আনন্দের দিন শাক্যকুলের! অবশ্য তিনি প্রাসাদে আসেন নি, ন্যগ্রোধারাম বিহারে শিষ্যপরিবৃত হয়ে বাস করছেন। কাল সন্ধ্যায় এসেছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা আয়ুষ্মান নন্দের আলয়ে ভিক্ষা করতে। ভ্রাতৃবধূ কল্যাণী ভদ্রা অত্যন্ত আদর ক'রে তাঁকে অন্ন পরিবেষণ করেছিলেন, অতি সুস্বাদু অন্ন। যাবার সময় অনেকগুলো সুপক্ব ফল দিয়েছিলেন সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে। ভগবান তথাগত কনিষ্ঠকে আদেশ ক'রে গেলেন—এ ফলগুলো তুমি কাল সকালে নিশ্চয়ই আমার কাছে নিয়ে আসবে। তুমি নিজে এসো। অন্য কারও হাতে পাঠিও না।

তাই আজ রাজকুমার নন্দ সেই ফলগুলি একটি বেতসলতায় প্রস্তুত আধারে রক্ষা ক'রে আধারটি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চললেন।

সুন্দরী ভদ্রাকে ছেড়ে নন্দ একদন্ডও থাকতে পারেন না কোথাও! মাত্র সম্বৎসর অতীত হয়েছে নন্দ বিবাহ করেছেন। নবপরিণীতা কিশোরী পত্নীকে চোখের আড়াল করার সাধ্য নেই নন্দের। দুজনে মিলে একসঙ্গে অঞ্জন, অভ্যঞ্জন, স্নান, গাত্রসংবাহন, আমিষ ও মধু সেবন, চিত্রকর্ম, মাল্যধারণ, চন্দন-অনুলেপন—এই সব চলছে। এই কয়-দিনের প্রতিদিনই নন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাগুরু ভগবান তথাগত জিনকে দর্শন করতে গিয়ে-ছেন—কিন্তু না, বেশিক্ষণ থাকতে পারেন নি। সর্বদা ভদ্রার মুখ মনে পড়ে। সমস্ত জগতের মধ্যে ওই একখানি সুন্দর মুখ গড়েছিলেন বিধাতাপুরুষ। ওই একখানি রূপের মধ্যে সারা পৃথিবীর রূপের মঞ্জুষা। ওকে ব'লে বোঝাতে হয় না, ফুটন্ত ফুলের মত ওর বাণী ওর রূপের মধ্যেই মুখর হয়ে উঠেছে দিনরাত।

ভগবান জিন বলতেন, নন্দ, এখুনি যাবে?

সলজ্জ শিরঃকম্পনের সঙ্গে নন্দ বলতেন, হ্যাঁ দাদা।

—বেশ, যাও।

কদিনই এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন প্রশান্তবুদ্ধি, দূরদর্শী মহাপুরুষ, কিছু বলেন না। কনিষ্ঠের গমনপথের দিকে স্নেহ ও অনুকম্পার দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখেন।

আজ এত সকালে এখনই যেতে হবে বধূকে ছেড়ে, মন সরছিল না রাজকুমারের। কিন্তু উপায় নেই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ লঙ্ঘন করার সাধ্য নেই। যেতে হবেই।

ভদ্রা বললে, কখন আসবে?

—বেলা দুদণ্ডের মধ্যে।

—ভগবান জিনকে আমার প্রণাম জানিও। আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্যে।

—একসঙ্গে অভ্যঞ্জন করব ফিরে এসে। স্নান ও কেলিও।

ভদ্রার বিশাল নয়ন দুটি কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, হাততালি দিতে দিতে বললে, খুব ভাল খুব ভাল, শীগগির এসো আয়ুষ্মান, অপেক্ষা করে থাকব তোমার জন্যে—

একটা পেচক কর্কশ রবে হর্ম্যের উপর দিয়ে উড়ে গেল কি?

নন্দ বা ভদ্রা কেউ শুনতে পেলেন না সে রব। সুখী নন্দ, সুমনা ভদ্রা। কপিলাবাস্তুর

প্রাসাদশিখরে দিবসের প্রথম প্রহর ঘোষণা করছে সূর্যদেবের তরুণ কিরণ।

ন্যগ্রোধারাম বিহারে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের প্রভাত-পরিচর্যা সমাপ্ত হয়েছে। ভগবান জিন আজ যেন আগ্রহের দৃষ্টিতে বার বার চাইছেন পথের দিকে।

একজন ভিক্ষুককে বললেন, আবুস, রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নি।

—কেন?

—এ স্থানে কীটের উপদ্রব। এক পাত্র সুবচল রস আমাকে দিও পানের জন্যে। নতুবা অনিদ্রাহেতু শিরঃপীড়া উপস্থিত হবে।

—আপনার যেমন আজ্ঞা। আপনার ইচ্ছাই তপস্যার আত্যন্তিকী সিদ্ধি।

এমন সময়ে বিনীত হাস্যমুখে রাজকুমার নন্দ জ্যেষ্ঠের পাদবন্দনা ক'রে ফলপূর্ণ করণ্ডকটি তাঁর সামনে স্থাপন করলেন। ভগবান জিন কনিষ্ঠের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হে নন্দ, শরীর ভাল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ফলপূর্ণ করণ্ডকটি কি খুব ভারী?

—আজ্ঞে না।

—ওই ভারটি স্বচ্ছন্দে বহন করলে কেন, বল তো? অন্য কারও জন্যে কি বহন করতে?

—ভন্তে, না।

—এ কথা সত্যি কি না?

—হ্যাঁ ভন্তে, এ কথা সত্যি।

—তবে এখন কেন বহন করলে ওটি?

—ভগবান, আপনাকে ভালবাসি। আপনার কর্মে আমার আনন্দ। কষ্ট হবে কেন?

রাজকুমার নন্দ আরও কিছুক্ষণ পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। বিহারের এদিকে-ওদিকে গেলেন। এদিকে মন ছটফট করছিল, বেশিক্ষণ আর থাকা চলে না। চক্ষুলজ্জার খাতিরে আরও অর্ধদণ্ড এদিক-ওদিক করতে হল। তারপর ভগবান জিনের পাদবন্দনা ও প্রদক্ষিণ ক'রে বিদায় প্রার্থনা করলেন। হায়, তখন তিনি জানতেন না যে বাজপাখীর কবলগত তিনি। বুদ্ধদেব কনিষ্ঠের দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, কোথায় যাবে নন্দ?

—গৃহে।

—গৃহ? গৃহে আসক্ত হয়ো না। কেননা, গৃহ--তৃষ্ণা, রাগ, বিবাদ, মন্যু, মান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্য, মনঃপীড়া ইত্যাদির নিদান এবং জন্ম-মরণের আলবাল। গৃহ ছেড়ে বাইরে এসেছ আমারই ইচ্ছায়। আমি তোমাকে স্নেহ করি। তোমার মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা রয়েছে। বৃথা গৃহবাসী হয়ে সে সম্ভাবনা নষ্ট ক'রো না। জাগতিক সুখ দুদিনের, তার জন্যে চিরস্থায়ী সুখকে নষ্ট করবে কেন? আমার ইচ্ছা তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর।

রাজকুমার নন্দের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এ কি সর্বনেশে কথা পূজনীয় জ্যেষ্ঠের মুখে! ভগবান জিন তাঁর সঙ্গে রহস্য করছেন না তো?

বুদ্ধদেব কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিরুত্তর দেখে আবার বললেন, কি নন্দ? কথা বললে না যে?

নন্দ অতীব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ভন্তে, আমি সম্প্রতি বিবাহ করেছি, আপনি জানেন। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবার যোগ্য নই। মন যদি—মানে—সংসারের দিকেই থাকে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা মিথ্যাচার হবে না কি? মিথ্যাচারে অভিরুচি হয় না, দেব।

নন্দ জানতেন না মহামানবের বজ্রকঠোর নির্মম দৃষ্টি তাঁর ওপর নিপতিত। পাথরের দেবতার মত তিনি নির্বিকার, শিষ্যের কোনও দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নন। তাকে তিনি সাধনোজ্জ্বল আত্মার সত্যদৃষ্টি ও নির্বাণ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যাবে কোথায় বাবাজি।

ধীরে ধীরে বুদ্ধদেব বললেন, শোন। প্রেম ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য। যতদিন যৌবন, প্রেম ততদিন। রমণীর সৌন্দর্যও দুদিনের। স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্যাঘ্র বা অপ্সরী স্বপ্নদ্রষ্টার নিজেরই একটি অংশ। এক অখণ্ড আমিই মোহগ্রস্ত অবস্থায় নিজেকে বহুরূপে দেখছে।

জগৎ কোথায়? জগৎ নেই।

রাজকুমার নন্দ আয়ত সুন্দর চক্ষু দুটি তুলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চক্ষে ব্যাধপীড়িত মৃগের কাতর দৃষ্টি।

ভগবান জিন বললেন, শোন নন্দ। তোমার কথা মিথ্যা নয়, তুমি ঠিকই বললে। কিন্তু, কি জান, পুরুষকার একটা খুব বড় জিনিস। চেষ্টা ছাড়া কিছু হয় না। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে জন্ম বৃথা যাবে, বার বার জন্মমৃত্যুর যূপকাষ্ঠে ব্রাহ্মণদের যজ্ঞীয় পশুর মত বলি প্রদান করবে নিজেকে নিজে। এ থেকে কোন দিন উদ্ধার পাবে না, মুক্তি পাবে না। সেটা ভাল, না এই এক জন্মেই দেহ, কাল ও অহঙ্কাররূপ বস্তুকে নির্মম ভাবে ধ্বংস ক'রে শাশ্বত শান্তি ও আনন্দ লাভ করা ভাল? বল শুনি।

রাজকুমার নন্দ বললেন, ভন্তে, জন্ম-মৃত্যু নিরোধ করাই ভাল।

—বেশ। তবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। আর গৃহে ফিরে যেও না। এই শুভমুহূর্তটির প্রতীক্ষাতেই আমি ছিলাম। শুভমুহূর্ত জীবনে একবার আসে, দুইবার আসে না। হেলায় হারিও না সে মুহূর্ত। যখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন দেখবে সংসার-সুখ তার কাছে অতি তুচ্ছ।

নন্দ শাক্যকুলজাত ক্ষাত্র বীর। আজ্ঞানুবর্তিতা সে কুলের ধর্ম।

বীরের মতই তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে তরুণী পত্নী প্রেমময়ী ভদ্রাকে মন থেকে মুছে ফেলে মাথা নীচু করে ঈষৎ হেসে বললেন, আপনি যা বলেন।

—প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে?

—আপনি যা বলেন।

—আজই মস্তক মুণ্ডন করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। আর একটি কাজ করতে হবে। বড় কঠিন কাজ।

—আদেশ করুন।

—ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষা করতে যেতে হবে তোমার জননী ও পত্নীর কাছে। আজই।

—আপনি যা বলেন।

এক বৎসর অতীত হয়েছে।

পুনরায় ফাগুন মাস। কিংশুক ও চম্পক ফুলের মেলা বসেছে বনে বনে, শৈলসানুতে, অধিত্যকার গর্ভদেশে। প্রকাণ্ড একটি ভেরীর মত শিমুলবৃক্ষের কাণ্ড বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে আকাশের নিম্নে। মাথায় তার ফুটন্ত ফুলের শোভা।

শ্রাবস্তীপুরের জেতবনবিহারে ভগবান তথাগত একটি নাগকেশর বৃক্ষের ছায়ায় ব'সে শক্তুর পিণ্ড ভোজন করেছেন, পার্শ্বে একটি স্থালীতে শালিধানের সিদ্ধান্ন—পুষ্পভদ্রক—বিহারের ভিক্ষুণী ঊর্মিমাতার প্রেরিত, ভগবান তথাগতের সেবার জন্য।

এমন সময়ে জশ্রনক ভিক্ষু এসে কাছে দাঁড়াতেই বুদ্ধদেব বললেন, আবুস, কিছু বলবে?

—ভন্তে, নিবেদন আছে।

—বল।

—ভন্তে, আজ আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভিক্ষু নন্দ আর একজন ভিক্ষুর কাছে বলছিলেন, তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক। ব্রহ্মচর্যপালন আর তাঁর দ্বারা নাকি সম্ভব হচ্ছে না।

—কার কাছে বলছিল?

—ভিক্ষু ভেণ ও ভিক্ষু উম্মুকের কাছে।

—আবুস, তুমি আমার নাম ক'রে আয়ুষ্মান নন্দকে বলো, আমি তাকে ডেকেছি। আর সামান্য লবণ পাঠিয়ে দিও ওর হাতে।

—ভন্তে, আপনার যা আজ্ঞা।

আয়ুষ্মান নন্দ জ্যেষ্ঠের ডাক শুনে প্রমাদ গণলেন। সমবয়সী ভিক্ষুক উম্মুকের কাছে আজই সকালে দু-একটা বেফাঁস কথা ব'লে ফেলেছিলেন বটে মনের দুঃখে। কিন্তু—

ভগবান জিন কনিষ্ঠের মুখের দিকে স্নেহভরে চেয়ে বললেন, নন্দ, তুমি কারও কাছে কিছু বলেছিলে আজ?

—ভন্তে, বলেছি।

—বলেছ যে, ব্রহ্মচর্য পালন করা আর তোমার দ্বারা সম্ভব নয়, তুমি গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্তনে উৎসুক?

—ভন্তে, এ কথা সত্য।

—কারণ কি আমাকে বলবে?

রাজকুমার নন্দ মাথা হেঁট ক'রে নীরব রইলেন। কোনও কথা বললেন না।

ভগবান জিন বললেন, লবণ এনেছ?

—ভন্তে, এনেছি।

—স্থালীতে নিক্ষেপ কর।

—যথা আজ্ঞা।

—এখন বল, ব্রহ্মচর্য পালন কেন তোমার দ্বারা অসম্ভব? গৃহত্যাগ ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছ, এখন আবার গৃহে ফিরতে চাও কি জন্যে খুলে বল।

আয়ুষ্মান নন্দ অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে চোখ মাটির দিকে রেখে বলতে আরম্ভ করলেন, ভন্তে, আমায় প্রগল্‌ভতার জন্যে ক্ষমা করবেন। আমার সংসার ভোগ করার স্পৃহা গেল না। আর একটি কথা, যখন সেদিন ফলপূর্ণ করন্ডক হস্তে আপনার সমীপে ন্যগ্রোধারামে যাই, তখন আপনার ভ্রাতৃবধূ জনকল্যাণী গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে সপ্রেম দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বার বার ব্যাকুল স্বরে বলেছিল, ফিরে এসো তাড়াতাড়ি, প্রিয়, বিলম্ব ক'রো না যেন। তার সেই আলুলায়িতকুন্তলা মূর্তিতে আজও যেন সে সেই দ্বারে দাঁড়িয়ে আমায় ডাকছে। আমি তার সে মূর্তি ভুলতে পারছি না, দেব। আমায় গৃহস্থাশ্রমে ফিরে যেতে অনুমতি দিন।

বুদ্ধদেব প্রসন্ন হাস্যে বললেন, সাধু আয়ুষ্মান নন্দ, সাধু! তুমি সত্যবাদী, অকপট। এই জন্যেই তোমাকে গৃহের বাহিরে এনেছিলাম। তুমি কুলপুত্র, সত্যজ্ঞানের জন্যে গৃহত্যাগ ক'রে এসে আবার গৃহে ফিরে গেলে অত্যন্ত নিন্দার কথা হবে সেটা। বংশ পতিত হবে। তপস্যা কর, নতুবা জ্ঞান লাভ হবে না। কর্মই কর্মকে জানিয়ে দেবে। ক্রমে আনন্দ ও বল পাবে মনে। আপাতমধুর অনিত্যবস্তুর প্রলোভনে শ্রেয় ত্যাগ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? যাও, খুব মনোযোগের সঙ্গে চেষ্টা কর।

রাজপুত্র আয়ুষ্মান নন্দ নিজের কুটিরে ফিরলেন। আবার কিছুদিন ধ'রে একমনে আষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন চালান অধ্যবসায়ের সঙ্গে। বিনয়গুলি যথাযথ প্রতিপালন করবার চেষ্টায় সারাদিন বেশ কেটে যায়; কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে পদচিহ্নহীন প্রান্তরের দিকে চেয়ে মন কেমন ক'রে ওঠে।

মনে হয় কতদূরে সে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় সেই গৃহদ্বারটিতে। এখনও সে আশা ছাড়েনি তার। ভদ্রার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। যেদিন ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন, সেদিন রাজপ্রাসাদে মহাপ্রজাপতি মাতা গোতমী তাঁকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন; কিন্তু ভদ্রা মূর্ছিতা ও জ্ঞানহীনা ছিল প্রাসাদরকক্ষে, ভিক্ষুর কাষায়বেশে তাঁর আগমন শ্রবণ করে। আয়ুষ্মান নন্দের সঙ্গে ছিলেন ভিক্ষু স্থবির উপালী।

নন্দের ইচ্ছা ছিল পত্নীর মূর্ছাভঙ্গের জন্যে অপেক্ষা করেন।

জ্ঞানবৃদ্ধ স্থবির উপালী অপেক্ষা করতে দেননি নন্দকে। বলেছিলেন, চল, চল, আয়ুষ্মান। জননীর নিকট ভিক্ষা করলেই বিনয় প্রতিপালিত হয়। যাই চল।

নন্দ রাজপ্রাসাদে চিত্রশিক্ষকের নিকট চিত্রকর্ম শিখেছিলেন, ভাল চিত্র অংকন করতে পারতেন।

কিছুকাল পরে তিনি এক উপায় বার করলেন।

ভদ্রাকে না দেখে আর সত্যি থাকা যায় না। এক এক নির্জন সন্ধ্যায় মনে হয়,

প্রাণ যেন আর দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকতে চাইছে না। ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে বিনয় প্রতিপালনের শৃঙ্খল থেকে, আষ্টাঙ্গিক মার্গের পাশবন্ধন থেকে, সেই বহুদূরে প্রাসাদঅলিন্দে, যেখানে এই বসন্তে নাগকেশর বৃক্ষে কুঁড়ি নেমেছে, বকুল ফুল ঝুর ঝুর ক'রে ঝ'রে পড়ছে শিলাবেদিকায়, অতিমুক্তলতায় কচি রাঙা পত্রের উদ্গম হচ্ছে ; ভদ্রা বাতায়ন-বলভিতে পুষ্পমাল্য রেখে একদৃষ্টে তাঁর আগমনপথের দিকে চেয়ে আছে। সেখানেই শান্তি, সেখানেই সুখ। নন্দ এক প্রস্তরফলকে ভদ্রার এক প্রতিমূর্তি আঁকলেন। সেই প্রতিমূর্তির সঙ্গে নির্জনে কথা বলেন, কত হাস্যপরিহাস করেন, কখনও অশ্রুপাত করেন।

অনেক সময় সারারাত্রি এমন ভাবে কাটে।

নন্দ আকুলস্বরে স্ত্রীর ছবির দিকে চেয়ে কত প্রেম-সম্বোধন করেন, অনুচ্চস্বরে গান গেয়ে শোনান।

নন্দের কুটিরের কাছাকাছি যে সব ভিক্ষুরা থাকেন, তাঁরা ক্রমে ব্যাপারটা জানতে পারলেন।

দু-একজন বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু নন্দকে অনেক প্রবোধ দিলেন, অনেক সদ্ধর্মের উপদেশ দিলেন। দিলে কি হবে, মন মানে না, তিন-চার মাস ধ'রে ব্যাপারটা সমানে চলতে লাগল। প্রথমে কেউ বুদ্ধদেবের কানে কথাটা তুলতে সাহস করেননি। মঠে বাস ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে এ রকম ব্যবহার সদ্ধর্মের বিরোধী, বিনয়-আচরণের বিরোধী, সাধন-তপস্যার বিরোধী। সর্বাপেক্ষা লজ্জা ও সঙ্কোচের ব্যাপার এই যে, ইনি ভগবান জিন তথাগতের মাতৃষ্বসার পুত্র।

কয়েকজন ভিক্ষুতে মিলে যুক্তি ও পরামর্শ ক'রে একদিন একজন বিজ্ঞ ভিক্ষু পদ্মপাদ বুদ্ধদেবের নিকট গিয়ে ধীরে ধীরে নন্দের কাণ্ডকীর্তি সব নিবেদন করলেন।

ভগবান বুদ্ধদেব মনোযোগের সঙ্গে সবটুকু শুনে বললেন, আবুস, আয়ুষ্মান নন্দকে গিয়ে বলুন যে, আমি তাকে ডেকেছি।

—ভন্তে, আপনার যা আজ্ঞা।

নন্দ কিছুক্ষণ পরে এসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে কিছুদূরে বিনীত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তথাগত বললেন, নন্দ, শুনলাম তুমি পুনরায় ব্রহ্মচর্যে অমনোযোগী হয়েছ, বিনয়গুলি রীতিমত প্রতিপালন কর না?

—ভন্তে, এ কথা সত্য।

—তুমি পাথরের গায়ে তোমার পত্নীর চিত্র অঙ্কন ক'রে তারই দিকে তাকিয়ে রাত্রিবেলা হাস কাঁদ?

—ভন্তে, হ্যাঁ।

—কেন এমন আশ্রমবিরুদ্ধ আচরণ কর?

—ভন্তে, এ কথা আমি পূর্বেই আপনাকে নিবেদন করেছি। আপনার ভ্রাতৃবধূ শাক্যানী জনপদকল্যাণীর কথা বিস্মৃত হতে পারছি না, তিনি আমার সমস্ত মন-বুদ্ধি অধিকার ক'রে আছেন ব'লেই আমি ব্রহ্মচর্যে স্থিতিলাভ করতে পারছি নে। আপনি আদেশ করুন, আমি গৃহস্থাশ্রমে ফিরে যাই। আমার কিছুই হচ্ছে না। দু' দিকই গেল।

ভগবান জিন স্নেহ ও অনুকম্পার দৃষ্টিতে এই তরুণবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর তাঁকে ইঙ্গিত করলেন নিকটে এসে উপবেশন করতে।

ধীরে ধীরে বললেন, নন্দ, একটা পুরনো কথা বলি শোন। যখন উরুবিল্ব গ্রামের অরণ্যে আমি অভিসম্বোধি লাভ করলাম, তখন আমি ভাবলাম এ ধর্ম সাধারণের কাছে প্রচার করব কি না। ভোগাসক্ত বিচারশক্তিহীন ভাবপ্রবণ মানবসমূহের পক্ষে ধর্মের এ আদর্শ উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন হবে। আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে সেই বনে কিছুকাল অবস্থান করি। একদিন সাহম্পতি ব্রহ্মা আমাকে এসে অনুরোধ করেন মানবসমাজের কল্যাণের জন্য এই ধর্ম প্রচার করতে। তাঁরই কথায় আমি পূর্বসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করি। তারপর মনে ভাবলাম, সর্বাগ্রে কার কাছে এ ধর্ম প্রচার করব। কে বুঝবে?

অনেক চিন্তার পরে আমার দুই পূর্বতন গুরু আবাদ কালাম ও রুদ্রক রামপুত্রে কথা মনে পড়ল। তখনই ধ্যানে ব'সে দেখলাম, ঐ দুই মহাত্মা মাত্র দশ দিন পূর্বে দেহত্যাগ করেছেন। তা হ'লে উপায়? মানুষ নেই, সবাই তোমার মত নির্বোধ। তখন আমার পাঁচজন সাধন-সঙ্গীর কথা মনে পড়ল। তাঁরা ছিলেন ঋষিপত্তন মৃগদাবে সাধনরত। এ'দের গিয়ে উপসম্পদা দান ক'রে ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত করলাম। শীঘ্রই তাঁরা সত্যতত্ত্বের ধ্যানে সম্পূর্ণ অধিকারী হলেন এবং জনসমাজে সদ্ধর্ম প্রচারের প্রকৃত যোগ্যতা লাভ করলেন। আমিও এই প'য়ত্রিশ বছর সত্যের প্রচারে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছি। আমার নিজের উপলব্ধি এই যে, শিষ্য নিজের সংযম পবিত্রতা ও তপস্যার দ্বারাই মুক্তিলাভ করে, এ জন্যে চাই তার নিজের দৃঢ় ইচ্ছা ও অধ্যবসায়। আমি তোমাকে শুধু পথ দেখিয়ে দিতে পারি। বাকীটুকু করতে হবে তোমার নিজের উদ্যমে ও সত্যসংকল্পে। এখন কী তোমার অভিরুচি? জীবনের দুঃখের লবণজলধি পার হতে চাও, না পথভ্রান্ত নাবিকের মত ঘুরে বেড়াবে জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে?

নন্দ মাথা নীচু ক'রে বললেন, ভন্তে, আমি অত্যন্ত দুর্বলচেতা। আমি বিনয় প্রতিপালন করতে পারছি না। আমাকে আদেশ করুন, আমি গৃহে ফিরে যাই। আমি আপনার স্নেহের ও কৃপার অযোগ্য।

ভগবান বুদ্ধদেব তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে স্নেহভাজন কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তধারণ ক'রে বললেন, চল, এস আমার সঙ্গে।

অবাক হয়ে গেলেন নন্দ। দাদা তাঁকে নিয়ে নক্ষত্রবেগে উড়ে চলেছেন নীল শূন্য পথ বেয়ে। পদতলে গোটা পৃথিবী লুপ্ত হয়ে গেল। উভয়ে এক অপূর্ব সুন্দর মহাদেশে উপস্থিত হলেন। দিকে দিকে সে দেশের সৌন্দর্যের মোহন লীলা; বিদ্যুতের, জ্যোৎস্নার, রমণীয় পুষ্পরাজির ও সংগীতের সমাবেশে যেন গোটা মহাদেশ স্বপ্নময়। বিদ্রুমবেদী ও হর্ম্যস্থলী স্থানে স্থানে যেন উপবন মধ্যে বিরাজমান।

এমন সময়ে চারুহাসিনী লজ্জাবতী ঈষৎহাস্যময়ী বহু দিব্যনারীকে পরস্পর হাত-ধরাধরি ক'রে অদূরে আবির্ভূতা হতে দেখে নন্দ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলেন। রূপের জ্যোতিতে ভরিয়ে তুলেছে ওরা দশ দিক।

তারপর জ্যেষ্ঠের দিকে চেয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ভন্তে, এ কোন্ দেশ? এই দেবীরাই বা কারা?

বুদ্ধদেব বললেন, এ দেশ ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ। এরা এ দেশের অপ্সরী। কামজয়ী পুরুষ ভিন্ন এরা অন্য কারও দৃষ্টিগোচর হয় না। আচ্ছা নন্দ, বল দেখি এরা শাক্যানী জনপদকল্যাণী অপেক্ষা অধিক সুন্দরী, না শাক্যানী জনপদকল্যাণী এদের অপেক্ষা সুন্দরী?

মুগ্ধ নন্দ উত্তর দিলেন, ভন্তে, এদের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্যই নেই, তুলনা করা সম্ভব নয়।

—তবুও?

—ভন্তে, এদের তুলনায় শাক্যানী জনপদকল্যাণী নাসিকাকর্ণহীনা মর্কটীর ন্যায়!

—বেশ, শোন নন্দ, যদি তুমি মনোযোগসহকারে ব্রহ্মচর্য পালন কর, তবে আমি এই সমস্ত অপ্সরা তোমাকে লাভ করিয়ে দেব—প্রতিশ্রুতি দিলাম। এখন চল, জেতবনবিহারে ফিরে নিষ্ঠার সঙ্গে বিনয় ও ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করবে। কেমন তো? রাজী?

নন্দ কেমন যেন হয়ে গিয়েছেন। অদূরে ওই কি কুলাচল পর্বত? এই কি স্বর্গ? আশ্চর্য দেশ! ওখানে কি হেমন্ত ও শিশির ঋতুর চার অষ্টকাতে ভগবান শক্র এই অপরূপ রূপসী দেবকন্যাদের সঙ্গে বিহার করেন? মরি, মরি, এই পিঙ্গলবর্ণনীবী-শোভিতা চঞ্চলচরণা, হাস্যময়ী দেবীগণের অপাঙ্গে যেন শাণিত তীর। এদের চরণকমল নূপুরের রিনিঝিনিতে শব্দায়মান, কটিতটস্থ দুকূলরাজি কাঞ্চিকলাপে বিলাসান্বিত, এ'দের ক্ষীণ কটিদেশ কুচযুগের ভারে যেন পরিশ্রান্ত, কমলকোরকের সহিত স্পর্ধাধারী সকটাক্ষ নয়ন যেন সকল পুরুষার্থের সাধক।

বেচারী নন্দ। তাঁর মাথাটি ঘুরে গেল। তিনি সব বিস্মৃত হলেন। ভুললেন কপিলা-

বাস্তুর রাজপ্রাসাদ, ভুললেন কল্যাণী জনপদলক্ষ্মী ভদ্রার ব্যাকুল নয়ন দুটি। বললেন, ভন্তে, যদি এঁদের লাভ করতে পারি এমন প্রতিশ্রুতি দেন, তবে আমিও কথা দিলাম, আজ থেকে অতি নিষ্ঠা ও মনোযোগের সঙ্গে বিনয় প্রতিপালন করব।

ভিক্ষুগণ ক্রমে শুনলেন যে ভগবান তথাগতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দ একপাল দেবকন্যা লাভের আশায় পুনরায় ব্রহ্মচর্য পালনে মনোযোগী হয়েছেন।

এবার অধ্যবসায় আগেকার চেয়ে অনেক বেশী।

দু'চারজন সমবয়সী ভিক্ষু ঠাট্টা ক'রে বলতে লাগলেন, বাহবা নন্দ, ভাল মজুরি বটে! একেবারে একটি দল দেবকন্যা লাভ!

কেউ কেউ বললেন, আরে বাবা! নন্দ বোকা নয়। দাদার কাছ থেকে পুরস্কারটি আগে আদায় করবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তবে ব্রহ্মচর্য আরম্ভ ক'রেছে। পাকা ঘুঘু নন্দ।

আয়ুষ্মান নন্দ কারও কোন ঠাট্টা-বিদ্রূপে কর্ণপাত না ক'রে একাগ্র মনে প্রচন্ড উৎসাহ ও অদম্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাধনা করতে লাগলেন। তাঁর কঠোর আত্মসংযম ও বিনয় প্রতিপালনের দৃঢ়তা প্রৌঢ় ভিক্ষুগণকে পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দিল।

পাঁচ বৎসর এইভাবে দিনরাত্রি কোথা দিয়ে কেটে গেল, নন্দ তার কোন খবরই রাখেন না। অদূরবর্তী নির্বিন্ধ্যা নদীর বারিপতনে যেন সত্যতত্ত্বের আভাস ভেসে আসে। সকল প্রকার গার্হস্থ্য সুখের চিন্তা তিনি ক্রমে পরিত্যাগ করলেন। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যশ, মুক্তি, বিলোপ ও নির্মললোক প্রভৃতির সমুদয় আশা আকাঙ্ক্ষা ও ঋতুসমূহের পুষ্পস্তবক ফল ও নবীন কিশলয়রাজি বারংবার তাঁর উগ্র তপস্যার সম্মুখে নতমস্তকে অভিবাদন জানিয়ে গেল।

একদিন রজনীর শেষযামে ঊষার অরুণচ্ছটা দিগ্বলয়ে উঁকি দেবার উপক্রম করেছে, এমন সময় হঠাৎ জেতবন দিব্য-জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে গেল। এক দীপ্তিমান দেবতা ধ্যানাসনে উপবিষ্ট ভগবান তথাগতের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে বিনীতভাবে জানালেন, ভগবান, অদ্য ভগবানের মাতৃষ্বসাপুত্র আয়ুষ্মান নন্দ ক্ষীণাঙ্গ হয়ে চেতোবিমুক্তি লাভ করলেন। তাঁর জয় হোক!

ভগবান জিন ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ, এ আমি অবগত হয়েছি।

—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

দেবদূতের অন্তর্ধানের অল্প পরেই বনে বনে বিহঙ্গকুল কলরব ক'রে উঠল। ভিক্ষুগণ শয্যাত্যাগ করলেন। সূর্যোদয়ের চিহ্ন প্রকাশ পেল পূর্ব আকাশে। ভিক্ষু উপালী প্রতিদিনের মত নির্বিন্ধ্যা নদীর শীতল জলে অবগাহন স্নান করতে চললেন। ভিক্ষু তিষ্য ভগবান জিনের জন্য দন্তকাষ্ঠ রেখে গেলেন।

এমন সময় অর্হৎ-জীবনের প্রথম নবীন প্রভাতে আয়ুষ্মান নন্দ ধীরপদবিক্ষেপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমীপে উপস্থিত হলেন। নিম্নস্বরে নতমস্তকে নিবেদন করলেন, ভন্তে, আমাকে যে জন্য উপসম্পদা দান করেছিলেন, তা আজ সফল হয়েছে। আমায় আশীর্বাদ করুন।

ভগবান বুদ্ধ বললেন, আমি জানি, নন্দ। তোমার জন্মগ্রহণ অদ্য সার্থক। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

নন্দ বললেন, ভন্তে, আর একটি কথা—

—বল—

—পূর্বে আমাকে আপনি একটি প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন।

—করেছিলাম।

—ভন্তে, আমার আর তাতে কোন আবশ্যক নেই।

—অপ্সরাদের তুমি গ্রহণ করতে চাও না?

—ভন্তে, ক্ষমা করবেন। আপনিই আমায় সাংসারিক আসক্তি থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

—তোমার ভ্রম, নন্দ। মুক্তি কেউ কাউকে দিতে পারে না। তুমি নিজেই নিজেকে

মুক্ত করেছ। আমি শুধু উপায় ব'লে দিয়েছি মাত্র। আর একটি কথা—

—ভন্তে, বলুন।

—আমি স্বর্গে তোমাকে নিয়ে যাইনি। এখানে এই বৃক্ষতলে ব'সেই ওই দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি। যখন দেখলাম, তোমার তরুণ চিত্তবৃত্তি নারীতে আসক্ত, তখন সেই পথেই যাতে তুমি প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ কর, তার জন্যে ওই একটি অলীক কল্পনার আশ্রয় আমায় নিতে হয়। ওই সব অপ্সরা কোথায় ছিল না, স্বপ্নে দৃষ্ট গন্ধর্বনারীর মতই ওই স্বর্গও অলীক।

তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প

মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব

তারানাথ তান্ত্রিকের প্রথম গল্প আপনারা শুনিয়াছেন কিছুদিন আগে, হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করেন নাই। সুতরাং তাহার দ্বিতীয় গল্পটি যে বিশ্বাস করিবেন এমন আশা করিতে পারি না। কিন্তু এই দ্বিতীয় গল্পটি এমন অদ্ভুত যে সেটি আপনাদের শুনাইবার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

জগতে কি ঘটে না ঘটে তাহার কতটুকুই বা আমরা খবর রাখি? "There are more things in Heaven and Earth, Horatio" ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব এই গল্পটি শুনিয়া যান এবং সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া ডিস্‌মিস্‌ করিবার পূর্বে মহাকবির ঐ বহুবার উদ্ধৃত, সর্বজনপরিচিত, অথচ গভীর উক্তিটি স্মরণ করিবেন এই আমার অনুরোধ।

তবে যিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট, এই স্থূল জগতের বাহিরে অন্য কোন সূক্ষ্ম জগৎ, কিংবা ভূতপ্রেত কিংবা অন্য কোন অশরীরী জীব কিংবা অপদেবতা-উপদেবতার অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাসবান নহেন, তিনি এ গল্প না-হয় না-ই পড়িলেন?

ভূমিকা রাখিয়া এখন গল্পটা বলি।

সেদিন হাতে কোন কাজকর্ম ছিল না, সন্ধ্যার পূর্বে মাঠ হইতে ফুটবল খেলা দেখিয়া ধর্মতলা দিয়া ফিরিতেছিলাম। মোহনবাগান হারিয়া যাওয়াতে মনও প্রফুল্ল ছিল না—কি আর করি, ধর্মতলার মোড়ের কাছেই মট্‌ লেনে (নম্বরটা মনে নাই তবে বাড়িটা চিনি) তারানাথ জ্যোতিষীর বাড়ি গেলাম।

তারানাথ একাই ছিল। আমায় বলিল—এস, এস হে, দেখা নেই বহুকাল, কি ব্যাপার?

কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পরে উঠিতে যাইতেছি এমন সময়ে ঘোর বৃষ্টি নামিল। তারানাথ আমায় এ অবস্থায় উঠিতে দিল না। আমি দেখিলাম বৃষ্টি হঠাৎ থামিবে না, তারানাথের বৈঠকখানায় বসিয়া আমরা দু-জনে। বৃষ্টির সময় মনে কেমন এক ধরণের নির্জনতার ভাব আসে—বৃষ্টি না থাকিলে মনে হয় শহরসুদ্ধ লোক বুঝি আমার ঘরে আসিয়া ভিড় করিবে, কেহ না আসিলেও মনের ভাব এইরূপ থাকে, কিন্তু বৃষ্টি নামিলে মনে হয় এ বৃষ্টি মাথায় কেহই আসিবে না। সুতরাং আমার ঘরে আমি একা। তারানাথের [illegible]তেও সেদিন মনে হইল আমরা দু'জনে ছাড়া সারা কলিকাতা শহরে যেন কোথাও কোন লোক নাই।

সুতরাং মনের ভাব বদলাইয়া গেল। এদিকে সন্ধ্যাও নামিল। জীবনের অদ্ভুত ধরণের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি উভয়েরই জাগিল। ঘোর বৃষ্টি-মুখর আষাঢ়-সন্ধ্যায় আমরা মোহনবাগানের শোচনীয় পরাজয়, ল্যাংড়া আম অতিরিক্ত সস্তা হওয়ার ব্যাপার, চৌরঙ্গীর মোড়ে ওবেলাকার বাস্‌-দুর্ঘটনা প্রভৃতি নানারূপ কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ কোন্‌ সময় নারীপ্রেমের প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িলাম।

তারানাথ বেশ বড় জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক হইলেও শুকদেব যে নয় বা কোন কালে ছিল

না, এ-কথা পূর্বের গল্পটিতে বলিয়াছি। আশা করি, তাহা আপনারা ভোলেন নাই। নারীর সঙ্গে সে যে বহু মেলামেশা করিয়াছে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাহার মুখ হইতেই এ বিষয়ে কিছু রসাল অভিজ্ঞতার কথা শুনিব, এরূপ আশা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই ছিল, কিন্তু তাহার পরিবর্তে সে এ সম্বন্ধে যে অসাধারণ ধরণের অভিজ্ঞতার কাহিনীটি বর্ণনা করিল, তাহার জন্য, সত্যই বলিতেছি, আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।

আর একটা কথা, তারানাথকে দেখিয়া বা তাহার মুখে কথা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল একটা কি ঘোর দুঃখ মনে সে চাপিয়া রাখিয়াছে, অনেকবার তন্ত্রশাস্ত্রের কথা-বার্তা বলিতে গিয়া যেন কি একটা বলি বলি করিয়াও বলে নাই, আজ বুঝিলাম তারানাথের তান্ত্রিক জীবনের অনেক কাহিনীই সে আমার কাছে কেন কাহারও কাছে বলে নাই, হয়তো সেগুলি ঠিক বলিবার কথাও নহে—কারণ সে-কথা বলা তাহার পক্ষে কণ্টকর স্মৃতির পুনরুদ্বোধন করা মাত্র। তা ছাড়া আমার মনে হয়, লোককে সে-সব গল্প বিশ্বাস করানোও শক্ত।

বলিলাম—জ্যোতিষী মহাশয়ের এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে অনেক—কি বলেন ?

তারানাথ বলিল—অভিজ্ঞতা একটাই আছে এবং সেটা বড় মারাত্মক রকমের অদ্ভুত। প্রেম কাকে বলে বুঝেছিলাম সেবার। এখন কিন্তু সেটা স্বপ্ন বলে মনে হয়—শোনো তবে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—কোন ট্র্যাজিক গল্প বলবেন না, প্রথম প্রেম হ'ল একটি মেয়ের সঙ্গে, সে মারা গেল—এই তো ? ও ঢের শুনেছি। তারানাথ হাসিয়া বলিল—ঢের শোন নি! শোন—কিন্তু বিশ্বাস যদি না কর তাও আমায় বলবে। এরকম গল্প বানিয়ে বলতে পারলে একজন গল্পলেখক হয়ে যেতুম হে !... দু-একজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া একথা কারও কাছে বলেনি।

ঠিক এই সময় বাড়ির ভিতর হইতে তারানাথের বড় মেয়ে চারু ওরফে চারি দু-পেয়ালা গরম চা ও দুখানি করিয়া পরোটা ও আলুভাজা আনিল। চারি দশ বছরের মেয়ে, তারানাথের মতই গায়ের রং বেশ উজ্জ্বল, মুখ চোখ মন্দ নয়। আমায় বলিল—কাকাবাবু, লেসের কাপড়ের ছবিটা আনলেন না ? চারির কাছে কথা দিয়া রাখিয়াছিলাম, ধর্মতলার দোকান হইতে তাহার উল-বোনার জন্য একটা ছবির ও প্যাটার্নের নক্শা কিনিয়া দিব। বলিলাম—আজ ফুটবলের ভিড় ছিল, কাল এনে দেবো ঠিক।

চারি দাঁড়াইয়া ছিল, তারানাথ বলিল—যা তুই চলে যা, দুটো পান নিয়ে আয়—

মেয়ে চলিয়া গেলে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ছেলেপিলের সামনে সে-সব গল্প—চা-টা খেয়ে নাও, পরোটাখানা—না না, ফেলতে পারবে না, ইয়ং ম্যান তোমরা এখন—খাওয়ার বেলা অমন—ওই বৃষ্টির জলেই হাত ধুয়ে ফেলো—

চা পানের পরে তারানাথ বলিতে আরম্ভ করিলঃ

বীরভূমের শ্মশানের যে পাগলীর অদ্ভুত কান্ড সেবার গল্প করেছিলাম, তার ওখান থেকে তো চলে এলাম সেই কান্ডের পরেই।

কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আমার একটা অত্যন্ত শ্রদ্ধা হয়ে গেল আর পর থেকে। নিজের চোখে যা দেখলুম, তা তো আর বিশ্বাস না ক'রে পারি না। এটা পাগলীর কথা থেকে বুঝেছিলুম, পাগলী আমায় ইন্দ্রজাল দেখিয়েছিল নিম্নতন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু সে তো ব্ল্যাক ম্যাজিক ছাড়া উচ্চতন্ত্রের কথাও বলেছিল। ভাবলাম দেখি না কি আছে এর মধ্যে। গুরু খুঁজতে লাগলুম।

খুঁজলে কি হবে, ও পথের পথিকের দর্শন পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ।

এই সময়ে বহু স্থান ঘুরে বেড়িয়ে আমার দুটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হ'ল। প্রথম, ধুনি-জ্বালানো সাধুদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন ব্যবসাদার, ধর্ম জিনিসটা এদের

কাছে একটা বেচাকেনার বস্তু, ক্রেতাকে ঠকাবার বিপুল কৌশল ও আয়োজন এদের আয়ত্তাধীনে। দ্বিতীয়, সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বোকা, এদের ঠকানো খুব সহজ, বিশেষতঃ ধর্মের ব্যাপারে।

যাক ও-সব কথা। আমি ধুনি-জ্বালানো ব্যবসাদার সাধু অনেক দেখলুম, ইন্সিওরেন্সের দালাল দেখলুম, দৈবী ঔষধের মাদুলি বিক্রেতাকে দেখলুম, সাধুবেশী ভিক্ষুক দেখলুম—সত্যিকার সাধু একটাও দেখলুম না।

এ অবস্থায় বরাকর নদীর ধারে শালবনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের সীমায় এক মন্দিরে একদিন আশ্রয় নিয়েছি, শীতকাল, আমি বনের ডালপালা কুড়িয়ে আগুন করবার যোগাড় করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে একজন শ্যামবর্ণ, ঋজু ও দীর্ঘাকৃতি প্রৌঢ় সাধু দেখি একটা পুঁটুলি বগলে মন্দিরে ঢুকছেন। আমি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম।

সাধুটি বেশ মিষ্টভাষী, বললেন—তুই যে দেখছি বড় ভক্ত! কি চাস্ এখানে? বাড়ি ছেড়ে দেখছি রাগ করে বেরিয়েছিস।

আমি বিনীত প্রতিবাদের সুরে বলতে গেলুম—রাগ নয় বাবাজী, বৈরাগ্য—

সাধুজী হেসে বললেন, যে কথাটি পাগলীও বলেছিল—ওহে ছোকরা, সাধু হব বললেই হওয়া যায় না। তোর মধ্যে ভোগের বাসনা এখনও পুরো মাত্রায় রয়েছে। সংসারধর্ম কর্ গে যা।

মন্দির থেকে একটু দূরে ছাতিম গাছের তলায় সাধুর পঞ্চমুণ্ডির আসন—পাঁচটি নরমুণ্ড পেতে তৈরী। সাধু রাত্রে সেখানে নির্জনে সাধনা করেন তাও দেখলুম। মনে ভারী শ্রদ্ধা হ'ল, সংকল্প করলুম এ মহাপুরুষকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছিনে এবার।

কিছুদিন লেগে রইলাম তাঁর পিছনে। তাঁর হোমের কাঠ ভেঙে এনে দিই, তিন মাইল দূরের কুসুমবনী ব'লে গ্রাম থেকে তাঁর চাল-ডাল কিনে আনি। গ্রামের সকল লোকের মুখে শুনলুম সাধুটি বড় একজন তান্ত্রিক। অনেক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ তাঁর আছে। তবে পাগলীর কাছে যেতে লোকে যেমন আমায় ভয় দেখিয়েছিল—এখানেও তেমনি ভয় দেখালে। বললে—তান্ত্রিক সাধু-সন্নিসিদের বিশ্বাস করো না বেশী। ওরা সব পারে, একটু সাবধান হয়ে চলো। বিপদে পড়ে যাবে।

শীঘ্রই ওদের কথার সত্যতা একদিন বুঝলুম।

গভীর রাত্রিতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। সেদিন শুক্লপক্ষের রাত্রি, বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না। মন্দির থেকে ছাতিম গাছের দিকে চেয়ে দেখি সাধু বাবাজী কার সঙ্গে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে কথা বলছেন। কৌতূহল হ'ল—এত রাত্রে কে এল এই নির্জন নদীতীরের জঙ্গলের মধ্যে?

কৌতূহল সামলাতে না পেরে এগিয়ে গেলুম। অল্প দূরে গিয়েই যা দেখলুম তাতে আর এগিয়ে যেতে সঙ্কোচ বোধ হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

সাধু বাবাজী এত রাত্রে একজন মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলছেন—গাছের আড়াল থেকে মেয়েমানুষটিকে আমি খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্টভাবে দেখে আমার মনে হ'ল মেয়েটি যুবতী এবং পরমা সুন্দরী।

এত রাত্রে গুরুদেব কোন্ মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন, সে মেয়েটি এলই বা কেমন করে একা এই নির্জন জায়গায়?

যাই হোক আর বেশীদূর অগ্রসর হ'লেই ওরা আমায় টের পাবে। মনে কেমন ভয়ও হ'ল, সে দিন চলে এলুম। তার পরদিন রাত্রে আমি ঘুমুলাম না। গভীর রাত্রে উঠে পা টিপে টিপে বাইরে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখি কাল রাতের সে-মানুষটি আজও এসেছে। ভোর হবার কিছু আগে পর্যন্ত আমি সেদিন গাছের আড়ালে রইলাম দাঁড়িয়ে। ফরসা হবার লক্ষণ হচ্ছে দেখে আর সাহস হ'ল না—মন্দিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন রাত্রেও আবার অবিকল তাই।

একদিন আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। যে-মেয়েমানুষটির সঙ্গে কথা হচ্ছে

অর পরণের বস্ত্রাদি বড় অদ্ভুত ধরণের। সে যে কোন দেশের বস্ত্র পরেছে, সেটা না শাড়ি, না ঘাঘরা, না জাপানী কিমোনো, না মেয়েদের গাউন!—অজানা যদিও, ভারী চমৎকার মানিয়েছেও বটে।

সেদিন আরও একটা কথা আমার মনে হ'ল।

মেয়েমানুষটি যেই হোক, সে জানে আমি রোজ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকি। কি ক'রে আমার একথা মনে হ'ল তা আমি বলতে পারব না, কিন্তু এই কথা আবছা ভাবে আমার মনের মধ্যে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে কেমন একটু ভয়ও হ'ল।

সরে পড়ি বাবা, দরকার কি আমার এ সবের মধ্যে থেকে?

কিন্তু পরদিন রাত্রে এক সময়ে আর শুয়ে থাকতে পারলাম না নিশ্চিন্ত মনে—উঠে যেতেই হ'ল। সেদিন আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম মেয়েমানুষটি যখন থাকে, তখন এক ধরণের খুব মৃদু সুগন্ধ যেন বাতাসে পাওয়া যায়—এ ক'দিনও এই গন্ধটা পেয়েছি, কিন্তু ভেবেছিলুম কোনও বন্য ফুলের গন্ধ হয়তো। আজ বেশ মনে হ'ল এ গন্ধের সঙ্গে ওই মেয়েটির উপস্থিতির একটা সম্বন্ধ বর্তমান।

এই রকম চলল আরও দিন-দশ-বারো। তার পরে সাধুর ডাক এল বরাকর না কোডার্মার এক গাড়োয়ালী জমিদার-বাড়িতে কি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করার জন্যে। সাধুজী প্রথমে যেতে রাজী হন নি, দু-দিন তাদের লোক ফিরে গিয়েছিল কিন্তু তৃতীয় বারে জমিদারের ছোট ভাই নিজে পাল্কী নিয়ে এসে সাধুকে অনেক খোশামোদ করে নিয়ে গেলেন।

মনে ভাবলুম এ আর কিছু নয়, সাধুজী সেই মেয়েটিকে ছেড়ে একটি রাত্রিও বাইরে কাটাতে রাজী নন্।

কিন্তু নিকটে কোথাও বস্তি নেই, মেয়েটি আসেই বা কোথা থেকে? আর সাধারণ সাঁওতাল বা বিহারী মেয়ে নয়—আমি অনেকবার দেখেছি সেটিকে এবং প্রত্যেক বারই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে এ কোন বড় ঘরের মেয়ে, যেমন রূপসী, তেমনি তার অদ্ভুত ধরণের অতি চমৎকার এবং দামী পরণ-পরিচ্ছদ।

হঠাৎ আমার মনে একটা দুষ্টুবুদ্ধি জাগল। আমার মনে হয়েছিল মেয়েটিকে সাধুজীর হয়তো খবর দেওয়ার সুযোগ হয় নি—দেখাই যাক না আজ রাত্রে আসে কি না? তখন ছিল অল্প বয়েস, তোমরা যাকে বল রোমান্স, তার ইয়ে তখন যে আমার যথেষ্টই ছিল. এতে তুমি আমাকে দোষ দিতে পার না।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে রাত্রে সেদিন আমি নিজেই গিয়ে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে রইলাম। মনে ভয়ানক কৌতূহল, দেখি আজ মেয়েটি আসে কিনা। কেউ কোন দিকে নেই, নির্জন রাত্রি, মনে একটু ভয়ও হ'ল—এ ধরণের কাজ কখনও করি নি, কোন হাঙ্গামায় আবার না পড়ে যাই!

তখন আমি অপরিণতবুদ্ধি নির্বোধ যুবক মাত্র, তখন ঘুণাক্ষরেও যদি জানতাম অজ্ঞাতসারে কি ব্যাপারের সম্মুখীন হতে চলেছি তবে কি আর ছাতিমতলায় একা পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসতে যাই?

তার নয়, ও আমার অদৃষ্টের লিপি। সে রাত্রির জের আমার জীবনে আজও মেটে নি। আমার মনের শান্তি চিরদিনের জন্যে হারানোর সূত্রপাতটি ঘটেছিল সেই কালরাত্রে —তা কি আর তখন বুঝেছিলাম!

যাক্ ও-কথা।

রাত ক্রমে গভীর হ'ল। পূব দিকের গাছপালার আড়াল থেকে চাঁদ উঠতে লাগল একটু একটু ক'রে। আমার ডাইনেই বরাকর নদী. দুই পাড়েই শিলাখণ্ড ছড়ানো. তার ওপর জ্যোৎস্না এসে পড়ল। সেই নদীর পাড়েই ছাতিমতলা ও পঞ্চমুণ্ডির আসন—আমি যেখানে ব'সে আছি। আমার বাঁ দিকে খানিকটা ফাঁকা ঘাসের মাঠ—তার পর শালবন শুরু হয়েছে।

হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলুম। আমার সামনে সেই মেয়েটি কখন

এসে দাঁড়িয়েছে এমন নিঃশব্দে, এমন অতর্কিত ভাবে যে আমি একেবারেই কিছু টের পাই নি। অথচ আগেই বলেছি আমার একদিকে বরাকর নদীর জ্যোৎস্না-ওঠা শিলাবিস্তৃত পাড় আর এক দিকে ফাঁকা মাঠ। আসনে ব'সে পর্যন্ত আমি সতর্ক দৃষ্টিও রেখেছি—মাঠের দিকে! নদীর দিক থেকে আমার কাছে কারো আসা সম্ভব নয়—মাঠের দিক থেকে কেউ এলে আমার দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে আধ সেকেন্ড আগেও কেউ ছিল না আমি জানি, আধ সেকেন্ড পরেই সেখানে জলজ্যান্ত একটি রূপসী মেয়ের আবির্ভাব আমার কাছে সম্পূর্ণ ইন্দ্রজালের মত ঠেকল ব'লেই আমি চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃদু মধুর সুগন্ধ! আমার সারা দেহ-মন অবশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠল।...আমার জ্ঞানও বোধ হয় ছিল তার পর আর এক সেকেন্ড। তার পরে কি ঘটল আমি আর কিছুই জানি না।

যখন আমার আবার জ্ঞান ফিরে এল তখন ভোর হয়েছে। উঠে দেখি সারা-রাত সেই পঞ্চমুন্ডির আসনেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলাম। নৈশ শীতল বায়ুতে বাইরে সারা-রাত পড়ে থাকার দরুন গায়ে ব্যথা হয়েছে, গলা ভার হয়েছে। উঠে ধীরে ধীরে মন্দিরে চলে এলাম। এসে আবার শুয়ে পড়লাম। আমার মনে হ'ল আমার জ্বর হবে, শরীর এত খারাপ।

পরদিন সারাদিন কিছু না খেয়ে শুয়েই রইলাম আর কেবলই কাল রাত্রের কথাটা ভাবি।

মেয়েটি কে? কি ক'রে অমন নিঃশব্দে অতর্কিতে ওখানে এল? এ তো একেবারে অসম্ভব। অসামান্যা রূপসী যে মেয়েটি, অজ্ঞান হয়ে পড়বার পূর্বে ওই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তা আমি দেখে নিয়েছিলুম। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লামই বা কেন, এরও তো কোন যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পেলাম না! অথচ সেই কথা নিয়ে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করাও সারাদিন আমার ঘুচল না। বিকেলের দিকে সাধুবাবাজী গাড়োয়ালী জমিদার-বাড়ি থেকে ফিরলেন। আমার জন্যে লাড্ডু, কচৌড়ি এবং একটা মোটা সুতি চাদর এনেছেন—তাঁর নিজের জন্যে জমিদার-বাড়ি থেকে ভাল একখানা পশমী আলোয়ান দিয়েছে!

আমায় বললেন—শুয়ে কেন? ওঠ—জিনিসগুলো রেখে দাও—

অতিকষ্টে উঠে সাধুর হাত থেকে পুঁটুলিটা নিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি হয়েছে?...অসুখ-বিসুখ নাকি?

কিছু জবাব দিলাম না।

সাধু স্নান করতে গেলেন এবং এসে জমিদার-বাড়ির কান্ড কি রকম তারই সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগলেন। আমায় বললেন—তোমার কি হয়েছে বল তো? অমন মনমরা ভাব কেন? বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে বুঝি? বলেছি তো বাবা, তোমরা ছেলে-ছোকরা এ-পথে কি নামলেই নামা যায় রে বাপু! বড় কঠিন পথ।

সেই রাত্রে আমার খুব জ্বর এল। কত দিন ঠিক জানি না—অজ্ঞান অচৈতন্য রইলাম। জ্ঞান হ'লেই দেখতাম সাধু শিয়রে বসে আছেন। বোধহয় তাঁরই সেবাযত্নে এবং দয়ায় সেবার ক্রমে সেরে উঠলাম।

সেরে উঠে একদিন গাছতলায় বসেছি দুপুরের পরে, সাধু বললেন—ছেলেছোকরা কিনা, কি কান্ডটা বাধিয়ে বসেছিলে বাপু? এবার তো বাঁচতে না—অতিকষ্টে বাঁচাতে হয়েছে। আচ্ছা বাপু, পঞ্চমুন্ডির আসনে কি জন্যে গিয়েছিলে সেদিন রাত্রে?

আমি তো অবাক। কি ক'রে জানলেন ইনি? আমি তো কোন কথাই বলি নি। হঠাৎ আমার সন্দেহ হ'ল, সেই অদ্ভুত মেয়েটির সঙ্গে নিশ্চয়ই সাধুর ফিরে এসে দেখা হয়েছে, সে-ই ব'লেছে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন—ভাবছ আমি কি ক'রে জানলাম, না?... আরে বাপু, কতটুকুই বা তোমরা বোঝ, আর কতটুকুই বা তোমরা জান। তোমাদের দেখে দয়া হয়।

ভয়ে ভয়ে বললাম—আপনি জানলেন কি ক'রে?

সাধু হেসে বললেন—আরে পাগল, তুমিই তো জ্বরের ঘোরে বলেছিলে ঐ সব কথা—নইলে জানব কি ক'রে? যাক, প্রাণে বেঁচে গিয়েছ এই ঢের। আর কখনও অমন পাগলামি করতে যেও না।

আমি চুপ ক'রে রইলাম। তা হ'লে আমিই বিকারের ঘোরে সব ফাঁস ক'রে দিয়েছি!...সেইদিন মনে মনে সংকল্প করলাম দুএক দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব—শরীরটা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই।

কিন্তু আমার ভাগ্যলিপি অন্য রকম। সাধুবাবাজীকে তার পরদিন পাহাড়ী বিছুতে কামড়াল—তিনি তো যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আমি পাঁচ মাইল দূরবর্তী মিহিজাম থেকে ডাক্তার ডেকে আনি, তাঁর সেবা করি, দিনরাত জেগে তিন দিন প'রে তাঁকে সারিয়ে তুলি।

দিন-দশেক পরে আমি এক দিন বললুম—সাধুজী আমি আজ চলে যেতে চাই।

সাধু বিস্মিত হয়ে বললেন—চলে যাবে? কোথায়?

—এখানে থেকেই বা কি হবে? আমার তো কিছু হচ্ছে না—মিছে ব'সে থাকা আর মন্দিরের প্রসাদে ভাগ বসানো। দুটি পেটের ভাতের লোভে আমি তো এখানে ব'সে নেই?

সাধুজী চুপ ক'রে গেলেন, তখন কোন কথা বললেন না।

সন্ধ্যার কিছু আগে আমায় ডেকে তিনি কাছে বসালেন। বললেন—ভেবেছিলাম এ পথে নামাব না তোমায়। কিন্তু তুমি দুঃখিত হয়ে চলে যাচ্ছ, সেটা বড় কষ্টের বিষয় হবে আমার পক্ষে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছ, নিজের ছেলের মত সেবা করেছ, তোমাকে কিছু দিতে চাই। একটা কথা তার আগে বলি, তোমার সাহস বেশ আছে তো?

বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ। এর আগেও আমি বীরভূমের এক শ্মশানে তন্ত্র-সাধনা ক'রেছি!

তারপর আমি সেই শ্মশানের পাগলি ও তার অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের কথা বললাম—এতদিন পরে আজ প্রথম সাধুকে পাগলীর কথা বললাম।

সাধু অবাক হয়ে বললেন—সে পাগলীকে তুমি চেন? আরে, সে যে অতি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! তুমি তার হাত থেকে যে অত সহজে উদ্ধার পেয়ে এসেছ সে কেবল তোমার পূর্বজন্মের পুণ্য। ওর নাম মাতু পাগলী, মাতঙ্গিনী। ও নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রে ভয়ানক ভাবে সিদ্ধ। ওর সংস্পর্শে গিয়ে পড়েছিলে! কি সর্বনাশ! ওকে আমরা পর্যন্ত ভয় করে চলি—কি রকম জান? যেমন লোকে ক্ষ্যাপা শেয়াল-কুকুর কি গোখরো সাপকে ভয় করে, তেমনি। ও সেই জাতীয়। অসাধারণ ক্ষমতা ওর নিম্নতন্ত্রের। ওর ইতিহাস বড় অদ্ভুত, সে একদিন বলব। কত দিন ওর সঙ্গে ছিলে?

—প্রায় দু-মাস।

সাধুজী বললেন—যখন ওর সঙ্গে ছিলে, তখন কিছু কিছু অধিকার হয়েছে তোমার। তোমাকে আমি মন্ত্র দেব। কিন্তু তুমি যুবক, তোমার মনের ভাব আমি জানি। তুমি কি জন্যে রাত্রে পঞ্চমুণ্ডির আসনে গিয়েছিলে বল তো?

আমি লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলাম। মনের গোপনে পাপ নেই, যদি পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে থাকি—তবে সেই অপরিচিতা নিশাবিহারিণী রূপসীর টানে যে, এ-কথা গুরুস্থানীয় ব্যক্তির কাছে স্বীকার করব কেমন করে।

সেই দিন সাধু অতি অদ্ভুত ও গোপনীয় কথা আমায় বললেন।

বললেন—কিন্তু একটা কথা তুমি জান না, সেটা আগে বলি। তুমি সেদিন যাঁকে রাত্রে ছাতিমতলায় ব'সে দেখেছিলে, তিনি তোমার আমার মত দেহধারী মানুষ নন্।

শুনে তো মশাই আমার গা শিউরে উঠল—দেহধারী জীব নয়, বলে কি রে বাবা! তবে কি ভূত-পেত্নী নাকি?

সাধুজী বললেন—তোমায় এ কথা বলতাম না, যদি না শুনতাম যে তুমি মাতু পাগলীর সঙ্গে ছিলে। আচ্ছা শুনে যাও। আমার গুরুদেব ছিলেন ৺কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী, হুগলী জেলায় জেজুড় গ্রামে তাঁর মঠ ছিল। মস্ত বড় সাধক ছিলেন, কুলার্ণব আর মহাডামর এই দুই শ্রেষ্ঠ তন্ত্রে তাঁর সমান অধিকার ছিল। মহাডামর-তন্ত্রের একটি নিম্ন শাখার নাম

ভূতডামর। আমি তখন যুবক, তোমারই মত বয়েস—স্বভাবতই আমার ঝোঁক গিয়ে পড়ল ভূতডামরের উপর। গুরুদেব আমার মনের গতি বুঝতে পেরে ও-পথ থেকে ফেরাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু তাই কি হয়, অদৃষ্টলিপি তবে আর বলেছে কাকে? এই তোমার যেমন—

আমি বললাম—ও-পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন কেন?

—ও-পথ প্রলোভনের পথ, বিপদের পথ। ভূতডামর তন্ত্র নানাপ্রকার অশরীরী উপদেবীদের নিয়ে কারবার করে—তন্ত্রের ভাষায় এদের সাধারণ নাম যোগিনী। জপে ও সাধনায় বশীভূত হয়ে এদের মধ্যে যে-কেউ—যার সাধনা তুমি করবে—সে তোমার আপন হয়ে থাকতে পারে। নানা ভাবে এদের সাধনা করা যায়, কিঙ্কণী দেবীকে মাতৃভাবে পেতে হয়, কনকবতী দেবীকে পাওয়া যায় কন্যাভাবে—কিন্তু বাকী সব যোগিনীদের যে-কোন ভাবে সাধনা করা যায় এবং যে-কোন ভাবে পেতে পারা যায়। এই সব যোগিনীদের কেউ ভাল কেউ মন্দ। এঁদের জাতি নেই বিচার নেই ধর্ম নেই, কোন গণ্ডি বা বাধ্যবাধকতার মধ্যে এঁরা আবদ্ধ নন। ভূতডামরে এই সাধনার ব্যাপারে ব'লে দেওয়া আছে। ভূতডামরের প্রথম শ্লোকই হ'ল—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনী সাধনোত্তমম্
সর্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্বসিদ্ধিদম্
অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্লভা

তুমি সেদিন যাঁকে দেখেছিলে তিনি এই রকম একজন জীব। তোমার সাহস থাকে সে-মন্ত্র আমি তোমায় দেব। কিন্তু আমার যদি নিষেধ শোন তবে এ-পথে নেমো না।

এতটা বলে সাধুজী ভাল করেন নি, আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আমায় আর কি সামলে রাখতে পারেন? আমি নাছোড়বান্দা হয়ে পড়লাম, মন্ত্র নেবই।

সাধুজী বললেন—তবে কনকবতী দেবী-সাধনার মন্ত্র নাও—কন্যাভাবে পাবে দেবীকে—

আমি চুপ করে রইলুম।

তিনি আবার বললেন—তবে কিঙ্কণী-সাধনার মন্ত্র?

আঃ, কি বিপদেই পড়েছি বুড়ো সাধুটাকে নিয়ে। অন্য যোগিনীদের দেখতে দোষ কি?

সাধু আমায় চুপ ক'রে থাকতে দেখে বললেন—বেশ, আমি তোমাকে মধুসুন্দরী দেবী-সাধনার মন্ত্র দিচ্ছি। এঁকে কন্যা ভাবে, ভগ্নী ভাবে বা ভার্যা ভাবে পেতে পার। তবে আমার যদি কথা শোন, কখনও ভার্যা ভাবে পেতে যেও না। এর বিপদের দিক বলি। ভার্যা ভাবে সাধন করলে তিনি তোমাকে প্রণয়ীর মত দেখবেন—কিন্তু এঁরা মহাশক্তিশালিনী যোগিনী, সাধারণ মানবী নয়, এঁদের আয়ত্তের মধ্যে রাখা বড় শক্ত। হয় তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখী মানুষ ক'রে রাখবে, নয়তো একেবারে উন্মাদ ক'রে ছেড়ে দেবে। সামলাতে পারা বড় কঠিন।

সাধুজী আমায় মন্ত্র দিলেন এবং বললেন—বাবা, এ জায়গা থেকে তোমায় চলে যেতে হবে। তোমায় এখানে আমি আর রাখতে পারি নে। এক জায়গায় দু'জন সাধকের সাধনা হয় না।

বেশ ভাল। আমিও তা চাইনে। আমার ভয় ছিল, হয়তো সাধুজীও মাতু পাগলীর মত হিপ্নটিজ্ম্ জানে, এবং খানিকটা অভিভূত ক'রে যা-তা দেখাবে আমায়। তারপর—

আমি তারানাথের কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—কেন, আপনি যে স্বচক্ষে পঞ্চমুণ্ডির আসনে কি মূর্তি দেখেছিলেন তখন তো সাধু সেখানে ছিলেন না?

—তারপর আমার টাইফয়েড জ্বর হয় বলি নি? হয়তো পঞ্চমুণ্ডির আসনে যখন বসে, তখনই জ্বর আসছে, সে-সময় জ্বরের পূর্বাবস্থায় অসুস্থ মস্তিষ্কে কি বিকার দেখে থাকব—হয়তো চোখের ধাঁধা। জ্বর ছেড়ে সেরে উঠে এ সন্দেহ আমার হয়েছিল, সত্যি বলছি।

যাক সে কথা। তারপর ওখান থেকে চলে গেলাম বরাকর নদীর ধারে আর একটা নির্জন জায়গায়। ওখান থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। একটা গ্রাম ছিল কিছু দূরে, থাকতাম

গ্রামের বারোয়ারী ঘরে। গ্রামের লোকে যে যা দিত তাই খেতাম, আর সন্ধ্যার পরে নদীর ধারে নির্জনে বসে মন্ত্র জপ করতাম।

এই রকমে একমাস কেটে গেল, দু-মাস গেল, তিন মাস গেল। কিছুই দেখিনে। মন্ত্রের উপর বিশ্বাস ক্রমেই যেন কমে যাচ্ছে। তবুও মনকে বোঝালাম—ছ-মাস পরে পূর্ণাহুতি ও হোম করার নিয়ম ব'লে দিয়েছিল সাধুজী। তার আগে কিছু হবে না। ছ'মাসও পূর্ণ হ'ল। সাধুজী যেমন বলে দিয়েছিল, ঠিক সেই সব নিয়ম পালন করলাম।

পদ্মাসনং সমাস্থায় মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্মতম্।
আমিষান্নৈঃ পুপসূপৈঃ সংপূজ্য মধুসুন্দরীম্॥

বরাকর নদীর তীরে বসে ভাত রাঁধলুম, কই মাছ পোড়ালুম, আঙট কলার পাতায় ভাত ও পোড়ামাছের নৈবিদ্য দিলাম। ডুমুরের সমিধ দিয়ে বালির উপর হোম করে ওঁ টং ঠং ঝং ইঁ ক্ষ'ং মধুসুন্দর্য্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে আহুতি দিলাম। জাতিফুলের মালা নিতান্ত দরকার, কত দূর থেকে খুঁজে জাতিফুলের মালা এনেছিলাম—তার মালা ও চন্দন আলাদা কলার পাতায় রেখে দেবীর উদ্দেশে নিবেদন ক'রে ধ্যানে বসলাম—সারারাত কেটে গেল।

বললাম—কিছু দেখলেন?

—কা কস্য পরিবেদনা। ঘি, চন্দন, মিষ্টি কিনতে কেবল কতকগুলো পয়সার শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। ধ্যান-জপ-হোমে কিছুই ফল ফলল না। রাগ ক'রে টান মেরে সব নৈবিদ্য ফেলে দিলাম নদীর জলে। বেটা সাধু বিষম ঠকিয়েছে। কোনো ব্যাটার কোনো ক্ষমতা নেই—যেমন মাতু পাগলী তেমনি এ সাধু। তন্ত্রটন্ত্র সব বাজে, খানিকটা হিপ্‌নটিজ্‌ম্ জানে—তার বলে মূর্খ গ্রাম্যলোককে ঠকিয়ে খায়।

এ-সব ভাবি বটে, জপটা কিন্তু ছাড়তে পারিনি, অভ্যেসমত ক'রেই যাই. ওটা যেন একটা বদ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এ-ভাবে আরও মাস চার-পাঁচ কেটে গেল।

একদিন সন্ধ্যার পরেই। রাত তখন হয়েছে সবে, আধ ঘণ্টাও হয়নি। আমি একটা গাছের তলায় বসে জপ করছি, অন্ধকার হ'লেও খুব ঘন হয় নি তখনও—হঠাৎ তীব্র কস্তুরীর গন্ধ অনুভব করলাম বাতাসে। বেশ মন দিয়ে শুনে যাও। এক বর্ণও মিথ্যে বলিনি। যা যা হ'ল একটার পর আর একটা বলছি মন দিয়ে শোন। কস্তুরীর গন্ধটা যখন সেকেণ্ড চার-পাঁচ পেয়েছি তখন আমার সেদিকে মন গেল। ভাবলুম এ দেখছি অবিকল কস্তুরীর গন্ধ! বাঃ, পাহাড়ে জঙ্গলে কত সুন্দর অজানা বনফুলই আছে!

তারপরেই আমার মনে হ'ল আমার পেছনে অর্থাৎ যে-গাছটার তলায় ব'সে ছিলাম তার গুঁড়ির আড়ালে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে। আমি পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি নে বটে কিন্তু অনেক সময় লোকের উপস্থিতি চোখে না-দেখেও এভাবে ধরা যায়। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন যেন অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেল, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন গরম আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে মনে হ'ল। আবার অজ্ঞান হয়ে যাব নাকি? ভয় হ'ল মনে। ঠিক সেই সময় আমার সামনে দেখলাম একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। আধ সেকেণ্ড আগেও তিনি সেখানে ছিলেন না। ঠিক সেই পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসার রাত্রের সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এবার মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করলাম জ্ঞান হারাব না কখনই।

মেয়েটি দেখি ভ্রূকুটির সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—নিজের চোখে এমনি এক মূর্তি দেখলেন আপনি?

আমার কথার মধ্যে হয়তো একটু অবিশ্বাসের গন্ধ পাইয়া তারানাথ উগ্র প্রতিবাদের সুরে বলিল—নিজের চোখে। সুস্থ শরীরে। বিশ্বাস কর না-কর সে আলাদা কথা—কিন্তু যা দেখেছি তাকে মিথ্যে বলতে পারব না।

—কি রকম দেখলেন? কেমন চেহারা?

—ভারি রূপসী যদি বলি কিছুই বলা হল না। মধুসুন্দরী দেবীর ধ্যানে আছে।

উদ্যদ্ ভানু প্রতীকাশা বিদ্যুৎপুঞ্জনিভা সতী
নীলাম্বর পরিধানা মদবিহ্বললোচনা

নানালঙ্কারশোভাঢ্যা কস্তুরীগন্ধমোদিতা
কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্

অবিকল সেই মূর্তি। তখন বুঝলাম দেবদেবীর ধ্যান মনগড়া কথা নয়, সাধকে প্রত্যক্ষ না করলে এমন বর্ণনা দেওয়া যায় না।

—আপনি কোন কথা বললেন?

—কথা! আমার চেতনা তখন লোপ পাবার মত হয়েছে—তো কথা বলছি। পাগল তুমি? সে-তেজ সহ্য করা আমার কর্ম? সাধারণ মানবীর মত তার কোন জায়গাই নয়। ঐ যে বলেছে মদবিহ্বললোচনা—ওরে বাবা সে চোখের কি ভাব! ত্রিভুবন জয় হয় সে-চোখের চাউনিতে।...

আমি অধীর হইয়া বলিলাম—বর্ণনা রাখুন। কি কথা হ'ল বলুন।

—কথাবার্তা যা হয়েছিল সব বলার দরকার নেই।

মোটের উপর সেই থেকে মধুসুন্দরী দেবী প্রতি রাত্রে আমায় দেখা দিতেন। নদীতীরের সেই নির্জন জায়গায় তাঁকে চেয়েছিলাম প্রিয়ারূপে—বলাই বাহুল্য, সাধুর কথা কে শোনে? তখন শীতকাল, বরাকর নদীর জল কম হয়েছে অনেক, জলের ধারে জলজ লিলিগাছ শুকিয়ে হলুদে হয়ে এসেছে, আগে যেখানে জল ছিল, সেখানে বালির উপর অভ্রকণা জ্যোৎস্নারাত্রে চক্‌চক্ করে, বরাকর নদীর দুপারের শালবন পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে! আকাশ রোজ নীল, রাত্রে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার বড় মনোরম শোভা—সেই সময় থেকে তিনটি মাস দেবী প্রতিরাত্রে দেখা দিতেন—সত্যিকার বাঁচা বেঁচেছিলাম ঐ তিন মাস। এসব কথাও বলা এখন আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। কত বেদনাদায়ক তুমি জান না, আমার জীবনের যা সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ তা পেয়েছিলুম ঐ তিন মাসে। দেবীই বটে, মানুষের সাধ্য নেই অমন ভালবাসা, অমন নিবিড় বন্ধুত্ব দান করা—সে এক স্বর্গীয় দান...সে তুমি বুঝবে না, তোমায় কি বোঝাব, তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে, মিথ্যেবাদী না হয় পাগল ভাববে। হয়ত ভাবছ এতক্ষণ। তুমি কেন আমার স্ত্রীই আমার কথা বিশ্বাস করে না, আমায় তান্ত্রিক সাধু পাগল ক'রে দিয়েছিল গুণজ্ঞান করে।

কিন্তু সে সুখের প্রকৃতি ভীষণ তেজস্কর মদিরার মত। আমাকে তার নেশা দিনে দিনে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ ক'রে দিতে লাগলো। কিছু ভাল লাগে না। কেবল মনে হয় কখন সন্ধ্যা নামবে বরাকর নদীর শালবনে, কখন দেবী মধুসুন্দরী নায়িকার বেশে আসবেন! সারারাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যাবে স্বপ্নের মত, নেশার ঘোরের মত। আকাশ, নক্ষত্র, দিক-বিদিকের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে কয়েক প্রহরের জন্যে—কয়েক প্রহরের জন্যে সময় স্থির হয়ে নিশ্চুই হয়ে স্থাণুর মত অচল হয়ে থেমে থাকবে বরাকর নদীতীরের বনপ্রাঙ্গণে।

একদিন ঘটল বিপদ।

একটি সাঁওতালী মেয়ে রোজ নদীর ঘাটে জল নিতে আসে—সুঠাম তার দেহের গঠন, নিকটের বস্তীতে তার বাড়ি। অনেক দিন থেকে তাকে দেখচি, সেও আমায় দেখচে।

সেদিন সে জল নিয়ে ফিরে যাচ্চে। আমায় তাদের বাঁকা বাংলায় বললে—ছেলে হয়ে হয়ে মরে যায়, তার মাদুলি আছে তোমার কাছে সাধুবাবা?

এমন ভাবে করুণ সুরে বললে—আমার মনে দয়া হোল। মাদুলি দিতে জানি একথা বলিনি, তবে তার সঙ্গে কিছুক্ষল গল্প করেছিলাম। তারপর সে চলে গেল।

মধুসুন্দরী দেবীকে সেদিন দেখলুম অন্য মূর্তিতে। কি ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি, কি ভীষণ মুখের ভাব! সে মুখের ভাব তুমি কল্পনা করতে পারবে না—চণ্ডিকা দেবীর রোষকটাক্ষে যেমন লোলজিহ্বা, করালিনী প্রচণ্ডা কালভৈরবী মূর্তির সৃষ্টি হয়েছিল—এও যেন ঠিক তাই।

সেদিন বুঝলুম আমি যার সঙ্গে মেলামেশা করি, সে মানুষ নয়—মানুষের পর্যায়ে সে পড়ে না। মানবী রাগ যতই করুক সে করালিনী হয় না, পিশাচী হয় না—মানবীই থেকে যায়।

ভীষণ পূতিগন্ধে সেদিন শালবন ভরে গেল—প্রতি দিনের মত কস্তুরীর সুবাস কোথায় গেল মিলিয়ে! তারপর এলেন মধুসুন্দরী দেবী—দেখেই মনে হোল এরা দেবীও বটে,

বিদেহী পিশাচীও বটে। এদের ধর্মাধর্ম নেই, সব পারে এরা। যে হাতে নায়িকার মত ফুলের মালা গাঁথে, সেই হাতেই বিনা দ্বিধায়, বিনা অনুশোচনায়, নিমেষে ধ্বংস করতে এরা অভ্যস্ত।

আমার ভীষণ ভয় হোল।

পিশাচী মধুসুন্দরী তা বুঝে বললে—ভয় কিসের?

বললুম—ভয় কই? তুমি রাগ করেছ কেন?

খল খল অট্টহাস্যে নির্জন অন্ধকার ভরে গেল। আমি শিউরে উঠলাম।

পিশাচী বললে—শব চিনতে পারবে? অন্ধকার রাত্রে সাঁওতালদের কোনো বৌয়ের শব তোমার সামনে দিয়ে যদি জলে ভেসে যায়—চিনতে পারবে? তুমি না যদি চিনতে পারো, দু'টি শবে জড়াজড়ি ক'রে ভেসে থাকলে অন্য লোকে সকালে নিশ্চয়ই চিনবে।

হাত জোড় ক'রে বললুম—দেবী, তোমায় ভালবাসি। ও মূর্তি আমায় দেখিও না—আমায় মারো ক্ষতি নেই—কিন্তু অন্য কোন নিরপরাধিনী স্ত্রীলোকের প্রাণ কেন নেবে? দয়া করো।

বহু চেষ্টায় প্রসন্ন করলুম। তখন আবার যে দেবী, সে দেবী। বললেন—সেই সাঁওতালের মেয়ের মূর্তিতে আমায় দেখতে চাও? সেই মূর্তিতে এখুনি দেখা দেবো।

বলতে বলতে সেই সাঁওতালদের মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে। বরং আরও নিটোল গড়ন শরীরের, মুখের ভাব আরও কমনীয়।

বললুম—ও চাই না—তোমার মূর্তি দেখাও দেবী।

সেই রাত্রি থেকে বুঝলুম কালসাপ নিয়ে খেলা করচি আমি। গুরুদেব বারণ করেছিলেন এই জন্যেই। হয়তো একদিন মরবো এর হাতেই। সাপুড়ে সাপ খেলায় মন্ত্রে—আবার বেকায়দায় পড়লে সাপের ছোবলেই মরে। এভাবে বেশীদিন কিন্তু ছিল না। কিছুদিন পরে পিশাচী মূর্তি ভুলে গেলুম দেবীর অনুপম প্রেমে ও মধুর ব্যবহারে। তাতেও বুঝলুম এ সাধারণ মানবী নয়—অমানুষিক ধরণের এদের মন। মানুষের বিবর্তনের জীব এরা নয়। হয় তার ওপরে, নয় তার নীচে।

একদিন দেবী আমায় বললেন—আর কিছুদিন যাক্ তোমায় বহুদূর নিয়ে যাবো—

—কোথায়?

—সে বলবো না এখন।

—কতদূরে? কোন্ দিকে?

—এতদূরে এমন দিকে যা তুমি ধারণা করতে পারবে না। তবে তোমার ভাগ্যে আছে কি তা?

সব ভুলে গেলাম আবার। পিশাচিনী মধুসুন্দরী তখন কোথায় মিলিয়ে গেছে—আমার সামনে হাস্যলাস্যময়ী, যৌবনচঞ্চলা, মুগ্ধস্বভাবা অপরূপ রূপসী এক তরুণী নারী। দেবীই বটে।

আমি আবার কিসের নেশায় অভিভূত হয়ে পড়লুম. মাথার ঠিক রইল না।

একদিন বললেন—বিপদ আসচে তোমার, তৈরী হও।

—কি বিপদ?

—তা বলবো না।

—প্রাণ-সংশয়ের বিপদ?

—তা বলবো না।

—তুমি অভয় দিলে বিপদ কিসের?

—আমি ঠেকাতে পারবো না। কেউ ঠেকাতে পারবে না। যা আসচে, তা আসবেই।

কথা খেটে গেল শীগ্গির. খুব বেশী দেরি হয়নি।

তিন মাস পরে আমার বাড়ি থেকে লোকজন সন্ধানে সন্ধানে সেখানে গিয়ে হাজির। গ্রামের লোক তাদের বলেছে কে একজন পাগল, বোধ হয় বাঙালীই হবে, অল্প বয়সে বরাকর নদীর ধারে শালবনে সন্ধ্যাবেলা ব'সে থাকে—আর আপন মনে বিড় বিড় ক'রে বকে। আমায় এ অবস্থায় গাঁয়ের অনেকেই নাকি দেখেছে।

তাই শুনে বাড়ির লোক আমায় গিয়ে খুঁজে বার করলে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরনে, মাথায় জট, গায়ে খড়ি উড়ছে—এই অবস্থায় নাকি আমায় ধরে। বাড়ি ধরে আনবার জন্যে টানাটানি, আমি কিছুতেই আসব না, ওরাও ছাড়বে না। আমার তখন সত্যিই জ্ঞান নেই, সত্যিই আমি ক্ষিপ্ত, উন্মাদ। ওরা হয়তো আমায় আনতে পারত না—কিন্তু যে দেবীকে পেয়েছিলাম প্রণয়িনী রূপে, তিনি নিরুৎসাহ করলেন।

—কি রকম?

ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী গ্রামের একটি গোয়ালঘরে আমায় বেঁধে রেখেছিল। গভীর রাত্রে বাঁধন ছিঁড়ে ওদের হাত থেকে লুকিয়ে পালিয়ে সেই একটি রাত মধুসুন্দরী দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দেবীকে বললাম—আমি এই নদীতীরের তীর্থস্থান ছেড়ে কোথাও যাব না। তিনি নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললেন—যেতে হবেই, এই আমার অদৃষ্টলিপি। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে তিনি অত বড় শক্তিশালিনী যোগিনী হয়েও যেতে পারেন না। তিনি জানেন, এই রাতের পরে জীবনে তাঁর সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না। আগে থেকে বলে তৈরী ক'রে রাখতে চেয়েছিলেন এই জন্যেই।

দেবী ত্রিকালজ্ঞা, তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি কি ক'রে তিনি একথা জানলেন। হ'লও তাই, বাড়ী আসার পরে সবাই বললে কে কি খাইয়ে পাগল ক'রে দিয়েছে। দিনকতক উন্মাদের চিকিৎসা চলল—বছর খানেক পরে আমার বিয়ে দেওয়া হ'ল। সেই থেকেই আমি সংসারী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কখনো মন্ত্র জপ করে তাঁকে আহ্বান করেন নি কেন?

—বাপ রে! এ কি ছেলেখেলা? মারা যাব শেষে! অন্য নারী জীবনে এলে তিনি দেখা দেবেন? সে-চেষ্টাও কখনো করিনি। সে কতকাল হয়ে গেল, সে কি আজকার কথা?

—আচ্ছা, এখন আর তাঁকে দেখতে ইচ্ছে হয় না?

বৃদ্ধ তারানাথ উৎসাহে, উত্তেজনায় বালিশ বুকে দিয়া খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল। ইচ্ছে হয় না কে বলেছে? বললুম তো ঐ তিনমাসই বেঁচে ছিলাম। দেবী এসেছিলেন মানুষী হয়ে। এদিকে ষড়ৈশ্বর্যশালিনী শক্তিরূপিণী যোগিনী, তেজে কাছে ঘেঁষা যায় না—অথচ কি মানবীই হয়ে যেতেন, যখন ধরা দিতেন আমায়! প্রিয়ার মত আসতেন কাছে, অমনই মিষ্টি, অমনই ঠোঁট ফুলিয়ে মাঝে মাঝে অভিমান, বরাকর নদীর ধারের শালবন রাত্রির পর রাত্রি তাঁর মধুর হাসিতে জ্যোৎস্নার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠতো—এমনি কত রাত ধরে! এক এক সময় ভ্রম হ'ত তিনি সত্যই মানুষীই হবেন।

বিদায় নিয়ে যাবার সেই রাতটিতে বললেন—নদীতীরের এই তিন মাসের জীবন আমিও কি ভুলব ভেবেছ! আমাদের পক্ষেও সুলভ এ নয়, ভেবো না আমরা খুব সুখী। আমাদের মত সঙ্গীহারা, বন্ধুহারা জীব কোথায় আছে? প্রেমের কাঙাল আমরাও। কত দিন পরে একজন মানুষে আমাদের সত্যিকার চাওয়া চায়, তার জন্যে আমাদের মন সর্বদা তৃষিত হয়ে থাকে কিন্তু তাই ব'লে নিজেকে সহজলভ্য করতে পারিনে, আগ্রহ ক'রে যে না চায় তার কাছে যাই নে, সে আমার প্রেমের মূল্য দেবে না, নিজেও আনন্দ পাবে না, যা কিনা পাওয়া যায় বহু চেয়ে পাওয়ার পরে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টলিপি; কোথাও চিরদিন থাকতে পারিনে—কি না কি ঘটে যায়, ছেড়ে চলে যেতে হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ক'জন আমাদের ডাকে? ক'জন বিশ্বাস করে? সুখী ভেবো না আমাকে।

বলিলাম—এত যদি সুখের ব্যাপার তবে আপনি ভয়ঙ্কর বলেছিলেন কেন আগে?

—ব্যাপার ভয়ঙ্কর এই জন্যে যে আমার সারা জীবনটা মাটি হয়ে গেল ঐ তিন মাসের সুখভোগে। কোন দিকে মনই দিতে পারিনে—মধ্যে তো দিনকতক উন্মাদ হয়েই গিয়েছিলাম, বিয়ের পরেও। তারপর সেরে সামলে উঠে এই জ্যোতিষের ব্যবসা আরম্ভ ক'রে যা হয় একরকম—সেও দেবীরই দয়া। তিনি বলেছিলেন, জীবনে কখনও অন্নকষ্টে আমায় পড়তে হবে না। পড়তে কখনও হয়নি—কিন্তু ওতেই কি আর আনন্দ দেয় জীবনে?

তারানাথ গল্প শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে যাইবার জন্য উঠিল। আমিও বাহির হইয়া ধর্মতলার মোড়ে আসিলাম। এত অদ্ভুত, অবাস্তব জগৎ হইতে বিংশ শতাব্দীর বাস্তব সভ্যতার জগতে আসিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যতক্ষণ তারানাথ গল্প বলিয়া-

ছিল ততক্ষণ ওর চোখমুখের ভাবে ও গলার স্বরে গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস জাগে নাই—কিন্তু ট্রামে উঠিয়াই মনে হইল—

কি মনে হইল তাহা আর না-ই বা বলিলাম?

ছেলে-ধরা

সবাই মিলে বাসায় ফিরে এলাম।

এসেই দেখি ঝুমরির মা বাংলোর বারান্দাতে বসে। তার সঙ্গে নাহানপুর গ্রামের কয়েকটি লোক। নাহানপুর শোন নদের ধারে একটা গ্রাম—বেশির ভাগ গোয়ালার বাস এ গ্রামে। শোনের চরে গরু মহিষ চরিয়ে দুধ ঘি উৎপাদন করে। ডিহরি থেকে ঘি চালান যায়। এই নাহারপুর গ্রাম থেকেই তিনটি ছেলে হারিয়েছে গত পনেরো দিনের মধ্যে। ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি যে হয়েছে এই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে, সেটাকে নিতান্ত অকারণ বলি কি করে।

একটা লোক এগিয়ে এসে বললে—কি হল বাবু?

আমরা বললাম—কিছু না, তোমরাও তো খুঁজছিলে।

—হাঁ বাবুজি। আমাদেরও কিছু না।

—তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?

—বহুৎ দূর, বন-জঙ্গলের দিকে। সে সব দিকে তোমরা যেতে পারবে না। তোমরা চেন না সেদিক। পরে ওরা পরামর্শ করতে বসল। আমরা বাঙালী বাবু, লেখাপড়া-জানা, আমরা কি দিই পরামর্শ ওদের? পনেরো দিনের মধ্যে তিনটি ছেলে উধাও। এখানে বাস করা দায় হয়ে উঠল। ডিহিরি শহর এখান থেকে অনেক দূর। প্রায় ন মাইল রাস্তা। সেখানে গিয়ে পুলিশের সাহায্য চাওয়া কি উচিত নয়?

আগের লোকটার নাম মন্নু আহীর। মন্নু বললে ওই অঞ্চলের হিন্দীতে—বাবু, জঙ্গল পাহাড় অঞ্চলের গাঁ। বেশী লোক থাকে না এক গাঁয়ে। দূরে দূরে গাঁ। এখানে এই রকম বিপদ হলে আমরা কি করে বাঁচি? আপনারা এসেছেন বেড়াতে, মজুমদার সাহেবের কুঠিতে আছেন, তবু কত ভরসা আমাদের। মজুমদার সাহেব বড়লোক, আসেন না আজকাল আর। আগে আগে যখন নতুন কুঠি বানালেন, তখন কত আসতেন।

ওরা সেদিন চলে গেল যখন, তখন রাত দশটা। বেশ দল বেঁধে মশাল জ্বেলে চলে গেল।

সতীশ গিরির দলপতিত্বে পরদিন হৈ হৈ করে হারানো ছেলে খুঁজতে বেরনো গেল। রোটাস গড়ে ওঠাই হত এবং ঠিক ছিল। কিন্তু একজন মহিষ-চরানো বৃদ্ধ রাখাল আমাদের বারণ করলে। ওখানে কি করতে যাবে বাবুজী, রোটাস গড়ে লোক থাকে না। চৌকিদার একজন আছে, সে সব সময় ওপরে থাকে না, নিচে নেমে আসে। ওখানে যাওয়া মিথ্যে।

বনের মধ্যে একস্থানে আমরা সেদিন বাঘের থাবার দাগ পেলাম। মহুয়া গাছের তলায় দিব্যি বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ। আমাদের মধ্যে একজন বললে—ওদের বাঘে নিচ্ছে না তো? যে বাঘের ভয় এদেশে—

হীরু বললে—তাই বা কি করে সম্ভব? বাঘ গাঁয়ের মধ্যে ঢুকলে সেখানে তো পায়ের দাগ থাকত।

দুপুরে আমরা খেতে এলাম বাসায়। শোনের চরে বালুহাঁস শিকার করেছিল ধীরেন আজ সকালে, আমাদের বেরোবার আগে। দশ মিনিটের মধ্যে তিনটি। খুব মজা করে

হাঁসের মাংস খাওয়া যাবে সবাই মিলে।
সতীশ গিরি খাওয়ার সময়ে বললে—শিকার করা বর্বরের কাজ তা জান?
আমরা সবাই চুপ।
হীরু বললে—বাজার থেকে মাংস কিনে খাও নি কখনও?
সতীশ গিরি বললে—আমি দেখেশুনে তো সে জন্তুকে মারি নি। আমি না কিনলেও অপরে কিনত।
খাওয়াদাওয়ার পরে হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল উঠল। জন-কয়েক লোক এসে হাজির হল বাংলোর কম্পাউন্ডে ব্যস্তসমস্ত ভাবে। সতীশ গিরি এগিয়ে গিয়ে বললে—কি হয়েছে? কি, কি?
ওরা বললে—আবার ছেলে চুরি গিয়েছে আজ।
আমরা সবাই অবাক। সতীশ বললে—আজ? কোন্ গাঁ থেকে?
—নাহানপুর থেকে দু মাইল ওদিকে। উনাও বলে একটা গাঁ। একটা ছোট ছেলে নিয়ে মা ফিরছিল গাঁয়ের বাইরের মাঠ থেকে। ছোট ছেলেটাকে এক জায়গায় ওর মা রাস্তার পাশে রেখে শালপাতা ভাঙতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে ছেলে নেই।
—বাঘের পায়ের দাগ?
—না বাবু।
—মানুষের?
—অত ভাল করে মেয়েমানুষ কি দেখেছে?

আমরা বাংলো থেকে সন্ধ্যের আগেই বেরিয়েছি। কত জায়গায় খুঁজলাম কিন্তু কোন পাত্তা পাওয়া গেল না খোকার। সেই বনবেষ্টিত পাহাড়-অঞ্চলে সন্ধ্যার পর বেরনো কত বিপজ্জনক আমরা জানি, কিন্তু তবু ছেলেটিকে খুঁজে এনে মায়ের কোলে দেওয়ার আনন্দ যে কত বড়! যদি পারা যায়, যদি খোকার মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে পারি!
কিন্তু এদিকে রাত হয়ে আসছে। সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হীরু। বিদেশবিভুঁই জায়গা, জঙ্গলাবৃত পাহাড় চারিধারে। বাঘের ভয়ও আছে। বৈশাখ মাসের চড়া রোদে পাহাড় তেতে এমন আগুন হয়ে আছে যে একপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত ঠান্ডা হয় না। তাও সত্যিকার ঠান্ডা হয় না। বিদেশে বেড়াতে এসে কি শেষে বাঘের পেটে যাব?
কথাটা ঠিক।
সতীশ মহারাজের কি! তার বাপ নেই, মা নেই। মরে গেলে কাঁদবে না কেউ। আমাদের তা নয়, আমাদের সবাই বেঁচে!
হীরু বললে—আজ কদিন হল আমরা এসেছি এখানে?
আমি বলি হিসেব করে—আজ তেরো দিন।
—আর কতদিন থাকা হবে?
—আর চার-পাঁচ দিন।
—কিন্তু এই হাঙ্গামাটা না চুকলে তো—
—সে তো বটেই।
হীরু বললে—ঘরের পয়সা খরচ করে বেড়াতে এসে কি ফ্যাসাদ!
ধীরেন একটু বিরক্তির সঙ্গে বললে—কে জানত এমনতর হবে। তাহলে কি—
সতীশ আমাদের মধ্যে সাধু-প্রকৃতির লোক। অনেস্ট, সত্যবাদী, পরোপকারী—ওকে আমরা এইজন্যে সতীশ গিরি, কখনও সতীশ মহারাজ বলে ডাকতাম, অবিশ্যি ব্যঙ্গচ্ছলে।
সতীশ মহারাজ বললে—ওর মায়ের কান্না শোনবার পরেও একথা তোমরা বলতে পারলে?
ও মাঝে মাঝে আমাদের বিবেক জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা পায় এই ভাবে। সেদিন এক বুড়ি টোমাটো নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাকে ডেকে বললাম—এস টোমাটো কিনব। বুড়ি বাজার দর জানে না বোধ হয়। সে বললে—বাজারে তোমরা কত করে কেনো বাবুজি?

আমরা জানি ছ পয়সা বাজার-দর এক সের টোমাটোর। হীর্ বললে—চার পয়সা দর বাজারে, দিবি?

বুড়ি দিয়ে গেল।

কিন্তু সতীশ গিরির তিরস্কারে সে টোমাটো আমাদের মুখে ওঠে নি সেদিন।

হীরুর নির্বুদ্ধিতা, সে গেল বাহাদুরি করতে তা নিয়ে খাবার সময়।

আমরা সবাই খেতে বসেছি। সতীশ মহারাজ গম্ভীরভাবে হেঁকে বললে—'টোমাটোর অম্বল আমার পাতে দিও না।' সবাই অপ্রস্তুত। যে রকম সুরে সে হেঁকে বললে, তার পর সেদিন আর উক্ত তরকারী কারও পাতে পড়তে পারল না। অসম্ভব। যাক গে, আজ কিন্তু সতীশ মহারাজের কথার প্রতিবাদ করলে ধীরেন। বললে—ঝুমরির মা দোর খুলে শুয়েছিল কেন রাত্তিরে?

সতীশ বললে—তাই কি?

—তা না হলে তো ছেলে হারাত না।

—সে নির্বোধ মেয়েমানুষ।

—তাহলে তার এমন হওয়াই উচিত। যখন সবাই জানে একথা যে, গাঁ থেকে বা এ অঞ্চল থেকে ছেলে চুরি যাচ্ছে প্রায়ই—

হীরু বললে—এইবার নিয়ে চারটি ছেলে এভাবে গেল।

ধীরেন বললে—হ্যাঁ, যখন তা সবাই জানে, তখন কি ওর উচিত হয়েছে রাতে দোর খুলে শোওয়া?

সতীশ বললে—এ গরমে করেই বা কি?

—তখন তার যাওয়াই উচিত। আমাদের দোষে তো যায় নি?

আমি ওদের থামিয়ে বলি—শোন, বাজে বকে লাভ নেই। ছেলে চুরি বা হারানো এ অঞ্চলে আমরা এসে পর্যন্ত শুনছি একথা ঠিক। তবু এসব দেশের গ্রাম্য লোকে অত সতর্ক হতে শেখে নি। পরের ছেলে হারিয়েছে—খোঁজবার চেষ্টা করা যাক, বিশেষ করে ওর মা আমাদেরই ঝি। যে কদিন আমাদের ছুটি বাকি আছে, খোঁজ, না পাই কলকাতায় যাবার সময় মনে অন্তত আমাদের ক্ষোভ থাকবে না। এ অজানা বন-জঙ্গলের দেশে আমরা এর বেশি আর কি—

আমাকে সবাই সমর্থন করলে।

সতীশ বললে—কাল চল রোটাস ফোর্টে উঠে দেখা যাক!

ধীরেন বললে—বড্ড সোজা কথা বললে। রোটাস ফোর্টে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়। এ গরমে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। ওপরে জল নেই। বাঘ সেদিনও বেরিয়েছিল জঙ্গলে। ফেরবার পথে সন্ধ্যে হয়ে গেলে ঐ বন ভেঙে নিচে নামতে পারব? আমাদের ঘরে বাপ-মা আছে সতীশদা!

আমি বললাম—তা ছাড়া রোটাস ফোর্টে পাহাড়ের ওপর ছেলে নিয়ে গিয়ে তুলবে কে? আমার মনে তো হয় না।

সতীশ বললে—দেখতে দোষ কি?

—তুমি বল যদি, আমি তোমার সঙ্গে যাব, সতীশ। তুমি ভাবতে পার এরা কষ্টের ভয়ে হয়তো যেতে চাইবে না। চল কাল সকালে।

হীরু ও ধীরেন নিজেদের ছোট করতে চায় না। তারা মুখে বললে, আমরাও যাব—কিন্তু মনে মনে বোধ হয় বিরক্ত হল আমার ও সতীশ মহারাজের ওপর।

গ্রামের লোকজন ডাকিয়ে আমরা তাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে দিয়ে এক এক দিকে পাঠালাম। আমরা নিজেরাও বেরিয়ে পড়লাম। নাহানপুরের পথে, ডিহিরি যাবার পথে, শোন নদের ধারে। সব দিকে আমরা বলে দিয়েছি কোনও রকম সন্ধান পেলে যেন বাংলোতে এসে খবর দেওয়া হয়। সেখানে সতীশ মহারাজ স্বয়ং বসে। তাকে কোথাও যেতে দিই নি আমরা। কারও মুখে কোন রকম সন্ধান পেলে যেন বাংলোয় খবর দেওয়া হয়।

সারাদিন কেটে গেল। কেউ কোন খবর নিয়ে এল না। কোন পাত্তাই পাওয়া গেল

না হারানো ছেলের। সন্ধ্যার অনেক পরে আমরা পরিশ্রান্ত দেহে বাংলোর বারান্দায় প দিতে না দিতে সতীশ গিরির দরবার জেরা।...কাজে ফাঁকি আমরা দিয়েছি কিনা দেখে নেবে সতীশ। আমরা কি ওখানে গিয়েছিলাম? সেখানে গিয়েছিলাম? অমুক জঙ্গলের পথ কি দেখেছি? একটু চা খাব সারাদিন পরিশ্রমের পরে, তা কৈফিয়ৎ দিতে দিতেই প্রাণান্ত হবার উপক্রম হল।

খেয়ে-দেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়া গেল। কাল সকালেই আবার নাকি বেরতে হবে। ধীরেন বললে—চল, পরশু আমরা এখান থেকে খসে পড়ি। আর এ ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না।

আরও দুদিন কেটে গেল। কোনও ছেলেরই পাত্তা পাওয়া গেল না। ঝুমরির মা কেঁদে কেঁদে বেড়ায়, গ্রামের লোকজন এসে ফিরে যায়। আমরা কদিন খোঁজাখুঁজির পর ক্রমে আলগা দিলাম। ক্রমে আরও দিন কেটে গেল।

সেদিন আমরা জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করে রওনা হয়ে পড়লাম। সিমেণ্ট পাহাড়ের গা কেটে পাথর নিয়ে যাচ্ছে ডিহিরিতে, সেই লরিতে আমরা চলেছি। জিনিসপত্র সমেত আমাদের ডিহিরি স্টেশনে পেঁছে দেওয়ার ভাড়া সাত টাকা ধার্য হয়েছে।

লরি ছাড়ল রাত আটটার সময়। পাথর বোঝাই করতে দেরি হয়ে গেল। পাহাড়-জঙ্গলের পথে বোঝাই লরি বেশি জোরে যেতে পারছে না, আমরা দিন কুড়ি পরে কলকাতায় ফিরছি, মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে চলেছি।

ডিম্‌হা ও বোচাহির পাহাড়ের কাছাকাছি পার্বত্য ক্ষুদ্র নদী পার হতে পাথর-বোঝাই লরির খানিকটা সময় লাগল। হাঁটুখানেক জল নদীতে। ঘন জঙ্গল দুধারে—হরীতকী, মহুয়া ও শাল। কি একটা পাখী কুস্বরে ডাকছে ডিম্‌হা পাহাড়ের ওপরকার বনে। লরি হু হু চলেছে।

এমন সময় লরিওয়ালা বলে উঠল—ও ক্যা বাবুজী? আমরা লরি-ড্রাইভারের পাশেই বসে। তখন দশটা, কোনদিকে লোকালয় নেই সেখানটাতে। চেয়ে দেখি, পথ থেকে রশি-দুই দূরে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে। যেন কেউ আগুন পোয়াচ্ছে কি ভাত রেঁধে খাচ্ছে। আমরাও চেয়ে দেখলাম।...কে ওখানে?

কৌতূহল হল দেখবার জন্যে। লরি থামিয়ে রাস্তার একপাশে রাখা হল। আমি ও সতীশ গিরি এগিয়ে গেলাম। আমাদের পেছনে পেছনে ধীরেন, হীরু ও লরি-ড্রাইভার। যখন আধ রশি মাত্র দূরে আছে আগুনে তখন আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম হঠাৎ।

অন্ধকার রাত। শোন নদের ধারের কাশচর দূর থেকে সাদা কাপড় পরা প্রেতের মত দেখাচ্ছে। ধীরেন বললে—শোনের ধারে যাস নে ভাই, ওদিকেই কাশবনে বাঘ থাকে। চল্ সিমেণ্টের পাহাড়ের ওপর। সতীশ মহারাজ গম্ভীরভাবে বললে—ওটা সিমেণ্টের পাহাড় নয়। সিমেণ্ট জিনিসটা বালির সঙ্গে আরও জিনিস মিশিয়ে তৈরি করতে হয়। ওটা বেলে পাথরের পাহাড়। যাকে বলে স্যাণ্ডস্টোন।...আমাদের মনের অবস্থা এখন সতীশ গিরির ভূতত্ত্ব-বক্তৃতা শোনবার অনুকূল নয়। আমরা আজ আর খুঁজতে রাজী নই। আর খুঁজবই বা কোথায়?

বড় সিমেণ্টের পাহাড়ের তলায় শালচারা আর কি কি গাছের বনজঙ্গল। সেদিন সন্ধ্যায় এখানে হায়েনার হাসি শোনা গিয়েছিল। সে হাসি গভীর রাত্রে শুনলে প্রেতের অট্টহাসির মত শোনায়; শহুরে ছেলে আমরা, আমাদের গায়ে কাঁটা দেয়। পাহাড়ের ওপর কলকাতার কোন্ ভদ্রলোকের এক বাংলো আছে। কিন্তু তিনি কোনদিন আসেন না। তাঁর বাড়ীর দরজা-জানলায় উই ধরেছে, কাঠের ফটকটা ভেঙে দুলছে কব্জার গায়ে। ভূতের বাড়ী বলে মনে হয় প্রথমটা। লোকে বলে ভূতও নাকি আছে। মহুয়া ফুলের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, বড় বড় মহুয়া গাছগুলোর তলায় পাতা পুড়িয়ে দিয়েছিল গত চৈত্র মাসে মহুয়া ফুল সংগ্রহ করবার জন্যে। পাতা-পোড়া ছাইয়ের গন্ধ বাতাসে। ছাইয়ের ওপর আবার পড়েছে শুকনো পাতার রাশ। খস খস করে কি একটা জন্তু পালিয়ে গেল তার ওপর দিয়ে।

ধীরেন চমকে উঠে বললে—ও কি রে?

আমি বললাম—কিছু না! শেয়াল হবে।
আমাদের চোখে যা পড়ল তা এই—

একটা বড় অগ্নিকুণ্ডের সামনে একজন লোক বসে কি করছে। দূর থেকেই মনে হল লোকটা দীর্ঘাকার—একটু অসম্ভব ধরনের দীর্ঘাকার। কি একটা নাড়ছে-চাড়ছে আগুনের সামনে বসে যেন।

সতীশ গিরি বললে—সন্নিসি।

আমাদের মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই সন্নিসি-টন্নিসি হবে। কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে এই গভীর রাত্রে—আচ্ছা সন্নিসি তো! বাঘের ভয়ে দিনমানে এখানে মানুষ আসতে ভয় পায় যে!

আমরা এগিয়ে গেলাম আরও। লোকটাও বেজায় লম্বা—অগ্নিকুণ্ডের ধারে উবু হয়ে বসে লোকটা কি একটা আগুনের ওপর ধরে নাড়ছে-চাড়ছে। বেশ বড় ও কালো মত একটা কি। কি ওটা? আলো-আঁধারে সে জিনিসটা দেখাচ্ছে যেন একটা কালো কাপড়ের বাণ্ডিলের মত। আমাদের সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে। কি জিনিস ওটা?

হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম। সেই কালো বাণ্ডিলের মত জিনিসটা থেকে যেন একটা ছোট হাত ঝুলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সতীশ মহারাজ ও ধীরেন একসঙ্গে বলে উঠল—হ্যাঁ রে, ও তো একটা ছোট ছেলে।

আমরা তখন ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। অদূরে সেই অতি দীর্ঘাকার বিকটদর্শন লোকটাকে রাক্ষসের মত দেখাচ্ছে। সন্ন্যাসীর সাজ বটে। দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক ওর কপালে, দীর্ঘ জটাজুট, এতখানি লম্বা দাড়ি পড়েছে বুকের ওপর।

লোকটা সামনে অগ্নিকুণ্ডের ওপর একটা ছোট ছেলেকে দুহাতে ধরে ঝলসাপোড়া করছে। বাতাসে মড়া পোড়ার বিকট দুর্গন্ধ।

আমরা কেউ এগোতে সাহস করলাম না। কারও মুখে কথাটি নেই। এই গভীর রাত্রি, নির্জন পাহাড়-জঙ্গল, কোথাও লোকালয় নেই কাছে; সম্মুখে এই নররাক্ষস। কেমন একপ্রকার আতঙ্কে আমরা সবাই মোহগ্রস্ত হয়ে চুপ করে আছি; এক পাও কেউ এগোয় না।

লোকটা আমাদের দেখলে কট্‌মট্‌ চোখে। তার পর যেন বিরক্তমুখে সেই আধ-ঝলসানো ছেলেটাকে কাঁধে ফেলে নিলে আমাদের চোখের সামনে,—ঠিক যেমন লোকে গামছা কাঁধে ফেলে সেই ভঙ্গিতে। তারপর ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে অন্ধকারে বনের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সতীশ গিরির মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে গেল একটা কথা—ছেলেধরা।

নুটি মন্তর

হাবু—নাপিতের ছেলে, সুতরাং রীতিমত তার বুদ্ধি।

পায়রাগাছির গুণীন্ রোজা এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ, সে নাকি মন্ত্রবলে সাপ হতে পারে, বাঘ হতে পারে, কী না হতে পারে! লোহার সিন্দুকে কিংবা বাড়ীতে বড় বড় হব্‌সের চব্‌সের কুলুপ লাগানো আছে—পায়রাগাছির রোজা (ওঝা) এসে কি একটা মন্তর বিড়বিড় করে বলে দুবার তালা ছম্‌ছম্‌ করে নাড়লে, আর তালা সব গেল বেমালুম খুলে। এ কত লোকের স্বচক্ষে দেখা। রায়েদের কলম আমবাগানে বিকেল বেলা কেউ কেউ নাকি দেখেছে রোজা কলমের আম পাড়ছে—হয়তো লোকে ধরতে গিয়ে দেখলে একটা খরগোস লাফাতে লাফাতে বাগানের উত্তরদিকের বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।

পায়রাগাছির রোজা! মস্ত বড় নাম।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—এত বড় নাম-করা রোজা যে, তাকে কেউ কখনও দেখে নি। কোথায় যে কখন কি ভাবে থাকে, তা কেউ বলতে পারে না।

হাবুর বড্ড ইচ্ছে সে কিছু মন্তর-তন্তর শেখে। এ তার অনেক দিনের ইচ্ছে। এখন তার বয়স আঠার-উনিশ। যখন তার বয়স চোদ্দ-পনের তখন থেকে সে যেখানেই শুনেছে রোজা গুণীন্ এসেছে অমনি তার পিছু পিছু ছুটে গিয়েছে। একবার তাদের পাশের গ্রামের হাইস্কুলে একজন বড় জাদুকর এসে নানারকম তাসের খেলা, টাকার খেলা দেখালে। একটা তাস বেমালুম গোলাপ ফুল হয়ে গেল, এর মুঠোবাঁধা হাতের টাকা ওর হাতে গেল, এক গ্লাস জল হয়ে গেল মিষ্টি শরবত।

তাদের গাঁয়ের দু-চারজন লোকের সঙ্গে হাবুও গিয়েছিল খেলা দেখতে। একখানা তাসকে তার চোখের সামনে গোলাপ ফুল হতে দেখে সত্যি সে কি আশ্চর্যই না হয়ে গিয়েছিল!

ফেরবার পথে সন্ধে হয়ে এসেছে। ওর কি রকম গা ছম ছম করতে লাগল।

কালী স্যাকরা দলের মধ্যে প্রবীণ। হাবু বললে—আচ্ছা কালী জেঠা, ওসব কি করে করলে?

কালী স্যাকরা একটা তাচ্ছিল্যসূচক ভঙ্গি করে বললে—আহা, ওসব তো সোজা!

—সোজা, কালী জেঠা?

—খু-উব সোজা।

—কি রকম সোজা?

—ওসব মন্তর-তন্তরের কাণ্ড। আমি ইচ্ছে করলে পারি।

—তুমিও পার?

—কেন পারব না?

—একদিন করে দেখাবে জেঠা?

—হুঁ হুঁ, যা। সময় হলে দেখাব। ও কিছুই নয়।

কালী স্যাকরার কথায় কিন্তু হাবুর বিস্ময়বোধ দূর হল না। সে গিয়ে জাদুকরকে পরদিন সকালে পাকড়ালে। সোজাসুজি তাঁকে জানালে সে ঐসব খেলা শিখতে চায়। শাগরেদ হতে সে রাজী আছে। জাদুকর কলকাতার লোক, মাথায় নরম বুরুশ দিয়ে চুল আঁচড়ে থাকেন, হাতে ঘড়ি পরেন, চোখে থাকে চমশা। তিনি নাক উঁচু করে বললেন—ওসব হয় না হে ছোকরা, হয় না। অনেক টাকার খেলা, অনেক টাকা প্রিমিয়াম দিলে তবে শাগরেদ করি।

হাবু বললে- -প্রিমিয়াম কি?

—প্রিমিয়াম টাকা হে, টাকা পারবে আমায় দিতে?

মরীয়া হয়ে হাবু বললে—আজ্ঞে কত টাকা?

—একশ’।—পারবে দিতে?

—আজ্ঞে না। অত টাকা কখনও একসঙ্গে দেখি নি।

—তবে ফিরে যাও। এসব অমনি হয় না।

—কিছু কম করে নিন—

—দু’শ করে প্রিমিয়াম নিই, তোমায় একশ বলেছি!

হাবু সেখান থেকে সরে পড়ল। অত টাকার সিকিও দেবার ক্ষমতা নেই তার। জাদুবিদ্যা শেখবার সৌভাগ্য কি সকলের ঘটে!

কেটে গেল বছর তিনেক। এই তিন বছরে তার জীবনে নতুন কিছু ঘটল না। এ অজ-পাড়াগাঁয়ে জীবন এক-রঙা ছবির মত একঘেয়ে।

ঠিক এই সময়ে একদিন হাবু দুপুরে মাছ ধরতে গেছে নদীতে, এমন সময়ে দেখলে একটা লোক আমবাগানের ছায়ায় বসে আপন মনে কতকগুলো ঢিল নিয়ে খেলছে। হাবু

একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলে লোকটা একটা ঢিল হাতে নিয়ে ছুঁড়ে দিতেই সেটা মস্ত বড় একটা কোলা ব্যাং হয়ে গেল, লাফিয়ে লাফিয়ে পালাল। আর একটা ঢিল ছুঁড়তেই সেটা হয়ে গেল একটা ছেলেদের দু টাকার খেলনাগাড়ী, কিন্তু সে গাড়ী গড়গড় করে গড়িয়ে চোখের বাইরে অদৃশ্য হল, আর একটা ঢিল হিল হিল করতে করতে একটা সাপ হয়ে চলে গেল, একটা ঢিল একমুঠো আবীর হয়ে ছত্রাকারে ছড়িয়ে মাটি রাঙিয়ে দিলে। হাবু সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা ওর মুখের দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে বললে—কি?

স্তম্ভিত ও ভীত হাবু কোন কথা না বলে একেবারে লোকটার পা জড়িয়ে ধরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল।

গাছতলায় লোকটা নেই।

হাবু বিভ্রান্ত চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখলে। অত বড় আমবাগানের কোথাও সে নেই! দু মিনিট হাবু দাঁড়িয়ে রইল আড়ষ্ট হয়ে। হঠাৎ সে দেখলে হাত দশেক দূরে সেই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

হাবু কাতর কণ্ঠে বললে—আমাকে দয়া করুন।

—কি দয়া?

—পায়ে ঠেলবেন না এমন করে। আমাকে আপনার চাকর করে রেখে দিন। আমি অনেক ভাগ্যে আপনার দেখা পেয়েছি।

—আমি গরিব লোক, চাকরে আমার কি দরকার। তাছাড়া আমার হাতে অনেক চাকর। এই দেখ—বলেই লোকটা একটা ঢিল গাছের ওপরের ডালের দিকে অবহেলার সঙ্গে ছুঁড়ে মারতেই ঝর ঝর করে একরাশ আম পড়ল। হাবু একেবারে স্তম্ভিত। আম আসে কোথা থেকে এই কার্তিক মাসে? পাড়াগাঁয়ে কোন গাছেই এ সময়ে আম তো দূরের কথা, আমের বউলও নেই। পাকা আম ঝুড়িখানেক তার সামনে!

লোকটা বললে—খাবার জল? এই—

যেমন একটা ঢিল ছোঁড়া, অমনি গাছের গুঁড়ির এক জায়গা একেবারে ফুটো হয়ে কলের মুখে যেমন জল পড়ে তেমনি জল পড়তে লাগল। লোকটা হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে বললে—খাও—ভাল জল।

হাবু কাতর সুরে বললে—আমায় শাগরেদ করে রাখুন!

—কি সর্বনাশ! শাগরেদ? আমি ওস্তাদ নই।

—আমায় দয়া করুন।

লোকটি হি হি করে হেসে উঠল। ও কি! মুখের ফাঁক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লাল নীল বেগুনি রঙের ডানাওয়ালা প্রজাপতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।...লোকটা কে?

এর উত্তর লোকটা দিলে। বললে—পায়রাগাছি জান? উত্তর দিকে। আমার সঙ্গে সেখানে দেখা ক'রো।

হাবু হাঁ করে রইল। ইনি তবে পায়রাগাছির সেই গুণীন্! সবাই বলে, উনি 'নুটি মন্তর' জানেন, অর্থাৎ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হতে পারেন। আজ সে নিজে তার প্রমাণ পেয়েছে! হাবু হাত জোড় করে বললে—আমায় দয়া করুন।

পায়রাগাছির রোজা এবার নরম সুরে বললে—শেখাতে পারি নুটি মন্তর, কিন্তু ছোকরা, তুমি এ পথে কেন? এ পথে কেবল তারাই আসতে পারে যাদের কামনা ক্ষয় হয়ে গেছে। কত লোভের পথ খুলে যাবে—দেখ। আচ্ছা বোসো', দিচ্ছি তোমায় মন্তরটা শিখিয়ে।...

কিছুদিন কেটে গেল।

হাবু এখন নুটি মন্তর শিখে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হতে শিখেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবিষ্কার করলে সে একজন ভীষণ চোর। যে ঘরে যায়, ভাল ভাল জিনিস সব চুরি করতে ইচ্ছে হয়। খাবারের দোকানে গেলে ইচ্ছে হয় খাবারের হাঁড়ি ফাঁক করে। সে যে চোর, তা সে কখনও জানত না। একদিন এক বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দেখলে, মস্ত বড় একটা

ইলিশ মাছ এনেছে বন্ধুর বাবা। রোয়াকে সেটা পড়ে আছে, বন্ধুর মা ঘরে ঢুকেছেন বঁটি আনতে। ওর লোভ হল মাছটাকে নিয়ে দৌড় দেয়!

হাবু ভয়ে তখনই দৃশ্যমান হয়ে গেল!

বন্ধুর মা ওকে দেখে বললেন—ওমা, হাবু কোথা দিয়ে এলি? তোকে তো দেখলাম না দরজা দিয়ে আসতে? এই মাত্তর তো ঘরে বঁটি আনতে গিয়েছি।

হাবু হেসে চুপ করে রইল।

একদিন আরও গুরুতর ব্যাপার ঘটল। পাড়ার গাঙ্গুলিরা বড়লোক, তাদের বাড়ীর ওপরের তলায় খাটে একছড়া দামী সোনার হার কে ফেলে রেখেছে। হাবু কৌতূহল-বশত গাঙ্গুলিদের তেতলায় অদৃশ্য অবস্থায় বেড়াতে গিয়ে লোভ সামলাতে না পেরে সেই হার হাতে নেমে এল। সেও অদৃশ্য, তার কাছে যে জিনিস থাকবে তাও অদৃশ্য।

কেউ কিছু টের পেলে না।

তার পর যখন জানা গেল হার চুরি গিয়েছে, তখন গাঙ্গুলিদের বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। গাঙ্গুলিদের বড় মেয়ের হার সেটা, তার সে কি কান্না? সবাই মিলে তাকে অপমান উৎপীড়ন করতে লাগল, সে কেন এত অসাবধান, কেন সে হার খাটের উপর ফেলে রেখেছিল। অবশেষে সন্দেহ গিয়ে পড়ল এক বৃদ্ধ দাসীর ওপর। তার ওপর শুরু হল নির্যাতন। পুলিশে খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও হতে লাগল।

কিন্তু হাবুর সবচেয়ে অসহ্য হল গাঙ্গুলিদের মেয়ের সেই হাপুস নয়নে কান্না। মেয়েটির সঙ্গে তাঁর স্বামীর বনিবনাও সেই। বাপের বাড়ী পড়ে থাকে। এমন মেয়ের কোন মান থাকে না বাপের বাড়ী। বৌদিদিরা একেই তো তাকে দাঁতে পেষেন, তার ওপর সে বাপের দেওয়া হারছড়া খুইয়ে ঘোর অপরাধে অপরাধিনী।

হাবু অদৃশ্য হয়ে সব দেখছিল, হারও তার পকেটেই ছিল। আর সহ্য করতে না পেরে হারছড়াটা সে বালিসের তলায় রেখে দিলে। সেখান থেকে সেই মেয়েই প্রথম হার আবিষ্কার করলে। তখন কি হাসি তার মুখে!

তা তো হল, কিন্তু হাবু পড়ে গেল মহা বিপদে।

সে চোর হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত? এ কি ভয়নক প্রলোভনে সে পড়েছে? পদে পদে প্রলোভন, পদে পদে সচ্চরিত্রতার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে তাকে। মনের বল ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। লোভ সামলাতে সামলাতে গলদঘর্ম। অদৃশ্য না হয়েও থাকা যায় না, অদৃশ্য হলেও বিপদ। এ কি সর্বনাশা মন্ত্র!

মাসের পর মাস কাটে, এই ঘোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

হাবু ইতিমধ্যে এক বিয়েবাড়ীর ভাঁড়ারে ঢুকে সের খানেক সন্দেশ মেরে দিল। পরক্ষণেই জাগল অনুতাপ—তীব্র অনুতাপ। সে কোথায় নেমে চলেছে দিন দিন! পায়রা-গাছির রোজা এ কি সর্বনাশ তার করে গেল! কিছুতেই অদৃশ্য হবার প্রলোভন সামলানো যায় না। কিছুতেই ভোলা যায় না নুটি মন্তর। নুটি মন্তর তার জীবনের অভিশাপ।

বছরখানেক এভাবে কেটে গেল। কত খুঁজলে পায়রাগাছির রোজাকে—কেউ সন্ধান দিতে পারলে না।

একদিন হাবু সেই আমবাগান দিয়ে যেতে যেতে সেই একই গাছের তলায় দেখলে পায়রাগাছির রোজা সেই রকম ঢিল নিয়ে ছুঁড়ে খেলা করছে। ওর দেহে বিদ্যুতের স্রোত বয়ে গেল। সন্ধান মিলেছে এতদিন পরে। ও ছুটে এগিয়ে কাছে গেল। ঢিল একটা ব্যাঙ হয়ে লাফাতে লাফাতে পালাল। একটা ঢিল সদ্য-কাটা ধাড়ি ছাগলের মুণ্ড হয়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে চলে গেল। এক ঝাঁক ছাতারে পাখী রোজার মুখের মধ্যে থেকে বের হয়ে উড়ে গেল।

হাবু ছুটতে ছুটতে (পাছে রোজা অদৃশ্য হয়ে যায়) গিয়ে ওর পায়ের ওপর পড়ল।

রোজা প্রশান্ত হাসির সঙ্গে বললে—কি হয়েছে?

—আমায় বাঁচান।

—কি ব্যাপার?

—আপনি সব জানেন। আপনি অন্তর্যামী। ওস্তাদজি, নুটি মন্তরের কবল থেকে আমায় উদ্ধার করুন। আমার চরিত্র গেল, মনের শান্তি গেল,—সব গেল। এ আপনি ফিরিয়ে নিন।

রোজা মৃদু মৃদু হেসে বললে—একবার মন্তর দিলে আর ফেরত হয়?—হয় না।

হাবু ভয়ে শিউরে উঠল। তবে কি জীবন-ভোর এই সর্বনেশে মন্তরের ভার বইতে হবে তাকে? এই অশান্তি,—পদে পদে এই পরীক্ষা সারাজীবন চলবে?

হাবু পা আঁকড়ে ধরে বললে—বাঁচান আমায়। আমি মরে যাব।

—তবে চাও না নুটি মন্তর?

—আজ্ঞে না।

রোজা হেসে বললে—তবে যাও, দিলাম না। মোটেই তোমাকে মন্তর দিই নি। পরীক্ষা করছিলাম।

হাবু অবাক। সে কি কথা! এক বছর ধরে তবে সে কিসের ভারবোঝা বয়ে মরল?

সে কি বলতে যাচ্ছিল। রোজা হেসে বললে—মোটে সাত মিনিট কেটেছে। এই প্রথম দেখা তোমার সঙ্গে আমবাগানে। নুটি মন্তর তোমাকে দেওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করছিলাম। আমি আজ বিশ বছর এই মন্তরের ভার বয়ে আসছি, আর তুমি এর দায়িত্ব সাত মিনিটও নিতে পারলে না?

হাবু বললে—তবে আমি গাঙ্গুলিদের বাড়ী হার চুরি করি নি? ময়রাদোকানে খাবার খাই নি চুরি করে? তবে আমি—

—না। মোটে সাত মিনিট কেটেছে। আমার সামনে ছাড়া তুমি কোথায়ও যাও নি। এই তো প্রথম তোমার সঙ্গে আমবাগানে...

বলে কি! হাবু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পায়রাগাছির গুণীন্ হা হা করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক চামচিকে তার হাঁ-করা মুখের মধ্যে থেকে পট্‌পট্ শব্দে বের হয়ে ইতস্তত উড়ে গেল।

ফড় খেলা

চড়কডাঙা ক্ষুদ্র গ্রাম। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে বড় মেলা হয়।

অনাদিবাবু সেকালের বনেদী জমিদার, কাম্পসহাটির বিখ্যাত জমিদারবংশের ছেলে। বর্তমানে অবিশ্যি সে প্রাচীন গৌরবের কিছুই অবশিষ্ট নেই। বহু শরিকে জমিদারি ভাগ হয়ে গিয়েচে, কোন রকমে ঠাট বজায় রেখে সংসার চলে।

অনাদিবাবু প্রথর যৌবনে ফুর্তি করতে গিয়ে অন্তত হাজার পঁচিশ টাকা উড়িয়ে দিয়েছেন, বর্তমানেও একটি রক্ষিতার পেছনে এই দুরবস্থার মধ্যেও মাসে ত্রিশটি টাকা দিতে হয়। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানেন না, বড়লোকের ছেলে, ফুর্তিটাই চিরকাল বুঝে এসেছেন। আজকাল অর্থের অভাবে অন্য সব ছেড়ে দিয়ে আফিং ধরতে বাধ্য হয়েছেন।

অনাদিবাবু সম্প্রতি চড়কডাঙার মুখুজ্যেবাড়ী এসেছেন বেড়াতে। হরিচরণ মুখুজ্যের তিনি হলেন দূর সম্পর্কে ভগ্নীপতি। পৌষ সংক্রান্তির বেলা তখন বসেছে। একদিন অনাদিবাবু মেলায় বেড়াতে গেলেন বিকেলে। একটি অশ্বত্থতলায় অনেক লোক ভিড় করেছে দেখে ডিঙি মেরে উঁকি দিয়ে দেখলেন, ভিড়ের কেন্দ্রস্থলে ফড়-গুটির জুয়াখেলা চলছে। একটা বাটিতে হাড়ের ছোট্ট গুটি (তার গায়ে এক ফোঁটা থেকে ছ ফোঁটা পর্যন্ত খোদাই করা) ঘুরিয়ে দেওয়া হয়—আর সামনের একটা কাপড়েও ঐ রকম এক ফোঁটা থেকে

ছ ফোঁটার ঘর আঁকা আছে ; টাকা-পয়সা যে ঘরে ইচ্ছে রাখ, গুটি ঘুরিয়ে জুয়োর মালিক একটি বাটি চাপা দেবে, তার পর গুটি আপনা-আপনি থেমে যখন পড়ে যাবে তখন ঢাকা খুলে যদি দেখা যায়, যে চিহ্নটি পড়েছে সেই দাগে অমুক অমুকের টাকা আছে—তখন তাদের টাকার চারগুণ ফেরৎ দেওয়া হবে। এই হল মোটামুটি খেলার ব্যাপারটা। পাশার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

অনাদিবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন খেলাটা।

অনেক নিরীহ চাষা, গ্রাম্য লোক, এমন কি বালকেরা পর্যন্ত খেলে পকেটে বা ট্যাঁকে যা কিছু এনেছে সব খুইয়ে চলে যাচ্ছে। জিততে বড় একটা কাউকে দেখলেন না। একবার যদি বা যেতে তবে পরের ক-বার উপরি উপরি হারে। সিকি, দুয়ানি, পয়সা ও টাকা জুয়াড়ির সামনে ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছে! অনাদিবাবু দাঁড়িয়ে দেখে দেখে বললেন—হ্যাঁহে বাপু, আমি খেলতে পারি?

জুয়াড়ি অনাদিবাবুর বেশভূষা দেখে মোটা শিকার ঠাউরে সসম্ভ্রমে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনায়াসে। খেলুন না বাবু, খেলুন।

অনাদিবাবু পকেট থেকে একটা টাকা বের করে দুই-ফোঁটা আঁকা ঘরে ফেলে দেন।

লোকটা বলে—বাবু, কোন্ ঘরে?

—দুরি।

—তিরি?

—বলছি দুরি, তুমি বলছ তিরি! থাক্ ওখানে।

ঢাকনি তুলে দেখা গেল—দুরির দান। ফড়-গুটির গায়ের দুই-ফোঁটা আঁকা অংশটা ওপরেই।

জুয়াড়ির মুখ আর ততটা উজ্জ্বল রইল না। চারটি টাকা অনাদিবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে বললে—হেঁ হেঁ, বাবু জিতলেন—

—হ্যাঁ তো, তা জিতলাম।

আর কিছুক্ষণ কেটে গেল। অনাদিবাবু আর খেলছেন না দেখে জুয়াড়ি বললে—খেলুন বাবু—

অর্থাৎ চারটি টাকা জিতে পালিয়ে না যান। আবার খেললেই ও-কটি টাকা জিতে তো নেবেই, বরং আরও—

—খেলুন বাবু!

অনাদিবাবু মৃদু হেসে বললেন, না বাপু, আর খেলছি নে। তোমরা খেল।

—না খেলুন, খেলুন।

—বেশ, খেলি তবে। এই চার টাকা ঐ পঞ্জুরিতে ফেল—

দান পড়ল পঞ্জুরিতেই। ষোল টাকা আর ঐ চার টাকা, কুড়ি টাকা জিতলেন অনাদিবাবু। জুয়াড়ির কাষ্ঠহাসি কাষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। সে টাকা কটা এগিয়ে দিয়ে বললে—নিন বাবু, হেঁ হেঁ—জিতলেন এবারও।

দু তিন দান কেটে গেল। খেলছেন না আর অনাদিবাবু।

জুয়াড়ি বললে—বাবু খেলবেন না? খেলুন।

অনাদিবাবু বললেন—একটা সিগারেট ধরিয়ে—আবার খেলব?

—খেলবেন না কেন। খেলুন—

—আচ্ছা এই পঞ্চাশ টাকা ঐ ছক্কার ঘরে রাখ।

দান পড়ার শব্দ হল বাটির ঢাকনির মধ্যে। ঢাকনি ওঠানো হল, ছক্কার ঘরের দান।... আড়াই শ টাকার নোট গুনে গুনে জুয়াড়ি দেয় অনাদিবাবুর হাতে। হাসি?...না। তার মুখে হাসি আর নেই। যারা খেলছিল, পাড়াগাঁয়ের চাষা-ভুষো গেঁয়ো লোক, এত টাকা একসঙ্গে বাজি ফেলা বা জেতা তারা দেখে নি। একটা লোক এ রকম জিততে পারে তাও তাদের কোন ধারণা নেই। ওরা বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে রইল অনাদিবাবুর দিকে।

জুয়াড়ি বললে—বাবু, খেলুন।
—আবার খেলব?
—হ্যাঁ, খেলুন না!
অনাদিবাবু কিছুক্ষণ পরে আড়াই শ টাকার নোটের বাণ্ডিলটা পুনরায় ছক্কার ঘরে রেখে দিলেন। তখন অন্য সব লোকের সিকি দুয়ানির খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে অনাদিবাবুর দিকে।
জয়াড়ি বললে—আড়াই শ'ই খেলবেন বাবু?
—হ্যাঁ।
জুয়াড়ি একটু অস্বস্তি বোধ করলে। একটু পরে যখন দান পড়ল, তখন তার চোখ ঘোলাটে হয়ে গেল, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ছক্কার দান পড়েছে, ওর ধাক্কায় হাজার বারো শ টাকা জিতে গেলেন অনাদিবাবু। সকলের চোখ বড় হয়ে উঠেছে বিস্ময়ে।
তখনই আবার খেললেন অনাদিবাবু—বারো শ' টাকাই পোয়ার ঘরে অর্থাৎ এক ফোঁটা আঁকা ঘরে রাখলেন, জুয়াড়ির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পোয়ার দান সাধারণত পড়ে না। এইবার ভগবান মুখ তুলে বোধ হয় চাইলেন। নয়তো জুয়াড়ি সর্বস্বান্ত। বাবু এইবার ভুল করে বসেছেন বোধ হয়। এই ভুলেই চাল মাৎ হবে নিশ্চয়!
দুরু দুরু বক্ষে জুয়াড়ি ঢাকনি তুলল—তুলেই তার চক্ষু স্থির। একচক্ষু দৈত্যের মত গুটির সঙ্গে একটি মাত্র ফোঁটা ওর দিকে চেয়ে আছে। ওর গা ঝিম্ ঝিম্ করে মাথা ঘুরে উঠল। গা বমি-বমি করল। চোখে কিছু দেখতে পেলে না কিছুক্ষণ।
আটচল্লিশ শ টাকা জিতেছেন অনাদিবাবু; আর এই বারো শ', মোট কত হল হিসেব করে দেখ। সমবেত লোকজন হর্ষকোলাহল করে উঠল।
অনাদিবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন—দাও।
জুয়াড়ি পাংশুমুখে বললে—বাবু, আর আমার কাছে কিছু নেই, হুজুর! এই দেখুন গেঁজে। গোটাকতক খুচরো টাকা সিকি দুয়ানি পড়ে আছে।
সকলে রাগে চীৎকার করে উঠল—তা হবে না, বাবুর টাকা ফেলে কথা কও।
ওদের দু-দশ আনা জিতে নিয়েছে জুয়াড়ি—আজ দু দিন অনেক পয়সা জিতেছে ও। সকলেরই রাগ আছে ওর ওপর।
—টাকা ফেলু; সোজা কথা। বাবুর টাকা মিটিয়ে দাও। শালা, আজ তোমার একদিন কি আমাদের একদিন—
জুয়াড়ি অনাদিবাবুর পা ধরে বললে—গরিব, মরে যাব বাবু—মাপ করে দেন। বিশ-ত্রিশ টাকার রেজগি পড়ে আছে। মরে যাব বাবু।
হাজারী ট্যারা দু দিনে দেড় টাকা হেরে গিয়েছিল। সে সকলের আগে চীৎকার করে বলে উঠল—ওসব হবে না বলে দিচ্ছি। টাকা ফেলে তবে কথা কইবে। আমাদের সর্বস্বান্ত করে নিয়েছ না তুমি? তোমায় অল্পে ছাড়ব ভেবেছ? টাকা না দিলে তোমার হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায়—
খুব যখন একটা হৈচৈ শুরু হয়েছে তখন সবাই মিলে জুয়াড়িকে ধরে বসল—চল বাবুর কাছে। তোমার চালাকি বের করে দিই একেবারে।

গ্রামের জমিদার হরিচরণ মুখুজ্যের কাছে ওকে ধরে নিয়ে গেল উন্মত্ত জনতা। অনাদি বাবুর ভগ্নীপতি তিনি, আগেই বলা হয়েছে। তিনিও লোকটি যথেষ্ট প্রজাপীড়ক ও স্বার্থপর। মদে তিনিও অনেক টাকা উড়িয়েছেন। লেখাপড়া সামান্যই জানেন, তবে কথায় কথায় ইংরেজির বুকনি দেন।
হরিচরণ বললেন—ব্রাদার, এ আবার কি কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ?—কি রে, ব্যাপার কি?
জুয়াড়ি কিছু উত্তর দেবার আগে ট্যারা হাজারী এগিয়ে গিয়ে হাত জোড় করে সব বুঝিয়ে দিলে।

—পাঁচটি হাজার টাকা বাবু ও এখন দেবে, তবে ওকে ছাড়ুন। আমরা যদি হারতাম তবে ও কি ছাড়ত? বাবু জিতেছেন, বলিহারি খেলা বটে বাবুর! আমরা তাজ্জব একেবারে। যা ফেলেন, তাতেই দান পড়ে! আমাদের মুখে তো রা নেই একেবারে। এখন টাকার বাণ্ডিল জিতেছেন; ও ব্যাটা এখন হাতে পায়ে পড়ছে—বলি বার শ' টাকা যদি ও জিতত, তবে নিত না? যদি বলি—

হরিচরণবাবু ট্যারা হাজারীকে ধমক দিয়ে থামিয়ে অনাদিবাবুকে বললেন—কি বল ভাই? তোমার যা ইচ্ছে। তুমি কর যা হয়।

অনাদিবাবু জুয়াড়িকে ডাকলেন। সে বেজায় ভয় খেয়ে গিয়েছে উন্মত্ত জনতার গতিক দেখে। বেচারী নবমীর পাঁঠার মত কাঁপছে। সে হাত জোড় করে এগিয়ে গেল।

অনাদিবাবু বললেন—নাম কি?

—আজ্ঞে, গজাধর লস্কর।

—বাড়ী?

—আজ্ঞে বাবু, হুগলী ঘুঁটেবাজারে আমার...

—ফড়-গুটি খেলা শিখেছ কার কাছে?

—আজ্ঞে করিম বস্‌কো সর্দার ছেল বড্ড ভারী জুয়াড়ি গেঁড়োর। তিনি আমার গুরু। আমি সাত বছর তাঁর শাগরেদি করি।

—গুরুমারা বিদ্যে হয়েছে?

—আজ্ঞে যা বলেন—

গজাধর নস্কর চুপ করে রইল। এখন কোন রকমে সে পরিত্রাণ পেলে বাঁচে। কথা আর সে কি কইবে? অনাদিবাবু বললেন—চাষাভুষোর সর্বনাশ করে বেড়াও। এ খেলার অন্ধিসন্ধি তুমি কিছুই জান না।

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

—না, শোন, তুমি কিছু জান না এ খেলার। কখনও এ খেলা খেলো না।—দেখবে? এই দেখ, ফড়-গুটি নিয়ে এস—

ট্যারা হাজারীর দল ও ফড়-গুটি খেলার বাটি, ফড়, মায় এক দুই আঁকা তেরপলের চটখানা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে এসেছিল। ওরা বললে—এই যে বাবু।

অনাদিবাবু বললেন—গুটি ঘোরাও, ঘুরিয়ে ঢাকনি চাপা দাও।

গজাধর নস্কর তাই করলে। একটু ঘুরে গুটি পড়ার শব্দ হল ঢাকনির মধ্যেই। অনাদিবাবু বললেন—তুমি তো মস্ত ওস্তাদের শাগরেদ—শব্দ শুনে বুঝতে পারলে কি দান পড়েছে?

—আজ্ঞে না, আমি শুনি নি তেমন ভাল করে।

—আমি বলছি, তিরির দান পড়েছে, তুলে দেখ।

গজাধর ঢাকনি তুলে ফেললে। সমবেত জনতা সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে ঠিক তিন ফোঁটার দান পড়েছে বটে!

অনাদিবাবু বললেন—শব্দ শুনে তুমি কই বল এবার? ঘোরাও—চাপা দাও—

গুটি পড়ার শব্দ হল। গজাধর কান পেতে শুনলে।

—বল, কত দান পড়েছে?

—আজ্ঞে, ছক্কা।

—না চৌকো। তোল ঢাকনি।

গজাধর ঢাকনি তুললে সমবেত জনতা হুমড়ি খেয়ে পড়ল দেখতে। চৌকোর দানই বটে! অনাদিবাবু মৃদু মৃদু হেসে বললেন—দেখলে? আচ্ছা, আবার বল। ঘোরাও গুটি। চাপা দাও।

মন্ত্রমুগ্ধবৎ সবাই চুপ করে আছে। গুটি পড়া তো দূরের কথা, সূচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়। অনাদিবাবু বললেন—কত দান পড়ল?

গজাধর বললে—আজ্ঞে বাবু, শব্দ শুনে আমি বলতে পারব না। আমার ওস্তাদও বলতে পারতেন না। কখনও শুনিও নি, শব্দ শুনে কি দান পড়েছে তা বোঝা যায়।

—যায় না? তবে আমি বলছি কি করে?—তিরির দান পড়েছে। ঢাকনি তোল।
ঢাকনি তোলা হল। গলা লম্বা করে সবাই চেয়ে দেখলে, তিরির দানই পড়েছে বটে! আশ্চর্য! গজাধর নস্কর হাত বাড়িয়ে অনাদিবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—আপনি বাবু বড় ওস্তাদ! মাপ করুন আপনার সংগে খেলার জন্যে। আপনার পায়ের ধুলোর যুগ্যি নই। আপনি ওস্তাদ, আমি শাগরেদ। চরণে রাখুন বাবু!

অনাদিবাবু মৃদু হেসে পকেট থেকে আগের জেতা সেই বারো শ' টাকা বের করে দিয়ে বললেন—এই নাও, নিয়ে যাও তোমার টাকা।

সে কি! পাঁচ হাজার দাকা গেল। আবার সাবেক বারো শ' দাকাও ফেরত কি রকম? ট্যারা হাজারী সকলের আগে বলে উঠল—বাবু, অমন করে ওকে 'নাই' দিলে আমরা যাব কোথায়? ও বেটা এ ক'দিন অনেকের সব্বোস্বান্ত করেছে—

গজাধর তাচ্ছিল্যের সংগে বললে—আরে সব্বস্বান্ত করবে কি করে? খেলেন তো সব এক পয়সা দু পয়সা, বড়জোর দু আনা চার আনা—

ট্যারা হাজারী বললে—তা যাই খেলুক। তুমি সব ফতুর করেও নাও নি?

হরিচরণবাবু ধমক দিয়ে বললেন—চুপ।

অনাদিবাবু বললেন—যাও, আজই ফড়-গুটি তুলে এখান থেকে চলে যাও। চাষা ঠকিয়ে আর তোমাকে এখানে আয় করতে দেব না।

হরিচরণবাবু তামাক টানতে টানতে বললেন—বেশ, চলে যাও ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাদের যাত্রার জন্যে দু শ' টাকা চাঁদা দিয়ে যাও। আরও দু রাত যাত্রা হবে এখানে।

ট্যারা হাজারী বলে উঠল—বহুৎ আচ্ছা, বাঃ!

হরিচরণবাবু ধমক দিয়ে বললেন—চুপ।...পরে গজাধরের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—দাও, দু শ' টাকা।

গজাধর টাকা গুনে দিয়ে বাবুদের পায়ের ধুলো নিয়ে ফড়-গুদি বগলে করে প্রস্থান করল।

বিরজা হোম ও তার বাধা

ভৈরব চক্রবর্তীর মুখে এই গল্পটি শোনা। অনেকদিন আগেকার কথা। রোয়ালে-বাদরপুর (খুলনা) হাইস্কুলে আমি তখন শিক্ষক। নতুন কলেজ থেকে বার হয়ে সেখানে গিয়েছি।

ভৈরব চক্রবর্তী ঐ গ্রামের একজন নিষ্ঠাবান সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। সকলেই শ্রদ্ধা করতো, মানতো। এক প্রহর ধরে জপ আহ্নিক করতেন, শূদ্রযারক ব্রাহ্মণের জলস্পর্শ করতেন না, মাসে একবার বিরজা হোম করতেন, টিকিতে ফুল বাঁধা থাকতো দুপুরের পরে। স্বপাক ছাড়া কারো বাড়ী কখনো খেতেন না। শিষ্য করতে নারাজ ছিলেন, বলতেন শিষ্যদের কাছে পয়সা নিয়ে খাওয়া খাঁটি ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাপাপ। আর একটা কথা, ভৈরব চক্রবর্তী ভাল সংস্কৃত জানতেন কিন্তু কোন স্কুলের পণ্ডিতি করেন নি। টোল করাও পছন্দ করতেন না। ওতে নাকি গবর্ণমেণ্টের দেও বৃত্তির দিকে মন চলে যায়। টোল ইন্সপেক্টরদের খোশামোদ করতে হয়। তবে দুটি ছাত্রকে নিএের বাড়িতে রেখে খেতে দিয়ে ব্যাকরণ শেখাতেন।

বর্ষা সেবার নামে নামে করেও নামছিল না, দিনে-রাতে গুমটের দরুণ আমরা কেউ ঘুমুতে পারছিলাম না। হঠাৎ সেদিন একটু মেঘ দেখা দিল পূব-উত্তর কোণে। বেলা তিনটে। স্কুল খুলেছে গ্রীষ্মের ছুটির পরে। কিন্তু এত দুর্দান্ত গরম যে পুনরায় সকালে স্কুল করার জন্য ছেলেরা তদবির করছে, মাস্টারদেরও উস্কানি তাতে ছিল বারো আনা। হেড্‌মাস্টার অফিস ঘরে বসে আছেন। গোপীবাবু ইতিহাসের মাস্টার, গিয়ে উত্তেজিত ভাবে বললেন—সার, মেঘ করেছে—

মুরুলী মুখুজ্যে (এই নামেই তিনি ও অঞ্চলের ছাত্রদের মধ্যে কুখ্যাত) গম্ভীর স্বরে বললেন,—কিসের মেঘ?

—আজ্ঞে, মেঘ কাকে বলে।

—কি হয়েছে তাতে?

—আজ্ঞে, বৃষ্টি হবে। স্কুলের ছুটি দিলে ভাল হোত। ছেলেরা অনেক দূর যাবে, ছাতি আনেনি অনেকে।

—বৃষ্টি হবে না ও মেঘে।

খাস ইন্দ্রদেবের আপিসের হেড কেরানীও এতটা আত্মপ্রত্যয়ের সুরে একথা বলতে দ্বিধা করতো বোধ হয়। কিন্তু সকলেই জানে মুরলী মুখুজ্যের পাণ্ডিত্যের সীমা-পরিসীমা নেই, আবহাওয়া-তত্ত্বটি তাঁর নখদর্পণে। গোপীবাবু দমে গিয়ে বললেন—বৃষ্টি হবে না?

—না।

—কেন সার? বেশ মেঘ করে এসেছে তো?

—মেঘের আপনি কি বোঝেন? ওকে বলে তাতমেঘা, ও মেঘে বৃষ্টি হবে না।

আমিও পাশের শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষ থেকে জানালা দিয়ে মেঘটা দেখেছিলাম এবং আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনাতে পুলকিত হয়েও উঠেছিলাম। মুরলী মুখুজ্যের নির্ঘাত রায় শুনে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বললাম—বৃষ্টি হবে বলে কিন্তু মনে হচ্ছে।

মুরলী মুখুজ্যে বললেন—তাতমেঘা। মেঘ হলেই বৃষ্টি হয় না।

—কোন্ মেঘে বৃষ্টি হয়?

—এখন বৃষ্টি হবে আলট্রা স্ট্রটোস্ মেঘে। যাকে বলে শিট্ক্লাউড।

—ও!

—তাছাড়া হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে। মনসুনের আগে হাওয়া ঘুরে যাবে পূবে।

—ও!

আর কোনো কথা বলতে আমাদের সাহস হোল না। কিন্তু ইন্দ্রদেব সেদিন বড়ই অপদস্থ করলেন আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্ মুরলী মুখুজ্যেকে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই মেঘের চেহারা ঘন কালো হয়ে উঠলো, মেঘের চাদর ঢাকা পড়লো আরও ঘন আর একখানা মেঘের চাদরে। তারপর স্কুলের ছুটি হওয়ার সামান্য কিছু আগেই ঝম্ ঝম্ মুষলধারে বর্ষা নামলো। পুরো দুটি ঘণ্টা ধরে খাল বিল নালা ডোবা ভাসিয়ে রামবৃষ্টি হওয়ার পরে বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় আকাশ ধরে গেল। ছেলেরা তখনো পর্যন্ত স্কুলেই আটকে ছিল। কোথায় আর যাবে। সবাই আমরা আটকে পড়েছিলাম।

গোপীবাবু জয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে মুরলী মুখুজ্যেকে গিয়ে বললেন—দেখলেন সার, তখন বললাম বৃষ্টি আসবে, তখন ছুটিটা দিলে আর এমন হোত না।

মুরলীবাবু বললেন—অমন হয়ে থাকে। ইতিহাস পড়ান, Higher Mathematics পড়ালে বুঝতেন। জগতে space and time নিয়ে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। এডওয়ার্ড গার্নেটের প্রবন্ধ পড়ে দেখবেন এ বছরের Mathematical Gazette-এ, বুঝলেন?

—সেটা কি?

—এ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড পড়েছেন তো? অঙ্কশাস্ত্রে এ্যালিস্ থ্রু লুকিং-গ্লাসের পরীক্ষা আর কি। পড়ে দেখুন। গোপীবাবু চলে এলেন। অঙ্কশাস্ত্রের কথা উঠলেই স্বভাবতঃ তিনি সংকুচিত হয়ে পড়েন।

বৃষ্টি থেমেছে, স্কুল থেকে বেরিয়ে আমি আর গোপীবাবু চলেছি। দুজনেই আমরা মনে মনে বড় খুশি। হেড মাস্টারকে আজ বড় জব্দ করা গিয়েছে। রোজ রোজ কেবল চালাকি!

এমন সময় ভৈরব চক্রবর্তীর বাড়ীর দাওয়ায় দেখি ভৈরব চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে। খুব খুশি মন। আমাকে দেখে ডেকে বললেন—কেমন ননীবাবু, বিষ্টি হোল তো?

—এই যে চক্কোত্তি মশায়, নমস্কার! তা হোল।

—হবে না? আজ তিন দিন থেকে হোম করছি বিষ্টির জন্যে। ওর বাবাকে হতে হবে।

অবিশ্যি বৃষ্টির পিতৃদেব কে, তা ভালো জানা ছিল না। বললাম—বলেন কি? হোম

করার ফল তাহলে ফলেছে বলতে হবে!

গোপীবাবু অর্ধস্ফুট স্বরে বলে বসলেন—লাগে তাক, না লাগে তুক।

ভৈরব চক্রবর্তী কথাটা শুনতে পেয়ে বললেন—আসুন দুজনেই আমার বাড়ি মাস্টার বাবুরা। দেখুন দেখাই।

গোপীবাবু ও আমি দুজনে দাওয়ায় গিয়ে বসলাম। মনটা বেশ ভালো। দুঃসহ গরমের পর প্রচুর বৃষ্টি হয়ে দিনটি একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আজ পনেরো দিন দারুণ গুমটে রাত্রে ঘুমুইনি।

গোপীবাবু কেবল বলছিলেন—আজ খুব ঘুম হবে, কি বলেন?

—নিশ্চয়। তার আর ভুল?

ভৈরব চক্রবর্তী আমাদের নিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে। সেখানে সত্যিই হোমের আগুনের কুণ্ডু—বালি বিছিয়ে তৈরি, বেলকাঠ ও জগ্‌গিডুমুরের ডালের বাড়তি সমিধ (যজ্ঞের কাঠ) এক পাশে গোছানো। পূর্ণপাত্রে সিধে সাজানো, তামার টাটে নারায়ণশীলা! সিঁদুর বেলপাতা তামার বড় থালায়। হোম হয়ে গিয়েছে, উপকরণের অবশেষ এদিক ওদিক ছড়ানো।

ভৈরব চক্রবর্তী বললেন—দেখলেন মাস্টারবাবু? হোম করার ফল আছে কি না দেখলেন?

গোপীবাবু বললেন—আপনি অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করেন?

—নিশ্চয়ই। নিজের চোখে দেখা। অপদেবতার কাণ্ড দেখেছি যে কত! পঞ্চমুণ্ডির আসনে জপ করার সময়!

—বলুন না দু'একটা ঘটনা?

—না, সে-সব বলবো না। থাক গে। কিন্তু আজ এক বছরও হয়নি একটা অলৌকিক কাণ্ড দেখেছিলাম আমার এক যজমান-বাড়ি। সেইটাই বলি। একটু চা করতে বলি?

এমন সময় আবার কালো মেঘ করে বৃষ্টি শুরু হোল। অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক। ঝড় উঠলো খুব ঠাণ্ডা হাওয়ার। ছড়্ ছড়্ করে পাকা জাম পড়তে লাগল চক্কত্তি মশায়ের বাড়ির সামনের গাছটা থেকে। নতুন জল ব্যাঁঙ ডাকতে লাগলো চারিদিকে।

চা এল। আমরা ছাতি নিয়ে বেরুইনি। এই বৃষ্টি মাথায় করে যাবার উপায় নেই। বেশ গুমিয়ে গল্প শুনবার জন্যে ভৈরব চক্রবর্তীর মাটির দাওয়ায় মাদুরের ওপর বসে গেলাম।

ভৈরব চক্রবর্তী আমাদের চা দিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এলেন। তারপর শুরু করলেন গল্প বলতেঃ

আর বছর ভাদ্র মাসের কথা। এখনো বছর পোরেনি। আমার এক যজমান-বাড়ি থেকে খবর পেলাম তার একটি মেয়ের বড় অসুখ। আমাকে তার বাড়িতে গিয়ে বিরজা হোম করতে হবে মেয়েটির জন্যে। বিরজা হোমে পূর্ণ আহুতি দিলে শক্ত রুগী ভালো হয়ে যায়। আমি এমন সারিয়েছি।

আমাকে তারা নৌকো করে নিয়ে গেল গোবরডাঙ্গা স্টেশন থেকে যমুনা নদীর ওপর দিয়ে। অজ পাড়াগাঁ। ঘরকতক ব্রাহ্মণ ও বেশির ভাগ গোয়ালা ও বুনোদের বাস। যমুনার ধারেই গ্রাম। গ্রামের মেয়েরা নদীর ঘাটেই স্নান করতে আসে।

—গ্রামের নাম কি?

—সাতবেড়ে। তারপর শুনুন। গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলাম বিকেলে। খুব বন-জঙ্গল গ্রামের মধ্যে। একটা ভাঙা শিবমন্দির আছে, সেকেলে ছোট ইটের তৈরি। মন্দিরের মাথায় বড় অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে। প্রকাণ্ড বড় একটা শিবলিঙ্গ বসানো মন্দিরের মধ্যে, চার্মচিকের নাদিতে আকণ্ঠ ডোবা অবস্থায়। পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহুদিন আগেই।

এই সময়ে আমাদের জন্যে ভৈরব চক্রবর্তীর বড় মেয়ে শৈল চালভাজা ও ছোলাভাজা নিয়ে এলো তেলনুন মেখে। ভৈরব চক্রবর্তী বিপত্নীক, তার মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে সবে ক'দিন হোল, চলে গেলে চক্রবর্তী মশায় নিজেই রান্না করে খান।

আমরা সকলেই খাবার খেতে আরম্ভ করে দিলাম। ভৈরব চক্রবর্তীও সেই সঙ্গে।

এখনও দিব্যি দাঁতের জোর, ওই বয়সে এমন চাল-ছোলাভাজা যে খেতে পারে, তার বহু-দিনেও দাঁত নষ্ট হবে না।

তিনি খেতে খেতেই বলে চললেন—এই শিবমন্দিরটার কথা মনে রাখবেন, এর সঙ্গে আমার গল্পের সম্পর্ক আছে। তারপর আমরা গিয়ে সে বাড়ি উঠে হাত-পা ধুয়ে জল খেয়ে ঠাণ্ডা হবার পর গৃহস্বামী একটি ঘরে আমায় নিয়ে গেলেন। অসুস্থ মেয়েটি সেই ঘরে শুয়ে আছে। বয়েস তেরো-চোদ্দ হবে, নিতান্ত রোগা নয়, বেশ মোটাসোটা ছিল বোঝা যায়—গলায় একরাশ মাদুলি। মেয়েটি চোখ বুজে একপাশ ফিরে শুয়ে আছে। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকতেই একবার সে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে আবার পাশ ফিরলে।

মেয়েটির গায়ে জ্বর। বেশ জ্বর, তিনের কাছাকাছি হবে। চোখে ক্লান্ত দৃষ্টি, চোখের কোণ সামান্য লাল। নাড়ি দেখলাম, বেশ নাড়ি, শক্তই আছে। হঠাৎ কোনো ভয়ের কারণ আছে বলে মনে হোল না। তাছাড়া আমার ওপর মেয়ের চিকিৎসার ভার নেই, আমি এসেছি হোম করতে!

গৃহস্বামী বললেন—আপনি আশীর্বাদ করুন, পায়ের ধুলো দিন মাথায় ওর।

পায়ের ধুলো মাথায় দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে হঠাৎ গৃহস্বামী আছাড় খেয়ে পড়ে গেল খাটের পাশে। আমি চমকে উঠলাম। হাত নড়ে গেল। লোকজন দৌড়ে এল কি হয়েছে দেখতে। কিছুই সেখানে নেই, না একটা কলার খোসা না কিছু। লোকটি পড়লো কি করে? পায়ের ধুলো দেবার কথা চাপা পড়ে গেল। গৃহস্বামীর মাথায় ও মুখে ওর বড় শালা ঠাণ্ডা জল দিতে লাগলো। মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সে এক হৈ-চৈ ব্যাপার।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি তান্ত্রিক হোম করি। কিছু কিছু দৈব ঘটনা বুঝি। লক্ষ্মণ, প্রতিলক্ষ্মণ, চিহ্ন আর ইঙ্গিত এই নিয়ে দৈব। গোড়াতেই এর লক্ষ্মণ খারাপ বলে যেন মনে হচ্ছে। তবে কি হোমে বসবো না? সন্ধ্যার কিছু পরে শিব-মন্দিরের সামনের রাস্তায় পায়চারি করছি। বড্ড গরম। বাড়ির মধ্যে হাওয়া নেই। রাস্তায় তবু একটু হাওয়া বইছে। হঠাৎ আমার কানে গেল, কে যেন বলছে—শুনুন, শুনুন। দুবার কানে গেল কথাটা। এদিক ওদিক চাইতেই চোখে পড়লো শিবমন্দিরের মধ্যে ঠিক দোরের গোড়ায় একটি কে মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে!

বললাম—আমায় বলছেন?

—হ্যাঁ। ও খুকীর জন্যে বিরজা হোম করবেন না। ও বাঁচবে না।

—কে আপনি?

—আমি যে-ই হই। যদি ভাল চান, হোম করবেন না।

আমি বিস্মিত হোলাম। নির্জন, অন্ধকার, ভাঙা মন্দির। সেখানে এখন মেয়েমানুষ আসবে কে? এমন আশ্চর্য কথাই বা বলে কেন? আমার খানিকটা রাগও হোল। আমার ইচ্ছার ওপর বাধা দেয় এমন লোক কে? মানুষ তো দূরের কথা, অপদেবতাকেও কখনো গ্রাহ্য করিনি। মায়ের আশীর্বাদে সবই সম্ভব হয়। ভৈরব চক্রবর্তীকে ভয় দেখানো সহজ নয়।

আমার এই অদ্ভুত দর্শনের কথা বাড়ি ফিরে কাউকে বললাম না। রাত্রে বসে হোমের জিনিসপত্রের ফর্দও করে দিলাম। তারপর রাত আটটা বাজল, গৃহস্বামী আমাকে রান্নাবান্না করতে বললেন। এইবার আমার গল্পের আসল অংশে আসবো। তার আগে ওদের বাড়িটার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

বাড়িটা খুব পুরনো কোঠা বাড়ি, কোনো ছিরি-সৌষ্ঠব নেই, কিন্তু দোতলা। পল্লী-গ্রামে দোতলা বাড়ি বড় একটা দেখা যায় না। যমুনা নদীর ধারে ঠিক নয় বাড়িটা, সামান্য দূরে। মধ্যে কেবলমাত্র একখানা বাড়ি। ঐ বাড়ির ছাদ আর এ বাড়ির ছাদের মধ্যে দশ-বারো ফুট চওড়া একফালি জমির ব্যবধান।

ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর। সেই ঘরে আমার বিছানা পাতা হয়েছে। পাশে খোলা ছাদে তোলা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোনামুগের ডাল, আতপ চাল, বড়ি, আলু আর ঘি। আমি একাই রাঁধছি, রান্নার সময় কাছে কেউ থাকে আমি পছন্দ

করিনে। রান্নার আগে একবার চা করে খেলাম। পরের তৈরি চা খেয়ে তৃপ্তি পাইনে।

রান্না করতে রাত হয়ে গেল। রাত সম্পূর্ণ অন্ধকার। একটা জিরিয়ে তামাক খেয়ে নিয়ে ভাত বেড়ে নিলাম হাঁড়ি থেকে আঙট-কলার পাতে। তারপর খেতে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হোল ছাদে আমি একা নেই। এদিক ওদিক চাইলাম, কেউ কোথাও নেই, রাত বেশি হয়েছে, বাড়ির লোকেও নিচের তলায় খেয়েদেয়ে শুয়েছে, গ্রামই নিষুতি হয়ে গিয়েছে। কেবল যমুনা নদীতে জেলেদের আলোয় মাছ ধরার ঠুক্ ঠুক্ শব্দ হচ্ছিল।

হঠাৎ খেতে খেতে মুখ তুলে চাইলাম।

আমার সামনে ছাদের ধারে ওটা কি গাছ? কালো মত, লম্বা তাল গাছের মত? এতক্ষণ ছাদে বসে রান্না-বাড়া করছি, কই অত বড় একটা গাছ নজরে পড়েনি তো এর আগে? ছিল নিশ্চয়ই, নয়তো এখন দেখছি কি করে। কি গাছ ওটা! সত্যি, যখন চা খেলাম, তখন দুটো বাড়ির মধ্যেকার ওই রাস্তাটা দিয়ে একখানা গরুরগাড়ির ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে আমাকে এদিকে তাকাতে হয়েছিল। তখন, কই তো অত বড় একটা তাল গাছ—উঁহু, কই! নাঃ, দেখিনি।

কিন্তু তাল গাছটা এমনভাবে—ও কি রকম তাল গাছ? ওকি! ওকি!

আমি ততক্ষণ বিভীষিকা দেখে ভাত ফেলে লাফিয়ে উঠে পড়েছি।

তাল গাছ না।

এখনো ভাবলে—এই দেখুন গায়ে কাঁটা দিয়েছে। যদিও আমার নাম ভৈরব চক্রবর্তি, তান্ত্রিক। পিছনের ছাদের কার্নিসের ওপর দাঁড়িয়ে এক বিরাটকায় অসুর কিংবা দৈত্যের মত মূর্তি তার তত বড় বড় হাত পা—সেই মাপে। মাথাটা একটা ঢাকাই জালার মত, চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মত রাঙা, আগুন ঠিকরে পড়ছে! আমার দিকেই তাকিয়ে আছে অসুরটা, যেন আমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলবে।

বিরাট মূর্তি। তালগাছের মতই লম্বা। অনেক উঁচুতে তার মাথাটা। নিচু চোখে সেটা আমার দিকে চেয়ে আছে।

ভালো করে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। দু'দুবার চোখ রগড়ালাম। দুবার চা খেয়ে কি এমন হোল? না। ওই তো সেই বিরাট, তাল শাল নারকোল গাছের মত তে-ঢ্যাঙা বেখাপ্পা অপদেবতার মূর্তি বিরাজ করছে সামনে জমাট অন্ধকারের মতো। এবার ভালো করে দেখে মনে হোল পিছনের ছাদে সেটা দাঁড়িয়ে নয়, কোথাও দাঁড়িয়ে নেই—দুই বাড়ির মধ্যেকার ফাঁকটাতে দাঁড়িয়ে বলা যায়। কারণ ওই জীবের নাভিদেশ থেকে ওপর পর্যন্ত আমার সামনে। তার নিচেকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমার দৃষ্টিরেখার নিচে।

এ বর্ণনা করতে যত সময় লাগলো, অতটা সময় লাগেনি আমার বারকয়েক দেখতে জীবটাকে। এক থেকে দশ গুনতে যত সময় লাগে, ব্যস্। আমি বলতে পারি অন্য যে কেউ ওই বিকট অপদেবতার মূর্তি অন্ধকারে নির্জনে ছাদে গভীর রাতে দেখলে আর গোলার ধানের ভাত খেতো না পরদিন।

আমি অপদেবতা দেখেছি, পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসলে জপের শেষের দিকে প্রায়ই ভয় দেখাতো। কিন্তু সে এ ধরনের বিকট ও বিরাট ব্যাপার নয়। ভয় পেয়ে গেলাম। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। চক্ষে অন্ধকার দেখে পড়ে যাই আর কি। পড়লেই হয়ে যেতো। দুর্বল মানুষ মরে ওদের হাতে। মন সবল হোল ওরাই পালায়।

নিজেকে তখুনি সামলে নিলাম। তারামন্ত্র জপ শুরু করলাম জোরে জোরে। সেই দিকে চেয়ে মন্ত্র জপ করতে করতে ক্রমে মূর্তি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

মূর্তিটা আমার সামনে সবসুদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিল এক থেকে ত্রিশ গুনতে যতটা সময় নেয় ততটা। এর খুব বেশী হবে না কখনো। সেটা মিলিয়ে যেতে আর একবার চোখ রগড়ালাম, কিছু নেই। বিশ্বাস করুন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিচের তলা থেকে কান্নাকাটি উঠলো। রুগী মেয়েটি মারা গিয়েছে।

—তখুনি?

—তখুনি। এ ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা দিতে আমি রাজী নই। যা ঘটেছিল অবিকল তাই নিবেদন করলাম আপনাদের কাছে। বিশ্বাস করুন বা না করুন।

কাশী কবিরাজের গল্প

আমার উঠোন দিয়ে রোজ কাশী কবিরাজ একটা ছোট্ট ব্যাগ হাতে যেন কোথায় যায়। জিজ্ঞেস করলেই বলে—এই যাচ্ছি সনকপুর রুগী দেখতে, ভায়া—

একদিন বললে—নৈহাটি যাচ্চি রুগী দেখতে, সেখান থেকে শ্যামনগর যাবো।

—সেখানেও আপনার রুগী আছে বুঝি?

—সব জায়গায়। কলকাতায় মাসে দুবার যাতি হয়।

আমার হাসি পায়। কাশী কবিরাজ আমাদের গ্রামে বছরখানেক আগে পাকিস্তান থেকে এসে বাসা করেছে। জঙ্গলের মধ্যে একখানা দোচালা ঘর। আমগাছের ডালপালায় ঢাকা। দিনে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না। ছেঁড়া কাপড় পরে কাশী কবিরাজের বৌকে ধান সেদ্ধ করতে দেখেছি। এত যদি পসার, তবে এমন অবস্থা কেন?

একদিন আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি আকাশে ঘন মেঘ এসে জমলো। বৃষ্টি আসে-আসে। কাশী কবিরাজ দেখি আমার উঠোন দিয়ে হনহন করে চলেচে ব্যাগ হাতে।

ডেকে বললাম—ও কবিরাজ মশাই—শুনুন শুনুন, কোথায় চললেন? বৃষ্টি আসচে—

কাশী কবিরাজ আমার চণ্ডীমণ্ডপে এসে উঠে বসলো।

বললে—একটু রাণাঘাট যাতাম এই ট্রেনে, রুগী ছেলো।

—কে রোগী?

—একজন মাদ্রাজী। পা ফুলে বিরাট হয়েচে, সব ডাক্তারে জবাব দিয়েচে। তিনবার এক্স্‌-রা কত্তি গিয়েলো। আমি বলিচি, ওসব এক্স্‌-রা টেক্স্‌-রা আমার সঙ্গে লাগবা না। আমার মুখিই এক্স্‌-রা—

আমার হাসি পেলো। নিজের যদি অত গুণ, তবে দোচালায় বাস কর কেন জঙ্গলের মধ্যে? লম্বা লম্বা কথা বললেই কি লোকে তোমাকে বড় কবিরাজ ভাববে?

—একটু চা খান, দাদা—

—তা খাওয়াও ভাই, বৃষ্টি এলো। একটু বসেই যাই—

—আপনার পসার তাহোলে বেশ বেড়েচে?

—বাড়বে কি ভায়া, বরাবর আছে। আমার তান্ত্রিক কবিরাজি। যা কেউ সারাতি পারবে না, তা আমি সারাবো।

—বলেন কি!

—এই জন্যেই তো আমার পসার। শুধু ঝাড়ানো—কাড়ানো—

—ঝাড়িয়ে রোগ সারিয়েছেন?

—আরে এ পাগল বলে কি? বড় বড় রোগ ঝাড়িয়ে সারিয়েচি।

—বটে!

তোমরাই ইংরাজি লেখাপড়া জান কিনা,—সমস্ত অবিশ্বাস করো জানি। ভূত মান?

এই রে! ঝাড়ফুঁক থেকে এবার ভূতপ্রেতে এসে পৌঁছুলো! কাশীনাথ কবিরাজ অনেক কিছু জানে দেখছি। বললাম—যদি বলি মানিনে?

—তা তো বলবাই, ইংরাজি পড়াতে তোমাদের ইহকালও গিয়েচে, পরকালও গিয়েচে! রাগ করো না ভায়া। যা সত্যি, তাই বললাম। চা এসেচে? তাহলি একটা গল্প শোনো বলি। আমার নিজের চোখে দেখা।

খুব বৃষ্টি এসে পড়লো, চারিদিক অন্ধকার করে এলো। কাশীনাথ কবিরাজ তার গল্প আরম্ভ করলো।

কাশীনাথ কবিরাজ তান্ত্রিক-মতে চিকিৎসা করে বলে অনেক দূর দূর থেকে তার ডাক আসে। আজ বছর দশেক আগে হরিহরপুরের জমিদার শিবচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়ি থেকে তাঁর ছেলের চিকিৎসার জন্যে কাশীনাথের ডাক এলো।

আমি বললাম—আগে কখনো সেখানে গিয়েছিলেন আপনি?

—না।

—নাম জানতেন?

—খুব। আমাদের ওদেশে হরিহরপুরের জমিদারের নাম খুব প্রসিদ্ধ।

—যখন গিয়ে পেঁাছলেন, তখন বেলা কত?

—সন্দের কিছু আগে। তারপর শোনো—

কাশীনাথ ওদের বাড়ি দেখে অবাক্ হয়ে গেলো। সেকেলে নামকরা জমিদার, মস্ত বড় দেউড়ি, দু-তিন মহল বাড়ি। দেউড়ির পাশে বৈঠকখানা ঘর, তার পাশে একটা বড় বারান্দা। ওদিকে ঠাকুর-দালান, বাইরে রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ। তবে এ সবই ভগ্নপ্রায়—পূর্বের সমৃদ্ধি ঘোষণা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র, বড় বড় বট-অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে বাড়ির গায়ে। মন্দিরের চূড়োর ফাটলে বন্য শালিখের গর্ত, কাঠবিড়ালির বাসা। সামনে বড় একটা আধ-মজা দীঘি পানায় ভর্তি।

সন্ধ্যার কিছু আগে সেই মস্ত বড় পুরনো ভাঙা বাড়ি দেখে কাশীনাথের মনে কেমন এক অপূর্ব ভাব হোলো।

আমি বললাম—কি ভাব?

—সে তোমারে বলতে পারিনে, ভায়া। ভয়ও না, আনন্দও না। কেমন যেন মনে হোল, এ বড্ড অপয়া বাড়ি—এ ভিটেতে পা না দেওয়াই ভালো আমার পক্ষি। তোমার হবে না, কিন্তু আমার হয় বাপু, এমনি।

—অন্য কোথাও হয়েচে?

—আরও দু-একবার হয়েচে এমনি। কিন্তু সে কথা এখন আনবার দরকার নেই। তারপর বলি শোনো না—

তারপর কাশী কবিরাজ সেখানে গিয়ে রোগী দেখল। দশ বৎসর বয়সের একটি ছেলের টাইফয়েড জ্বর, খুব সংকটাপন্ন অবস্থা। কাশী কবিরাজ গিয়ে তান্ত্রিক প্রণালীতে ঝাড়ফুঁক করে শেকড়-বাকড়ের ওষুধ বেটে খাওয়ালো। রোগী কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে উঠলো।

অনেক রাত্রে কাশী খাওয়া-দাওয়া সেরে দেউড়ির পাশে বৈঠকখানা ঘরে এসে দেখলো, সেখানে তার জন্যে শয্যা প্রস্তুত। উৎকৃষ্ট শয্যা, দামী নেটের মশারি, কাঁসার গেলাসে জল ঢাকা আছে, ডিবের বাটিতে পান,—সব ব্যবস্থা অতি পরিপাটি।

আমি বললাম—বড়লোকের বাড়ির বন্দোবস্ত—

—হাজার হোক, বনেদী ঘর তো? যতই অবস্থা খারাপ হোক, পুরনো চাল-চলন যাবে কোথায়?

—তারপর?

কাশী কবিরাজ বেশিক্ষণ শোয়নি, এমন সময় সে দেখল ঘোমটাপরা একটি বৌ হনহন করে মাঠের দিক থেকে এসে দেউড়ির মধ্যে দিয়ে জমিদার-বাড়ি ঢুকচে। কাশী খুব আশ্চর্য হয়ে গেলো। এত রাত্রে বাইরের মাঠ থেকে এসে বাড়ি ঢুকলো কে? ভদ্রলোকের ঘরের সুন্দরী বধূ বলেই মনে হলো, যতটুকু দেখেছে তা থেকেই।

যাক্। সে এসেছে কবিরাজি করতে, অতশত খোঁজে তার কি দরকার? যে যা ভালো বোঝে করুক।

আমি বললাম—রাত তখন কত?

—রাত একটার কম নয়, বরং বেশি।

—যেদিক থেকে এলো, সেদিকে কোনো লোকালয় নেই?

—না মশাই। ফাঁকা মাঠ অনেকখানি পর্যন্ত, তারপর কোদালে নদী। কোদালে নদীতে গরমকালে জল থাকে না। হেঁটে পার হওয়া যায়—তার ওপারে বলরামপুর গ্রাম।

—আপনি কি করে বুঝলেন ভদ্রবংশের মেয়ে?

—হাত-পায়ের যতটুকু খোলা, ধবধবে ফরসা। আধ-জ্যোৎস্না রাত, আমি দিব্যি টের পাচ্ছি—মুখখানা অবিশ্যি ঘোমটায় ঢাকা ছেলো।

—বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবার সময় অন্য কোনো লোক সেখানে ছিলো?

—না।

—আপনাকে টের পেয়েছিলো?

—কোনদিকে না চেয়ে হনহন করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

কাশী কবিরাজ নির্বিরোধী ভাল লোক, সে জলের গেলাস তুলে খানিকটা জল খেয়ে মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু নানা চিন্তায় ঘুম আর আসে না, বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো। লোকে বাড়িতে চিকিৎসক ডাকে ঘুমুবার জন্যে নয়। কাশী কবিরাজ অভিজ্ঞ লোক, দায়িত্ব বোধ তার যথেষ্ট, সে অবস্থায় তার চোখে ঘুম আসে কি করে?

মিনিট খানেক পরে কাশী হঠাৎ দেখলে, সেই বৌটি তার পাশের দেউড়ি দিয়ে আবার বার হয়ে যাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে সে তড়াক করে উঠে পড়লো। বৌটি ক্রমে দূর মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় তার সাদা কাপড় দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আমি বললাম—মাঠের দিকে গেলো একা?

—একদম একা। আর অত রাত!

—আপনি কি ভাবলেন?

—আমি আর কি ভাববো মশাই, একেবারে অবাক্। এত রাত্রে একটি সুন্দরী মেয়ে এমন ভাবে যে নির্জন মাঠের দিকে চলে যেতে পারে, তা কখনো দেখিওনি।

কাশী কবিরাজ সাত-পাঁচ ভাবছে, এমন সময়ে বাড়ির মধ্যে থেকে একজন ছুটে এসে বললে—শীগ্‌গীর আসুন, কবিরাজ মশাই, রোগী কেমন করচে।

কাশী গিয়ে দেখে, রোগীর অবস্থা সত্যই খারাপ। কিন্তু হঠাৎ এত খারাপ হওয়ার কথা তো নয়। যাহোক্ তখনকার মত ব্যবস্থা করতে হোলো। অনেকক্ষণ খাটুনির পরে রোগী খানিকটা সামলে উঠলো। তখন আবার এসে শুয়ে পড়লো কাশীনাথ বাইরের দেউড়ির ঘরে।

পরের দিনমান রোগীর অবস্থা ক্রমশ ভালোর দিকেই চললো। জমিদারবাবুর মন বেশ ভালো—প্রথম দিন বড়ই যেন মুষড়ে পড়েছিলেন। এমন কি কবিরাজের সঙ্গে বসে দুপুরের পর খানিকক্ষণ পাশাও খেললেন। কবিরাজকে তাঁদের বড় দীঘিতে একদিন মাছ ধরতে যাবার আমন্ত্রণও জানালেন। খাওয়ার ব্যবস্থাও দুপুরে বেশ ভালোই হোল—মাছের মুড়ো, দই, দুধ, সন্দেশ ইত্যাদি। কবিরাজ খুব খুশী...। জমিদারবাবু বেশ প্রফুল্ল।

সেই রাত্রে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। এমন ধরনের ব্যাপার কাশী কবিরাজ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

রোগীর অবস্থা ভালো থাকার দরুন সেদিন আর বেশি খাটুনি ছিলো না ওর। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শয্যা আশ্রয় করলো কিন্তু ঘুম আসতে দেরি হোতে লাগলো। কোথাকার ঘড়িতে একটা বেজে গেলো ঢং করে। ঠিক সেই সময়ে দেখলো কাশী কবিরাজ, সেই ঘোমটাপরা বৌটি দেউড়ি দিয়ে ঢুকে অন্দরের দিকে চলেছে।

বলতে কি কাশী কবিরাজের বড় বিস্ময়বোধ হোল! কি সাহস মেয়েটার! এত রাতে মাঠের মধ্যে দিয়ে চলে আসতে ভয়ও কি করে না?

মিনিট পনেরো কেটে গেলো, কি বিশ মিনিট। তারপর কাশী কবিরাজকে আশ্চর্য স্তম্ভিত করে দিয়ে সেই বৌটি ওর ঘরে এসে ঢুকলো। আমি বললাম—আপনার ঘরে?

—হ্যাঁ, একেবারে আমার সামনে।

—ঘরে আলো ছিলো?

—বাড়িতে রোগী থাকার দরুন আমার ঘরে সারারাতই একটা হারিকেন জ্বলে।

ঘরে ঢুকে মেয়েটি মুখের ঘোমটা অনেকখানি তুলে কবিরাজের দিকে চাইলো। বেশ সুন্দরী মহিলা। দেখলে সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়, এমনি চেহারা। কাশী কবিরাজকে বলল—তুমি এখানে থেকো না, চলে যাও এখান থেকে।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত কাশী কবিরাজ মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বলল—আপনি কে মা?

—আমি যেই হই, তুমি এখান থেকে যাবে কি না?

—মা, আমি চিকিৎসক। রুগী দেখতে এসেচি। আমার কাজ না সেরে আমি কি করে যাবো?

—তুমি এ রুগী বাঁচাতে পারবে না। কাল সকালে তুমি চলে যাও এখান থেকে—

—কি করে আপনি জানলেন রুগী বাঁচবে না!

—আমি ওর মা। ওর সৎমা ওকে খুব কষ্ট দিচ্ছে, সে কষ্ট আমি দেখতে পারচিনে—আমি ওকে নিয়ে যেতে এসেচি—নিয়ে যাবোই। তুমি তাকে কিছুতেই রাখতে পারবে না—

কাশীনাথ কবিরাজ তখনো ব্যাপারটা ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারেনি! সে আমতা-আমতা করে বললে—আপনি কোথায় থাকেন?

—আমি মারা যাওয়ার পরে আজ চার বছর হোল ওর বাবা আবার বিয়ে করেচে। আমার সেই সতীন ওকে বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমি সেখানে শান্তিতে থাকতে পারি না—খোকা আপন মনে কাঁদে। আমি শুনতে পাই—ওকে আমি নিয়ে যাবোই। তুমি কেন অপযশ কুড়োবে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও—

কাশীনাথের সমস্ত শরীর হিম হয়ে গিয়েছে যেন। কি ব্যাপারটা সামনে ঘটচে, তার যেন কোনো ধারণাই নেই, তবুও সে হাতজোড় করে বললে—মা, একটা কথা। আমি জমিদারবাবু—আপনার স্বামীকে সব বলি। তিনি তাঁর ছেলেটিকে বড় ভালবাসেন। ছেলেটিকে আপনি নিয়ে গেলে তাঁর কি অবস্থা হবে, সেটা তো আপনার বিবেচনা করা উচিত।

বৌটি বললেন—তাঁর এ পক্ষের ছেলেমেয়ে হবে। তাঁদের নিয়ে থাকবেন তিনি—

—ও কথা বলবেন না, মা। আপনি তাঁর কথা চিন্তা না করলে কে চিন্তা করবে? সব দিকে বুঝুন। তাঁর কথা ভাবতে হবে আপনাকেই। আমি আজই সব বলচি তাঁকে খুলে। যদি তিনি তাঁর এ পক্ষের স্ত্রীকে ব'লে ছেলেটির ওপর অত্যাচার নিবারণ করতে পারেন, তবে আপনি আমাকে কথা দিন, ছেলেটিকে আপনি নিয়ে যাবেন না? আমি সে চেষ্টা করি, মা?

—করো।

বলেই মূর্তি অদৃশ্য হোল না কিন্তু। ঘর থেকে বার হয়ে দেউড়ি দিয়ে বার হয়ে মাঠের দিকে চলে গিয়ে নিশীথ-রাত্রের শুভ্র জ্যোৎস্নার কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

—আমি জিগ্যেস করলাম—বলেন কি!

—হ্যাঁ মশাই।

—আচ্ছা, এ মূর্তির কোনো অংশ অস্পষ্ট নয়?

—দিব্যি মানুষের মত। কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই কোথাও। কথাবার্তা বললাম, আমার কোনো ভয় হোল না। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলচি, তেমনি মনে হোল।

মূর্তিটি অদৃশ্য হওয়ার খানিক পরেই বাড়ির মধ্যে থেকে কাশীকে ডাকতে এলো। রুগীর অবস্থা খুব খারাপ। অথচ সমস্ত দিন এমন ভালো ছিলো। তখনকার মত সুব্যবস্থা করে ভোরের দিকে কাশী কবিরাজ জমিদারবাবুকে বললে—আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, বাইরে চলুন।

আমি বললাম—বাইরে এসে সব কথা বললেন নাকি?

—হ্যাঁ, গোড়া থেকে। বললাম, এই আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা প্রথম পক্ষের স্ত্রী কিছুক্ষণ আগে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন।

—বিশ্বাস করলেন?

—কেঁদে ফেললেন। বললেন,—আমি জানি। আমি এই অসুখের সময় একদিন ওকে শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচি!

তার পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত।

জমিদার বললেন, আমি জানি, ওর সৎমা ওর ওপর খুব সদয় নয়—তবে এতটা আমি জানতাম না। আমি কথা দিচ্চি, খোকা সেরে উঠলে ওর মামার বাড়িতে রেখে লেখা-পড়া শেখবো। এ সংস্রবে আর আনবো না। আমার এ স্ত্রীকেও আমি শাসন করচি। আপনি তাঁকে জানাবেন। রাত ভোর হয়ে গেলো।

রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভালো হয়ে উঠতে লাগলো। এগারো দিনের পরে কাশী কবিরাজ পথ্য দিলে তার রোগীকে।

বললাম—ওর মাকে আর দেখেননি? আসেননি আপনার কাছে?

—না।

মায়া

দু'বছর আগের কথা বলি। এখনো অল্প অল্প যেন মনে পড়ে। সব ভুল হয়ে যায়। কি করে এলাম এখানে! বগুলা থেকে রাস্তা চলে গেল সিঁদরানির দিকে। চলি সেই রাস্তা ধরেই। রাঁধুনী বামুনের চাকরিটুকু ছিল অনেক দিনের, আজ তা গেল।

যাক্, তাতে কোনো দুঃখু নেই। দুঃখু এই, অবিচারে চাকরিটা গেল। ঘি চুরি আমি করিনি, কে করেচে আমি জানিও না, অথচ বাবুদের বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হলাম। শান্তিপাড়া, সর্ষে, বেজেরডাঙা পার হতে বেলা দুপুর ঘুরে গেল। খিদেও বেশ পেয়েচে। জোয়ান বয়স, হাতে সামান্য কিছু পয়সা থাকলেও খাবার দোকান এ পর্যন্ত এ-সব অজ পাড়াগাঁয়ে চোখে পড়ল না।

রাস্তার এক জায়গায় ভারি চমৎকার একটা পুকুর। স্নান করতে আমি চিরকালই ভালোবাসি। পুকুরের ভাঙা ঘাটে কাপড় নামিয়ে রেখে জলে নামলাম। জলে অনেক পানা-শেওলা, সেগুলো সরিয়ে পরিষ্কার জলে প্রাণভরে ডুব দিলাম। বৈশাখের শেষ, গরমও বেশ পড়েচে, স্নান করে সত্যি ভারি তৃপ্তি হোল। পুকুরের ধারে একটা তেঁতুলগাছের ডালে ভিজে কাপড় রোদে দিলাম। শরীর ঠাণ্ডা হোল কিন্তু পেট সমানে জ্বলছে। এ সময় কোনো বনের ফল নেই? চোখে তো পড়ে না, যেদিকে চাই।

এমন সময় একজন বুড়ো লোক পুকুরটাতে নাইতে আসচে দেখা গেল। আমাকে দেখে বললে—বাড়ি কোথায়?

আমি বললাম,—আমি গরীব ব্রাহ্মণ, চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপাততঃ বড় খিদে পেয়েচে, খাবো কোথায়, আপনি কি সন্ধান দিতে পারেন?

বুড়ো লোকটি বললে—রোসো, নেয়ে নি—সব ঠিক করে দিচ্চি!

স্নান সেরে উঠে লোকটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে জঙ্গলে ঘেরা একটা পুরোনো বাড়িতে ঢুকলো। বললে—আমার নাম নিবারণ চক্রবর্তী। এ বাড়ি আমার, কিন্তু আমি এখানে থাকিনে। কলকাতায় আমার ছেলেরা ব্যবসা করে, শ্যামবাজারে ওদের বাসা। এত বড় বাড়ি পড়ে আছে আর সেখানে মাত্র তিনখানা ঘরে আমরা থাকি। কি কষ্ট বলো দিকি! আমি মাসে মাসে একবার আসি, বাড়ি দেখাশুনো করি। ছেলেরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে আসতে চায় না। মস্ত বড় বাগান আছে বাড়ির পেছনে। তাতে সব-রকম ফলের গাছ আছে—বারো ভূতে খায়। তুমি এখানে থাকবে?

বললাম—থাকতে পারি।

—কি কাজ করতে?

—রাঁধুনীর কাজ।

—যে ক'দিন এখানে আছি, সে ক'দিন এখানে রাঁধো, দুজনে খাই।

—খুব ভালো।

আমি রাজী হয়ে যেতে লোকটা হঠাৎ যেন ভারী খুশী হোল। আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে তখনি। খাওয়া-দাওয়ার পরে আমাকে একটা পুরোনো মাদুর আর একটা মোটা তাকিয়া বালিশ দিয়ে বললে—বিশ্রাম করো।

পথ হেঁটে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে যখন উঠলাম, বেলা তখন নেই। রাঙা রোদ বড় বড় গাছপালার উঁচু ডালে। এরি মধ্যে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে শেয়ালের ডাক শুরু হোল। আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে বেড়ালাম। যেদিকে চাই, সেদিকেই পুরানো আম-কাঁঠালের বন আর জঙ্গল! কোনো লোকের বাড়ি নজরে পড়লো না। জঙ্গলের মধ্যে একস্থানে কেবল একটা ভাঙা দেউল দেখতে পেলাম। তার মধ্যি উঁকি মেরে দেখি, শুধু চামচিকের আড্ডা।

ফিরে এসে দেখি, বুড়ো নিবারণ চক্কত্তি বসে তামাক খাচ্চে। আমায় বললে—চা

করতে জানো? একটু চা-করো। চি'ড়ে ভাজো। তেল-নুন মেখে কাঁচালঙ্কা দিয়ে খাওয়া যাবে।

সন্ধ্যার পর বললে—ভাত চড়িয়ে দাও। সরু আতপ আছে, গাওয়া ঘি আছে, আলু ভাতে ভাত,—ব্যস্!

—যে আজ্ঞে!

—তোমার জন্যে ঝিঙের একটা তরকারি করে নিও। ঝিঙে আছে রান্নাঘরের পেছনে। আলো হাতে নিয়ে তুলে আনো এইবেলা। আর একটা কথা—রান্নাঘরে সর্বদা আলো জেবলে রাখবে।

—তা তো রাখতেই হবে, অন্ধকারে কি রান্না করা যায়?

—হ্যাঁ, তাই বলচি।

মস্ত বড় বাড়ি। ওপরে নীচে বোধ হয় চোদ্দ-পনেরোখানা ঘর। এছাড়া টানা বারান্দা। দু-চারখানা ছাড়া অন্য সব ঘরে তালা দেওয়া। রান্নাঘরের সামনে মস্ত বড় লম্বা রোয়াক, রোয়াকের ও-মুড়োয় চার-পাঁচটা নারকোল গাছ আর একটা বাতাবি লেবুর গাছ। ঝিঙে তুলতে হোলে এই লম্বা রোয়াকের ও মুড়োয় গিয়ে আমায় উঠোনে নামতে হবে, তারপর ঘুরে রান্নাঘরের পেছন দিকে যেতে হবে। তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়নি, আলোর দরকার নেই ভেবে আমি এমনি শুধুহাতেই ঝিঙে তুলতে গেলাম।

বাবাঃ, কি আগাছার জঙ্গল রান্নাঘরের পেছনে! বুনো ঝিঙে গাছ, যাকে এ'টো গাছ বলে। অর্থাৎ এমনি বীজ পড়ে যে গাছ হয় তাই। অনেক ঝিঙে ফলেচে দেখে বেছে বেছে কচি ঝিঙে তুলতে লাগলাম। হঠাৎ আমার চোখ পড়লো, একটি বৌ-মতো কে মেয়েছেলে আমার সামনাসামনি হাত দশেক দূরে ঝোপের মধ্যে নীচু হয়ে আধঘোমটা দিয়ে আমারই মতো ঝিঙে তুলচে! দুবার আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম, তারপর পেছনে ফিরে সাত-আটটা কচি ঝিঙে তুলে নিয়ে চলে আসবার সময় আর একবার চেয়ে দেখলাম। দেখি, বৌটি তখনো ঝিঙে তুলচে।

নিবারণ চক্কত্তি বললে—ঝিঙে পেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক ঝিঙে হয়ে আছে। আর একজন কে তুলছিল।

নিবারণ বিস্ময়ের সুরে বললে—কোথায়?

—ওই রান্নাঘরের পেছনে। বেশী জঙ্গলের দিকে।

—পুরুষমানুষ?

—না, একটি বৌ।

নিবারণ চক্কত্তির মুখ কেমন হয়ে গেল। বললে—কোথায় বৌ? চলো দিকি দেখি। আমি ওকে সঙ্গে করে রান্নাঘরের পেছনে দেখতে গিয়ে দেখি, কিছুই না।

নিবারণ বললে—কৈ বৌ?

—ওই তো ওখানে ছিল, ও ঝোপটার কাছে।

—হুঃ, যতো সব। চলো, চলো। দিনদুপুরে বৌ দেখলে অমনি!

আমি একটু আশ্চর্য হোলাম। যদি একজন পাড়াগাঁয়ের বৌ-ঝি দুটো জংলী ঝিঙে তুলতে এসেই থাকে, তবে তাতে এত খাপ্পা হবার কি আছে ভেবে পাই নে! তাছাড়া আজ না হয় উনি এখানে আছেন, কাল যখন কলকাতায় চলে যাবেন, তখন বুনো ঝিঙে কে চৌকি দেবে?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর চক্কত্তি-বুড়ো আবার সেই ঝিঙে চুরির কথা তুললে। বললে—আলো নিয়ে যাওনি কেন ঝিঙে তুলতে? তোমায় আমি আলো হাতে নিয়ে যেতে বলেছিলাম, মনে আছে? কেন তা যাওনি?

আমি বুঝলাম না কি তাতে দোষ হোল! বুড়োটা খিটখিটে ধরনের। বিনা আলোতে যখন সব দেখতে পাচ্চি, এমন কি ঝিঙে-চুরি-করা বৌকে পর্যন্ত—তখন আলো না নিয়ে গিয়ে দোষ করেচি কি?

বুড়ো বললে—না, না, সন্ধ্যার পর সর্বদা আলো কাছে রাখবে।
—কেন?
—তাই বলচি। তোমার বয়স কত?
—সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে।
—অনেক কম বয়স আমাদের চেয়ে। আমার এই তেষট্টি। যা বলি কান পেতে শুনো।
—আজ্ঞে, নিশ্চয়।

রাত্রে শুয়ে আছি, ওপরের ঘরে কিসের যেন ঘট্‌ঘট্‌ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। জিনিসপত্র টানাটানির শব্দ। কে বা কারা যেন বাক্স-বিছানা এখান থেকে ওখানে সরাচ্চে! ভারী জিনিস সরাচ্চে। বুড়ো কাল সকালে চলে যাবে কলকাতায়, তাই বোধ হয় জিনিস-পত্র গোছাচ্চে! কিন্তু এত রাত্তিরে?

বাবাঃ! কি বাতিকগ্রস্ত মানুষ!

সকালে উঠে বুড়োকে বলতেই বুড়ো অবাক হয়ে বললে—আমি?
—হ্যাঁ, অনেক রাতে।
—ও! হ্যাঁ—না—হুঁ—ঠিক।
—আমাকে বললেই হোত আমি গুছিয়ে দিতাম!

চক্কত্তি-বুড়ো আর কিছু না বলে চুপ করে গেল। বেলা নটার মধ্যে আমি ডাল-ভাত আর ঝিঙেভাজা রান্না করলাম। খেয়ে-দেয়ে পোঁটলা বেঁধে সে রওনা হোল কলকাতায়। যাবার সময় বার বার বলে গেল—নিজের ঘরের লোকের মত থেকো ঠাকুর। পেয়ারা আছে, আম-কাঁঠাল আছে, উৎকৃষ্ট পেঁপে আছে, তরিতরকারি পোঁতো, আমার খাস-জমি পড়ে আছে তিন বিঘে। ভদ্রাসন হোল দেড় বিঘের ওপর। লোক-অভাবে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। খাটো, তরকারি উৎপন্ন করো, খাও, বেচো—তোমার নিজের বাড়ি ভাববে। দেখা-শুনো করো, থাকো। ভাবনা নেই। আর একটা কথা—
—কি?

চক্কত্তি-বুড়ো অকারণে সুর খাটো করে বললে—কত লোকে ভাঙচি দেবে। কারো কথা শুনো না যেন। বাড়ি দেখাশুনো যেমন করবে, নিজের মতো থাকবে, কোনো কথায় কান দেবে না, গাছের ফল-ফুলুরি তুমিই খাবে। দুটো ঘর খোলা রইল তোমার জন্যে।

বুড়ো চলে গেল। আমাকে যেন আকাশে তুলে দিয়ে গেল। আরে, এত বড় বাড়ির বড় বড় দুখানা ঘর আমার ব্যবহারের জন্যে রয়েচে—তাছাড়া বারান্দা, রান্নাঘর, রোয়াক তো আছেই! বাড়িতে পাতকুয়া, জলের কষ্ট নেই। শুকনো কাঠ যথেষ্ট, কাঠের কষ্ট নেই। দশটা টাকা আগাম দিয়ে গিয়েচে বুড়ো, প্রায় আধ-মণটাক সরু আতপ চালও আছে। গাছ-ভরা আম-কাঁঠাল। এ যেন ভগবানের দান আকাশ থেকে পড়ল হঠাৎ!

বিকেলের দিকে তেল-নুন কিনবা বলে মুদির দোকান খুঁজতে বেরুলাম। বাপ রে, কি বন-জঙ্গল গাঁ-খানার ভেতরে! আর এদের যেখানে বাড়ি তার ত্রিসীমানায় কি কোনো লোকালয় নেই? জঙ্গল ভেঙে সুঁড়িপথ ধরে আধ মাইল যাবার পর একজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল। সেও তেল কিনতে যাচ্চে, হাতে তেলের ভাঁড়। আমায় দেখে বললে—বাড়ি কোথায়?
—এখানে আছি নিবারণ চক্কত্তির বাড়ি।
—নিবারণ চক্কত্তির? কেন?
—দেখাশুনো করি। কাল এ'সচি।
—ও বাড়িতে থাকতে পারবে না।
—কেন?
—এই বলে দিলাম। দেখে নিও। কত লোক ও-বাড়িতে এল গেল। ওরা নিজেরাই

থাকতে পারে না, তা অন্য লোক! ও-বাড়ির ছেলে-বৌয়েরা কস্মিনকালে ও-বাড়িতে আসে না—

—কেন?

—তা কি জানি! ও বড় ভয়ানক বাড়ি। তুমি বিদেশী লোক। খুব সাবধান।

আর কিছু না বলে লোকটা চলে গেল। আমি দোকান খুঁজে জিনিস কিনে বাড়ি ফিরলাম। তখন বিকেল গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নামচে। দূর থেকে জঙ্গলের মধ্যেকার পুরোনো উঁচু দোতলা বাড়িখানা দেখে আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। সত্যি, বাড়িখানার চেহারা কি রকম যেন! ও যেন একটা জীবন্ত জীব, আমার মতো ক্ষুদ্র লোককে যেন গিলে ফেলবার জন্য হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসচে! অমনতর ওর চেহারা কেন?

কিছু না। লোকটা আমার মন খারাপ করার জন্য দায়ী। আমি যখন তেল-নুন কিনতে যাই তখন আমার মনে দিব্যি ফুর্তি ছিল—হঠাৎ এমন হওয়ার কারণ হচ্চে ওই লোকটার ভয়-দেখানো কথাবার্তা। গায়ে পড়ে অত হিত করবার দরকার কি ছিল বাপু তোমার? চক্কোত্তি-বুড়ো তো বলেই গিয়েছে, কত লোক কত কথা বলবে, কারো কথায় কান দিও না।

কিছু না, গাছপালার ফল-ফুলুরি গাঁয়ের লোক চুরি করে খায় কিনা। বাড়িতে একজন পাহারাদার বসালে লুঠপাট করে খাওয়ার ব্যাঘাত হয়, সেইজন্যেই ভয় দেখানো। যেমন ওই বৌটি কাল সন্ধ্যাবেলা ঝিঙে চুরি করছিলো।

অনেকদিন এমন আরামে থাকিনি। বিনা-খাটুনিতে পয়সা রোজগারের এমন সুযোগ জীবনে কখনো ঘটেনি। নিজের জন্য শুধু দুটো রান্না—মিটে গেল কাজ! সকাল সকাল রান্না সেরে নিয়ে নীচের বড় রোয়াকে বসে আপনমনে গান গাইতে লাগলাম। এত বড় বাড়ির আমিই মালিক। কারো কিছু বলবার নেই আমাকে। যা খুশী করবো।

হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দোতলার নালির মুখ দিয়ে পড়তে লাগলো জল, যেমন ওপরের বারান্দাতে কেউ হাত-পা ধুলে জল পড়ে—বেশ মোটাধারে জল পড়তে লাগলো। তখনি আমি উঠে রোয়াকের ধারে দাঁড়িয়ে দোতলার বারান্দার দিকে চেয়ে দেখলাম। তখনো জল পড়চে—সমানে মোটাধারায়। ওপরের সিঁড়ির দরজায় তালা দেওয়া। চাবি চক্কোত্তি মশায় নিয়ে গিয়েচেন, সুতরাং দোতলায় যাবার কোনো উপায় আমার নেই। এ জল কোথা থেকে পড়চে?

মিনিট দশেক পড়ার পর জলের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হোল, চক্কোত্তি মশায় বোধ হয় কোনো কলসী বা ঘড়াতে জল রেখে দিয়েছিলেন ওপরের বারান্দাতে, সেই কলসী কি-ভাবে উল্টে পড়ে গিয়ে থাকবে। নিশ্চয় তাই। তা ছাড়া জল আসবে কোথা থেকে?

একটু পরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো। অনেক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে গেল, জানলা দিয়ে সুন্দর জ্যোৎস্না এসে পড়েচে বিছানায়। কি একটা ফুলের গন্ধও আসচে। বেশ সুবাস ফুলের।

কি ফুল?

ঘুমের ঘোরেই ভাবচি এমন কোন সুগন্ধওয়ালা ফুল তো বাড়ির কাছাকাছি দেখিনি!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। ও কি! জানলার সামনে দিয়ে একটি বৌ চলে গেল রোয়াক বেয়ে। হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখেচি—ভুল হবার নয়! আমি তখুনি উঠে দরজা খুলে রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালাম। রোয়াকে দাঁড়াতে দুটো জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হোল। প্রথম সেই ফুলের সুবাসটা রোয়াকে অনেকখানি ঘন, ঐ বৌটি যেন এই সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে গেল এই কতক্ষণ! না, এ কোনো ফুলের সুবাস নয়। এ কিসের সুবাস, তা আমার মাথায় আসচে না।

কেমন একরকম যেন লাগচে! একরকম নেশার মতো! কেন আমি বাইরে এসেচি? ও! কে একটি বৌ রোয়াক বেয়ে খানিক আগে চলে গিয়েছিল—সে-ই ছড়িয়ে গিয়েচে এই তীব্র সুবাস। কিন্তু কোনো দিকে নেই তো সে! গেল কোথায়?

সে-রাত্রে সেই পর্যন্ত। কতক্ষণ পরে ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে মনে হোল, সব স্বপ্ন। মনটা বেশ হাল্কা হয়ে গেল। কাজ-কর্মে ভালো করে মন দিলাম। বন-জঙ্গল কেটে কিভাবে তরি-তরকারির আবাদ করবো, সেই আলোচনা করতে লাগলাম মনের মধ্যে।

একটা অসুবিধে এখানে থাকবার—বড্ড নির্জনে থাকতে হয়। কাছাকাছি যদি একঘর লোকও থাকতো, তবে এত কষ্ট হোত না—কথা বলবার একটা লোক নেই, এই হোল মহাকষ্ট।

সেদিন দুপুরে এক ঘটনা ঘটলো।

আমি ভাত নামিয়ে হাঁড়ি রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় দোতলার বারান্দাতে অনেক লোক যেন একসঙ্গে হেসে উঠলো। সে কি ভীষণ অট্টহাসি! আমার গা যেন দোল দিয়ে উঠলো সে হাসি শুনে। খিলখিল করে হাসি নয়—খলখল করে হাসি। আকাশ-বাতাস থমথমিয়ে উঠলো সে হাসির শব্দে।

ভাত ফেলে রেখে দৌড়ে গেলাম। রোয়াকে গিয়ে ওপরের দিকে দেখি, কিছুই না। নিচের জানলা যেমন বন্ধ, ওপরের ঘরের সারবন্দি জানলা তেমনি বন্ধ। হাসির লহর তখন থেকে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েচে।

ব্যাপার কি? কোনো বদমাইশ লোকের দল ওপরে আড্ডা বেঁধেছে? ওপরের সিঁড়ির মুখে গিয়ে দেখি দরজায় তেমনি কুলুপ ঝুলচে।

আমার ভয় হয়নি। কেননা দিনমান, চারিদিকে সূর্যের আলো। এ সময়ে মনের মধ্যে কোন ভূতের সংস্কার থাকে না। এই হাসিই যদি আমি রাত্রে শুনতাম, তবে বোধ হয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতাম, চাবি দিয়ে দাঁত খুলতে হোত।

রান্নাঘরে ফিরে এসে ভাতের ফেন গেলে ঝিঙের তরকারি চাপিয়ে দিই। প্রচুর ঝিঙে জঙ্গলে ফলেচে, যত ইচ্ছে তুলে নিয়ে খাও। আমারই বাড়ি, আমারই ঝিঙে-লতা। মালিক হওয়ার যে একটা মাদকতা আছে, তা কাল থেকে বুঝচি। আমার মতো গরীব বামুনের জীবনে এমন জিনিস এই প্রথম।

কান পেতে রইলাম ওপরের ঘরের কোনো শব্দ আসে কিনা শুনতে। ছুঁচ পড়বার শব্দও পেলাম না। খেয়েদেয়ে নিজের মনে বিছানায় গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—ঘুমের ঘোরে শুনচি, ঘরের মধ্যে অনেক লোক কথাবার্তা বলচে, হাসচে। ঘুমের মধ্যেও আমি ওদের কথাবার্তা যেন শুনচি, যেমন কোনো বিয়েবাড়িতে ঘর-ভর্তি লোকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে লোকজনের গলার শব্দ ঘুমের মধ্যেও পাওয়া যায়! হয়ত সবটাই আমার মনের ভুল! সেই যে ভাব হয়েছিল হাসি শুনে, তারই ফল!

এর পর ন'দিন আর কোন কিছু ঘটেনি।

মানুষের মনের অভ্যাস, অপ্রীতিকর জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি দিব্যি ভুলে যেতে চায়. পারেও ভুলে যেতে। আমি নিজের মনকে বোঝালুম, ওসব কিছু না. কি শুনতে কি শুনেচি, বৌ দেখা চোখের ভুল, হাসি শোনাও কানের ভুল! সব ভুল।

এ ন'দিনে আমার শরীর বেশ সেরে উঠলো। খাই-দাই আর শুধু ঘুমুই। কাজ-কর্ম কিছু নেই—কেমন একরকমের কুড়েমি পেয়ে বসেছে আমাকে। আমি সাধারণতঃ খুব খাটিয়ে লোক, শুয়ে বসে থাকতে ভালোবাসিনে—কিন্তু অনেকদিন ধরে অতিরিক্ত খাটুনির ফলে কেমন একরকমের অবসাদ এসে গিয়েচে, শুধুই আরাম করতে ইচ্ছা হয়।

ন'দিনের দিন বিকেলে মনে হোল রান্নাঘরের পেছনে সেই ঝিঙের জঙ্গলটা কেটে একটু পরিষ্কার করি, ঝিঙের লতাগুলো বাঁচিয়ে অবশ্য। ওখানে ঝালের চারা পুঁতবো. আর একটা চালকুমড়োর এঁটো লতা হয়েচে ওই জঙ্গলের মধ্যে, সেটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে রান্না-ঘরের ছাদে উঠিয়ে দেবো। এ বাড়িতে কাজ করে সুখ আছে: কারণ দা, কোদাল, কাস্তে. নিড়েন, শাবল, কুড়ুল, সব মজুত আছে—ঘরের কোণে একটা হাত-করাত ইস্তক।

অল্পক্ষণ মাত্র কাজ করেছি—আধ ঘণ্টাও হবে না।

হঠাৎ দেখি, সেই বৌটি ঝিঙে তুলতে এসেচে। নীচু হয়ে ঝোপের মধ্যে ঝিঙে তুলচে।

সঙ্গে সঙ্গে দোতলার ঘরগুলোর মধ্যে এক মহা-কলরব উপস্থিত হোল। অনেকগুলো লোক—আন্দাজ জনপঞ্চাশেক, একসঙ্গে যেন হৈ-হৈ করে উঠলো—সব দরজা-জানলা যেন একটা ঝড়ের ঝাপট লেগে একসঙ্গে খুলে গেল।

বন কাটা ফেলে আমি ওপরদিকে চেয়ে দেখলাম। সামনের রোয়াকে এসে দাঁড়ালাম—কৈ, একটা দরজা জানলার কপাটও খোলেনি দোতলার! যেমন তেমনি আছে!

ব্যাপার কি? বাড়িটার মৃগী রোগ আছে নাকি? মাঝে মাঝে এমন বিকট চীৎকার ওঠে কেন? এবার তো ভুল হবার কোনো কথা নয়—সম্পূর্ণ সুস্থ মনে কাজ করতে করতে এ চীৎকার আমি শুনেচি এইমাত্র। এখন আবার চারিদিক নিঃশব্দ, কোনো দিকে কোন শব্দ নেই।

সেই বৌটি আবার ঝিঙে তুলতে এসেচে এই গোলমালের মধ্যে। দৌড়ে গেলাম রান্নাঘরের পেছনে। সেখানেও কেউ নেই।

সেদিন রাত্রে এক ঘটনা ঘটলো। ভারি মজার ঘটনা বটে।

খেয়েদেয়ে সবে শুয়েচি, সামান্য তন্দ্রা এসেচে—এমন সময় কিসের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। চেয়ে দেখি, আমার বিছানার চারিপাশে অনেক লোক জড়ো হয়েচে—তাদের সবারই মাথায় লাল পাগড়ি, হাতে ছোট ছোট লাঠি—আশ্চর্যের বিষয়, সকলেরই মুখ দেখতে একরকম। একই লোক যেন পঞ্চাশটি হয়েচে, এইরকম মনে হয় প্রথমটা। বহু আরশিতে যেন একটা মুখই দেখচি।

কে যেন বলে উঠলো—আমাদের মধ্যে আজ কে যেন এসেচে!

একজন তার উত্তর দিলে—এখানে একজন পৃথিবীর লোকের বাড়ি আছে অনেক দিন থেকে। আমি দেখিনি বাড়িটা, তবে শুনেচি। যারা দেখতে জানে, তারা বলে। সেই বাড়ির মধ্যে একটা লোক রয়েচে।

—সব মিথ্যে! কোথায় বাড়ি?

—আমরা কেউ দেখিনি।

—তবে এসো, আমরা নাচ আরম্ভ করি।

বাপ রে বাপ! কথায় বলে ভূতের নেত্য! শুনেই এসেছিলাম এতদিন, এইবার স্বচক্ষে দেখলাম। সে কি কাণ্ড! অতগুলো লোক একসঙ্গে লাঠি বাজিয়ে এক তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলে, আমার দেহের মধ্যে দিয়ে কতবার যে এল গেল! তার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার আর হল্লা!

আমার বিছানার বা আমার কোনো অংশ তারা স্পর্শও করলো না। আমি যে সেখানে আছি, তাও যেন তারা জানে না। ওদের হুঙ্কার আর ভৈরব নৃত্যে আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান হোল, তখন শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্না খোলা জানলা দিয়ে এসে বিছানায় পড়েচে। সেই ফুলের অতি মৃদু সুবাস ঘরের ঠান্ডা বাতাসে। আমি আধ-অচেতন ভাবে জানলার বাইরের জ্যোৎস্নামাখা গাছপালার দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না ভোর হয়ে গেল।

বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি, ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি। সুনিদ্রা হোলে শরীর যেমন ঝরঝরে আর সুস্থ হয়, তেমনি বোধ করচি।

তবে সে ভূতের নাচ কে দেখেছিল? সে নাচ কি তবে ভুল? খেয়েদেয়ে পরম আরামে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেচি?

তাই যদি হয়, তবে এই শেষ-রাত্রের ঠান্ডা বাতাসে যে ফুলের সুবাস পেয়েচি, তা কোথা থেকে এলো? সেই বৌটি যখন চলাফেরা করে, তখনি অমন সুবাস ছড়ায় বাতাসে। সুবাসটা ভুল হতে পারে না। এখনো সে-গন্ধ আমার নাকে লেগে রয়েচে!

কোনো অজানা বন-ফুলের সুবাস হয়তো! তাই হবে।

তেল কিনতে গিয়েচি দোকানে, দোকানী বললে—কি রকম আছো? বলি, কিছু দেখচো নাকি?

—না।

—শুনচো কিছু?

—না।

—তুমি দেখচি সাধু লোক। তুক-তাক জানো নাকি? ভূতের মন্তর?

—তেল দাও, চলে যাই। ওসব বাজে কথা।

—আচ্ছা, একটা মেয়েকে ওখানে কোনো দিন দ্যাখোনি? বৌ মত? কোনো গন্ধ পাওনি?

—কিসের গন্ধ?

—কোনো ফুলের সুগন্ধ?

—না।

—খুব বেঁচে গিয়েচ তুমি। তোমার আগে যারা ওখানে থাকতো, তারা সবাই একটি বৌকে দেখতো ওখানে প্রায়ই। এমন হোত শেষে, ও বাড়ি ছেড়ে তারা নড়তে চাইতো না। তারপর রোগা হয়ে দিন দিন শুকিয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যেতো। দুটি লোকের এই রকম হয়েচে এ পর্যন্ত। বাড়িতে ভূতের আড্ডা। ভূতে লোককে পাগল করে দেয়। তাদের কান্ডজ্ঞান থাকে না, এমন ভালো লাগে এ বাড়ি—না খেয়ে, না দেয়ে ওখানে পড়ে থাকে—ছেড়ে যেতে চায় না! তুমি দেখচি ভূতের মন্তর জানো। আমরা তো ও বাড়ির ত্রি-সীমানায় যাইনে। মাথা খারাপ করে দেয় সাধারণ মানুষের।

তেল নিয়ে চলে এলাম। ভাবতে ভাবতে এলাম, মাথা খারাপ হওয়ার সূত্রপাত আমারও হোল নাকি? বাড়ির সীমানায় পা না দিতেই আমারও মনে হোল, নাঃ, সব ভুল! পরম সুখে আছি। এ ছেড়ে কোথায় যাবো? বেশ আছি, খাসা আছি, তোফা খাসা আছি!

সেই থেকে আজ দু'বছর পড়ে আছি এ বাড়িতে। চক্কত্তি মশায় মাইনে-টাইনে কিছুই দেয় না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। বাড়ি দেখাশুনো করি, বেগুন-কলা বেচি, দিনরাত ওঁদের নৃত্য দেখি, ওঁদের মধ্যেই বাস করি—এক-পা যাইনে বাড়ি ছেড়ে।

ভৌতিক পালঙ্ক

অনেকদিন পর সতীশের সঙ্গে দেখা। বেচারা হন্তদন্ত হয়ে ভিড় ঠেলে বিকালবেলা বেণ্টিক স্ট্রীটের বাঁ দিকের ফুটপাথ দিয়ে উত্তরমুখে চলেছিল। সমস্ত আপিসের সবেমাত্র ছুটি হয়েছে। শীতকাল। আধ-অন্ধকার আধ-আলোয় পথ ছেয়ে ছিল। ক্লান্ত দেহে ছ্যাকড়া-গাড়ির মত ধীরে ধীরে পথ ভেদ করে চলেছিলাম। সহসা সতীশের জামাটা চেপে ধরে চীৎকার করে উঠলাম—আরে, সতীশ যে!

সতীশ সবিস্ময়ে আমার পানে চেয়ে বলে উঠল—খগেন! বাই গড্! আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।

বললাম—তার প্রমাণ, আমাকে ধাক্কা দিয়েই তুমি চলে গেছলে আর একটু হলে! ভাগ্যিস্ ডাকলাম!

—সরি। আমি এখন বিশেষ ব্যস্ত।

—তা তো বুঝতেই পারছি। তা কোথায় চলেছ শুনি?

—তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। বেশীদূর নয়। যাবার পথে সব বলব।

—আশ্চর্য!

—'না' বললে শুনব না। জোর করে নিয়ে যাব।

ছেলেবেলা থেকেই সতীশকে চিনি। কথা অনুযায়ী সে কাজ করে। আজ শরীরে কিছু বল থাকায়, প্রায়ক্ষেত্রে সে বলপ্রয়োগ করে স্বার্থসিদ্ধি করতে ভোলে না। অগত্যা তার সঙ্গে যেতে হোল।

তার গন্তব্যস্থান খুব নিকটেই ছিল এবং সে তার উদ্দেশ্য খুব সংক্ষেপেই ব্যক্ত করল। সেদিন সকালে খবরের কাগজে বেচা-কেনার কলমে একটি বিজ্ঞাপন ছিলঃ

"একটি অতি আধুনিক এবং রহস্যজনক চীনদেশীয়
খাট অধিক মূল্যদাতাকে বিক্রয় করা হইবে।
জগতে ইহা অদ্বিতীয়। সুযোগ হারাইলে
অনুশোচনা করিতে হইবে।

২।৩..............স্ট্রীট।"

সতীশ তার পকেট থেকে বিজ্ঞাপনটি বার করে বললে—পড়।

—বুঝলাম। তা 'রহস্যজনক' শব্দটার মানে কি?

—ঐটেই তো আমায় ভাবিয়ে তুলেচে! কোনো হদিস করে উঠতে পারছি না।

সতীশ চলছিল রাস্তার নাম দেখতে দেখতে। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল—পেয়েছি। এই গলি।

সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে সেই গলির পানে তাকিয়ে আমার সারা শরীরে—কেন জানি না—একপ্রকার শিহরণ জাগল। চীনাপল্লীর চীনা-আবহাওয়ায় রহস্যজনক খাট! সতীশের হাতটা ধরে বললাম—খাটে কাজ নেই সতীশ, চল ফিরে যাই। আমার বাঙালী-খাট বেঁচে থাকুক।

সতীশ প্রবলবেগে এক ঝাঁকানি দিয়ে উঠল—ভীতু কোথাকার! এতটা এগিয়ে এসে কখনও ফেরা যাবে না।

গলির মোড়ে ডান পাশে একটা নিমগাছ ভূতের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিকের ডাস্টবিনের মধ্যে থেকে যত সব অখাদ্য-কুখাদ্যের উৎকট গন্ধ ভেসে আসছে। অন্নপ্রাশনের ভাত যেন ঠিকরে বার হয়ে আসতে চাইল অসহ্য যন্ত্রণায়! নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কোনগতিকে পথ চলতে লাগলাম।

একটা দমকা বাতাস বিভ্রান্ত হয়ে আচমকা দক্ষিণ দিক থেকে ভেসে এসে আমাদের শরীরে যেন আছাড় খেয়ে পড়লো। মাথার উপরদিকে কয়েকটা বাদুড় ডানার শব্দ করতে করতে উড়ে গেল। দুটো অভিভাবকহীন কুকুর এই অনধিকার-প্রবেশকারীদের পানে চেয়ে বিশ্রী সুরে অভিযোগ করতে লাগল।

পথে আর জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। পাশে একটি চীনা-ডাক্তারের বহু পুরাতন সাইন-বোর্ড। তার উপরকার নরকঙ্কালের ছবিটি জীর্ণপ্রায়। কোথা থেকে একটি পিয়ানোর অস্পষ্ট সুর ভেসে আসছিল।

শীঘ্রই আমরা আমাদের নির্দিষ্ট গৃহে এসে পেঁছোলাম। অমন বাড়ি আমি আর জীবনে দেখিনি। ইট বার-করা পঙ্গুপ্রায় বহু প্রাচীনকালের সাক্ষ্য নিয়ে দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো নবাব আলিবর্দি খাঁর আমলে এই বাড়ির ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল।

ভাঙা ফটক দিয়ে অতি সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করলাম। বাড়ির ভেতরে গিয়ে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। এত লোক এখানে কোথা থেকে এল? যে নির্জন নিস্তব্ধ গলি আমরা পিছু ফেলে আসলাম, সেখানে তো কারুর ছায়া পর্যন্ত খুঁজে পাইনি! ভৌতিক কান্ড নাকি? সকলের মুখেই কৌতূহলের ছাপ বর্তমান। নানা জাতির লোক সেখানে সমবেত হয়েছিল। এতগুলি লোক, কিন্তু কারুর মুখে একটি কথা নেই। ছুঁচ পড়লে পর্যন্ত তার শব্দ শোনা যায়।

ঘন্টাখানেক পর একটি বৃদ্ধ মোটা চীনা আমাদের পথ প্রদর্শন করে নিয়ে গেল। তার মাথার একটি চুলও কাঁচা ছিল না। তার সামনের ওপরের দুটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, আর বাঁ হাতের উল্কিতে একটি ভোজালির ছবি। সে আমাদের ইশারা করে

অনেকগুলি ঘর পার করে সেই খাটের ঘরে নিয়ে গেল। বাড়িটি একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের মত—চারিদিকে গোলকধাঁধা।

হ্যাঁ, খাট বটে! অমন খাট আমি জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। খাট আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু ঠিক ঐ রকম আশ্চর্য চীনা-খাট সেই প্রথম এবং শেষ দেখলাম। তার অপূর্ব ভাস্কর্য, অপূর্ব কারুকার্য! একপাশে ভগবান বুদ্ধের ধ্যান-গম্ভীর প্রশান্ত মূর্তি। আয়তনে খাটটি বিশেষ বড় নয়। দুটি মানুষ বেশ আরামে শুতে পারে। আবার আশ্চর্য, সেই খাট বাড়িয়ে দশজনের জায়গা করা যায়! দেখে চমকে গেলাম। সকলের সঙ্গে দরকষাকষি হতে লাগল। ঐ সামান্য একটা কাঠের খাটের প্রতি সকলেরই মন আকৃষ্ট হয়েছিল। কেনবার জন্যে সকলের কি সে ব্যাকুলতা! দাম হু-হু করে বাড়তে লাগল। শেষে সতীশের ভাগ্যেই ঐ খাটটি জুটল—পনরো-শ টাকায়।

সেই খাট নিয়ে বাড়ি ফিরতে সতীশের প্রায় দশটা বাজল। যে দেখল, সেই বলল—চমৎকার!

সেখানে থেকে খাওয়া-দাওয়া করে আমি বাড়ি গেলাম। সতীশ বলল—আবার এস, নেমন্তন্ন রইল।

—তথাস্তু। বলে চলে এলাম।

আমি যাবার আগেই পরের দিন সকালে সতীশ এসে হাজির। উস্কখুস্ক চুল, মুখ শুকনো। চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল—দুর্ভাবনায় ও দুশ্চিন্তায় হয়তো সারারাত্রি ঘুম হয়নি!

আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম—আরে, ব্যাপার কি?

—বিপদ, বিষম বিপদ! সতীশের গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছিল না।

—কিসের বিপদ?

—সেই খাট!

—একটা যে কিছু হবে, তা আমি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। কেউ কখনও খাল কেটে কুমীর নিয়ে আসে? হাজার হোক, ওটা একটা রহস্যজনক খাট।

পূর্বরাত্রের ঘটনা সে সবিস্তারে বর্ণনা করে গেল। সারারাত্রি সে ঘুমোতে পারেনি। ঐ খাটের ওপর সে শুয়ে ছিল। হঠাৎ মধ্যরাত্রে তার মনে হোল, কে যেন খাটটা নাড়াচ্ছে! উঠে সুইচ টিপে আলো জেবলে দেখল, না, খাট ঠিকই আছে। আবার শুয়ে পড়ল—আর খানিক পরেই ঘুম ভেঙে গেল। কিসের একটা ভীষণ শব্দে সারা ঘরখানা যেন গমগম করছে! দেওয়ালের সঙ্গে যেন খাটখানার ভীষণ ঠোকাঠুকি হচ্ছে!

ধড়মড় করে উঠে ও আলো জবালল। না। সব কিছু নিঃশব্দ নিথর—কোথাও এতটুকু শব্দ নাই। সে আবার শুয়ে পড়ল। এবার আর সে আলো নেবাল না। ভোররাত্রে কার দুর্বোধ্য আর্তকণ্ঠের বিলাপধ্বনিতে তার চেতনা ফিরে এল। কে যেন খাটের পাশে বসে বিনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে মরছিল।

আমি বললাম—বলেছিলাম তো তোমায় প্রথমেই, ও খাট কিনে কাজ নেই। যেমন তোমার রোখ্। এইবার বোঝো।

সতীশ বলল—দেখ খগেন, তোমায় হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারব না। ঐ হতভাগ্য খাটখানার ওপর এমন মায়া লেগে গেছে যে কি বলব! আমি ওকে ছাড়তে পারব না কোন মতেই।

—তবে মর ঐ নিয়ে!

—আমি তোমার সাহায্য চাই।

—আমার সাহায্য!

—হ্যাঁ, আজ তুমি আমাদের ওখানে রাতে খাওয়া-দাওয়া করবে। সারারাত না ঘুমিয়ে ঐ খাট পাহারা দেব। দেখি, ওর গলদ কোথায়!

—আর আমার আপিস?

—পাগল, কাল যে রবিবার!

অগত্যা বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্যে সন্ধ্যাবেলা তাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

সতীশ আমার অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে ছিল। সে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল— সুস্বাগতম্! সুস্বাগতম্!

—তারপর! আর কোন গণ্ডগোল হয়নি তো?

—না, দিনের বেলা গণ্ডগোল হবার তো কোন কারণ নেই!

সতীশের মা বললেন—দেখ দেখি বাবা খগেন, এত বলছি—যা, বিক্রি করে দে, তা আমার কথা যদি ও শুনেচে!

সতীশ বলল—বলছ কি মা, ভয় পেয়ে পনরো-শ টাকার খাটটা বিক্রি করব?

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রি জাগবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে খাটের ঘরে গিয়ে বসলাম। আমার হাতে দীনেন রায়ের ডিটেকটিভ উপন্যাস, আর সতীশের হাতে "হেলথ্ অ্যান্ড হাইজিন"।

রাত্রি ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। ঠিক হোল, আগে সতীশ ঘুমুবে আর আমি জাগব। তারপর সতীশ জাগবে, আর আমি ঘুমুব।

বইখানা খুলে আমি বসে রইলাম। পড়তে পারলাম না একটি অক্ষরও, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম; চারদিকে কান খাড়া করে বসে রইলাম ভয়ে ভয়ে। এতটুকু শব্দে থেকে থেকে চমকে উঠছিলাম। ঐ বুঝি অপদেবতা আমার গলাটি দিলে টিপে!

কাদের বাড়িতে ঘড়িতে সুর করে দুটো বেজে গেল। হঠাৎ মনে হোল, কে যেন বাইরের বারান্দায় চলে বেড়াচ্ছে! তার পদশব্দ বেশ স্পষ্ট হয় উঠল। আমার সারা শরীর ডোল দিয়ে উঠল, লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল।

হঠাৎ সশব্দে খোলা জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তে বোধ হোল, আমি যেন শূন্যে উঠে গেছি. আমার জ্ঞান যেন লোপ পেয়ে গেছে। আমি মৃত না জীবিত, তাও ঘোর সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠল। আমি সভয়ে ডেকে উঠলাম—সতীশ! সতীশ!

সতীশ ধড়মড় করে উঠে বসল—ব্যাপার কি খগেন? ব্যাপার কি?

ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। সতীশ আমার দু' কাঁধে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে ডাকল—খগেন! খগেন!

আমি আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললাম—ওঃ! যা ভয় পেয়েছিলাম!

—তা তো বুঝতেই পারছি। যাক্ আর তোমায় জাগতে হবে না। তুমি ঘুমোও, আমি জেগে বসে আছি।

—না আমারও ঘুমিয়ে কাজ নেই। আর তা ছাড়া ঘুমও আমার হবে না আদৌ।

—ভীতু কোথাকার!

তারপর ভীতু আমি ও সতীশ দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে রইলাম। আমরা দু'জনেই নিঃশব্দে জেগে রইলাম। কেউই একটিও কথা কইলাম না। আমি খোলা জানলা দিয়ে বাইরের টুকরো আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। অসংখ্য তারকা মিট্‌মিট্ করে জ্বলছিল। বোধ হোল, তারা যেন আমাদের বিপদে ফিক-ফিক হাসছে! আমরা চুপটি করে বসে আছি, এমন সময়ে হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিকের আলো দপ্ করে নিবে গেল। আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম—কে?

বোধ হোল কে যেন মেন সুইচ্ বন্ধ করে দিয়েছে!

হঠাৎ এক উৎকট হাসিতে সারা ঘর ভরে উঠল। অমন হাসি আমি জীবনে কাউকে হাসতে দেখিনি। হাসি যেন আর শেষ হতে চায় না। সে কি বিকট শব্দ!—হা-হা-হা-হি-হি-হি-হো-হো-হো-হে-হে-হে...

বোধ হোল, কে যেন ঠিক দরজার কাছে হেসে খুন হচ্ছে! আমি শিউরে উঠলাম।

সতীশ চট করে টর্চটা দরজার ওপর ফেলল। তাতে হিতে বিপরীত হোল। বোধ হোল কে যেন দরজার ঠিক বিপরীত দিকে জানলাটার ধারে বসে আর্তকণ্ঠে বিনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে মরছে! তার কান্নার কোন ভাষা খুঁজে পেলাম না। কেবল একটা করুণ সুর সারা ঘরময় ঘুরে ঘুরে মরতে লাগল। তার পর সেই খাটের উপর গিয়ে সেই বিলাপ-ধ্বনি আর নড়ল না। তার কান্নায় যেন খাটটা ভিজে গেল। সেই অবোধ্য ভাষার সকরুণ বিলাপ-ধ্বনি চিত্তে এমন এক অজ্ঞাত বেদনার সঞ্চার করল, যার ফলে আমাদের সমস্ত

শক্তি যেন ক্রমে ক্রমে লোপ পেতে লাগল। মনে হোল, কে যেন ক্লোরোফর্‌ম্‌ দিয়ে আমাদের অজ্ঞান করে দিচ্ছে! আমরা যেন ধীরে ধীরে অচেতন হয়ে পড়ছি!

সতীশের সাহসটা ছিল কিছু বেশী, তাই সে খাটের উপর টর্চ ফেলে গর্জে উঠল—কে, কে ওখানে?

কিছুই দেখা গেল না, কেউ সাড়া দিল না। সহসা সেই খাটখানা ঘরময় দাপাদাপি শুরু করে দিল। মনে হোল অগণিত নরকঙ্কাল যেন তার চারিদিকে নৃত্য করচে। তাদের হাড়ের খটখট শব্দে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হোল। আমার বুকের ভেতরটা টনটন করতে লাগল কিসের যেন বেদনায়। বোধ হোল, হয়তো বুকখানা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে!

একটা একটু করে আমার জ্ঞান হারিয়ে গেল।

তারপর কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বোধ হোল, আমি যেন অনেক দূরে এক চীনাবাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছি। একটি ছোট ঘরে তখন সেই গভীর রাত্রে টিম-টিম করে একটি দীপ জ্বলছিল। ঘরের মেঝের উপর একটি লোক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রয়েচে।

একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর তার সেই রোগ-পাণ্ডুর মুখখানা দেখে আমার বড় দয়া হোল। রোগে ভুগে ভুগে বেচারা কঙ্কালসার হয়ে গেছে। তার পাশে বসেছিল—তার স্ত্রী হবে বলেই বোধ হোল—চেহারা কিন্তু তার স্বামীর চারগুণ। একটা মস্ত টুলের ওপর বসে সে ঢুলছিল।

তার পাশেই আমাদেরই এই খাটটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সাত সমুদ্র তের নদী পার করে এটাকে কে এখানে নিয়ে এল?

হঠাৎ স্ত্রীলোকটি বিকট এক হাঁ করে হাই তুলল, তারপর দুটো সশব্দ তুড়ি দিয়ে একবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখল। দেখলাম—তার স্বামী ইতিমধ্যে উঠে সেই খাটের দিকে এগিয়ে গেছে চুপি চুপি। চকিতে ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত তার স্ত্রী তাকে জোর করে খাট থেকে নামিয়ে বিছানায় ফেলে দিলে। সে ভীষণ ভাবে গর্জন করতে লাগল, আর তার স্বামী ব্যাকুলভাবে অনুনয় করতে লাগল, ঐ খাটের পানে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে! বোধ হোল, সে চায় খাটে উঠতে; কিন্তু তার স্ত্রী তাকে কিছুতেই উঠতে দেবে না।

উত্তেজনায় কাশকে কাশতে তার মুখ দিয়ে একঝলক রক্ত বেরিয়ে গেল। আমি শিউরে উঠলাম। তারপর লোকটার মাথাটা বিছানায় লুটিয়ে পড়ল, আর সে উঠল না। তার স্ত্রী তার পাশে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল।

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম—ভোরের আলোয় চারদিক ভরে গেছে। দেখলাম—সতীশের মা আমার চোখে মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন।

তিনি আমার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে বললেন—খগেন, বাবা খগেন!

আমি বললাম—আমি কোথায়?

—নীচের ঘরে।

—সতীশ কোথায়?

—সতীশের এখনও জ্ঞান হয়নি।

তারপর শুনলাম—রাত্রি চারটে নাগাদ আমরা নাকি দুজনে সদর দরজায় এসে মাটিতে পড়ে গিয়ে গোঁ গোঁ করতে থাকি। সতীশের মা বাইরে এসে এই অবস্থা দেখে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করে দেন। পাকা তিন ঘণ্টা তদারক করার পর আমাদের জ্ঞান হয়। ডাক্তার এসে বলে গেছিল—ভয়ের কোন কারণ নেই। একটা 'সাড্‌ন্‌ শক্‌' (sudden shock) আর কি! জ্ঞান হলে একটু ব্রোমাইড দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সতীশের জ্ঞান হতে সেও সেই আমারই মত অবিকল উদ্ভট স্বরে কথা বলে গেল। আমি বিস্ময়ে সকলের পানে তাকিয়ে রইলাম।

সতীশের মা বললেন—আগে ঐ সর্বনেশে খাট বিদায় কর বাবা!

খাট-বিক্রির একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হোল। পরের দিন বিকালে অসংখ্য লোকে বাড়ি ছেয়ে গেল। খাটটা বিক্রি হোল—শেষ পর্যন্ত দু'হাজার টাকায়। এক ইহুদী সেটা

কিনে নিয়ে গেল।

যাক, মাঝ থেকে কিছু লাভ হোল। বিক্রি না হলে শেষ পর্যন্ত হয়তো ওটা বিলিয়ে দিতে হোত।

এখন মাঝে মাঝে সেই রহস্যজনক খাটের কথা ভাবি। এক-একবার মনে হয় সেটা এখন কার কাছে আছে, খোঁজ করি। সেই অতৃপ্ত আত্মা—যাকে তার দুর্দান্ত স্ত্রী কোন ক্রমেই ব্যাধির ভয়ে খাটের ওপর জীবিত অবস্থায় শুতে দেয়নি; সে কি আজ তৃপ্ত হয়েছে? না, এখনও সে ঐ খাটের পিছনে প্রতি রাত্রে ঘুরে ঘুরে মরে—কাউকে ওর ওপর শুতে দেবে না বলে?

টান

গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

যাঁর মুখে আমার এ গল্প শোনা, তাঁদের পরিবারবর্গ কর্ম উপলক্ষে পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবি শহরে অনেক দিন থেকেই বাস করছিলেন, ও-দেশের নানা গল্প আমি বন্ধুটির মুখে সেদিন বসে বসে শুনেছিলাম।

সকালবেলা, পাহাড়ী পথে একা বেড়াতে বার হয়েচি, একখানা জিপগাড়ী দেখি স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসচে, আমার বন্ধু প্রণববাবু গাড়ীটি চালাচ্চেন। অনেকদিন দেখিনি প্রণববাবুকে—তিনি কবে এখানে এসেচেন, তাও জানি না।

আমাদের এদিকের বাজারে মালিয়া মোহান্তির বড় গোলদারি দোকান। তার কাছে জিগ্যেস করে জানলুম, প্রণববাবু আজ দু-মাস ধরে 'হোমসডেল' কুঠিতে বাস করচেন।

মিনিট পঁয়ত্রিশ পরে (কারণ আমাকে পায়ে হেঁটে এই পথটা যেতে হোল তো) প্রণববাবু ও আমি দু'জনে বসে গল্প করছিলাম ও চা পান করছিলাম। অনেক দিন পরে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ এবং দু-জনেই খুব খুশি হয়েছিলাম এই রকম হঠাৎ দেখা হওয়ায়।

প্রণববাবু বললেন—এখানে খেয়ে যাবেন।

—বাড়ীতে বলে আসি নি, স্নান হয় নি—

—সব ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। তা হোলে থাকবেন তো,, একটা খুব ভাল গল্প বলবো খেয়েদেয়ে ঐ বুড়ো হর্তুকিতলার ছায়ায় বসে। কেমন? ও লাখপতিয়া, এখানে এস—এই বাবুর বাড়ী গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হবে।

—এখানে কতদিন আর থাকবেন?

—বুধবারে চলে যাবো। আজ দেখা হওয়াতে বড় ভাল হোল। কতদিন দেখা হবে না আর কে জানে।

—অথচ আমরা কলকাতাতেই থাকি, ঠিকানা না জানাতেই—

—মাংস খান তো?

—খুব।

—নিষিদ্ধ পক্ষীর?

—খুব।

মধ্যাহ্ন ভোজন খুবই ভাল হোল।

এর পর আমরা সেই হর্তুকিতলায় গিয়ে বসি। সামনে পশ্চিম দিকে নদীর ওপারে শৈলশ্রেণী, ঝির-ঝির বাতাস বইচে নদীর দিক থেকে। একদল সাদা বক পাহাড়শ্রেণীকে পেছনে ফেলে মেঘের তলা দিয়ে উড়ে আসচে এদিকে।

প্রণববাবু বললেন—আপনি আমার জীবনের কথা কিছু কিছু সকালবেলা শুনেচেন। আজ একটি অসাধারণ ঘটনার কথা বলবো। এ আমার নিজের চোখে দেখা বলেই আপনার কাছে বলবার ইচ্ছেটা বড় প্রবল হয়েচে।

আপনি জানেন, আমার বাবা ও কাকা উগান্ডা রেলপথ তৈরির সময় থেকে ওদেশে ছিলেন। আমার এক কাকা বেলজিয়ান কঙ্গোতে কমলালেবুর আবাদ করেন, আমার বাবার অনেক আগে থেকে তিনি আছেন সে দেশে, তাঁর চার-পাঁচটি ছেলে big game hunter। লোহার মত শরীর, অনর্গল সোহালি ভাষা বলতে পারে, সে দেশের নেটিভদের মতই। এসব কথা গল্পের মত শোনাচ্ছে না কি? কিন্তু ঘর-ভোলা লোকের কাছে এ সব যতই গল্প বলে মনে হোক, আমরা জানি বাঙলা দেশের লোক কত দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে। আমাদের পৈতৃক বাসভূমি বলাগড়ের কাছে সিমুলিয়া। দশ বছর বয়সে আমি প্রথম নাইরোবি যাই। ভিক্টোরিয়া নয়ান্জা হ্রদের তীরবর্তী কামপালা নামক ছোট শহরে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে একজন ভদ্রলোক স্কুলমাস্টারী করতেন সে সময়—আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সময়ে তিনি বিবাহ করেন নি, ছুটি-ছাটাতে নাইরোবিতে আমাদের বাসায় এসে বসতেন। তিনি দিনকতক আমার ইংরিজি পড়াবার ভারও নিয়েছিলেন!

সে সময়ে ওদেশে জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল—মাংস, দুধ, মাখন, কপি যথেষ্ট পাওয়া যেত। সমগ্র নাইরোবিতে তিন ঘর বাঙালী পরিবার ছিল। সকলেই উগান্ডা রেলপথের কর্মচারী। আর একজন ছিল খৃষ্টান, ধর্মপ্রচার করবার কাজে কি এক মিশন কর্তৃক প্রেরিত, মাঝে মাঝে নাইরোবিতে থাকতো মাঝে মাঝে দূর পল্লী অঞ্চলে চলে যেতো।

আমি পনেরো বৎসর একাদিক্রমে নাইরোবিতে ছিলাম বাবা-মার সঙ্গে; ওখানকার জীবন খুব ভালই কেটেছিল। জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ, জিনিসপত্র ছিল সস্তা, কত নতুন স্বপ্ন তখন দেখেছি অল্প বয়সে। একবার আমার খুড়তুতো ভাই অতুল এসে বেলজিয়ান কঙ্গোর জীবনের এক অপূর্ব ছবি আমার চোখের সামনে ধরলে, সেই আমার তরুণ বয়সে। বাবাকে বললাম, কাকার কমলালেবুর আবাদে গিয়ে কাজ করবো, হাতী, সিংহ শিকার করবো, গল্পের বইয়ের নায়কের মত দুর্দান্ত এডভেঞ্চারপূর্ণ মুক্ত জীবনানন্দ আস্বাদ করবো।

আমি বললাম—তখন আপনার বয়েস কত?

—সতেরো বছর।

—লেখাপড়া?

—কামপালার সেই মাস্টার সীতানাথ বাঁড়ুয্যে ইংরিজি পড়াতেন আর স্টেশন মাস্টার ডসন সাহেবের মেমের কাছে অঙ্ক কষতাম। আমায় বড় ভালবাসতেন ডসব সাহেবের স্ত্রী। তাঁর এক ছেলে ছিল প্রায় আমার বয়সী। একটা এয়ার গান নিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতাম। শিকারের ঝোঁক ছিল আমাদের দু-জনেরই। নাইরোবির বাইরে তখন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কণ্টক ও সিমোসা গাছের বনে জেব্রা, সিংহ, জিরাফ, উটপাখীর দল বিচরণ করতো, এখনও করে। আমরা কতবার এই সব অঞ্চলে যেতাম বন্য জন্তু শিকারের জন্যে। একবার একদল সিংহের সামনে পড়েছিলাম—তার মধ্যে এক গর্ভবতী সিংহী ছিল, সে আমাদের প্রায় চোখের সামনে একটা ঝোপের আড়ালে তিন-চারটে শাবক প্রসব করেছিল। —সুতরাং লেখাপড়া সেখানে তেমন হয় নি।

—আপনি ডাক্তার হয়েছিলেন কোথায় পড়াশুনো কোরে?

—সে অনেক পরে। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ি।

—কত বছর বয়সে কলকাতায় আসেন?

—পঁচিশ বছর বয়সে।

—অত বছর বয়সে ডাক্তারি পড়লেন? পাস করেছিলেন?

—হোমিওপ্যাথিক কলেজে পড়ি, মাত্র তিন বছরের কোর্স ছিল তখন। তাতেই যথেষ্ট রোজগার করেছি বা এখনো করছি।

—ভাগ্যটা ভালো আপনার।

—আমি প্রথম প্র্যাকটিস করি ডার-এস-সালামে, তারপর মোম্বাসায়। ওখান থেকে বোম্বে। বোম্বে থেকে কলকাতায় এলাম। পয়সা যা কিছু বেশী রোজগার করি, সবই ডার-এস-সালামে। আবার ইচ্ছে ছিল, সেখানে যাই, কিন্তু সেখানে আর সুবিধে হবে না।

ম্যালান গবর্ণমেণ্টের আওতায় ও উৎসাহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েচে, তাতে ভারতবাসীদের আর সেখানে হয়তো সুবিধে হবে না। ওরাই বেশী ডাকতো।

—কারা?

—আফ্রিকানরা। ওদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করেছিল সে সময়। অনেক মেয়ে ভারতীয় স্বামী গ্রহণ করেছিল। আস্তে আস্তে উভয় সমাজে এ প্রথাটা চালু হচ্ছিল।

—এইবার আসল গল্পটা বলুন।

—বেলা গিয়েচে। বাকিটুকু অথবা আসলটুকু অতি অল্প, কিন্তু ভারি অদ্ভুত। শুনলেই তো ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে চলুন চা খাওয়া সেরে নেওয়া যাক।

চা খাওয়া হলো খুব ভাল। ও-বেলাও যাতে আমি থাকি, সেজন্যে প্রণববাবু ও তাঁর স্ত্রী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।—এবেলা নাকি ভালো করে খাওয়ানো হোল না।—আমার খাওয়ার নাকি খুবই কষ্ট হোল।

সন্ধ্যার পর আধ-জ্যোৎস্না আধ-অন্ধকারের মধ্যে প্রণববাবু আবার গল্প শুরু করলেন সেই হর্তুকিতলায় বসে।

এইবার যে কথাটা বলবো, সেটা ভালো করে বুঝতে হোলে আমার মামার বাড়ীর ইতিহাস আপনার কিছু জানা দরকার। আমার দাদামশায় গোবিন্দ ঘোষাল সিপাই বিদ্রোহের সময় ফয়জাবাদ মিলিটারি একাউণ্টেণ্টে কাজ করতেন। তাঁর দুই বিবাহ, আমার দিদিমাকে তিনি বিবাহ করেন যখন, তখন তাঁর বড় ছেলের বয়েস ত্রিশ বছর। আমার মা তাঁর শেষ বয়সের সন্তান; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমার সে দিদিমা সধবা অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। আমার মাকে মানুষ করে বামা বলে এক পুরোনো ঝি, আমার মামার বাড়ীর। আমার দাদামশায় তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে হুগলী জেলায় নিজের গ্রামে এসে বসেচেন।

বামা মাকে ঠিক নিজের সন্তানের মত মানুষ করেছিল। বাইরে কোথাও গেলে সন্ধ্যার পর পিছু-পিছু যেতো, মার বড় বয়সেও।

বামা কোথাও যেতো না, নিজের দেশ বর্ধমান জেলার যে ক্ষুদ্র গ্রামটিতে তার পৈতৃক ভিটে, মার ভার নেওয়ার পর থেকে সে কখনো আর সে গ্রামেও পদার্পণ করে নি।

আমার মা যখন বিয়ের কনে সেজে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন—বামা তখন মার সঙ্গে এ বাড়ী চলে আসে এবং মাঝে মাঝে দেশে চলে গেলেও প্রায়ই তার এই জামাই-বাড়ী এসেই থাকতো।

মা বলতেন—এখানেই থাক না কেন বামা?

সে বলতো—না খেঁদি (মার ডাকনাম), জামাই-বাড়ী কি থাকতে আছে? লজ্জার কথা।

সে কিন্তু মাকে ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারতো না—কিছু দিন পর-পর প্রায়ই আসতো। আসবার সময়, মা যা খেতে ভালবাসতেন ছেলেবেলায়—নারকোল নাড়ু, চিঁড়ে, কলা, এই সব যোগাড় করে নিয়ে আসতো। শুধু হাতে কখনো আসে নি!

বামা কিন্তু মারা যায় আমার মামার বাড়ীতেই, হঠাৎ কি একটা অসুখ হয়ে। মার সঙ্গে দেখা হয় নি। মার সেজন্যে খুব দুঃখ হয়েছিল। আমাদের কাছে পর্যন্ত বামার নাম করতেন আর চোখের জল ফেলতেন।

আমি বললাম—আপনি বামাকে দেখেছিলেন?

—না, আমার দাদা দেখেছিলেন, তখন দাদার ছ-সাত বছর বয়েস।

—তারপর?

—তারপর কর্ম উপলক্ষে বাবা মা উগাণ্ডা চলে গেলেন এবং সে দেশেই বাস করতে লাগলেন। আমরাও গেলাম, ক্রমে বড় হলাম সে দেশে। বাবার চাকরির উন্নতি হোল। আমার এক বোনের বিয়ে হোল মোম্বাসায়, সেখানে হুগলী জেলার বন্দীপুরের রামতারণ

চক্রবর্তী শিপিং কোম্পানীর অফিসে চাকরি করতেন, তাঁর বড় ছেলে শিবনাথ আমার ভগ্নীপতি।

পরের বৎসর আমার মা মারা গেলেন।

আমার বোনের বিয়ের আগে থেকেই তিনি হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন, একদিন সন্ধ্যার পর আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বললেন শরীরটা কেমন করচে।

তারপর ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন, ডাক্তার আসবার আগেই মারা গেলেন।

এইবার আসল কথাটা এসে গিয়েছে।

মা তো মারা গেলেন সন্ধ্যার সময়। অনেক রাতে লোকজন যোগাড় হোল। যে কটি বাঙালী পরিবার নাইরোবিতে সে সময় থাকতো, তাদের সকলের বাড়ী থেকেই মেয়েরা ও পুরুষেরা এলেন সে রাত্রে আমাদের বাড়ী খবর পেয়ে। রাত এগারোটার পর আমরা শ্মশানে মৃতদেহ নিয়ে গেলাম।

নাইরোবির বাইরে শহর থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় নদীর ধারে শ্মশান। স্থানটা বড় নির্জন ও ঘাসের জঙ্গলে ভরা। রাত্রে এ সব স্থানে সিংহের ভয় ছিল খুব বেশী। সিংহের উপদ্রবে রাতে কেউ বড় একটা মড়া নিয়ে যেতে সাহস করতো না শ্মশানে। আমাদের সঙ্গে অনেক লোক ছিল। আলো জেবলে ও বন্দুক নিয়ে আমাদের দল মৃতদেহ বহন করে শ্মশানে নিয়ে গেল।

মৃতদেহ চিতায় চড়ানো হয়েচে, দাদা মুখাগ্নি করলেন, আমরা সবাই চিতার অদূরে বসে আছি। এমন সময় আমার ছোট ভাই দেবু আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ঐ দেখো, ও কে দাদা!

আমি চেয়ে দেখলাম। শ্মশানের দক্ষিণ দিকে একটা গাছতলায় একজন ভারতীয় বৃদ্ধা মহিলা চুপ করে বসে একদৃষ্টে চিতার দিকে চেয়ে আছে। পরণে তার আধময়লা থান কাপড়।

বাবা সেদিকে চেয়ে বলে উঠলেন—সর্বনাশ! ও যে বামা ঝি।

দাদা বললেন—হ্যাঁ বাবা, বামা দিদিমার মত দেখতে বটে।

বাবা বললেন—তোর মনে আছে?

—একটু একটু মনে পড়ে বাবা।

আমরা সবাই অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম। সত্যি, এই গভীর রাতে এই দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল শ্মশানভূমিতে কোন বাঙালীর মেয়ে আসবার কথা কেউ কল্পনা করতে পারে না। আমরা কেউ তাকে চিনিও না। কেবল চেনেন বাবা এবং সামান্য কিছু চেনে দাদা। তাদের সাক্ষ্য সেখানে সেদিন গভীর এক তত্ত্বের অবতারণা করলে। কোথায় বা চিতা, কার বা মৃতদেহ, মৃত্যুই বা কার?

বৃক্ষতলে উপবিষ্টা নারীমূর্তি কিন্তু আমাদের দিকে লক্ষ্য করে নি। সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, উদাসীনভাবে একদৃষ্টে জ্বলন্ত চিতার দিকে চেয়ে বসে ছিল। এখনো সে ছবি আমি দেখচি যেন চোখের সামনে। চিরকাল আঁকা থাকবে সে ছবি আমার মনের পটে।

হুগলী জেলার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে মৃত্যুজয়ী স্নেহের টানে আজ বিশ বছর পরে বামা ঝি চলে এল পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবির শ্মশানভূমিতে।

বেশিক্ষণ আমরা দেখতে পাই নি। সবসুদ্ধ বোধ হয় মিনিট পাঁচ-ছয় হবে বামা ঝিকে আমরা দেখতে পেয়েছিলুম সবাই মিলে। তার পরই মিলিয়ে গেল সে মূর্তি।

আমরা বেশী কিছু কথা বলি নি এর পর। দাহকার্য শেষ করতে সকাল হয়ে গেল। নদীতে স্নান করে আমরা বাড়ী ফিরে এলুম তখন বেলা সাতটা সাড়ে সাতটা। ওই নদীর তীরেই আমার মার দর্শাপিণ্ড দেওয়া হয় এর দশ দিন পরে এবং মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন রেল অফিসের অবিনাশ গাঙ্গুলী, নাইরোবির বাঙালীদের বাড়ীর মোটামুটি বিয়ে, পৈতে, ষষ্ঠীপুজো তিনিই করতেন। তাঁর নামই ছিল আমাদের মধ্যে 'পুরুতকাকা'।

নদীর ওপারে শৈলশ্রেণী সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল।

ছায়াছবি

এক বন্ধুর মুখে এ গল্প শোনা।

আমার বন্ধুটি অনেক দেশ বেড়িয়েচেন, লোক হিসেবে অমায়িক, রসিক ও শিক্ষিত। কলকাতাতেই থাকেন।

যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন গল্পে গল্পে অনেক সময় সারারাত কেটে যায়।

প্রকৃতপক্ষে ঠিক মনের মত লোক পাওয়া বড় দুষ্কর। অনেক কষ্টে একজন হয়তো মেলে। অধিকাংশ লোকের সঙ্গে যে আমাদের আলাপ হয়, সে সম্পূর্ণ মৌখিক। তাদের সঙ্গে আমাদের হয়তো ব্যক্তিগত অভ্যাসে, চরিত্রে, মতে, ধর্মবিশ্বাসে, বিদ্যায় যথেষ্ট তফাত। কিন্তু একই আফিসে কি কলেজে কি কোর্টে একসঙ্গে কাজ করতে হয়, দু-বেলা দেখা হয়—দাদা কিংবা মামা বলে সম্বোধন করতে হয়, কৌটাস্থ পানের খিলির বিনিময়ও হয়তো হয়ে থাকে—কিন্তু ওই পর্যন্ত। মন সায় দিয়ে বলে না তার সঙ্গে দুবেলা দেখা হোলে গল্প করে বাঁচি। কোনো নিরালা বাদলার দিনে আফিসের হরিপদ-দার সঙ্গ খুব কাম্য বলে মনে হবে না।

আমার বন্ধুর নাম—থাক গে, নামের দরকারই বা কি? আবার লোকে তাঁকে বিরক্ত করবে। কৌতূহলী লোকের সংখ্যা সর্বত্রই বেশি। কোনো কাজ নেই—গিয়ে আনন্দ করবে আর বকবক বকাবে। তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী। হাতে পয়সা এবং কলকাতায় বাড়ী আছে। বাড়ীর গ্যারেজে মোটর গাড়ী থাকবার অন্য কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু আমার বন্ধু আড়ম্বর ও বিলাসিতা পছন্দ করেন না।

ভূমিকা এই পর্যন্ত।

সেদিন খুব বর্ষার দিন। একা বাড়ী বসে বসে ভালো লাগলো না। একখানা ট্রেন ধরে কলকাতায় পেঁাছুলাম। ভীষণ বর্ষায় ট্রাম বন্ধ। বাস ক্বচিৎ দু-একখানা চলচে। জল ভেঙে হেঁটে বন্ধুর বাড়ী গিয়ে পেঁাছুলাম।

বন্ধু আমায় দেখে অত্যন্ত খুশি হোলেন বলাই বাহুল্য। তখনই গরম চা ও খাবারের ব্যবস্থা হোল। পরস্পরের কুশল-জিজ্ঞাসার ভদ্রতা বাদ গেল না। তাঁর বৈঠকখানার গদিআঁটা আরাম কেদারায় ততক্ষণ বেশ হাত-পা এলিয়ে বসে পড়েছি।

সন্ধ্যার পরে আবার সজোরে বৃষ্টি নামলো। বেশি ঠান্ডাবোধ হওয়াতে পাখা বন্ধ করতে হোল।

বন্ধুর আতিথেয়তা আমার সুপরিচিত। তিনি বললেন—ঘরে স্টোভ আছে, চলুন দোতলার ঘরে। এই বৃষ্টিতে আর কেউ আসবে না। খিচুড়ি চড়িয়ে দিই। ডিম আছে, আলু আছে—

—চমৎকার।

—মাছ দেখতে পাঠাবো রঘুয়াকে?

—কোনো দরকার নেই। আমাদের ওতেই হয়ে যাবে।

—চলুন ওপরের ঘরে। রাতে এখানে খাবেন এবং থাকবেন।

—নইলে আর যাচ্ছি কোথায়?

—যেতে চাইলেও যেতে দেওয়া হবে না।

ওপরের বসবার ঘরটিতে বন্ধুর লাইব্রেরী। দেওয়ালের গায়ে সারি দেওয়া কাঁচের আলমারি, সাধারণতঃ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বইয়ে ভর্তি। দেওয়ালে বড়-বড় অয়েল পেন্টিং—প্রতিকৃতি নয়—সবই ল্যান্ডস্কেপ। ভাল চিত্রকরের হিমালয় অঞ্চলের দৃশ্য। আমার বন্ধু হিমালয়কে অত্যন্ত ভালবাসেন। হিমালয় অঞ্চলের ভৌগোলিক তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে। অনেকদিন রাত্রে হিমালয় ভ্রমণের নানা মনোরম গল্পে রাত্রি কখন কেটে

গিয়েচে, টেরও পাই নি।

ওপরের ঘরে যখন গিয়ে বসলুম, তখন টেবিলের ওপর একখানা ছবিওয়ালা বই খোলা পড়ে আছে। বন্ধু হাতে নিয়ে বললেন—এখানা দেখেচেন? হিমালয়ান জর্নাল। সোয়েন হেদিনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বেরিয়েচে।

—কোথাকার?

—কাশ্মীর।

—এমন শৌখীন স্থানে সোয়েন হেদিন বেড়াতেন বলে তো জানতাম না! কোথায় তাক্‌লা মাকান্‌, কোথায় কারাকোরম—এ সব দূর দুর্গম স্থান ছাড়া তিনি—

—না। চমৎকার দৃশ্যের বর্ণনা করেচেন এ লেখাটায়, দেখবেন।

—দেখবার চোখ ছিল ভদ্রলোকের—যা সকলের থাকে না।

—একশো বার সত্যি।

তারপর আমাদের গল্প আরম্ভ হোল প্রধানতঃ কাশ্মীর নিয়েই। কাশ্মীর আমার বন্ধুটির জীবনের একটি তীর্থক্ষেত্র—অনেকবার তিনি ক্লান্ত নাগরিকের মন ও চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে দেশ-বিদেশে ভ্রমণে বেরুতেন আমি জানি। কাশ্মীরেও গিয়েচেন অনেকবার। কাশ্মীরের কথায় সাধারণতঃ তিনি পঞ্চমুখ হয়ে পড়েন। এবার কিন্তু একটা নতুন বিষয় নিয়ে তিনি কথা পাড়লেন। সেটা হোল তাঁর একটি অতি প্রাকৃত অভিজ্ঞতা, যেটা কাশ্মীরের পথেই ঘটেছিল।

বন্ধু বললেনঃ

সেবার পুজোর পরে আমার বাল্য-সুহৃদ রতিকান্ত মৈত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে তারই মোটরে দু'জনে কাশ্মীর যাত্রা করা গেল। রতিকান্ত প্রতিবৎসর নিজের মোটর নিয়ে গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে কোথাও না কোথাও যাবে। এবার আমারই কথায় সে কাশ্মীর রওনা হোল। পথের আনন্দ ও কষ্ট ভোগ করতে করতে আমরা দিল্লী গিয়ে পৌঁছুলাম। সেখানে দিন দুই বিশ্রাম করে আমরা আবার মোটর ছাড়লুম।

বাকি পথটুকু বেশ কাটলো। সে বর্ণনা বিস্তৃতভাবে করবার কোনো আবশ্যক দেখি না।

কোহালায় পৌঁছুলাম দিল্লী থেকে রওনা হবার তিন দিন পরে সন্ধ্যার দিকে। মোটর থামিয়ে কোহালার বাজারে একটি চায়ের দোকানে চা পান করতে বসলাম দু-জনে। গাড়ীতে রইল ক্লিনার রামদীন ও ভৃত্য নাথু বাগ। শেষোক্ত ব্যক্তির নামটি অবাঙালীর মত শোনালেও প্রকৃতপক্ষে ওর বাড়ী মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় এবং সে বাঙলা ছাড়া অন্য প্রদেশের ভাষা জানে না।

চা পানের সময় দোকানদারকে আমাদের রাত্রির জন্যে একটু বিশ্রামস্থানের সন্ধান দিতে বললাম। সে দু-একটা সন্ধান দিলে। বড় পরিশ্রান্ত ছিলাম সেদিনটা। রাত্রিটাতে একটু ভাল ঘুমের দরকার। নাথুকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে (কারণ তার দ্বারা এ বিষয়ে কোনো সাহায্যই পাওয়া সম্ভব নয়) রামদীন ক্লিনারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বাসার সন্ধানে বার হই।

রতিকান্ত বললে—গাড়ীর একটা আস্তানাও তো খুঁজতে হবে?

আমি বললাম—খুঁজে পেলে ভাল হয়। বাইরে বেজায় ঠান্ডা। নাথু তো শীতে জমে যাবে গাড়ীতে থাকলে বাইরে।

—রামদীন বরং পারে।

রামদীন বললে—হামারা ওয়াস্তে কোই পরোয়া নেহি হুজুর—

কিন্তু বাসা কোথাও পাওয়া গেল না। কোহালা বড় জায়গা নয়। বাজারের সরাই-গুলো পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ভিড়ে পরিপূর্ণ। একখানা দোকানের পেছনদিকে একটা ঘর আছে বটে, দোকানদার দেখালে।—কিন্তু সে ঘর এত অপরিষ্কার ও আলোবাতাস-হীন যে, সে ঘরে রাত্রি কাটানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া সে ঘরে বিশ্রাম করতে গেলে মোটর বাইরে পড়ে থাকে। রামদীন মুখে বলেছে বলেই তাকে হিমবর্ষী রাত্রে বাইরে শুইয়ে

রাখা যায় না।

রতিকান্ত বললে—উপায়?,

আমি এর আর কি উপায় বলবো!

পরামর্শ করা গেল সেই চায়ের দোকানীর কাছে আবার যেতে হবে। তাকে গিয়ে এমনভাবে ধরা হোল যেন এই পার্বত্য দেশে সে-ই আমাদের একমাত্র রক্ষক ও অভিভাবক। তারই মুখ চেয়ে আমরা বাড়ী থেকে এই দু-হাজার মাইল রাস্তা অতিক্রম করে এসেচি।

দোকানদার লোক ভালো। সে বলে দিলে বাজারের পেছন দিয়ে যে পথটা ছোট্ট পাহাড়টা ডিঙিয়ে চলে গেল, ওরই ওপারে এক বৃদ্ধ জাঠের বাড়ী। সে বাড়ীতে অনেক সময় লোকজনদের আশ্রয় দেয়।

আমরা দু'জনে দোকানদারের কথামত সেখানে গেলাম।

বাড়ীখানা কাঠের দোতলা। দেখে মনে হয়, এক সময়ে বাড়ীর মালিকের অবস্থা ভালই ছিল।

আমাদের ডাকাডাকিতে একজন বৃদ্ধ দাড়িওয়ালা লম্বা সুপুরুষ ব্যক্তি দোর খুলে রুক্ষস্বরে জিগ্যেস করলে—কিস লিয়ে হল্লা মচাতে হো? কৌন হ্যায় তুম্ লোক?

আমরা বিনীতভাবে আমাদের আসবার কারণ ব্যক্ত করলাম। আমরা নিরীহ পথিক, কোনো গোলমাল করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বৃদ্ধ বললে—কোথা থেকে আসচ তোমরা?

অবশ্য হিন্দীতেই বলেছিল কথা।

আমরা বললাম কলকাতা থেকে।

—ঘরভাড়া আমি দিই না।

—মেহেরবানি করে একটু জায়গা দিতেই হবে।

—কে বললে এখানে জায়গা আছে?

—বাজারে শুনলাম।

—আমি ঘরভাড়া দিই না।

—ভাড়া না দেন, একটু আশ্রয় দিন।

বৃদ্ধ একটুখানি কি ভেবে বললে—কজন লোক?

—চার জন। তবে একজন মোটরে শুয়ে থাকবে বাজারে।

—একখানা ঘরের বেশি দিতে পারবো না।

—তাই আমরা কৃতজ্ঞতার সংগে গ্রহণ করবো।

—আমরা বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করলাম লোকটি আমাদের নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগলো। বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক আছে বলে আমাদের মনে হোল না। সিঁড়ির বাম দিকের কোণের ঘরে সে আমাদের নিয়ে গিয়ে বললে—এই ঘরটা আমি দিতে পারি। আর ঘর নেই। কারপেটখানা পেতে নেবেন। বাইরের টবে জল আছে। গরম জল দিতে পারব না—কিন্তু—বলেই লোকটা চুপ করে গেল।

আমাদের ভয় হোল পাছে সে আবার মত বদলায়।

আমরা উভয়েই জোর করে বললাম—আপনার খুব মেহেরবানি। চমৎকার ঘরটি।

—জিনিসপত্র কোথায়?

—মোটরেই আছে। আরও দু-জন লোক মোটরে আছে। তদের একজনকে নিয়ে আসি।

—কি খাবেন রাত্রে? এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা হবে না।

—কোন দরকার নেই। আমরা দোকান থেকে আনিয়ে নেবো। চলুন, আমরাও নিচে যাই। বাজারে যাবো।

আধ ঘণ্টা পরে আমরা আবার এসে ঘরে বিছানাপত্র পেতে নিলাম। রামদীন মোটরেই রইলো। রতিকান্ত অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল। তারই অনুরোধে আমি আলো নিবিয়ে দিয়ে ওর শোবার ব্যবস্থা করে দিলাম, তারপর আমি নিজে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম।

বাজারের রাস্তা সামনের ছোট পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে যে উপত্যকায় নেমেছে, তারই

এপারে এই ছোট্ট দোতলা কাঠের বাড়ীটি। অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠেচে, সামনের নিম্নভূমি অর্থাৎ উপত্যকায় বেঁটে ওক, চেনার ও সরল গাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার কি অপূর্ব শোভা। বাতাস বেশ শীতল। আমার যেন চোখে ঘুম আসচে না, এই সুন্দর বনাবৃত উপত্যকার শান্ত কুটিরখানি সারারাত্রি জেগে ভোগ করি এই যেন আমার মনের গূঢ় বাণী। কিন্তু শরীর মানলো না। পথক্লান্ত দেহ এলিয়ে পড়তে চাইছিল শয্যায়। অগত্যা শয্যা আশ্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি জেগে উঠে বিছানার ওপরে বসলাম। কি একটা শব্দ যেন আমি ঘুমের ঘোরে শুনেছি, তাতেই ঘুম ভেঙেচে। শব্দটা তখনও হচ্চে, আমি বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ গিয়ে পড়লো নিম্নের উপত্যকার বনভূমির দিকে। এমন একটি দৃশ্য আমার চোখে পড়ল যাতে আমি পাথরের পুতুলের মত আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। চাঁদ হেলে পড়েচে পশ্চিম আকাশে, তারই সুস্পষ্ট আলোতে দেখি একটি নারীমূর্তি আমার সামনের কি একটা বড় গাছের ডালে দোল্না বেঁধে দোল খাচ্ছে।

ভাল করে চেয়ে দেখলাম। হ্যাঁ নারীই বটে, সুন্দরী নারী। বাইশ-তেইশের মধ্যে বয়স।

কিন্তু মেয়েটির দোল খাওয়ার স্থান—বিশেষ করে সময়, আমার কাছে বড় আশ্চর্য বলে মনে হোল। কাশ্মীরের দিকে কখনো আসি নি। এখানকার মেয়েরা এই হিমবর্ষী রাত্রের শেষ প্রহরে বনে এমন ভাবে দোলনা টাঙিয়ে দোল খায় নাকি?...

দৃশ্যটা যদি শুধু সুন্দর হোতো—সুন্দর সন্দেহ নেই—তাহলে আমি এমন অস্বস্তি বোধ করবো কেন? আমার যেন মনে হোল এই দৃশ্যের মধ্যে একটি জিনিস আছে—যা অশিব, যা নিয়মের বিপরীত, যা অমানুষী!—

তাড়াতাড়ি রতিকান্তকে ডাকলুম। সেও যখন বাইরে এল, তখনও মেয়েটি দোল খাচ্ছে।

রতিকান্তকে বললাম—ও কে ভাই?

সে অবাক হয়ে গিয়েছে। চোখ রগড়ে বললে—তাই তো!

—এখানকার মেয়েরা ওরকম করে নাকি?

—তা কি জানি?

হঠাৎ রতিকান্ত বলে উঠলো—ওকি! দোল্নায় দড়ি কই? গাছে টাঙিয়েচে কি দিয়ে? ভাল করে চেয়ে দেখলাম, সত্যিই তো দোলনার দড়ি অস্পষ্ট এত যে চন্দ্রালোকে দেখা যাচ্ছে না। সরু তার হোলেও দেখা যাবে এ আলোতে। কিন্তু তার বা দড়ি কিচ্ছু নেই—শূন্যে ঝুলচে দোল্না! আরও একটা ব্যাপার যা এতক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম—আমাদের দিকে অল্প দূরেই গাছটার তলায় এ ব্যাপার ঘটচে, অথচ কোন রকম শব্দ আমাদের কানে আসচে না। সবসুদ্ধু মিলিয়ে যেন একটা ছবি।

রতিকান্ত বললে—ভাই, বাড়ীওয়ালাকে ডাকবো?

—ডাকো।

—আবার এরই কেউ না হয়—তাহোলে হয়তো চটে যাবে।

—তুমি ডাকো। যা হয় হবে।

কথা বলতে বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়েই পড়েছিলাম দুজনে বোধ হয় কয়েক সেকেন্ড। পরক্ষণেই সামনের দিকে চেয়ে দেখি কোথায় সেই দোদুল্যমানা তরুণী নারীমূর্তি! কিছুই নেই সে গাছের তলায়। ওই তো সেই বাঁকা ডালটা, জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠচে গাছটার শুভ্র কাণ্ড; পাশের বেঁটে ওক গাছটা তেমনি দেখা যাচ্চে—কিন্তু কেউ কোথাও নেই, গাছের তলা একদম ফাঁকা।

রতিকান্ত বললে—ওকি কোথায় গেল?

—তাই তো!

—আশে-পাশে নেই তো?

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কেউ পালাতে পারে না—আমাদের দু'জনের চোখ এড়িয়ে এই জ্যোৎস্নালোকিত উপত্যকা থেকে। যাবার আর কোনো রাস্তা নেই, বাজারে যাবার ওই সংগে পায়ে চলার পড় ছাড়া। পেছনে উঁচু পাহাড়টা। বনের নিচে আগাছার জঙ্গল নেই বাংলাদেশের মত—বেশ পরিষ্কার তলা দেখা যাচ্চে জ্যোৎস্নায়। সম্ভব নয়, কোথাও লুকানো বা পালানো আমাদের চোখ এড়িয়ে—এত অল্প সময়ের মধ্যে।

রতিকান্ত বললে—ব্যাপার কি?

—তাই তো আমিও ভাবচি!

—এ দেখচি একেবারে ম্যাজিক—

—সেই রকমই মনে হচ্চে!

—কি করা যাবে এখন?

—শোয়া ও ঘুমুনো।

রাত বড় বেশি ছিল না। ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে উঠে রতিকান্ত ও আমি দেখি নাথুর তখনও নাক ডাকচে। ওকে উঠিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বলে আমরা আবার এসে বারান্দায় দাঁড়ালুম। ওই সেই গাছটা, ওই সেই বাঁকা ডালটা। সত্যি সত্যি কাল শেষ রাতের দিকে আমরা দু'জনে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখেচি কিন্তু আমাদের নিজেদের কাছেই মনে হচে ওটা আসলে ঘটে নি, হয়তো রাত্রির স্বপ্ন।

স্বপ্ন? কি জানি?

দাড়িওয়ালা বৃদ্ধের নিকট বিদায় নিয়ে আমরা মোটরের পাশে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের দোকানী বন্ধু চেরা সরল কাঠের ডাল উনুনে দিয়ে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করচে। আমাদের দেখে বললে—কি, জব্বর ঘুম হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—কোনো বিপদ-আপদ ঘটে নি তো?

আমি যেন দোকানীর কথার সুরে ও দৃষ্টিতে একটি প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন লক্ষ্য করলুম।

আমরা চা দিতে বলে ওর দোকানের সামনে জাঁকিয়ে বসে রাত্রের ঘটনা সবিস্তারে ওকে বর্ণনা করলাম।

দোকানী ঘাড় নেড়ে হেসে বললে—জানি বাবুজি। এই জন্যেই ও বাড়ীর সন্ধান আপনাদের দিতে ইতস্ততঃ করছিলাম। ওই বনে জ্যোৎস্নারাতে কত লোক ও মেয়েটিকে দুলতে দেখেচে। ও মানুষ নয় জিন, আফরিট্, হুরী—

বলে হাত নেড়ে যেন সব জিনিসটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললে—আপনারা আজই কোহালা ছেড়ে চলে যান। আমি জানি যারা ওই খুবসুরত জিন হুরীর মোহে পড়ে ওই কাঠের ঘর ভাড়া নিয়ে দিনের পর দিন থেকে গিয়েচে—শেষকালে তাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে। একবার একটি আত্মহত্যাও ঘটেছিল। বেশিদিন থাকলেই বিপদে পড়ে যাবেন। বাড়ীওয়ালা বুড়ো ওই জন্যেই আজকাল বাড়ীভাড়া দিতে চায় না।

আমরা বললাম—তোমরা তো স্থানীয় লোক, তোমরা দেখতে পাও?

—রোজ কি জিন, আফরিট্দের নজরে পড়ে? দু-মাস হয়তো কিছুই না, একদিন হয়ে গেল। কানুন কিছু নেই। তবে কানুনের মধ্যে এই চাঁদনি রাত হওয়া চাই আর রাতের শেষ প্রহর চাই। এখানকার লোকেরা সাঁঝ জ্বালার পর ও-পথে বড় একটা যাতায়াত করে না।......

—হ্যাঁ, এক রুপেয়া সাড়ে সাত আনা হুজুর। আদাব হুজুর।

কবিরাজের বিপদ

চন্দ্রনাথবাবু কবিরাজ এবং শিশির সেন তরুণ ডাক্তার। রামদাসের ছোট্ট বাজার পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। রোগীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা বেশি! তবে দেশটায় রোগ-বালাই নিতান্ত কমও নয়, তাই সবাই দু-মুঠো ভাতের যোগাড় করতে পারতো কোনোরকমে। চন্দ্রনাথবাবুর বয়েস পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন, শিশির সেনের বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ। ওদের ডাক্তারখানা রাস্তার এপার-ওপার। রোগী-পত্তর প্রায়ই থাকে না, দু'জনে বসে গল্প-সল্প করে। বয়সের তারতম্য যতই থাকুক, দু'জনে খুব বন্ধুত্ব। চন্দ্রনাথবাবু এসেচেন খুলনা জেলার হলদিবুনিয়া থেকে আর শিশিরবাবু যশোর শহর থেকে।

কাজকর্ম না থাকলে যা হয়ে থাকে, দু'জনে বসলেই তর্ক আর দ্বন্দ্ব। তর্কের বিষয়-বস্তু প্রধানতঃ মানুষের মৃত্যুর পর কি হয়, এই নিয়ে।

চন্দ্রনাথবাবু বলেন—তাঁদের গ্রামের একজন সাধু ছিলেন, তিনি ভূত নামাতে পারতেন। অনেকবার তিনি ভূতনামানো-চক্রে উপস্থিত ছিলেন, নিজের চোখে ভূতের আবির্ভাব দেখেচেন, ভূতের কথা শুনেচেন নিজের কানে। সাধুটি একজন বড় মিডিয়ম, তাঁর মধ্যে নাকি ভূতের দল পৃথিবীতে নিজেদের প্রকাশ করে!

শিশির সেন বলেন—রাবিশ!

চন্দ্রনাথবাবু বলেন—তোমার বলবার কোনো অধিকারই নেই এখানে! তুমি ছেলে-মানুষ, কতটুকু তোমার অভিজ্ঞতা?

—অভিজ্ঞতার কোনো দরকার হয় না, কমন-সেন্সের প্রশ্ন এটা।

—কাকে বলচো কমন-সেন্স?

—মানুষ মরে গেলে আর বেঁচে থাকে না, কমন-সেন্স। মরা মানেই না-বাঁচা।

—মরা মানে বৃহত্তর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করা।

—মরা মানেই না-বাঁচা।

—মরা মানে জীনটা বড় করে পাওয়া।

—একদম বাজে।

—দু-পাতা সায়েন্স পড়ে ভাবচো খুব সায়েন্স শিখে ফেলেচো? আসল সায়েন্সের কিছুই জানো না, শেখো নি।

বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ। এ বছরের মত এমন গরম এখানকার বৃদ্ধ লোকেরাও সেখানে কোনোদিন দেখে নি।

শিশির সেন বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় এসে ডাক্তারখানা খুললেন। নাঃ, টিনের বারান্দা তেতে আগুন হয়েচে, এখনো ঘরের ভেতর বসা সম্ভব নয়।

সামনের পানের দোকানীকে বললেন—রাস্তাটাতে একটু জল ছিটিয়ে দিও অভয়—এখুনি লরী গেলে ধুলোয় চারিদিক অন্ধকার করে দেবে।

—ও কোবরেজ-মশায়!

—কি?

—বাইরে আসুন না!

—যাই।

—কতক্ষণ এলেন?

—আমি আজ বাসায় যাই নি—দুপুরে এখানেই শুয়েছিলাম।

—খেলেন কোথায়?

—রামজীবন তরফদা'রর স্ত্রীর শ্রাদ্ধ গেল আজ কিনা। নেমন্তন্ন ছিল।

—হুঁ। আসুন আমার বারান্দায়, চা খাবেন?

—ন' মশায়। এই গরমে চা? দুপুরে লুচি ঠেসে?

—দালদা ঘি-এর তো?

—নইলে আর কোথায় পাচ্চে গাওয়া ঘি?

—না মশাই, ও নেমন্তন্ন না খেয়ে ভালোই করেচি। খেলে অম্বল, না হয় পেটের অসুখ। আর এই গরমে!

চন্দ্রনাথবাবু ডাক্তার সেনের বারান্দায় এসে বসলেন এবং চাও খেলেন। পরে যথারীতি ভূতের গল্প শুরু হয়ে গেল।

চন্দ্রনাথবাবুর মধ্যে একটি সমরপটু আত্মা বাস করে, অবিশ্বাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করেই তাঁর তৃপ্তি। শিশির সেন ভূতে বিশ্বাস করুক, না করুক, তাতে চন্দ্রনাথ কবিরাজের কি? জিনিসটা যদি সত্যিই হয়, তবে শিশির সেনের অবিশ্বাস সেটার কি হানি করতে পারে?

চন্দ্রনাথবাবু সেটা বোঝেন না যে এমন নয়, বোঝেন সবই। তবু যদি একজন অবিশ্বাসীকেও একদিন আলোতে এনে হাজির করা যায়! ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের দিগ্বিজয়ী প্রচারকদের আশা যেন তাঁর মধ্যে এসে বাসা বেঁধেচে। সত্যের আলোতে এসব অসৎ মূর্খ ছেলে-ছোকরাদের আনতেই হবে, তবেই প্রকৃত শাস্তি দেওয়া হবে এই দাম্ভিক-দের। স্বার্থবাদী ছোকরা দাম্ভিকের দল। দু-পাতা সায়েন্স পড়ে সব শিখে ফেলেচে।

চন্দ্রনাথবাবু জানতেন না শিশির সেনের মত ছোকরা তাঁর সম্বন্ধে কি মনে করে। ওরা আড়ালে মুখ টিপে হেসে বলে—বুড়ো একদম সেকেলে। কুসংস্কারে ভরা। ইংরাজি তো তেমন জানে না। কবরেজি করতো, সংস্কৃত জানে একটু-আধটু। দৃষ্টিভঙ্গি একে বারে ঊনবিংশ শতাব্দীর। কি করি, মেশবার কোনো লোক নেই এসব জায়গায়। কার সঙ্গে দুটো কথা বলি? নইলে ওই বুড়ো হাবড়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার? রামঃ!

একটু পরে হঠাৎ পশ্চিম দিগন্তে অন্ধকার করে একখানা বড় কালো মেঘ উঠলো এবং কিছুক্ষণ পরে কালবৈশাখীর ঝড় শুরু হয়ে গেল। চন্দ্রনাথ কবিরাজ নিজের কবরেজ-খানার জানলা দরজা বন্ধ করতে ছুটে গেলেন। ধুলোয় চারিদিক অন্ধকার হয়ে উঠলো, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু হলো বটে কিন্তু বৃষ্টি বেশি না হয়ে ঝড়টাই হলো বেশি।

ডাক্তারখানার সামনের অশথ-গাছের একটা ডাল ভেঙে উড়ে এসে পড়লো শিশির সেনের ডাক্তারখানার দরজার সামনে। বৃষ্টি-ভেজা সোঁদা মাটির গন্ধ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস ঠাণ্ডা—গরম একদম কমে এল।

চন্দ্রনাথ বললেন—আঃ বাঁচা গেল! শরীর জুড়িয়ে গেল যেন! কতদিন পরে একটু বৃষ্টি পড়লো আজ মাটিতে।

—চা খাবেন একটু?

—তা হলে মন্দ হয় না। আনাও আর একটু।

এই সময় বৃষ্টিটা বেশ জোরেই এল। বর্ষাকালের বৃষ্টির মত।

চন্দ্রনাথ কবিরাজের কবরেজখানার ঘরের চালের ছাঁচ বেয়ে অবিরল ধারে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। রাস্তায় জল জমে উঠলো আধ-ঘণ্টার ভেতর।

—বেশ বৃষ্টি হলো, মুষলধারে না হোলেও এ বছরের পক্ষে মন্দ নয়। চন্দ্রনাথবাবু বললেন—কই তোমার চা কোথায় গেল হে?

—নবীন তো গিয়েচে, বৃষ্টিতে আটকে পড়লো রামুর দোকানে। ছাতি আছে আপনার?

—নাঃ।

—তবে আর কি হবে? বসুন, জল ছেড়ে যাক।

—আপনার ভূতুড়ে আলোচনা আরম্ভ করুন না!

—নাঃ।

—কেন, আজ এত বিরাগ কেন? আজই বরং ঠাণ্ডা বাদলায় সন্ধেতে এ-কথা জমবে ভালো।

—না হে, তোমরা অবিশ্বাস কর হাসাহাসি কর, গভীর সত্যকে এভাবে বেনা-বনে ছড়াতে নেই।

—আপনার কথার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হতে হচ্চে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে। গভীর

সত্য কাকে বলচেন আপনি?

—মানুষের জীবন ও মৃত্যু অদ্ভুত রহস্যময়। গভীর রহস্য দিয়ে ঘেরা আমাদের এই জীবন। মানুষ মরে না। ভগবান অনন্ত করুণার আকর। এই হলো গভীর সত্য। আরো সংক্ষেপে শুনতে চাও? মানুষ অমর।

শিশির সেন হেসে বলে উঠলেন—তবে আপনি কবরেজি করেন কেন? মানুষ যদি অমর তবে?

—তার এই দেহটা অমর নয়, তাই কবিরাজি করি। আর এতদিন পরে কথাটা বলি, কবিরাজি করতে গিয়েই এই সত্যটা টেরও পেয়েচি।

—কি ভাবে?

এই সময় নবীন চাকর ভিজতে-ভিজতে চা নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখলে।

শিশির সেন বললেন—বিস্কুট কই রে? আনিস নি? যা নিয়ে আয় চারখানা।

—আসুন! দুটো সিগারেট নিয়ে আয় অমনি। এইবার বলুন কি ভাবে?

চন্দ্রনাথ কবিরাজ চা খেতে খেতে গম্ভীর মুখে বললেন—নাঃ ও সব নিয়ে ঠাট্টা নয়। বাদ দাও।

—না না, রাগ করবেন না। কি করে সত্যটা টের পেলেন কবরেজি করতে গিয়ে বলুন না?—বেশ বাদলার সন্ধ্যেটা—

—না, আমি বলবো না। ঠাট্টার ব্যাপার নয় সেটা। তোমরা হাসবে আর আমি ভেবেচ আমার জীবনের অত বড় একটা অভিজ্ঞতা—

—আমি কবে আপনাকে ঠাট্টা করেচি এ নিয়ে? সত্যি বলুন!

চন্দ্রনাথ কবিরাজের মনটা যেন একটু নরম হয়ে এল। তিনি চা খেতে-খেতে শুরু করলেন নিম্নের গল্পটি।

—আমি নিজে যা দেখেছি তা অবিশ্বাস করি কি করে? ঘটনাটা গোড়া থেকে বলি। পাকিস্তানে আমার বাড়ী ছিল খুলনা জেলার হলদিবুনিয়া গ্রামে। আমার বাবার নাম ছিল ৺ত্রিপুরাচরণ শাস্ত্রী, সেকালের বড় নামডাকওয়ালা কবিরাজ ছিলেন তিনি।

বাবা বড় কবিরাজ ছিলেন, তাঁর পসার পেলাম আমি। বাবা তখনো বেঁচেই আছেন, তবে কাজকর্ম করেন না। ইদানীং পক্ষাঘাত রোগে এক দিকের অঙ্গ অচল হয়ে গিয়ে শয্যাগত ছিলেন একেবারে। নাম-করা সেকেলে কবিরাজের ছেলে হিসেবে বড় বড় বাঁধা ঘর ছিল, যারা অসুখ-বিসুখে আমাকে ছাড়া আর কোনো চিকিৎসককে ডাকতো না।

মালমাজীর পাকড়াশী জমিদার ছিলেন এমন একটি বাঁধা ঘর। সেবার কার্তিক মাসের শেষে জমিদার হরিচরণ পাকড়াশী ডেকে পাঠালেন—তাঁর ছেলের অসুখ।

আমি গিয়ে দেখলাম ছেলেটির বিষম জ্বর, যাকে আপনারা বলেন টাইফয়েড। পনেরো-ষোল বছর বয়েসটা ও রোগের পক্ষে তত সুবিধাজনক নয়। আমাকে জমিদার বাবু হাতে ধরে অনুরোধ করে বললেন—আপনাকে এখানে থাকতে হবে কবিরাজ মশায়, যা লাগে আমি তাই আপনাকে দেবো। ছেলেকে বাঁচিয়ে দিন।

আমি রোগীর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। পেট-ফাঁপা, বুকে সর্দি-কাশি, নাড়ির গতি আপনারা যাকে বলেন ইণ্টারমিটেণ্ট, ভুল বকা—সব খারাপ লক্ষণই বর্তমান। বাঁচানো বড়ই কঠিন।

ভগবান ধন্বন্তরীকে স্মরণ করে কাজে লেগে গেলাম। সেদিন সন্ধ্যার পর নাড়ির অবস্থাটা ভালো করে আনলাম। পেট-ফাঁপাও অনেকটা কমে গেল। ভুল বকুনি খানিকটা কমলো। আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করতে গেলাম রাত্রি এক প্রহরের পর!

পাকড়াশী জমিদারদের বাড়ী দো-মহলা। বাইরে একদিকে দোলমঞ্চ, নাটমন্দির আর গোবিন্দ-মন্দির। ডাইনে সদর-কাছারি আর মহাফেজখানা। মহাফেজখানার দক্ষিণে আমলাদের থাকবার কুটুরি সারি-সারি অনেকগুলি। আমলাদের বাসার পূর্বদিক বড় পুকুর। এই পুকুরের তিন দিকে বাঁধানো ঘাট। পূব পাড়ের ঘাট বাইরের লোকদের জন্যে, বাকি দুটি ঘাট আমলাদের জন্যে।

বাইরের মহলের মাঝখানে সদর দেউড়ি, এই দেউড়ির দু-পাশে দুই বৈঠকখানা।

আমার বাসা নির্দিষ্ট হয়েছিল বাঁদিকের বৈঠকখানার পাশের বড় কুঠুরিতে।

সাদা ধবধবে চাদর পাতা, দুটো বড় তাকিয়া, মশারি খাটানো, চমৎকার বিছনো করে দিয়ে গিয়েচে বাড়ীর ঝি। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমি বাইরে বসে অনেকক্ষণ রোগীর বিষয় চিন্তা করলাম, কাল সকালে কি কি অনুপান দরকার হবে, সেগুলো মনে মনে ঠিক করে রাখলাম। তারপর এসে শুয়ে পড়তে যাবো, এমন সময়ে দেখি জ্যোৎস্নালোকিত মাঠ দিয়ে কে একজন সাদা কাপড় পরা স্ত্রীলোক এদিকে আসচে।

রাত তখন অনেক। এত রাতে একা কে মেয়ে এদিকে আসচে বুঝতে পারলাম না। মেয়েটি এসে দেউড়ি দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আবার সে বার হয়ে মাঠের দিকে চলে গেল। আমি ভাবলাম, আমলাদের বাড়ী থেকে যদি কোনো স্ত্রীলোক রোগীকে দেখতে আসে, তবে এত রাত্রে আসবে কেন? একাই বা আসবে কেন? ...ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো দেউড়িতে।

এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে আমার ডাক এলো—রোগীর অবস্থা খারাপ, শীগগির যেন যাই।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম রোগীর শয্যার পাশে।

সত্যি রোগীর অবস্থা এত খারাপ হলো কি করে? দেড় ঘণ্টা আগেও দেখে গিয়েচি রোগী বেশ আরামে ঘুমুচ্চে, এখন তার জ্বর হঠাৎ বড্ড নেমে গিয়েচে, অথচ চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল, নাড়ির অবস্থা খারাপ। জ্বর এত কম দেখে ঘাবড়ে গেলাম। বেজায় ঘামতে শুরু করেচে রোগী। মস্ত বড় সংকটজনক অবস্থার মুখে এসে পড়লো কেন এভাবে হঠাৎ?

তক্ষুনি কাজে লেগে যাই। আমিও ত্রিপুরা কবিরাজের ছেলে, উপযুক্ত গুরুর শিষ্য; দমবার পাত্র নই।

ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে রোগীকে চাঙ্গা করে তুলে শেষরাত্রে ক্লান্ত দেহে বাইরের ঘরে বিশ্রাম করতে গেলাম।

এক ঘুমে একেবারে বেলা আটটা। উঠে রোগী দেখে এলাম, বেশ অবস্থা, কোনো খারাপ উপসর্গ নেই।

সারাদিন এক ভাবেই কাটলো। রোগীর অবস্থা দেখে বাড়ীর সকলে খুব খুশি। আমার সারাদিনের মধ্যে বিশেষ কোনো খাটুনি নেই। দুপুরবেলা খুব ঘুম দিলাম। বিকেলে—এমন কি বড় পুকুরে মাছ ধরতে গেলাম আমলাদের মধ্যে একজন ভালো বর্শেলের সঙ্গে। সেরখানেক একটা পোনা মাছও ধরলাম। মনে খুব ফুর্তি।

সেদিন রাত্রে বাইরের ঘরে শুয়ে আছি, এমন সময়ে দেখি দূরে মাঠের দিক থেকে যেন সেই স্ত্রীলোকটি এদিকে আসচে!

আজ সারাদিনের মধ্যে মেয়েটির কথা একবারও আমার মনে হয় নি। এখন আবার তাকে আসতে দেখে ভাবলাম ইনি নিশ্চয় এদের কোনো আত্মীয় হবেন, দূর গ্রাম থেকে দেখতে আসেন ঘরের কাজকর্ম সেরে। কিন্তু একা আসেন কেন?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কাল এই মেয়েটি রোগীকে দেখে চলে যাবার পরেই রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল।

মেয়েটি দেউড়ি দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো দেখে আমার বুকের মধ্যেটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো কেন কি জানি! কান খাড়া করে রইলাম বাড়ীর দিকে।

আরামে ঘুমুতে যাচ্ছিলাম কিন্তু বিছানা ছেড়ে চেয়ারে বসলাম। ঘড়িতে ঠিক সে সময় বারোটা বাজলো।

হঠাৎ দরজার কাছে কি শব্দ হলো! মুখ তুলে দেখি, সেই স্ত্রীলোকটি একেবারে আমার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েচেন।

বেশ সুন্দরী, ধপধপে শাড়ী-পরা, চল্লিশের মধ্যে বয়েস, কপালে সিঁদুর।

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুবার আগেই তিনি আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে

হুকুমের সুরে বলতে আরম্ভ করলেন—শোনো, তুমি এই ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না, তুমি বাড়ী যাও।

আমার মুখ দিয়ে অতি কষ্টে বেরুলো—কেন মা? আপনি কে?

আমার শরীর যেন কেমন ঝিমঝিম করে উঠলো! সমস্ত ঘরটা যেন ঘুরচে। কেন এমন হলো হঠাৎ কি জানি!

তিনি এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে বললেন—শোনো, আগুন নিয়ে খেলা কোরো না। একে আমি নিয়ে যাবো। এ আমার ছেলে। ওর বাবা আবার বিয়ে করেচেন আমার মৃত্যুর পর। সৎমা ওকে দেখতে পারে না। বহু অপমান হেনস্থা করে। আমি সব দেখতে পাই। আমার স্বামী অনেক কথা জানেন না, কিন্তু আমি সব জানি। আমি আমার ছেলেকে নিশ্চয় নিয়ে যাবো। কাল রাত্রেই নিয়ে যেতাম, তোমার জন্য পারি নি। তুমি চলে যাও এখান থেকে। ওকে বাঁচাতে পারবে না।

আমার সাহস ফিরে এল।

হাত জোড় করে বললাম—মা, আমি বৈদ্য। আমার ধর্ম প্রাণ বাঁচানো। আমার ধর্ম থেকে আমি বিচ্যুতি হবো না কখনোই। আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার। একটা প্রস্তাব আমি করি মা! জমিদারবাবুকে সব খুলে বলি। অসুখ সারবার পরে তিনি ছেলেকে যাতে কোনো ভালো স্কুলের বোর্ডিং-এ রেখে দ্যান, এ ব্যবস্থা আমি করবো। এ যাত্রা আপনি ওকে নিয়ে যাবেন না। যদি আবার ওর ওপর অত্যাচার হতে দ্যাখেন, তখন নিয়ে যাবেন আর আমিও আসবো না। দয়া করুন জমিদারবাবুকে। তিনি বড় ভালবাসেন এই ছেলেকে।

তিনি বললেন—বেশ তাই হবে। তবে যদি কোনো ভালো ব্যবস্থা না হয়, তবে এবার আমি ওকে নিয়ে যাবোই, মনে থাকে যেন।

তখনই যেন সে মূর্তি মিলিয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে আমার ডাক এল অন্দর থেকে, রোগীর অবস্থা খারাপ।

আমি তখনি ছুটে গেলাম। কাল যেমন অবস্থা ছিল, আজও ঠিক তাই। বরং একটু বেশি খারাপ। ভোর পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হোলো রোগীকে চাঙগা করতে।

সকালবেলা বাইরে যাওয়ার আগে জমিদারবাবুকে আমি নিভৃতে ডেকে বললাম—কিছু মনে করবেন না জমিদারবাবু, আপনি এই ছেলেটিকে বাঁচাতে চান তো?

জমিদারবাবু অবাক হয়ে বললেন—তার মানে?

তার মানে হচ্চে এই। আপনি জানেন না ওই ছেলেটির ওপর ওর সৎমা বড় অবিচার করেন। কাল ওর মা আমার কাছে এসেছিলেন—শুনুন তবে।

সব কথা খুলে বললাম। জমিদারবাবু প্রথমটা অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেললেন।

পরে বললেন—আমি কিছু কিছু জানি। বেশ এবার ও বেঁচে উঠুক, এর ব্যবস্থা আমি করবো, আপনাকে আমি কথা দিলাম। ও সেরে উঠুক, জানুয়ারি মাস থেকে যশোর জেলা-স্কুলের বোর্ডিং-এ ওকে আমি রাখবো।

—কেমন ঠিক তো? এবার কিছু হলে আমি নেই, কেউ আর ওকে বাঁচাতে পারবে না।

—আমি কথা দিচ্চি কবরেজ মশাই।

—বেশ। নির্ভয়ে থাকুন, আপনার ছেলে সেরে গিয়েচে। আগামী মঙ্গলবার ওকে পথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। আপনি পুরনো চাল কিছু এর মধ্যে যোগাড় করুন।

—পরের দিন জ্বর ছেড়ে গেলো রোগীর।

শিশির সেন একমনে গল্প শুনছিলেন।

বললেন—সেরে উঠলো!

—নিশ্চয়।

—আর কোনোদিন দেখেছিলেন তার মাকে?

—কোনোদিন না। সে ছেলে এখন কলকাতায় থাকে, কিসের ভাল ব্যবসা করে শুনেচি। জমিদারবাবু মারা গিয়েচেন। চললুম আমি, বৃষ্টি থেমেচে—ঘরে আলো

জবালি গে।

চন্দ্রনাথ কবিরাজ উঠে গেলেন।

রহস্য

আমার বন্ধুর মুখে শোনা এ গল্প। বন্ধুটি বর্তমানে কলকাতার কোন কলেজের প্রফেসার। বেশ বুদ্ধিমান, বিশেষ কোনরকম অনুভূতির ধার ধারেন না, উগ্র বৈষয়িকতা না থাকলেও জীবনকে উপভোগ করার আগ্রহ আছে, সে কৌশলও জানা আছে।

সেদিন রাত্রে ঝম-ঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। নানারকম গল্প হচ্ছিল গরম চা ও আনুষঙ্গিক খাদ্যের সঙ্গে মজিয়ে। অবিশ্যি ভূতের গল্পই হচ্ছিল। আমার বন্ধু একটা গল্প বললেন, আশ্চর্য লাগল গল্পটা। একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপক যখন এই গল্পটা করলেন তখন এর একটা মূল্য আছে ভেবেই এই গল্পটা বলছি। তাঁর নিজের কথাতেই বলি—

সেবার আমি বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছি, অনার্স পরীক্ষা হয়ে যাবার পরে দিন চার-পাঁচ ছুটি পাওয়া গেল। কিসের ছুটি তা আমার এতকাল পরে মনে নেই। ভবতারণ ঘোষাল বলে আমার এক বন্ধু ছিল, ওর বাড়ি ছিল বেলঘরেতে। ভবতারণ ক্লাসে খুব পান খেত, ক্লাসের বাইরে ঘন ঘন সিগারেট খেত, অশ্লীল কথাবার্তা বলত, লম্বা লম্বা কথা বলত, চালবাজির অন্ত ছিল না। তার আমার সঙ্গে খুব বনত, এইজন্যে যে আমি নিজেও একজন দস্তুরমত চালবাজ ছেলে ছিলাম তখন। এখন সেসব কথা ভাবলে হাসি পায়। তারপর যা বলছিলাম।

অনার্স পরীক্ষা শেষ হবার দিন ভবতারণ আমায় টেনে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে। যাবার সময় ট্রেনে গেলুম। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা হাঁটতে হল, কারণ ওদের বাড়িটা প্রায় গঙ্গার ধারের কাছে। কিছুক্ষণ ওর বাড়ি থেকে হঠাৎ কি একটা বিষয়ে ঘোর তর্কাতর্কি হল, ওর আর আমার মধ্যে। এমন চরমে উঠল সে তর্ক যে দুজনের মধ্যে হাতাহাতি হবার উপক্রম। হায় রে সে সব দিন! এই রোদ এই মেঘ—তখনকার জীবনে তাই ছিল স্বাভাবিক।

যাই হোক, আমি ভয়ানক রেগে ওদের বাড়ি থেকে সেই সন্ধ্যাবেলাই বেরিয়ে পড়লুম। এমন জায়গায় ভদ্রলোকের থাকতে আছে?

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড বেয়ে হন্-হন্ করে হাঁটছি কলকাতা-মুখে। দিব্যি ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত। মাঝে মাঝে এক-আধখানা মোটর দ্রুতবেগে চলেছে কলকাতার দিকে। সম্পূর্ণ নির্জন রাস্তা, একবার একটা মাতাল কুলি ছাড়া আর কোন লোকের দেখা পাইনি।

হঠাৎ আমার মনে হল এতটা রাস্তা একটানা হাঁটতে পারব না, একটু বিশ্রাম দরকার। ডাইনে বাঁয়ে চাইতে চাইতে কিছুদূর গিয়ে একটা বাগান বাড়ি দেখে তার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বাইরে থেকেই আমার মনে হয়েছিল এ বাগান-বাড়িতে লোকজন কেউ থাকে না, আছে হয়ত একটা-আধটা উড়ে মালী, তাকে দু-চারটি পয়সা দিলে বাগানের মধ্যে বসে একটু বিশ্রাম করতে দেবে এখন। নিশ্চয় একটা পুকুর আছে বাগানে, নিশ্চয় তার ঘাট বাঁধানো। এমন গ্রীষ্মের দিনে জ্যোৎস্না রাত্রে পুকুরের বাঁধা ঘাটে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার আনন্দ অনেক দিন পরে হয়ত কপালে জুটে যাবে।

বাগানের মধ্যে ঢুকে মনে হল এ বাগানে লোকজন কেউ বাস করে না। ঘন ঘন কেউ আসেও না। লাল কাঁকরের পথগুলোর ওপরে এক হাত লম্বা উলু ঘাস, ফুলের খেত আর আগাছার জঙ্গলে ভর্তি। আরও একটু অগ্রসর হয়ে মনে হল এ বাগান-বাড়ি খুব বড়লোকের, অন্তত যে সময়ে এ বাগান-বাড়ি তৈরি হয়েছিল সে সময়ে মালিকের অবস্থা ছিল খুব ভাল। সৌখীন রুচির পরিচয় আছে এর প্রত্যেকটি গাছপালায়, প্রত্যেকখানি ইঁটে, পাথরে। আগাছাভরা ফুলের ক্ষেতের মাঝে মাঝে এখানে ওখানে পাথরের অপ্সরী

মূর্তি। দু-একটার হাত ভাঙা নাক ভাঙা, অনেক এমন অপ্সরী মূর্তি আছে বাগানের এদিকে ওদিকে। কোনটার পিঠ দেখা যাচ্ছে, কোনটার মুখ—ঝোপের আড়ালে আড়ালে। একটু দূরে গিয়ে বাঁদিকের চওড়া পথ ধরলাম, পুকুরে গিয়ে পথটা শেষ হয়েছে। তবে, যে ধরনের পুকুর আশা করেছিলাম এ তা নয়। অনেক কালের পুরোনো পুকুর, বাঁধা ঘাট এক সময় ছিল। এখন তার মাঝামাঝি প্রকাণ্ড বড় ফাটল ধরেছে, রানার দু-পাশে বট অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে, সে ঘাটে নামাও যায় না সিঁড়ির সাহায্যে। এ রাত্রে তো সাপের ভয়ে সেদিকে যেতেই আমার সাহস হল না।

ঘাটের থেকে কিছু দূরে একখানা বেঞ্চি পাতা, ক্লান্ত শরীরে বেঞ্চির ওপরে শুতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না। আমার তন্দ্রা যখন ছুটে গেল, তখন অনেক রাত। সামনের দিকে চাইতেই একটা অদ্ভুত সন্দেহ হল আমার মনে।

আমার বেঞ্চিখানা থেকে কিছু দূরে যে অপ্সরী মূর্তি আমার দিকে পাশ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটার দিকেই ঘুম ভেঙে আমার চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এতক্ষণ সে মূর্তিটা অন্য কি কাজ করছিল বা অন্যদিকে অন্যভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে জাগতে দেখেই সেটা চট্ করে যেন নিজেকে সামলে নিয়ে আবার পূর্ববৎ ভঙ্গিতে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি অবাক হয়ে সোজা হয়ে বসলাম, চোখ মুছলাম ভাল করে। ঘুমের ঘোরে? কিন্তু তা বলে তো মনে হল না! আমি ঘুম ভেঙে স্পষ্টই দেখেছি, ও পুতুলটা কি একটা করতে যাচ্ছিল, আমার সাড়া পেয়ে সামলে নিয়েছে।

সমস্ত শরীর যেন অবশ, ভারি। ঘুমের ঘোর ভাল কাটে নি। রাস্তা হাঁটবার ইচ্ছে নেই মোটে। আবার সেই বেঞ্চিখানাতেই শুয়ে পড়লাম। শোয়া-মাত্র আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম আসবার পূর্বে পর্যন্ত কিন্তু একটা কৌতূহল আমার মনে বার বার উঁকি দিয়েছে। পুতুলটা কী করতে যাচ্ছিল? আমায় ঘুম ভেঙে উঠতে দেখে কী করতে করতে ও সামলে গেল?

অনেক রাতের ঠাণ্ডা ফিরফিরে হাওয়ায় আমি গাঢ় ঘুমেই অচেতন হয়ে পড়েছিলাম। আবার যখন ঘুম ভাঙল, তখন চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশের গাছপালার পেছনে। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। তবে পশ্চিম দিক থেকে লম্বা লম্বা গাছের ছায়া পড়েছে ফুলের ক্ষেতে আগাছার জঙ্গলে।

ঘুম ভেঙে উঠেই আমার মনে হল আমি প্রথম যখন এ বাগানে ঢুকি তখন বাগানে যা ছিল, এখন তা নেই। কোথায় কি একটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে বাগানের। ঘুমের ঘোর যতই ভাঙতে লাগল আমার মনে এ ধারণা ততই বদ্ধমূল হতে লাগল। আগে যা ছিল তা এখন যেন নেই। কী একটা বদলে গিয়েছে। অথচ কি সেটা বুঝতে পারছিনে। কী বদলে গেল কোথায়? হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সামনে। চোখ ভাল করে মুছলাম। পরিবর্তন ওখানেই হয়েছে যেন। আগে যা ছিল, এখন তা নেই।

কিন্তু কী পরিবর্তন? কী বদলে গেল? এক মিনিট কি দেড় মিনিট কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে বিদ্যুতের স্রোতের মত বয়ে গিয়ে আমাকে সম্পূর্ণ আড়ষ্ট ও অবশ করে দিয়ে আসল সত্যটি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

ঐ উচ্চ বেদিটার ওপর বসানো সে অপ্সরী পুতুলটা কোথায় গেল? বেদিকা খালি পড়ে আছে। পুতুলটা নেই।

প্রথমটা যেন বিশ্বাস হল না। সত্যি কি ওখানে অপ্সরী মূর্তিটা ছিল? অন্য জায়গায় ছিল হয়ত। আমি ভুল দেখেছিলাম। তা কি কখনো হয়? পাথরের অত বড় পুতুলটা গভীর রাত্রে কে নিয়ে যাবে? আমারই ভুল।

কিন্তু এই অপ্সরী মূর্তিই তো অন্য দিকে চেয়ে কি একটা করতে যাচ্ছিল, আমি ঘুম ভেঙে দেখেছিলাম। এই বেদিটার ওপরেই সেই পুতুলটা ছিল। না থাকলে আমি এই বেঞ্চিতে শুয়ে দেখলাম কী করে? বেশ মনে আছে, প্রথম এই বেঞ্চিতে শুয়ে পুতুলটা প্রথম আমার চোখে পড়েছিল। আমার দিকে ওর পাশ ফেরানো ছিল। এও ভাবলাম আমার মনে আছে, এ ধরনের পুতুল কি ইটালি থেকে আসে? না, এ দেশে তৈরী হয়?

এত সব একেবারে ভুল হয়ে যাবে? কিন্তু তা যদি না হয়, তবে সে অপ্সরী মূর্তিই বা যাবে কোথায়? এত রাত্রে কে উঠিয়ে নিয়ে গেল মূর্তিটা? চোরে নিয়ে গেল?

তাই যদি হয়, এতকাল এ বাগান অরক্ষিত ভাবে পড়ে আছে, এতদিন কেউ চুরি করলে না, আর একজন জলজ্যান্ত মানুষ শুয়ে আছে সামনের বেঞ্চিতে, আজই চোর এসে এত বড় ভারি মূর্তিটা চুরি করে নিয়ে যাবে?

না। তাও সম্ভব বলে মনে হয় না।

কেন জানি না, আমার কেমন ভয় হল। গা ছম-ছম করতে লাগল। রাত আর বেশি নেই। এ বাগানে আর শুয়ে থাকার দরকার নেই। আস্তে আস্তে কলকাতা-মুখো হাঁটা দি।

যেমন এ কথা মনে আসা, অমনি আমি বেঞ্চি থেকে উঠে পড়লাম। পুকুরের ঘাটে নেমে চোখে মুখে জল দিয়ে নেব বলে ঘাটের দিকে যাচ্ছি, এমন সময় আবার অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাঁধা ঘাটের ঠিক ওপরেই আমলকি-তলায় যে স্ট্যাচুটা ছিল, সেটাই বা কই? সেটার হাত ভাঙা ছিল বলে আরও বেশি করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঐ তো তার শূন্য বেদীটা পড়ে আছে।

মনে কেমন সন্দেহ হল। বাগানের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলুম। কত পুতুল ছিল এখানে ওখানে। বনের ঝোপের মধ্যে, আড়ালে আড়ালে। সাদা পাথরের পুতুলগুলো ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ঝক-ঝক করছিল। এখানে তেমনি সাদা জ্যোৎস্না বাগানের সর্বত্র, কিন্তু কই সে অপ্সরী পুতুলগুলো? একটাও তো নেই!

এক রাত্রে কি বাগানের সব পুতুল চুরি গেল? এই রাত্রিটার জন্যেই কি চোরেরা ওত পেতে বসে ছিল?

আশ্চর্য! বোকার মত চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। এতক্ষণে বুঝলাম, ঘুম ভেঙে উঠে যে ভাবছিলাম বাগানের কোথায় কি পরিবর্তন হয়েছে, সে হল এই পরিবর্তন। বাগানময় এই মস্ত পরিবর্তনটা সাধিত হয়েছে আমার ঘুমের মধ্যে।

ততক্ষণে পায়ে পায়ে আমি গিয়ে পুকুরের বাঁধা ঘাটের ওপরটাতে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ পুকুরের জলের দিকে চাইতে আমার কেমন যেন হয়ে গেল। সারা শরীর ডোল দিয়ে উঠল ভয়ে, বিস্ময়ে।

বাগানের সব অপ্সরী পুতুলগুলো জলে নেমে সাঁতার দিচ্ছে, দিব্যি সাঁতার দিচ্ছে, এপার ওপার যাচ্ছে—কিন্তু একটা জিনিস আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সেগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। আড়ষ্টভাবেই, পুতুল রূপেই সাঁতার দিচ্ছে!

এইখানে আমাদের মধ্যে বন্ধুকে কে প্রশ্ন করলে—আপনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন?

অধ্যাপক বন্ধুটি আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—অনেক দিনের কথা হয়ে গেল বটে, কিন্তু আমি আজও ভুলি নি সে রাত্রের কথা। সে দৃশ্য আজও দেখছি চোখের সামনে। মাঝে মাঝে যেন দেখি। বিশ্বাস করা না করা অবিশ্যি আপনাদের ইচ্ছে। আমি কাউকে বলিও নে বিশ্বাস করতে।

আমি বললাম—সিদ্ধি খেয়েছিলেন বন্ধুর বাড়ি বেলঘরেতে? বা—

—আমি ওসব ছুঁতাম না তখন, এখনও তাই। বিশ্বাস করুন এ কথাটা—

সকলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিলাম। আমরা বললাম—তারপর? বন্ধু বলতে আরম্ভ করলেন আবারঃ

তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে। আমার মনে হল আমি পাগল হয়ে গিয়েছি, কিংবা আমার কোন শক্ত রোগ হয়েছে। যা দেখছি এসব কী? বেশ মনে আছে পশ্চিম দিকের পাঁচিলের গায়ে একটা তাল কি নারকেল গাছ ছিল। চাঁদ তখন গাছটার ঝাঁকড়া মাথার ঠিক আড়ালে। সে ছবিটা বেশ মনে আছে আমার। আবার তখনই চোখ নামিয়ে পুকুরের দিকে চাইলাম—সেখানে সেই অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অস্বাভাবিক দৃশ্য! সব সাদা সাদা বড় মর্মর মূর্তিগুলো জীবন্তের মত জলকেলি করছে পুকুরের জলে। আমার মাথা ঘুরে গেল যেন। নিজের ওপর কেমন একটা অবিশ্বাস

হল। সেখান থেকে মারলাম টেনে ছুট—একেবারে সোজা দৌড় দিয়ে ফটকের কাছে এসে যখন পেঁাছেছি তখন আমার মনে হল—অবিশ্যি হলপ করে বলতে পারব না সত্যি কি না—তবে আমার মনে হল, যেন অনেকগুলো মেয়ে খিল খিল করে একযোগে হেসে উঠল। হাসির একটি ঢেউ যেন আমার কানে এসে পেঁাছল। পরক্ষণেই আমি একেবারে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপরে এসে পড়লাম।

এবার আপনারা যে প্রশ্ন করবেন তা আমি জানি। সেখানে আর আমি গিয়েছিলাম কিনা? পরদিনই গিয়েছিলাম, একা নয়, তিনটি বন্ধু সঙ্গে করে। গিয়ে দেখলাম, পুরনো ভাঙা বাগানবাড়ি। আগাছার জঙ্গলে ভরা ফুলের ক্ষেত। কতকগুলো হাত-ভাঙা নাক-ভাঙা অপ্সরী পুতুল এদিকে ওদিকে বনে-জঙ্গলের আড়ালে পাথরের বেদীর ওপরে দাঁড় করানো। কোথাও কোনদিকে অস্বাভাবিকতার কোন চিহ্ন নেই।

হঠাৎ আমার এক বন্ধু আমাকে ডাক দিলে। ঘাটের ওপরে আমলকিতলায় যে হাত-ভাঙা পুতুলটা দাঁড়িয়ে আছে, একটা মোটা বিছুটিলতা মাটি থেকে গজিয়ে উঠে সেটার দুখানা পা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে—অন্তত এক বছরের পুরনো লতা। গত বর্ষায় এ বিছুটিলতা গজিয়ে উঠেছিল এমনও মনে হয়।

লতাটার কোথাও ছেঁড়া নেই, ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেল।

অথচ আমি হলপ করে বলতে পারি এ পুতুলটাও কাল জলে নেমেছিল, অন্তত এ বেদিকা আমি কাল খালি দেখেছি। এই ঘাটের ধারেই তো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম।

বন্ধুরা বললেন—তাহলে বিছুটিলতাটা এমন থাকে কী করে? এই জড়ানো তো এক বছরের জড়ানো। রাতারাতি গাছটা গজায়নি!

ওদের যুক্তি অকাট্য।

কী উত্তর দেব ওদের?? আমার নিজেরই যখন ক্রমশ অবিশ্বাস হচ্ছে আমার নিজের ওপর!

অশরীরী

নানারকম অদ্ভুত গল্প হচ্ছিল সেদিন আমাদের লিচুতলার আড্ডায়। কিন্তু সে সব নিতান্ত পানশে গোছের ভূতের গল্প। পাড়াগাঁয়ের বাঁশবাগানের আমবাগানের গেঁয়ো ভূত। সাদা কাপড় পরে রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকে—ওসব অনেক শোনা আছে। ওর বেশি আর কেউ কিছু বলতে পারলে না।

এমন সময় শরৎ চক্রবর্তী আড্ডায় ঢুকলেন। তিনি আবগারী বিভাগে বহুদিন কাজ করে অবসর গ্রহণ করেচেন। ষাটের কাছাকাছি বয়সে। তান্ত্রিক সাধনা করেন। ঠিকুজি-কুষ্ঠি বিনা পয়সায় ক'রে দেন। কোন রত্নের আংটি ধারণ করলে কার সুবিধে হবে, ঠিক ক'রে দেন। পরের বেগার খাটতে ওঁর জুড়ি বড় একটা দেখা যাবে না এসব কাজে। লোক অতি সজ্জন, সকলে মানে, শ্রাদ্ধা করে। অনেকে ওঁর সামনে ধূমপান করে না।

শরৎবাবু ঢুকে বললেন—এই যে, কি হচ্ছে আজ? যে বাদলা নেমেচে!

শ্যামাপদ মোক্তার বললেন—আসুন, আসুন চক্কোত্তিমশায়। আমাদের ভূতের গল্প হচ্ছে বাদলার দিনে। তবে তেমন জমচে না। আপনার তো...

শরৎ চক্রবর্তীমশায় বললেন—আমি একটা গল্প বলতে পারি তবে সেটা ভূতের গল্প নয়। সেটা কিসের গল্প তা আমি জানিনে। আপনারা শুনে বিচার করুন।

শরৎবাবুর মুখে, সেই গল্প শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। স্বর্গমর্ত্য যেন একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল সেই ঘন বর্ষার বর্ষণমুখর মেঘের আবরণ ভেদ করে।

শরৎবাবু বললেন—আমাকে সেবার হঠাৎ জলপাইগুড়ির ওধারে ডুয়ার্স অঞ্চলে বদলি করলে। আমার পরিবারবর্গ তখন ঢাকায়, তাদের ওখানে রেখে জলপাইগুড়ি চলে গেলাম। নতুন জায়গা। সেখানে নিজে না দেখেশুনে কি করে সবাইকে নিয়ে যাই। বিশেষ ক'রে ছেলেমেয়েরা তখন ঢাকা স্কুলে পড়াশোনা করচে।

যেখানে গেলাম সেখানটা জলপাইগুড়ি থেকে অনেক দূর। ছোট লাইনে যেতে হয়, পথে চা-বাগান পড়ে। বনময় অঞ্চল। কিন্তু দূরে সবুজ বনরেখার পটভূমিকায় হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরমালা চোখে পড়ে। বড় নির্জন স্থান। আমি যে জায়গায় গেলাম, তার নাম হলদিয়া। ছোট্ট জায়গা, আমি সেখানে গিয়ে সিনিয়র সাব্‌ইন্‌স্পেক্টরের বাসায় উঠলাম, কারণ, আমার বাসা তখনো ঠিক হয়নি। সে ভদ্রলোকের নাম, রেবতীমোহন মুখুজ্যে, বাড়ি নদীয়া জেলা। বেশ ফর্সা, লম্বা, দোহারা চেহারা। আমায় খুব যত্ন করলেন, দিন কয়েকের মধ্যেই বাসা ঠিক ক'রে দেবেন ভরসা দিলেন।

তৃতীয় দিন সকালে আমায় বললেন—আপনাকে একটা কথা বলি......

—কি?

—আপনার এখন এখানে আসা খুব ভুল হয়েচে।

—কেন বলুন তো?

—আপনি জানেন না কিছু এদেশের ব্যাপার?

—না। কি ব্যাপার?

—এই বর্ষাকালে এখানে ভয়ানক ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর হচে চারিধারে। আপনি নতুন লোক, আপনার তো খুবই জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। দু'একবার জ্বর হোলেই ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর দেখা দেবে। তখন জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। এইরকম এদেশের কাণ্ড।

—তবে আপনারা আছেন কি করে?

—সেকথা আর ব'লে লাভ নেই। ইচ্ছে ক'রে নেই। আছি প'ড়ে পেটের দায়ে। চাকরি ছেড়ে দিলে এ বয়সে যাবো কোথায়, খাবো কি? আমার দুটি মেয়ে পর পর মারা গিয়েচে ব্ল্যাকওয়াটার ফিভারে। তবুও বদলি পেলাম না। কি করি বলুন শরৎবাবু।

—তবেই তো...

—একটু সাবধানে থাকলেই হবে। জলটা গরম না ক'রে খাবেন না বাইরে গিয়ে!

—ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার হোলেই কি মানুষ মারা যায়?

—ভালো চিকিৎসা না হলে বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। বিশেষ ক'রে এই বর্ষাকালে যাঁরা নতুন আসেন, তাঁদের ধরলে বাঁচানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে। আমি এরকম দুটো কেস দেখেচি। দুটোই মারা গেল।

শুনে মনে ভয় হলো। কিন্তু সাবধান হয়েই বা কি করবো। বিদেশে বেরিয়ে কত-দূর সাবধান হওয়াই বা চলে। যা থাকে কপালে ভেবে কাজ আরম্ভ ক'রে দিলাম। দশ-বারো মাইল দূরে দূরে গাঁজার দোকান মদের দোকান তদারক করে বেড়াতে লাগলাম।

খুব ভালই লাগছিল। বর্ষার সবুজ অভিযান সুরু হয়েচে বনে বনে। কত রকমের ফুল ফোটে। কত ধরনের পাখী ডাকে। দূরে হিমালয়ের তুষারাবৃত কি একটা শৃঙ্গ একদিন দেখা গেল। মিছরির পাহাড়ের মত ঝক্‌ঝক্ করচে সকালের সূর্যকিরণে। তবে রোদ বড় একটা উঠতে ইদানীং আর বড় দেখা যেতো না।

ইতিমধ্যে রেবতীবাবুর চেষ্টায় ভালো একটা বাসা পাওয়া গেল। উঁচু কাঠের খুঁটির ওপর কাঠের তক্তা বসিয়ে তার ওপর বাংলো ধরনের ঘর করা হয়েছে। কাঠের মেজে বেশ শুকনো খট্‌খটে। ঘরটা বেশ বড়। আলো-হাওয়া বেশ আসে।

মনের ভয় ক্রমে কেটে গেল। তখন মনে ভাবি, রেবতীবাবুর ওটা উচিত হয়নি। এখানকার মাটিতে পা দিতে না দিতে অমন ভয় দেখিয়ে দেওয়া কি ভালো হয়েচে? কেন করলেন ওটা রেবতীবাবু? অন্য কোন মতলব ছিল নাকি? সাত-পাঁচ ভাবি।

এখানে আমার এক ব্রাহ্মণ আরদালি জুটলো। নাম দিগম্বর পাণ্ডে। লোকটা অনেক-দিন সেখানে আছে। রান্না করতো খুব ভালো। সে হাট-বাজার রান্নাবান্না সবই করতো। কোন অসুবিধা ছিল না।

মাস-দুই পরে সেবার 'বামনাপাড়া নর্থ' বলে একটা জায়গায় আবগারি তদারকে গেলাম। সেটা একটা চা-বাগানের পাশে ছোট্ট বাজার। চা-বাগানটার ট্রাকগুলোর গায়ে লেখা আছে, 'বামনাপাড়া নর্থ টি এস্টেট'। পাহাড়ী একটা ছোট নদী পেরিয়ে আমার

গরুর গাড়ি বাজারে গিয়ে থামলো। বেলা তখন দশটা। দুটি মাড়োয়ারী মহাজনের গদি আছে। তারা বন অঞ্চলের উৎপন্ন সওদা করে। দেবেন সামন্ত ব'লে মেদিনীপুরের একজন ব্যবসায়ীর কাঠের কারবার আছে। গাঁজা ও আফিমের দোকান সেই দেবেন সামন্তের ভাই, শশী সামন্তের।

ওখানে বসে থাকতে-থাকতেই আমার শরীর কেমন খারাপ হোলো। মাথা ধরলো। দেবেন সামন্তকে বলতে সে কি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিলে। বললে, এতেই সেরে যাবে। কোনো ভয় নেই।

আমি বললাম—আপনাদের এখানে ব্ল্যাকওয়াটার হয়?

—খুব।

—মানুষ মরে?

—তা মন্দ মরে না।

—আপনারা ভয় পান না?

—আমরা অনেকদিন আছি। নতুন যাঁরা আসেন, তাঁদের ভয় একটু বেশি।

সবাই দেখছি একই কথা বলে। গাঁজার হিসেব চেক করতে করতে আর যেন বসতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ি। জল-তেষ্টা পাওয়াতে বামনপাড়া নর্থ চা-বাগানের একটা গুমটি টিনের শেড্ থেকে জল চেয়ে খাই এক নেপালী দরওয়ানের কাছ থেকে।

যখন বাসায় পেঁছিলাম তখন বেলা গিয়েচে। আমার তখন খুব জ্বর। পথেই কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। খবর পেয়ে রেবতীবাবু ছুটে এলেন। ডাক্তার ডাকা হলো। ওষুধ ও ইন্‌জেকসান চললো। তিনদিনের মধ্যে জ্বর ছেড়ে গেল।

দিন পনেরো বেশ আছি।

সবাই বল্লে—ঠাণ্ডা লেগে অমনটা হঠাৎ হয়েছিল। ও কিছু না।

আমিও নিজেকে সেইভাবেই বোঝালুম। আবার বেশ কাজকর্ম করি। শরীরে কোন গ্লানি নেই। একদিন হলদিয়া পুলিশ-থানায় বসে থানার দারোগার সঙ্গে গল্প করচি, হঠাৎ আবার জ্বর এলো। দারোগাবাবু লোক দিয়ে আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

আরদালি দিগম্বর পাঁড়েকে বললাম—জল দাও। জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম, তিনদিন ভীষণ জ্বরের ঘোরে কাটলো। রেবতীবাবু এবং থানার দারোগাবাবু দু'বেলাই আসতেন। কিভাবে আমার সাবু বার্লি তৈরী করতে হবে, আমার আরদালিকে শিখিয়ে দিয়ে যেতেন। তিনদিন পরে জ্বর কমে গেল।

ক্রমে বেশ সেরে উঠলাম। কাজকর্ম আবার সুরু ক'রে দিলাম। দিন পনেরো পরে চা-বাগানের একটা আবগারী কেস দেখতে গিয়েছি, আবার হঠাৎ জ্বর এলো। এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম।

এখানকার জ্বর ভেল্কিবাজীর মত আসে, আবার ভেল্কিবাজীর মত চলে যায়। সুতরাং প্রথম প্রথম জ্বর এলে আমার যে রকম ভয় হোতো, এখন গা সওয়ার দরুন সে ভয় একেবারেই নেই। আরদালিকে ডেকে বলে দিলাম, আগের মত পথ্য প্রস্তুত ক'রে আমাকে যেন খাওয়ায়।

এবার কিন্তু একটু অন্যরকম হলো।

অত সহজে এবার আমি নিষ্কৃতি পেলাম না। দিন দুই পরে উৎকট ব্ল্যাকওয়াটার জ্বরের সব লক্ষণগুলি আমার মধ্যে ফুটে বেরুলো। অতিরিক্ত রক্তপাতের দরুন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লাম। সেরে উঠতে পাঁচ-ছ'দিন লেগে গেল। দিন দুই পথ্য করার পর একদিন সকালবেলা আমার সঙ্গে রেবতীবাবু আর দারোগাবাবু দেখা করতে এলেন। আরদালিকে চা ক'রে দিতে বললাম, কিন্তু তাঁরা চা খেলেন না। পরে বুঝেছিলাম, তাঁরা চা খাননি—ব্ল্যাকওয়াটারকে ছোঁয়াচে জ্বর ভেবেই। দারোগাবাবু বললেন—শরৎবাবু, একটা কথা বলি।

—বলুন।

—আপনি এখান থেকে চলে যান।

—কেন বলুন তো?

—ডাক্তারবাবুর তাই মত।

—আমাকে তো কিছু বলেননি।

দারোগাবাবু ইতস্তত ক'রে বললেন—না, আপনাকে বলেননি। আমাদের বলেচেন আপনাকে বলবার জন্য কিনা। তাই বলা উচিত ভাবলাম। উনি বলেচেন, আপনার অসুখ খুব খারাপ। মানে—

—আমি তো সেরে গিয়েচি।

—ও সারা বড় কঠিন শরৎবাবু।

—বেশ, তাহলে স্টেশন পর্যন্ত আমি যাবো কি করে? রক্ষিয়াঘাট পার হবার তো কোন উপায় দেখিনি।

—কিছু ভাববেন না। স্ট্রেচার যোগাড় করছি চা-বাগান থেকে। কুলী পাঠাবো। পুলিশের একজন লোক সাথী থাকবে, আপনাকে ট্রেনে উঠিয়ে না দিয়ে তারা ফিরবে না।

—বেশ।

আমি তখন জানতাম না যে, আজই আমার জীবনের শেষদিন হোতো, যদি—

কিন্তু সে কথা ক্রমে বলচি।

আমি সম্মতি দিলে দারোগাবাবু চলে গেলেন।

তখন বেলা ন'টা হবে। গরম জল ক'রে নিয়ে আসতে বললাম আরদালিকে, গা-হাত মুছবো ব'লে। তারপর একবাটি বার্লি খেলাম। আরও একটু বেলা হোলে দুটি ভাতও খেলাম।

বেলা বারোটার পর লোকজন এলো স্ট্রেচার নিয়ে। এই পর্যন্ত ব'লে শরৎ চক্রবর্তী বললেন—একটু চা খাবার ইচ্ছে হচ্চে।

আমরা বললাম—গল্পটা শেষ করুন।

—চা খেয়ে নিয়ে বলবো। এইবার গল্পের আসল অংশটাতে এসে গিয়েছি কিনা, একটু গলা ভিজিয়ে নিয়ে বলি।

নিতাইবাবু উকিল বললেন—একই কথা। আপনি বললেন, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর হলো, সেরে গিয়ে আপনি পথ্য করলেন, অথচ ডাক্তারবাবু কেন আপনার অসুখ খারাপ বললেন? অসুখ তো সেরে গিয়েছিল।

—সেরে গিয়েছিল কি রকম সেবার, এখুনি সেটা শুনলে বুঝতে পারবেন। আসলে সারেনি।

—তবে পথ্য দিয়েছিল কেন ডাক্তার?

—এ কথার জবাব আমি দিতে পারবো না। কাউকে জিগ্যেসও করিনি। তবে যেমন ঘটেছিল, সেইরকম বলে যাচ্চি—

—এটা একটা অদ্ভুত কথা বলচেন আপনি। কিরকম সে-দেশের ডাক্তার বুঝলাম না মশাই!

—এ-কথাটা আমিও কখনো ভেবে দেখিনি। আচ্ছা, এবার বলি গল্প। শরৎ চক্রবর্তী পুনরায় গল্প আরম্ভ করলেনঃ

বেলা বারোটার পর স্ট্রেচার নিয়ে এলো চা-বাগানের লোকজন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন রেবতীবাবু ও দারোগাবাবু। আমি আরদালি জিনিসপত্র গোছাচ্চি এমন সময় আমার এলো জ্বর। ভীষণ কম্পজ্বর। আর আমি বসতে পারলাম না। ঘরের মধ্যে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাঁধা বিছানা আরদালিকে দিয়ে খুলিয়ে পাতিয়ে শুয়ে পড়লাম। এবার আমি আর কিছুই জানিনে। আমার সমস্ত চৈতন্য লুপ্ত হয়ে গেল এক ঘন অন্ধকারের আবরণের অন্তরালে।

যখন আবার আমার জ্ঞান হলো, তখন দুটো জিনিস আমার চোখে পড়লো প্রথমেই। অন্ধকারের মধ্যে একটা কি গাছের ডাল পাশের জানালার বাইরে হাওয়ায় দুলচে। দ্বিতীয় জিনিস হলো, আমার বাক্স ও পুঁটুলি আমার পায়ের দিকে দেওয়ালের কাছে রয়েচে এবং আমার ছাতিটা দেওয়ালের কোণে হেলানো রয়েচে।

আমি কি রেলওয়ে ট্রেনে উঠেছি?...

কিন্তু এত অন্ধকার কেন রেলের কামরা? অন্য লোকই বা নেই কেন কামরায়? তারপর আস্তে আস্তে আমার মনের আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে আসতে লাগলো। আমার মনে পড়লো যে, আমি স্ট্রেচারে আদৌ উঠিনি, জ্বর আসাতে ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু ঘরই যদি হয় আরদালি দিগম্বর কই? ঘরে আলো জ্বালেনি? আমি কোথায়?

তৃষ্ণা পেয়েছিল। ডাকতে গেলাম ওকে। গলায় স্বর আটকে গেল। দুবার ডাকতে গেলাম, দুবারই তাই হলো।

আমার মনে হোলো বাইরে চাঁদ উঠেছে। জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে চাঁদের সামান্য আলো এসে পড়েচে। কিছুক্ষণ সামনের দিকে চেয়ে রইলাম, ঘরের মধ্যে বা বাইরে কোথাও কোন শব্দও নেই।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হোলো বাইরের দিকে। কে ওখানে বাইরে?

এই দেখুন, এতদিন পরে মনে পড়েও আমার গা শিউরে উঠলো। দেখলাম কি জানেন, একটি কালো মত মেয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমার ঘরের চারিপাশে ঘুরছে, আর একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে কি করচে—দুবার আমার সামনের দরজার ফাঁক দিয়ে সে নীচু হয়ে ঘুরে গেল।... তিনবারের বার মেয়েটি হঠাৎ মুখ উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে হাত নেড়ে বললে—কোনো ভয় নেই—গণ্ডি দিচ্চি—আজ রাত্রে কেউ গণ্ডির মধ্যে আসতে পারবে না—ঘুমো—

অতি অল্পক্ষণের জন্যে মেয়েটিকে চোখের সামনে দেখলাম, তারপর সে ঘুরে গেল ওদিকে। আমারও আর জ্ঞান রইল না। ঘুমিয়ে পড়লাম কি?

এরপরে কতক্ষণ পরে জেগে উঠেছিলাম তা বলতে পারবো না, কিন্তু তখন চোখ খুলেই দেখলাম, সেই কালো মেয়েটি আমার শিয়রের কাছে ব'সে। তার বয়েস আঠারো বছরের বেশি হবে বলে আমার মনে হলো না। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, মেয়েটি যেন খুব ঘেমেচে, ওর মুখ ঘামে ভিজে গিয়েচে যেন, সারা শরীর দিয়ে যেন দরদর করে ঘাম ঝরচে...

আমি ওর দিকে চেয়ে দেখতেই মেয়েটি চমৎকার শান্ত স্নেহময় সুরে বলে উঠলো—জাগলি কেন? ঘুমো-ঘুমো—কোনো ভয় নেই—ঘুমো—

শেষবার যখন ও 'ঘুমো' বলেছে, তখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ওর কথা শুনতে শুনতে। ঘুমিয়ে পড়বার আগে সেই গাছের ডালটার দিকে নজর পড়লো জানলার বাইরে। তার গায়ে জ্যোৎস্না পড়েচে।...

এইখানেই আমার গল্প শেষ হলো।

সকালে আমি যখন জেগে উঠলাম, তখন আমার মনে হোলো, স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় ঘুম থেকে আমি জেগে উঠেছি।

আমার শরীরে কোনো গ্লানি নেই। কিন্তু শরীর বড় দুর্বল। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলাম না। ক্রমে ক্রমে একটু বেলা হোলো। তখন দেখি, দিগম্বর পাঁড়ে আরদালি সন্তর্পণে পা টিপে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি দিচ্চে। আমি ডাকতেই যেন সে চমকে উঠলো, কোনো উত্তর দিলো না। আমি বললাম—রেবতীবাবুকে ডেকে নিয়ে এসো।

থতমত খেয়ে সে যেন চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে অনেক লোক এলো আমাকে দেখতে। তার ম'ধ্য রেবতীবাবুও ছিলেন।

রেবতীবাবু বললেন—কেমন আছেন শরৎবাবু?

—ভালো। আমি কিছু খাবো।

তখনই রেবতীবাবু বাইরে গিয়ে কাকে কি বললেন। খানিক পরে এক বাটি বার্লি এলো আমার জন্যে। বার্লি খেয়ে শরীরে বল পেলাম। ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে বললেন, জ্বর ছেড়ে গিয়েচে।

এর দিন-দুই পরে আমি সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে উঠলাম। পথ্যও করলাম। তখন ক্রমে ক্রমে শুনলাম, সেই ভীষণ রাত্রে আমাকে মুমূর্ষু মনে ক'রে সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল একা ফেলে। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন রাত কাটবে না। এমন কি, নাকি সকালে

আমার সৎকারের জন্যে কে কে যাবে, কোথায় কাঠ পাওয়া যাবে, এসব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সকালেই লোক পাঠিয়ে আমার পরিবারবর্গকে টেলিগ্রামে আমার মৃত্যু সংবাদ জানানোর জন্যে থানা থেকে একজন কনেস্টেবল পাঠাবেন, দারোগাবাবু তাও ঠিক ক'রে রেখেছিলেন।

অথচ সেই নির্বান্ধব, পরিত্যক্ত অবস্থায় কে আমার মৃত্যুশয্যার পাশে সারারাত বসেছিল, কে আমার ঘরের চারিধারে গণ্ডি এ'কে দিয়েছিল আমাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে...সবাই পরিত্যাগ করলেও কে আমাকে সেই অসহায় অবস্থার মধ্যেও পাহারা দিয়েছিল...এ সব প্রশ্নের কোনো জবাবই আমি দিতে পারবো না।

যদি আপনারা বলেন, সবটাই জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছি—তারও কোন প্রতিবাদ আমি করতে চাই না। স্বপ্ন যদি হয়, বড় মধুর, বড় উন্নত ধরনের উদার স্বপ্ন দেখেছিল আমার মুমূর্ষু মন। সে স্বপ্নের ঘোর আমার সারাজীবন চোখে রইল মাখা। মস্ত বড় একটা আশার বাণী দিয়ে গেল প্রাণে।

শরৎ চক্রবর্তী চুপ করলেন। মনে হোলো তাঁর চোখে যেন জল চক্‌চক্‌ করছে। উকিল নিতাইপদ রাহা বললে—সেরে উঠে হর্লাদিয়াতে আপনি ছিলেন কতদিন?

—যতদিন গবর্ণমেন্ট আমাকে বদলি না করেছিল? প্রায় দু'বছর।

—এভাবে একা ছিলেন বাসায়?

—আমি আর দিগম্বর। আর কেউ না।

—আর কোনোদিন কিছু দেখেছিলেন?

—না।

—আর অসুখে ভুগেছিলেন?

—না।

ঘন বর্ষার রাত। বাইরে বেশ অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছিল উঠানের শিউলি গাছটার ডালে পাতায়। আমরা সবাই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। নিতাই উকিলও আর বেশী কথা বলেনি। বৃষ্টি এসে পড়বে ব'লে শরৎ চক্রবর্তীকে আমরা বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম ছাতি দিয়ে।

বাঘের মন্তর

বাইরে বেশ শীত সেদিন। রায়বাহাদুরের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে বেশ গল্প জমেছিল। আমরা অনেকে ছিলাম। ঘন ঘন গরম চা ও ফুলুরি মুড়ি আসাতে আসর একেবারে সরগরম হয়ে উঠেছিল।

রায়বাহাদুর অনুকূল মিত্র একজন মস্ত বড় শিকারী। আমরা কে তাঁর কথা না শুনেছি? তাঁর ঘর ঢুকে চারিদিকে চেয়ে শুধু দেখবে মরা বাঘ ও ভালুকের চামড়া, বাঘের মুখ ভালুকের মুখ বাঁধানো—ঘরগুলো দেখে মনে হয় ট্যাক্সিডারমিস্টের কারখানায় বুঝি এসে পড়লাম।

কিন্তু সেদিন আর-একজন লম্বা মত প্রৌঢ় ব্যক্তিকে রায়বাহাদুরের অতি কাছে বসে থাকতে দেখে ও শিকার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে শুনে বেশ অবাক হয়ে গেলাম। রায়বাহাদুরের সামনে শিকারের কথা বলে এমন লোক তো আজও দেখিনি। যে অনুকূল মিত্র জীবনে ত্রিশটি রয়েল বেঙ্গল পনেরোটি লেপার্ড মেরেছেন, ভালুক ও বুনো শুয়োরের তো লেখা-জোখা নেই—এছাড়া আছে গণ্ডার, আছে বাইসন, আছে অজগর পাইথন, আছে শজারু, আছে কাক বক হাঁস, এ-হেন রায়বাহাদুরের পাশে বসে শিকারের কথা বলা! নাঃ, লোকটা কে হে? বড় কৌতূহল হল জানবার।

উপেনবাবু, আমাদের উপেন মাইতি আপন মনে চা খেয়েই চলেছেন, তাঁকে দেখে বললাম—ও উপেনবাবু, ঐ লোকটি কে?

উপেনবাবু যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে বলে উঠলেন—অ্যাঁ? কই, কে?

—ঘাবড়াবেন না। ওই আধ-বুড়ো লোকটি কে?
—উনি?
—হুঁ। বলুন না।
—বিজ্ঞ শিকারী নিধিরাম ভট্টাচার্য।
—নামটা যেন নৈয়ায়িক পণ্ডিতের মত শোনালো। আপনি অনায়াসে বলতে পারতেন—নৈয়ায়িক নিধিরাম সার্বভৌম।
—তা শিকারের ব্যাপারে উনি বড় কেউ-কেটা নন। ওঁর 'শিকারযোগ' বই পড়েননি? তিনটে এডিশন হয়ে গেল। আসুন আলাপ করিয়ে দিই।
আমার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। নিধিরাম ভট্‌চাজ যে কোনকালে চাল-কলা-বাঁধা পুরুত ছিলেন না তা তাঁর কথাবার্তার ধরনে আগেই বুঝেছিলাম, এখন সেটা আরো ভাল করে জানা গেল। নানা স্থানের বাঘ-ভালুকের শিকার কিভাবে হয় সে গল্প করলেন। রাত্রে কিভাবে গাছের উপর বসে কাটিয়েছেন, কোন্ জঙ্গলে একবার বাঘের মুখে পড়েছিলেন, ইত্যাদি নানা গল্প। লোকটি ভাল গল্প বলতে পারেন। এমন সুন্দর, নিখুঁতভাবে গল্প বলছিলেন যে আমরা ঘটনাবলী যেন চোখের ওপর ঘটতে দেখছি। আরও দেখলাম, নিধিরাম বেশ প্রকৃতি-রসিক ব্যক্তি। জ্যোৎস্না রাত্রি ও বর্ষামুখর শ্রাবণ রাত্রিগুলির এমন সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছিলেন মুখে মুখে! আমি বললাম—একটা কিছু আশ্চর্য ঘটনা বলুন।
নিধিরাম ভট্‌চাজ বললেন—সবই আশ্চর্য। বনের সব ব্যাপারই আশ্চর্য।
—তবুও।
—তবুও কী? ভূতের গল্প? ভূত দেখিনি কখনো চোখে।
—বিশ্বাস করেন?
—না।
বা-রে, এ আবার অতি অদ্ভুত লোক। বাঙালী হয়ে ভূতে বিশ্বাস করে না এমন লোক তো দেখিনি! পরে কথার ভাবে বুঝলাম তিনি তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী। বললাম—আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে ভূত মানে না?
—তন্ত্রশাস্ত্র আমি পড়িনি। মন্তর-তন্তরের কথা বলছি।
—ও! কিরকম মন্তর-তন্তরের?
—সব বাজে, ভুয়ো।
—ও-ও বাজে?
—একদম।
—আমি একেবারে অতটা যেতে রাজি নই। মন্তরের শক্তি নিশ্চয়ই আছে।
—ঐ করে করে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। আপনারা ইংরেজি লেখাপড়া শিখেও এইসব মানেন?
এইবার নিধিরাম ভট্‌চাজের ওপর আমার শ্রদ্ধা হল। আশ্চর্য মানুষ তো? আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রৌঢ় ব্যক্তি। আমি বললাম—সুন্দরবনে আপনি গিয়েছেন?
—অনেকবার। এই মন্তর-তন্তর সম্বন্ধে সেখানকার একটি ঘটনা বলি।
আমি বেশ এগিয়ে গিয়ে বসলাম তাঁর কাছে। দিনটা এইসব গল্প শুনবার উপযুক্ত বটে।
উনি বলতে লাগলেনঃ—
সেবার কাকডাঙার ট্যাঁকে আমাদের বজরা লেগেছিল। আমাদের যিনি শিকারের গুরু, খুলনার উকিল সীতাকান্ত রায়ের ভাইপো শ্যামাচরণ রায় ছিলেন আমাদের সঙ্গে। কথাটা উল্টে বলা হল। আসলে তাঁর সঙ্গেই আমরা গিয়েছিলাম—নইলে আমাদের অবস্থার লোক আর বজরা কোথায় পাবে বলুন।
যেখানে বজরা বাঁধা হল সেখানটা একটা খালের মুখ। গভীর বনের মধ্যে দিয়ে এসে এখানে নদীতে পড়েছে কাকডাঙার খাল। খালের দৃশ্য বড় সুন্দর। দুধারে হেঁতাল ঝোপ, বনের মধ্যে গরান আর গোলপাতার গাছ। জলের ধারে টাইগার ফার্নের জঙ্গল। এই

টাইগার ফানে'র জঙ্গলের মধ্যেই সাধারণত বড় বড় বাঘ আত্মগোপন করে থাকে। শ্যামাচরণ রায় ফার্সিতে তামাক খেয়ে নিয়ে আমাদের বললেন—কাকডাঙার-খালে ডিঙি ওঠাও।

ডিঙি বেয়ে আমরা চললাম খালের মধ্যে দিয়ে। সুন্দরবনে যাঁরা কখনো যাননি তাঁরা বুঝতে পারবেন না এইরকম খাল বেয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় কী চমৎকার রূপ চোখে পড়ে সুন্দরবনের। কখনো হেঁতাল ঝোপ, কখনো বন্য লেবুর জঙ্গল, গোল গাছের সারি, কোথাও বা বাতাবি লেবুর মত প্রচুর ফল হয়ে আছে। কোথাও বা হলুদ ফুল ফুটে আলো করে আছে বন্য লতা। কেয়া ঝোপে কেয়া ফুল ফুটে বাতাসকে মিষ্টি করেছে।

অনেকে বলেন সুন্দরবন বড় একঘেয়ে। তাঁরা গভীর জ্যোৎস্না রাত্রে এ বনের চেহারা কখনো দেখেননি, অন্ধকারে দেখেননি সূর্য উঠবার আগে রাঙা আলোয় মোড়া নিস্তব্ধ বনানীর রূপ, শোনেননি এর বিচিত্র বিহঙ্গ-কাকলি। আমার গুরু শ্যামাচরণ রায় এত ভালবাসতেন এই বন যে বাড়িতে বলেছিলেন তিনি মারা গেলে তাঁর দেহটি যেন সুন্দর-বনে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর আত্মা এতে শান্তি পাবে।

আমি বললাম—তিনি বেঁচে আছেন?

—না। বহুদিন দেহ রেখেছেন।

—দেহ কি সমাধিস্থ করা হয়েছিল বনের মধ্যে?

—না। হিন্দুর দেহ সমাধিস্থ করা নিয়ে গোলমাল হয় সমাজে। তাই হয়নি।

—বড় দুঃখের কথা। তারপর বলুন।

—শুনুন তারপর, কিন্তু একটা কথা, সবটা শেষ হয়ে না গেলে কোন প্রতিবাদ করতে পারবেন না।

—বেশ, বলুন।

নিধিরামবাবু ভালভাবে তামাক টেনে দম নিয়ে অনেকখানি ধোঁয়া ছেড়ে তারপর আবার বলতে লাগলেনঃ—

অনেক দূর চলে গেলাম খাল বেয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, শিকার করার নেশার চেয়েও এই ঘন বনভূমির দৃশ্য আমাকে পেয়ে বসেছিল। যখন প্রায় মাইলখানেকেরও বেশি চলে গিয়েছি নদী থেকে, তখন খালের ধারের বনঝোপের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল—বাবু, ও বাবুরা—

আমরা চমকে উঠলাম। ডিঙির হিন্দু মাঝি বলে উঠল—রাম রাম!

শ্যামাচরণ রায় গলা উঁচু করে ডাঙার দিকে চেয়ে বললেন—আঃ, চুপ কর সবাই। কে ওখানে?

ক্ষীণ স্বরে কে বললে—বাবু আমি।

—কে তুমি? কোথায় তুমি, সামনে বেরিয়ে এস—

—এই যে বাবু আমি, হেঁতাল ঝোপের পাশেই বসে।

সত্যি এতক্ষণ লোকটাকে দেখতে না পাওয়ার দরুন ওর স্বর অশরীরীর কণ্ঠনিঃসৃত বলে ভ্রম হচ্ছিল বটে, এবার লোকটাকে সবাই দেখতে পেলে। ওই তো বসে আছে হেঁতাল ঝোপের ডাইনে। ওকে আগেও দেখা গিয়েছিল, এবার বুঝলাম। কিন্তু আলো-ছায়ায় জলের মধ্যে দিয়ে ওকে গাছের কাটা গুঁড়ির মত দেখাচ্ছিল। আমরা দস্তুরমত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ওকে ওখানে একা বসে থাকতে দেখে। সুন্দরবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা বুঝবেন এরকম বনের মধ্যে একা বসে থাকতে বাতুলেও ভয় পায়।

শ্যামাচরণ রায় বললেন—ও, বেশ। তা ওখানে কী করছ?

—বাবু, হেঁতালের ফল খাচ্ছিলাম। বড্ড খিদে পেয়েছে। গরিব লোক!

—কথাটার ঠিক জবাব হল না। খিদে পাওয়া তো শরীরের ধর্ম, সেটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, এ জঙ্গলে ঢুকলে পাকা কুল ছাড়া যে আর কিছু খাবার পাওয়া যায় না তাও ঠিক। কিন্তু তুমি এখানে এলে কী করে?

—বাবু, আমি ফকির মানুষ। ভয়-ডর করলি আমাদের চলে? আমারে একটু নৌকায়

তুলে নেবেন বাবু? কাল-রন্ঘাটের ট্যাঁকে আমাকে নাবিয়ে দিলে হে'টে পীরের দরগায় গিয়ে রাত কাটিয়ে কাল সকালে বাড়ি যাব। নেবেন বাবু?

—তোমার বাড়ি সেখানে?

—কাল-রন্ঘাটের কাছে মানিক সেনের পাড়ায়।

শ্যামাচরণবাবু কিছু বলবার আগে আমাদের ডিঙির মাঝি দুজন আপত্তি জানিয়ে বললে—নেবেন না বাবু! ডিঙির নিয়ম জানেন তো, সুন্দরবনে চলতি ডিঙিতে পথের লোক তুললে সে বড্ড অপয়া। বাবু যাচ্ছেন যখন একটা শুভ কাজে—

শ্যামাচরণবাবু রেগে বললেন—তোদের কী বুদ্ধি!

—কেন বাবু?

—আমার শিকার হোক আর না হোক, ওকে এখানে ফেলে যাব বাঘের মুখে? নিয়ে চল ওকে।

আর এর পরে কী কথা চলবে? ডিঙি থামিয়ে তাকে উঠিয়ে নেওয়া হল। আমাদের মনে হল লোকটা একজন ফকির। সাজ-পোশাক দেখে অন্তত তাই আমার মনে হয়েছিল। হিন্দু কি মুসলমান, বাইরের সাজ দেখে বোঝা শক্ত। আমরা চুপ করে আছি। শ্যামাচরণ রায় বললেন—কী সাধনা?

—বাঘ আনবার মন্তর জানি কিনা, তার সাধনা।

আমি বললাম—সেটা আবার কী?

—আছে বাবু। আমার গুরু আমায় শিখিয়েছেন।

শ্যামাচরণবাবু বললেন—হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকো?

—না বাবু। মন্তরে বাঘ আসবে।

—আমরা শিকার করতে চলেছি। তুমি বাঘ এনে দিতে পারলে দশ টাকা বকশিশ পাবে।

—বাবু! আপনার দয়া!

—ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে না।

—ও কথাই বলবেন না বাবু।

লোকটাকে আমরা ততক্ষণে সবাই ঘিরে বসেছি। শ্যামাচরণবাবু বললেন—সুন্দরবনে এক-একজন লোক আছে, যারা শিকারীর সামনে বাঘ হাজির করে পয়সা রোজগার করে। তারা তো হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকে জানি। তুমি সে দলের নও?

—আপনাকে আগেই বলেছি বাবু। মন্তর আসল জিনিস। বাঘ টেনে আনে।

এই সময় আমরা নিধিরাম ভট্চাযকে জিজ্ঞাসা করলাম—হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকার ব্যাপারখানা বুঝলাম না তো?

নিধিরামবাবু আমাদের বুঝিয়ে দিলেন—

এক শ্রেণীর লোকের পেশা হচ্ছে এই। তারা ঝোপের মধ্যে বসে হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে বাঘের আওয়াজ নকল করে ডাকে, তাতে নর-বাঘ সেখানে ছুটে আসে এবং শিকারীর বন্দুকের পাল্লায় ধরা দেয়। পাঁচ টাকা ছিল ওদের ফি যুদ্ধের আগে। এখন কত জানি না।

আমরা বললাম—এমনভাবে বাঘ আসতে আপনি দেখেছেন?

—অনেক দেখেছি। তবে সব সময় সফল হয় না ওদের চেষ্টা। বাঘ হয়ত সে জঙ্গলে নেই কিংবা কাছে নেই। নয়তো মানুষের সাড়া পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছে। সে অবস্থায় কী হবে?—তারপর শুনুন। আমি ঘুন শিকারী, মন্তরে বাঘ এনে দেয় এমন কথা কখনো শুনিনি। শিকার কত এগিয়ে গেল তাহলে ভাবুন তো? শিকারের শখ যাঁদের আছে তাঁরা জানেন একটা জ্যান্ত বাঘের পেছনে কী খাটুনিটাই মশাই তাকে শিকার করতে হয়। জঙ্গল ঠ্যাঙাও, নয়তো মাচান বেঁধে রাত জাগো। সোজা কষ্ট মশায়? আর সে জায়গায় যদি মন্তরে বাঘ আসে, তবে শিকার কত সোজা হয়ে গেল বলুন! পাঁচের জায়গায় দশ টাকা দিতে কেন তারা আপত্তি করবে?

—ঠিক কথা। বলুন আপনি।

তারপর ঘণ্টা দুই কেটে গেল, কাকডাঙার খালের মাজায় এসে আমরা নোঙর করলাম।

—মাজায় মানে কী?

—খালের অর্ধেকটা পার হয়ে এসে।—সন্ধ্যে হয়ে এল। আমরা সাহস করলাম না এখন ডাঙায় নামতে। রাত্রের খাবার সঙ্গে করে আনা হয়েছিল, তাই খেয়ে সবাই ডিঙিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিলাম। সমস্ত রাত উত্তেজনায় শ্যামাচরণবাবুর ঘুম নেই চোখে। তিনি শুধু বসে বসে ফকির সাহেবের আজগুবী মন্তশ্রের কথা শুনছিলেন—সে কতবার সাধনা করেছে বনের মধ্যে এই বাঘ আনার জন্যে। গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে বসে এই মন্তরের সাধনা করাই তার কাজ। আরও কত কি যে বাজে গল্প! সারাদিন খেটেখুটে রাতে যে একটু ঘুমুবে, তার উপায় নেই।

কিন্তু শ্যামাচরণ রায় স্বয়ং ফকির সাহেবের মুরুব্বি। তাঁর কথার উপর কথা বলবে কে? আমরা চুপচাপ শুয়ে ঘুমুবার চেষ্টা করলাম। শেষরাতের দিকে খানিকটা কৃতকার্য যে হইনি তাও নয়।

আমি বললাম—একটা কথা। আপনারা কাকডাঙা খালের মাঝামাঝি এলেন কেন? বজরা ছেড়ে আসার হেতু কী?

হেতু খুব স্পষ্ট। বজরায় বসে তো শিকার চলবে না! বজরা আছে নদীতে, তার একদিকে জঙ্গল, অন্যদিকে কূলকিনারা দেখা যায় কি না যায়। ছোট খালের মধ্যে না গেলে দুদিকের জঙ্গল তো তুমি দেখতে পাচ্ছ না। তুমি তো জঙ্গলে চড়ুইভাতি করতে আসনি?

নিধিরাম ভট্চাজ একটু তর্কপ্রিয় লোক। কেউ তাঁর কথার প্রতিবাদ পাছে করে এই আশঙ্কায় সর্বদাই কোমর বেঁধে তর্কের জন্য তৈরি হয়ে থাকেন এবং গল্প শুরু করবার সময়ে কেন যে বলেছিলেন আমার কথার কোন প্রতিবাদ করতে পারবে না গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত, এখন তা বুঝলাম। আমরা তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—আপনাকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছি জানবার আগ্রহে, আপনার গল্পের খুঁত ধরবার জন্য নয়। বলে যান আপনি।

নিধিরাম ভট্চাজ বললেন—খুব ভাল কথা। শোন তারপরে। আমার এ গল্প শেষ হয়ে এসেছে। যা কিছু প্রতিবাদ করবার গল্পের শেষে করতে তো তোমাদের বলছি।

ডিঙি নোঙর করে সারারাত্রি সেখানে থাকবার সময়ে সে-রাত্রেই বুঝতে পারা গেল, কী ভয়ানক জায়গায় আমরা এসেছি। জ্যোৎস্না রাত্রির আলো-ছায়া বার বার কেঁপে কেঁপে উঠে ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল বাঘের গর্জনে। কাকডাঙার খাল সম্বন্ধে শ্যামাচরণ রায় বিবেচনায় ভুল করেননি। ভোরে উঠে শ্যামাচরণবাবুকে বললাম—চমৎকার জায়গায় এসেছেন!

শ্যামাচরণ রায় বললেন—কাঁচা শিকারীর কথা হয়ে গেল!

—আজ্ঞে কেন?

—বনের বাঘ আর শিকারীর বাঘ এক নয়। ওরকম বাঘ ডাকে সুন্দরবনের বহু জায়গায়। কিন্তু চোখে দেখতেও পাবে না কোনদিন একটি। তাই তো ফকির সাহেবকে ধরেছি। এখন ফকির সাহেবের দয়া—

—আর আপনার হাতযশ—

সকালের রোদ বেশ উঠলে আমরা সবাই ডিঙি থেকে নেমে বনের মধ্যে ঢুকলাম। আধমাইলটাক দূরে একটা ফাঁকা জায়গা আছে বনের মধ্যে, তাকে বলে হাতল বাদিয়ার ডাঙা। সেখানে আমরা রান্না করে খাব দুপুরে।

আমরা জিনিসপত্র নিয়েই নামলাম, নয়তো কে আবার এ বনের মধ্যে দিয়ে ডিঙিতে ফিরবে রান্নার জিনিস নিতে। মাঝি দুজনকেও সঙ্গে নিলাম, এ নির্জন জঙ্গলে তারা দুটি প্রাণী ডিঙিতে বসে থাকতে রাজি নয়।

দুদিকে ঘন গরান আর হেঁতালের জঙ্গল, টাইগার ফার্নের ঘন সমাবেশ, পা বাঁচিয়ে চলতে হয় শুলোর ভয়ে। শুলো হল গাছের বায়ব্য শিকড়, কাদা থেকে মাথা তুলে তীক্ষ্ণ সড়কির মত খাড়া হয়ে থাকে, ঝরা পাতার তলায় পা দিলেই রক্তপাত। দু-ধারে বন,

মাঝখান দিয়ে জুড়ি পায়ে চলার পথটা।

ফকির সাহেব সকলের আগে, তার পেছনে গুরুজী শ্যামাচরণ রায়, তাঁর পিছনে দুজন লোক, তারপর আমি, সর্বশেষে মাঝি দু'জন।

হঠাৎ এক জায়গায় কি একটা শব্দ হল, শ্যামাচরণবাবু ও লোক দু'জন চমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে ছিলাম, ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে এগিয়ে গেলাম।

বললাম—কী হল? থামলেন যে? '

সেই সময় নজর পড়ল, দলের পুরোভাগে ফকির সাহেব ছিলেন, তিনি নেই। বলতে যাচ্ছি—ফকির সাহেব বুঝি—

শ্যামাচরণবাবু বললেন—উঃ সর্বনাশ! এমন কাণ্ড কখনো—উঃ!

তাঁর পেছনের লোকদুটি তখনো আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে। একজন বললে—উঃ! বাবুর ডান পাশের ঝোপ থেকেই তো—

শ্যামাচরণবাবু আড়ষ্ট গলায় বললেন—আহা, গরিব লোক! আমিই মন্তর আওড়াতে বলেছিলাম ওকে মনে মনে—

ব্যাপার তখনি শুনলাম। ডানদিকের টাইগার ফার্নের বন থেকে ভীষণ এক রয়্যাল টাইগার লাফিয়ে পড়ে ফকির সাহেবকে তুলে নিয়ে গিয়েছে।

চেয়ে দেখে মনে হল বাঁ দিকের হেঁতাল ঝোপের মাথা যেন তখনো নড়ছে।

আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললাম—তারপর? পাওয়া গেল ফকির সাহেবকে?

—তা কখনো যায়! ওই শেষ। একটা হিংলাজের দানার মালা কেবল একটি হেঁতালের ডালে বেধে ঝুলেছিল। আমরা অনেক খুঁজেছিলাম। শ্যামাচরণ রায় বড় শিকারী, বাঘের ধরন-ধারণ তাক-বাক অনেক কিছু জানেন। কিছুই করতে পারলেন না। নামও জানিনে ফকির সাহেবের যে কাউকে কোথায় খবর দেব।

আমার গুরুজী শ্যামাচরণ রায় বলতেন, লোকটি সত্যিই গুণী ছিল। মন্তরের জোরে বাঘ আকর্ষণ সে ঠিকই করেছিল, আমার অসতর্কতায় মারা পড়ল ও। বাঘকে আকর্ষণ করতেই শিখেছিল, বাঘের হাত থেকে বাঁচার মন্তর তো শেখেনি!

অপরাহ্নের দিকে আমরা খোঁজাখুঁজি শেষ করে কাকডাঙার খাল বেয়ে বজরা ধরলাম নদীতে। মন সবারই এত খারাপ হয়ে গেল যে সেবার আমাদের শিকারে আর কোন উৎসাহই রইল না। শ্যামাচরণবাবুকে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—গুরুজী, ফকির সাহেবকে দলের আগে আগে যেতে কে বলেছিল? আপনি তো জানেন নিরস্ত্র অবস্থায় আগে আগে ওভাবে যেতে নেই? শ্যামাচরণ রায় বলেছিলেন—বিশ্বাস করিনি যে। বোগাস বলে ভেবেছিলাম তোমাদের মত!

হারুণ অল রসিদের বিপদ

জানিপুর থেকে দুটি ছেলে পড়তে আসে ইস্কুলে।

এ অঞ্চলে আর ইস্কুল নেই, ওদের বাড়ীর অবস্থা ভালো, যদিও সাতপুরুষের মধ্যে অক্ষরপরিচয় নেই, তবুও বাপমায়ের ইচ্ছে, যখন ধান বেচে কিছু টাকা পাওয়া গেল, তখন ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক। চাষা লোকদের জন্যেও লেখাপড়ার দরকার আছে বই কি। ধানের হিসেব, জন মজুরের হিসেব রাখাও তো চলবে।

ওরা আসে মাদলার বিলের ধারের বড় মাঠের ওপর দিয়ে। আজকাল সকালে ইস্কুল, সোঁদালিফুলের ঝাড় দোলে মাঠের মধ্যে, কত কি পাখী ডাকে, বড় বড় খোলাওয়ালা গেঁড়িগুলো বিলের দিকে নামে মাঠের পথ বেয়ে, আশ ধানের জাওলা খায় লুকিয়ে ছাড়া গরুতে। ওরা পরামানিকদের বাগানের আম কুড়তে কুড়তে চলে আসে মাঠ ও বাগানের মধ্যে দিয়ে, যদি সামনে বিপিন মাস্টারের বেতের ভয় না থাকতো ইতিহাসের ঘণ্টায়, তবে বড় মজাই হোতো। কিন্তু তা হবার নয়, এমন সুন্দর পথযাত্রার শেষে অপেক্ষা করচে রুক্ষমূর্তি বিপিন মাস্টার ও তাঁর হাতের খেজুর ডালের বেত।

একটি ছেলের নাম হারুণ, আর অপরটির নাম আবুল কাসেম। দুটি বেশ দেখতে, পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শান্ত চেহারা, অতি সরল, কলকাতা তো দূরের কথা, মহকুমার টাউন বনগাঁও কখনো দেখে নি। আবুলের হাতে অনেকগুলো পদ্মফুল, মাদলার বিল থেকে তুলেচে, ক্লাসের টেবিল সাজাবে, ফণি মাস্টার ফুল ভালোবাসেন, তাঁকে দিতে হবে।

হারুণ বললে—এই আবুল, এঁচড় পাড়বি?

—কোথাকার রে?

—চল না, রাস্তার গাছের। ও গাছ তো সরকারি, তুমিও পাড়তে পারো, আমিও পারি।

—কি হবে এঁচড়? বিপ্নে মাস্টারকে দিবি?

—তাই চল, যাবার সময়ে ওর বাড়ীতে দুখানা বড় দেখে দিয়ে যাই। মারের দায়ে বেঁচে যাওয়া যাবে এখন।

বেত্রভীতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার এ পথ ওদেরই আবিষ্কৃত। যেদিন ওরা এঁচড় দেয়, সেদিন ইতিহাসের ঘণ্টায় ওদের দেখতে পান না যেন বিপিন মাস্টার। অন্য সবাইকে মারেন। ওরা গাছে উঠে দুখানা বড় এঁচড় সংগ্রহ করলে। হারুণ উঠলো গাছে, আবুল রইল নিচে দাঁড়িয়ে। কোষ-ওয়ালা বড় এঁচড়। ইতিহাসের পড়া কারো হয় নি আজ।

রাস্তার ধারে বিপিন মাস্টারের টিনের বাড়ীটা। বাইরে কেউ নেই।

হারুণ ডাকলে—স্যার, স্যার—

বিপিনের স্ত্রী ঘুমচোখে বাইরে আসতে আসতে বলছিলেন—আপদগুলো সকালবেলাই এসে—

এমন সময় ওদের হাতের এঁচড় দেখে থেমে গিয়ে মুখে হাসি এনে, গলার সুর মোলায়েম করে বললেন—কিরে? এঁচড়? কোত্থেকে আনলি?

ওরা এঁচড় ফেলে চলে এলো। বিপিন মাস্টার ইস্কুলে গিয়েচেন ওদের আগে। আজ তাঁরই প্রথম পিরিয়ডে ক্লাস। একটু দেরি করে ক্লাসে ঢুকলে আট আনা জরিমানা করা তো বাঁধাধরা রুটিনের কাজ।

ওরা ঢুকলো ক্লাসে দুরু দুরু বক্ষে।

বিপিন মাস্টার কড়া সুরে হেঁকে বললেন—এই যে! হারুণ আর আবুল—এদিকে এসো—

ওদের একজন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। বিপিন মাস্টার বললেন—দেরি কিসের?

—আজ্ঞে, এঁচড়—

—কি? এঁচড়? কিসের এঁচড়? সরে এসো এদিকে—

পিঠে বেত পড়বার আর দেরি নেই দেখে হারুণ ভূমিকাবাহুল্য না করে সংক্ষেপে আসল কথাটা বলবার প্রচেষ্টায় উত্তর দিলে—আপনার বাড়ীতে এঁচড়—

—কি? আমার বাড়ীতে? তার মানে?

—এঁচড় দুখানা বেশ বড় বড়। আপনার বাড়ীতে দিয়ে এলাম।

—কবে?

—এখন স্যার। তাইতে তো দেরি হোল—এঁচড় পাড়তে দেরি হোল—

বিপিন মাস্টারের উদ্যত বেত্র নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এ যে কত বড় অমোঘ মহৌষধ ওরা দুজনেই তা জানে। বিপিন মাস্টার আর কোনো কথা বললেন না, ওরা দুজনে গট্ গট্ করে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে সামনের বেঞ্চির ভালো ছেলে যুগলকে ঠেলে সরিয়ে সেখানে বসবার চেষ্টা করতে যুগল দাঁড়িয়ে উঠে বললে—দেখুন স্যার, আমি কতক্ষণ থেকে বসে আছি এখানে আমাকে ঠেলে ওরা বসতে চাচ্ছে এত দেরিতে এসে—

বিপিন মাস্টার মুখ খিঁচিয়ে বললেন—বসতে চাইচে তা হয়েচে কি? তোমার একার জন্যে বেঞ্চি হয় নি—সরে বসে ওদের বসতে দাও। ওরা কি দাঁড়িয়ে থাকবে—ডেঁপো ছোকরা কোথাকার—

হারুণ এক ঠ্যালা মেরে যুগলকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বসে পড়লা। আবুল বসলো যুগলের ওখানে। যুগল বেচারীকে উঠেই যেতে হোল দুদিক থেকে ঠ্যালা খেয়ে। বিপিন মাস্টার দেখেও দেখলেন না। আজ তিন পিরিয়ড বিপিনবাবুর।

ওরা বুঝে-সুজেই আজ এ'চড় এনেচে। তিন পিরিয়ডের ধাক্কা সামলাতে হবে তো? কিন্তু তার চেয়েও বড় ধাক্কা আজ পে'ছিলো এসে। ওরা দুজনে ক্লাসের বাইরে এসে দেখলে একখানা ঘোড়ার গাড়ী স্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে।

হারুণ বললে—কে রে? কে এল?

আবুল ঠোঁট উল্টে বললে—কি জানি!

এমন সময় ওপর ক্লাসের শিবনাথ মাস্টার বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে বললেন—যাও সব ক্লাসে গিয়ে বোসো। ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু এসেচেন—এখুনি ক্লাস দেখতে আসবেন—

সব ছেলে চুপচাপ ক্লাসে এসে বসে। আবুল ও হারুণ সেই সঙ্গে এসে বসে। ওদের গাঁয়ের পাশে রসুলপুর, সব মুসলমান চাষীদের বাস। সে গ্রাম থেকে পড়তে আসে একটি ওদের বয়সী ছেলে, নাম তার হায়দার আলি। হারুণ বললে—আমাদের পরনে ময়লা কাপড়—

হায়দার বললে—তাতে কি হয়েচে?

—মার খাবি এখন—

—ইস্ তা আর জানি নে! মারলেই হোল।

কথাটা বললে বটে, কিন্তু মনে ততটা ভরসা ছিল না হায়দারের। ভয়ে ভয়ে সে ক্লাসে গিয়ে ঢুকলো। একটু পরে সাহেবি পোশাকপরা ইন্‌স্‌পেক্টর এবং তাঁর পেছনে হেডমাস্টার ওদের ক্লাসে দেখা দিলেন। বিপিনবাবু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু বললেন—এটি কোন ক্লাস? বেশ বেশ। এদের কিসের ঘণ্টা?

বিপিনবাবু বললেন—ইতিহাসের।

—বেশ বেশ।

পরে হারুণের দিকে চেয়ে বললেন—কি নাম?

হারুণ ভয়ে ভয়ে বললে—হারুণ-অল-রসিদ।

—অ্যাঁ?

—স্যার, হারুণ-অল-রসিদ।

—বোগদাদ থেকে কবে এলে?

—আজ্ঞে, স্যার?

—বলি বোগদাদ ছেড়ে এখানে ছদ্মবেশে নয় তো?

হারুণ বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। হেডমাস্টার হাসলেন।

—স'র এসো এদিকে। ইতিহাস পড়েচ?

—আজ্ঞে, স্যার।

—কুতুবুদ্দীন কে ছিলেন?

হারুণ বললে—রাজা।

—কোথাকার রাজা? কোথায় থাকতেন?

—বিলেতে।

—বেশ। আকবর কে ছিলেন?

হারুণ ভেবে বললে—সেনাপতি-

—কার সেনাপতি?

—রাজার।

—কোন রাজার?

—বিলেতের।

—বাঃ বাঃ—হারুণ-অল-রসিদ বোগদাদী, বেশ ইতিহাসের জ্ঞান তোমার। বোগদাদের খবর কি?

—অ্যাঁ?

—বলি বোগদারের খবর কি?

হারুণ ভাবলে বোগদাদ হয়তো তাদের গ্রামের ইংরেজী নাম। তাই সে বললে—খবর ভালো, স্যার।

হেডমাস্টার ও ইন্‌স্‌পেক্টর হো হো করে হেসে উঠলেন। এর মধ্যে হাসবার ব্যাপার কি আছে, হারুণ তা খুঁজেই পেলে না। বিপিন মাস্টারের দিকে হঠাৎ ওর নজর পড়তেই দেখলে তিনি রোষকষায়িত নেত্রে ওর দিকে চেয়ে আছেন—ওকে গিলে খাবেন এই ভাব।

হারুণ ভেবে পেলে না কি এমন অন্যায় কাজ সে করে বোসলো।

বিপিন মাস্টার নিশ্চয়ই চটেচে, ওঁর মুখে তার রেশ আছে।

ইন্‌স্‌পেক্টর ওর দিকে চেয়ে বললেন—বেশ মজার ছেলেটি, সো সিম্পল্‌।

হেডমাস্টার বললেন—পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কিছুই জানে না।

—চলুন, অন্য ক্লাসে যাওয়া যাক।

ঘণ্টাখানেক পরে হেডমাস্টার এসে ওদের ক্লাসে বললেন—পুণ্যশ্লোক নৃপতি হারুণ-অল রসিদের নামে তোমার নাম। তাঁর কথা কিছু জানো? তিনি ছিলেন গরীবের মা-বাপ, ছদ্মবেশে প্রজাদের দুঃখ দেখে বেড়াতেন। শিখে রেখো।

বিপিন মাস্টার ছুটির আগে ওদের ক্লাসে এসে বেত আস্ফালন করে বললেন—সরে এসো এদিকে, মুখ্যুর ধাড়ি। ক্লাসের মুখ হাসিয়েচ আজ। বেত লাগাই এসো। হারুণ কাঁদো কাঁদো মুখে এগিয়ে যেতেই হেডমাস্টারের ঘর থেকে স্কুলের চাকর এসে বললে—হারুণকে ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু ডাকচেন।

কি বিপদেই আজ পড়েচে ও। কার মুখ দেখে না জানি আজ সে উঠেছিল!

অফিসঘরে ওকে ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু জিজ্ঞেস করলেন—বাড়ী আপাতত কোথায়?

হারুণ ভয়ে ভয়ে বললে—জানিপুর।

—কতদূর এখান থেকে?

—দু মাইল, স্যার।

—কি খেয়ে এসেচো?

—পান্তা ভাত।

—মসরুর কোথায়?

—আজ্ঞে?

—খোজা মসরুর?

নাঃ, কি বিপদেই আজ ভগবান তাকে ফেললেন। এ সব কথা সে জীবনে কখনো শোনে নি। কেন এত বড় বড় লোক খাপছাড়া কথা বলে, যার কোনো মানে হয় না? উত্তর দিতে না পারলে এখুনি বিপ্‌নে মাস্টার বেত উঁচিয়ে আসবে মারতে।

হারুণের মুখ শুকিয়ে গেল। ও করুণ নয়নে একবার ইন্‌স্‌পেক্টরবাবুর দিকে চেয়ে দেখে চোখমুখ নিচু করলে। একবার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে বিপ্‌নে মাস্টারটা ওঘরে কোথাও আছে নাকি। সকালের এঁচড় পাড়া আজ একেবারে মাঠে মারা গেল! অদৃষ্ট আর কাকে বলে? নাম রেখেচেন তার বাপ মা, তার কি দোষ?

কখন তার চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো ওর অজ্ঞাতসারে।

ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু বললেন কেঁদো না খোকা। যাও, বাড়ী যাও। তোমার নামটা খুব বড় একজন ভালো লোকের নাম। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ লোক, বুঝলে, যাও—

স্কুল থেকে বাড়ী যাবার পথে আবুল বললে—এঁচড় আজ না দিয়ে কাল দিলেই হোত। আজ তো পড়াই হোল না। তোকে কি বলছিল রে ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু?

হারুণ বললে—তুই পাড়্‌গে যা এঁচড়। বিপ্‌নে মাস্টারকে আজ এখুনি চার-পাঁচখানা দিয়ে আসি। কাল নইলে আজকের শোধ তুলবে। কি মুশকিলে পড়েছিলাম আজ বল্‌ তো!

বেলা দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দুজনে বাড়ী পৌঁছল।

বিকেল হয়নি ভাল করে।

তরলা লাইলাক রংয়ের ভয়েল শাড়ী পরে টেনিস কোর্টে বসে প্রতীক্ষা করচে মিঃ বাসুর। মিঃ বাসুকে এ অঞ্চলে কে না জানে? বিখ্যাত টেনিস-খেলোয়াড় মিঃ বাসুর কৃশ, দীর্ঘ সুন্দর, যৌবনশ্রী-মণ্ডিত চেহারা আলিপুর অঞ্চলের ও বালিগঞ্জ অভিজাত-পল্লীর প্রত্যেক টেনিস কোর্টকে অলঙ্কৃত করেচে—তাঁর নিখুঁত সাহেবী পোশাক নিখুঁততর আদবকায়দা অনেক ঈর্ষাপরায়ণ তরুণের অনুসরণ-কেন্দ্র।

সেদিন বইয়ের এজেন্ট মিঃ সেনকে দেখে এরা বুঝেছিল এ তাদের সেটের লোক নয়।

অণিমা নাক সিঁটকে বলেছিল—ও, মি! টাইটার রং এমন বিশ্রী! টেস্ট বলিহারি ভদ্রলোকের। ওই টাই পরে—ইট ইজ বিঅন্ড্ মি! সুওরলি ওয়ান শুড্ নো হাউ টু ড্রেস প্রপারলি!

তরলা মুখে রুমাল দিয়ে বলেছিল—স্-স্-স্! নো ব্যাড্ রিমার্কস ডিয়ারি—যার যা তার তা।

—জানি। তবুও ওয়ান শুড্—

—হি-হি-হি-হি—

—তবে! তুমি নাকি বড়—হঠাৎ এত খুশী যে? ব্যাপার কি?

—জানি নে।

—আমি জানি। মিঃ বাসু আজ টেনিসে আসচেন। না?

—(সুরে) দেয়ার আর ওয়াইল্ড্ ক্যাট্স দ্যাট্ রোম্ দি
গড্স-রোড্, গ্রীন্ আইড্—এ্যান্ড্ অ্যাফ্রেড্ অফ্ নান্—

—থাক্—থাক্—বুঝেচি। ওয়াইল্ড্ ক্যাট্স দেয়ার আর এনাফ অ্যান্ড টু স্পেয়ার—বাট্—

—চুপ্।

—সত্যি, কিছু হবে নাকি?

—কি হবে? (কৃত্রিম কোপে)

—বাঃ, রাগ কর। সুন্দর মানায়।

—নো ফ্ল্যাটারিং প্লিজ—

—অ্যাট্ লিস্ট্ নট্ ফ্রম্ মি, কেন না তার চেয়েও ভাল সোর্স রয়েচে। না?

—চুপ।

—বাস, চুপ করলাম। তরলা, সরলা কোথায়?

—ওপরে আছে বোধ হয়।

—তার সেই হাঁদামুখো ভবঘুরেটা আজ নাকি কলকাতায় এসেচে শুনলাম। এখানে আসবে নাকি?

—বোধ হয়। সরলা তো কাল রাত্রে ঘুমোয় নি তার কথা ভেবে।

—পোশাক পরা একটা বিশিষ্ট লক্ষণ ভদ্রলোকের। যে তা না জানে—

একে একে মেয়েরা এল, সঙ্গে সঙ্গে এলেন মিঃ দাস, মিঃ সেন, মিঃ চক্রবর্তী ইত্যাদি। এঁদের কাজ হচ্ছে শুধু একটি আমোদের স্থান থেকে আর একটি আমোদের স্থানে যাতায়াত করা। এঁদের প্রত্যেকের নিজের মোটর আছে, এসেচেনও সেই মোটরে। জীবনে এঁদের একমাত্র লক্ষ্য কি করে ভাল টেনিস খেলা যায়। বিদেশের টেনিস-বিজয়ীদের নাম এঁদের মুখস্থ।

মিঃ সেন এদের মধ্যে এসেচেন বেশি দিন নয়, নিজের মোটর আছে, বিলিতি বই-বিক্রেতাদের এজেন্ট। অর্থের দিক থেকে ভালই উপার্জন, তবে সংসারও ছোট নয়, অনেক বুঝে চলতে হয়। ইনি স্ত্রীকে আনতে সঙ্কোচ বোধ করেন এখানে, কারণ তিনি একেবারে গ্রাম্য মেয়ে। এ-দলে মেশবার উপযুক্ত নন।

সরলা নেমে এল ওপর থেকে। বেশ মেয়েটি, একটা সাদা সিল্কের শাড়ী, হাতে

রিস্টওয়াচ, চোখে চশমা, বেশ সাদাসিধে চালচলন। মুখের ভাব দেখে মনে হয় কি একটা চিন্তা করচে অনেকক্ষণ থেকে।

অণিমা বললে—এসো সরলা। এত দেরি?

—মাথা ধরেছিল।

—অসময়ে?

—এই সময়েই তো ধরে। একটা এ্যাসপিরিন খেলাম—

—হার্ট ডিপ্রেসাণ্ট—বড়—

—হলে কি করবো?

—খেলবে না?

সরলা উত্তর দেবার আগেই দুটি ভৃত্য ট্রে হাতে ঢুকে সকলকে বরফ দেওয়া পানীয়, বরফশীতল ক্ষীর ইত্যাদি পরিবেশন করতে লাগলো। তরলা দাঁড়িয়ে উঠে বললে—মিঃ দাসকে দাও। ও, আপনার চলবে না? কি দেবে? আচ্ছা চা-ই নিয়ে এসো। আর কেউ চা? সরলা, একটু দ্যাখ্ না ভাই।

এমন সময়ে মিঃ বাসু লনে এসে ঢুকলেন। লম্বা, একহারা চেহারা, নিখুঁত পোশাক, নিখুঁত আদব-কায়দা, সুপুরুষ বলতে যা বোঝায় তাই। চালচলনের কায়দা ছায়াচিত্র-অভিনেতা মরিস সিভ্যালিয়রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—যদিও মরিস সিভ্যালিয়রের দিন ফুরিয়ে গেছে অনেক কাল। সকলে চেয়ে দেখলে মিঃ বাসুর দিকে। তরলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলা—কিন্তু সে অপরদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো। মিঃ বাসু হচ্ছেন মল্লিক-বাড়ীর এ টেনিস ময়দানের সিংহ। নামকরা খেলোয়াড়। কি করে টেনিস খেলতে হয় স্টাইলের সঙ্গে তা এখানকার অনেকেই এঁর কাছে শিখেছেন, যদিও মুখে স্বীকার করেন না।

মিঃ দাস বললেন—দেরি যে! উই আর অল্ অ্যাওয়েটিং ইওর ভেরি প্রেশাস প্রেজেন্স্।

মিঃ বাসু বললেন—রি-য়্যা-লি!

—আস্ক্ দেম্—আস্ক দি লেডিজ্— ।

মিঃ বাসু বিলিতি কায়দায় মাজা থেকে নুয়ে পড়ে অভিবাদন করলেন। মুখে কোনো কথা বললেন না। অতি চমৎকার দেখালো জিনিসটা কায়দার দিক থেকে। অণিমা শীলা সেনের কানে কানে বললে—আই কল্ দ্যাট্ স্মার্টনেস, না?

শীলা সেন মিঃ সেনের ভাগিনেয়ী, সুন্দরী ও সুগায়িকা, টেনিস খেলায় হাত ভাল। মেয়েপুরুষের সম্মিলিত ক্রীড়ায় অনেক টেনিস ময়দানে দেখা যায় ফিরিঙ্গি পাড়ায় এবং আলিপুরে বালিগঞ্জে।

খেলা আরম্ভ হবার আর বেশি দেরি নেই। সবাই সবাইকার সঙ্গে কথাবার্তায় মত্ত, সরলা ছাড়া। সে বিমর্ষভাবে একটা পাম গাছের ছায়ায় বসে আছে তৃণভূমির কোণে। হঠাৎ কাকে দেখে সে যেন খুশি হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। অণিমা চেয়ে দেখলে মিঃ সুর ওদিকের গেট দিয়ে ময়দানে ঢুকচেন! মোটাসোটা লোক, একটু বেঁটে অথচ থল্‌থলে নয়, বেশ আঁটসাঁট গড়নের চেহারা। মুখে চোখে উদার হাসি। নস্যি রংয়ের সুট পরনে—ভাল মানায় নি—যেন বালিশের-খোল-পরা গোছের দেখাচ্ছে।

অণিমা কৌতুকের সুরে বললে—আবার পরচর্চা! তোমাকে তো বলেচি, যার যা তার তা।

অণিমা চুপি চুপি বললে—সরলা বেচারীর জন্যে দুঃখু হয়! আই ডু পিটি হার—

—তোমার কিছু করবার আছে?

—কিছু না।

—তা হলে সেকথা ছেড়ে দাও। সরলাকে হিণ্ট দিয়েচি কতবার। ও বোঝে না।

এই সময়ে মিঃ সেন বলে উঠলেন—ওয়েক আপ, লেডিজ—

খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। মেয়েরা যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। উঠলো না কেবল সরলা আর উঠলেন না মিঃ সুর। মিঃ সুরকে দু-একজন কৃত্রিম আগ্রহের সঙ্গে অনুরোধও করলে, তিনি বললেন, খেলা তিনি জানেন না ভালো। তিনি শুধু দেখতে এসেচেন।

কিছু পরে খেলোয়াড় দল বিশ্রাম করতে এল। অমনি গৃহভৃত্য ছুটে এসে সকলের

হাতে হাতে ঠাণ্ডা বার্লির জল, চা, বরফ-মিশ্রিত পানীয় বা কফি পরিবেশন করতে লাগলো। মিঃ বাসুর নৈপুণ্যের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো চারিদিক। সকলে ঘিরে দাঁড়ালো মিঃ বাসুর চারিদিকে।

মিঃ সেন বললেন—মিঃ বাসু, ভাবচি আপনার শিষ্য হবো। আই উড বি প্রাউড টু বি ইওর ডিসাইপ্‌ল্।

মিঃ বাসু বার্লির-জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে কায়দার সঙ্গে সিগারেট ধরিয়ে বললেন—গুরু হবার কৃতিত্ব দাবী করতে পারি নে।

অণিমা বললে—কি যে বলেন—

—কেন? মিথ্যে বললাম?

—অতিশয় বিনয়ের কথা হোল। আপনার যা হয়েচে, ক'জনের ও রকম সৌভাগ্য ঘটে? আপনার খেলা দুচোখ ভরে দেখলেও আই উড্ থার্স্ট ফর মোর—

—ধন্যবাদ।

—না, সত্যি বলচি, আমাকেও আপনি শিষ্য করে নিন না?

—শিষ্য? ব্যাকরণ ভুল হ'ল, শিষ্যা হবে কথাটা।

—যা বলেন। না সত্যি, করে নিন না শিষ্যা?

—তথাস্তু।

সকলে হেসে উঠলো। তরলা বললে—কথা বলবার কি সুন্দর ভঙ্গি! ও-ও শিখতে হয় আপনার কাছে।

অণিমা বললে—একশো বার।

মিঃ সেন বললেন—বাঃ, আমি কথাটা তুললাম, আর আপনি ও তরলা দেবী কথাটা একচেটে করে নিলেন দেখচি।

মিঃ বাসু হেসে বললেন—লেডিজ প্রিভিলেজ—

এই সময়ে পুনরায় খেলা আরম্ভ হওয়ার সময় হোল। সবাই যে যার জায়গায় খেলতে উঠে চলে গেল। মিঃ বাসু নিজের র‍্যাকেটের তাঁতগুলোতে হাত দিয়ে বললেন—একখানা ভালো র‍্যাকেট দিতে পারেন কেউ! পাট্‌গুলো ঢিলে হয়ে পড়েচে। দুটো ছিঁড়ে গিয়েছে—বড্ড অসুবিধে হচ্ছে—

তরলা বললে—এই নিন আপনি আমার-খানা।

—আপনি?

—আমি আনিয়ে নিচ্ছি—

অণিমা বললে—না হয় আমারটা নিন—

—না থাক। দুজনকেই ধন্যবাদ। এবারটা আমি এতেই চালিয়ে নেবো। তারপর মিঃ সুরকে দেখিয়ে চুপি চুপি বললেন—ও ভদ্রলোকটি কে?

অণিমা চুপি চুপি উত্তর দিলে—একটি নিরীহ ভদ্রলোক।

—পরিচয় কি?

—মিঃ সুর না সোম, কি জানি!

—ও, কি করেন?

—ভবঘুরে। এ জেণ্টলম্যান উইদাউট এনি ডিনোমিনেশন্।

—এখানে আগে কখনো তো দেখিনি?

—অনেকবার এসেচেন। মাঝে মাঝে আসেন। সরলা ওঁকে পছন্দ করে।

—রি-য়্যা-লি?

—শুনচি। আসুন, ইণ্ট্রোডিউস করে দিই, না?

ওরা সকলে আবার খেলতে গেল। এরা নিজের ভাবেই নিজে বিভোর হয়ে আছে. তরলা একটা নীল রংয়ের স্কার্ফ-রিফ নট্ করে বেঁধে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে র‍্যাকেট হাতে। মিঃ বাসু খেলার বিষয়ে কি একটা কথা তাঁর পার্টনার অণিমাকে বলচেন। অণিমার চোখে সপ্রশংস মুগ্ধ দৃষ্টি। এখানে যে ক'টি মেয়ে আছে, এদিকে এরা, ওদিকে মিঃ সেনের বড় মেয়ে মৃদুলা, শ্যালিকা মঞ্জুশ্রী—সুনিপুণ খেলোয়াড় মিঃ বাসুকে এরা

ইষ্টদেবের আসনে বসিয়েচে। একটুখানি খেলা বন্ধ হোলেই মিঃ বাসুর চতুর্দিকে তরুণীরা মুগ্ধনেত্রে ভিড় করে দাঁড়াবে এবং রজত-বিগলিত কণ্ঠের কলধ্বনি শুরু হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। মিঃ সুর একটা সিগারেট নিয়ে সবে ধরিয়েছেন, এমন সময় সরলা এসে ওঁর কাছে বসলো। বললে—কি ভাবচেন?

—ভাবচি মিস মিত্র, আমি খেলতে পারি নে কেন?

—শেখেন নি কেন?

—সময় পাইনি। সত্যি বলচি। এক সময় ভেবেছিলাম ক্যামেট্-পর্বতচূড়ায় উঠবো। চেষ্টা করেছিলাম সেদিকে। একবার ভেবেছিলাম নাঙ্গা পর্বতে উঠবো—এশেন্ ব্রেনার যে বছর মারা গেল নাঙ্গা পর্বতের চার নম্বর ক্যাম্পে, আমি তখন সেই ভীষণ স্নো-স্টর্মের মধ্যে তিন নম্বর ক্যাম্পে আছি। আমার মাথার ওপর বিরাট নাঙ্গা পর্বতের খাড়া ঢালু—চারিপাশ গুঁড়ো বরফে আচ্ছন্ন, কিছু দেখা যায় না।

—বলুন, বলুন—কি ভালোই লাগচে—

—এমন সময় নেপালী ক্যাম্প-ফলোয়ার টুটি থাপা এসে বললে—সব খতম্ হো গিয়া হুজুর—আমি আর একজন জার্মান—ওটা ছিল জার্মানদের অভিযান—আবার উঠতে লাগলাম চার নম্বর ক্যাম্পে—

—সেই বরফের ঝড়ের মধ্যে?

—না। সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে যখন বরফের ঝড় কমলো, তখন।

—আপনার কথা শুনে মনে হয় এরা কি সব ছোট জিনিস নিয়ে থাকে। এদের এই খেলা, সো-কল্‌ড্ স্মার্টনেস, এদের ইংরিজি বুলি আমার এত খারাপ লাগে। বড় জিনিসকে নিয়ে, বড় কল্পনাকে নিয়ে যদি না থাকতে পারা গেল তবে মানুষ হয়ে জীবনের সার্থকতা কি?

মিঃ সুর হেসে বললেন—আমাকে ঘরছাড়া করেচে আজ কিসে? কবে হয়তো ওই বিরাটের স্বপ্ন দেখেছিলাম, তারপর থেকে শুধু মরুভূমিতে, পর্বতে, বনে বেড়িয়ে বেড়াচ্চি, কিসের যে নেশায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়! কতবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এসেচি। মরুভূমিতে দিক্‌হারা হয়ে জলের অভাবে মরণের অর্ধেক পথে পৌঁছে ফিরে এসেচি সে সব গল্প একদিন করবো মিঃ মিত্র—নিরিবিলি বসে। আজ এই টেনিস খেলার মাঠ তার উপযুক্ত স্থান নয়।

—শুধু আমাকেই বলবেন কিন্তু।

—আর তো কেউ শুনতে চায় না। এখানকার আর তো কারো শোনবার আগ্রহ নেই, আপনাকেই বলবো।

—বসুন। আপনার জন্যে কি আনবো?

—কিছু না।

—আইসক্রিম খান একটু।

—ধন্যবাদ। আপনি বসুন, ব্যস্ত হবেন না।

এই সময় খেলা ভাঙলো। তরলা, অণিমা ও মিঃ বাসু একসঙ্গে এসে ওদের ডান পাশের চেয়ারগুলো দখল করলে। মঞ্জুশ্রী ও খুকী সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

অণিমা মিঃ বাসুকে বললে—বার্লি-ওয়াটার?

—থ্যাংক্‌স্। আধ গ্লাস।

সরলা এই সময় অণিমাকে বললে—অনি, মিঃ সুরের জন্যে একটা আইসক্রিমের কথা অমনি বলে দাও না—

মিঃ বাসু গলার সুর নীচু করে বললেন অণিমাকে—আইসক্রিম! মেয়েদের খাদ্য বলেই ওটাকে আমার জানা আছে।

অণিমা বললে—সবাই সমান পুরুষ মানুষ হয় কি?

—কি নাম বললেন সরলা দেবী? আমি শুনিনি ঠিক! অন্যমনস্ক ছিলাম।

তরলা বললে—মিঃ সুর। আসুন, ইণ্ট্রোডিউস করে দিই?

অণিমা চোখ টিপে বারণ করে বললে—থাক।

মঞ্জুশ্রী হেসে বললে—কেন?

অণিমা বললে—সকলের সঙ্গে সকলের মিশবার যোগ্যতা থাকে কি? আমাকে তুমি যাই বলো মঞ্জু, হয়তো তুমি দোষ দিতে পারো কিন্তু আমার মনে হয় পুরুষ যদি পুরুষের মতো না হয়, তেমনি স্মার্ট না হয়, তাহোলে জবুথবু জবড়জঙ্গ ধরণের—

তরলা হি-হি করে হেসে বললে—আর একটা বিশেষণ বাদ দিলে, সেটা হোল—

মঞ্জু অমনি টপ করে বলে ফেললে—জ-র-দ-গ-ব—

তরলা মুখে আঙ্গুল দিয়ে বললে—স্-স্-স্—

এই সময়ে ভৃত্য বার্লির জল, আইসক্রিম প্রভৃতি ট্রে ভর্তি করে নিয়ে এসে তরলার সামনে ধরলে। তরলা ও অণিমা ট্রে থেকে খাদ্য ও পানীয় উঠিয়ে নিয়ে যার যার হাতে পরিবেশন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সকলের আগে মিঃ বাসুকে ও সর্বশেষে মিঃ সুরকে দেওয়া হল।

ঠিক এই সময়ে একখানা টু-সিটার অস্টিন্ ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো ; তা থেকে নেমে মিঃ দে আর তাঁর কন্যা শকুন্তলাকে দেখা গেল টেনিস কোর্টে ঢুকচেন।

মিঃ দে এ-সমাজের চূড়ামণি, পৌরসভার ডেপুটি মেয়র, কলিকাতা হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিস্টার, বড় কংগ্রেসী পাণ্ডা, সাহিত্যিক ও বক্তা। এদের দলে যখন মেশেন, তখন এরা বিনয়ে বিগলিত হয়ে থাকে সর্বদা। ওঁরা টেনিস কোর্টে ঢুকতেই সকলে সমস্বরে ওঁদের অভ্যর্থনা করলে।

—এই যে মিঃ দে, এই যে মিস্ দে, আসুন, আসুন, সো গুড্ অফ ইউ টু।

—মিস দে-কে যে বড্ড টায়ার্ড দেখাচ্চে—বসুন—বসুন, ইত্যাদি।

তরলা বললে—শকু দিদি—সেই হাজারিবাগ আর এই। কতদিন—

হঠাৎ মিঃ সুরের দিকে চোখ পড়াতে মিঃ দে যেন অবাক হয়ে গেলেন। এগিয়ে এসে ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—আপনি!

শকুন্তলাও এগিয়ে এসে বললে—মিঃ সুর! সত্যি আপনি!

মিঃ সুর দাঁড়িয়ে উঠে ওঁদের অভিবাদন করলেন। বললেন—আমি এখানে মাঝে মাঝে আসি। তবে মধ্যে পাঁচ-ছ'মাস আসি নি।

মিঃ দে বললেন—আসবেন কেমন করে? আপনার কথা যে কাগজে বেরিয়েচে আজ আপনার ছবি পর্যন্ত বেরিয়েচে। শকুন্তলা কাগজখানা গাড়ি থেকে নিয়ে এসো তো মা, সিন্ধুনদীর গর্জ আর কেউ বিজয় করে নি ফ্রাঙ্ক নটন বাদে। বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেচন আপনি।

মিঃ সেন বললেন—ইনি কি করেচেন বললেন?

মিঃ দে বললেন—ইনি হোলেন বিখ্যাত পর্যটক ব্যোমকেশ সুর। এ'র কথা 'ইউ পি'র সমস্ত কাগজে। আমি পরশু লখ্নউ থেকে আসচি। সিন্ধু নদীর বিরাট খাত ইনি একা বেড়িয়ে এসেচেন। কি দুর্গম পথযাত্রা সে! শকু মা, কাগজ এনেচো? এই দেখুন এ'র ছবি। পড়ে দেখুন সবটা। বাঙ্গালীর মুখ একশোবার উজ্জ্বল করেচেন আপনি। ফ্রাঙ্ক নর্টনের পর এ দুঃসাহসিক কাজ আর কেউ করে নি—সকলে বুঝতে পারবে না ইনি কি করেচেন—বাঙ্গালীর মধ্যে এত বড়—

মিঃ সেন বললেন—কবে গিয়েছিলেন?

মিঃ দে কাগজখানা খুলে সকলের দিকে ফিরিয়ে দেখিয়ে বললেন—দেখুন, এই তো সেদিন ফিরেচেন, আজ দিন দশ-পনেরো হোল, এই দেখুন এ'র ফটো। মিঃ সুর, আমাদের কাগজে ধারাবাহিকভাবে আপনি সিন্ধু অভিযান লিখুন! পাঁচ হাজার টাকা অফার রইল আমার। স্টেটসম্যান জানে না যে আপনি কলকাতায়। তা হোলে এখুনি লুফে নেবে। আমার অফার রইল কিন্তু মিঃ সুর।

শকুন্তলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ সুরের দিকে চেয়ে বললে—কাল আমাদের বাড়ী আসুন মিঃ সুর। গল্প শুনবো আপনার মুখে। কেমন তো?

অণিমা ও তরলা হাঁ করে এদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এই সময় মিঃ বাসু এসে

দুজনকে চুপি চুপি বললেন, আমি আসি। একটা এনগেজমেণ্ট আছে এখুনি, আচ্ছা গুড নাইট।

কলহান্তরিতা

শ্যাম সরকার আমাকে ডেকে বললে—শোন বাবা, একটু বোসো।

হাট-বাজার করে ফিরছিলাম, বেলা হয়েচে, বেশি বসবার সময়ও নেই।

শ্যাম সরকার বুড়ো হয়েচে, বড্ড বকে। আমার এখন ওর বকুনি শুনবার সময় নেই। তবুও বললাম—কাকা ভাল আছেন?

শ্যাম সরকার ওর দোতলা বাড়ীর সামনে বসে মালা জপ করছে। আমি ওকে মালা জপ করতে দেখচি এইভাবে বসে আজ ত্রিশ বছর। লোকটা ঝানু বিষয়ী, টাকা ধার দিয়ে তার সুদ থেকে চালায়। আবার গীতার ব্যাখ্যাও করতে শুনেচি ওকে। এদিকে মামলা মোকদ্দমা করতে ছাড়ে না, তাও দেখতে পাই।

শ্যাম সরকার বললে—এসো বাবা, বোসো। চোখেও আজকাল খুব ভাল দেখি নে—একটা কথা শোনো। আমার একটা উপায় করে দাও বাবা—

—কি উপায় কাকা? কিসের উপায়?

আমার ছেলে বিষ্টু বড় বদ হয়ে উঠেছে। দিন রাত কেবল আমার সঙ্গে ঝগড়া। আমায় বলে, বিষয়-সম্পত্তির ভাগ দাও। বসে বসে খাবে কেবল। কোন কাজ করবে না। ওবেলা তো আমায় মারতে এসেছিল। এর একটা—

—কাকীমা কিছু বলেন না?

—তাহলে আর ভাবনা ছিল কি? সেও ছেলের দিকে। দু'জনে মিলে আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। এর একটা বিহিত করো বাবা—

—আমি এর কি বিহিত করবো বলুন। বিষ্টু আমার কথা কি শুনবে? মিছে মিছে অপমান হওয়া।

—অপমান করলেই হোল অমনি? তোমরা হোলে সোনার চাঁদ ছেলে—তোমরা এর একটা প্রতিকার করতে পারবে না?

—মাপ করবেন কাকা। আপনাদের গৃহবিবাদের মধ্যে আমাদের থাকবার দরকারই বা কি? ও আমার দ্বারা হবে না।

এ দিনটি কোনো রকমে নিস্তার পেয়ে এলাম বটে কিন্তু পরদিন আবার শ্যাম কাকা আমায় ধরেচে রাস্তায়। বিকেলে তাস-খেলার আড্ডায় বেরুচ্চি, শ্যাম কাকা বললেন—শোনো বাবা—

—এখন একটু ব্যস্ত আছি কাকা। শুনব এখন অন্য সময়—

—ওই বাবাজি তোমাদের দোষ। একটুখানি দাঁড়াও না? এই দ্যাখো তোমার খুড়ীমা আমায় আজ কি ক'রে মেরেচে—

—মেরেচেন? খুড়ীমা!

—মিথ্যে কথা বলচি বাবা? হয় না হয় তুমি ললিতকে জিজ্ঞেস ক'রে দ্যাখো। আমায় রক্ষে কর বাবা। আমায় আজ খেতে দেয় নি, দুটো ভাতও দেয় নি। আমায় বাঁচাও—

কথা শেষ ক'রে শ্যাম কাকা আমার হাত দুটো খপ ক'রে ধরে ফেললেন।

অগত্যা শ্যাম সরকারের বাড়ীর মধ্যে আমায় ঢুকতে হোল।

ঢুকে বললাম—ও খুড়ীমা—

শ্যাম কাকার বাড়ীর মধ্যে অনেকগুলো ঘর। ওদিকে শান-বাঁধানো বড় রোয়াক, টিউবওয়েল, পাকা রান্নাঘর, গোয়াল—বেশ সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহস্থালির সুস্পষ্ট চিহ্ন সর্বত্র। কিন্তু ওদের সংসারে যে শান্তি নেই, তা এ গ্রামে সকলেই জানে। এদের বাইরের ঠাট যেমনই হোক, ভিতরে অনেক পরিমাণে অন্তঃসারশূন্য।

খুড়ীমা তালের বড়া ভাজবেন বলে তোড়জোড় করছিলেন, কারণ হাতে তালের গাদ,

হলদে রস মাখা ; রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে খুড়ীমা রোয়াকে দাঁড়ালেন—যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, লাল-চওড়া-পাড় শাড়ী পরণে, পায়ে আলতা, মাথায় একঢাল চুল, মুখশ্রীতে প্রৌঢ়া সুন্দরীর গম্ভীর স্থির সৌন্দর্য। আমার দিকে চেয়ে বললেন—কে, রমেশ? কি বাবা?

আমতা আমতা ক'রে বললাম—এই খুড়ীমা, বল্‌চি কি—

কথা বেধে যেতে লাগলো। খুড়ীমার ঝঙ্কার ও দাপটের খ্যাতি এ গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়ে জুড়ে বসেচে অনেক কাল থেকে। সকলেই জানে কি রকম চিজ্ তিনি। এই সন্ধ্যেবেলা শেষে কি গোলমাল বাধাবো? ভাল হাঙ্গামাতেই পড়েছি! বেশি পরোপকারের প্রবৃত্তি থাকলেই এ রকম বিপদে পড়তে হয়, এ আমি লক্ষ্য ক'রে আসচি বরাবর থেকে।

খুড়ীমা রুক্ষ নীরস কণ্ঠে বললেন—আমার আবার সময় নেই। তালের গোলা মাখচি দেখতেই পাচ্চ বাপু। কি বলবে বল—

খুড়ীমা ঝানু মেয়েমানুষ, নিশ্চয়ই বুঝেচেন আমি কি বলবো।

শক্তি সঞ্চয় ক'রে বললাম—কাকা নাকি আজ খান নি—ওঁর এ বয়সে ঠিক সময়ে খেতে না পেলে—

খুড়ীমা আমার সামনে এসে হাত নেড়ে বললেন—ওই বুড়ো বদমায়েশ লাগিয়েচে বুঝি? তা লাগিয়ে আমার কি করবেন শুনি? গাঁয়ের লোকে কি চাল কেটে আমায় উঠিয়ে দেবে গাঁ থেকে? হ্যাঁ, খেতে দিই নি! বুড়োর বচনে পিত্তি জ্বলে যায়, সে বচন যদি শোনো বাবা, তখন তুমিও বলবে যে হ্যাঁ, বচন বটে একখানা। আমার ওই ধুলো-গুড়োটুকু নিয়ে সংসার করচি বাবা, আমার শিব রাত্তিরের শল্‌তে টিম্ টিম্ ক'রে জ্বলচে, ওই আমার বিষ্টু—ওকে বুড়ো বলে কি না, পয়সা না রোজকার করিস তো বাড়ী থেকে বেরো। তুমিই বলো দেখি বাবা, বিষ্টু বাড়ী থেকে বেরিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াবে, আর আমি বসে থেকে ওই বুড়ো ভূতকে ক্ষীর-সর-ননী খাওয়াবো? তাই বলি ছাই খেতে দেবো তোমাকে। তাই খেতে দিই নি—সোজা কথাই তোমাকে বললাম, এখন তুমি আমার কি করবে করো—

আমি জিভ কেটে বললাম—সে কি কথা খুড়ীমা, ছি ছি—আমি আপনার সন্তানের মত—এ সব কথা আমাকে—

খুড়ীমা বললেন—বোসো বাবা, তালের বড়া ভাজচি, খেয়ে যাও গরম গরম—

আমি বললাম—সে হবে এখন। কাকাকে আপাততঃ কিছু খেতে দিন, ওঁর খাওয়া হয় নি সারাদিন। ডেকে আনবো?

খুড়ীমা মুখ ঘুরিয়ে বললেন—না। অত আত্যিসুয়ো তোমার করবার কোন দরকার দেখি নে তো!

—দরকার বেশ দেখা যাচ্চে, খুড়ীমা! কাকাকে ডেকে আনি, দেখুন—বুড়ো মানুষ, ও-রকম করবেন না। কিছু খেতে দিন ওঁকে।

—আচ্ছা, একটু পরে যেও। তালের বড়া একখোলা নামাই—পোড়ারমুখে না হয় গরম গরম দু'খানা দেবেন এখন বুড়ো, যমের অরুচি—

—ছি খুড়ীমা, অমন ক'রে বলা আপনার উচিত হয়? বলবেন না ওরকম।

পিছনের দিকে দোরের কাছে কখন শ্যাম কাকা এসে হুঁকো হাতে দাঁড়িয়েছেন, টের পাই নি। তিনি অমনি দোর থেকে বলে উঠলেন—শুনচো তো বাবাজি? শোনো, নিজের কানে শুনে যাও তোমার খুড়ীমার বচন—মধু ঢেলে দিচ্ছে একেবারে কানে। ওই মাগী যদি এ ভাবে—সংসার উচ্ছন্ন দিলে ওই বদমাইশ মাগীই তো—

এর পর উভয়ে ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে গেল। আমি কিছুক্ষণ উভয়পক্ষকে নিরস্ত করার বৃথা চেষ্টার পরে সরে পড়বার যোগাড় করচি, এমন সময় খুড়ীমা ডাকলেন—কোথায় যাও বাবা? দাঁড়াও, তালের বড়া খেয়ে যাও—

আর তালের বড়া! যে কাণ্ডটা দুজনে সন্ধ্যেবেলা বাধালেন, ভাবলাম একবার বলি!

মুখে বললাম—আচ্ছা, খুড়ীমা; আমি বসচি। আপনারা দয়া ক'রে একটু চুপ করবেন?

খুড়ীমা আর কোন কথাটি না বলে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

শ্যাম কাকা আমাকে চুপি চুপি বললে—তুমি একটু বলো বাবাজি, দু'খানা তালের বড়া যেন আমাকেও দেয়—বড্ড খিদে পেয়েছে। আমি ততক্ষণ হরিনামটা সেরে নিই—সন্দে হয়ে এল—

আমায় কিছু বলতে হোলো না। খুড়ীমা দুটো কাঁসার জাম-বাটিতে তালের বড়া নিয়ে এসে বললেন—অমুক বুড়ো (খুড়ীমার ব্যবহৃত বিশেষণটি অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট বলে এখানে উল্লেখ করা গেল না) কোথায় গেল?

—আজ্ঞে তিনি সন্ধ্যে আহ্নিক করতে গেলেন—

—ওর মুন্ডু আহ্নিক। ডেকে দ্যাও, খেয়ে তিনি আমার মাথা কিনুন—

আমি ডেকে আনলাম বাইরের ঘর থেকে।

খুড়ীমা কিন্তু আমাকে অবাক ক'রে দিলেন শ্যাম কাকাকে ডেকে আনবার পরে। আমার অস্তিত্বই যেন তিনি ভুলে গেলেন। শ্যাম কাকাকে তালের বড়া খাওয়াতেই তাঁর সারা মন যেন ঢেলে দিলেন। তবে সম্বোধনের বাণী মধুর ছিল না, মধুর তো দূরের কথা, শিষ্ট বা ভদ্রও ছিল না।

নমুনা কিছু নীচে দেওয়া গেলঃ—

—গেলো—যমের অরুচি—গেলো। তা ভালো হয়ে বোসোও না হয়? কোন্ মড়ার ঘাটে তোমার জন্যে বাঁশ তৈরি রয়েচে যে আজ সারা দিন বাইরে বসে থাকা হয়েছিল শুনি? আমার তো বড্ড দোষ, দেশ পিরথিম তো ছেয়ে ফেললে আমার অপযশ গেয়ে। এখন তারা এসে তোমায় গিলতে দিক দেখি? বলি, মুখে বলতে সবাই আছে, দুটি বেলা পিন্ডি সেদ্ধ করবার বেলা কোন যম তোমার আছে শুনি? দাঁড়াও, আর দু'খানা গরম গরম এনে দিই—তাড়াতাড়ি কিসের শুনি? বলে সেই এক কড়ার মুরোদ নেই, নাম গঙ্গারাম—ইদিকে তেজটুকু আছে ষোল আনার ওপর সতেরো আনা। সে-বার আশ্বিন মাসে যখন দাঁত ছরকুটে বিছানায় পড়ে জ্বরে বেহুঁশ হয়েছিলে, তখন দেখে নি এসে পাড়ার লোক? এই মাগীর তো যত দোষ, এই মাগী না থাকলে যে কোন্ কালে শ্মশানঘাট আলো করতে? শেয়াল-শকুনে হাড়-মাংস ছেঁড়াছেঁড়ি করতো? পেট ভরেচে? না গুড় দিয়ে দু'খানা খাবে? ভাল হয়েচে? তবু তো নারকোল পড়ে নি। বাড়ীর লোক নারকোল এনে দেবে তবে তো হবে? তা না সকাল থেকে শোনো শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া—যম ভুলে রয়েচে কেন? যমে তোমায় নেয় না? পান ছেঁচে আনবো? ঠান্ডা হাওয়া হচ্চে—পুবে স্যাঁওটা দেখা দিয়েচে—এন্ডিখানা নিয়ে আসি, গায়ে দিয়ে গিয়ে বোসো—নইলে সর্দি-কাশির থুতু-গয়েরে ঘর ভরিয়ে ফেললে সে তোমার যমকে ডেকে এনে পরিষ্কার করিয়ো বলে দিচ্চি স্পষ্ট কথা—এই ন্যাও গামছা—

খুড়ীমার স্বামী-শুশ্রূষার আতিশয্যে আমি কোথায় তলিয়ে গেলাম, একবার মাত্র আমার বাটিতে তালের বড়া দিয়ে আর আমার দিকে তিনি ফিরেও চাইলেন না।

মুক্তপুরুষ হরিদাস

এটি মুক্তপুরুষ হরিদাসের জীবনী।

হরিদাস চক্রবর্তী বি-এ, বি-টি এখানকার স্কুলে অনেকদিন ধরিয়া মাস্টারি করিতেছেন। সম্প্রতি মুশকিল হইয়াছে এই যে, একে দিনে রাতে চোখের অসুখে তিনি রীতিমত ভুগিতেছেন, তাহার উপর হেডমাস্টারের কড়া তাগাদা—হাফ-ইয়ারলির খাতাগুলো আর ক'দিন ফেলে রাখবেন মশাই? সব মাস্টারদের খাতা দেওয়া হয়ে গেল, আর আপনি ফাইভ্ উইক্স্ খাতা নিয়ে বসে আছেন—একখানাও দেখলেন না—এতে ক'রে স্কুলের কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্চে।

হরিদাসবাবু বিনীত ভাবে বলিলেন—চেষ্টা তো করচি স্যার, চোখের জন্যে পড়তে পাচ্ছি না, দিচ্চি যত শীগ্গির হয়—

আবার তিন দিন গেল। আবার হেডমাস্টার কড়া তাগাদা দেন—কি মশাই? এখনো আপনি খাতা দিচ্ছেন না?

—দিচ্ছি স্যার, আর দু-পাঁচটা দিন—

—না মশাই, তা হবে না। আপনি পরশু নিশ্চয় খাতা দেবেন, নয়তো স্টেপ নিতে বাধ্য হবো। আমি কোনো অন্‌প্লেজ্যান্ট ব্যাপার করতে চাই নে, কিন্তু—

তার উপর বাড়ীতে একপাল ছেলেমেয়ে দিনরাত খাই খাই করিতেছে, তাহাদের খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে, ত্রিভুবনে হেন বাপ-মা আজও জন্মগ্রহণ করে নাই। সামান্য বিয়াল্লিশ টাকা বেতনের স্কুল মাস্টার হরিদাসবাবু এই যুদ্ধের বাজারে আর কত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে পারেন?

খাতা একটি গাদা। সকালে উঠিয়া টিউশানি করিতেই সময় কাটিয়া যায়, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে একটা কথাবার্তা বলিবার পর্যন্ত সময় হয় না। বাজার করিতে হয় টিউশানি করিয়া ফিরিবার পথে। বাড়ীতে গিয়াই শুনিতে হয়, গিন্নি বলিয়া বসেন, আজ একখানা শাড়ী দ্যাখো, যেখানেই হোক, মেয়েটা কি ন্যাংটো হয়ে থাকবে? তোমার না হয় গা হিম ক'রে বসে থাকলে চলে, আমার তো তা চলে না?

কাপড় কোথা হইতে আসে সে জ্ঞান যদি বাড়ীর মেয়েদের থাকিত। তাহা ছাড়া দু-এক মাস হয়, লোকে পারে। এই ব্যাপার চলিতেছে কি আজ? কতকাল হইতে এই অবস্থায় তিনি কালযাপন করিতেছেন বা আরও কতকাল করিতে হইবে, তাহা কে জানে?

কিন্তু উপায় কি? উপায় তো কিছুই দেখেন না।

এই সময় আর একদিন হেডমাস্টারের কড়া কথা শুনিতে হইল পরীক্ষার খাতা ভাল করিয়া দাগ দিয়া না দেখার দরুণ। হেডমাস্টার বলিলেন—খাতাগুলো কি অমন ক'রে দেখে? ওতে ছেলেদের কি সুবিধে হবে মশাই? আপনি আজকাল কাজে বড় অমনোযোগী হয়েচেন, খাতাগুলো ফেরৎ নিয়ে যান, ওতে কাজ চলবে না।

সেদিন টিফিনের ছুটিতে স্কুলের গাছতলায় বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে হরিদাস-বাবুর মনে হইল এ বিষম বিপদ হইতে কবে তিনি পরিত্রাণ পাইবেন। এই বন্ধন দশা চলিতেছে কতকাল। এমন কি কোনো উপায় নাই, যাহাতে তিনি এই দুঃখ, দারিদ্র্য ও ক্রীতদাসত্বের বন্ধন এড়াইতে পারেন?

ভগবান এ প্রার্থনা শুনিলেন।

কি ভাবে তাহা বলি। বড় আশ্চর্য ঘটনা।

থার্ড ক্লাসের শ্রীপতি কুণ্ডু বেঞ্চির তলায় লুকাইয়া কি বই পড়িতেছে হরিদাসবাবু দেখিতে পাইলেন। দু'বার বারণও করিলেন—এই কি হচ্ছে? অঙ্ক কষো—তাড়াতাড়ি কষো—

কিন্তু শ্রীপতি অঙ্ক কষিবে কেন, ভগবান যে অদ্য তাহাকেই দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন সংসারক্লিষ্ট হরিদাসের নিকট। এরূপ অলৌকিক ঘটনা আপনারা মহাপুরুষদের জীবনীর মধ্যে অনেক পাঠ করিয়াছেন, মনে করিয়া দেখুন। শ্রীপতি আবার লুকাইয়া সেই বইখানা পড়িতে লাগিল। এবার হরিদাসবাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া গিয়া তাহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া তাহার কান সজোরে মলিয়া দিলেন। পরে চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। কৌতূহলবশতঃ বইখানা খুলিলেন। আগে ভাবিয়াছিলেন, কোনো নাটক নভেল হইবে—অন্ততঃ ভূতের গল্প। কিন্তু তা নয়, বইখানার নাম 'বীর-বাণী', স্বামী বিবেকানন্দ রচিত। হরিদাসবাবু ধর্মের ধার কখনো ধারিতেন না, তবে বিবেকানন্দের নাম ভালই জানিতেন। বইখানা একবার পড়িয়া দেখিবেন বলিয়া হাতে করিয়া রাখিয়া দিলেন।

পরদিন রবিবার। টিউশানি ছিল না। বাড়ীতে চা খাইয়া হরিদাসবাবু বইখানা লইয়া বসিলেন। পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গেলেন। এসব কি কথা! আমিই সেই! আমিই ভগবান। অহং ব্রহ্মাস্মি। সোঽহং।

কি মহান, বিরাট আইডিয়া! কি হিমালয়ের মত উদার গগনচুম্বী বাণী! হরিদাস মাস্টার ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মাথা গিয়া মহাব্যোমে ঠেকিল,

স্বসংবেদ্য অনুভূতিতে মনপ্রাণ ভরিয়া গেল, তিনি আজ অজর, অমর, শাশ্বত আত্মা, ভগবান আর তিনি হাত ধরাধরি করিয়া যুগ-যুগ পার হইয়া চলিয়া আসিয়াছেন অনন্তকাল ধরিয়া, চলিবেন অনন্তকাল ধরিয়া। তিনি মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক, মহাবীর। জগতকে বেদান্ত শিক্ষা দিবার জন্য, এই পরম সত্য প্রচার করিবার জন্য তিনি লীলাদেহ ধারণ করিয়াছেন—ক্রমে একথাও ধীরে ধীরে হরিদাসবাবুর মনের নিভৃত কোণে বাসা বাঁধিতে লাগিল।

হরিদাস মাস্টার ব্রাহ্ম।

এক আধদিন নয়, সাতদিনে বইখানি অন্ততঃ পাঁচবার পড়িলেন। খাতা দেখিবার জন্য ফোর্থ ক্লাসের নুরুল হকের নিকট হইতে যে নীল পেন্সিলটা আনিয়াছিলেন, তাহা দিয়া দাগ মারিয়া পড়িলেন, ছেলেদের পরীক্ষার কাগজ হইতে সংগৃহীত সাদা কাগজে অনেক ভালো ভালো কথা টুকিয়া রাখিলেন, রাত্রি জাগিয়া বইখানার মধ্যে উদ্ধৃত অনেক সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিলেন, মোটের ওপর বইখানি লইয়া মশগুল হইয়া রহিলেন।

ধন্য শ্রীপতি কুণ্ডু! তুমি বালকমাত্র, তুমি জানো না দুঃস্থ, হতভাগ্য শিক্ষকের জীবনে তুমি কি জিনিস দিলে। এ অনেকটা সেই ঘটনার মত। হরিদাসবাবু ও তাঁহার এক বন্ধু পায়ে হাঁটিয়া বৈদ্যবাটি বেড়াইতে গিয়াছিলেন, দুপুর ঘুরিয়া গেল, দু'জনেই অভুক্ত। অবশেষে কোথাকার বাজারের এক অপকৃষ্ট হোটেলে তাঁহারা পিতলের থালায় মোটা চালের ভাত খাইতে বসেন। তখন দুপুর অনেকক্ষণ ঘুরিয়া গিয়াছে। তাঁহার বন্ধুটি দারুণ ক্ষুধার মুখে ভাত পাইয়া মহা খুশি, খাইতে খাইতে গদগদকণ্ঠে বার বার বলিতে লাগিল—হরিদাস তুমি জানো না সিস্টেমকে তুমি কি দিলে!

হরিদাসবাবুর বড় মনে ছিল কথাটা।

শ্রীপতি কুণ্ডু তুমিও জানো না, হরিদাসবাবুকে তুমি কি দিলে।

এই সাতদিনে হরিদাসবাবু সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেলেন। এমন সব বাণী পৃথিবীতে আছে তাঁহাকে কেহ বলে নাই। তিনিই বা কি করিয়া জানিবেন?

স্কুলে গিয়া শ্রীপতি কুণ্ডুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে, ও বই কোথায় পেলি?

—আজ্ঞে ও দাদার বই।

—কোথায় পেলে রে তোর দাদা ও বই?

—কোত্থেকে এনেছিল স্যর। আরও আছে ওইরকম দু'তিনখানা বই।

—আছে? আজ টিফিনের সময় নিয়ে আসবি। অবিশ্যি করে—আনবি—বুঝলি?

টিফিনের ছুটির পরে শ্রীপতি কুণ্ডু আরও দুখানা বই আনিয়া দিল। বিবেকানন্দের রাজযোগ' এবং স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরির 'অধ্যাত্ম-দর্শন'।

হরিদাসবাবু যেটুকু সময় পান, বই দু'খানি পড়েন। দু'দিন টিউশনি কামাই করিলেন। হরিদাসবাবুর স্ত্রী তাগাদা দেন—তুমি এ দু'দিন ছেলে পড়াতে যাও নি যে? আজও তো হিম হয়ে বসে আছ। টিউশনি আছে তো?

—থাকবে না কেন?

—তবে যাও না কেন? ঐ দশটা টাকা আসে তাই দুধটা হয়। সকালের ছেলে পড়ানো চলে গেলে দুধ ছাড়িয়ে দিতে হবে। দাম জোগাবে কোথা থেকে? আজও যাবে না নাকি?

—আজ শরীরটা তেমন ভাল নেই।

—এই তো দিব্যি চা খেলে। যাও একবার বেড়াতে বেড়াতে. লালমোহন ঘোষ কথা লোক. সে-বার সেই জানো তো? বেণুর বিয়ের জন্যে তিন দিন কামাই হয়েছিল বলে ছাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আজ বসে থেকো না, যাও।

লালমোহনের তাগাদার চেয়েও গৃহিণীর তাগাদা কড়া। হরিদাসবাবু স্ত্রীকে ভয় করিয়া চলেন! অগত্যা বই লইয়া চলেন ছাত্রের বাড়ী। ছাত্রের বাবা লালমোহন ঘোষ বড় আড়তদার ব্যবসায়ী। ঘুঘু লোক। লালমোহন বাড়ী ছিল না তাই রক্ষা। হরিদাসবাবু আর আগের মত অত ভয়ও করেন না। যা বলে বলিবে। পুস্তকের অধীত জ্ঞান যদি দৈনন্দিন কর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে না পারা গেল, তবে জ্ঞানের মূল্য রহিল কোথায়।

স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরির পুস্তকেই আছে, "যে ব্যক্তি শুধু বোঝা বোঝা পুঁথি পড়ে অথচ একবারও আত্মচিন্তা করে না, ভগবানের সহিত একাত্মবোধ তাহার নিকট হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছে। সেবা-ধর্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ অনেক রচনা করিয়াছে, পাঠ করিয়াছে, কিন্তু কখনো ভিখারীকে একটা পয়সাও দেয় নাই, ভগবানকে চিনিতে বা বুঝিতে তাহার এখনো বহু বিলম্ব।"

হরিদাসবাবু ছাত্রকে ডাকিলেন—কেশব?

ছাত্র বাহিরে আসিয়া বলিল—কাল পরশু এলেন না স্যর?

হরিদাসবাবু আগে আগে এক্ষেত্রে বলিতেন, অসুখের জন্য আসিতে পারেন নাই। কিন্তু এবার তিনি সে লোক নহেন। এত ভয় কিসের? লালমোহন ঘোষের তিনি ধার ধারেন না। সত্য কথা বলিবেন, ইহাতে ভয় করিলে চলে না। অতএব বলিলেন—এমনি একটু অসুবিধে ছিল।

—বাবা বলছিলেন, তাই বলছি স্যর।

—কি বলছিলেন?

—বকছিলেন। জানেন তো বাবাকে। ওইরকম লোক।

—তা কি হবে এখন? বাড়ীতে অন্য কাজ ছিল। পড়ো।

ছেলেকে অঙ্ক কষিতে দিয়া হরিদাস মহেশ্বরানন্দ গিরির বই পড়িতে লাগিলেন।

"বিচারবলে কেহ কেহ জানিতে পারেন যে জগৎ ব্রহ্ম, সাক্ষাৎকার হইলে, তবে আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে দর্শন হয়।"

"যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ববিধ সংস্কার বর্জিত হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাকে ও বহুরূপী জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন।'

হরিদাসবাবুর দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, জ্ঞান তাঁহার হইয়া গিয়াছে। সব সংস্কারের একটি সংস্কারও তাঁহার নাই। ব্রহ্ম ও তিনি যে এক, এ জ্ঞান তাঁহার মর্মে মর্মে ঢুকিয়াছে।

কি ভয়ানক কথা!

এত সহজে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণার হাত এড়ানো যায়, কেহ এতদিন তাঁহাকে বলে নাই কেন?

পুনরায়—"মুক্ত-পুরুষসহ উপযুক্ত অবলম্বন করিয়া উত্তমপুরুষ ব্রহ্মে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়েন।"

সাধন তো তাঁহার হইয়া গিয়াছে। তিনি সব বুঝিতে পারিয়াছেন। সাধন না হইলে দিব্যজ্ঞান হয়? দিব্যজ্ঞান তাঁহার হইয়া গিয়াছে অথবা যদি বাকি থাকে, সামান্যই বাকি।

"তদবস্থায় গুণাতীত আশ্রয়রূপী ব্রহ্ম তাঁহাদের নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হয়েন এবং তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন।"

উঃ, এ সব কথা এতদিন কোথায় ছিল!

পুনরায়—"সময় না হইলে তত্ত্বসমূহ জীবের নিকট প্রকাশ করা হয় না। যে উপযুক্ত পাত্র, মহাপুরুষ-বাক্যের সম্পূর্ণ অনুকূল, শুধু তাঁহারই নিকট গভীর শাস্ত্রতত্ত্বসমূহ উপস্থাপিত হইয়া থাকে।"

ধন্য মহেশ্বরানন্দ গিরি! ধন্য শ্রীপতি কুণ্ডু!

আজ সময় হইয়াছে বলিয়াই তাহা হইলে এ তত্ত্ব তাঁহার চোখের সামনে ভগবান মেলিয়া ধরিয়াছেন।

দিন-কুড়ি কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, হরিদাসবাবু বুঝিতে পারিলেন না। আগের সে হরিদাসবাবু একেবারেই নাই। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করে সে কি আর সাধারণ মানুষ থাকে? হরিদাসবাবুর সাহস বাড়িয়া গিয়াছে, আগের মত ভীরু তিনি আর নাই, টিউশনির ছাত্রের পিতাকে আর তত গ্রাহ্য করিবার আবশ্যক কি? কিসের ভয় তাঁর? তিনি অজর অমর আত্মা। দু'দিনের জন্য লীলাখেলা করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। এতদিন বুঝিতে পারেন নাই তাই ছোট হইয়া ছিলেন।

হরিদাসবাবু স্বাধীন হইবেন।

সর্বপ্রথমে চাকুরী ছাড়িতে হইবে। জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

সেদিন ভাবিলেন, স্ত্রীকে সব খুলিয়া বলেন, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। দশটার সময় আহারাদি সারিয়া সাজিয়া গুজিয়া প্রতিদিনের মত বাহির হইলেন কিন্তু স্কুলে গেলেন না।

পথের মধ্যে আল্‌তাপোলের খালের ওপর যে পুল আছে, তাহার নীচে ঘাসের উপর ছায়ায় গিয়া বসিয়া রহিলেন। সঙ্গে দু'খানা অধ্যাত্মতত্ত্বের পুস্তক। একপ্রকার লুকাইয়াই রহিলেন এইজন্য যে স্কুলের ছেলেরা স্কুলে যাইবার পথে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। স্কুলে গিয়া হেডমাস্টারের কাছে বলিয়া দিবে অথবা বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রীর নিকট। চুপচাপ থাকিয়া বই পড়িতে পড়িতে বিড়ি টানিতে লাগিলেন। বিড়ি ফুরাইয়া গেল। অসুবিধা হইতে লাগিল। বাজার স্কুলেরই কাছে। সেখানে বিড়ি কিনিতে গেলে কেউ টের পাইবে। কি করা যায়?

রাস্তা দিয়া একটি লোক বিড়ি টানিতে টানিতে যাইতেছে। কে লোকটা? হরিদাস-বাবু মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন। একটা বিড়ি কি চাহিবেন? নাঃ, লোকটি কি মনে করিবে।

হরিদাসবাবু ডাকিলেন—ওহে শোনো—

লোকটি রেলিং হইতে নীচের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি বাবু?

—নেমে এসো। বাজারে যাচ্চ কি? দু'পয়সার বিড়ি আমার জন্যে আনবে?

—দাঁড়ান বাবু।

সে নামিয়া আসিল। বলিল—এখানে কি করচেন বাবু?

—এই—এই—ইয়ে কাঠের গাড়ী আসচে কিনা, তাই বসে আছি। কাঠ কিনবো।

লোকটা চলিয়া গেলে হরিদাসবাবুর মনে অনুতাপ হইল। ছিঃ, বিড়ির আসক্তিতে মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন? আর বিড়ি খাইবেন না। বিড়ি ত্যাগ করিলেন আজ হইতে। অবশ্য এই দুই পয়সার বিড়ি খাইয়া লইবেন আজকের মত।

বেলা চারটার পর হরিদাসবাবু পুলের তলা হইতে বাহির হইয়া বাড়ী আসিলেন। দিব্যি চা খাইলেন, খাবার খাইলেন, যেমন স্কুল হইতে ফিরিয়া প্রতিদিন খাইয়া থাকেন।

আবার পরদিনও সেই রকম। তবে এবার পুলের তলায় নয়, মাঠের মধ্যে একটা বটগাছের তলায় বসিয়া রহিলেন। অদ্য একটি বাণ্ডিল বিড়ি বসিয়া বসিয়া পুড়াইলেন।

এমনি ভাবে সাত দিন কাটিয়া গেল। দশটায় বাড়ী হইতে রোজ বাহির হন, আবার ঠিক সাড়ে চারটায় বাড়ী আসিয়া পেঁছান। কোনো হাঙ্গামা নাই, মুক্ত মন মুক্ত জীবন। এতদিনে তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কিন্তু বোধহয় ভগবান অধ্যাত্ম-সাধনার পথে বাধা সৃষ্টি করেন, সাধককে আরও উন্নত করিবার জন্য। সেদিন বাড়ী ফিরিতেই গৃহিণী বলিলেন—আজ মাইনে হয়েচে?

হরিদাসবাবু থতমত খাইয়া বলিলেন—মাইনে?

—হ্যাঁ গো, মাইনে হয় নি?

—না।

—কেন হয় নি? আজ তো ইংরেজী মাসের সাত তারিখ। পাঁচ তারিখে তো তোমাদের মাইনে হয়।

—আজও হয় নি।

—ইদিকে তো আর চলে না। হাজারী মেছুনি রোজ তাগাদা আরম্ভ করেচে, গায়ের মাংস খুলে খাচ্ছে। দুধওয়ালী আজ সকালেও তাগাদা দিয়েচে—তাদের বলে রেখেচি তুমি আজ মাইনে আনবে।

—তা আজ না দিলে আমি কি করবো?

—চালও বাড়ন্ত। কাল কি হবে তার ঠিক নেই। কি খেয়ে কাল ইস্কুলে যাবে? কাপড় একজোড়া না কিনলে এমাসে, বাড়ী থেকে আর বেবুনো যাচ্চে না।

—না যায় বেরিও না—

এই কথায় গৃহিণী তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া ধুন্ধুমার ঝগড়া শুরু করিলেন।

বড় মেয়ে আসিয়া বলিল—বাবা, আমার বই এনে দিলে না?

—কি বই?

—কবিতা সোপান, দ্বিতীয় ভাগ। না কিনলে বুড়ো মাস্টার রোজ বকে। তুমি কালই কিনে দাও বাবা।

—আচ্ছা, আচ্ছা, হবে। এখন যা।

গৃহিণী ওঘর হইতে গলা চড়াইয়া বলিলেন—কাল থেকে তোর ইস্কুলে যেতে হবে না। যতদিন না বই কেনা হয়, ততদিন ইস্কুলে যাবি নে, খবরদার বলচি।

সংসার অসার তো বটেই, ঘোর অশান্তিময়। এসব তিনি গ্রাহ্য করেন না, স্ত্রী বকিতেছে, বকুক। নারীজাতির স্বভাবই ওই। তাঁহার মন ব্রহ্মোপলব্ধির পন্থায় শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এসব সাংসারিক ঝগড়া দ্বন্দ্ব অতি তুচ্ছ জিনিস, তিনি এসবের ঊর্ধ্বে আছেন। চিরকাল তো তোমাদের দাসত্ব করিলাম, এখন জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে, চোখ রাঙাইয়া আর সাবেক পথে ফিরাইতে পারিবে না। বকিতেছে, বকিয়া মরুক।

মানুষ কত সহজে দেবতা হয়, তাঁহার জানা ছিল না। দেবতা কে, না যে সংসারের মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণপথে উদিত হইল। জয় ও পরাজয়, লাভ ও ক্ষতিকে যে সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারে সে-ই তো অধ্যাত্ম-রাজ্যের একজন বড় গাঁতিদার বা তালুকদার। তিনি আজ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত আছেন। কিসের বলে? ব্রহ্মোপলব্ধির বলে। আত্মসাক্ষাৎকার লাভের বলে। অতএব তিনি জীবন্মুক্ত। তিনি দেবতা।

পরদিনের প্রভাতটি যেন তাঁহার কাছে তাঁহার নবজীবনের প্রভাতের মত ঠেকিল।

কি সুন্দর শরতের ঝলমলে আলো গাছে-পাতায়। কি সুন্দর বিহঙ্গকাকলী। এসব যেন নতুন চোখে আজ দেখিতেছেন। কিন্তু এ দৃষ্টি, কবির দৃষ্টি, আত্মতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীর দৃষ্টি নয়। হরিদাসবাবু যে সে কথা বুঝিলেন না তা নয়, তবু ভাল লাগিল এই শরতের আলো, সবুজ গাছপালা, নীল আকাশ।

কবির দৃষ্টি তাই কি, কবি কি জ্ঞানী নয়?

সবে আসিয়া বাইরের ঘরে বসিয়াছেন, এমন সময় হাজারী মেছুনী আসিয়া বলিল—বাবা ঠাকুর উঠেচেন? দু'দিন আমি আপনার দেখাই পাই নে। পেন্নাম হই। ইয়ে গিয়ে আমার ও-মাসের সেই চিংড়ি মাছের দরুণ সাতসিকে পয়সা বাকি। আজ না দিলি চলবে না। মহাজনের টাকা বাকি, আজ তাদের দেনা শোধ দিতি হবে।

হরিদাসবাবু বলিলেন—আচ্ছা এখন যা—বেলা হ'লে আসবি।

—কত বেলা হ'লি?

—আঃ, বিরক্ত করলে! এই বেলা ন'টা দশটা।

—বাবা ঠাকুর, আপনি ব্যাজার হবেন না, ব্যাজার হ'লি চলে? আমরা হচ্চি গরীব লোক। আপনার দোর থেকে নিয়ে গিয়ে তবে খাব। একটু বেলা হ'লি আসবো এখন, দামটা চুকিয়ে দেবেন এখন।

মেছুনী চলিয়া গেল।

হরিদাসবাবু সকাল দশটার আগেই ভাতে ভাত খাইয়া গিয়া পুলের তলায় বসিলেন। মুশকিল এই যে, বিড়ি ফুরাইয়াছে। নগদ পয়সার অভাব। যে কয়টি খুচরা আনি দুয়ানি পকেটে ছিল, স্ত্রীকে দিয়া আসিতে হইয়াছে।

যাক গে। আশাতে আসক্তির বন্ধন। সর্ব-বন্ধন-মুক্ত না তিনি? তিনি না অজর, অমর আত্মা? বিড়ি না টানিলে কি হয়? বিড়ি ছাড়িয়া দিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া গীতার ভাষ্য পড়িলেন। কৃষ্ণানন্দ স্বামীর এই ভাষ্যখানি সম্প্রতি পাড়ার রামতারণ মুখুয্যের কাছে চাহিয়া লইয়াছেন। বুড়ো রামতারণ ঘুঘু লোক, সুদখোর মহাজন, গীতার মহিমা সে কি বুঝিবে? টাকার আণ্ডিল, একটা পয়সার সম্ব্যয় নাই। গীতা অত সহজ জিনিস নয়।

আরও একদিন এভাবে কাটিল।

তাগাদার চোটে পথে ঘাটে বাহির হওয়ার জো নাই। বাড়ীতেও তিষ্ঠিবার জো নাই। গত মাসের মাহিনা দিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে স্কুলের, হরিদাসবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, আজ ইংরাজি মাসের এগারো তারিখ। চার তারিখে মাহিনা হওয়ার দিন। এদিকে আর চলে না। একরাশ দেনা, দুধওয়ালীর দুধ বন্ধ করিবে কাল হইতে।

বাড়ীতে গৃহিণী বলিলেন—হ্যাঁগা, আর তো চলে না। এবার কি তোমাদের মাইনে হবে না? এত দেরি করচে কেন এবার? আজ ইস্কুলে গিয়ে ভালো ক'রে বলো পোড়ার-মুখো হেডমাস্টারকে।

তেরোদিন অনুপস্থিতির পর হরিদাসবাবু আজ স্কুলে গিয়া গুটি গুটি হাজির হইলেন।

তখনও ঘণ্টা পড়ে নাই। হরিদাসবাবুর পা কাঁপিতেছে। জিভ্ শুকাইয়া গিয়াছে। এতদিন কামাই করিবার কি কৈফিয়ৎ দিবেন? বড় কড়া হেডমাস্টার।

হেডমাস্টারের অফিসে কম্পিত পদে দুরু-দুরু বক্ষে ঢুকিতেই হেডমাস্টার মুখ তুলিয়া চাহিয়া নীরস স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—এতদিন কি হয়েছিল আপনার?

ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্তপুরুষ হরিদাস সে চশমা-পরা চোখজোড়ার তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস হারাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—স্যর, ইয়ে—বাড়ীতে বড্ড অসুখ। তলপেটে যন্ত্রণা। তাই নিয়ে আজ এ ক'টা দিন যে কি ভাবে কেটেচে। তার ওপর রাত জেগে নার্স করতে হচ্চে। আর তো দ্বিতীয় লোক নেই বাড়ীতে। কি কষ্টে যে যাচ্চে স্যর। একে পয়সার অভাব, ডাক্তারে-ওষুধেই বিশ পঁচিশ টাকা ব্যয় হয়ে গেল—বড় বিপদে পড়ে গিয়েচি স্যর—

হেডমাস্টার বলিলেন—বুঝলাম। আপনার একটা খবর দিতে কি হয়েছিল? অসুখ বিসুখ হতে পারে, সেটা আশ্চর্য নয়—বাট ইউ অট টু হ্যাভ ইনফর্মড্ মি—স্কুলের ইণ্টারেস্ট সাফার করচে, এ জ্ঞান আপনার থাকা উচিত ছিল। আপনি না পুরনো টিচার? না, এরকম হ'লে হরিদাসবাবু, আই অ্যাম সরি টু টেল ইউ, আমাকে সেক্রেটারির কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য হ'তে হবে আপনার নামে—

—এবারটা স্যর এক্সকিউজ করুন দয়া ক'রে। আমার মাথার একদম ঠিক ছিল না এ ক'দিন, সে কি কষ্ট আর যন্ত্রণা রাত্রে, যদি দেখতাম স্যর তবে আপনারও কষ্ট হোত—এগারো দিন রাত্রে ঘুমুই নি, ঠায় শিয়রে জেগে বসে আছি স্যর—চোখে দেখা যায় না সে যন্ত্রণা—

হরিদাসবাবু কাঁদো-কাঁদো হইলেন।

আচার্য কৃপালনী কলোনি

আমার স্ত্রী আমাকে কেবলই খোঁচাইতেছিলেন।

পূর্ববঙ্গে বাড়ী। এই সময় জমি না কিনিলে পশ্চিমবঙ্গে ইহার পরে আর জমি পাওয়া যাইবে কি? কলিকাতায় জমি ও বাড়ী করিবার পয়সা আমাদের হাতে নাই, কিন্তু পনেরোই আগস্টের পরে কলিকাতার কাছেই বা কোথায় জমি মিলিবে? যা করিবার এইবেলা করিতে হয়।

সুতরাং চারিদিকে জমি দেখিয়া বেড়াই। দমদমা, ইছাপুর, কাশীপুর, খড়দহ, ঢাকুরিয়া ইত্যাদি স্থানে। রোজ কাগজে দেখিতেছিলাম জমি ক্রয়-বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন। পূর্ববঙ্গ হইতে যে সব হিন্দুরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া চলিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের অসহায় ও উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে বাড়ী ও জমির মালিকেরা একটুও বিলম্ব করেন নাই। এক বৎসর আগে যে জমি পঞ্চাশ টাকা বিঘা দরেও হইত না সেই সব পাড়া-গাঁয়ের জমির বর্তমান মূল্য সাত-আটশো টাকা কাঠা।

বহুস্থানে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইলাম।

কলিকাতার খুব কাছাকাছি জমির দর অসম্ভবরূপে চড়িয়াছে, আমাদের সাধ্য নাই

ওসব স্থলে জমি কিনিবার। তাছাড়া জমি পছন্দই বা হয় কই?

এমন সময়ে আমার স্ত্রী একখানা কাগজ আনিয়া হাতে দিলেন। বলিলেন—তোমার তো জমি পছন্দই হয় না। ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড় করে ফেললে। সিনারি নেই তো কি হয়েছে? এটা পছন্দ হয় না, ওটা পছন্দ হয় না। এবার কি আর কিনতে পারবে কোথাও? যাও এটা দেখে এসো। খুব ভালো মনে হচ্ছে। তোমার মনের মত। পড়ে দ্যাখো—

আমাকে আমার স্ত্রী যাহাই ভাবুন, হিম হইয়া বসিয়া আমি নাই। সত্যিই খুঁজিতেছি, মন-প্রাণ দিয়েই খুঁজিতেছি। ভালো জিনিস পাইলে আমার মত খুশী কেহই হইবে না।

বলিলাম—এ কাগজ কোথায় পেলে?

—বীণাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। ওরাও জমি খুঁজচে, ওদের দেশ থেকে সব উঠে আসচে ইদিকে, কলকাতার আশেপাশে। ওরা এটা কোথা থেকে আনিয়েচে।

পড়িয়া দেখিলাম। লেখা আছে—

'আচার্য কৃপালনী কলোনি।'

আজই আসুন! দেখুন!! নাম রেজেস্ট্রি করুন!!!

'কলিকাতার মাত্র কয়েক মাইল দূরে অমুক স্টেশনের সংলগ্ন সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে এই বিরাট নগরটি গড়িয়া উঠিতেছে। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। কলোনির পাদদেশ ধৌত করিয়া স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া জাহ্নবী বহিয়া যাইতেছেন। পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, জলের কল, স্কুল, মেয়েদের স্কুল, গ্রন্থাগার, নাগরিক জীবনের সমস্ত সুখ-সুবিধাই এখানে পাওয়া যাইবে। আপাততঃ পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইলেই নাম রেজেস্ট্রি করিয়া রাখা হইবে।

স্টেশনের নাম পড়িয়া মনে হইল, কলিকাতার কাছেই বটে।

আমার স্ত্রী বলিলেন—দেখলে? ভালো না?

—খুব ভালো। বীণার কাকা জমি নিয়েচেন এখানে?

—না, নেবেন। নাম রেজেস্ট্রি করেচেন। তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা করে পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে দাও। কাঠা-পিছু পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে, জমি পরে দেখো। উনিও ত দেখেন নি এখনো।

—জমি দেখবো না? আচ্ছা, বীণার কাকাকে জিগ্যেস করি।

বীণার কাকার নাম চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। চিরকাল বিদেশে চাকুরী করিয়াছেন, কোথাও বাড়ীঘর করেন নাই, জমি বাড়ী সম্বন্ধে খুব উৎসাহ। আগে-আগে ভাবিয়া আসিয়াছেন কলিকাতায় বাড়ী করিবেন, সম্প্রতি সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন।

চিন্তাহরণবাবু বলিলেন—আসুন। ও কাগজটা আপনি দেখেচেন? ভালো জায়গাই বলে মনে হ'চ্ছে।

—একটু দূরে হয়ে যাচ্ছে না কি?

—ওর চেয়ে কাছে আর কোথায় পাবেন মশাই?

—তা বটে। স্টেশনের কাছেই, গঙ্গার পারে।

—এখনো সস্তা আছে। এর পরে আর থাকবে না। ইলেকট্রিক আলো, জলের কল, পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তা—

—আপনি টাকা পাঠিয়েচেন?

—নিশ্চয়। রসিদ এসে গিয়েচে। আপনি যদি নেবার মত করেন তবে টাকা পাঠিয়ে দিন।

—জমি না দেখেই?

—ও মশাই, এইবেলা নাম রেজেস্ট্রি করে রাখুন। এর পরে আর পাবেন না। ঠিকানাটা হচ্চে—দি নিউ ন্যাশনাল ল্যাণ্ড ট্রাস্ট। রাজীবনগর।

আমার স্ত্রী আমার নামের রসিদ দেখিয়া খুশী হইলেন। বলিলেন—কাঠা-পিছু পঞ্চাশ টাকা। ক' কাঠার জন্যে টাকা পাঠালে, মোটে দু'কাঠা?

—এখন এই থাক্। পনেরোই আগস্ট কেটে যাক। সীমানা-কমিশনের রায় বের হোক। পরে—

পনেরোই আগস্ট পার হইয়া গেল। সীমানা-কমিশনের রায় আর বাহির হয় না। আমার স্ত্রী বলিলেন—একবার জমিটা দেখে এসো না? বীণার কাকাকে সঙ্গে নিয়ে যাও—অনেক লোক আসচে ময়মনসিং পাবনা নোয়াখালি থেকে পালিয়ে। আমাদের পাশের বাড়ীর ফ্ল্যাট্‌গুলো সব বোঝাই। এক-এক গেরস্ত বাড়ীতে তিন-চার ঘর লোক আশ্রয় নিচ্চে।

—কেন নিচ্চে? কোথাও তো কোনো গোলমাল নেই।

—তা কি জানি বাপু, অত-শত জিগ্যেস্ করেচে কে? বীণাদের বাড়ীই ওর পিসতুতো ভাই আর বীণার দাদামশায়ের ছোট ভাই এসেচেন ছেলেমেয়ে নিয়ে।

কথাটা মন্দ নয়। নাম রেজেস্ট্রি করিয়াছি, জমি কোথাও যাইবে না। তবে আর এক-আধ কাঠা বেশী জমি রাখিব কি না, ইহাই ধার্য করিবার পূর্বে কলোনিটা একবার চোখে দেখা উচিত নয় কি?

সন্ধ্যার সময় ঝড়ের বেগে বীণার কাকা আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলাম—ব্যাপার কি? এত ব্যস্ত কেন?

—নিয়ে নিন, নিয়ে নিন। জমি কোথাও এতটুকু পাওয়া যাবে না এর পরে। হাজার হাজার লোক আসচে 'ইস্টবেঙ্গল' থেকে। আমার বাড়ী তো ভর্তি হয়ে গেল। জমি এইবেলা যা যেখানে নেবার নিয়ে নিন।

—বলেন কি?

—সত্যি বলচি। কলোনির জমিটা চলুন কাল দেখে আসি। দেখে এসে কিছু বেশী করে জমি ওইখানেই কিনে রাখুন। কত করে দাম নেবে তা কিন্তু এখনো বলে নি। কাল সেটাও ওদের আপিস থেকে জেনে আসি চলুন—

—কোথায় যেন ওদের আপিস?

—রাজীবনগর। কোন্নগরের কাছে।

পরদিন কিন্তু আমাকে একাই যাইতে হইল।

বীণার কাকা যাইতে পারিলেন না, তাঁহার বাড়ীতে আবার দুটি গৃহস্থ আসিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের লইয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

কোন্নগর স্টেশনে নামিয়া রাজীবনগর যাইতে মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। স্টেশনের সংলগ্ন তো নয়ই। পাকা আড়াই মাইল দূরে। কাঁচা রাস্তা কাদায় ভর্তি। যেমন জঙ্গল, তেমনি মশা।

খোঁজ করিয়া এক গ্রাম্য ডাক্তারবাবুকে জমির মালিক হিসাবে পাওয়া গেল। তিনি একখানা টিনের ঘরে রোগীপত্র দেখিতেছিলেন, যাহাদের সংখ্যা আর যাহাই হউক ডাক্তারের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু নহে। আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কাকে চাচ্চেন?

বিনীতভাবে বলিলাম—আপনারই নাম মনীন্দ্র ঘটক? আমি যশোর থেকে আসচি। আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—

ডাক্তারবাবু নিস্পৃহভাবে বলিলেন—ও—

এবং পরক্ষণেই রোগীদের দিকে মনোযোগ দিলেন পুনরায়।

আমি বড় আশা করিয়াই গিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে মাত্র নয় মাইল দূরে স্টেশনের গায়ে জমি, এ জমিটা লইতে পারিলে নানাদিক দিয়াই সুবিধা। কিন্তু জমির মালিক অত নিস্পৃহ কেন। তবে কি বিক্রয় করিবেন না মনস্থ করিলেন?

প্রায় মিনিট দশেক কাটিয়া গেল।

দাঁড়াইয়াই আছি। কেউ বসিতেও বলে না।

আবার সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলাম—আমি—মানে, এই ট্রেনেই আবার—মানে—

ডাক্তারবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—কি বলচেন?

—জমিটা—

—কোন্ জমি?

—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—স্টেশনের সংলগ্ন—কৃপালনী কলোনি—

—ও।

আবার রোগীদিগের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। আমিও অতটা সুবিধাসম্পন্ন যে জমিটুকু, তাহার খোদ মালিককে বিরক্ত করিতে সাহস করিলাম না।

দশ মিনিট কাটিল।

এবার ডাক্তারবাবুই আমাকে বলিলেন—তা, বসুন।

বসিবার অনুমতি পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। অনেকক্ষণ হইতে খাড়া দাঁড়াইয়া আছি। বসিবার মিনিট দুই পরে আমি বলিলাম—ইয়ে—জমিটার কথা—মানে—

ডাক্তারবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—কী বলচেন?

—জমিটার কথা বলছিলাম। মানে—একবার দেখলে ভালো হয়। এদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে—

—জমিটা দেখবেন? ও কার্তিক, কার্তিক! যাও, এই বাবুকে জমিটা দেখিয়ে আনো।

ভাবিলাম, তাই তো, ইহা আবার কি। ডাক্তারখানার পাশের ঘরে বড়-বড় হরফে ইংরাজীতে লেখা আছে বটে, 'দি নিউ ন্যাশনাল ল্যান্ড ট্রাস্ট'।

গঙ্গার ধারে বিরাট ভূখণ্ড লইয়া এই উপনিবেশ গড়িয়া উঠিবে—কিন্তু গঙ্গা হইতে রাজীবনগরই তো দেখিতেছি আড়াই মাইল দূরে। তবে ইহাও হইতে পারে, দি নিউ ন্যাশনাল ল্যান্ড ট্রাস্টের আপিস এখানে, জমি গঙ্গার ধারে।

কার্তিক নামধেয় লোকটি ডাক্তারবাবুর আহ্বানে এইমাত্র আসিয়াছিল। বলিল—কোন্ জমি বাবু?

—আরে, ওই যে বরোজের পশ্চিম গায়ে—

—জমি?

—আ মলো যা। হাঁ করে সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? হ্যাঁ, জমি। কোথাকার ভূত?

বাড়ীর চাকরটা বোধ হয় বোকা, প্রভুর এমন মূল্যবান ভালো বহুবিজ্ঞাপিত ভূমি-খণ্ডের সম্বন্ধে কোন খবর রাখে না কেন?

আমি পথে বাহির হইয়া বলিলাম—চলো—

লোকটা পশ্চিমদিকে যাইতেছে দেখিয়া বলিলাম—ওদিকে কোথায় যাচ্চো? ইস্টিশানের কাছে যে জমি—কৃপালনী কলোনি—

—ইস্টিশানের কাছে কোনো জমি নেই বাবু।

—আলবৎ আছে। তুমি কোনো খবর রাখো না।

—না বাবু, কোনো জমি নেই ওদিকে।

—শোনো। ইস্টিশানের গায়ে। কাগজে যে জমির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চাশ টাকা খরচ করে নাম রেজেস্ট্রি করতে বলা হয়েছিল যে জমির জন্যে। আমি নাম রেজেস্ট্রি করে রেখেছি—রসিদ আছে পকেটে—

—এ-কথাটা আপনি ওখানে বললেন না কেন বাবু। আমি তো আর কোনো জমির সন্ধান জানি না। কালও তো এক বাবু এসেছিলেন, তিনিও নাম রিজিস্টারি করে নিয়ে গেলেন।

—জমি দেখেন নি?

—না। ডাক্তারবাবু বললেন, জমি দেখে যাবেন সামনের রবিবারে।

—বেশ, আমায় নিয়ে চলো—

—বাবু—

—কি বলে আবার?

—আপনি জমি দেখতে চান?

—কি বলে আবোল-তাবোল? জমি দেখবো না তো কি?

—আপনি এখানে দাঁড়ান। আমি জিজ্ঞেস্ করে আসি।

আমি বিরক্ত হইয়া নিজেই আবার ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম। বলিলাম—আপনার

চাকর জানে না আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে।

এবার ডাক্তারবাবু দেখিলাম, আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। তিনিও জমির জন্যই আসিয়াছেন মনে হইল। কারণ তিনি পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া নাম রেজেস্ট্রি করিলেন। ডাক্তারবাবু রসিদ কাটিয়া দিলেন দেখিলাম। লোকটির সঙ্গে আরো কি কথা হইয়াছে জানি না, দুটাকা দিয়া রসিদ লইয়া লোকটা চলিয়া গেল।

আমাকে ডাক্তারবাবু বলিলেন—জমি দেখবেন? আচ্ছা, চলুন, আমিই যাচ্ছি।

পরে আমাকে দুর্গন্ধময় জল-ভর্তি নালা, কচুবন, ভাঙা চালাঘর প্রভৃতির পাশ দিয়া কোথায় কোন্ অনির্দেশ্য রহস্যের দিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন, তিনিই জানেন।

আমি একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিলাম। তিনি বোধ হয় ভুলিয়া যাইতেছেন, এ জায়গাটি স্টেশনের খুব কাছে। স্টেশনের সংলগ্ন বলিয়া বিজ্ঞাপনে আছে—

ডাক্তারবাবু আমার দিকে কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—আপনার তো আইডিয়া দেখছি বেশ। স্টেশন-সংলগ্ন মানে কি একেবারে কোন্নগর ইস্টিশনের টিকিটঘরের পাশে হবে মশাই?

বলিতে পারিতাম, 'সংলগ্ন' বলিতে দুই মাইল দূরবর্তীই কি বোঝায়? কিন্তু না, দরকার নাই। পূর্ববঙ্গের অসহায় হিন্দু আমি, এখানকার জমির মালিকের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া করিব না। স্থান পাওয়া লইয়া কথা। চটিয়া গেলে জমি না দিতেও তো পারে।

বিনীতভাবে বলিলাম—কলোনি কতদূর?

—মাইলখানেক দূরে।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—বলেন কি? তবে সাড়ে-তিন মাইল দূর পড়লো স্টেশন থেকে। এর নাম 'সংলগ্ন'? এ তো কখনো শুনিনি—

ডাক্তারবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। বলিলেন—না শুনেচেন কি করবো? কিন্তু আপনাকে বলচি, কলোনির এক ইঞ্চি জমি পড়ে থাকবে না। সব নামে-নামে রেজেস্ট্রি হয়ে যাচ্চে। আপনার ইচ্ছে না হয়, না নেবেন। তবে কি দেখতে যাবেন, না, দেখবেন না?

—চলুন যাই।

পকেট হইতে একগোছা চিঠি বাহির করিয়া ডাক্তারবাবু আমার নাকের কাছে ধরিয়া বলিলেন এই দেখুন। মনিঅর্ডারে টাকা আসচে অফিসে, রোজ একগোছা চিঠি আসচে, আপনি দেখুন না মশাই। না দেখলে ঠকবেন এর পরে। তবে আপনি না নিলে জোর করে তো আপনাকে দেওয়া হবে না—

রাস্তায় ভীষণ কাদা। একটা গোয়াল-পাড়ার ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম, মহিষ ও গরুর বাথান চারিদিকে। অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাতাসে। ইহাতে মশা বিন্-বিন্ করিতেছে। খানিকদূর গিয়া একটা অবাঙালী কুলি বস্তি, যেমন নোংরা, তেমনি ঘিঞ্জি। তারপরে আবার জঙ্গল বাঁশবন আর ডোবা।

মাইলখানেক দূরে জঙ্গলের একপাশে রাস্তার ধারে একটা টিনের সাইনবোর্ডে বড়-বড় করিয়া লেখা আছে—'আচার্য কৃপালনী কলোনি'।

এখানে আসিয়া ডাক্তারবাবু দাঁড়াইলেন। সামনের দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—এই—

চারিদিক চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিস্ময়বোধের শক্তিও যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহার নাম, আচার্য কৃপালনী কলোনি। এই সেই বহু-বিজ্ঞাপিত ভূখণ্ড? কোথায় ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে? কোথায় সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য? পঞ্চাশফুট চওড়া রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, জলের কল প্রভৃতি ছবির সঙ্গে এই অন্ধকার বাঁশবন, কচুবন, ওলবন আর মশাভরা ডোবার সহিত খাপ খাওয়াইতে অনেক চেষ্টা করিলাম; মনকে অনেক বুঝাইলাম, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কি ছিল? অমুক কি ছিল? কিন্তু পারিয়া উঠিলাম না। তাহা ছাড়া এখানে ডাঙ্গা-জমিই বা কোথায়? সব তো জলেডোবা আর জলের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে বনকচুর ঝাড়।

সে কথা বলিয়া লাভ নাই।

ডাক্তারবাবু গর্বের সহিত বলিলেন—সাড়ে ছ'শো করে কাঠা, তাই পড়তে পাচ্ছে না। সব প্লটের নাম রেজেস্ট্রি হয়ে গিয়েচে মশাই।

কিন্তু 'প্লট' বলিতে জমির টুকরো বোঝায়, এখানে জমিই যে নাই, এ তো সবই জলাভূমি। পুণ্যতোয়া স্বচ্ছসলিলা জাহ্নবী ইহার ত্রিসিমানায় আছেন বলিয়া মনে হইল না।

বলিলাম—গঙ্গা এখান থেকে কতদূর?

—বেশী নয়। মাইল খানেক হবে কিংবা কিছু বেশী হবে—

তাই বা কি করিয়া হয়? গঙ্গা এখান হইতে চারি মাইলের কম কি করিয়া হয়, বুঝিলাম না।

সে যাহা হউক, তর্ক করিলাম না। ফিরিয়া আসিলাম। এই জলাভূমি আর কচুবনই হয়তো ইহার পর পাইব কি না কে জানে। মন ভীষণ খারাপ হইয়া গেল।

বাড়ী আসিতেই স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ গা, কি রকম দেখলে? ভালো?

বলিলাম—চমৎকার!

—বলো না, কি রকম জায়গা? গঙ্গার ওপর?

—সংলগ্ন বলা যেতে পারে।

—বেশ বড় রাস্তা করেচে?

—মন্দ নয়। বড়ই।

বীণার কাকাকে সেদিন কিছু বলিলাম না। পঞ্চাশ টাকা জলে ফেলিলাম বটে, কিন্তু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম! পূর্ববঙ্গই ভালো! আর জমি খুঁজিব না ঠিক করিয়া ফেলিলাম!

পরদিন র‍্যাডক্লিফের রায় বাহির হইল।

আমাদের দেশ পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে।

জওহরলাল ও গড্

সেদিন হাওড়া স্টেশনে সকাল হইতেই ভিড় হইবে এই রকম একটা আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বড় বড় করিয়া খবর বাহির হইয়াছিল জওহরলালজি সেদিন বম্বে মেলে কলিকাতায় আসিতেছেন। আরও একটি খবর বাহির হইয়াছিল, ভগবান স্বয়ং পাঞ্জাব মেলে কলিকাতা আসিতেছেন, হিমালয়ের কোন একটা স্থান হইতে।

এই পর্যন্ত। টাইম টেবিল দেখিয়া জানিলাম উভয় ট্রেন আসিয়া পৌঁছিবে দু'ঘণ্টার ব্যবধানে। বম্বে মেল আগে আসিবে, বেলা সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে।

গিয়া দেখি হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য ব্যাপার। স্ট্র্যান্ড রোডের পর হাওড়া পুলের দিকে এক পা-ও বাড়ানো সম্ভব নয়। মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান ও জওহরলাল একই দিনে যখন কলিকাতা আসিতেছেন, তখন এমন ভিড় হওয়া স্বাভাবিক বটে।

জওহরলালজি আসিবার কথায় তত বিস্মিত হই নাই, কারণ তিনি ইতিপূর্বেও কলিকাতায় আসিয়াছেন। কিন্তু ভগবান কখনও কোথাও আসেন না, তিনি নিরাকার, এ পর্যন্ত তাঁহাকে কেহ দেখে নাই বলিয়াই শুনিয়াছি। তিনি হঠাৎ অদ্য পাঞ্জাব মেলে কেন যে কলিকাতা আসিতেছেন, কিছু বোঝা গেল না। কোথা হইতে আসিতেছেন, তাহাও জানি না।

ভিড়ের মধ্যে দেখি একদল সংকীর্তন পার্টি চলিয়াছে, বোধ হয় ভগবানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য। ভগবানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সংকীর্তন পার্টি কি হইবে? কারো গঙ্গাযাত্রার সময় সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয় জানি, কিন্তু ভগবান যখন স্বয়ং হাওড়া স্টেশনে আসিতেছেন, তখন এর অপেক্ষা ভালো ব্যবস্থা কি করা যাইত না?

অতি কষ্টে প্ল্যাটফর্মের ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখভাগে আগাইবার চেষ্টা করিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে জওহরলালজির ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল।

ইহার পর স্টেশন ভাঙিয়া পড়ে আর কি, বহুবিধ স্লোগানের সমবেত উচ্চকণ্ঠের উচ্চারণে। সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফারের দল দেখিতে দেখিতে পণ্ডিতজিকে ঘিরিয়া ফেলিল। তারপর সেই বিরাট জনতা তাঁহাকে লইয়া পথে নামিল এই পর্যন্ত দেখিলাম—ইহার পর কি ঘটিল না ঘটিল বলিতে পারিব না, কারণ আমি জওহরলালজির সে বিশাল শোভাযাত্রায় যোগদান করি নাই, ভগবানকে দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মেই ছিলাম।

দল চলিয়া গেল।

প্ল্যাটফর্ম প্রায় খালি।

সেই সংকীর্তন পার্টি ছাড়া ভগবানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কেহই উপস্থিত নাই গোটা প্ল্যাটফর্মে। একজন রোগা, গোঁপদাড়িকামানো লোক আমার কাছে আসিয়া বলিল—মশায়, আজ নাকি ভগবান আসচেন?

—এই রকমই তো কাগজে লিখেচে।

—কোন্ প্ল্যাটফর্মে জানেন?

—পাঞ্জাব মেলে তো আসচেন। এন্কোয়ারি আপিসে একবার জিগ্যেস করে আসুন না?

—উঃ মশাই, যা ভিড়ের কাণ্ড! কি কষ্টে যে হাওড়া পুলটুকু ছাড়িয়ে এসেচি!

—প্রসেশন কতদূর গেল?

—জওহরলালজির মোটর তো স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে হাইকোর্ট-মুখো চলে গেল দেখলাম—আর কিছু বলতে পারি নে। বসুন, এন্কোয়ারি আপিসে জিগ্যেস করে আসি।

লোকটা সেই যে চলিয়া গেল, আর ফিরিল না। অন্তত আমি আর তাহাকে দেখিলাম না।

মিনিট কুড়ি পরে পাঞ্জাব মেল আসিয়া সশব্দে স্টেশনে প্রবেশ করিল। বিশেষ কোনো দলকে আগাইয়া যাইতে দেখিলাম না, সেই ক্ষুদ্র সংকীর্তন পার্টি ছাড়া, তাহারা ততক্ষণ খোল ও খঞ্জনীর সাহায্যে উদ্দণ্ড রেড়ো কীর্তন জুড়িয়া দিয়াছে।

প্ল্যাটফর্মময় ফুল ও ছেঁড়া ফুলের মালা ছড়ানো। কিছুক্ষণ পূর্বে পণ্ডিতজির উদ্দেশে যে বিরাট পুষ্পবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহারই চিহ্ন। একগাছা মালা কেন সংগ্রহ করিয়া আনিলাম না ভগবানের জন্য, ভাবিয়া মায়া হইল সে বেচারীর উপর। সংকীর্তনের দল কি মালা আনিয়াছে? আনিতে পারে।

হুড়হুড় করিয়া লোক নামিয়া গাড়ী খালি হইয়া আসিল। বাঙালী, বিহারী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, পাঠান যাত্রীর দল নিজের নিজের জিনিসপত্র কুলীর মাথায় চাপাইয়া, ব্যাগ ও টিফিন-ক্যারিয়ার নিজের নিজের হাতে ঝুলাইয়া গেটের দিকে চলিয়াছে। স্থানে স্থানে স্তূপাকার বাক্স ও হোল্ড-অল-বাঁধা বিছানাকে কেন্দ্র করিয়া মেয়েরা বালক-বালিকাসহ দাঁড়াইয়া আছে, সঙ্গের পুরুষেরা কুলীদের সঙ্গে দরদস্তুর করিতেছে। খুব একটা ব্যস্তত্রস্ততার ভাব চারিদিকে।

কিন্তু—ভগবান কই?

ফার্স্ট ক্লাস দেখিলাম, সেকেণ্ড ক্লাস দেখিলাম। দুই তিনটি বাঙালী পরিবার একটি সেকেণ্ড ক্লাসের কামরা হইতে নামিয়া কামরার সামনেই মালপত্র নামাইয়া জটলা করিতেছে। এঞ্জিনের সামনে ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাস কম্পোজিট বগিখানিতে মিলিটারি বোঝাই। তাদের সঙ্গে বহু মালপত্র। কুলীরা ঠেলাগাড়ী আনিয়া মাল বোঝাই করিতেছে। এখানেও তো ভগবানের আসিবার কথা নহে।

সংকীর্তন পার্টি কীর্তন থামাইয়াছে। তাহাদের কাছে গিয়া বলিলাম—মশায়, ভগবানকে খুঁজে পেলেন?

উহাদের একজন বলিল—না মশায়, আমরাও তো খুঁজচি।

—পেছন দিকটা দেখে এসেচেন?

—সব দিকে দেখা হয়ে গিয়েচে।

—ইণ্টার ক্লাসটা দেখা হয়েচে?

—কোনো ক্লাসই বাদ দিই নি আমরা। কোথাও তো তেমন কোনো লোককে দেখলাম না মশাই। আমরা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ থেকে আসচি।

আরও খানিকটা অপেক্ষা করিবার পর আমি নিরাশ মনে প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িলাম। কি মনে করিয়া ট্রাম না ধরিয়া হাওড়া পুল ধরিয়াই চলিয়াছি, হঠাৎ চোখে পড়িল একজন লোক পুলের মাঝামাঝি রেলিং ধরিয়া অন্যমনস্ক ভাবে গঙ্গার জলের দিকে চাহিয়া আছে।

আমি পাশ দিয়া যাইতেছি, লোকটি হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল। লোকটির চেহারায় কি যেন ছিল, দীন-দুঃখীর মত অকিঞ্চন ভাব মুখে, অথচ চোখ-দুটিতে অতল-স্পর্শ গভীরতা ও বালকোচিত সারল্য একসঙ্গে মাখানো। আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম ওর এই মুখ-ভাবের আশ্চর্য পবিত্রতা ও সরলতায়। বলিলাম—কোথায় যাবেন?

লোকটি গঙ্গার দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই নতুন পুল বুঝি?

—হ্যাঁ।

—বেশ পুল করেচে। সাহেবেরা করে ভালো।

—আপনি কোথায় যাবেন? অনেকদিন আসেন নি বুঝি কলকাতায়?

—আমি ভগবান। কলকাতায় এসেচি এই ট্রেনে। হাওড়া স্টেশনে কেউ তো আমায় অভ্যর্থনা করবার জন্যে যায় নি?

কি সর্বনাশ, লোকটা বলে কি। ভগবান? এই লোকটা? এ'কে তো নিতান্ত অভাজন বলিয়া মনে হইতেছিল—যদিও কি গুণে লোকটা মনকে আকৃষ্ট করিয়াছে বটে।

আমি পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিলাম। বলিলাম—আপনি?

—হ্যাঁ। বলি, ওরা আমাকে কেউ স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে এলো না কেন?

—ওরা জওহরলালজিকে এগিয়ে নিয়ে গেল কিনা—তাই—

—আর আমার বেলা কেউ বুঝি এলো না?

ভদ্রলোক দেখিলাম ছেলেমানুষের মত ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানের সুরে কথা কয়টি বলিলেন। আমার দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। ভগবান এত ছেলেমানুষ!

সান্ত্বনার সুরে বলিলাম—তা কেন, গৌড়ীয় মঠের বাবাজিরা কীর্তন পার্টি নিয়ে এসেছিলেন তো? তা বোধ হয় আপনাকে তাঁরা চিনতে পারেন নি। আপনার কোনো ফটো তো ইতিপূর্বে কোনো খবরের কাগজে বার হয় নি, চেনাই যে দায়।

ভগবান আমার কথায় ছেলেমানুষের মতন অল্পে সান্ত্বনা পাইয়া বলিলেন—তা বটে। চিনতে পারে নি তা কি করবে। শোনো, আমার একটা ফটো তুলিয়ে খবরের কাগজে ছেপে দিতে পারবে?

—আজ্ঞে বলেন—আজ্ঞে আমি—ফটো আমি তুলিয়ে দিতে পারি। কিন্তু কোনো খবরের কাগজের লোকের সঙ্গে আমার আলাপ নেই। কাগজে ফটো ছাপাবার ব্যবস্থা তো করতে পারিনে—

ভগবান নিরাশ ভাবে বলিলেন—ও!

আমার আবার মায়া হইল। তাঁর এই অসহায় বালকের মত কণ্ঠের 'ও!' শুনিয়া বলিলাম—চলুন না কেন, এই কাছেই বর্মন স্ট্রীটে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আপিসে, ওরা আপনার ফটো নিশ্চয়ই যত্ন করে ছাপবে আপনার নাম শুনলে—চলুন সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্চি—

ভগবানের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল দেখাইল। আগ্রহের সুরে বলিলেন—চলো, চলো—তাই চলো—এইবার ফটো ছাপালে সামনের বারে অনেক লোক আসবে।

তারপর যেন খানিকটা আপন মনেই বলিলেন—লোকে চেনে না তাই, না চিনলে—

আমি কিন্তু যে কথাটা ভাবিতেছিলাম, সেটা তাঁহাকে বলিলাম না। ফটো ছাপানো হয় না বলিয়া চিনিবার অসুবিধার জন্য যে তাঁহার অভ্যর্থনা হয় নাই তাহা তো কথা নয়, আসলে প্ল্যাটফর্মে তখম লোকজনই ছিল না তিনি যে সময় আসিলেন।

হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়াতে কথাটা বলিলাম যে তিনি কোথায় উঠিবেন ঠিক

করিয়াছেন ?

তিনি বলিলেন—কেউ তো আগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে না, কোথায় উঠবো কি জানি!

—যদি কিছু মনে না করেন, আমার একখানা ঘর আছে দোতলায়। ভাড়াটে ঘর, একলাই থাকি। সেখানেই যদি আজ রাত্রে থাকেন—

—তা বেশ। যাবো এখন।

—আপনার খাওয়া-দাওয়া তো কোনো—মানে ওখানে সব আঁষ, মাছ-মাংস খাই। অবিশ্যি নিরিমিষ যদি খান, তার ব্যবস্থা করে দেবো এখন।

ভগবান হাসিয়া বলিলেন—আমার আবার ওসব কি? যা দেবে, তাই খাবো। আমি কি বোষ্টম গোসাঁই?

অপ্রতিভ সুরে বলিলাম—আজ্ঞে, ক্ষমা করবেন। বৈষ্ণবেরা নিরামিষ ভোগ আপনাকে নিবেদন করে দেন কিনা তাই বলছিলাম—

—আবার অন্যলোকে মাছ-মাংস দিয়ে ভোগ দেয়—মুরগি বলি দেয়, গরু মহিষ ছাগল কাটে—তাও খাই। আমার এক অবতারে আমি ভক্তের দেওয়া শূকরের মাংস খেয়ে রোগগ্রস্ত হয়ে নরদেহ ত্যাগ করি।

—আজ্ঞে জানি, বুদ্ধ অবতারে।

—ব্যাপার কি জানো, আদিম নীহারিকাটা ঘুরিয়ে দেবার পরে বিশ্বসৃষ্টি আপনা-আপনি হচ্চে, আমার কোনো কাজ নেই। আজ কোটি কোটি বৎসর ধ'রে বেকার বসে আছি। ঘুরে ঘুরে বেড়াই, কোথায় কি হচ্চে দেখি। এখন আমি শুধু দ্রষ্টা ও সাক্ষী মাত্র। জগতে দেখতে পাই আমায় কেউ চায় না, কেউ বোঝে না—একা একা থাকি। সর্বত্রই আছি অথচ কেউ ফিরে চেয়েও দেখে না। কেউ মানে না আজকাল আর, বলে উনি তো বেকার। জগৎ আপনা-আপনিই চলচে, ওঁর আবশ্যকতা বা কি?

কষ্ট হইল বেচারীর জন্য। এমন সুরে কথা বলিলেন, তাঁর উপর কেমন একটা মায়াও হইল।

মানুষ বেকার হইত, চেষ্টা যত্ন করিয়া একটা কাজ যোগাড় করিয়া দিতাম। ভগবানের বেকার-সমস্যার সমাধান করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।

সামনেই চিৎপুর রোড। বড় ট্রাফিকের ভিড়।

পিছনে ফিরিয়া বলিলাম—আসুন, এই সামনেই 'আনন্দবাজার আপিস'—আপনার ফটোটা তাহলে—

আহ্লাদের সুরে বলিলেন—বেশ, চলো চলো—ওদের আমার পরিচয়টা দিয়ে দিও—

নাঃ, বড্ড সরল ও ছেলেমানুষের মত। এত ছেলেমানুষি কেন ভগবানের মধ্যে? আহা, কেন লোকে ওঁকে মানে না, গ্রাহ্য করে না, না মানিয়া মনে কষ্ট দেয়!

চিৎপুর রোড পার হইয়া ওপারের ফুটপাথে উঠিয়া পিছন ফিরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে গিয়া দেখি, তিনি নাই। ভিড়ের মধ্যে কোথাও হারাইয়া গেলেন নাকি? কলিকাতায় চলাফেরা অভ্যাস নাই তো!

তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া গেলেন, না অভিমান করিয়া আবার তাঁহার স্বধামেই ফিরিয়া গেলেন—কি করিয়া বলিব।

পথিকের বন্ধু

মহকুমার টাউন থেকে বেরুলাম যখন, তখনই বেলা যায় যায়।

কলকাতা থেকে আসছিলাম বরিশাল এক্সপ্রেসে। বারাসাত স্টেশনে নিতান্ত অকারণে (অবশ্য যাত্রীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী) উক্ত বরিশাল এক্সপ্রেস চল্লিশ মিনিট কেন যে দাঁড়িয়ে রইল দারুব্রহ্মবৎ অনড় অবস্থায় তা কেউ বলতে পারলে না। গন্তব্যস্থান বনগাঁয়ে পেঁছে দেখি রাণাঘাট লাইনের গাড়ী চলে গিয়েচে।

বেলার দিকে চাইলাম। বেশ উঁচুতেই সূর্যদেব, লিচুতলা ক্লাবে খানিকটা বসে আড্ডা দিয়ে চা খেয়ে ধীরে সুস্থে হেঁটে গেলেও এই পাঁচ মাইল পথ সন্ধ্যার আগেই অতিক্রম করতে পারা কঠিন হবে না।

রামবাবু, শ্যামবাবু, যদু ও মধুবাবু সবাই বেলা পাঁচটার সময় ক্লাবে বসে গল্প করছিলেন। আমায় দেখে বললেন—এই যে বিভূতি, এসময় কোত্থেকে?

—কলকাতা থেকে।

—বাড়ী যাবে? ট্রেনে গেলে না?

—ট্রেনটা ফেল হয়ে গেল, বরিশাল এক্সপ্রেস চল্লিশ মিনিট লেট।

—এসো, খুব ভাল হয়েছে এক্সপ্রেস লেট হয়ে। বোসো চা খাও।

তারপর গল্পগুজবে (যার বারো আনা পরনিন্দা) সময় হু হু করে কেটে গিয়ে কখন যে গোধূলির পূর্বমুহূর্ত উপস্থিত হয়েচে, তা কিছু বলতে পারি নে। যেতে হবে এখনো অনেকটা রাস্তা, আর দেরি করলে পথেই অন্ধকার হয়ে যাবে, বৃষ্টিও আসতে পারে, কারণ বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস। বড় রাস্তায় উঠে সত্যিই দেখলাম আড্ডা দিতে গিয়ে সময়ের আন্দাজ বুঝতে পারি নি। তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম, পশ্চিম আকাশে মেঘ করে আসচে।

চাঁপাবেড়ে ছাড়িয়েচি, রাস্তায় জনমানব নেই, পথের দুপাশে ঘন জঙ্গলে পটপটির ফুল ফুটেচে, গন্ধ ভেসে আসছে জোলো বাতাসে, শেয়াল খস্ খস্ শব্দ করে চলে গেল পাতার ওপর দিয়ে দিয়ে, বিলিতি চটকা গাছের ডাল বেয়ে ঝুলে পড়েচে মাকাললতা। কলকাতা থেকে হঠাৎ এসে বেশ লাগচে এই নির্জনতা।

চাঁপাবেড়ের পুল ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়েচি, এমন সময় দেখি একটি লোক কাঁধে বাঁক নিয়ে আমার আগে আগে যাচ্চে।

আমার পায়ের শব্দে সে চমকে পিছন ফিরে আমার দিকে চাইলো।

ওকে এপথে একা দেখে একটু আশ্চর্য হয়েচি। এ বনপথে এ সময় কেউ একা বড় একটা হাঁটে না।

বললাম—কোথায় যাবি?

—আজ্ঞে, গোপালনগরে।

—বাঁকে কি রে?

—দই আছে।

—এত দই কি হবে?

—নিবারণ ময়রার বাড়ী বায়না আছে। তেনাদের বাড়ী আজ খাওয়ান দাওয়ান।

—তোদের বাড়ী কোথায়? দই আনচিস কোথা থেকে?

—আজ্ঞে, বেনাপোল থেকে।

—বলিস কিরে, এই দশ মাইল দূর থেকে দই আনচিস! তা এত দেরি করে ফেললি কেন?

লোকটার কণ্ঠস্বরে মনে হয়েছিল ও আমাকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে বাঁচলো এই সন্দেবেলা। একা যেতে ওর নিশ্চয় ভয় করছিল।

আমার প্রশ্নের উত্তরে সে গল্প জুড়ে দিলে কেন তার দেরি হল দই নিয়ে রওনা হতে। ওদের একটা গোরু হারিয়ে গিয়েছিল আজ পাঁচদিন। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। আজ দুপুরের পর হিজোলতলার বাঁওড়ে সেই গোরুকে চরতে দেখা গেল। তারপর ওরা দল বেঁধে বেরুলো গোরু আনতে। গিয়ে দেখে বাঁওড়ের ধারে একটা লোক বসে আছে, তার কাছেই ছ'টা গোরু একসঙ্গে চরচে। সবগুলোই বিভিন্ন গ্রামের হারানো গোরু, ক্রমে জানা গেল। লোকটা ত ওদের দেখেই দৌড়—ইত্যাদি।

এইবার বেশ সন্দে হয়ে এসেচে।

বাঁশ-আমবনের ভেতরে ভেতরে ঘুলি ঘুলি অন্ধকার।

সামনে একখানা শুকনো কাঠ উঁচু চটকা গাছের মাথা থেকে ভেঙে পড়তেই ও চমকে উঠে বললে—ও কি? আমি হাসি চেপে বললাম—চটকা গাছের ডাল। লোকটা আশ্বস্ত

হয়ে বললে—ও।

—তোমার নাম কি?

—নিধিরাম।

—বাড়ী?

—কটক জিলা।

—সত্যি? তুমি তো বেশ বাঙালীর মত কথাবার্তা বলচো।

—তা হবে না বাবু? বেনাপোলের কাছে কাসুন্দিয়াতে আমার পনেরো বছর কেটে গেল। ওখানে আমার গোরুর বাথান। কুড়িটা গাইগোরু, পনেরো-ষোলটা বক্‌না বাছুর, মস্ত বাথান। রোজ আধ মণ দুধ হয়। এঁড়ে বাছুর আমরা রাখিনে, শুধু বক্‌না বাছুর রেখে দিই। এঁড়ে বিক্রী করে ফেলি বাবু—

লোকটা একটু বেশি বকে। আমাকে পেয়ে ওর বকুনি আর থামতে চায় না। একা যাচ্ছিল, আমায় পেয়ে ও ভারি খুশি হয়েচে, ভরসা পেয়েচে, এই সন্দেবেলা।

বললে—বৃষ্টি আর হল না বাবু, কি বলেন?

—সেই রকমই তো দেখচি।

—এবার বড় দুব্বচ্ছুর। আমন ধানের রোয়া হল কই? বীজপাতা ছিল দু কাঠা ভুঁই। সে বীজ লালচে হয়ে আসচে। ওই দেখুন, কেমন মেঘ করে আসছিল, আবার ফর্সা হয়ে এল! এবার আমাদের এদিকে খুব কম বৃষ্টি হয়েচে। আমন ধানের রোয়া হয়নি, চাষামহলে হাহাকার পড়ে গিয়েচে, ধানের দর ছিল চারটাকা মণ। এখন উঠচে সাড়ে সাত টাকা মণ! গরিব দুঃখী লোকেরা এর মধ্যে উপোস শুরু করে দিয়েচে।

আমায় আবার বললে—গোরুগুলো অনেক কষ্ট করে মানুষ করা। এবার বিচুলি অভাবে মারা পড়বে বাবু।

—কাঁচা ঘাস কেটে খাওয়াবে। বর্ষাকালে কোনো গোরু বিচুলি খায়? সবই কাঁচা ঘাস খেয়ে বাঁচে।

—বেত্‌না নদীর ধারে আগে আগে কত কাঁচা ঘাস পাওয়া যেতো, এখন সব আঁটি বেঁধে এনে এনে বনগাঁ শহরে বিক্রী করে। শহুরে বাবুরা চার আনা চোদ্দ পয়সা এক আঁটি কিনচে। আমাদের গোরুর ঘাস নিয়েই মুশকিল। ওটা কি বাবু?

এইবার লোকটা চমকে উঠে যেন আমার গা ঘেঁষে এসে থমকে দাঁড়ালো।

আমি বললাম—কই, কি?

—ওই যে সাদা মত?

চেয়ে দেখলাম, কিছুই না। মাকাললতার মোটা সাদা লতা গাছের ডাল থেকে ঝুলে দুলচে অন্ধকারে। লোকটা দেখচি বিষম ভীতু।

হঠাৎ আমার মনে একটা দুষ্ট বুদ্ধি জাগলো।

আমায় ও বললে—বাবু, আপনি কোথায় যাবেন?

—আমি একটু গিয়ে ডানদিকের রাস্তায় নেমে যাবো। ওখানেই আমার গাঁ।

—গোপালনগর এখন কতদূর আছে?

—তা দেড় মাইল।

—পথে কোনো ভয়-টয় নেই তো?

আমি জোরে ঘাড় নেড়ে বললাম—না, ভয় কিসের। এ অঞ্চলে বাঘ-টাঘ নেই। বুনো শুয়োরও নেই। সে বললে—আমি বাঘের কথা বলিনি বাবু—বলি এই—সন্দেবেলা আবার নাম করতে নেই—সেই তাঁদের—

—ও, ভূতপ্রেতের?

—ও নাম করবেন না সন্দেবেলা। রাম রাম রাম রাম! ও নাম কি করতে আছে এ সময়? রাম রাম রাম রাম—

আমি অতি কষ্টে হাসি চেপে বললাম—ও, বুঝিচি। তবে একটা কথা, যখন তুমি বিদেশী লোক, তখন তোমাকে সব খুলে বলাই ভালো।

—কি বাবু?

—দাঁড়াও এখানে। আমি তো এখুনি নেমে যাবো, তুমি একা যাচ্চ এতটা পথ—অন্ধকারে—পথে জনপ্রাণী নেই—। আমার বর্ণনার বহর শুনে লোকটা আরও আমার দিকে ঘেঁষে দাঁড়ায়। আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে বললে—তারপর বাবু?

—তারপর আর কি, তোমাকে বলা আমার উচিত নয়, কিন্তু যখন জিগ্যেস করলে তখন না বলাটাও তো ঠিক নয়। বিশেষ করে একা যখন যাচ্চ। সঙ্গে নেই লোক। ওই যে একটা সাঁকো আছে রাস্তার ওপর বনের পাশে, ওই সাঁকোটা বড় খারাপ জায়গা।

—কেন বাবু?

—ও জায়গাটাতে ভূত—মানে ওঁরা সব আছেন কিনা! পাশে যে বড় বাগান, ওটার নাম গলায়-দড়ের আমবাগান। বড্ড খারাপ জায়গা। অনেক দিন আগে তখন আমি ছেলে-মানুষ, একবার একজন এই তোমার মতই বিদেশী লোক একা যাচ্ছিল গোপালনগরে, সন্দের পর। তার পরদিন সকালবেলা দেখা গেল কিসে তার ঘাড়টা ভেঙে মেরে ফেলে রেখেচে সাঁকোর তলায়। এ আমার নিজের চোখে দেখা। কথাটা তোমায় বলা উচিত নয়, তবে যখন জিগ্যেস করলে, তখন চেপে রাখাও তো উচিত নয়। একটা বিপদ হতে দেরি লাগে না, তখন তুমি বলতে পারো বাবু আপনি জেনে-শুনেও আমায় বলেন নি কেন। সন্দের পর কেউ ও পথে যায় না। প্রাণ হাতে করে যেতে হয়। আজ বছর দুই আগে এক রাখাল ছোঁড়া দিনদুপুরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সাঁকোর তলায়। যাক সে, তুমি রাম রাম বলতে বলতে চলে যাও, কোনো ভয় নেই।

—বাবু, আপনি কি নেমে যাবেন?

—হ্যাঁ, আগে আমার গাঁয়ে রাস্তা নেমে গেল। আমি এইবার চলে যাবো।

—তাই তো বাবু, একা আমি কি করে যাবো?

—রাখে কেষ্ট মারে কে? মারে কেষ্ট রাখে কে? কপালে মৃত্যু থাকলে কেউ সামলাতে পারে না। না থাকলে কেউ মারতে পারে না। রাম রাম বলতে বলতে চলে যাও। দাঁড়াও, আজ আবার তিথিটা কি? চতুর্দশী। তিথিটা ভালো নয়। অমাবস্যে, চতুর্দশী, প্রিতিপদ এই তিথিগুলো খারাপ।

—কেন, কেন বাবু?

—সে আর তোমাকে বলে কি হবে? তুমি সন্দের অন্ধকারে একা রাস্তার ওপর—যেতে হবে এখনো তোমায় এক ক্রোশ পথ। ক্রমশ ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আসচে। তবে তোমায় বলা আমার উচিত—বিদেশী লোক, তোমায় সব কথা খুলে না বলাটাও ঠিক নয়। একটা বিপদ হোতে কতক্ষণ? তখন তুমি আমায় দোষ দিতে পারো। এই সব তিথিতেই ভূত প্রেত—পিশাচ ব্রহ্মদাত্যি—

লোকটা বলে উঠলো—রাম রাম রাম রাম—ও সব নাম করবেন না বাবু—

—মানে ওঁরা সব বার হয়ে থাকেন কিনা—

—তাই নাকি? তবে তো—

—আবার কি জান, এই চতুর্দশী তিথিতে গলায় দাড়ি দিয়ে অপমৃত্যু ঘটেছে এমন ভূতেরা বার হয়। আমি একবার বড় বিপদে পড়েছিলুম—

লোকটা আড়ষ্ট সুরে বললে—কি বাবু?

—একটা শ্মশানের ধার দিয়ে সেবার যাচ্ছিলাম। সেও এই ভূতচতুর্দশী তিথি। দেখি যে অন্ধকারে গাছের ডাল থেকে কি একটা যেন ঝুলচে—কাছে গিয়ে দেখি একটা মেয়ে-মানুষ গলায় দাড়ি দিয়ে ঝুলচে আর হিঃ হিঃ করে হাসচে—

লোকটা আঁৎকে উঠে বললে—কি সর্বনাশ!

—যাক্, ওই আমার রাস্তা নেমে গেল। আমি চললাম এবার। যাও তুমি, একটু সাবধানে যাও, সাবধানের মার নেই।

কথা শেষ না করেই আমি আমাদের গ্রামের পথে নেমে পড়লাম।

ও কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে—বাবু, আমাকে একটু এগিয়ে নিয়ে সাঁকোটা পার করে দ্যান যদি—

আমি শিউরে বলে উঠি—আমি? আমার কম্ম নয়। আমাকে তারপর এগিয়ে দেবে

কে? বাবারে, প্রাণ হাতে করে যাওয়া ওসব জায়গায়! একে আজ ভূতচতুর্দশী—

—রাম রাম রাম রাম!

—তুমি চলে যাও একটু জোর পায়। আবার রাস্তাও তো কম নয়, তোমাকে যেতেও হবে একমাইল দেড়মাইল রাস্তা—আর এই অন্ধকার! আচ্ছা চলি—তুমি বিদেশী লোক, জিগ্যেস করলে তাই এত কথা বলা। নইলে কি দরকার?

আমাদের রাস্তায় নেমে কয়েক পা মাত্র এগিয়েচি, লোকটা দেখি ডাকচে—বাবু, বাবু, একটা কথা শুনুন—ও বাবু—

পিছন ফিরে দেখি কাঁধের বাঁকটা একটি শিশুগাছের তলায় নামিয়ে দাঁড়িয়েচে।

বললাম—কি?

—দইগুলো নিয়ে আমি এখন কি করি বাবু?

—কি আর করবে? বায়না রয়েচে, একমুঠো টাকা। দিয়ে এসো। রাত হ'য়ে গিয়েচে, ওদের খাওয়ানো দাওয়ানোর সময় হল। রাম ব'লে এগিয়ে পড়ো—সাবধানে যেও—। আর কোনো কথা না বলে আমি হন হন করে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

ও শুনলাম আবার ডাকচে—ও বাবু, ও বাবু—শুনে যান—একটা কথা, ও বাবু—! দূরে ওর গলার সুরটা যেন আর্তনাদের মত শোনাচ্ছিল।

এয়ার গান

হাবুল নাকি পাস করেছে ফার্স্ট হয়ে। কথাটা শুনে গর্বে তার বুকটা তো ফুলে উঠলো দশ হাত। হাওয়ার ওপর ভর করে সে ফিরে এল বাড়ীতে ধীরে ধীরে। বিপুল আনন্দে সারারাত্রি তার ভাল ঘুমই হল না। মাকে কথাটা বলতে মা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, 'সুখী হও—বড় হও বাবা!'

সত্যি, তার এই দীর্ঘদিনের খাটুনি সার্থক হয়েচে। বাড়ীর লোকের চোখ এড়িয়ে কত রাত্রি জেগে সে বই পড়ে গেছে, তার পড়ার বই একাগ্রচিত্তে। আজ তার পরিণতি ওর প্রথম হওয়া। সকলে তো কথাটা শুনে বিশ্বাসই করতে চায় না। স্কুলের ছেলেরা তো প্রথমে হেসে উড়িয়েই দিয়েছিল একেবারে। সারাদিন যে আড্ডা মেরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সে এত উন্নতি করলে কি করে? তবু হাবুল ফার্স্ট হল—

শীতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে ঝির ঝির করে। হাবুলের ঘুম ভেঙে গেল; ধড়মড় করে উঠে বসলো। মনে পড়ল গতকালের ঘটনা—তার প্রথম হবার কথা। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে। হাবুল গিয়ে দাঁড়াল তার ছোট-কাকার ঘরের দরজায়। ছোট কাকা তখন ঘুমুচ্চেন নাক ডাকিয়ে লেপের মধ্যে। হাবুল ডাকল, 'ছোট-কাকা—ছোট-কাকা!'

ছোটকাকার ঘুম ভাঙলো। তিনি দু-হাত দিয়ে চোখ রগড়ে উত্তর দিলেন, 'কি রে হাবুল!'

হাবুল বললে। 'কাকা, আমি ফার্স্ট হ'য়েচি।'

এমন সময় এই সকালে টুনু এসে হাজির হয়। সে হাবুলের কথা শুনে তীব্র প্রতিবাদ করলে, 'কক্ষনো না ছোট-কাকা!'

হাবুল রুখে উঠলো, 'তুই জানিস টুনু!'

টুনুও দমে না একটুও, 'ইস! উনি আবার ফার্স্ট হবেন? তবে যদি টোকেন, সে কথা আলাদা।'

হাবুলের রাগ চড়ে গেল। সে ঠাস করে টুনুর কচি গালে একটা চড় মেরে বললে, 'বাবা সাক্ষী। কাল রাত্রে হেডমাস্টার মশায় বললেন, জানিস সে-কথা? সকাল বেলা এসেচেন চালাকি কর্তে।'

টুনু গালে হাত বুলোতে থাকে বেদনায়। ছোট-কাকা বললেন, 'ছিঃ, মারলি কেন রে ওকে?'

'দেখলে তো কি হিংসুটে!'

'এ রকম চড় তোমার গালেও পড়বে অখন।' কথার শেষে টুনু ছল্ ছল্ চক্ষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পরে হাবুল বললে,—'ছোট-কাকা, তুমি বলেছিলে, ফার্স্ট হলে আমাকে একটা এয়ার গান কিনে দেবে।'

'ও!' এতক্ষণ পর ছোট-কাকার আট মাস আগেকার প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে গেল। বললেন, 'বেশ বেশ, কাল কিনে দেবো।'

'কাল না—আজই।'

ঠিক আটমাস আগে হাবুল একদিন ওর ক্লাসফ্রেন্ড ভুলোদের বাড়ীতে দেখেছিল তার একটা এয়ার গান। হাবুলেরও একটা এয়ার গান কিনবার ভারি শখ হল। কথাটা তার ছোটকাকাকে বলতে তিনি বললেন, 'ফার্স্ট হলে এয়ার গান তোকে প্রাইজ দেবো।'

হাবুল উঠে-পড়ে লেগে গেল প্রথম হবার জন্যে এবং প্রথম হল যথাসময়ে।

সেদিনই সে একটা এয়ার গান কিনে আনলে। তারপর সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে এয়ার গান হাতে ঝুলিয়ে বাড়ীময় খুঁজতে লাগলো শিকার। কোথাও বসেছে একটা অসহায় চড়াই কিংবা পায়রা। তাকে লক্ষ্য করে এয়ার গানে আওয়াজ হল ফট ফট শব্দে। পাখী উড়ে পালালো অক্ষত শরীরে আর গুলি বেরিয়ে গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে, পাখীর দশ হাত তফাৎ দিয়ে প্রায়।

হতাশ হয়ে ও ফিরে এল হাত-ঠিক করবার জন্যে, যাতে সে পুনরায় না লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ঘরের দরজার চৌকাঠে বসে, ও লক্ষ্য করলে দেওয়ালে টাঙানো একটা বিলিতি ক্যালেন্ডারে ছবির মুখ। অনেকক্ষণ পর তার এয়ার গান থেকে শব্দ বেরুল ফট করে —গুলি ছুটে চললো ছবিতে একটা ছেলের ঠিক মুখের পানে। তারপর আওয়াজ হল ঝন-ঝন-ঝন। ভয়ে হাবুলের মুখ হয়ে গেল পাংশু। সে দৌড়ে গেল। দেখলে মেঝেতে ছড়ানো অগুন্তি কাচের টুকরো। আস্তে আস্তে ক্যালেন্ডারটা তুলে ধরতে দেখলে, দেওয়ালে কালী ঠাকুরের একখানা পট ফ্রেম দিয়ে মুড়ে কাচ দিয়ে ঢাকা। ছবিখানাকে ক্যালেন্ডারটা ঢেকে ছিল এতক্ষণ। লোহার গুলির ঘায়ে ভঙ্গুর কাচই গেছে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে। বুকের ভেতরটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠলো আতঙ্কে। চোখের সামনে লক লক করতে লাগলো কালী ঠাকুরের দীর্ঘ জিভ। ভয়ে ও ভাবনায় সে মুষড়ে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে ফেললে কাচগুলো। মা জানলে তো এক্ষুনি রসাতল করে ফেলবেন।

তখন মধ্যাহ্ন প্রায়। হাবুল ধীরে ধীরে চলে গেল ছাতের 'চিলকুঠরি'র ভেতর। সেখান থেকে লক্ষ্য করলে পাশের বাড়ীর আঙিনায়-বসা একটা কাককে। কাকও সঙ্গে সঙ্গে উড়ে পালিয়ে গেল তাকে বিদ্রূপ করে হয়তো। হাজার হোক, কাক বড় ধূর্ত প্রাণী।

নিয়ে যেতে হাবুলের আর সাহস হচ্চে না। চুপ করে বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে একটা চটের উপর বসে থাকে জানলা দিয়ে দূরের পানে তাকিয়ে। কাক কিংবা পায়রা কিংবা চড়াই এলে ও গুলি ছুঁড়ে মারবে তাকে। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে ও সামনের বাড়ীর ট্যাঙ্কটাকে লক্ষ্য করে ফেলে। গুলির আঘাতে ট্যাঙ্কটাও বেজে ওঠে ঝন্-ঝন্-ঝন্।

মনে আবার আনন্দ ফিরে আসে। হ্যাঁ, হাত অনেকটা ভাল হয়েছে। আবার সে লক্ষ্য করে পাঁচিলের ওপরের একটা ফুল গাছের টবে। সেটায় আওয়াজ হয় খট করে।

আনন্দ ওর বেড়ে যায় চতুর্গুণ। বন্দুকটা নেড়েচেড়ে ভাল করে পরীক্ষা করে। হ্যাঁ, একদিন ও বড় বন্দুকও ছুঁড়তে পারবে নিশ্চয়। এই হল তার সূচনা। বড় হলে সে চলে যাবে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে মঙ্গো পার্কের মত। অসংখ্য জন্তু-জানোয়ার শিকার করে ও দেখাবে ওর শৌর্য-বিক্রম। বাঙালী ভীরু নয়—বীরের জাতি—ও তা প্রমাণ করবে। খবরের কাগজের পাতায় পাতায় ওর ফটো ছাপানো হবে। ও দাঁড়িয়ে থাকবে

হাফ্ প্যান্ট পরে বন্দুক হাতে, আর পায়ের কাছে পড়ে থাকবে বিরাটকায় হিংস্র জন্তুর নিহত দেহটা। পুলকে ওর হৃদয় ভরে গেল এখনই। কৃষ্ণ মহাদেশের গভীর অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসবে মানুষ-খাদক জাতি সভ্য মানুষের গন্ধে, ও তাদের দেখে ভয় পাবে না একটুও। বরং ওর বন্দুক ছুঁড়ে দেবে গুড়ুম-গুড়ুম-গুড়ুম। শিক্ষা হয়ে যাবে তাদের রীতিমত। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে কতকগুলো ইতস্ততঃ ভূমিতে। আর সবাই পালিয়ে যাবে এই আশ্চর্য কল দেখে। নিরীহ হাবুল এখনই যে নিষ্ঠুর শিকার হয়ে উঠলো সম্পূর্ণরূপে! রক্ত-প্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠলো ওর ধমনীতে ধমনীতে। ও পায়চারি করতে লাগলো ঘরের ভেতর এয়ার গানটা হাতে ঝুলিয়ে আফ্রিকার রোমাঞ্চকর এ্যাড্-ভেঞ্চারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে। অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে ও ইতিহাসের পাতায়। নেপোলিয়ন কিংবা নেলসনের চেয়ে ও কোন অংশে হেয় নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন নাকি পেছনে হাত দিয়ে নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাঁর পাশ দিয়ে শন শন করে গুলি চলে গেলেও তিনি গ্রাহ্য করতেন না আদৌ। ঠিক সেই ভঙ্গিমায় সেই স্বর্গীয় বীরের অনুকরণে ও দাঁড়িয়ে রইলো ঘরের মধ্যে জানালার পানে মুখ করে।

কিন্তু ও কি? সামনের বাড়ীর ট্যাঙ্কের ওপর একটা বাঁদর যে? তাই এত কাক ডেকে উঠছে অবিশ্রান্ত, তাদের বিকট রব তার কানে যায় নি এতক্ষণ। কারণ সে কলকাতা ছেড়ে এযাবৎ আফ্রিকার গভীর অরণ্যে পড়ে ছিল শিকারের খোঁজে। ওর বুকের ভেতরটা যেন দুর দুর করে উঠলো। ও ওর বন্দুকটা একবার ভাল করে দেখে নিলে—বাঁদরটা বেশ বড় এবং হৃষ্টপুষ্ট। আর ওদিকে বাঁদরটা ঝুপ করে হাবুলের ঘরের দরজার কাছে এসে উপস্থিত হল! বীর পুরুষের কাঁপুনি শুরু হয়, রীতিমত হাঁটুতে-হাঁটুতে ঠোকা-ঠুকি লেগে যায়, নেলসনের ও নেপোলিয়নের মত। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বাঁদরটার পানে। ঘরের এক পাশে ছিল একছড়া বড় বড় চাঁপা কলা। বাঁদরটা এক পা এক পা করে এগিয়ে আসে সেই কলার দিকে—বাঁদর নাকি কলা খেতে বড় ভালোবাসে। হাবুলের সামনে এই নিদারুণ ডাকাতি ঘটে যায়! সে আর দেখতে পারে না, মরীয়া হয়ে, তার সমস্ত শক্তি একত্র করে দাঁড়ায় কলা ও বাঁদরের মাঝখানে জন্তুটাকে এয়ার গান দিয়ে লক্ষ্য করে। এয়ার গানের ঘোড়া দিলে টিপে ; কিন্তু তাতে গুলি পোরা ছিল না একটাও। সুতরাং বাঁদরের ক্ষতি হয় না আদৌ। পরন্তু তার রাগ বেড়ে যায় এই বাধা দেওয়ার জন্যে। সে ত্বরিতে এসে হাবুলের গালে মারে একটা বিরাশি সিক্কার চড়। বেচারার মাথা ঘুরতে থাকে বন বন করে। নেপোলিয়ন গালে হাত দিয়ে দাঁড়ায়। এয়ার গান পড়ে থাকে তার পদতলে। বাঁদরটাও সুযোগ বুঝে এয়ার গানটা নিয়ে উধাও হয় পাশের নিমগাছের ডালে। হাবুলও প্রাণপণে চীৎকার করে ওঠে বাঁদরের এই বেয়াদপি দেখে। মনে পড়ে টুনুর গালের ব্যথা আর কালীর ছবির কাচ ভাঙার কথা।

তার চীৎকার শুনে ছুটে আসেন মা, দাদা, ছোটকাকা, মায় টুনু। হৈচৈ পড়ে যায়, 'কি হয়েচে রে হাবুল? কি হয়েচে?'

নিরুত্তর হাবুল করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকে পলাতক বাঁদরের পানে। টুনু তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'ওই দেখ ছোট-কাকা, ছোড়দার এয়ার গান বাঁদরের হাতে।'

'কি ছেলে রে তুই? বাঁদরে তোর হাত থেকে এয়ার গানটা নিয়ে গেল? অমন খাসা জিনিসটা, ন-টাকা দশ আনা দাম!'

আর হাবুল?—সে অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে নিষ্ঠুর অপমানে ও পরাজয়ে হৃদয় ভারাক্রান্ত করে।

সাহায্য

গরীবপুরের হাট হপ্তায় দুদিন। দুদিনই আসি।

গোপালনগরের বাজারে পানবিড়ি বিস্কুটের দোকান। রোজ দোকানে যা বিক্রি, হাটে এলে অনেক বেশী বিক্রি হয় তার চেয়ে; আশেপাশের ক'খানা গ্রামের হাটই করতে হয়

এজন্যে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমাদের গাঁয়ের গোপীনাথ বৈরাগী আছে আর গোপালনগরের আলি নিকিরি, মধু জেলে। কিন্তু ওরা গোপালনগর ইস্টিশান পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাবে, বাকিটা যেতে হবে আমাকে একলা। নিতান্ত ভীতু নই, তাই ওই বন-বাদাড়ের মধ্যে দিয়ে একলা যেতে পারবো। আমি পান বিড়ি বিস্কুট বড় থলের মধ্যে পুরে বললাম—চলো। সন্দে হয়ে গেল যে—শীতও পড়েচে আজ বড্ড—

আলি নিকিরি বললে—রও গো রও। তবিল বেঁধে নিই—শীত পড়েচে বটে—

তারপর আমরা তিনজনে রেল রাস্তায় উঠলাম। রেল লাইনের পাশে সরু পায়ে-চলার পথ কিন্তু আমরা সবাই যাচ্ছি একখানা স্লিপার থেকে আর একখানা স্লিপারে পা দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। গরীবপুর ইস্টিশান ছাড়িয়ে লাইনের দু'ধারে মাঠ আর বন। নির্জন জায়গা, লোকজনের বসতি নেই। ছ'মাইল দূরে গোপালনগর ইস্টিশান। এ ছ'মাইলের মধ্যে লাইনের বাঁ পাশে কেবল একখানা চাষাগাঁ আছে মেহেরপুর, তার আধ মাইল পরেই গোপালনগর ইস্টিশান।

সুতরাং অনেকখানি রাস্তা যেতে হবে হেঁটে এই অন্ধকারে। বেশ মজা লাগে তিনজনে গল্প করতে করতে যাচ্চি বলে।

আলি বললে—কত বিক্রি হোল গো?

—সাত টাকা পাঁচ আনা।

—পানবিড়ি?

—বিস্কুটও আছে।

—আছে দু'একখানা? বড্ড খিদে পেয়েল। খ্যাতাম।

—না আলি দা। গুঁড়োগাঁড়া পড়ে আছে টিনি। সে আর তোমারে দেবো না।

গোপীনাথ বৈরাগী ঘুন্সি চিরুনি কাঠের মালা বিক্রি করে। সে বললে—হাট আর সে যুতের নেই বামুন দা। এই গরীবপুরের হাটে আগে আগে পাঁচ টাকার কম হাট থেকে ফিরতাম না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়েচে দুই তিন—আজ ন'সিকে। এতে মুনফা কি পাই আর পেট চালাই কি দিয়ে। সাড়ে তিন টাকা সরষে তেলের সের। পয়সা লোট্‌চে আলি ভাই—

আলি বললে—কি আর লোট্‌লাম? মনসুর বনগাঁর বাজারে বসে, একডালা খয়রা আর একডালা পুবে চিংড়ি—রোজ সতেরো টাকা আঠারো টাকা মুনফা—আমার সেই জায়গায় সাত আট—বড্ড জোর নয়।

—উঃ রে মুনফা!

—বড্ড হোল?

—আমরা তো ধারণা কত্তি পারিনে—

—পারবা কি করে। ঘুনসি কাঠের মালা ক'জন লোক কেনবে? ও না হলিও লোকের চলে যাবে। কিন্তু মাছ না খেলি মুখে ভাত ওঠবে কি দিয়ে সেটা বোঝো। এই শীতি মাছ না খেলে মানুষ বাঁচে?

হঠাৎ আমি বলে উঠলাম—চুপ চুপ ওই শোনো—

সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে চারিপাশে। সামনে একটা রেলের ছোট সাঁকো। তার দুদিকে জলাভূমি, জলার ধারে জঙ্গল, বেজায় ঘন। সেই জঙ্গলের মধ্যে একটু দূরে ফেউ ডাকচে। ক'দিন ধরে আমাদের এ অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব হয়েচে। প্রায়ই এ গ্রাম ও গ্রামে গরু ছাগল ধরে নিয়ে যায়। সামনে পড়লে মানুষকে কি আর ছাড়ে?

আলি সভয়ে বলল—কোথায়?

—রেলের পুলের ধারে জঙ্গলে—

—দাঁড়াও সব।

গোপেশ্বর এগিয়ে এসে বললে—চলো চলো, ও কিছু নয়—এতগুলো লোককে বাঘ ধরচে না—চলো—

বাঘের জলা পার হয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। মধু জেলে ছেলেমানুষ, তার ভয় হয়েচে। সে বললে—রায় কাকাবাবু, মোরে মাঝখানে করে ন্যাও—

আমি ধমক দিয়ে বললাম—নে, আচ্‌কান! বিশ বছরের ধাড়ির ভয় দ্যাখো—শীতকালে ফি বছর বাঘ আসে, জানো না?

মধু বললে—না, পায়ে পড়ি মোরে এট্টু মাঝখানে ন্যান্—মোর গা ডোল দিয়ে উঠেচে—এই দেখুন হয় না হয়—

—এত ভয় তোর? হাট কত্তি আসিস কেন? মার আঁচল ধরে বসে থাক গে।

কথাটা বললে আলি নির্কিরি।

মধুকে মাঝেই নেওয়া হোলো সবার কথায়।

মধুর ভয় তখনো যায় নি। বললে—রাত্তির ছ'টা পয়সা বাঁচবার জন্যি এল-গাড়ীতি না গিয়ে হেঁটে এ্যালেন সবাই কিন্তু ভাল কাজ করলেন না। আজ মঙ্গলবার অমাবস্যে—সেবার মুই আলেয়া ভূত দেখেলাম চাতরাবাগির বিলি—

আলি বললে—বিলির জলে?

—না গো। বিলির জলের ধারে। জ্বলচে নিবচে জ্বলচে নিবচে—

গোপেশ্বর বললে—যাকগে। রাত্রির কালে ওই সব—রাম, রাম, রাম, রাম—

আমি অতি কষ্টে হাসি চেপে রেখেচি। এ দলের মধ্যে সাহসী আলি নির্কিরি, তার পরেই আমি; ভূতটুতের ধার ধারিনে। মধু ছেলেমানুষ, ওর না হয় ভয় হওয়া সম্ভব—কিন্তু গোপেশ্বর বোষ্টম আধবুড়ো লোক, ওরও ভয়! হাসি পায় বৈকি।

এর পরে নানারকম ভূতের গল্প উঠলো! জলার মধ্যে নক্ষত্র জ্বলচে, কাশবনে শেয়াল ডাকচে। শ্যাম-লতার সাদা ফুল অন্ধকারে দেখা যাচ্চে ঝোপে ঝোপে, মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্চে। ঝিঁঝিঁ ডাকচে পায়ের তলায় ঘাসবনে।

আলি নির্কিরি মাছের ব্যবসার গল্প করচে। এবার ও পাঁচপোতার বিল জমা নেবে, আশিখানা কোমড়ে আছে। এক এক কোমড়ে দু মণ মাছ হবে। গোপেশ্বর জিগ্যেস করলে—কোমড় যে পেতেছিল, সে মাছ তোলে নি তা থেকে?

আলি বললে—কি করে ধরতি পারবে? অত জলে আর কচুরিপানার দামে বোঝাই বিলির মধ্যি মাছ! অত সোজা না মাছ ধরা!

গোপালনগর ইস্টিশান এল, ওরা রেলের বেড়া টপকে অন্য রাস্তায় চলে গেল। আমি এবার একা। ইস্টিশান ছাড়িয়ে দুধারে জঙ্গল বড্ড ঘন। আমার ভয়-ডর নেই, অত বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একাই যাচ্চি, নানারকম অপদেবতার গল্প শুনেও। রায়পুরের রাস্তাটা যেখানে রেল লাইনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সেখানটাতে জঙ্গল বড্ড ঘন।

হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ওটা কি জঙ্গলের মধ্যে সাদা-মত! নড়চে! একটা কুস্বরও কানে গেল! সর্বনাশ! এখন উপায়? আমার গলা কাঠ হয়ে গেল। হাত-পা যেন জমে হিম বরফ হয়ে গিয়েচে।

কানে গেল কে যেন ক্ষীণ দুর্বল স্বরে কি বলচে। আমার শরীর দিয়ে যেন ঘাম বেরিয়ে গেল। এ তো মানুষের গলা। ভূতে শুনেচি, নাকি সুরে কথা কয়।

ঝোপের দিকে এগিয়ে গিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখি একটা কালোমত বুড়ো লোক ময়লা নেকড়া-চোকড়া জড়িয়ে বসে আছে একটা কুঁচঝোপের নিচে। ভয়ের সুরে লোকটা চিঁ চিঁ করে বললে—মোরে খাতি দাও। না খেয়ে মরে গেলাম।

—এখানে কি করে এলে? বাড়ী কোথায়?

—মোরে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়েল গোপালনগর ইস্টিশানে। হাঁটতি হাঁটতি এইটুকু এয়েলাম। না খেয়ে মলাম। এট্টু জল দ্যাও। বাঁচবো না—মোরে বাঁচাও—তুমি মোর ধম্মের বাপ—

—গাড়ী থেকে নামিয়ে দিলে কেন? টিকিট করো নি?

—গায়ে 'মায়ের দয়া' হয়েছে! হাঁটতি পারিনে। সারা অঙ্গে ব্যথা। মোরে বাঁচাও—

অন্ধকারে ভালো দেখতে পাইনে। তাই তো, ওর সারা গায়ে বসন্ত বেরিয়েচে! নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। আর এই শীতে, এই নির্জন রেল রাস্তার ঝোপের মধ্যে...আমার

সারা গা শিউরে উঠলো। কিন্তু কি উপায় করি আমি একা?

—বিস্কুট খাবা?

আমার থলেতে বিস্কুট আছে। তখন আলি নির্কারিকে মিথ্যে কথা বলেছি। রোজ রোজ বিনি পয়সায় পরকে বিস্কুট খাওয়াতে গেলে চলে না। ও কি কখনো বিনি পয়সায় মাছ খাওয়ায় আমাকে? থলেতে খান কুড়ি বিস্কুট ছিল, থলে ঝেড়ে ওর নেকড়াতে ফেলে দিলাম দূর থেকে। একটা বিড়ি ও একটা দেশালাইয়ের খোলে দুটি মাত্র কাঠি পুরে ওর নেকড়াতে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম—বিড়ি খাও—

বিড়ি ধরাবার সময় দেশলাইয়ের কাঠি ও অতি কষ্টে জ্বাললে। ওর হাত কাঁপচে। দেশলাইয়ের কাঠির আগুনে দেখলাম ওর মুখখানা কী বীভৎস দেখাচ্ছে বসন্তের ঘায়ে! বলতে নেই, মা শীতলা, রক্ষে করুন।

—এট্টু জল দ্যাও মোরে—জল তেষ্টায় মলাম—

মুশ্‌কিল! জল পাই কোথায়? জলের পাত্রই বা কোথায় এখানে? রাইপুর গ্রাম এখান থেকে আধ ক্রোশ দূর। সেখান থেকে জল আনতে হবে।

যদি না আনি ও তেষ্টায় মরে যাবে। চলে গেলাম সেই অন্ধকারের মধ্যে রাইপুর। কুমোর বাড়ী থেকে একটা কলসী কিনে পাঁচু তরফদারের টিউব-কল থেকে জল পুরে আবার নিয়ে আসি রেল রাস্তার ধারে। ওর কাছে কলসী এনে দেখি সে ক্ষীণ সুরে কাতরাচ্চে। জল খাবার জন্যে কিছু আনা হয়নি, ভুল হয়ে গিয়েছে। কলসীটা ওর পাশে বসিয়ে বললাম—কলসীর কানায় হাত দিয়ে জল খাও।

থলে থেকে আরও গোটাকতক বিড়ি বার করে একটা দেশালাই সমেত কলসীর পাশে রেখে আমি যখন যেতে উদ্যত হয়েছি, লোকটা বললে—যাচচ নাকি?

—হ্যাঁ।

—কনে যাবা?

—বাড়ী যাবো আর কোথায় যাবো?

—মুই দুটো ভাত খাবো—

আমি রাগ করে বললাম—কোথায় পাবো ভাত? রাত ন'টার গাড়ী চলে গিয়েচে, বাঘের ভয়, আমি বাড়ী যাবো কি করে? এখনো এককোশ পথ। আমি চললাম—

—শোনো, ওগো শোনো—মোর কাছে বসবা না?

—আমার কাজকর্ম নেই তো, বসি তোমার কাছে এখন! কি ঝকমারি যে আজ আমি করিচি! এর পর থেকে আর কোন্ শালা—

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে বললে—মোর বড্ড শীত নেগেচে—

বিবেচনা করে দেখলাম তা লাগতে পারে। আমারই হাড় কাঁপিয়ে দিচ্চে কনকনে উত্তুরে কলাই-ওড়ানো হাওয়ায়। আগুন করে দিই শুকনো ডালপালা দিয়ে ওর কাছ থেকে একটু দূরে। এবার চলে যাবো, ওর কোনো কথা এবার শুনবো না। ও কিন্তু আবার গোঙিয়ে গোঙিয়ে বললে—মোর কাছে একটু বসবা না?

ওর চোখে অসহায় মিনতি।

না, বাড়ী যেতে পারলাম না।

এখন ভাবলে অবাক হয়ে যাই সেই হিম-পড়া কনকনে রাতে বাড়ী ফেরার কথা ভুলেই গেলাম। বসে রইলাম সারা রাত সেই আগুনের কাছে। বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোর রাতেই লোকটা মারা গিয়েছিল, তা আমি জানিনে—তখনো আমি আগুনের পাশে ঘুমুচ্চি।

কালচিতি

কালচিতি গ্রামের নারান হাঁসদা এসে আমাদের নিমন্ত্রণ করে গেল ওদের গ্রামে যাবার জন্যে।

কালচিতি এখান থেকে পাকা দশ মাইল দূর, ডিবুডুংরি ও সারোয়া দুটি জঙ্গলাবৃত পাহাড় পেরিয়ে তবে। দুর্গম রাস্তা।

যাওয়ার প্রয়োজনও ছিল। এই চালের বাজার, জিনিসপত্র দুর্লভ বটে, আক্রাও বটে। ভাল দুধ তো দেশ থেকে উঠেই গিয়েছে। নারানা হাঁসদা ও গ্রামের প্রধান, আমার মক্কেল। তাকে অনেকদিন থেকে বলছিলাম ওদিকে কিছু ধানের জমি পাওয়া যায় কিনা। এবার এসে সে খবর দিল, ত্রিশ বিঘা ভাল জমি এক বন্দে আছে, সেই সঙ্গে একটা পুকুর ও শাল-মহুয়ার জঙ্গল। দরে সে কিছু সস্তা করে দিতে পারে আমাকে, সে-ই যখন গ্রামের প্রধান!

সেদিন সকালে সে একখানা গরুর গাড়ী পাঠিয়ে দিলে। গাড়োয়ানের হাতে একখানা চিঠি, তাতে লেখা আছে আমি যেন বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে যাই।

দুপুরে আহারাদির পর কালচিতি রওনা হলাম। মাইল দুই গিয়ে টাউনের সীমা ছাড়ালাম। তার পর একটা ঝাঁটি শালচারার বন, সেও মাইলখানেক—তার পরেই পড়ল ডিবুডুংরি পাহাড়! পাহাড়ের উপর এঁকেবেঁকে গরুর গাড়ী উঠতে লাগল। তখন বেলা দুটো, আদৌ রোদ নেই; মেঘস্নিগ্ধ আকাশতল, অথচ সকাল থেকে বৃষ্টি নেই, শুধু ঠান্ডা হাওয়া বইছে। পাহাড়ের চড়াইয়ের বড় বড় শাল, করম, আসানের ছায়াবহুল জঙ্গল, এক রকমের ছোট বাঁদর খেলা করে বেড়াচ্ছে ডালে ডালে। করম গাছের হলদে ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ছে পাষাণময় পথের ওপর। যেন কে ইচ্ছে করে ছড়িয়ে রেখেছে।

আবার বহুদূর ঢালু পথে গরুর গাড়ী মন্থরগতিতে নামতে নামতে চলে।

গাড়োয়ান মুখে বলছে—ইঃ ইঃ। ডুংরিটা পেরিয়ে জল খাওয়াইয়ে লিব, চল ইঃ—শালের পাঁচন মারছে গরুর গায়ে।

পাহাড় পার হয়ে ঢালু বিস্তীর্ণ পথটা যেখানে সমতল ভূমিতে এসে মিশেছে সেখানে একটা পাহাড়ী নদী উপলরাশির ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। পার্বত্য নদীর বন্ধুর তটভূমিতে দু পারেই কুটজ কুসুমের শোভা, চিহড় লতা অজগর সাপের মত বড় বড় শালগাছের গুঁড়িতে বেষ্টন করে উপরের দিকে উঠেছে। কম্‌ব্রিটাম লতার ছোটবড় ঝোপ একেবারে জল ছুঁয়ে আছে। পক্ষিকাকলীমুখর বড় সুন্দর স্নিগ্ধ উপত্যকাটি। যেন এখানে সংসারের কোন গোলমাল নেই। রাজাকরদের উৎপাতের কথা শুনতে হয় না সকালে উঠে, ব্ল্যাকমার্কেটের সংবাদ পেঁছয় না, মানুষের সঙ্গে বিবাদের বার্তা নেই এখানে। গাড়োয়ান বললে—নাম বাপু, জল খাওয়াইয়ে লিব গরু দুটাক।—আমরা গাড়ী থেকে নেমে একটু দূরে একটা বড় শিলাসনে বসতে যাচ্ছিলাম! গাড়োয়ান বললে, উ ধারে যাবি না আজ্ঞে।

—কেন?

—উ ধারে ভালুক-ঝোড় আছে। ভালুকটা বাহিরাবে! গরু ডরাবে।

ভালুক! পথের ধারেই দিনের বেলা ভালুকের ভয়! মেয়েরা ভয় পেয়ে গেলেন। আমরা কাছেই বসলাম কিছুক্ষণ, তার পর আবার গাড়ীতে উঠলাম।

এবার কিছুদূর গিয়ে একটা বন্য গ্রাম পড়ল, নাম কাড়াডোবা। ঘর কুড়ি-বাইশ মুন্ডা খৃষ্টানের বাস, মকাই ক্ষেতে কাজ করছে মেয়েরা, বাঙালী মেয়ের মত শাড়ী পরনে। একটি মুন্ডা যুবককে জিজ্ঞেস করলাম—কি নাম আছে?

—পল্।

—ও মেয়ের কি নাম?

—রত্না কুই!

একেবারে আধুনিক নাম—'রত্না'। খৃষ্টান মিশনারীরা ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে অনেকখানি বাইরের আলো দিয়েছে যে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। রাস্তার দুধারে অবস্থিত সারবন্দী ওদের বাঁশ-খড়ের ছোট নীচু ঘরগুলির মেঝে ও দাওয়া এলা মাটির রং করা, নিকানো মোছানো, দেওয়ালের বাইরে ধনেশপাখীর ছবি আঁকা, ভালুকের, পাহাড়ের ও ফুলগাছের ছবি আঁকা।

ওদের ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে ছেলে কোলে করে কৌতূহলের সঙ্গে বন্য মেয়েরা

একদৃষ্টে আমাদের গাড়ীর দিকে তাকিয়ে আছে।

একটি বৃদ্ধা গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলে—কুথাকার গাড়ী বটে?

—কালাচাঁদ।

—কে আসছে সঙ্গে?

—ডাক্তারবাবু বটে।

—হোই।

আবার নির্জন বনপথ। একেবারে নির্জন। সন্ধ্যার পর বন্যহস্তিযূথ এ পথে বর্ষার ধানক্ষেতে নামে পাহাড় থেকে, পথের ধারে নরম মাটির বুকে তাদের পদচিহ্ন এঁকে। সাদা মেঘপুঞ্জ থোলো থোলো জমেছে দূরে শৈলমালার শিখরে শিখরে, কালিদাসের দেশের সানুমান আম্রকূটের ছবি মনে জাগিয়ে দেয়। সঙ্গে একখানি মেঘদূত যদি আনতাম, তবে ওই বন্য কুটজবৃক্ষের তলায় পাহাড়ী নদীর পাড়ে পাথরের ওপর পা ছড়িয়ে বসে এমন মেঘমেদুর দিনের স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের সুখমন্থর দিনগুলির কথা পাঠ করতাম, আর শুনতাম ধনেশপাখীর ডাক, শুনতাম বনময়ূরের কেকাধ্বনি। শহরের দোতলা ঘরে বৈদ্যুতিক বাতির তলায় ও কাব্য পড়ে কেউ ওর প্রাণস্পন্দন কানে শুনতে পাবে না।

অনেকদূর যাবার পরে আর একটা গ্রাম পড়ল, এর নাম টেঁড়াপানি। একেবারে সাঁওতালী নাম, যে জায়গা থেকে জল দূরে। বহুব্রীহি সমাস।

এ গ্রামটিও খুব বড় নয়, খুব বড় গ্রাম এ অঞ্চলে বড় একটা নেই। এই গ্রামে একটা দেখবার মত জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে একটা পাথরের চবুতারা, তার চারিদিকে পয়ঃপ্রণালী। বহু পুরনো আমলে এখানে নাকি প্রানদণ্ডের আসামীদের শিরশ্ছেদ করা হত, রক্ত গড়িয়ে পড়ত ঐ পয়ঃপ্রণালী দিয়ে। কে যে কার প্রাণদণ্ড দিত, তা বোঝবার কোন উপায় নেই—সম্ভবত পুরনো প্রাক্‌বৃটিশ যুগের কোন বন্য রাজা।

টেঁড়াপানি ছাড়িয়ে দু-রশি গিয়েই সারোয়া পাহাড়ের চড়াই শুরু হল ক্রমোচ্চ বনপথের মধ্য দিয়ে: এই বর্ষাকালে ছোটখাটো ঝরনা কুলুকুলু রবে এদিক-ওদিক থেকে সরবে নেমে আসছে, দ্রোলঘাসের ফুল ফুটেছে, যে ফুল তীরের মত বিঁধে যায় কাপড়ে।

এ পাহাড়ে বড় গাছ অনেক বেশি, চড়াইয়ের পথ দুর্গমতর। কিন্তু শোভা সবচেয়ে চমৎকার। উচ্চতা এত বেশি যে, এখানে চড়াইয়ের মাথা থেকে বহু দূরে টাটানগরের ডালমা পাহাড় চোখে পড়ে। চারিধারেই ঢেউ-খেলানো পাহাড়শ্রেণী, কোথাও উঁচু কোথাও নীচু—দূরে দূরে পাহাড়গুলো ঘননীল, কালো মেঘের পটে ছবির মত।

একজন বুড়ো কাঠুরে লুদাম গাছের কাঠ কাটছে পাহাড়ের মাথায়। তার পরনে ইঞ্চিদুই চওড়া কাপড়ের কৌপীন মাত্র।

জিজ্ঞেস করা গেল—কি নাম রে?

—গনু সর্দার।

—বাড়ী কোথায়?

—টেঁড়াপানি।

—তোর বয়েস কত?

—কি জানি বটেক।

—পঞ্চাশ হয়েছে?

—পঞ্চাশ হতে পারে, ত্রিশ হতে পারে।

—কি খেয়েছিস?

—নাই খাইল।

—তবুও?

—সোঁধা চাল আর নুন।

অর্থাৎ ভিজে চাল নুন দিয়ে খেয়েছে। এ সব বন্য দেশে আটা ছাতু প্রভৃতি খাদ্য একেবারে অচল। এরা ভাত ছাড়া আর কিছু বোঝে না। এমন কি তরকারি পর্যন্ত খায় না, হয়তো একটু শাকভাজা আর নুনের টাকনা দিয়ে এক বড় জামবাটি ভর্তি

পান্তাভাত দিব্যি মেরে দিলে। তাতেই এদের সবল স্বাস্থ্যবান পাথরেকোঁদা চেহারা, ধনুকবাণ নিয়ে বড় বাঘ ও বুনো হাতী আর ভীষণ বিষধর শঙ্খচূড় সাপের সামনে এগিয়ে যাবে নির্ভয়ে। আর ভালুক? সে তো এদের ধর্তব্যের মধ্যেই গল্য নয়। সন্ধ্যের অন্ধকারে বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘোরে।

আমাদের গাড়ীর একটি মেয়ে হাসতে হাসতে বললে—হ্যাঁ গনু সর্দার, তোমার বয়েস পনের পর্যন্ত হয়েছে কি?

—তা হতে পারে বটে।

—তাহলে বড্ড বয়েস হয়েছে তোমার?

—হ্যাঁ, রেলটা বসল চাঁইবাসাতে, তখন আমি কাড়া চরাই আজ্ঞে। তুমি আগুন দিলি?

—কি?

আমি বুঝিয়ে বললাম গনু দেশলাই চাইছে। পিকা খাবে। পিকা অর্থাৎ কাঁচা শাল-পাতায় জড়ানো তামাকের পাতা; বিড়ির আকারের বটে, তবে আধহাত লম্বা। বাজারের বিড়ির চেয়ে পিকা খেতে অনেক ভাল লাগে। এই সব বন্য অঞ্চলের কোন লোকই বাজারের তৈরি বিড়ি কিনে খায় না।

জিজ্ঞেস করলে বলে—উ উদাস লাগছে রে।

এবার সারোয়া পাহাড় থেকে পথ নামল। ঐ পথটা আগের পাহাড়ের উৎরাইয়ের মত অতটা ঢালু নয়। অর্থাৎ রাস্তাটা দিয়ে আরোহী-বোঝাই গরুর গাড়ী নিয়ে নামা একটু বিপজ্জনক। নামবার রাস্তার একপাশে খাদ বেশ গভীর। গরু যদি ভয় পেয়ে একটু এদিক-ওদিক নিয়ে যায় তবে ঐ খাদে আরোহী-পূর্ণ গাড়ীর সমাধি সুনিশ্চিত।

ঢালু পথটা যেখানে সমতলে এসে মিলল, সেখানেই কালচিতি গ্রাম। অর্থাৎ সারোয়া পাহাড়ের এপারে ঢেঁড়াপানি আর ওপারে কালচিতি, মাঝখানে পাহাড়টা দাঁড়িয়ে। এই গ্রামটা এদিকের মধ্যে বড়। অনেক ঘর লোকের বাস, এদের মধ্যে অনেক বাঙালী অধিবাসীও আছে। বাঙালী অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ বহুকাল আগে বাঁকুড়া বা মেদিনীপুর জেলা থেকে এসে এখানে বাস করেছিল। এই বনাঞ্চলের পরিবেশের মধ্যেও এরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ঠিক বজায় রেখে চলেছে।

আমরা নারান হাঁসদার বাড়ী গিয়ে উঠলাম। খড়ের বাড়ী, মাটির দেওয়াল, মাঝখানে বড় একটা চওড়া ঘর, তার চারপাশে কুঠুরি, শালকাঠের দরজা জানালা। কোথাও চুন সিমেন্টের বালাই নেই। নারান হাঁসদার মুখে শুনলাম এ ঘর অন্তত সত্তর বছর আগে তৈরি, অথচ মাঝে মাঝে নতুন ছাউনি দেওয়া ছাড়া অন্য বিশেষ কোন খরচ নেই এর পেছনে। নারান হাঁসদার বাড়ীর মেয়েরা এগিয়ে এসে গাড়ী থেকে আমাদের বাড়ীর মেয়েদের নামিয়ে নিয়ে গেল। তাদের পরনে ফর্সা শাড়ী, গায়েও ব্লাউজ, এমনি অজ বন্য গ্রামের মেয়েদের তুলনায় অনেক মার্জিত ও সভ্য, এদের কথাবার্তাও ভাল, খানিকটা এ অঞ্চলের বুলি ও টান থাকা সত্ত্বেও ভাল বাংলা বলেই মনে হয়।

নারান হাঁসদা বাঙালী নয়, সাঁওতাল। ওদের বাড়ীটা একটু বেশি ভাল, আসবাবপত্রও অনেক রকম আছে, কারণ ও গ্রামের প্রধান, অবস্থাও ভাল।

নারান হাঁসদার মা এসে বললে—ঠাকরাইনরা, আসেন ঘরের মধ্যে। গরিবের ঘরে পা দিছেন, পায়ে জল দেন।

আমি বাইরের ঘরে একটা চৌকির ওপর বসলাম। নারান হাঁসদার ভাই এসে তার ওপর একটা ভাল শতরঞ্জি পেতে দিয়ে গেল।

এতটা পাহাড়ী রাস্তায় এসে শরীর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমি গরুর গাড়ীতে বেশি উঠি নি, হেঁটেই এসেছিলাম গরুর গাড়ীর পাশে পাশে। বালতিতে ঠাণ্ডা জল ঝরনা থেকে তুলে নিয়ে এল, হাত মুখ ধুয়ে ফেললাম, মাথাও ধুয়ে ফেললাম। শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গেল। সারাদিনের পরে এখন হঠাৎ হলদে রোদ গাছপালার মাথায়, দূর পাহাড়ের মাথায়। বনকুসুমের সুবাসভরা অপরাহ্ণটি বন্যবিহঙ্গের কলরবে মুখর। ওদের বাড়ীর সামনে মস্ত বড় কুসুমগাছ, তার তলায় কাঠের আস্ত গুঁড়ি চেরা ছালটের বেঞ্চি পাতা। সেখানটাতে

গিয়ে বসলাম ঝিরঝির পাহাড়ী হাওয়ায়। গ্রামটি বেষ্টন করে দূরে দূরে নীল পাহাড়মালা। অরণ্যের শ্যামশোভা সারোয়া পাহাড়ের সানুদেশে, দু ফার্লিং দূরে পার্বত্য নদীর ধারে ধারে। এ যেন রূপকথার গাঁ—যেখানেঃ

রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকি-জ্বলা বনের ছায়ে
দুলিছে দুটি পারুল কুঁড়ি,
তাহারি মাঝে বাসা।

শহর থেকে অনেকদূরে, পাহাড়ী বনের ধারে, শাল আসান মহুল গাছের ছায়ায় লুকানো আছে রূপকথার গ্রাম। জ্যোৎস্নারাত্রে বনের ফুলের সুবাসে এদের কুটিরের বাতাস মদির কর তোলে, বাঘ-ভালুক উঁকি মারে আনাচেকানাচে, বনের ময়ূর নৃত্য করে এমনি বর্ষার দিনে কুসুমগাছের ডালে ; খুব নিস্তব্ধ, শান্তি ও নির্জনতায় ভরা দিনে এরা গান গেয়ে বেড়ায় গ্রামের মাঠে পথে। ঝরনার স্বচ্ছ জল তুলে আনে সুঠাম বনবধূরা, কুরচি-ফুল-ফোটে পাষাণপথ বেয়ে রিক্তবৃন্ত করবীর বাঁকা ডালে মাংসল বটের, চাহা, তিত্তির পাখী উড়ে এসে বসে।

শহরের লোকে এ গাঁয়ের সন্ধান খুঁজে পায় না।

নারান হাঁসদার ভাই এসে বললে—বাবু, চা দেব কোথায় ? ঘরে আসবেন ?

—এখানেই ভাল। বেশ ফাঁকা জায়গা গাছের তলায়।

—পিকা বানাব বাবু ? বিড়ি-সিগারেট এখানে মেলে না।

—চমৎকার হবে—বানাও।

ঘটিতে চা এল আর এল তালের পরোটা, গরম ভাজা মুড়ি, তালের ক্ষীর, মর্তমান কলা, আর শসার কুঁচি নুন-নেবু মাখানো। যা কিছু সবই এ গ্রামের, কেবল পরোটার আটা এসেছে বাইরে থেকে। অবিশ্যি চা-চিনিও। খাঁটি দুধের তৈরি তালের ক্ষীরটি অতি উপাদেয় হয়েছিল।

নারান হাঁসদা বিনীতভাবে বললে—আমাদের ইস্কুল দেখবেন ? আমার মেয়ে সেখানে মাস্টার। যাবেন ?

—নিশ্চয়ই যাব।—আমার জানা ছিল না নারান হাঁসদার কোন মেয়ে আবার ইস্কুল মাস্টার।

বললাম—কিন্তু এখনও স্কুল খোলা আছে ? বেলা তো বেশি নেই।

—আপনি দেখতে যাবেন বলে খোলা রাখা হয়েছে।

—সে কি ! এতক্ষণ বলতে হয়। চল চল।

অনেকটা গিয়ে গ্রামের প্রান্তসীমায় ফাঁকা মাঠ ও বনের সামনে খড়ের স্কুলঘর। সে এমন একটি স্বপ্নময় সুন্দর জায়গা যে মনে হল এখানে মাস্টারি করা একটা সৌভাগ্য। স্কুলের মাঠের অল্প দূরেই নিবিড় আরণ্য-ভূমি শুরু। রাত্রে নাকি স্কুলের রোয়াকে ভালুক এসে বেড়ায়। জারুল ফুল ফুটে আছে অদূরবর্তী বনশীর্ষে, যে জারুল গাছ কত যত্ন করে কলকাতার রাস্তার ধারে মানুষ করা হচ্ছে।

আমি স্কুলের মধ্যে ঢুকতেই ছাত্রছাত্রীরা উঠে দাঁড়াল একসঙ্গে। নারান হাঁসদার মেয়ে নার্সদের মত কাপড় পরে নীচু টুলে বসে ছাত্র পড়াচ্ছিল। বাইশ-তেইশ বছর বয়স হবে : কালো বটে, তবে কুচকুচে কালো নয়, চোখ দুটিতে সরলতা ও ঔৎসুক্যের দৃষ্টি। হাতজোড় করে নমস্কার করলে, আমিও নমস্কার করলাম। বেশ লাগল মেয়েটিকে।

স্কুলের দেওয়ালে একখানা ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো, তার এক পাশে মহাত্মা গান্ধীর ছবি একখানা। একখানা বাংলা ক্যালেন্ডার ঝুলছে তার পাশে। মেজেতে মাদুর পাতা, তাতে ছাত্রছাত্রীরা বসে ; সামনে একটা করে নীচু টুল, তাতে বইপত্তর রাখে।

নারান হাঁসদা বললে—এই আমার মেয়ে, এর নাম সুশীলা।

আমি বললাম—বেশ। আপনি বসুন। আপনার ছাত্রছাত্রীরা কি পড়ে ?

মেয়েটি বিনীতভাবে বললে—লোয়ার প্রাইমারি পাঠশালা এটা।

একটি ওরই মধ্যে বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম—কি পড়?

—সরল সাহিত্যপাঠ।

—পড় তো একটু।...আচ্ছা, বেশ হয়েছে। বস। ভাল পড়েছ।

মেয়েটি বললে—একটা কবিতা শুনবেন?

—নিশ্চয়ই।

আমাকে অত্যন্ত অবাক করে দিয়ে একটি ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করলে—

ঐ দেখ মা, আকাশ ছেয়ে
মিলিয়ে এলো আলো,
আজকে আমার ছুটোছুটি
লাগলো না আর ভালো।
ঘণ্টা বেজে গেল কখন,
অনেক হলো বেলা,
তোমায় মনে পড়ে গেল,
ফেলে এলেম খেলা।

যে দেশের ঘন বনানী ও পাহাড় অঞ্চলের ক্ষুদ্র সাঁওতাল গ্রামের ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে, সে দেশ বাংলা-ভাষী নয় এ অদ্ভুত মন্তব্য কাদের? তারা এসে যেন দেখে যায়।

বোর্ডে একটা ছোট অঙ্ক দিয়ে ওদের কষতে বললে সুশীলা। তারা শেলটে অঙ্ক কষে আমার কাছে দেখাতে নিয়ে এল। গান্ধীজীর ছবি দেখিয়ে ছেলেদের বললাম—কার ছবি বল তো?

বড় বড় ছেলেরা সবাই বললে—গান্ধীজীর।

ছোট ছেলেমেয়েরা উত্তর দিলে না।

আমি ওদের খুব উৎসাহ দিলাম লেখাপড়ার বিষয়ে। সুশীলা স্কুলের ছুটি দিয়ে দিলে। আমার স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষ নাকি আগামী কালও ছুটি থাকবে।

ছেলেরা তিনবার বললে—জয়-হিন্দ! জয়-হিন্দ! জয়-হিন্দ!

একে একে আমায় নমস্কার করে সবাই স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে উচ্চ-কলরব ও হাসি-খুশির ঢেউ তুলে যে যার বাড়ীর দিকে চলল।

মেয়েরা দেখি মেয়েদের সঙ্গে খুব জমিয়ে তুলেছে। বেলা গেল, যদিও সুমুখে জ্যোৎস্নারাত, মেঘে ঢাকা আকাশে জ্যোৎস্না বিশেষ সাহায্য করবে না দুর্গম পাহাড়ী পথে। সেই জন্যে নারান হাঁসদা বার বার বলতে লাগল—রাত্রে এখানে থাকুন বাবু।

সুশীলা এসে বললে—থাকুন রাত্রে আজ। আপনারা থাকলে বড় খুশী হব।

বললাম—আপনি বরং একদিন আমাদের ওখানে আসুন আপনার বাবার সঙ্গে। আজ ছেড়ে দিন আমাদের। সুশীলা চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ থেকে একটা প্রশ্ন ওকে জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। এইবার বললাম—

—আপনি কতদূর পড়াশুনো করেছিলেন?

সুশীলা উত্তর দিল—মেদিনীপুর স্কুল থেকে মাইনর পাশ করেছি। একটা ক্রিশ্চান মিশনে সেলাই আর ইংরিজি শিখেছি কিছুদিন।

—এখানে মাইনে কত পান?

—কুড়ি টাকা।

—স্কুলের লাইব্রেরী আছে?

—সামান্য কিছু বই আছে। রবীন্দ্রনাথের বই কিছু আনব এবার।

—কি বই পড়েছেন রবীন্দ্রনাথের?

—কিছুই পড়িনি। আমি যে মিশনে সেলাই শিখতাম, সেখানকার টিচারের কাছে ও'র অনেক বই ছিল। ও'র গানের বই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে।

—রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে পারেন?

—গান গাইতে জানি নে। কোন গানই নয়। শুনতে ভালবাসি। একটা কথা বলব? এঁদের মধ্যে যদি কেউ গান করেন একটি, তবে বড় ভাল হয়।

আমাদের বাড়ীর একটি মেয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গাইলেন। ওরা সবাই খুব মন দিয়ে শুনল।

এবার আমরা বিদায় নিলাম। আসবার পথে ওরা খানিকদূর আমাদের এগিয়ে দিলে, আর উপঢৌকন দিলে সঙ্গে ঢেঁড়স, কুমড়ো, পাতিলেবু, বড় একছড়া মর্তমান কলা, গোটা-চারেক পাকা তাল।

সারোয়া পাহাড়ের ওপরে যখন উঠেছি, তখন অস্তদিগন্তের মেঘের নীচে দূরের পাহাড়গুলো ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। একটা চমৎকার ওষধিগন্ধ উঠছে বনলতা গাছপালা থেকে। পাখীদের কাকলী-ধ্বনিতে অধিত্যকার বনানী মুখর হয়ে উঠেছে। একটি পরিচিত পাখীর ডাক শুনে খুশী হলাম। সমতল বাংলাদেশের বাঁশবনে, আমবনে, বৈঁচি-ঝোপের পাশে এ পাখী ডাকে। পাপিয়া।

সারোয়া পাহাড় থেকে যখন নামলাম, এপাশে টেঁড়াপানি গ্রামের কুটিরে কুটিরে তখন মাটির প্রদীপে মহুয়া বীজের তৈল ও বন-করনজার তৈলের মিটমিটে আলো। কেরোসিন তেল এসব দুর্গম বনাঞ্চলে আদৌ পেঁছিয় না আজকাল, তার ধারও এরা ধারে না।

ভিবুডংরি পাহাড়ের আগে সেই বনভূমির মধ্যে দিয়ে অতি সন্তর্পণে মশাল জ্বালিয়ে গাড়িখানা চালাতে লাগল গাড়োয়ান বন্যহস্তীর ভয়ে। অন্ধকার খুব ঘন নয়, মেঘভরা জ্যোৎস্নায় পথ দেখতে কোন অসুবিধে নেই।

হঠাৎ দেখি সেই নির্জন বনপথে দুজন লোক আসছে। দুটিই মেয়েমানুষ।

বললাম—বাড়ী কোথায় রে?

—উই গাঁয়ে বটে।

—কোন্ গাঁয়ে?

—টেঁড়াপানি।

—এত রাত্রে কোথা থেকে আসছিস?

—হাটে গিয়েছিলেক, আবার কুথা থেকে আসব বটে।

তা বটে। আজ কালিকাপুরের হাট, মনে ছিল না সে কথা।

এই দুটি মেয়ে যদি এত রাত্রে এই বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অন্ধকার বনপথে নির্ভয়ে আসা-যাওয়া করতে পারে, তবে আমরা মস্ত বড় দুঃসাহসের কাজ কিছু করছি না রাত্রে গাড়ী করে ফিরে।

আগে ভয় যে না হয়েছিল এমন নয়; এখন লজ্জিত হলাম সেজন্যে। তবে এ বনই এদের জন্য, কিছু বোঝে না ওরা বন ছাড়া। স্নেহময়ী জননীর অঙ্কের সমান ওঁদের কাছে এই পাণ্ডববর্জিত বন্যাঞ্চল, বাঘ-ভালুক ওদের বাল্যসঙ্গী। আমাদের তা নয়, এইটুকু যা তফাত।

দিবাবসান

যে কটা জিনিস আমার ভাল লাগছিল তার মধ্যে প্রধান একটা হচ্ছে চারিধারের নির্জনতা—যে দিকে চাই, কোন দিকে কাউকে চোখে পড়ে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, গাছপালার সমাবেশে প্রকৃতির কোন দৈন্য চোখে পড়ছিল না—বনে, ঝোপে, পাতায়, লতায়, ফুলে, ফলে, খড়ে, ঘাসে অযত্ন-সজ্জিত প্রকৃতির পরিস্ফুট বন্য-সৌন্দর্য। এই আছে, তার পেছনে আরও, তার পেছনে আরও, দূরে দূরে আরও নানা রকমের বন-ঝোপের সমাবেশ, ঠাসাঠাসি, অগাধ সবুজ সমুদ্রে জমাট পাকিয়ে আছে। ইচ্ছামত যত খুশি দেখতে পারি, ফুরিয়ে যাবে না, মানুষের হাতে বাছাই করে পোঁতা দু-দশ রকমের শখের গাছ নয়। একটা উঁচু ঢিবির ওপরে নানাজাতীয় গাছ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে—একটা বড় সাঁইবাবলা গাছ, তলায় আধ-

শুকনো উলু খড়, কাঁটাওয়ালা বৈঁচি গাছ, আসশেওড়া, ভাঁট, কচু, ওল, বিছুটি-লতা—সবগুলো জড়িয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে। ঢিবিটার ওপর নোনা গাছটার ছায়ায় একটু বসলুম। এমন শান্তি অনেক দিন অনুভব করি নি—চারিদিকে চেয়ে শান্তি—কেউ কোন দিকে নেই। আর গাছগুলোর দিকে চেয়ে মহাশান্তি এই যে, সেগুলো মানুষের হাতে পোঁতা নয় আদৌ—সম্পূর্ণ বনজ, একেবারে খাঁটি নিখুঁত বনজ। তলায় একেবারে শুয়ে পড়লুম। আঃ, কি আরাম! হলদে ফুলে ভরা বিছুটিলতা মাথার ওপরে দুলছে, বাতাস লেগে শুকনো সাঁই-বাবলার পাতা ঝর-ঝর করে বুকের ওপর ঝরে পড়ছে। দুর্গা-টুনটুনি পাখী একেবারে কানের কাছে শেওড়ার ডালে বসে কুচকুচ করছে। বড় দুঃখ হল, সঙ্গে কোন বই আনি নি। প্রাণে রস যোগায় এমন বই যদি পড়তে হয় তবে এই তার স্থান। এই রকম শান্ত শীতের অপরাহ্ণে, এই রকম ধু-ধু মাঠের ধারের নির্জন ঝোপের মধ্যে, ডান হাতের খুঁটি দিয়ে মাথাটাকে উঁচু করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়তে হয় শেলির কবিতা, কি ডারউইন, কি মানুষের দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তার ইতিহাস, কি ঐ রকম একটা কিছু। আবদ্ধ লাইব্রেরী ঘরে পুরাতন বই ও ন্যাপথলিনের গন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাসের মধ্যে বসে বই পড়লে অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য ও গাম্ভীর্যের আবহাওয়ায় সদ্য পণ্ডিত হয়ে উঠেছি মনে করে পুলকিত হওয়া যায় বটে, কিন্তু এ-রকম নির্জন ঝোপে খোলা আকাশের তলায় বসে পড়বার ঐশ্বর্যের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। আরাম করে পড়বার এই তো জায়গা। গাছগুলোর পাতার দিকে চেয়ে যখন মনে হবে, মাঠের মধ্যের এই সামান্য শেওড়া গাছ, এই সামান্য উলু-খড়টাও নয় কোটি মাইল দূরবর্তী সূর্যের দিকে পত্র-পুষ্প ফিরিয়ে আছে প্রাণশক্তির ইন্ধন ভিক্ষার আশায়, ঐ বিরাট অগ্নিপিণ্ডের লক্ষ লক্ষ মাইল দীর্ঘ প্রজ্বলন্ত হাইড্রোজেন-শিখার রক্তলীলার আড়ালে পৃথিবীর মাঠের এই সামান্য বিছুটিলতাটিরও জীবন লুকানো রয়েছে—ডারউইনের লেখা তখন মনের মধ্যে নতুন রস যোগাবে, শেলির কবিতার নতুন অর্থ হবে। এ-রকম অবস্থায় আধ ঘণ্টার মধ্যে মনের হয়তো যে দ্বার খুলে যেতে পারে, আঁটাসাঁটা বন্ধ ঘরে ইলেকট্রিক পাখার তলায় আরাম-কেদারা হেলান দিয়ে পড়লে সাত বৎসরেও সে দ্বারের সন্ধান মিলবে না।

লতা যেমন ঐ বাবলা গাছের আড়ালে হেলে পড়া সূর্য থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে, এখানে মন তেমনি উন্মুক্ত উদার বিপুলা প্রকৃতি থেকে নতুন রস পান করে বলী হয়।

বেলা পড়ে যাচ্ছে দেখে নোনা গাছের তলা থেকে উঠলুম। মাঠের মধ্যে তখন গাছপালার দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া পড়ে গেছে, বাবলা বনের ওপর সূর্য হেলে পড়েছে। চলতে চলতে আর একটা ঝোপের মাথা থেকে একটা বেগুনে রঙের অজানা বনফুল তুলে নিলুম। তার গর্ভকেশরের চারিপাশ ছোট ছোট লাল লাল পিঁপড়েয় ভরা, তাদের সর্বাঙ্গ ফুটন্ত ফুলের পরাগে মাখামাখি—মধু খেতে এসে তারা গাছের কি মহৎ উপকার করে যাচ্ছে। চেয়ে দেখলুম সে-রকম গাছ চারি পাশে আরও অনেক। সবগুলোতেই ফুল ফুটে আছে। আমি উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্র নই, স্ত্রী-ফুল পুরুষ-ফুল চিনি নে, তা হলে ব্যাপারটা বেশি করে উপভোগ করতে পারতাম। ঝোপের মাথায় হলদে-পাখা প্রজাপতি উড়ছে। এই সব ছোট ছোট পোকামাকড় প্রজাপতি আর এই অখ্যাত উদ্ভিদ-জগৎ পরস্পর অদ্ভুত কার্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ, পরস্পরের উপর নির্ভর করছে। গাছপালা কঠিন মাটি থেকে, বায়ুমণ্ডল থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিজের দেহের মধ্যে অদ্ভুত কৌশলে খাদ্য তৈরি করছে প্রাণী-জগতের জীবনধারণের জন্যে—ওগুলো তো প্রাণীজগৎকে খাদ্য যোগাবার একপ্রকার যন্ত্র। প্রাণী-জগৎ কত রকমে তাদের বংশবৃদ্ধির সাহায্য করছে; আর সকলে মিলে নির্ভর করে আছে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরবর্তী ঐ বিরাট অগ্নিকুণ্ডটার ওপর। এই পাখী, এই প্রজাপতিটা, এই ফুল, এই তুচ্ছ কি গাছটা, এই লতা, এই আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, ঐ যে উজ্জ্বল হয়ে আসছে ঐ চাঁদটা, এই চারিধার, এই প্রাণী-জগৎ, ঐ লক্ষ মাইল দূরের সূর্য, ঐ অনন্ত মহাব্যোম, এই বিপুল বিশাল অচিন্তনীয় অসীমতা, সবগুলোর মধ্যে পরস্পর কি আশ্চর্য নাড়ীর যোগ! কি বিপুল রহস্য ভরা তাদের এই পরস্পরনির্ভরতা!

মাঠের সামনে গ্রাম পড়ল। অড়হর ক্ষেতের চারিধারে ধঞ্চে গাছের বেড়া দিয়েছে।

ওধারে ভুর-ভুর করে কোথা থেকে ফুটন্ত সরষে ফুলের গন্ধ আসছে। এদিকে বেড়ার গায়ে ক্ষুদে-ক্ষুদে ফুল ফুটে বেড়া আলো করে রেখেছে, গন্ধটায় বড় ঝাঁঝ। মাঝে মাঝে গাছে নাটা ফলের খোলো শুকিয়ে আছে। একঝাড় পাথরকুচি গাছের পরমায়ু ফুরিয়ে আসছে, তাদের পাতাগুলো সিঁদুরের রং হয়ে উঠেছে। একটা ঘন আলকুশি লতার ঝোপের মধ্যে থেকে শীতের বৈকালের ঠান্ডা গন্ধের সঙ্গে কি একটা ফুলের তীব্র ঘন সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে...মাথার উপর দিয়ে আকাশ বেয়ে এক ঝাঁক বালিহাঁস বাসার দিকে উড়ে চলেছে।

কাশির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, গ্রামের ও-দিকের পথ বেয়ে দুজন র‍্যাপার-গায়ে জুতো-পায়ে ভদ্রলোক আসছেন। এখান থেকে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিযুক্ত, এ রকম ঝোপের কাছে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তাঁরা আমাকে পাগল ঠাওরাবেন নিশ্চয়, কারণ বিনা কাজে মাঠের মধ্যে ঝোপের দিকে হাঁ করে চেয়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছে—এ-দৃশ্যটা আমাদের দেশে একেবারেই আজগুবী।

গ্রামের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই বাড়ী। একজন বৃদ্ধ জনকতক লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছে—'এই তো পথ ছিল রে বাপু। মাছ তরকারি সব বাড়ী বসে কেনো। বাজারে কি যেতে হত। বেগুন সব এমন এমন। আর সস্তাও কি! মনে আছে তখন বিষ্ণুপুরের হাট বিষ্ণুপুরেই ছিল, রাজগঞ্জে উঠে আসে নি। একবার—।' ...পুরনো পোড়ো বাড়ীটার একটা দেওয়াল তখনও দাঁড়িয়ে আছে, স্তূপাকৃতি ইটকাঠের মধ্যে নিমগাছ আর যগডুমুর চারা গজিয়ে উঠেছে। দেওয়ালের গায়ে দোতলার সমান উঁচুতে একটা কুলুঙ্গি। কে জানে, সত্তর বছর আগে হয়তো এই জীর্ণ পরিত্যক্ত আবাসে কোন নববধূ তার মেথিতে ভেজানো সুগন্ধ নারকেল রেলের পাথরবাটি ঐ কুলুঙ্গিতে রেখে দিত। ঐ ঘরের মধ্যেই কত বছর আগেকারের তাদের ফুলশয্যার প্রথম প্রণয়ের মধুরাত্রি কেটে গিয়েছে।

কোথায় আজ আশি বৎসর আগেকার সে সব প্রথম প্রণয়-হর্ষাকুলা তরুণী নববধূ? কোথায় তাদের প্রিয়জনেরা? কোন্ দূর অতীতে কতদিন হল ছায়ার মত মিশে গিয়েছে, কে আজ তাদের সন্ধান দিতে পারে!

একটা বাড়ীর উঠানে একটা বিলাতী আমড়া-গাছতলায় একদল পাড়ার ছেলে খেলা করছে, নতুন লোক দেখে তারা খেলা ফেলে আমার দিকে সকৌতুকে চেয়ে রইল। অন্ধকার ঝুপসি বাঁশ-বাগানের মধ্যে ডোবার ধারে বসে একজন পল্লীবধূ বাসন মাজছে—তাদের তরুণ জীবনও সেই বাঁশ-বাগানের মধ্যেকার আসন্ন শীতসন্ধ্যার মতই ঘুলিঘুলি অন্ধকার। সামনের এক বাড়ীর দোর খুলে আর একটি বধূ এ-হাতে একটি ঘড়া ও-হাতে আর একটি নিয়ে বার হয়েই হঠাৎ আমায় সামনে দেখে ঘড়াসুদ্ধ ডান হাতটা তাড়াতাড়ি খানিকটা উঠিয়ে এবং মাথাটা খানিকটা নুইয়ে হাতের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘোমটা টেনে দিলেন। একটি বাড়ীর মধ্যে উঁচু মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—"আমি জানি নে খুড়িমা মাঝের ঘরেই তো ছিল, কে নিয়েছে আমি জানি নে!"—জন চার-পাঁচ ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে—তাদের মধ্যে একজন একটা কঞ্চি হাতে উঠানের একটা কুলগাছ থেকে কাঁচা সবুজ কুল পাড়ছে।—'ঐ যে রে তোর বাঁ হাতের ডালে—আর একটু উঁচুতে—এ যে, একটু একটু রাঙা হয়েছে, না? হ্যাঁ হ্যাঁ'—বলা বাহুল্য পৌষমাসের প্রথম, রাঙা হওয়া দূরের কথা, কুলের মধ্যে আঁটিও হয় নি। পথের বাঁক ফিরে একটা বেশ বড় বাড়ী—লোহার বড় বড় গজাল-মারা প্রকাণ্ড সিংদরজা, বালির কাজ খসে পড়ছে, পাঁচিলের মাথায় বনমূলোর গাছ গজিয়েছে। বাড়ীর সামনে পেরেকে ঝুলনো একটা রং-করা ডাকবাক্স, Next Clearence-এর নীচে Thursday-র প্লেট বসানো।

পাড়া পার হয়ে একটা বাঁশ-বাগান পড়ল। তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা। মচমচ করে শুকনো বাঁশপাতার রাশ ও বাঁশের খোলা জুতোর নীচে ভেঙে যেতে লাগল। পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় বুনো গাছপালার লতা-ঝোপের ঘন সমাবেশ, কি বিরাট প্রাচুর্য! জীবনের কি প্রবল উচ্ছ্বাস! সমস্ত ঝোপটার মাথা জুড়ে সাদা সাদা তুলোর মতো রাধালতার ফুল ফুটে রয়েছে। সমস্ত ঝোপটির কি সম্মিলিত সুগন্ধ, কি স্নিগ্ধ স্পর্শ! এইবার গ্রামের শেষে কাওরাপাড়া। ছোট্ট ছোট্ট চালাঘর, একটার উঠানে শুকনো পাতালতা জ্বেলে অনেক-

গ্নলো ছেলে-মেয়ে আগ্নন পোয়াচ্ছে। বাড়ীর পিছনে খেজ্নর গাছে ভাঁড় ঝ্নলনো। বাড়ীর মধ্যে সীম গাছ, লাউ গাছের মাচা। তিন-চারটে কুকুর জ্নতোর শব্দে ছ্নটে এসে নতুন লোক দেখে বেজায় ঘেউ-ঘেউ আওয়াজ শ্নর্ন করে দিলে। সর্ন পথ বেয়ে আবার গ্রামের পিছনের মাঠে এসে পড়ল্নম।

ম্নশকিল

পিসিমা সকালে উঠে আমায় বললে—যা পয়সা নিয়ে গিয়ে দেখে আর দিকি বনগাঁর খোঁয়াড়ে। যদি সেখানে গর্নটা গিয়ে থাকে,—দেখেই এস না কেন বাপ্ন—

মা বললেন—ওকে পাঠানো আর না পাঠানো দ্নই-ই সমান। ও কি করবে সেখানে গিয়ে? ও পারবে না। ওর ব্নদ্ধি-স্নদ্ধি নেই, কখনও ঘরের বার হয় নি।

এ কথায় আমি চটে গেলাম মনে মনে। বললাম—তুমি পাঠিয়েই দেখ না কেন, পারি কি পারি নে। আমি বনগাঁ গিয়ে আর গর্ন দেখে আসতে পারিনে? খ্নব পারি।

বনগাঁ আমি কখনও যাই নি। শ্ননেছি মস্ত বড় শহর-জায়গা। কত গাড়ীঘোড়া, লোকজন, রেলগাড়ী—আরও কত কি দেখার জিনিস সেখানে। আমাদের গ্রামের কিছ্নদ্নরে যে পাকা রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ধরে প্নবদিকে তিনক্রোশ রাস্তা নাকি যেতে হয়।

ওখানে বড় স্কুল আছে। আমাদের গাঁয়ের গিরীন ডাক্তারের ছেলে স্নরেন সেখানে স্কুলবোর্ডিঙে থেকে পড়ে। মাঝে মাঝে ফিরে এসে বনগাঁ শহরের কত আশ্চর্য গল্প করে শ্ননেছি। সেখানে যাবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মা কিছ্নতেই আমাকে সেখানে যেতে দেবে না। গেলে নাকি আমি গাড়ীঘোড়া চাপা পড়ব। গাড়ীঘোড়া কি লোকের দিকে তেড়ে ছ্নটে আসে? সাবধান হয়ে বেড়ালেও কি লোকে গাড়ীঘোড়া চাপা পড়ে?

অনেক ব্নঝিয়ে মাকে রাজী করাই। আট আনা পয়সা দিয়ে মা বললেন—এটা কাপড়ের খ্নঁটে আলাদা করে বেঁধে নে—তুই আবার যে রকম ছেলে, হারিয়ে ফেলবি কোথায়। আর তুই কিছ্ন কিনে খাস, এই নে চার পয়সা।

আমি বললাম—আরও দ্নটো পয়সা দাও।

—আবার কি হবে?

—দাও না। খেলনা কি নতুন জিনিস কিনে আনব!

—যা নিয়ে।

ভাদ্র মাস। চারিদিকে সব্নজ আমন ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে ঢেউ খেলছে। বন-ধ্নঁধ্নলের বড় হলদে ফ্নল ঝোপে ঝোপে ফ্নটে রয়েছে। শ্নকনো কাঠ ভেঙে পড়েছে পাকা রাস্তার উপর একটা চটকাগাছের তলায়। একটা বিলিতি শিরীষ গাছে মাকাল ফল পেকে ঝ্নলছে। পাটবোঝাই একখানা গর্নর গাড়ী আমার আগে আগে চলেছে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে করতে।

আমার মন খাঁচা-খোলা পাখীর মত হয়ে গিয়েছে। কোথায় যেন চলেছি কত দ্নরে!

রক্ত-কুঁচের কাঁটালতলায় হল্নদ ফ্নল ফ্নটেছে, তার কেমন গন্ধ! লতা বেয়ে কাঠবেড়ালি উঠেছে ঝোপের মাথায়। দাঁড়িয়ে দেখে দেখে যেমন একটা ঢিল মেরেছি, অমনি পালিয়ে গেল।

পাটবোঝাই গাড়ীটা এবার ধরে ফেলেছি। একটা ব্নড়ো ম্নসলমান গাড়ী চালাচ্ছে, একটি ছোট ছেলে পাটের বস্তার ওপর বাঁশ ধরে বসে আছে। ব্নড়োকে দেখতে আমাদের গাঁয়ে ময়জদ্দি কাকার মত।

আমি বললাম—কোথাকার গাড়ী?

ব্নড়ো গাড়োয়ান বললে—সনেকপ্নরির।

—কোথায় যাবে?

—বনগাঁয়ে কুন্ড্নদের আড়তে।

—আমায় নেবে?

—উঠতি যদি পার ওপরে, তবে চল।

—গাড়ী থামাও।

—থামাতি পারব না, পেছন দিয়ে ওঠ।

—হ্যাঁ পড়ে মরি আর কি! যাও তুমি চলে।

—ওঠ না খোকা, ভয় কি।

—না, তুমি যাও—তোমার আগে বনগাঁ পোঁছে যাব।

খানিকক্ষণ জোর পায়ে হাঁটবার পরে কোথায় পড়ে রইল গরুর গাড়ীটা! বার বার খুশির সঙ্গে পেছন ফিরে চেয়ে দেখতে লাগলাম। একজন বাগ্দী মস্ত বড় একটা মাছ নিয়ে চলেছে বনগাঁর দিকে। তাকেও গিয়ে জোর পায়ে ধরে ফেললাম। সে আমার দিকে ফিরে চাইলে। দু'একবার চাইবার পর বললে—বাবা, কোথায় যাবা?

—বনগাঁ।

—কেন?

—গরু পন্টে গিয়েছে, আনতে যাব।

—আপনাদের বাড়ী কনে?

—গোপালনগর।

—ওখানে তো পণ্ট আছে।

—সে পন্টে নেই, আজ দুদিন হারিয়েছে। মা বললে, বনগাঁর পণ্ট খুঁজে আসতে।

—আজকাল দুষ্টুমি করে দূরির পন্টে দেয়। তা চল মোর সঙ্গে।

খানিকদূর গিয়ে পথের ধারে একটা বনজঙ্গলের মধ্যে তালগাছ থেকে ধুপ করে একটা তাল পড়ল। আমি ছুটে আনতে যাচ্ছি, মাছওয়ালা বাগ্দী আমাকে বললে—কোথায় যাচ্ছেন বাবা? যাবেন না। জঙ্গলের মধ্যে সাপখোপ আছে। এখন বিকেলে রোদ নেই, দেখতে পাবেন না। আর তাল নিয়ে বইবেন কেমন করে?

সে কথা ঠিক। বইব কি করে অত বড় তালটা সে কথা ভেবে দেখি নি। তাল পড়বার শব্দ হলেই দৌড়নো চাই। তখন আরও মনে পড়ল আমাদের পুকুরধারেই জ্যাঠামশায়দের তালগাছ থেকে আজই সকালে দুটো বড় বড় তাল কুড়িয়ে এনেছি। গিয়ে আরও কত কুড়বো। কি হবে এখান থেকে তাল বয়ে নিয়ে গিয়ে। রাস্তার দু ধারে খালি বনজঙ্গল। এক জায়গায় বুনো করমচা পেকে আছে দেখে তুলতে যাচ্ছি, আমার সঙ্গী বারণ করলে—যেও না যেও না। ও তুলো না—

—কেন?

—কেন আবার! বাড়ী থেকে সদ্য বেরিয়েছ ছেলেমানুষ। ও ফল খেলি হাড়ের জ্বর এখুনি টেনে বের করে এনে ফ্যালবে।

—আমাদের বাড়ীতে তো কত খায়।

—খায় রেঁধে। কাঁচা কেউ খায় বলতি পার?

ওর ওপর আমার বড় রাগ হল। ও কি আমার অভিভাবক, যা করতে যাচ্ছি তাতেই বাধা দিচ্ছে? তাল কুড়ুতে দেবে না, করমচা খেতে দেবে না, ভাল রে ভাল! তুমি তোমার পথে যাও, আমি আমার পথে যাই। আমি ওকে বললাম—বনগাঁ কতদূর হবে?

—এইবার চাঁপাবেড়ে ছাড়ালি তবে বনগাঁ।

—তোমার বাড়ী কোথায়?

—সাতবেড়ে।

দূর থেকে একটা সাদা কোঠাবাড়ী চোখে পড়ছে। ওই হল বনগাঁ শহর। আমার মন আনন্দে ঔৎসুক্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। না জানি কত কি জিনিস এখুনি চোখে পড়বে! কত বড় শহর বনগাঁ! কি বড় বড় বাড়ী!

শহরে ঢুকে দু পাশে দেখতে দেখতে চললাম। মাছওয়ালা বাগ্দী তখনও আমার সঙ্গ ছাড়ে নি; সে বললে চলুন আপনি ছেলেমানুষ, আমি পণ্টঘর আপনাকে দেখিয়ে দিই।—আমি যদি তখন তার সদুপদেশ শুনতাম! যাক গে। আমি তখন ওর ওপর ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠেছি। আমি এসেছি বেড়াতে, বাবার আর মার শাসন থেকে দূরে। আমি এখানে

যা খুশি তাই করব। তুমি কে হে বাপু সব সময়ে আমার পেছনে লেগে আছ? আমার গরু আমি নিই না নিই সে আমার খুশি। পণ্টে গিয়ে গরু পেলেই আমায় এখুনি গরু নিয়ে বাড়ী ফিরতে হবে, আমি একটু বেড়িয়ে দেখতে পারব না। আমি এসেছি শহর বেড়িয়ে দেখতে।

বাগ্‌দী সত্যিই আমায় ছেড়ে এবার অন্য দিকে চলে গেল। আমি আজ বাড়ী ফিরব না। তুমি যাও।

আমি আরও এগিয়ে গিয়ে বাজারে পড়লাম। কি লোকজনের ভিড়! ঝুমঝুমি বাজিয়ে এক জায়গায় কি বিক্রি হচ্ছে। চানাচুর! সে আবার কি জিনিস? একটা লোক ঝুমঝুমি বাজিয়ে বলছে—চা-না-চু-র, মজার চানাচুর গরম! যে খাবে ও পস্তাবে, যে না খাবে ও ভি পস্তাবে—মজার চানাচুর গরম!

কি ও জিনিসটা? খেয়ে দেখব?

—আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম—কত দাম? কি জিনিস?

—চানাচুর গরম!

—এক পয়সার দেবে?

—কাহে নেহি দেবে বাবা? এই লাও।

লোকটা একটা শালপাতার ছোট ঠোঙা আমার হাতে দিলে। আমি ঠোঙা খুলে ভেতরের জিনিস দেখতে গেলাম তাড়াতাড়ি। ওমা! ছোলা ভাজা আর কি কি ভাজা! কেমন চমৎকার মসলা। একগাল খেয়ে দেখলাম—ও মা, কি চমৎকার। আর এক পয়সার চানাচুর নিলাম, বাড়ী নিয়ে যাব ছোট ভাইটার জন্যে।

এক জায়গায় একটা মুচি জুতো সেলাই করছিল। তার সামনে একটা লোহার তিনপায়া জিনিস। তার ওপর রেখে জুতোয় ঠুকছিল পেরেক। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম। সেখানে কি সব বড় বড় দোকান। কত রকম জিনিস সাজানো। একটা দোকানে নানারকম ফল বিক্রি হচ্ছে, সেই দিকে গিয়ে দেখি, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না আমাদের গাঁয়ে—কি বিক্রি হচ্ছে বল তো? আম! কেউ কখনও শুনেছে ভাদ্র মাসে আমের কথা! আষাঢ়ের প্রথমে দু-একটা গাছে আম থাকতে দেখা যায় আমাদের ওদিকে। আম এখনও বিক্রি হয়, পাকা আম? আমি সেই ফলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমগুলো কতক্ষণ ধরে দেখলাম। কত শিল-নোড়া একটা দোকানে। এত শিল-নোড়া কেনে কে? কত রকম টোপর বিক্রি হচ্ছে একটা দোকানে। টোপর তো মালীরা করে দেয় দেখেছি, দোকানে বিক্রি হয় জানতাম না। পেছন দিকে একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখি—এর নাম কী গাড়ী? বা রে। মানুষে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ তার ভেতরে লোক বসে! একজনকে বললাম—ওটা কী গাড়ী?

—রিক্‌শা গাড়ী বলে ওকে খোকা।

—রিক্‌শা গাড়ী?

—হ্যাঁ! দেখ নি কখনও? তোমার বাড়ী কোথায়?

—গোপালনগর। পাড়াগাঁ।

—তাই দেখ নি। এ গাড়ী এখানেই নতুন এসেছে। একখানা মাত্র দেখছি।

আরও এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা ফাঁকা জায়গায় ভিড় করে গোল হয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। কি ব্যাপার?

দেখি একটা লোক ফড় খেলছে। চার পয়সা দিলে চার আনা ফেরত দিচ্ছে জিতলে। আমি ফড়খেলা আমাদের গাঁয়ে মেলার সময় দেখেছি। বাবা খেলতে দেয় না। নইলে আমার খেলার খুব ইচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছি, আরও অনেক লোক দেখছে। খেলছেও অনেক লোক। এই উপযুক্ত সুযোগ, আর আসবে না। মায়ের দেওয়া আট আনাটা কিছু না ভেবেই একটা ঘরে দিলাম।

খেলার মালিক বললে—কার আধুলি?

—আমার।

—আধুলি উঠিয়ে নাও।

—কেন? আমি খেলেছি যে!

—না, তুমি আধুলি নিয়ে চলে যাও।

—না, আমি খেললাম যে! বা রে!

—হেরে গেলে আমার কোন দোষ নেই কিন্তু খোকা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, আমি এবার ঠিক ধরেছি। জিতব বলে ও শুধু ঐ রকম করছে। চালাকি পেয়েছে! আমি বললাম—না, তোমার কোন দোষ কেন থাকবে।

লোকটা অমনি ফড়ের বাটি তুলে বললে—এই চলে এস—ছক্কা। তোল দান।

বাস্! আমার আধুলি তিরির ঘরে। চক্ষের নিমেষে সে আধুলিটা আত্মসাৎ করলে। বললে—গেল খোকা? তোমায় বললাম ভাল কথা, তোমার আধুলি তুলে নাও—শুনলে না।

আমার চোখে যেন সরষের ফুল দেখলাম।

হাতে আর একটা পয়সাও নেই আমার। পণ্টের গরু কি দিয়ে খালাস করে নিয়ে যাব? সর্বনাশ! সেই মাছওয়ালা বাগ্দী লোকটা সৎপরামর্শই দিয়েছিল, তখন কেন শুনলাম না। বাবা অবিশ্যি বাড়ী থাকেন না, মা শুনলে কি বলবে? আ-ট-আ-না পয়সা গেল! এক আধটা কি। আহা, সেই অপূর্ব বস্তু চানাচুরও যদি কিনতাম ঐ আট আনা দিয়ে, এতগুলো দিত। বাড়ীর সবাই খেয়ে খুশী হত। এভাবে একেবারে মূলে-হাভাত হত না আধুলিটা।

না, আর কোথাও দাঁড়ালাম না।

মন বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শহর অতি খারাপ জায়গা। পেট চুঁই-চুঁই করছে ক্ষিদেতে। চার পয়সা আছে সঙ্গে, ওই পয়সায় পান কিনে নিয়ে যেতে হবে মার জন্যে। মা পান পেলে খুশী হয়। হয়তো আধুলি খোয়ানোর রাগটা একটুখানি কমতে পারে। পান্ কোন্ দিকে বিক্রি হয়? পান নিয়ে যাই চার পয়সার। বেলা পড়ে আসছে। তিন ক্রোশ রাস্তা এখন যেতে হবে।

গল্প নয়

সেদিন হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে ঢুকে দেখি কামরাতে আদৌ ভিড় নেই।

সকালের ট্রেনে কামরা অনেকটা খালি পাওয়া যায় বটে। নিজের ইচ্ছামত বিছানা পেতে নিয়ে বসেছি, এমন সময় একটি বৃদ্ধ মুসলমান একটি শিশুকে কোলে নিয়ে ঢুকল এবং আমার বিছানার অদূরে বসল।

খবরের কাগজ পড়বার ফাঁকে খবরের কাগজের ওপর দিয়ে ওদের চেয়ে দেখলাম। এমন একটি দৃশ্য আমার চোখে কখনও পড়েছে কিনা সন্দেহ। বৃদ্ধ মুসলমান পরম যত্নে শিশুটিকে কোলের মধ্যে আঁকড়ে রেখেছে। কিন্তু শিশুটির চেহারা দেখে মনে হল, বেশিদিন পৃথিবীর আলো-বাতাস ওকে ভোগ করতে হবে না। শুধু কখানি হাড়ের ওপর চামড়া দিয়ে ঢাকা, মাংস আদৌ নেই বললেই হয়, সেইজন্যে হাঁটুর ও পায়ের নীচের চামড়া কুঁচকে জড়ো হয়ে এসেছে। মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, মাথার চারিদিকে বড় বড় সাত-আটটা ঘা। ওষুধের তুলো লেপটানো রয়েছে।

এ ক্ষেত্রে আমরা যেমন করে থাকি, তাই করলাম।

কড়া সুরে বললাম—সরে বস না বাপু, একেবারে ঘাড়ের ওপর কেন! গাড়ীতে যথেষ্ট জায়গা তো পড়ে রয়েছে। বৃদ্ধ মুসলমানটি আমাকে বলতে পারত অনায়াসেই—কেন মশাই, আপনার বিছানাতে আমি বসি নি তো। তফাতেই বসে আছি, তবে সরে বসতে বলছেন কেন? টিকিট করে আপনিও যাচ্ছেন, আমিও যাচ্ছি। আপনি সরে বসতে বলবার কে?

কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেমন সাধারণত হয়ে থাকে—লোকটি সরে বসল। আমি আবার আমার খবরের কাগজে মন দিলাম।

একবার গাড়ীতে ফেরিওয়ালা উঠে বিস্কুট ফেরি করতে লাগল। মুসলমানটি শিশুকে দুখানা বিস্কুট কিনে দিলে। আর একবার তাকে চানাচুর কিনে দিলে। আমার মনে হল, আমার নিজের ছেলে হলে তাকে এই রুগ্ন অবস্থায় আমি কি বিস্কুট-চানাচুর খাওয়াতাম?

কিন্তু মুখে কোন কথা ওকে বলি নি।

যা খুশি করুক, আমার বলবার দরকার কি?

এক একবার চেয়ে দেখি আমার বিছানার কাছে এসে বসল কিনা। কি কুশ্রী কদাকার হয়েছে দেখতে ছোট ছেলেটা!

ইতিমধ্যেই অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে। গাড়ীতেও লোকজনের যথেষ্ট ভিড় হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ আমার কানে গেল একটি ছোট মেয়ের স্নেহময় স্বরে কে যেন বলছে—এ বিস্কুট-গুলো তেমনি মিষ্টি নয় বলে খোকা খাচ্ছিল না—এখন দেখ কেমন খাচ্ছে। না মা, দেখ, কেমন হাত দিয়ে মুখে তুলে কুটুর কুটুর কাটছে—

এমন ধরনের কথা এবং এমন ধরনের সুর আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত বলেই প্রথম ওই কথাটা আমার অন্যমনস্ক মনকে আকৃষ্ট করে।

আমাদের ছোট্ট খোকাটি যখন তার মামার বাড়ী যায় তখন তার ছোট মাসি ও মামাতো বোনেরা এমনি স্নেহমাখা আগ্রহ নিয়ে খোকার প্রত্যেকটি তুচ্ছ কাজ এবং অকাজ লক্ষ্য করে এবং ঐ রকম সুরে সহর্ষ মন্তব্য করে।

সোজা হয়ে উঠে বসে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। ইতিমধ্যে কখন দুটি স্ত্রীলোক এসে গাড়ীতে ঢুকেছিল আমি লক্ষ্য করি নি। একটি তরুণী বধূ, মলিন শাড়ী পরনে, রুক্ষ চুল, মুখশ্রী সুন্দর, চোখ দুটিতে পল্লী-প্রান্তের শান্ত অবসর। বধূটির পাশে আধা-বয়সী একটি থানপরা স্ত্রীলোক, কিন্তু এর রং কিছু ফর্সা, তরুণীটির রং কালো।

দুজনেই থলে নিয়ে চলেছে এই ট্রেনে চাল আনতে। এরা সম্ভবত উঠেছে বাগনান স্টেশনে, যাবে বোধ হয় ঝাড়গ্রামে। প্রত্যেক স্টেশনেই দেখেছি চাল আনবার জন্যে পল্লীর গরিব মেয়েরা ভিড় করে উঠছে। কোথা থেকে এরা চাল আনে তা ঠিক বলতে পারব না।

এর দুটিও সেই দলের লোক। এদের সঙ্গের আট ন বছরের খাটো কাপড় পরা খুকীটি বোধ হয় আধা-বয়সী স্ত্রীলোকটির মেয়ে।

তরুণী বধূটি জিজ্ঞেস করছে বৃদ্ধ মুসলমানটিকে—সেখানে তারা বুঝি রাখলে না?

এদের আগের কথাবার্তা আমি শুনি নি। কারা রাখলে না, কোথায় রাখলে না, এ সব কথা নিশ্চয় আগে হয়ে গিয়ে থাকবে।

বৃদ্ধ বললে—না গো। তাইতে তো একে নিয়ে যাচ্ছি।

—মা কতদিন মারা গিয়েছে বললে?

—এ তখন সাত মাসের।

শুনেই মেয়ে দুটি পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে। তরুণীটি বললে—আহা!

অন্য মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে—এখন একে কোথায় নিয়ে যাবে?

—বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি।

—একে সেখানে দেখবার লোক আছে?

—না গো, কেউ না, আমাদেরই দেখতে হবে।

—ডাক্তার দেখানো হয় নি?

—কিছু না। পরে কি করে গো?

—বয়েস কত হল?

—এই এগারো মাস।

—আহা শরীরে শুধু হাড় আর চামড়া সার হয়েছে।

—তা নসিবের দোষ। কি করব। এখন খোদা যদি বাঁচান, তবেই বাঁচবে।

—কি খেতে দিচ্ছ?

—কি দেব, যা জোটে। আমি একা মানুষ বলেই তো কলকেতায় ওদের ওখানে রেখেছিলাম। এমন হাল করবে তা কি করে জানব। করে এখন খবর দিয়েছে নিয়ে

যাও।

—ঠাণ্ডা মোটে লাগিও নি, বিষ্টি হচ্ছে, জানালাটা বন্ধ করে দাও। আহা, এমনিতেই তো ওর কাসি হয়েছে!

আরও কত কি প্রশ্ন মেয়ে দুটি করতে লাগল, আমার সব মনে রাখবার কথা নয়। আমার এটি গল্প নয়; সুতরাং বানানো কিছু এর মধ্যে স্থান পাবে না। এইটুকু আমার মনে আছে, ওরা দুজনে যতগুলি প্রশ্ন করলে, সবগুলি ঐ ছোট্ট রুগ্ণ খোকার রোগ সম্বন্ধে, পথ্য সম্বন্ধে, ওর চিকিৎসা সম্বন্ধে, ওর ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে। একবার তরুণী বধূটি করে আর একবার অন্য মেয়েটি করে। এ একবার ও আর বার। যা কিছু প্রশ্ন, সব ওই খোকাকে ঘিরে। আর ওদের চোখে—বিশেষ করে সেই তরুণী বধূটির চোখে—অদ্ভুত স্নেহঝরা দৃষ্টি।

একবার খোকা হাঁচল।

তরুণী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—জীব!

আমার অন্যমনস্কতা চলে গিয়েছে ততক্ষণ। আমি বিস্মিত হয়ে উঠেছি। এমন একটা ঘটনা যেন দেখছি যা শুধু এই বিংশ শতাব্দীর নয়, সর্বকালের, সর্বযুগের। মানুষের প্রতি মানুষের হিংসায়, শঠতায়, নিষ্ঠুরতায়, স্বার্থপরতায়, ঈর্ষায় যে বিংশ শতাব্দীর নভোমণ্ডল আজ ধূম্রমলিন—যে বিংশ শতাব্দীতে আছে শুধু অর্থের আদর—সেখানে এই ময়লা-শাড়ী-পরনে দরিদ্র পল্লীবধূটি ও তার করুণাময়ী সঙ্গিনী এক নতুন বার্তা শুনিয়ে দিলে। সে বার্তা নতুন হলেও হিমালয়ের মতই পুরনো।

এই গাড়ীর মধ্যে এত পুরুষমানুষ ছিল, কেউ ফিরেও চেয়ে দেখেনি ছেলেটার দিকে। সনাতনী মাতৃরূপা নারী দুটি এসে এই মাতৃহীন মৃত্যুপথযাত্রী শিশুকে মাতৃস্নেহের বহু-পুরাতন অথচ চির-নূতন বাণী শুনিয়ে দিলেঃ সেদিন সে ট্রেনের মধ্যে গুটি-কয়েক ক্ষণের জন্য বিংশ শতাব্দী ছিল না—সমাজদ্রোহী, 'কালোবাজার-পুষ্ট' লোভী বিংশ শতাব্দী। ছিল সেই অমর মাতৃলোক, বিশ্বের সমগ্র জীবজগৎ যার করুণাধারায় বিধৌত।

পাঁশকুড়া স্টেশনে বধূটি ও তার সঙ্গিনী ট্রেন থেকে নেমে গেল।

শিকারী

জংলী দেহাতি বালক মাগনিরাম। রামজীর কাছে মেগে ওকে নাকি কোলে পাওয়া গিয়েছিল। এরা ভগবানের কাছে ও মানুষের কাছে বিনয় প্রকাশ করতে অভ্যস্ত, তাই বৈশ্য-বণিকদের মত কুরুচি প্রদর্শন করে না ছেলের 'লাখপতিয়া' 'দৌলতরাম' প্রভৃতি নাম রেখে।

ঝাঁপাড়িশোল গ্রামে ওর বাড়ী।

মোটরের রাস্তা থেকে বাঁ-দিকে বেরুনো সরু রাস্তা। এই রাস্তার কিছু দূরে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের শিমুল গাছের আবাদ। প্রায় তিন চার একর জমিতে শুধু দেড়শো দুশো শিমুল গাছ। ফাল্গুন চৈত্রে ফুল ফুটলে কি অদ্ভুত দেখায় রাস্তা থেকে. নিষ্পত্র বড় বড় গাছগুলিতে আগুন-রাঙা পাপড়ি জ্বলচে শিমুল ফুলের।

শিমুল গাছের আবাদ পার হয়ে একটি নদী, নাম বরজোর নালা, বড় বড় শিলাখণ্ডের পাষাণ বাঁধানো তটভূমির ওপর ছায়ানিবিড় বনপাদশ্রেণী. তাদের তলা দিয়ে বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে দ্বিগুণ হয়ে বরজোর নালা ছুটে চলেচে অদূরবর্তী শঙ্খনদীর দিকে। শঙ্খনদী আবার মহাডাল পাহাড়শ্রেণীর তলায় গিয়ে মিশেচে মহানদীর সঙ্গে। সেটা কোথায় গিয়েচে. ঝাঁপাড়িশোল গাঁয়ের লোক অত খবর রাখে না। বরজোর নালা পার হয়ে চুকুরদি-তুকুরদি রিজার্ভ ফরেস্ট। চুকুরদি একটি খৃষ্টান গ্রামের নাম, গ্রামের মধ্যেই ওদের পুরু কর্কশ সাবাই ঘাসে ছাওয়া ধাওড়া চালাঘরের গীর্জা। দেওয়ালের শালকাটির ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলে দেখা যাবে একখানা মাত্র টিনের ভাঙা চেয়ার গীর্জাঘরের একমাত্র

আসবাব। বগোদর থেকে মাসে একবার পাদ্রি সাহেব এসে এদের নিয়ে উপাসনা করেন ও শাস্ত্রকথা বলেন, তাঁর জন্যেই এই চেয়ারখানা যোগাড় করা আছে।

চুকুরদি গ্রাম পেরিয়ে মহাডাল পাহাড়ের তিনশো ফুট একটি শাখা পার হয়ে, একটি বৃদ্ধ মাদার গাছ পার হয়ে বনবেষ্টিত বনকাটি গ্রাম। মাত্র ছাব্বিশ ঘর লোকের বাস, কোল ও মুণ্ডা জাতীয় লোক, এরা খৃষ্টান নয়।

গ্রামের বাইরে এদের বড় বড় শালগাছের মধ্যে বোঙ্গাপুজোর স্থান।

মারাং বোঙ্গা অর্থাৎ সূর্যদেবের উদ্দেশে এখানে মুরগী বলি দেওয়া হয়, গাঁয়ের সবাই বছরে একদিন রেঁধে খায়। হাঁড়িকুঁড়ি ফেলে যায় বোঙ্গাতলার একপাশে। বছর বছর জমচে পুরোনো হাঁড়ির পাহাড়।

বনকাটি গ্রামের পরে মাঙ্গনবেড়া, মাঙ্গনবেড়ার পরে ঝাঁপড়িশোল।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, ঝাঁপড়িশোল গ্রাম যে রিজার্ভ ফরেস্টের ছায়াময় নিবিড়তার কোথায় কতদূর লুকোনো, সেটা বোঝা যাবে।

এই গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চাইলে দেখা যাবে, চক্রাকারে নীল শৈলমালা, মহাডাল, কাট্‌চুরি, নানকাঁসবাহাল, সয়ছুরি ও চুকুরদি পাহাড় (যেটার উচ্চতা আগেই বলা হয়েচে) এ ক্ষুদ্র গ্রামকে ঘিরে রেখেচে। জারুল ফুল ফোটে বর্ষাকালে, করমগাছের হল্‌দে ফুল ঝরে পড়ে থাকে বনতল বিছিয়ে, ধনেশ পাখী ডাকে, কেকারব করে বনশীর্ষে ময়ূরের দল।

মার্গানিরাম ষোল বছরের ছেলে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে রোগা শরীর। এই সব জংলী গ্রামে বর্ষাকালে ম্যালেরিয়া একবার যাকে ধরে, তাকে একেবারে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলে! এ গ্রামের অধিকাংশ লোকের কিন্তু সুন্দর সুগঠিত দেহ, পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত। মেয়েরা পুরুষদের চেয়েও সুঠাম, সাবলীল—অধিকাংশ মেয়ের মুখই যেমন সরল, তেমনি সুন্দর।

মার্গানিরাম আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে থাকে সর্বদা। নিজের অসুখের জন্যেই বোধ হয়।

বন্ধু নন্‌কুয়া এসে বললে—চল্‌ মাছটা ধরে আনি—

মার্গানিরাম রাগের সঙ্গে বললে—নাই যাবো—

—কেনে?

—উদাস লাগচে মাথাটা।

—দুখাচ্চে?

—না হে, উদাস লাগচে। উ কথায় তোর কি কাম? নাই যাবো, ভাগি যা!

—কেনে ভাগবে? ইঃ!

—দিখাবো তোকে? দিখ্‌বি?

—কাঁড় ধরবার হাত্তি নি, দিখাবি কুথা থিকে? উ অত সোঝা?

—ভাগি যা!

—নাই যাবো।

মার্গানিরাম রাগের সঙ্গে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলে। নন্‌কুয়া হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল।

পালিয়ে ঠিক নয়, চলে গেল বলাই সঙ্গত। ম্যালেরিয়া-জীর্ণ মার্গানিরামকে কে বা ভয় করবে ওদের মধ্যে!

মার্গানিরাম সেই দুঃখেই উদাস মনে থাকে আজকাল।

বরজোর নালা ঘুরে ঝাঁপড়িশোলের নিকট দিয়েই গিয়েচে, সিকি মাইল দূরে একটা বন পার হলেই। এই নালার ধারে বনের ওপারে গ্রামের লোকেরা বর্ষাকালে কান্দা আলু তুলতে যায়। কান্দা আলুর বড় লতা শাল আসান অর্জুন গাছের গা বেয়ে অনেক উপরে উঠে যায়, সেই অত উঁচুতে যেখানে বনের ময়ূর নৃত্য করে বর্ষার মেঘ পাহাড়ের শিখরে জমলে—সেখানে ফুটে থাকে কান্দা-আলুলতার নীল ফুল।

মার্গানিরাম সে ফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু অত উঁচুতে উঠে ফুল সংগ্রহ করতে

পারে না বলে গ্রামের মেয়েরা তাকে ক্ষেপায়, দোষ ধরে, মানুষ ব'লে ভাবে না।

তারা বলে—কমজুরী লোকটা হে, উ উসব কামের লয়—

ও উত্তর দেয়—গায়ের জুর লা আছে তো কি করচে। তুদের মনটা নেই যে হে—

বুধ্নি হেসে বলে—মনে কি করবে?

—উ তোদের বুঝাতে লারবো। জাহিল লোকদের বুঝাবো কি হে?

উঃ, ভারি জাহিল জাহিল করতে এসেছে, বড় পন্ডিতটা আছে তাই দিখাতে এসেছে—ভাগি যাঃ!

—তুই ভাগি যা।

ওরা রাগ করে বলে—তুর ঘরে চাউল সিঝাই না মকাই মাগ্নি করি যে ভাগি যাবো?

এবার মাগনিরাম হাসে। মেয়েদের রাগ দেখে ওর হাসি পায়। বলে—যা যা হুজুমে চালাকানা—ঠ্যাঙাকানা দো—

এ কথার মানে, না গেলে লাঠি মারবো। মেয়েরা রেগে গালাগালি করে আরো। ও হাততালি দিয়ে হাসে। বলে—বিজলি চম্কাও কানা দো—

অর্থাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে। ও চমৎকার গান বাঁধে সেদিনটা বিদ্যুৎ চমকানো নিয়ে। নিজেই গায়। এবার মেয়েরা মন দিয়ে শোনে। ওর ওপর তাদের রাগ ও বিতৃষ্ণা অনেকখানি চলে যায়। বোংগা পরবের সময় ও নিজের বাঁধা ছড়া ও গান নিজের বন্ধু নন্কুয়া ও ছোট বোন রতুকে শেখায়।

আসলে মাগনিরাম হল কবি।

কবির বংশও বটে, ওর বাবা জাতে সাঁওতাল, কিন্তু রাঁচি শহরে কিছুদিন ছিল। সেই জন্যেই ওর ছেলের নাম মাগনিরাম নতুবা সাঁওতালের ছেলের নাম মাগনিরাম হত না। রামভক্তি সে বিদেশ থেকে এই নিবিড় বনপ্রদেশে আমদানি করেছিল।

ওর বাবা এদেশে একজন বিখ্যাত লোক। রাঁচি শহরে সে মোটর গাড়ী দেখেচে, টেলিফুঁক দেখেচে, বিজলি বাতি, বিজলি পাখা, কলের গান—কত কি দেখেচে। আজ বছর সতেরো আগেকার কথা। সতেরো বছর ধরে সেই গল্প ভাঙিয়ে খাচ্চে বাড়ী বসে। গ্রামের লোকদের সে অবজ্ঞার চোখে দ্যাখে, বলে—সে দুনিয়াটার কি দেখলি রে? কুথা না গেলি, শরীরটার সক্কত হবে কুথা থেকে হে? মনের সক্কত হবে তবে তো শরীরটাতে লাগবে।

ওর কাছে সবাই আশ্চর্য গল্প শুনতে আসে। কত রকম পরামর্শ করতে আসে। ছেলেটিও বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে। দুনিয়া সংসারের কোনো কাজে লাগে না। বসে বসে কবিতা বানায় আর গান বাঁধে। এদিক থেকে সে বাপের চেয়ে এক কাটি সরেস হয়েচে, বলাবলি করে গ্রামের লোকেরা। অবিশ্যি নিন্দা হিসাবেই বলে, প্রশংসা করে নয়।

মাগনিরামের মন ওড়ে কান্দালতার নীল ফুল যেখানে ফুটেচে, সেই বনের মাথার ওপরে। বাবাকে সে বড় মানে; বাবা একজন কত বড় লোক। কত দেশ ঘুরেচে। এখানকার জাহিল লোকেরা কি করে বুঝবে তার বাবা কত বড়?

সে যদি জ্বরে না ভুগতো তবে অনেকদূর চলে যেতো এতদিন—একবার সে গরমিণ্টোর শিমুল গাছের আবাদ দেখতে গিয়েছিল, সেখানে তার কয়েকদিন আগে গরমিণ্টো এসেছিল আবাদ তদারক করতে। গরমিণ্টো মিঠাই ফেলে গিয়েছিল, বিলাইতি মিঠাই, লাল নীল রং, কাগজে মোড়া। সে কুড়িয়ে প্রথমে ভাবলে, কি এগুলা?

আবাদের চৌকিদার দেখে বললে—ও বিলাইতি মিঠাই। খেয়ে লাও—

সে মুখে দিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। অমন সে জীবনে কখনো খায়নি। গরমিণ্টোর মিঠাই ভারি চমৎকার লাগে খেতে।

এ সব ফেলে সে চলে যেতো যে দেশে ঐরকম আশ্চর্য জিনিস আছে, কিন্তু বাবার জন্য মন কেমন করলে দূরে কি করে যাওয়া হয়? তা ছাড়া, শরীরে অসুখ তো লেগেই আছে, যে জন্যে সে গাছের ওপরে উঠতে পারে না, কাঁড় ধরতে পারে না, পাহাড় ডিঙিয়ে বড় ঝোপের বনে যেতে পারে না। কিন্তু বাবার মত সে নামকরা লোক হতে চায়, বাবার মনে সুখ দিতে চায়।

বর্ষার বাজরাক্ষেতে যেমন প্রতি বছর পাহাড় থেকে বন্যহস্তিযূথ নামে, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে, এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না।

ঘাটোয়ালী কাছারি থেকে ঢেঁটরা দিয়ে গেল, এবার মস্ত বড় পাগলা হাতী নেমে বন্য গ্রামগুলির অত্যন্ত ক্ষতি করচে। যে হাতী মারতে পারবে, তাকে একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

গ্রামের মধ্যে জোয়ান শিকারীর দল চঞ্চল হয়ে উঠলো, কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে পরামর্শ করে না, পাছে তার মতলব অপরে আত্মসাৎ করে।

ঢেমন সাঁওতাল বনকাটি গ্রাম থেকে এসে একদিন সবাইকে ডেকে বললে—এ বছরের হাতীটি তুরা মারতে লারবি।

সবাই বললে—কেনে হে?

—উ মাদী হাতী আছে। মারতে লারবি।

একজন যুবক শিকারী বললে—কাঁড় টেনে হাতী মারা নেই যাবে? তুমি শিখাতে এসেচ? মাদী হাতীটা কি হাতী লয়?

—ই সে হাতী লয়। দেখে লিবি আমার কথা। এ বছর দু'তিন আদমি মরবেই সব বস্তির। ঘাটোয়ালী কাছারির লোক টাকা দেবে সিধা বাত শুনে? তা দিবে না। দেখে লিবি।

ঢেমন বড় শিকারী এ অঞ্চলের। একা বাঘ মেরেচে কাঁড় দিয়ে। বিষাক্ত ফলা চালিয়ে হাতী মেরেচে। তার কথা অগ্রাহ্য করবে এমন লোক এ দিকের কোন গ্রামে নেই।

মাগানিরাম সেখানে উপস্থিত ছিল। সে ঢেমন সাঁওতালের সুগঠিত চেহারার দিকে চেয়ে দেখলে প্রশংসার দৃষ্টিতে। মরদ বটে একজন! আজ তার যদি জ্বর না হত, সেও অমনি হতে পারতো। তার বাবা বুড়ো হয়েচে। বাবার হাত থেকে কাজ নিতে হবে এবার তাকে। বাবাকে সুখে রাখতে হবে।

মাগানিরাম কবির দৃষ্টিতে জগৎটাকে দেখে। বাবাকে সাহায্য করতে হবে, সুখী করতে হবে, এটা হল কল্পনা-প্রবণ হৃদয়ের কথা। কিন্তু বাইরের দুনিয়াটা শুধু কল্পনাতে চলে না। কল্পনাকে কার্যে পরিণত করবার কৌশলও শেখা দরকার। মাগানিরাম সেখানে নিজেকে অসহায় বোধ করে।

কতদিন একলা বসে বসে কি ভাবে সেই জানে।

বাবা কত বড় হয়ে যাবে একশো টাকা পেলে। কাড়া কিনবে। কাড়ার দুধ খাবে গরমিণ্টের মিঠাই আনিয়ে খাবে দুজনে। তার মা কবে মারা গিয়েচে ছেলেবেলায়, তার মনেও পড়ে না। বাবা তাকে মায়ের মত করে মানুষ করেছিল। এখন সে যদি বাবাকে না দেখে, কে দেখবে?

সেদিন সে শুনলে নিমপুরা আর বরজোর নালার ধারে রোজ রাত্রে পাগলা হাতীটা নামচে। মাগানিরাম কাউকে কিছু না বলে বিকেলের দিকে একাই চলে গেল বরজোর নালার ধারে।

বর্ষায় বরজোর নালার কূল ছাপিয়ে জল উঠেচে এপারে বাজরা ক্ষেতে। ওপারে পাহাড় সুতরাং জল সেদিকে না বেড়ে এই কূলকেই ভাসিয়েচে। বাজরা ক্ষেতে হাতীর পায়ের দাগ সর্বত্র, ক্ষেত তচনচ করেচে হাতী।

সুমুখ জ্যোৎস্না রাত। মাগানিরাম ঢেমন সাঁওতালকে অনেক খোশামোদ করে দুটি বিষমাখা শলা সংগ্রহ করেচে। বাঁশের চোঙায় ফুঁ দিয়ে সেই বিষমাখানো শলা কি ভাবে ছুঁড়তে হয় সেটা সে দু-একবার দেখে নিয়েচে বটে, কিন্তু নিপুণ হাতে চালায় যারা, তারাই শলা চালাতে ইতস্তত করে, আনাড়ি মাগানিরামের কথা তো অনেক দূরের।

মাগানিরাম বরজোর নালার ধারের একটা কুলগাছে উঠে বসে রইল সন্ধ্যার আগে থেকেই। আপন মনে গুন্ গুন্ করে গান করতে লাগলো। যদি আজ হাতীটা নামে।

অনেক রাত্রে সত্যি নামলো পাগলা মাদী হাতীটা। হাতী নয়, সাক্ষাৎ শমন। আজই সন্দেবেলা এই খানিক আগে নিমপুরার একটি বুড়ো ক্ষেতপাহারাদারকে খুন করে এসেচে,

তার শুঁড়ে তখনো টাটকা রক্তের দাগ।

মাগানিরাম উত্তেজিত হয়ে উঠলো। একশো টাকা রোজগার করে বাবাকে আনন্দ দেবার চরম মুহূর্ত সমাগত। দেরি করলে চলবে না।

ঠিক যখন হাতীটা বরজোর নালার ধারে কুলগাছের পাশে এসেচে, মাগানিরাম বাঁশের চোঙে ফুঁ দিয়ে শলা ছুঁড়লো।

এর পরের ঘটনা টের পাওয়া গেল সকালবেলা।

বাজরা ক্ষেতের মধ্যে তিন জায়গায় মাগানিরামের দেহের তিনটি রক্তাক্ত থেঁৎলানো টুকরো। কিন্তু মাগানিরামের বাবাকে একশো টাকা দিয়েছিল ঘাটোয়ালী কাছারি থেকে।

কেন, তা বলি।

বরজোর নালার ওপারে সরকুন্দ জঙ্গলের কিনারায় প্রকাণ্ড পাগলা হাতীটা মরে পড়ে আছে—আবিষ্কার হল তিনদিন পরে। হাতীটির নাকের দুপাশে তখনো দুটো শলা গিঁথে ছিল। ঢেমন সাঁওতাল বীর শিকারী, শলা দেখে বললে—ই তো আমার হাতের শলা আছে হে! বাসুড়ির ছেলেটা আমার কাছ থেকে লিয়েছিল সেদিন। ওর মনে ই ছিল, সেটা কি ক'রে জানচি হে?

ঢেমন সর্দারের সাক্ষ্যের বলে ঘাটোয়ালী কাছারির পানিকর মাগানিরামের বাবাকে কাছারিতে ডেকে চারজন সাক্ষীর সামনে টিপসই নিয়ে নগদ দশ টাকার দশখানা নোট ওর হাতে তুলে দিয়ে বললে—বাপের বেটা তো ইকে বোলে! চোখের জল না ফেলবি, উ তোর বেটা ছিল না, তোর বাবা ছিল হে।

কয়লাভাঁটা

সকালবেলা। চা খাওয়া শেষ করেই দেবেন মাইতি কনট্রাক্টর আমাকে বললে—চলুন এবার মাঠাবুরু ওঠা যাক। আমাদের ডাকবাংলোর পিছনেই সুদীর্ঘ শৈলমালার মাঠাবুরু শিখর, উটের পিঠের কুঁজের মত ডলোমাইটের অনাবৃত গম্বুজ। শেষ দু'তিনশ' ফুল গাছপালা বড় একটা দেখা যায় না, একটা বিরাট শিবলিঙ্গ যেন নীল আকাশে মাথা তুলে আছে।

বললাম—কত উঁচু?

—হাজার ফুট।

—বড্ড খাড়াই দেখছি—

—একটু কষ্ট হবে, কিন্তু ওপর থেকে চমৎকার সিনারি, আপনি যা ভালবাসেন, সাব!

—ওই যে কি একটা গাছ মাথার ওপরে, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে?

—ওটা একটা পাকুড় গাছ; মস্ত বড় গাছ ওটা, ওপরে উঠলে টের পাবেন।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। একটা বড় পাকুড় গাছ এখান থেকে দেখাচ্ছে যেন আশশেওড়া গাছের মত! কত উঁচু মাঠাবুরু শিখরটা!

দেবেন মাইতি বললে—আপনি রেডি হয়ে আছেন তো?

—চলুন ওঠা যাক—

আমার বাংলো থেকে হাত-কুড়ি দূরে গিয়েই জঙ্গল। জঙ্গলে হরীতকী, আমলকী, কেঁদ, শাল ও পলাশ গাছই বেশি। এখানে ওখানে বড় বড় পাথর ছড়ানো, নানা আকারের পাথর, কোন-কোনটার ওপর দিব্যি চৌরস সমতল—এত বড় যে, পাঁচ-ছজন বিছানা করে শুয়ে থাকলে পরস্পরের খুব ঘেঁষাঘেঁষি হয় না। আবার কোনটা সত্যিই ছোট।

একটি ক্ষীণকায়া ঝরনা পাহাড়ের দিক থেকে নেমে বয়ে চলেছে অসংখ্য ছোট বড় পাথরের ওপর দিয়ে। বেশ স্বচ্ছ, ঠাণ্ডা জলটা। দেবেন মাইতি বললে—এর নাম ছাৎনাজোড়—

—কোথায় গিয়ে মিশেছে?

—ও ওই আগে গিয়ে নাকটিটাঁর ফরেস্টের নীচে ভাটাইজোড়ের সঙ্গে মিশেছে।

—আর ভাটাইজোড়?

—কুসুমতির নীচে শঙ্খনদীর সঙ্গে মিশল—

ক্রমে সমতল ভূমি ছেড়ে মাঠাবুরু পাহাড়ের ওপর উঠতে আরম্ভ করলাম। রাস্তা খুব সরু, উঁচু নীচু পাথরের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে ওপরের দিকে চলেছে। দু ধারে শাল, কাঞ্চন, পলাশ, আমলকী গাছের ঘন ছায়া, মোটা মোটা চীহড় লতা, লতা-পলাশ দুলছে এ-ডাল থেকে ও-ডাল থেকে, প্রথম বসন্তে করন্ধা ফুলের সুগন্ধ সকালের বাতাসে, কোথাও একটা মস্ত বড় লতায় থোকা থোকা নতুন ফোটা অগ্নিবর্ণ পলাশ ফুল পথের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, কোথাও দীর্ঘচঞ্চু ধনেশ পাখী লতাপাতার আড়াল থেকে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল।

আমি অবিশ্যি জানতাম না, স্বরটা শুনে চমকে উঠে বলি—ওটা কি ডাকে?

দেবেন মাইতি হেসে বললে—ধনেশ পাখী, সার।

—যার তেল হয়?

—হ্যাঁ সার, দেখবেন? এ দিকটা তাকিয়ে থাকুন—

একটু আগিয়ে গিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ব্যস্তভাবে বললে—উই-উই—বড় বড় ঠোঁট—

এক এক স্থান কি সুন্দর ছায়াশীতল! করন্ধা ফুলের সুবাস ভুরভুর করছে বাতাসে, বড় বড় চৌরস শিলাসন চারিদিকে বিছানো। মনে হয় এমন শান্ত নিভৃত মৌন বনানীতলে সেকালে মুনিঋষিদের কুটির ছিল, বনবিহঙ্গের কলধ্বনি-মুখরিত এমনি প্রভাতে তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টি জীবনমৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে ব্যস্ত থাকত এই নিভৃত বনাঞ্চলে। আর সেইখানে দেবেন মাইতি কনট্রাক্টর আর আমি এসেছি কাঠকয়লার ভাঁটা কিনতে?

পা বড় ব্যথা করছিল। একটা লতা-পলাশের ফুলের থোকা দোলানো আমলকী গাছের তলায় পাথরের ওপর বসে সিগারেট ধরাই। অতি সুন্দর স্থান। এত নিবিড় ডাল-পালা ঝুঁকে আছে সানুদেশে যে, এখান থেকে সমতল ভূমি বা ডাকবাংলো দেখাই যায় না।

দেবেন মাইতি বললে—উঠুন, এখনও অনেকটা—

—কতটা উঠলাম?

—শ-চারেক ফুট হবে। এখনও অনেক বাকি—

এমন সময় অনেকগুলি তরুণীকণ্ঠের উচ্ছল হাসি-কলরবে বনভূমি মুখর হয়ে উঠল। আমাদের সামনে দিয়েই ছসাতটি মানভূমি বাউরি কি ভূমিজ মেয়ে লম্বা ধরনের লতায়-বোনা ঝুড়ি মাথায় হরিণীর মত লাফিয়ে সরু পথটা বেয়ে ওপরে উঠে চলল।

বললাম—এরাই বোধ হয় কুলি?

দেবেন মাইতি বললে—হ্যাঁ।

—মজুরি কত?

—এখানকার রেট আমি জানি নে।

এই ঘটনার এবং পথের ধারে বিশ্রামের পর ঝাড়া চল্লিশটি মিনিট কেটে গিয়েছে. আমরা তখনও মাঠাবুরু আরোহণ করছি তো করছিই। যা ভেবেছিলাম খুব কাছে, তা হয়ে পড়েছে বহুদূর। বন আগের চেয়ে একটু পাতলা হয়েছে বটে কিন্তু এখনও ওপরে উঠতে কত দেরি আছে বুঝতে পারছি নে—পা ভেঙে পড়ছে।

দেবেন মাইতি আশ্বাসের সুরে বলছে—এই এলাম সার. ওই এক নম্বর কিলিন দেখা যাচ্ছে—আর একটু—

কিন্তু ওর আশ্বাসের ওপরে বিশ্বাস হারিয়েছি। মোটে হাজার ফুট বললে. কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আরও বেশি—অনেক বেশি। সত্যি কষ্ট হচ্ছে। সোজা খাড়াই না হলে এত কষ্ট হত না।

আমি বললাম—আর এক নম্বর কিলিন! অনেকক্ষণ থেকেই তো বলছেন।

—আপনি দেখুন আর একটু গিয়ে। ওই যে পিয়াসাল গাছটা দেখছেন, ওই হল ওপরের লেভেল—

—বসবেন একটু এই পাথরটাতে?

এমন সময় আবার সেই রকম সম্মিলিত নারীকণ্ঠের গান ও কলরব ওপর থেকে নীচে নেমে আসছে শোনা গেল। আগের সেই দলটি এবার কাঠকয়লার ঝুড়ি মাথায় মাঠাবুরু থেকে নীচে নামছে। এতক্ষণ লেগেছে ওদের ওপরে পৌঁছুতে এবং কয়লা আনতে।

কিন্তু দেবেন মাইতি আমার ভুল ভেঙে দিলে। বললে—এরা সে দল নয়। এরা আমাদের অনেক আগে পাহাড়ে উঠেছিল। এদের উঠতে দেখি নি আমরা।

আমি বললাম—আগের দল এখনও পৌঁছয় নি?

—তা, এতক্ষণ প্রায় পৌঁছে গেল বোধ হয়।

তার মানে এখনও পৌঁছয় নি।

চারিদিকে চাইলাম। বড় বড় কেঁদগাছ আর মউলগাছ লতা-পলাশের বেষ্টনীর মধ্যে ধরা দিয়ে নিশ্চেষ্ট পৌরুষের মোহস্বপ্নে বিভোর। বনজুঁইএর ঝাড় উঁকি মারছে মস্ত বড় গ্যাবরো পাথরের গুহাসদৃশ ফাটলের অন্ধকার পর্দার পেছন থেকে। ঝকমক করছে অভ্র-কণিকা পায়ের তলার পথের বুকে। উষ্ণ হয়ে আসছে সকালের অরণ্যস্নিগ্ধ বাতাস।

বললাম—হ্যাঁ মশাই, মাঠাবুরু পিক কোন্‌টা? সামনের এটা না ওইটে?

এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার তাৎপর্য এই যে, হঠাৎ বনানীর ফাঁক দিয়ে আকাশপানে চোখ পড়াতে আরবী ড্রোমেডারি উটের পিঠের দুটো কুঁজের মত দুটো চূড়ো দেখতে পেয়ে সশঙ্ক হয়ে উঠেছি। দূরের ওইটে যদি মাঠাবুরু হয় তবে যতদূর দেখছি ও আরও হাজার ফুট, এর আর মার নেই ; তবে যদি এইটে হয়, তাহলে আর শ-পাঁচেক ফুট। এতক্ষণ একটা চূড়ো দেখছিলাম, তা এমন ভাবে দুটো হয়ে গেল কি করে? এমন হয়ে থাকে পাহাড়ের দেশে পাহাড়ের রাজ্যে, কোথা থেকে কোনও ভাবে অদৃশ্য কোন শিখর মাথা তুলে ঠেলে উঠল শিলাযবনিকা ভেদ করে, শিলীভূতা মায়াবিনী অপ্সরীর মত।

দেবেন মাইতি হেসে বললে—দূরের ওটা গুর্গাবুরু সার। বাঁ দিকে অনেক দূরে। মাইল-পাঁচেক হবে। উচ্চতম চূড়া এই রেন্‌জের।

—কত?

—বাইশ শ বাইশ—

হেসে বললাম—বা রে, রেলির বাড়ির ধুতি নাকি? ঠিক নম্বরটা পড়ে গিয়েছে দেখছি!

দেবেন মাইতি সম্ভবত না বুঝেই বোকার মত হাসলে। বললে—বসবেন একটু?

—না না, আবার কি বসব। উঠুন।

একটা পাহাড়ী কেলিকদম্বের আড়াল সরে যেতেই দেখি অগণ্য গোলগোলি ফুল ফুটে আছে পাহাড়ের গায়ে। স্বর্ণকান্তি পুষ্পস্তবক, পাষাণ পটভূমিকার গায়ে কোন শিল্পী যেন মায়াতুলি দিয়ে এঁকে রেখেছে। সুদূর পার্বতভূমির স্বপ্ন যখন দেখেছি বাংলাদেশের বর্ষাবাদলে ভেজা হয়তো এক একঘেয়ে দিনমানের শেষপ্রহরে—কোথা থেকে মনে উদয় হয়েছে রুক্ষ ব্যাসাল্টের স্তূপে নিষ্পত্র শুভ্রকান্ত বৃক্ষে এই পীত পুষ্পস্তবকের ছবি, তাদের সে অপূর্ব ইঙ্গিত। যে স্বপ্ন শীতের দেশ থেকে এসে লেগেছিল উদ্ভিদবিজ্ঞানবিৎ হুকারের চোখে, হিমালয়ের বনপ্রদেশের বহু ম্যাগনোলিয়া বহু রক্ত রডোডেনড্রনের মোহ ছাপিয়ে জয় করেও ছোটনাগপুরের পর্বতারণ্যের এই ফুল যে স্থায়ী প্রভাব এঁকে দিয়ে গিয়েছিল তাঁর মনে—হুকারের বইএতে তাঁর নিজের হাতে আঁকা গোলগোলি ফুলের ছবিতে তার প্রমাণ আছে।

দেবেন মাইতিকে কিছু বলব এ সম্বন্ধে ব'লে মুখ খুলেই আবার বন্ধ করলাম। ও কিছু বুঝবে না এ সম্বন্ধে। ও বোঝে—এত কিউবিক ফুট মাটি বা বালির কাজ হয়েছে, এত নম্বরের কুলির গ্যাং এত নম্বরের খাটালে কাজ করেছে—মজুরীর সঙ্গে অন্যান্য খরচ ধরে মালের দরের পড়তা কত হয়, পুরুলিয়ার বিহার ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের খাতায় কত জমা পড়ল। গোলগোলি ফুলের পীত পাপড়িতে পাপড়িতে যে স্বপ্ন আপনাতে আপনি মুক্ত, এমনিতর মুক্ত আকাশের তলায় পর্বতরাজ্যে তার যে অলেখা বাণী প্রাণের কানে অক্লান্ত চঞ্চলতা এনে দেয়—বেচারী দেবেন মাইতির কানে সে সবের খবর পৌঁছয় নি।

এইবার দেখি একদল কুলিমেয়ে নেমে আসছে, ওদের মাথায় কাঠকয়লার ঝুড়ি।

দেবেন মাইতি বলে—এই, কত নম্বর কিলিনের মাল?

একটি ঢেঙা, পাথরে কোঁদা দেবীমূর্তির মত সুঠাম তরুণী হাসি-মাখানো সুরে টেনে টেনে বললে—ছ নম্বর কিলেন গো।

দেবেন মাইতি আবার বললে—কে আছে রে?

—ওঝাজি আছে গো। ওঝাজি।

কুলিরমণীর দল একপাল প্রমোদমত্তা নীলা কুরঙ্গীর মত হাসি-কলরব করতে করতে নেমে গেল। আমি ওদের দিকে চেয়ে রইলাম—ওরা ক'বার ওঠানামা করতে পারে এই দুরারোহ পাহাড়ের মাথায় কয়লার ভাঁটাতে? কত ওদের রোজগার হয় সারাদিনের এই হাড়ভাঙা খাটুনির পরে?

পাহাড়ের ওপরে বেশ সমতল ময়দান। জঙ্গল বেশি নেই, এখানে ওখানে দেবকাঞ্চন, মহুয়া ও সুদাম গাছ। গাছগুলির বাড় বন্ধ হয়ে গিয়েছে শক্ত পাথুরে মাটিতে। স্বল্পচ্ছায় বিটপিতলে ছোট বড় কয়লার ভাঁটা। সুঠাম তরুণী কুলিমেয়েরা ভাঁটা ভেঙে সরু কয়লা মোটা কয়লা বাছাই করছে। বিষম রোদের তেজ, ঘাম ঝরে পড়ছে ওদের সর্বাঙ্গ বেয়ে।

একটি মেয়ে ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুঠাম, সুন্দর। তার গলায় কুঁচের মালা, নিটোল হাত দুটিতে কাঁসার বাউটি—মাথায় ঠাসবুনুনি চুল, মুখে হাসি লেগেই আছে।

কাছে গিয়ে বললাম—কি নাম রে?

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল। কিন্তু আমার কথার কোন জবাব দিলে না। পাশের মেয়েটি বললে—ও তোদের হিন্দি বাত বুঝতে পারবে? উয়াকার বাপের ঘর রাঁচি—

ভাল রে ভাল! হিন্দি কখন বললাম? যে মেয়েটি বাংলা ভাষায় জবাব দিলে তারও তো বোঝা উচিত ছিল। দেবেন মাইতি হেসে বললে—শুনুন গল্প। এক সাহেবের বিশ্বাস তিনি ভাল উড়িয়া শিখেছেন। উড়িষ্যার এক পল্লীগ্রামস্থ পাঠশালা পরিদর্শনে গিয়ে তিনি ঘণ্টাখানেক ধরে উড়িয়া ভাষায় ছাত্রের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল কথা বলবার পরে পাঠশালার উড়িয়া গুরুমশায় হাতজোড় করে বললে—হুজুর, একটা কথা আছে। আমার পাঠশালার এ ছাত্ররা নিতান্তই পাড়াগেঁয়ে, এরা হুজুরের হিন্দী কথা বুঝতে পারছে না। সাহেব তো অবাক! ছাত্রদের কথা চুলোয় যাক গে, গুরুমশায়ের তো বোঝা উচিত ছিল তিনি কি ভাষায় এতক্ষণ কথা বলে গেলেন অনর্গল।

দেবেন মাইতি একজন লোককে বললে—হো ভাষায় ওকে জিজ্ঞেস কর ওর নাম কি।

প্রশ্ন করা গেল, এবার উত্তর দিলে মেয়েটি, তার নাম—বুধনি কুই।

—কত করে রোজ দেয় এখানে?

—ঝুড়ি-পিছু ছ পয়সা বাবুজি।

—ক ক্ষেপ ওঠানামা করতে পার সারাদিনে?

—ছ বারের বেশি নয়।

—ছ বার ওঠানামা, না তিনবার ওঠা তিনবার নামা?

—ছ বার ওঠা, ছ বার নামা।

কি কাণ্ড! এই দুরারোহ মাঠাবুরু শিখরে ছ বার ওঠা যে কি কঠিন পরিশ্রমের কাজ তা কেউ বুঝতে পারবে না যে নিজে অন্তত একবারও না উঠেছে। পা কি আর থাকে তার পরদিন! এর চেয়ে কেদার-বদরী যাওয়া বোধ করি সহজ। আর এই সব সুঠাম তরুণীর দল আধমণ ত্রিশ সের কাঠকয়লার ঝুড়ি মাথায় হাসিমুখে দিব্যি উঠছে নামছে। যে কঠিন লোহার পাথর দিয়ে মাঠাবুরু গড়া, সেই ধাতুর শক্ত উপাদানে তৈরি হয়েছে ওই সব হো ও বাউরি মেয়েদের হাড়। নমস্কার করি শক্তিময়ীদের উদ্দেশে।

দেবেন মাইতি বললে—মজুরি সস্তা বলেই তো এখানে কাঠকয়লা পুড়িয়ে দু-পয়সা থাকে। ওপরে দেখবেন অনেক ভাঁটা আছে। সাড়ে ন আনা মণ আর কোথাও পাবেন না ও জিনিসের।

আমার উৎসাহ অনেক কমে গিয়েছে। দেবেন মাইতি যা বলছে তা করতে গেলে অনেক লোককে আমায় ফাঁকি দিতে হবে বেশ বুঝতে পারছি।

আমরা সাত আটটা ভাঁটা দেখলাম। দেবেন মাইতি ফিতে বার করে কত হাজার কিউবিক ফুট কাঠকয়লা এখানে পাওয়া যেতে পারে তার হিসেব করতে বসল।

আমি বললাম—মশাই মজুরি বড্ড কম।

দেবেন মাইতি আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আজ্ঞে, মানে?

—মানে এই, এখানে কয়লার ভাঁটা আমার নেওয়া হবে না। আপনি অন্য পার্টনার দেখুন।

—বেশ, বেশ। আপনি মজুরির রেট বাড়িয়ে দিন না! দিন সাত পয়সা করে। তাতেও আপনার মন খুঁৎখুঁৎ করে, দিন সাড়ে সাত পয়সা। কেমন, হল তো? ওসব কবি-টবি লোক নিয়ে কি বিজনেস চলে সার? ও আমি বুঝতে পেরেছি।

পাঁচদিন পরের ব্যাপার। ছ পয়সা থেকে মজুরির রেট বাড়িয়ে আমার কথায় করা হয়েছে তিন আনা। দেবেন মাইতি হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করেছিল, আমি শুনিনি। তার সব প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেছি।

সকালে ডাকবাংলোতে বসে আছি, কয়লাভাঁটার চৌকিদার গুপীনাথ মালিয়া এসে জানালে—বাবু বড় মুশকিল, কুলি পাওয়া যাচ্ছে না।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—কেন?

—কেউ এল না।

—ব্যাপার কি? মজুরি আরও বেশি চায়?

—আজ্ঞে সেজন্যে নয়। আপনি গিয়ে একবার দেখুন না?

গুপীনাথ মালিয়ার পিছু পিছু চলি। ডাকবাংলো থেকে বার হয়ে কিছু দূরে বাঘমুণ্ডী-ঝালদা পাকা সড়কের ওপর নিমডি গ্রামে ওর বাড়ি। এক সময়ে ওরা নাকি ছিল এই অঞ্চলের জমিদার, তাই ওদের উপাধি 'বাবু'। এখনও সকলে ওকে ডাকে গুপীবাবু বলে।

কিছুদূর গিয়ে নিমডি গ্রামের বাইরে বাটাইজোড় নদী বা নালা বা ঝরণা যাই বলুন, তারই ধারে একটা বড় অর্জুন গাছের তলায় গ্রামের ভাঁটিখানা—মহুয়া মদ চোলাই ও ক্রয়বিক্রয় হয়। গিয়ে দেখি কয়লাভাঁটার মেয়েপুরুষ সব কুলি নেশায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ওঠা তো দূরের কথা, চোখ মেলে চাইবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

বললাম—এ কি ব্যাপার গুপীবাবু?

গুপী দাঁত বের করে হেসে বললে—আজ্ঞে হবেই তো। হাতে কড়ি যাঁহাতক আসা, তাঁহাতক ও জাতের—

—তোমার কি মনে হয় মজুরির রেট বাড়িয়ে—

—আজ্ঞে, নির্ঘাৎ।

কাজ হল না! বিকেলে যখন ওদের নেশা ভাঙল, তখন তারা কাজের উপযুক্ত নয়। শরীর শিথিল, অবশ্য বেলাও পড়ে এসেছে, মাঠাবুরুর সানুদেশের জঙ্গলে মহুয়া ফুল খেতে ভালুক বেরোয়, অবেলায় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওঠা-নামা নিরাপদ নয়।

দেবেন মাইতি দেখি খুব খুশী। আমায় দেখে টেনে টেনে বললে—আপনাকে বললাম সার, তা আপনারা কবি লোক—

—কবি লোকের কি দোষ হল?

—দোষ হল এই যে, কয়লাভাঁটা উঠে গেল, আর এখানে কুলি পাবেন না।

—কেন?

—মজুরি তিন আনা দিলে মাথা পিছু আঠারো আনা পড়ে। সব দেখবেন মদ খেয়ে চিৎপাত হয়ে এমনি রোজ পড়ে থাকবে। আপনার কবিত্বের এই ফল হল। বিজনেস, সার, আলাদা জিনিস। আমার হাতে দিন ছেড়ে, দেখুন কি করে চালাই।

দিব্যি চলতে লাগল পরের দিন থেকে কয়লার ভাঁটা। ছ পয়সা রেটেই মজুরি নামিয়েছে দেবেন মাইতি। কোন কুলিই অনুপস্থিত নেই। আমি আর কোন কথা বলি নে। দেবেন মাইতি যা করে তাই। পয়সা আসছে।

মাঠাবুরুর সানুদেশের অরণ্যপথে বড় বটগাছের তলায় বসে আছি। ঘনছায়াভরা গ্রীষ্ম-অপরাহ্ন. পাহাড় তেতে উঠেছে, কয়লাভাঁটা একেবারে পাহাড়ের ওপরে গাছপালাহীন রুক্ষ অনুদকদেশে, এই গরমে তিষ্ঠুবার জো নেই সেখানে। তাই এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি। হঠাৎ দেখি কুলির দল নেমে আসছে। সেই কুলির দল।

একজন বাউরি কুলি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল—তোর কাছে জানাচ্ছি, ছ পয়সা রেট আমাদের পোষাচ্ছে না রে--

—কেন?

—তিন আনা করিছিলি আবার কাটলি ক্যানে?

—মদ খেয়ে মাতলামি করে কাজ কামাই করছিলি ক্যানে?

পেছনে মেয়ে-কুলির দল দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে সেদিনকার বুধনি কুইও ছিল। ওরা সবাই হাসছে দেখে কুলিটাকে বললাম—কি ব্যাপার রে? সব হাসছে কেন?

ওরা কিছু না বলে নেমে গেল।

রাত্রে ডাকবাংলোর চৌকিদার আমাকে গোপনে বললে—বাবু, সব কনট্রাক্টর বাবুর কাজ। পাঁচ টাকা খরচ করে নিজের ট্যাঁক থেকে—বিলকুল সব মদ খাইয়েছিল সেদিন।

—কেন?

—নইলে আপনি মজুরির রেট কমাবেন না। আপনার শুধু এই মাঠাবুরুর ভাঁটা ওর সঙ্গে ভাগে, কিন্তু ও বাবুর এ অঞ্চলে আরও অমন কত জায়গায় ভাঁটা, মজুরির রেট বাড়ালে ওর লোকসান কত। কুলিরাও সেটা জানে, তাই জেনেশুনে হাসছিল, আপনার কাছে রেট বাড়াবার কথা বলে হাসছিল। আমি সব শুনেছি।

আমার এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই, অথচ যারা সত্যিই ঠকেছে এ ব্যাপারে, তারা পরের পাঁচ ছ দিন ধরে আমাকে দেখলেই হাসে, গা ঠেলাঠেলি করে পরস্পরের, যেন আমাকে তারা খুব বোকা বানিয়েছে। তাদের দলের সেই হো তরুণী বুধনি কুই এ কাজে অগ্রণী।

এ সরলা বন্যবালাদের আমি কি বোঝাব? দেবেন মাইতির জয় হোক, মাঠাবুরুর কয়লাভাঁটার মহাজন বলরামপুরের বিরিজলাল ঘনশ্যামদাসের সাড়ে তেত্রিশ পার্সেণ্ট মহাজনির জয় হোক।

কবি

গল্প নয়, নিজের চোখে দেখা।

তবে গল্প না বলিলে লোকে পড়িতে চায় না, তাই গল্পের আকারেই লিখিতে হইল।

সিংভূম জেলার পাহাড়-জঙ্গলময় স্থান পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম আমি এবং সঙ্গে দুইটি বন্ধু। তবে আর একটু খুলিয়া বলি, গুছাইয়া না বলিলে আপনাদের ঠিক ছবিটি দিতে পারিব না হয়তো। দেশের লিচুতলা ক্লাবে বসিয়া একদিন ভ্রমণের গল্প করিতেছিলাম। পাহাড়-জঙ্গলের গল্প অনেক কিছু করিলাম। এখানে এ পাহাড় দেখিয়াছি, ওখানে ও পাহাড় দেখিয়াছি, সত্য ও মিথ্যা মিলাইয়া বেশ গল্প ফাঁদিয়াছিলাম। অবশ্য সত্যই বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অভ্যাসদোষে অতিরঞ্জিত মিথ্যা কিছু কিছু বর্ণনার মধ্যে ঢুকিয়া গেলে আমি আর কি করিব!

ভাদ্র মাসের শেষ। শরতের চিহ্ন নীল আকাশের শুভ্র মেঘমালায় পরিস্ফুট। বাতাস রৌদ্রতপ্ত, দিন ছোট হইয়া আসিয়াছে। মাঝে মাঝে অতর্কিতে একপশলা বৃষ্টি কোন

উড়ন্ত মেঘখণ্ড হইতে ঝরিয়া পড়ে। নদীতীরে কাশগুচ্ছ সর্বত্র দেখা যায়।

মন্মথ মোক্তার বলিলেন, এসব কোথায় ভায়া?

—সিংভূম জেলায়।

—কতদূরে?

—তা হাওড়া থেকে দুশো মাইল।

—তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কখনও কিছু দেখলাম না। সাক্ষীর জেরা করতে আর তালিম দিতে দিতে জীবনটা—

আর এক উৎসাহী বন্ধু বলিলেন, যা বললেন মন্মথদা। রইলাম প'ড়ে এই গর্তে। কিই বা জীবনে দেখলাম! বিভূতি দেখ কত দেশ ও বিদেশ দেখে দেখে—

বলিলাম, তার আর ভাবনা কি? আমি নিয়ে যেতে রাজি আছি আপনাদের। মানে আমার সন্ধানে অল্প খরচে বেশ পাহাড়-জঙ্গলের পথ দিয়ে নিয়ে যেতে আমি প্রস্তুত।

—কোথায়?

—একটা পথে আমি নিজে একবার হেঁটে গিয়েছিলাম। সবসুদ্ধ ষোল মাইল রাস্তা হবে। আগাগোড়া বন আর পাহাড়। নিবিড় নির্জন বনপথ। রেখামাইন্‌স স্টেশনে নেমে দক্ষিণ দিকে বনের পথ দিয়ে আবার পূবের দিকে ঘুরতে হবে, তারপর আবার উত্তর মুখে এসে সুবর্ণরেখা পার হ'তে হবে, সবসুদ্ধু ষোল-আঠারো মাইল পথ। রাজি?

মন্মথদা উৎসাহের সুরে বলিলেন, হ্যাঁ রাজি। দেখাও ভাই, বয়েস হয়েছে. কবে হয়তো—

—কিন্তু তা তো হ'ল। আপনি হাঁটতে পারবেন এই দুর্গম বনপথ এতটা?

—তুমি সে পথ জান তো?

একবার গিয়েছিলুম, সুতরাং জানি। তবে সেও আজ হ'ল পাঁচ বছর আগের কথা, ভাল মনে নেই। চলুন, নিয়ে যাব। সব স্থির হইয়া গেল। কি একটা ছুটি ছিল দিন সাত-আট পরে, সম্ভবত ঈদের ছুটি। ঠিক হইল সেই ছুটিতে এখান হইতে ঝোলা-ঝুলি কাঁধে রওনা হইতে হইবে, সত্যকার ভবঘুরে ভ্রমণকারীদের মত।

মন্মথবাবুর বয়স পঞ্চান্নর কাছাকাছি। তাঁহাকে আবার বলিলাম, হাঁটতে পারবেন তো? গাড়িঘোড়া কিছু মিলবে না কিন্তু সে রাস্তায়। ভেবে দেখুন।

তিনি আশ্বাস দিলেন, কিছু ভেবো না ভায়া। দেখো এ বুড়োর হাড়ের জোর। তোমাদের চেয়ে অনেক শক্ত আছি এখনও।

কিন্তু তিনিই বিপদে ফেলিয়াছিলেন আমাদিগকে পথের মধ্যে। সে কথা এখানে অবান্তর, আসল কথা যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহাই বলিব। আজ সাত-আট বছর হইয়া গেল, সে ঘটনা, সে ছবি আজও আমাদের তিনজনেরই মনে জ্বলজ্বল করে. সময়ের ব্যবধান তাহা ম্লান করিয়া দিতে পারে না।

সেই গ্রাম্যকবি রঘুনাথ দাসের কথা।

আর একটু গোড়া হইতেই বলি।

রাত চারটার সময় ট্রেন হইতে নামিলাম মহুলিয়া স্টেশনে। ট্রেনে একটি উপর-চালাক ছোকরাকে জিজ্ঞেসা করা গেল, এ ট্রেন রেখা মাইন্‌সে ধরিবে কিনা? নির্বোধেরা সব সময় সব বিষয়ে খুব নিশ্চিত থাকে। সে বলিল, ধরিবে নিশ্চয়ই; কোন সংশয়ের অবকাশ নাকি সে সম্বন্ধে নাই। আমার কেমন সন্দেহ হইল তার কথাবার্তার ধরনে। আমি অন্য বন্ধুটিকে গার্ডের কাছে পাঠাইয়া দিলাম এ কথা জানিবার জন্য। গার্ড বলিয়া দিল, ও স্টেশনে ট্রেন ধরে না। দায়িত্বজ্ঞানহীন ছোকরার কথা শুনিয়া কাজ করিলে সেদিন একেবারে টাটা গিয়া গাড়ি থামিত, ফিরিবার ট্রেন সারাদিন মিলিত না, ভ্রমণটাই মাটি হইয়া যাইত। কেন লোকে না জানিয়া শুনিয়া এমন বাজে কথা বলে, তাই ভাবি।

যখন ট্রেন হইতে নামিলাম, তখনও রাত্রি আছে। তবে পথ বেশ দেখা যায়। আমরা হাঁটিয়া আসিলাম রেখা মাইনস্ পর্যন্ত। ঠিক সে সময় ভোর হইয়া গেল। আমরা অরুণচ্ছটারক্ত পূর্বদিগন্তের মহিমা অবাক হইয়া দর্শন করিলাম সুবর্ণরেখাতীরের শালবন

হইতে। আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি অনামিকা পার্বত্য তটিনী দুই তীরের পাষাণ-কূলের মধ্য দিয়া কুলুকুলু স্বরে ছুটিয়া চলিয়াছে। পাষাণময় তট বর্ষার বনকুসুমে ফুটিয়া আছে, নদীর ধারে ধারে বনশেফালী বৃক্ষ, দুই-একটি শিউলিফুলও ফুটিয়াছে।

আমি প্রস্তাব করিলাম, আসুন, স্নান করা যাক এই নদীতে।

মন্মথদা বলিলেন, এত সকালে?

—এত সকালেই। "নদী দেখবে যখন, স্নান করবে তখন।' সুতরাং শাস্ত্রবাক্য মেনে নিয়ে এখুনি স্নান করা যাক। রাস্তায় এমন সুন্দর নদী আর হয়তো মিলবে না।

—ভিজে কাপড় বইতে হবে সারা রাস্তা।

—তার ব্যবস্থা হবে।

ব্যবস্থা যাহা হইল, তাহা ছাপার অক্ষরে না লেখাই ভাল। অতঃপর নদীর সেই জলজ-লিলি-সুবাসিত পাষাণতট পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। একস্থানে শৈলসানুতে একটা বড় পিয়াল গাছ, তার তলদেশে বিশাল শিলাখণ্ড একখানা, ঠিক যেন বাঁধানো বেদীর মত। কয়েক দণ্ড সেখানে বিশ্রাম করিলাম ও সঙ্গে আনীত পাঁউরুটি মাখন, জেলি ও সন্দেশের সদ্ব্যবহারও যে না করা গেল এমন নয়।

তারপর আবার রওনা। পথিমধ্যে এক অতি বৃদ্ধ সাহেবের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে দেখা। সাহেব কুলি খাটাইয়া কি কাজ করিতেছে, বনের মধ্যে একটি তাঁবু, তাঁবুতে দুই-একখানা চেয়ার, টেবিল। সাহেবের নিজের মুখেই শুনিলাম তাহার বয়স নব্বুই বৎসর। এই বয়সে সে অর্থ উপার্জন করিয়া সে অর্থ ভোগ করিবে কবে, বাঙালীর মনে এ প্রশ্ন উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ও জাতের ধর্ম অন্যরূপ। 'অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ' চাণক্য শ্লোকের এই বাক্য উহারাই সার্থক করিয়াছে।

আরও কিছুদূরে গিয়া একটি বনমধ্যস্থ সাঁওতালী গ্রাম, নাম কুলামাড়ো। সেখানে পথের ধারে একটি ছোট্ট কুটির, তাহার পাশে শালের খুঁটিতে ঝোলানো একটা কেরোসিনের টিনের ভগ্নাংশ, তাহাতে অতি জরুরী বিজ্ঞপ্তি লিখিত আছে—"এই মাস হইতে দুকান খোলা হইয়াছে"।

মন্মথদা বলিলেন, এ ব্যাপারটা কি হে?

আমি বলিলাম, মনে হচ্ছে এটা দোকান।

—খোঁজ করা যাক, কি বল? চা ক'রে যদি দিতে পারে।

—সন্ধান করুন।

ডাকাডাকি করার পরে একটি বন্য তরুণী বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, এটা দোকান?

—হোই।

—চা ক'রে দিতে পার?

—পারবোক না কেনে?

—দাও তবে।

—চা আছে চিনি নেই।

—আমাদের আছে, দেব।

ক্রমে আলাপ হইয়া গেল। তরুণীর নাম পরীবানু। এ ধরনের নাম এই বনের মধ্যে কোথা হইতে আসিল, কি জানি। তরুণীটির বেশ সুঠাম সুগঠিত চেহারা, শান্ত মুখশ্রী। সে জল ফুটাইয়া দিব্যি চা করিয়া আনিল, তবে পেয়ালা ইত্যাদি নাই, বড় কাঁসার জামবাটিতে এক বাটি চা এবং কয়েকটি গেলাস।

চা-পান সারিয়া আবার বাহির হওয়া গেল। এবার দুর্গম বনপথ, মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝরনা ক্ষুদ্র নদীর আকারে পথের পাশেই বহিয়া চলিয়াছে। পাষাণতট বনকুসুমকে আলো করিয়া আছে।

মন্মথদা বলিলেন, বেশ জায়গা হে এমন পাহাড় বন দেখি নি কখনও।

অপর বন্ধুটি বলিলেন, সত্যি এমন জায়গা যে আছে, যশোর জেলার পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে

থেকে তা কি ক'রে বুঝব? একটা জায়গা দেখালে বটে।

আমি আনন্দিত হইলাম বটে, কিন্তু লক্ষ্য করিতেছিলাম, মন্মথদা আর হাঁটিতে পারিতেছেন না। তাঁহার পদবিক্ষেপের মধ্যে একটা ক্লান্তির চিহ্ন ক্রমশই ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। বলিলাম, ব্যাপার কি?

—আর কত মাইল বাকি?

—এখনও অনেক।

—তাই তো, বড় ক্ষিধে পেয়েছে। এখানে কিছু পাওয়া যায়?

—কি পাওয়া যাবে এখানে! সঙ্গে পাঁউরুটি আছে, চলুন, কএটা ঝরনা দেখে ব'সে তাই খাওয়া যাক।

আরও ঘণ্টা দুই কাটিল।

একটি চমৎকার বনাবৃত অধিত্যকার মধ্যে ছায়াগহন সমতলভূমিতে আমরা আসিয়া বসিলাম। তখন বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। সকাল হইতে অনবরত হাঁটিয়া সকলেই ক্লান্ত। হাতঘড়িতে তিনটা বাজিলেও পাহাড়ের দীর্ঘ গহন ছায়া সমস্ত অধিত্যকাটি এমনভাবে ঢাকিয়াছে যেন শাল কেঁদ ও পলাশ বনে প্রদোষকাল উপস্থিত বলিয়া মনে হইতেছে।

দেখা গেল পাঁউরুটি যাহা আছে তাহা তিনটি দস্তুরমত বুভুক্ষু ব্যক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযুক্ত নয়। মন্মথদা বলিলেন, আর একটু চা হলে এক রকম কাটাতে পারতাম।

আমরা সকলেই এ কথায় সায় দিলাম।

আমি বলিলাম, চলুন দাদা, এই পাহাড়টা টপকে ওপারে কোনও গ্রাম আছে কিনা দেখা যাক। সকলে আবার উঠি, আবার পাহাড় টপকাইয়া চলি। পাহাড়ে উঠিবার পথে দুই ধারে শিউলিফুলের বন, প্রথম শরতে শিউলিফুল ফুটিয়া সকালেই ঝরিয়া পড়িয়াছে শিলাপটে। বড় দুর্গম চড়াইয়ের রাস্তা, মন্মথদা হাঁপাইতেছেন, বন ক্রমশ ঘন হইতে ঘনতর হইতেছে, কেঁদগাছে পরগাছার ফুল ফুটিয়াছে হরেক রঙের।

মন্মথদার হাত হইতে ঝুলিটা আমি লইলাম, তিনি বড় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে একরূপ টানিয়া পাহাড়ের সমতল শীর্ষে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইলাম।

একটু পরে আবার নামিতে শুরু করিতে হইল, কারণ বেলা হু হু করিয়া পড়িতেছে। এই ভল্লুকসংকুল পর্বতারণ্যের অপরিচিত পথে রাত্রির অন্ধকার আমাদের উপর নামিয়া না আসে।

মন্মথদা বলিলেন, আহা, একটু চা যদি পেতাম!

মন্মথদা বার বার চায়ের কথা বলার দরুণই রঘুনাথ দাস কবির সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল।

পাহাড়ের ওপাশে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম, কয়েক ঘর লোকের বসতি। একজন লোককে মহিষ চরাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহে, এখানে চা-টা পাওয়া যাবে কোথাও?

সে লোকটি বলিল, হোই।

—কোথায়?

—ওই হোথা। তোদের মতন একজন লোক আছে রে। লেখে পড়ে, কবি হচ্ছে। টুসু পরবের গান বানায়। চলে যা সোজা, ওই বড় মহুয়া গাছের নীচে দেখবি ওর ঘর আছে।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলাম। কবি এই জঙ্গলে-ঘেরা বন্যদেশে বর্বরদের গ্রামে!

মন্মথদা বলিলেন, চল চল হে, দেখা যাক। আশ্চর্য কথা তো! চা-ও নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কবি মাত্রেই চা খায়। চল, কি রকম কবি দেখা যাক।

আমরা গিয়া কথিত মহুয়াগাছের তলায় পৌঁছিলাম। দেখি একজন লোক কোদাল ধরিয়া মাটি কোপাইতেছে। লোকটির রঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, পরনে লেংটি, মাথায় বাবরি চুল, বয়স চল্লিশের মধ্যে, বেশ স্বাস্থ্যবান। আমরা গিয়া বলিলাম, কবি রঘুনাথ দাসের বাড়ি কোথায়?

লোকটি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আগাইয়া আসিল। বলিল, আমারই নাম! আপনাদের দাসানুদাস। বাবুদের কোথা থেকে আগমন হচ্ছে?

কলকাতা থেকে।
তবে পাটাঘটার জঙ্গলের দিক থেকে এলেন যে?
হাঁটতে হাঁটতে আসছি এই বন দেখতে দেখতে।
আসুন, বাবুরা আসুন। আমার বড় ভাগ্যি। চলুন আমার ঘরে।
বনের ভেতর দিয়া পথ, গ্রাম হইতে কিছুদূরে পাহাড়ের নিভৃত উপত্যকায় একটি নিচু খড়ের ঘর; ঘরের সামনে ও চারিধারে শাল ও মহুয়ার সারি, পাহাড়ী ঢালুতে বনকুসুম ফুটিয়া আছে, প্রধানত বন্য পিটুনিয়া ও বন্য শেফালি, উপরের দিকে দেবকাঞ্চন।
ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই প্রথমে চোখে পড়িল, বড় বড় অক্ষরে একখানা কাগজে লিখিয়া দেওয়ালে মারা ঃ—

সংসারের কোলাহল নাহি পশে কানে
তাই ভালো লাগে মোর থাকিতে এখানে।

ঘরের একপাশে একখানা দড়ির খাটিয়া, তাহাতে একখানা মোটা সাঁওতালী চাদর পাতা, ঘরের এদিকে ওদিকে বইখাতা অত্যন্ত অগোছালোভাবে ছড়ানো, একখানা রাধাকৃষ্ণের ছবি টাঙানো দেওয়ালে, ঘরের কোণে এক ঝুড়িতে কয়েকটি শশা। বাহির গাছপালায় পার্বত্য পক্ষীকুলের কলকাকলী, ঘনছায়া বনপাদপের পাশেই উত্তুঙ্গ তামাপাহাড়শ্রেণী, পড়ন্ত বেলার রোদ শৈলচূড়ার বনানীশীর্ষে। অতি সুন্দর আশ্রমটি। কবির লিখিবার ও ভাবিবার উপযুক্ত স্থান বটে।
যে এরূপ স্থান নির্বাচন করিবার ক্ষমতা রাখে, সে কবি না হইয়াই যায় না।
আমরা বলিলাম, আপনার বাড়ি নয় এটা?
না বাবু, এটা আমার লিখবার জায়গা। সারাদিন এখানেই থাকি, বাড়িতে যাই খেতে। গ্রামের মধ্যে বড্ড গোলমাল, ও আমার সহ্য হয় না। আপনারা বসুন, আমি আসছি।
কবি চলিয়া গেলে আমরা তাহার বইপত্তর ঘাঁটিয়া দেখিতে লাগিলাম। রামায়ণ, মহাভারত, একখানা সাঁওতালী ছড়ার বই, পদ্যে লেখা সিংভূমের রাজবংশের ইতিহাস, একখানা লয়লামজনু বই বটতলার ছাপা, একজন কোন সাধুর জীবনচরিত ইত্যাদি।
মন্মথদা বলিলেন, এ যে দেখছি, ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল!
আমি ও আমার বন্ধু দুজনেই সে কথায় সায় দিলাম।
মন্মথদা বলিলেন, চা হবে কি বল?
আমি বলিলাম, মনে তো হয় দাদা। কবি যখন, দেখা যাক।
বড় সুন্দর জায়গা এটা। ও যদি বিক্রি করে, কিনতে রাজি আছি।
কিনবেন তো, আসবেন কোথা দিয়ে? এই বনের মধ্যে দিয়ে দশ-বারো মাইল হেঁটে?
তাই তো ভাবছি।
ইতিমধ্যে কবি গ্রাম হইতে ফিরিল। তাহার এক হাতে একটি ধামায় একধামা মুড়ি, অন্য হাতে আট-দশটা ভুট্টাপোড়া। হাসিমুখে বলিল, দেরি হয়ে গেল।
আমরা তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম, কিছু দেরি হয় নাই।
চায়ের সরঞ্জাম এখানেই ছিল, কবি আর একবার গিয়া দুধ লইয়া আসিল। মুড়ি শশা, ভুট্টাপোড়া ও চা-পর্ব মিটিবার পরে আমরা কবিকে ধরিলাম, আমাদের কবিতা পড়িয়া শুনাইতে হইবে।
পরিবেশটি ছিল চমৎকার। তামা পাহাড়ের দীর্ঘশ্রেণী আমাদের বামে, শালতরুর সারি ছিল দুই পাশে, দেবকাঞ্চন ফুটিয়াছিল পর্বতসানুর বনে, তাহার মধ্যে বাবরি চুলওয়ালা কৃষ্ণকায় সাঁওতালী চেহারার কবি রঘুনাথ দাস আপনার মনে স্বরচিত কবিতার পর কবিতা আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে।
ভ্রমণে আসিয়া এতটা ঘটিবে আমাদের ভাগ্যে, তাহা ভাবি নাই।
অনেক কবিতা। দিব্যি ছন্দের কান, ভাষা সরল সহজ, গ্রাম্য কবির উপযুক্ত। সব চেয়ে আমার ভাল লাগিল কবির নিসর্গপ্রীতি। প্রকৃতিকে দেখিবার সুন্দর চোখ আছে কবির, অনেকগুলি কবিতা প্রকৃতির বর্ণনা, ঋতুর বর্ণনা, সকাল-সন্ধ্যায় পার্বত্যভূমির নানা রূপের বর্ণনা।

আমার এ সকল কবিতা মনে নাই। মনে থাকিলে এখানে নমুনা দিতে পারিলে ভাল হইত। কেবল একটা লাইন আমার মনে আছে একটা কবিতার—

'মত্ত ধরা রেরেং পোকার গানে'

আমরা বলিলাম, রেরেং পোকা কি?

ওই যে ডাকে রাত্তিরে, বনে জঙ্গলে।

ঝিঁঝিঁ পোকা?

ওই। আমরা বলি, রেরেং পোকা।

মন্মথদা বলিলেন, বই ছাপান নি?

এখানে মাঘ মাসে টুসু পরব হয়। টুসুর গান আর ছড়া ছাপিয়ে বিক্রি করি। খুব বিক্রি হয়। বছরে ওই টুসু পরবের সময় ত্রিশ টাকা আন্দাজ বই বিক্রির আয় হয়।

ওতে চলে সারা বছর?

আমার ওতেই হয়ে যায়। খরচ তো বেশি কিছু নয়; ধানের জমি আছে ওই পাহাড়ের কোলে, মকাই হয় এই ভাদ্র মাসে। কুরমি হয় দশ মণ।

কুরমি কি জিনিস?

কলাই জাতীয় ফসল। এ দেশে সেদ্ধ ক'রে খায়। গাছে ধুঁধুল, চিচিঙ্গে, ঢেঁড়স ফলে। ওতেই খুব হয়।

আপনার ছেলেপিলে কি?

তিনটি ছেলে। মেয়ে নেই। বুড়ো বাবা-মা বাড়িতে। স্ত্রী আছেন।

এদের বেশ চলে যায়!

যেমন এদেশে চলবার নিয়ম। দুবেলা বাঙালী বাবুদের মত ভাত খেতে হবে, তা নয়। ভুট্টাপোড়া খেয়েই দুদিন কেটে গেল। জংলী আলু একরকম আছে, কার্তিক মাসে পাহাড়ের জঙ্গল থেকে গ্রামসুদ্ধু মেয়েরা তুলতে যায়। সকরকন্দ আলুর মত মিষ্টি। এক-একজন একমণ দেড়মণ আলু তুলে আনবে জঙ্গল থেকে। তাই খেয়েই পনেরো দিন কেটে গেল—এমনই। ভাল কথা, রাতে আপনারা এখানেই থাকুন। কাল সকালে উঠে যাবেন। খাওয়ার ব্যবস্থা করি।

আমাদের ভালই লাগিল এই বন্য গ্রামের কবির সাহচর্য। এ ধরনের কবি আমরা দেখি নাই কখনও। মনও খাঁটি কবির মতই। আমরা বলি, গাঁয়ের বাইরে এই জঙ্গলের মধ্যে থাকেন, এতে কষ্ট হয় না?

কবির কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। উত্তর দিল, কষ্ট কেন হবে বাবু? এমন বনের মধ্যে পাহাড়ের নীচে। শালফুল যখন ফোটে, সে গন্ধে পাগল ক'রে দেবে, সে সময় আসবেন বাবু। দেখুন না কত ফুল ফুটে আছে এ সময়। সকালে কত শিউলি ফুল প'ড়ে থাকবে পাহাড়ের বনে। আর দিনকতক পরে আশ্বিন মাসের প্রথমে এখানে জ্যোৎস্নারাতে ঘরে ব'সে পড়ি বা লিখি, শিউলিফুলের সুবাস কি! এক-একদিন আর বাড়ি যেতে ইচ্ছে হয় না। সারা রাতই এখানে শুয়ে থাকি।

মন্মথদা রহস্য করিয়া বলিলেন, আর কবিপ্রিয়া?

রঘুনাথের মুখে সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল। চুপ করিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, বলুন, বলুন, লজ্জাটা কি এর মধ্যে?

রঘুনাথ বলিল, সে লেখাপড়া জানে না। এদেশের মেয়ে, দেখেছেন তো ওদের। স্বাস্থ্য ভাল। আপনি দেখে বুঝতে পারবেন না বয়স কত। যেদিন রাত্রে না যাই, মাঝে মাঝে সে নিজেই আসে। ফুল বড় ভালবাসে, ওই জঙ্গল থেকে এই সন্ধেবেলা দবকাঞ্চন ফুল নিয়ে আসতে হ'ল, খোঁপায় গুঁজবে।

আমার বন্ধুটি বলিলেন, নাঃ মশাই, আপনি একজন সত্যিকারের কবি। আচ্ছা, উনি যদি আসেন, এখানে খাবেন কি?

ও ভাত রেঁধে নিয়ে আসে শালপাতায় জড়িয়ে। নয়তো ভুট্টাপোড়া। কোন কোনদিন মুড়ি আর আলুসিদ্ধ। আমার তৈরি গান ওকে গাইতে বলি। এই মাঘ মাসে টুসু পরব

আসছে, আর দিনকতক পরে গান বাঁধতে আরম্ভ করব। রাত্রে এখানে একদিন থেকে দেখবেন কত ফুলের গন্ধ!

সত্যিই এই সরল বন্য কবির জীবন আমাদের কাছে লোভনীয় মনে হইল। আর এই পাহাড়ের কোলের ছোট্ট খড়ের ঘরখানা।...প্রাচীন দিনের ভারতবর্ষে এমনই শৈলারণ্য, এমনই আশ্রমে কত কবি 'ভাস' 'অবিমারক' 'স্বপ্ন বাসবদত্তা' রচনা করিয়া গিয়াছেন, কত কালিদাস 'মেঘদূত' লিখিয়াছিলেন, কত ভবভূতি প্রস্রবর্ণগিরির বর্ণনা করিয়াছিলেন। সুঠাম তরুণী কবিপ্রিয়া খোঁপায় শালমঞ্জরী গুঁজিয়া ময়ূরকে আহার্য প্রদান করিতেন আশ্রমের অঙ্গনে। দিকে দিকে মুক্ত প্রকৃতির আহ্বান।...আমাদের রঘুনাথ দাস তাহাদেরই সেই ধারা এই অরণ্যপ্রান্তে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাঁহাদেরই প্রতীক ও। সন্ধ্যার কিছু আগে আমরা কবির নিকট বিদায় লইলাম।

মন্মথদার থাকিবার উপায় নাই, কোর্ট খুলিবে। রঘুনাথ দাস আমাদিগকে সুবর্ণরেখার খেয়াঘাট পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া গেল। খেয়া পার হইয়া আরও তিন মাইল হাঁটিয়া স্টেশনে আসিয়া রাত্রি বারোটার সময় ডাউন রাঁচি এক্সপ্রেস ধরিলাম।

যাচাই

গরুর গাড়ী ঢুকলো চাঁদপুর গ্রামের মধ্যে। ননীবালা ছেলেকে বললে—বাবা, চেয়ে দ্যাখো—

—ঘুমুই নি মা। চেয়ে আছি—

—এই গাঁয়ের সীমানা। ওই গেল দুলেপাড়া—

—ব্রাহ্মণপাড়া কত দূর?

—আরও আগে।

ননীবালার সারা দেহেমনে একটি অপূর্ব অনুভূতির শিহরণ!

মনে পড়লো আজ ত্রিশ-বত্রিশ বছর পূর্বে একদিন এই গ্রামে নববধূরূপে ঢুকবার সেই দিনটির কথা। তিনি ছিলেন পাশে—আজ যেমন ছেলে সুরেশ তার পাশে বসে রয়েছে। তেমনি মুখচোখ, তেমনি চোখের দৃষ্টি, বয়সেও তাই।

চাঁদপুর গ্রামে ঢুকবার কিছু পরেই কাককোকিল ডেকে ভোর হয়ে গেল।

সুরেশ গাড়ী থেকে নেমে গাঁয়ের পথের ধুলো তুলে মাথায় দিলে।

মাকে বললে—তোমরা কতদিন গাঁ থেকে গিয়েছিলে?

—তোর বয়েস।

—একুশ বছর!

—হ্যাঁ। ওঁর ইস্কুলের চাকরি গেল—আমরা এখানকার মায়া কাটালুম।

—বাবা দুঃখ করেন নি?

—আহা! মরবার আগেও প্রায়ই বলতেন বড়বৌ, একবার যদি চাঁদপুর যেতে পারতাম ফিরে, তবে বোধ হয় কিছুদিন আরও বাঁচতাম। ওখানে এখনা চৈত্র মাসের দুপুরে বুড়ীর কুলচুর শুকুচ্চে রোদ্দুরে। বাঁশবনে কত কোকিল পাপিয়া ডাকচে—আমি গাঁয়ে যাবো। শহরের ছোট বাসার মধ্য উনি চিরকাল হাঁপিয়ে এসেচেন। আর তেমনি গরম সেখানে।

—আমি যদি তখন বড় হোতাম, বাবাকে বাবার জন্মভূমিতে ঠিক নিয়ে আসতাম বলে দিচ্চি।

সুরেশ ছিপছিপে চেহারার শক্ত হাতপা-ওয়ালা যুবক। ফুটবল খেলে ভালো। দেশ স্বাধীন হবার পর রাইফেল ক্লাবে যোগ দিয়ে খুব রাইফেল ছোঁড়া অভ্যেস করচে। এইবার রেলের শিক্ষানবিশি শেষ করে ভালো চাকরি একটা পাবে। শিক্ষানবিশির সময়েই ও খেলোয়াড় হিসেবে রেলের উপনিবেশ শহরটির অনেক বড় বড় অফিসারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেচে। শিক্ষানবিশির ছাত্রও সে ভালো—অংক বেশ ভালো জানে বলে অংকের টুইশানিতে মাসে আজকাল সত্তর-আশি টাকা রোজগার করে।

স্বামী মারা গিয়েচেন আজ দশ-এগারো বছর। সুরেশ তখন দশ বছরের ছেলে। নিচের ক্লাসে পড়ে। কি আতান্তরেই ফেলে গিয়েছিলেন সেদিন! মনে হয়নি যে আবার একদিন এ ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে! রেল উপনিবেশের সকলেই খুব দয়া করলেন। একটা বাসা দেখে দিলেন, কারণ রেলের কোয়ার্টার ছাড়তে হোল, ইন্‌স্টিটিউটের সেক্রেটারি রায় বাহাদুর হরিচরণ বসু নিজে এসে দেখাশুনো করলেন। সুরেশের লেখাপড়া যাতে বন্ধ না হয়, যাতে এ গরীব অসহায় পরিবারটি অনাহারের পথ থেকে রক্ষা পায়—এ সমস্তই ওখানকার বড় বড় লোকেরা করলে। সে সব দিনের কথা ভাবলে জ্ঞান থাকে না। এমন দিনও আসে মানুষের জীবনে!

আজ মনে হচ্চে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এসে অদূরে এবার কূলরেখা যেন দেখা দিয়েচে। ওরা সবাই বলে আমাদের দেশ এখন স্বাধীন, আর সে যুগের মত কষ্ট করতে হবে না। এখন ছেলেপিলেদের ভালো চাকুরি হবে, চাকুরিতে উন্নতি হবে, আগের মত অল্প মাইনেতে ঘস্‌টাতে হবে না। না খেয়ে মরবে না কেউ এ স্বাধীনা ভারতের মাটিতে। অনেক বড় বড় আশার কথা সে শুনেচে, ছেলে-ছোকরারা কত মিটিং করে, বক্তৃতা দেয়। গান্ধীজীর ছবিতে মালা দিয়ে গান করতে করতে শহর ঘুরে বেড়ালো এই তো সেদিন। তাঁর মৃত্যুর পরে সেদিন এক বৎসর বুঝি ঘুরলো। সুরেশও চমৎকার গান গাইতে পারে। আর একটা গান গায় সুরেশ, গান্ধীজী নাকি বড় ভালবাসতেন। সবাই বলে, রামধুন গান।

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিতপাবন সীতারাম।

ভোরের আলো বেশ ফুটেচে। সামনের পুরোনো কোঠাবাড়ীটা থেকে একজন বার হয়ে এসে পথের ওপর দাঁড়িয়ে ওদের গরুর গাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখলে। ননীবালা চুপি চুপি বললে—ও সুরেশ, ওই বোধ হয় তোর বিনোদ কাকা, ওঁর খুড়তুতো ভাই। আমি চিনিচি। তুই এগিয়ে যা। পরিচয় দিয়ে প্রণাম করবি। ওঁকেই চিঠি দেওয়া হয়েছিল।

মিনিট পনেরো কেটে গেল উভয়ের কথাবার্তায়। সুরেশ আর তার বিনোদ কাকার। তারপর বিনোদ কাকা এগিয়ে এসে ননীবালাকে আদর করে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন।

বহুদিন পরে গ্রামের বৌ গ্রামে ফিরে এসেচে। আজ কুড়ি একুশ বছর পরে। গ্রামের বৌ-ঝি দেখা করতে এল এপাড়া ওপাড়া থেকে। অভয় নাপিতের বৌ এসে বললে—ও বৌ, কেমন আছ? খোকা কই? কতবড়ডা হয়েচে দেখি? দাঁড়াও, একটু পায়ের ধুলো দ্যাও দিদি আগে।

তারপর দুই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে সে সামনে বসলো।

অভয়ের বৌকে দেখে ননীবালা যেমন আশ্চর্য হয়ে গেল তেমনি মনে মনে কেমন এক ধরনের দুঃখও হোল। অভয়ের বৌ তার চেয়ে অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশ বছরের বড়, তার মার বয়সী, চুল অর্ধেক পেকে গিয়েছে—শুধু দাঁত ভাল আছে বলে অত বয়েস বোঝা যায় না—কিন্তু অভয়ের বৌ এখনো সধবা। পাকা চুলে সিঁদুর পরচে। অভয় নাপিত এখনো বেঁচে থাকবে সেটা ভেবে দেখলে এমন কিছু আশ্চর্যের কথা নয়, বড় জোর সত্তর-বাহাত্তর না হয় তার বয়েস হয়েছে—কিন্তু—

এ 'কিন্তু'র কোন সান্ত্বনা ননীবালা মনের মধ্যে খুঁজে পেলে না। ওঁর কি মরবার বয়েস হয়েছিল? পরদিন সে দেখলে, শুধু অভয় নাপিতের বৌ নয়, তার চেয়ে অনেক বড় বয়েসে বৌ এখনো দিব্যি সিঁদুর পরছে পাকা আধপাকা চুলে। কেন চলে গেলেন অল্প বয়সে ওদের বিদেশে ভাসিয়ে? গ্রামের মেয়েরা যখন দেখা করতে আসে, তখন বার বার ওই কথাটাই মনে হয় ওর।

ননীবালার শ্বশুরবাড়ী বিনোদ কাকাদের বাড়ীর দক্ষিণ গায়ে। কুড়ি-একুশ বছর ধরে সে বাড়ীতে কেউ না থাকায় উঠোনে একগলা নোনা, ভাঁট, সেঁউতি লতার জঙ্গল. জংলী ডুমুরের বড় গাছে ডুমুর ফলচে পাঁচিলের মাথায়. জানলায় কাঁটালতা উঠে জানালার কবাট ঢেকে ফেলেচে।

সুরেশ কেবলই বলছিল, মা, আমাদের নিজের বাড়ীতে চলো গিয়ে। গ্রামে এসে পরের

বাড়ীতে থাকবো কেন? আজ তিন-চার দিনে জঙ্গল কাটিয়ে উঠোন পরিষ্কার করে তবে ননীবালা নিজেদের ভিটেতে ঢুকলো।

মাত্র তিনখানা ঘর, দুটো বারান্দা দুদিকে, ভাঁড়ার-রান্নাঘর আলাদা। কতকাল পরে আবার এ ভিটের মাটিতে সে পা দিল? দীর্ঘ একুশ বছর। এতও তার জীবনে ঘটবার ছিল।

সুরেশ বলে—কই মা, আমার তো কিছু মনে নেই এ বাড়ীতে থাকবার কথা?

ননীবালা বলে—দূর, তোর বয়েস যখন ন মাস, তখন এবাড়ী ছেড়ে আমরা চলে যাই যে।

—এখন এখানে কিছুদিন থাকো মা। আমার বড্ড ভালো লাগচে।

—থাকতেই তো এলাম। এখন মা মঙ্গলচণ্ডী যা করেন।

ননীবালা সারাদিন ঘর ঝাড়ে পোঁছে সাজায়। আজ একুশ বছরের ধুলোর স্তর পড়েচে ঘরখানার ওপর। কেবলই ওর মনে পড়চে আজকাল ওদের বিবাহিত জীবনের সেই মধুমাখা দিনগুলি—নববধূর নতুন স্বপ্ন মাখানো অপূর্ব রাত্রি ও দিনগুলি। উনি তখন একেবারে তরুণ, সে চোদ্দ বছরের কিশোরী।

ওই তো সেই কুলুঙ্গিটা। ওটাতে উনি একদিন রসগোল্লা এনে লুকিয়ে রেখে মজা করেছিলেন। একটা বিলিতি ওষুধের কাগজের বাক্সের মধ্যে রসগোল্লা ছিল লুকোনো। উনি বলেছিলেন—কি বলো তো ওতে?

প্রগল্ভ নববধূ বলেছিল—তোমার জিনিস তুমিই জানো। ও তো একটা বিলিতি ওষুধ।

—বাজী ফেলবে?

—অত শত আমি বুঝি নে। কি ওতে?

—রসগোল্লা।

—হাতী।

—গা ছুঁয়ে বলচি। এই দ্যাখো—ক'টা খাবে বলো।

তারপর দুজনে কাড়াকাড়ি করে সেই রসগোল্লা খেয়েছিল—ত্রিশ বছর আগের কথা। মনে হচ্চে কাল ঘটেচে। এখানে এসে বড্ড বেশি করে স্বামীর কথা মনে পড়চে ননীবালার। সব ঘরে, সব বারান্দায়। প্রতি কোণে, ওই রান্নাঘরের খেতে বসবার বড় কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি-খানায় ওর নববধূজীবনের স্মৃতি মাখানো তরুণ স্বামী সেখানে ঘুরচেন এঘরে ওঘরে। ও নিজে সেখানে ব্রীড়ানম্র কুণ্ঠিতা কিশোরী বধূ, নতুন প্রেমের স্পর্শে দুরুদুরু বুক নিয়ে আলতাপরা পায়ে এঘরে ওঘরে গৃহকাজ করে বেড়াচ্ছে নবীন উৎসাহ নিয়ে!

ননীবালার মনে হচ্চে যেন ওঘরে গেলেই দেখবে তিনি বসে আছেন তক্তপোশে আবার ওঘরে থাকলে মনে হয় বুঝি এঘরে এলেই দেখা পাবে। আগেকার দিনের মত লুকোচুরি খেলা এখনো কি চলচে?

একবার উনি নতুন ধানের শিষ নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন—লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রেখে দাও। নতুন জমির নতুন ধান। শাঁখ বাজাও, তুমি ঘরের লক্ষ্মী, শাঁখ বাজিয়ে অভ্যর্থনা করা নিয়ম তোমার।

ঠিক দুপুরের গম্ গম্ রোদে অলস নিমফুলের গন্ধের মধ্যে কতকাল আগের তার কথাই মনে পড়ে। ননীবালা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে বাঁশঝাড়ের ঘন ডালের দিকে, কিন্তু মন তখন অতীত দিনের কোন্ আবেশাতুর মুহূর্তটিতে স্থিরনিবদ্ধ। হয়তো সে সময় ছেলে সুরেশ বলে ওঠে—মা, একটু খাবার জল দাও না। ননীবালা চমকে ওঠে ধ্যান ভেঙে, লজ্জা পায় পাছে ছেলে কিছু বুঝে ফেলে। ছেলেকে জল দিয়ে হয়তো কাঁথা সেলাই করতে বসে গেল, কিংবা নতুন-পাড়া তেঁতুলের রাশ বঁটি পেতে কাটতে আরম্ভ করে দিলে।

অমনি মনে পড়ে যায় সেই সব দিনে এমন চৈত্রের দুপুরে—

বাড়ীর পেছনের গাছের তেঁতুলের রাশ এমনি কাটতে বসেছিল একদিন—

উনি পেছন থেকে এসে চুপিচুপি বললেন—তেঁতুল কাটা রাখো। নুন দিয়ে নেবুপাতা দিয়ে তেঁতুল জরাও দিকি বেশ করে?

—চুপ। মা টের পাবেন। পালাও তুমি। তেঁতুল খেলে জ্বর হয়।

—ইস্! উনি যেন আর খাবেন না, একলা আমি খাবো কিনা? মা ঘুমুচ্চে। তুমি তাড়াতাড়ি ওঠো তো লক্ষ্মীটি। জিভে জল আসচে না তেঁতুলের নাম! সত্যি কথা বলো।

ননীবালাকে উঠে যেতে হয় কাটা তেঁতুল নিয়ে রান্নাঘরের দিকে। উনি বলেন—দাঁড়াও, আমি নেবুপাতা নিয়ে আসচি। তেঁতুলগুলো একটু ধুয়ে নিও, বড্ড বালি কিচ্ কিচ্ করবে নইলে—

ননীবালা ধমকের সুরে বলে—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সদ্দারি করতে হবে না। তেঁতুল ধুয়ে কেউ জরায় না। জিগ্যেস্ করো গিয়ে। পান্সে হয়ে যায়।

দুজনে কাড়াকাড়ি করে সেই একতাল জরানো তেঁতুল খেয়ে ফেলে। পরদিনই ওঁর সর্দি আর গলাব্যথা, ননীবালা আঙুল তুলে কৌতুকের সুরে বলে—কেমন? বলেছিলাম না? কথা শোনা হোল? আমার কথা শোনা হবে কেন? আমি কি আর কেউ?

—মাকে যেন কোনো কথা বোলো না—

—ঠিক বলে দেবো। চালাকি বার করে দেবো, দেখো। আর একটু তেঁতুল চলবে? নিয়ে আসবো নুন নেবুপাতা দিয়ে?

ননীবালার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে আঁচল দিয়ে, ছেলে পাছে টের পায়। আজ যদি তিনি থাকতেন! মরার বয়েস হয়নি তো। অনায়াসেই থাকতে পারতেন। আজ কি সুখেরই দিন তা হোলে। খোকা এত বড় হয়েছে। যে দেখে সেই ভালো বলে। দুদিন পরে মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় রেলে ভালো চাকরি করবে। উনি পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খান না কেন! আমরা তাঁকে কাজ করতে দিতাম না। আরাম করে খান না ছেলের রোজগার। এই দুপুরে বসে বসে কত গল্প করতাম দুজনে। ছেলের বৌ সেবা করতো, তেঁতুল জরিয়ে নিয়ে আসতো।

পৃথিবীর পথে সে যেন একা।

সঙ্গী চলে গিয়েচে তাকে ফেলে।

দীর্ঘ পথ সামনে দূর থেকে দূরে বিস্তৃত। কে জানে কতদিন চলতে হবে এই টানা পথ বেয়ে?

না না, তার খোকা, তার সুরেশ আছে। বেঁচে থাক সে। তার ঘরকন্না গুছিয়ে দিতে হবে না? আজ বাদে কাল সুরেশের বিয়ে দিতে হবে। ছেলেমানুষ ওরা, সংসারের কি জানে। তাকেই গুছিয়ে দিতে হবে সব।

সুরেশ এসে বলে—মা, একটু তেঁতুল জরাও না? নুন দিয়ে, নেবুপাতা দিয়ে।

ননীবালা চমকে উঠে ছেলের তরুণ মুখের দিকে চেয়ে থাকে অবাক হয়ে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে চোখের জল রোধ করলে।

ছেলে কি করে জানলে তার বাবা অবিকল এমনি সুরে, এমনি টান দিয়ে কথা বলতো?

গ্রামে ফিরে আসা পর্যন্ত ওঁর প্রতি পদক্ষেপ যেন সে শুনতে পায়। কি জানি, কিছুই যেন ভাল লাগে না। সব যেন ফাঁকা, অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। কোন কাজে আর উৎসাহ নেই।

একদিন ওপাড়ার হরিদাস চক্কত্তির বাড়ী সত্যনারাণের পুঁথি শোনা ও প্রসাদ খাওয়ার নিমন্ত্রণ সে পাড়ার ঝি-বৌদের সঙ্গে গেল। সেকেলে কোঠাবাড়ী, দালানে পুজোর জায়গা হয়েচে, মাদুর পেতে দেওয়া হয়েচে নিমন্ত্রিতা মেয়েদের জন্যে। পুরুষেরা বসেচে বাইরের রোয়াকে। পূর্ণিমার রাত্রে উঠোনের বড় নারকোল গাছগুলোর ছায়া পড়েচে রোয়াকে। সদ্য-তোলা যুঁই ফুলের সুগন্ধ ভুরভুর করচে পুজোর বারান্দা।

হরিদাস চক্কত্তির বৌ বললেন—এসো এসো ভাই। কতদিন গাঁয়ে আস নি, সেই একবার এসেছিলে অনন্তচতুর্দশীর ব্রত উদ্‌যাপনের সময়, মনে পড়ে?

ননীবালা বললে—খুব মনে পড়ে।

—তখন তোমার নতুন দু'এক বছর বিয়ে হয়েচে।

—দু'বছর হবে।

—চেহারা আগের চেয়ে খারাপ হয়ে গিয়েচে।

—আর চেহারা দিদি! কি দরকার আমাদের চেহারায় বলুন। সে পাট তো ঘুচে গিয়েচে।

—আহা হা, সে আর বোলো না ভাই। ঠাকুরপো তো ছেলেমানুষ। আমাদের ওঁদের চেয়ে কত ছোট। তার কি এখন যাবার বয়েস হয়েছিল? সবই অদেষ্ট! কি বলবো বলো।

ননীবালার দু'চোখ ততক্ষণ জলে ভরে গিয়েচে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল, নয়তো জল গড়িয়ে পড়বে গাল বেয়ে। সে একটা লজ্জার কথা এদের সামনে। তার মনে যে কি অভাব, সে কথা এরা কেউ বুঝবে না। সে মধুর অনুভূতির স্মৃতি এদের জীবনে পুঁজি নেই। স্থূল জীবনযাত্রা চালিয়ে যায় রান্নাবাড়া করে, খাইয়ে, ঘরকন্না গেরস্থালি করে। তার মনের সে অনুভূতির ধারণাই নেই এদের। চোখের জল দেখে ভাববে ঢং করে কাঁদচে লোক দেখানোর জন্যে।

পাশের বাড়ীর কানাই গাঙ্গুলির পুত্রবধূ এসে বসলো ওর পাশে। ওর সঙ্গে আলাপ করে ফেললে। অল্পদিন বিয়ে হয়েচে, একটি মাত্র মেয়ে, ন'মাস বয়েস। বাপের বাড়ী শান্তিপুরের কাছে হবিবপুর। বেশ শহুরে টান কথাবার্তায়। ওকে বললে—কাকীমা, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবো ভাবচি আজ ক'দিনই।

—আমার কথা কে বললে তোমায়?

—সবাই বলে। আমার পিসশাশুড়ী বলছিলেন, বড় ভালো বৌ ছিল এ গাঁয়ের। গিয়ে দেখা করে এসো বৌমা। আপনার নাম কি কাকীমা?

—ননীবালা। তোমার?

—প্রীতিলতা।

—বেশ নামটি। খুকির নাম কি?

—এখনো কিছু রাখি নি। ডাকনাম টুলু। আপনার কাছে যাবো এখন। একটা নাম ঠিক করে দেবেন এখন আপনার নাতনীর!

—দেবো না কেন বৌমা, কালই যেও। গান কর নাকি?

—গাই। সে তেমন কিছু না। আপনার মুখে শুনবো। এইমাত্র ওরা বলছিল আপনি ভালো গান জানেন।

—আমি? আমার গানের পাট তো চুকে গিয়েচে মা। আবার—

নাঃ, যখন তখন চোখে জল এসে বড় অপ্রতিভ করে দেয় এইসব ছেলেমানুষ ঝি-বৌয়ের সামনে! তার কি এখন চোখ পানসে করে কাঁদবার বয়েস? সে না গিন্নীবান্নি? ছেলের মা?

প্রীতিলতা মেয়েটি বেশ দেখতে, কত আর বয়েস হবে, আঠারোর বেশী নয়। ননীবালা সামলে নিয়ে বললে—যেও বৌমা। তোমাদেরই মুখের দিকে চেয়ে তো আবার এ গাঁয়ের মাটিতে পা দিলাম। যাবে বৈকি।

সব বেশ ভালভাবেই চলছিল, এমন সময় আর একটি ওর সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে দেখা হোল, তার নাম কনক, এ পাড়ার কোনো এক বাড়ীর মেয়ে, বোধ হয় উপেন ভট্চাজের মেয়ে। কনক ছুটে এসে ওর হাত দুখানা চেপে ধরে বললে—মনে পড়ে বৌদি? মনে পড়ে?

একে খুবই মনে পড়ে। স্বামীর ঘরে প্রথম প্রথম যাবার সময় এই মেয়েটি আর রায়চৌধুরী পাড়ার সুবাসিনী এই দুজনে কি অসাধারণ ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই তাদের রুদ্ধ দুয়ারের বাইরে আড়ি পেতে বসে থাকত রাত দুপুর পর্যন্ত।

একদিন—না, সে সব কথা এখন মনেই চাপা থাক।

যুঁইফুলের গন্ধেভরা দীর্ঘবিলম্বিত তাদের পুরনো বাতাস কোন্ দিগন্তে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এসব পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের জ্ঞানকাণ্ড বোধহয় একটু কম। নইলে সে যেটা প্রাণপণে চাপা দিতে চাইচে, ওরা সেটা খুঁচিয়ে তুলতে চাইবে কেন? একটা সাধারণ বুদ্ধিও তো আছে! কনক সামনে এলেই মনে পড়ে সে সব মাধবী-রাত্রির টাটকা যুঁই চাঁপার গন্ধ।

কেন এরা সামনে আসে? কেন এরা সামনে আসে? ননীবালা মুখে অতি কষ্টে হাসি টেনে বললে—হ্যাঁ ভাই, কনক ঠাকুরঝি। ভালো?

—ভালো। তুমি?

—দেখতেই পাচ্ছ।

—তা তো দেখচি। আহা, মনে পড়লে বুক ফেটে যায়। সেদিনের কথা! সেই রাত্রে দাদা আমার মুখে খড়িগোলা মাখিয়ে দিলে আড়ি পাতবার জন্যে, মনে পড়ে?

না, এদের যেন আর কোনো কথা নেই আজকার দিনে। ননীবালা চুপ করে রইল দেখে কনক বোধ হয় কিছু অপ্রতিভ হোল। সেও চুপ করে গেল।

খুব লোকজনের ভিড়। দালানের মধ্যে মেয়েদের প্রসাদ খাবার পাতা সাজিয়ে দেওয়া হোল। ননীবালা এবং অন্যান্য মেয়েরা সেখানেই বসলো। সত্যনারাণের পুঁথি পড়া আরম্ভ হোল।

খানিক পরে সেখানে একজন বৃদ্ধ লাঠি হাতে এসে দাঁড়ালা। বৃদ্ধের বাঁ হাতে একটা বাটি। বৃদ্ধ এসে বললে—পুজো হয়নি?

হরিদাস চক্কবত্তির ছেলে বললে—না। আসুন জ্যাঠামশায়। বসুন—

—মেয়েদের মধ্যে আর বসব না। যাই বাইরে। কত দেরি হবে?

—বেশি দেরি হবে না জ্যাঠামশায়।

—আবার বাড়ী গিয়ে রুটি করতে হবে, তবে খাবো। বেশি রাত্তির না হয়।

ননীবালা পাশের কাউকে জিগ্যেস করলে—উনি কে ভাই?

সে বললে—চাটুয্যে বুড়ো। ছেলেরা মস্ত রোজগেরে, কলকাতায় থাকে। বুড়ো বাবা এখানে পড়ে আছে, খোঁজও নেয় না।

—বৌ বেঁচে নেই বোধ হয়!

—খুব আছে। ছেলেদের কাছে কলকাতায় থাকে।

—ইনি যান না কেন ছেলেদের কাছে?

—তা কি জানি দিদি। তা বলতে পারিনে। এখানে থাকে, তাই তো দেখি। আর তুমিও যেমন! নিজের খবরই রাখতে পারি নে, তার আবার পরের খবর নিতে যাচ্চি।

রাত অনেক হয়ে গেল পুজো ও পুঁথি-পড়া শেষ হতে। ননীবালা যখন ছেলের সঙ্গে বাড়ী যায়, তখন দেখতে পেলে সেই বৃদ্ধ ওদের আগে আগে চলেচেন লাঠি ঠকঠক করতে করতে। ওদের দেখে বললেন—কে যায়? তোমাদের তো বাবা চিনতে পারলাম না।

সুরেশের পরিচয় পেয়ে বড় খুশি হোলেন। তাকে কত আশীর্বাদ করলেন, ননীবালাকে বললেন—তোমার বিয়ের পর একবার বৌমা তোমায় দেখেছিলাম—বিয়ের বৌভাতের দিন। যেও আমাদের বাড়ী, কেমন? কালই যেও।

পরদিন বিকেলে ননীবালা চাটুয্যে বুড়োর বাড়ী গেল। সামনে বারান্দাওয়ালা সেকেলে কোঠাবাড়ী, একদিকে ডুমুর গাছ অন্যদিকে একটা বাতাবিনেবুর গাছ—উঠোনের পূর্বদিকে একটা পেঁপে গাছে অনেকগুলো পেঁপে ধরেছে।

বুড়ো বললে—কি দেখচো বৌমা, ও সব আমার নিজের হাতে করা। সবাইপুরের বিশ্বেসদের বাড়ী থেকে বীজ আনিয়েছিলাম আজ ন' বছর আগে। সেই গাছ। তখন ওরা সব এখানে ছিল।

ননীবালা বললে—ওরা কারা জ্যাঠামশাই?

—তোমার জেঠিমা।

—আপনাকে এখানে রেঁধে দেয় কে?

—নিজেই। খুব ভালো রাঁধতে পারি। এই এখন বসে পরোটা করবো।

—জেঠিমা থাকেন না এখানে?

—না মা। ওরা বড় ছেলের কাছে থাকে কলকাতায়।

—ক'ছেলে আপনার?

—তিনটি। তা নিজের মুখে বলতে নেই, তিন ছেলে ভালো চাকুরিই করে।

শ্যামবাজারে তেতলা বাসা। ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান। বড় ছেলের মোটর গাড়ী। দশে মানে, দশে চেনে। চাটুয্যে সায়েব বললে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের একডাকে সকলে চেনে। চেহারাও একেবারে সায়েব—নিজের ছেলে বলে বলচি তা ভেবো না—

বৃদ্ধের মুখে-চোখে গর্বের ভাব অতি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। নিজের মনে আপনা-আপনি হেসে উঠে বললে—জন্মাবার পরে এতটুকু ছিল। ওর মা ফুলে-নবলার পাঁচু ঠাকুরের দোর ধরে তবে ওই ছেলে বাঁচায়! ছ'বছর বয়েসে কাঁকড়াবিছের কামড়ে ছেলে নীলবর্ণ হয়ে মরে যাবার যোগাড় হয়েছিল। কাঁটানটের শেকড় বেটে খাইয়ে জলপড়া দিয়ে তেলপড়া দিয়ে সে যাত্রা অতিকষ্টে রক্ষা হয়। তবে আজ আমাদের নৃপেন—তা এসো, বোসো বৌমা। এই পরোটা কখানা ভাজি আর তোমার সঙ্গে গল্প করি।

একটা ক্ষুদ্র ভাঁড়, চেঁচে-মুছে ঘি বেরুলো আধ-ছটাক খানেক।

বৃদ্ধ ভাঁড় দেখিয়ে বললে—দালদা। ভালো দালদা। আর তা ছাড়া পাচ্ছি কোথায়? শ্রীঘি আট টাকা সের।

—কেন, আপনার ছেলে টাকা পাঠায় না?

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—নৃপেন? তার অনেক খরচ। রোজগারও যেমনি, খরচও তেমনি। আমি আর তাকে বিরক্ত করিনে। আমার বিঘে তিনেক ধানের জমি আছে, আর ধরো লাউ করি, কুমড়ো করি, ঢেঁড়স, ডাঁটা—সবই তৈরি করি নিজের হাতে। বেশ চলে যাচ্ছে। নৃপেন পুজোর সময় একখানা ভালো থান কাপড় পাঠিয়ে দিয়েচে। ফাইন থান—তা বৌমা সে আমি তুলে রেখে দিয়েছি। বার বার দেখি, বলি বড় খোকা আমায় দিয়েচে। ছোট ছেলের বাসা আগে ছিল কলকাতায়—এখন মনিপুরে। সে একজোড়া চটিজুতো পাঠিয়ে দিয়েছিল পুজোর সময়।

ননীবালা ইতিমধ্যে পরোটা কখানা বেলে দিয়ে বললে—আপনি ভেজে নেবেন, না আমি দেবো?

—না মা, আমিই নিচ্ছি।

—কেন কষ্ট করবেন? সরুন। আমি করে দিচ্ছি।

ননীবালা খাবার তৈরী করে দুধ জ্বাল দিয়ে পিঁড়ি পেতে বৃদ্ধকে যত্ন করে খেতে বসিয়ে দিলে। চাটুয্যে বুড়োর মুখের ভাব দেখে মনে হলো অনেকদিন তাকে এমন যত্ন করে কেউ খাবার করে খাওয়ায় নি।

বুড়ো বললে—কি সুন্দর পরোটা হয়েছে! মেয়েমানুষ না হোলে কি খেয়ে তৃপ্তি? মেয়েদের হাতের রান্নাই আলাদা! বেঁচে থাকো বৌমা বেঁচে থাকো। মুখ বদলালাম অনেকদিন পরে।

—আপনার ছেলেদের বৌ কেউ এখানে থাকে না কেন?

—না না। পাগল! তাদের কি এই অজ পাড়াগাঁয়ে থাকতে বলতে পারি? তুমি জানো না, এসব অশিক্ষিত স্থানে তাদের আমি আসতে বলতে পারি না। তাদের মন টেঁকে এখানে? গরীব ছিলাম নিজে বটে কিন্তু ছেলেদের মানুষ করে দিয়েছি কষ্ট-দুঃখ করে। বিয়েও দিয়েছি তেমনি ঘরে। বড় বৌমার বাবা মতিহারিতে সিভিল সার্জন। মেজ বৌমার বাবা নেই, মামারা খিদিরপুরে বড় কনট্রাকটর, রায় চৌধুরী কোম্পানীর নাম শুনেছ? সেই রায় চৌধুরী কোম্পানী। ছোট বৌমার বাবা এখন বাঁকড়োর সদর এস. ডি. ও.। বড় বৌমা ম্যাট্রিক পাশ। ছোট বৌমা বি এ পর্যন্ত পড়েছিলেন, পরীক্ষা দেন নি। ইংরিজি বলেন কি? আড়াল থেকে শুনেচি—যেন মেমসাহেব! হুঁ হুঁ বৌমা—এসব গল্পকথা এখান থেকে শোনাবে। নিজের চোখে না দেখলে—

—তাঁরা কখনো এখানে আসেন নি?

—বড় বৌমা এসেছিলেন একবার পুজোর সময়, যেবার আমার বড় নাতির ভাত হয়। প্রথম ছেলের ভাত এখান থেকেই হয়েছিল কিনা! সে আজ বিশ বছর আগের কথা। সে নাতি এবার ডাক্তারি পড়ছে মেডিকেল কলেজে। ওর পরে দুই মেয়ে, তারা ইস্কুলে পড়ে। এইবার ম্যাট্রিক দিয়েছে একটি। ছোট বৌমাকে নিয়ে আমার ছোট খোকা এসেছিল সেবার

মোটরে করে, ঘণ্টা চার-পাঁচ ছিল সবাই। আমি অনেকদিন দেখি নি কিনা, তাই চিঠি লিখেছিলাম। চিঠি পেয়ে বৌ নিয়ে দেখা করতে এসেছিল। ছোট বৌমা এসে শুধু ডাব আর চা খেয়েছিলেন—পাড়াগাঁয়ের জল খেলেই ম্যালেরিয়া হবে। তাদের অবস্থা ভালো, শিক্ষিত, সব বোঝে তো। রাত কাটালো না এখানে। কোথায় বা শুতে দিতাম, না বিছানা, না মশারি। নিজে শুই একটা ছেঁড়া মশারি টাঙিয়ে। সারারাত মশা কামড়ায়, নিজে ভালো দেখতে পাই নে চোখে যে সেলাই করবো।

—আমি কাল আপনার মশারি সেলাই করে দিয়ে যাবো জ্যাঠামশাই।

—তা বেশ। এসো বৌমা। একটু গুড় সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারো? খাবার ইচ্ছে হয়, এ বছর কিনতে পারি নি। বড্ড দাম। পরোটা দিয়ে খেজুরের গুড় লাগে বড় ভালো।

খাওয়া শেষ করে চাটুয্যে বুড়ো তামাক সাজতে বসলো। ননীবালা চলে এল। তার মনে সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাব।

সুরেশকে সে খেতে দিলে। সুরেশ বললে—বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে মা, এখানে বোসো।

ননীবালা বললে—তাঁকে তোর মনে পড়ে?

—খুব। আমায় নামতা পড়াতেন রোজ সকালে উঠে। বাবা যদি আজ থাকতেন!

সুরেশের গলার স্বর ভাঙা, আবেগে আড়ষ্ট।

ননীবালা ভাবলে, এই ভালো, এই ভালো। খোকা আজ তোমার নাম করচে, তুমি নেই বলে। ওর চোখের জলে তোমার স্মৃতি সার্থক হোক। বেঁচে থাকো মানে-মানে খোকার মনে। মন শুকিয়ে যায়, তুমি বেঁচে থাকলে হয়তো চাটুয্যে জ্যাঠামশায়ের মত তোমাকেও অবহেলা পেতে হোত। ভালোই হয়েচে তুমি মানে-মানে চলে গিয়েচো।

বিক্রমখোল

সেদিন ছিল রবিবার। হাতে কোনো কাজকর্ম ছিল না। স্নান সারিয়া বারান্দার রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতেছিলাম, এমন সময় একটা সংবাদ চোখে পড়িল। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ঝার্সাগুড়া স্টেশনের নিকটবর্তী এক পাহাড়ের গুহায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা দেখিয়া বলিয়াছেন ওটার বয়স অন্ততঃ চারি হাজার বৎসর। নিকটেই আর একটা গিরিগুহার প্রাগৈতিহাসিক মানবের আঁকা ছবিও নাকি আছে।

অনেকদিন কোথাও যাই নাই। একঘেয়ে কলিকাতার কর্মক্লান্ত, বৈচিত্র্যহীন জীবন আর ভাল লাগিতেছিল না; কিন্তু যাই বা কোথায়! মনে মনে ভাবিতেছিলাম, না হয় একদিন শনি-রবিবারে ট্রেনে চাপিয়া ডায়মণ্ডহারবার লাইনে কোথাও বেড়াইয়া আসিব তবুও প্রথম ফাল্গুনে নতুন ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের দল দেখা যাইবে, ফুলে-ভরা শিমুল গাছও দু-দশটা চোখে পড়িবে। আমের বউলের গন্ধ পাওয়াও বিচিত্র নহে। তা ছাড়া কলিকাতায় যা একেবারেই নাই, যার অভাব মনকে সর্বদা পীড়া দেয়, সঙ্কুচিত করিয়া রাখে—ও লাইনে দুধারের দিগন্তপ্রসারী মাঠ ও ঝুঁকিয়া পড়া নীল আকাশে সে অভাবটা পূর্ণ হইবে।

হঠাৎ সেদিন খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে মনে হইল ডায়মণ্ডহারবারে না গিয়া এখানেই কেন যাই না? এদিকটা আমার একেবারেই অজানা, আর কখনো যাই নাই—সম্বলপুরের নাম শুনিয়াছি বটে—সেরকম তো টোকিও, মেক্সিকো ও হাওয়াই দ্বীপের নামও শুনিয়াছি কিন্তু সম্বলপুর কোন্ দিকে, কেমন জায়গা, প্রাকৃতিক দৃশ্য কেমন—। এসব দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে আমার কাছে বলিভিয়া ও সম্বলপুর একই পর্যায়ভুক্ত। তাছাড়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের আঁকা ছবি বা তাদের খোদিত শিলালিপি—নির্জন জঙ্গল ও পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে চার হাজার বৎসর আগে! বেদের মন্ত্র তখন মুখে মুখে রচিত

হইতেছে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী সমতল ভূভাগে আর্য সভ্যতা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছে—এত সুপ্রাচীন অতীত দিনের সম্পর্কবিজড়িত স্থানে এই বসন্তের আরণ্য-শোভার আবেষ্টনীর মধ্যে দু-একদিন কাটাইয়া আসা—কলিকাতার ট্যাক্সি ও ট্রামের শব্দমুখর রাজপথের ধারের বাসায় বসিয়া সেকথা ভাবিতেও মন কেমন মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িল।

ঠিক করিলাম যাইতে হইবেই, তবে একা গিয়া সুখ নাই, দু-একজন বন্ধুবান্ধবকে দলে টানিতে হইবে। কয়েকজন বন্ধু যাইতে সম্মতও হইলেন। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া ৫ই মার্চ, শুক্রবার রাত্রের নাগপুর প্যাসেঞ্জারে আমরা হাওড়া স্টেশন হইতে রওনা হইলাম।

যাঁহারা পাহাড় ও জঙ্গল দেখিতে ভালবাসেন এবং যাঁহারা ইতিপূর্বে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথে বেশী দূর যান নাই, তাঁহাদের একবার এ পথে অন্ততঃ বিলাসপুর যাইতে অনুরোধ করি। এরূপ অপূর্ব আরণ্যশোভা ঈ-আই-আর-এ দেখা যাইবে না—এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারা যায়। আমি মধুপুর হইতে কিউল ও গোমো হইতে গয়ার কথা তুলিতেই না, সারা লুপ লাইনেও অন্ততঃ বার পনেরো বেড়াইয়াছি, তবুও বলি বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের গৈলকেরা হইতে (২৮৭ মাইল) বিলাসপুর পর্যন্ত দু-ধারের জনহীন ঘন অরণ্য ও ধূসর শৈলমালার দৃশ্য অতুলনীয়, বিশেষতঃ এই প্রথম বসন্তে, যখন বনে বনে বিকশিত বন্য-পুষ্পের অপূর্ব বর্ণবৈচিত্র্য, শাখায় শাখায় নব কিশলয়, আকাশ সুনীল, বাতাসে রৌদ্রতপ্ত ধরণীর দেহ-সৌরভ—যখন বড় বড় আঁক-বাঁকা অর্ধশুষ্ক পাহাড়ী নদী গৈরিক বালুরাশির উপর যেন বন্য অজগরের মতো অলসভাবে পড়িয়া রোদ পোহায়, আর্দ্রতাহীন নৈশ আকাশে নক্ষত্ররাজি লক্ষ লক্ষ হীরকখণ্ডের মতো জ্বলিতে থাকে, দিনে সামান্য গরম কিন্তু রাত্রির বাতাসে আরামদায়ক শৈত্য—আমার মনে হয় পশ্চিম উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের ঐ সব অঞ্চল ভ্রমণ করিবার পক্ষে ফাল্গুন-চৈত্র মাসই প্রশস্ত সময়।

বেলপাহাড় স্টেশনে (৩৮৭ মাইল) আমরা পৌঁছিলাম পরদিন বেলা দুইটার সময়। রাত্রে স্টেশনের নিকটবর্তী সোমড়া গ্রামের ডাকবাংলায় বিশ্রাম করিয়া পরদিন সকালে আমরা বিক্রমখোল রওনা হইলাম। পথে গ্রিন্ডোলা নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম পড়ে, সেখান হইতে আমরা দু-তিনজন স্থানীয় লোককে পথ দেখাইবার জন্য সঙ্গে পাইলাম। বিক্রমখোল পৌঁছিতে বেলা প্রায় একটা বাজিয়া গেল। এস্থানের কাছাকাছি কোথাও লোকালয় নাই—গভীর অরণ্যের মধ্যে যে পাহাড়ের গুহায় শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে গুহাটির নাম বিক্রমখোল। স্থানটির দৃশ্য সত্যই অপূর্ব—তবে যে পূর্বে খবরের কাগজে বিবরণ পড়িয়া ভাবিয়াছিলাম বিক্রমখোলের চারিপাশের বনে দলে দলে বন্যহরিণ বিচরণ করিতে দেখিব বা দিনে-দুপুরে বাঘকে বনের পথে ওৎ পাতিয়া থাকিতে দেখা যাইবে ইত্যাদি—গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া সে সব কিছু দেখিতে না পাইয়া বোধ হয় বা নিরাশ হইয়া থাকিব।

দৈর্ঘ্যে ২ ফিট ও প্রস্থে প্রায় ৩৬ফিট পরিমিত স্থান জুড়িয়া এই লিপিটি কঠিন প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ। এই লেখে যে অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে তাহার বয়স ৪০০০ বৎসর। প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত জয়সোয়াল বলেন, ইহা মোহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত অক্ষর ও অশোকানুশাসনের ব্রাহ্মী অক্ষরের মাঝামাঝি সময়ের—যদিও এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ বর্তমান। যাহা হউক সে সকল বিচার করিবেন বিশেষজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা—লেখের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনধিকার চর্চা করা আমাদের অভিপ্রেত নয়। আমাদের সঙ্গী শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী বিক্রমখোল লিপি ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী অরণ্যের কয়খানি ফটো তুলিয়াছিলেন। স্থানটির অবস্থান ফটো তুলিবার অনুকূল নহে বলিয়া ফটোগুলি আশানুরূপ হয় নাই।

বিক্রমখোল শিলালেখের বয়স ও প্রকৃতি যাহাই কেন হউক না আমার বক্তব্য এই যে, সম্মুখে ইস্টারের ছুটি আসিতেছে—যাঁহারা বিদেশে বেড়াইতে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা গতানুগতিক রাস্তার পথিক না হইয়া যদি পশ্চিম উড়িষ্যার সেই নির্জন বন্যপ্রদেশে একবার

বেড়াইয়া আসেন—তবে তাঁহাদের অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকার বৃথা হইবে না, এ কথা বলিতে মনে কোথাও বাধে না।

কিন্তু যাঁহাদের হাতে প্রচুর অবসর আছে, অথচ যাঁহারা প্রকৃতিকে ভালবাসেন তাঁহাদিগকে যাইতে বলি ইস্টারের ছুটির পূর্বে যে শুক্লপক্ষ শেষ হইয়া যাইবে—সেই সময়ের মধ্যে কোনো একদিন। ফিরিবার পথে তাঁহারা যেন গ্রিণ্ডোলা হইতে ছইবিহীন গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া সন্ধ্যার পর রওনা হন এই আমার বিনীত প্রার্থনা। আমরাও সেখানে গিয়াছিলাম শুক্লা নবমীতে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয়, তাঁহারা এমন কিছু লইয়া ফিরিবেন, যাহার স্মৃতি এই কর্মব্যস্ত জনাকীর্ণ শহরের এই কোলাহলের মধ্যে বহুদিন পর্যন্ত তাঁহাদের অবসর বিনোদন করিবে—এমন কিছু আনন্দ, যাহা আধ্যাত্মিক প্রকৃতি-বিশিষ্ট—যাহার অনুভূতি দশ বৎসর কলিকাতায় বাস করিলেও মিলিত কিনা সন্দেহ—মুক্তরূপা প্রকৃতির ধ্যানমূর্তি বুঝি শুধু ঐ রকম নির্জনে জ্যোৎস্না রাত্রেই মনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়—অন্য সময়ে অন্য অবস্থায় নহে।

অরণ্যে

বেশী দিনের কথা নয়, গত ফাল্গুন মাসের কথা। দোলের ছুটিতে গালুডি বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে বলি যে সিংভূম জেলার এই অঞ্চলে আমি অনেকবার গিয়েচি এবং এখানে আমার কয়েকটি বন্ধু বাড়ীও করেচেন, ছুটি-ছাটাতে গিয়ে কিছুদিন যাপন করবার জন্যে।

গালুডি ক্ষুদ্র গ্রাম, এ থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে দূরে সব দিকেই পাহাড়ের শ্রেণী ও জঙ্গল। দক্ষিণ-পশ্চিম সুবর্ণরেখার ওপারে সিদ্ধেশ্বর ও ধনঝরি শৈলমালা, তার ওদিকে তামাপাহাড় নামে একটি অনুচ্চ পাহাড়? এখানে কয়েক বৎসর পূর্বে একটা তামার খনি ছিল, কোম্পানী ফেল হয়ে যাওয়াতে ঘরবাড়ী, কারখানা, চিমনি, ম্যানেজারের বাংলো সবই পড়ে আছে, মানুষ জন নেই। জায়গাটার নাম রাখা মাইন্‌স। এই নামে একটা ছোট রেল-স্টেশনও আছে দেড় মাইল দূরে। রাখা মাইন্‌স এবং তার আশেপাশে ঘন জঙ্গল ও পাহাড়, মাঝে সাঁওতালী বন্য গ্রাম। এই সব বনে হস্তী আছে, শঙ্খচূড় সাপ আছে, ভাল্লুক তো আছেই। এই জঙ্গলে যখন-তখন চলাফেরা করা বিপজ্জনক, বন্দুক না নিয়ে কখনও যাওয়া উচিত নয়।

এই পরিত্যক্ত নির্জন স্থানে একটা ভগ্নপ্রায় খড়ের বাংলোতে এক মাদ্রাজী কবিরাজ থাকতেন, তাঁর সঙ্গে বেশ আলাপ হয়েছিল। তাঁর মুখে গল্প শুনেচি—কিছুদিন আগে দুই বুনো হাতীর লড়াই হয়েছিল পুরোনো কারখানার কাছে। দুদিন ধরে লড়াই হয়, শেষকালে একটা হাতী মারা যায়। বেশী রাত্রে তাঁর বাংলোর বারান্দায় বাঘ ডাকে, সম্পূর্ণ দিনের আলো না ফুটলে তিনি কখনো বাংলোর বারান্দার দিকের দোর খোলেন না।

আমি ইতিপূর্বে অনেকবার যখন গালুডি গিয়েচি, তখন রাখা মাইন্‌স ও তার আশেপাশের বনে বেড়াতে গিয়েচি একা একা। একা যাওয়ার কারণ প্রথমতঃ তো ওসব বনের মধ্যে স্বাস্থ্যান্বেষী অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত শৌখিন কলকাতার বাবুরা পায়ে হেঁটে যেতে রাজী হ'ন না, দ্বিতীয়তঃ গভীর বনের মধ্যে বেড়ানোর শখও সবার থাকে না—এতে তাঁদের দোষ দেওয়া চলে না অবশ্য। অনেকবার বেড়িয়ে বনের মধ্যে কিছু কিছু জায়গা পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হয় তখন লোকে স্বভাবতই সেখানে একটু অসতর্ক হয়ে পড়ে। আমিও তাই হয়েছিলাম; ওদেশে বনে বেড়াতে হ'লে সাধারণতঃ সকালের দিকে যাওয়াই নিয়ম, বেলা দু'টো তিনটের পর অর্থাৎ পড়ন্ত বেলার দিকে বনের মধ্যে থেকে বার হয়ে লোকালয়ের দিকে আসাই ভালো।

প্রথম প্রথম এ-নিয়ম খুবই মেনে এসেচি। একজন করে সাঁওতাল গাইড্ সঙ্গে না নিয়ে বনে যেতাম না। একবার সিদ্ধেশ্বরডুংরির বলে প্রায় পনরো শ' ফুট উঁচু একটা

পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলাম, সেবারও সঙ্গে ছিল একজন সাঁওতাল ছোকরা। পাহাড়ের ওপর অনেক উঁচুতে বুনো হাতী চারা কেঁদগাছ ভেঙে দিয়েচে, সেই পথপ্রদর্শক সাঁওতাল ছোকরা আমায় দেখায়। চীহড় ফল,—এক রকম বুনো সীমের মত ফল, তার বীজ পুড়িয়ে খেতে ঠিক গোলআলুর মতো—সে-ই পুড়িয়ে খাইয়েছিল পাহাড়ের ওপরকার জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে। পাহাড়ের এক জায়গায় একটি গুহা দেখিয়ে বলেছিল, এ গুহা এখান থেকে সুবর্ণরেখার ওপার পর্যন্ত চলে গিয়েচে।

এ-সব অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। যাঁরা ঘন অরণ্যানী, নির্জন শৈলমালার সৌন্দর্য ভালবাসেন তাঁদের এ সব স্থানে আসা দরকার। বনের মধ্যে মাঝে মাঝে ক্ষীণকায় পার্বত্য নদী—হয়তো হাঁটুখানেক জল ঝিরঝির করে বইচে পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে। দুধারেই জনহীন বনভূমি, কেঁদ পলাশ ও শালের জঙ্গল, ঘন ও প্রস্তরাকীর্ণ, কত বিচিত্র বন্যপুষ্প, বন্য শেফালির বন। বার বার যাতায়াত করতে করতে ভয় ভেঙে গেল। যখন নিজের চোখে কখনও ভাল্লুক দেখলাম না, বা বুনো হাতির তাড়া সহ্য করতে হ'ল না, তখন মনে হ'ল অনর্থক কেন একজন গাইড্ নিয়ে গিয়ে পয়সা খরচ করা! যেতে হয় একাই যাবো।

অর্থব্যয় ছাড়া গাইড্ নিয়ে ঘোরার অন্য অসুবিধাও ছিল। ধরুন, এক জায়গায় চমৎকার বন্য-পুষ্পের শোভা, পাহাড়ের নীল চূড়া সুনীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, নিকটেই ক্ষুদ্র পার্বত্য ঝর্ণার মৃদু কলধ্বনি, বনস্পতিদের শাখায় শাখায় বন্য পাখীর কূজন,—আমার মনে হ'ল এখানে অদূরবর্তী শিলাখণ্ডে পিয়াল গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি, আপন মনে প্রকৃতির এই নিরালা রাজ্যে বসে বনবিহঙ্গ-কাকলী শুনি; কিন্তু গাইড্ দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসতে দেবে না, বলবে, "চলো বাবুজী, চলো, এখনও অনেক পথ বাকি!"—তা ছাড়া সঙ্গে লোক থাকলে মনের সে শান্ত, সমাহিত ভাবও আসে না।

এই সব কারণে ইদানীং একাই বেড়াতে যেতাম বনের মধ্যে। কিন্তু যে ঘটনার কথা এখানে বলবো, তার পূর্বে সুবর্ণরেখার ওপারে দু'তিন মাইল ছাড়া একা খুব বেশী দূরে যাই নি, বড় জোর গিয়েচি সিদ্ধেশ্বর পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশ পর্যন্ত। গিয়েচি, আবার বেলা পড়বার অনেক আগেই সুবর্ণরেখার তীরে ফিরে এসেচি।

দোলের ছুটিতে এবার গালুডি গিয়ে দেখি অপূর্ব নির্মেঘ নীল আকাশ। বনে বনে শাল-মঞ্জরীর সুগন্ধ, নব বসন্তে নতুন কচি-পাতা-ওঠা শাল, কেঁদ, পিয়াল, মহুয়া গাছে গাছে কুঁড়ি দেখা দিয়েচে। বসন্তের বন্যা এসেচে পাহাড়ী ঝর্ণার মতো নেমে—বিচিত্র বর্ণে, বিচিত্র সজ্জায় বনে বনে।

একজন বৃদ্ধা সাঁওতালের মুখে শুনেছিলাম পাঁচ মাইল দূরে বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছোটখাটো জলপ্রপাত আছে—জায়গাটার নাম নিশিঝর্ণা। সেখানে নাকি বন আরও ঘন, পথে এক জায়গায় পুরোনো আমলের একটা দেউল আছে ইত্যাদি। জায়গাটা দেখবার খুব হচ্ছে হ'ল। দোলের আগের দিন বেলা দশটার মধ্যে কিছু খেয়ে নিয়ে জায়গাটার উদ্দেশ্যে বার হয়ে পড়লাম।

শীঘ্রই সুবর্ণরেখা পার হয়ে গিয়ে রাখা মাইন্‌স-এর পথ ধরলাম। মুসাবনী রোড্ যেখানে রাখা মাইন্‌স্-এর চার নম্বর শ্যাফ্‌টের গভীর বনের মধ্যে গালুডির পাকা রাস্তার সঙ্গে মিশেচে—সেখানে পৌঁছুতে বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। তারপর বাঁধা সড়ক ছেড়ে দিয়ে বাঁ দিকে কুলামাড়ো বলে একটা ক্ষুদ্র বন্যগ্রাম পার হয়ে পায়ে-চলা সুঁড়িপথ ধরে ধন্‌ঝরি পাহাড়ের নিচেকার ঘন বনের মধ্যে ঢুকলাম। পথ যে আমার একেবারে অপরিচিত তা নয়, আর বেশীদূর অগ্রসর না হ'লেও কুলামাড়ো গ্রামে সাঁওতালী উৎসবে সাঁওতালী নৃত্য দেখতে এর আগেও একবার এসেচি। সুতরাং আমার মনে দ্বিধা বা ভয় থাকবার কথা নয়, ছিলও না।

কুলামাড়ো পেছনে ফেলে এসেচি, আমার ডাইনে ধন্‌ঝরি পাহাড় সরু বন্য পথের সমান্তরাল ভাবে যেন বরাবর চলেচে উত্তর-দক্ষিণ কোণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে। বন ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে তা বেশ লক্ষ্য করচি। কিছুদূর গিয়ে বাঁ দিক

থেকেও আর একটা শৈল্যশ্রেণী যেন ক্রমশঃ ধন্‌ঝারির গায়ে মেশবার চেষ্টা করচে! যে অরণ্যাবৃত উপত্যকা দিয়ে আমি চলোচ সেটা যেন ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসচে। আমার জানা ছিল এই পথটা বনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় ধন্‌ঝারি পাহাড় পার হয়ে ওপারে চলে গিয়ে আবার মুসাবনী রোডের সঙ্গে মিশেচে। সুতরাং মনে কোন উদ্বেগ ছিল না। জানি, যেতে যেতে আপনা-আপনি মুসাবনী রোডে পড়বোই। নিশিঝর্ণা কোথায় আমার জানা ছিল না; আমি বনের মধ্যে যেতে যেতে কান খাড়া করে আছি কোথায় ঝর্ণার শব্দ পাওয়া যায়। এক জায়গায় সত্যিই শব্দ পাওয়া গেল জলের, সুঁড়িপথটা ছেড়ে নিবিড়তর বনের মধ্যে ঢুকে দেখি একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী উপলরাশির উপর দিয়ে বয়ে চলেচে; তার দু'ধারে এক প্রকার বন্য গাছ—অজস্র বেগুনী রঙের ফুল ফুটে আছে। স্থানটি যেমন সুন্দর তেমনি স্নিগ্ধ, কতক্ষণ বসে রইলাম একটা শিলাখণ্ডে, উঠতে যেন ইচ্ছে করে না।

কিন্তু এই বনে থাকা তখন যে উচিত ছিল না, তা তখনো বুঝি নি। প্রথমতঃ তো বনের ওসব নিভৃত স্থান—বিশেষ করে যেখানে জল থাকে, সেখানে বাঘ থাকা বিচিত্র নয়, দ্বিতীয়তঃ বেলা গেল, পথ তখনও কত বাকি সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা ছিল না—অথবা ধারণা থাকলেও ভুল ধারণা ছিল। যখন আবার সুঁড়িপথটায় উঠলাম তখন বেলা বেশ পড়ে এসেচে।

বনেই এই অংশের শোভা অবর্ণনীয়। প্রথম বসন্তে কত কি বনের ফুল গাছের মাথা আলো করে রেখেচে, ধন্‌ঝারির নীল সানুদেশ এক দিকে খাড়া হয়ে উঠেচে ডাইনে, শাল-মঞ্জরীর সুবাসে উপত্যকার বাতাস নিবিড় হয়ে উঠচে, বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গন্ধটি যেন আরও বাড়চে; কতক্ষণ অন্যমনে চলেছি, সুঁড়িপথটাও কখন হারিয়ে গেছে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখি আমার সামনেই ধন্‌ঝারি পাহাড়ের খুব উঁচু একটি অংশ, সেখানে পাহাড় টপ্‌কে ওপারে যাওয়ার কোন উপায় নেই—পথও নেই। স্থানটি সম্পূর্ণ জন-মানবহীন। সেই কুলামাড়ো গ্রাম ছাড়িয়ে এসে আর লোকালয় চোখে পড়ে নি। বেলাও পড়েচে, একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তা ছাড়া সুঁড়িপথটাই বা গেল কোথায়? বনের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পথ খুঁজতে গিয়ে আরও গভীর বনের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

এ দিকে সূর্য হেলে পড়েচে। এ বনের মধ্যে আর বেশিক্ষণ দেরী করা উচিত হবে না। ভাবলাম, আর নিশিঝর্ণা দেখে দরকার নেই, এবার যে পথে এসেছি সেই পথেই ফিরি। কিন্তু কোথায় সে পথ? ক্রমে এমন সব জায়গার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যেখান দিয়ে আসবার সময় আসিনি তা বেশ বুঝলাম। বনের মধ্যে দিক্‌ভ্রান্ত হওয়া খুব সহজ, বিশেষ করে এ ধরনের নিবিড় বনের মধ্যে। কিন্তু আমি জানি ধন্‌ঝারি উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে বিস্তৃত, বিশেষতঃ সূর্য যখন এখনও আকাশে দেখা যাচ্ছে, তখন দিক ভুলের সম্ভাবনা অন্ততঃ নেই—এই একটা ভরসা ছিল মনে। কিন্তু ভরসা ভরসাই রয়ে গেল সেই পর্যন্ত, কোনও কাজে এলো না। সূর্য ক্রমে পাহাড়ের আড়ালে অস্ত গেল। ছায়া ঘনিয়ে এলো বনে। যদিও সামান জ্যোৎস্না রাত্রি, তবুও এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা রাত্রি কাটানোর সম্ভাবনায় বিশেষ পুলকিত হয়ে উঠলাম না।

হঠাৎ মনে হ'ল ধন্‌ঝারি পাহাড়ের ওপারেই তো মুসাবনী রোড। পাহাড়টা যদি কোনও রকমে টপকাতে পারি, এখনও রাত হয় নি, লোকালয়ে পৌঁছতে পারবো। নতুবা ঘনায়মান সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে যতই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরবো ততই সম্পূর্ণরূপে পথভ্রান্ত হয়ে পড়তে হবে। একটা জায়গায় মনে হ'ল যেন ধন্‌ঝারি একটু নিচু হয়েচে। এই ধরনের নিচু খাঁজ দিয়েই আমার জানা পায়ে-চলার সুঁড়িপথটা গেছে—ঘন চুলের মধ্যে চেরা সিঁথির মতো; পার্বত্য পথের কোন চিহ্নই দেখছি না কোন দিকে, তবুও এই অপেক্ষাকৃত নিচু থাক টপকে ধন্‌ঝারির ওপারে যাওয়া খুব কঠিন হবে না মনে হয়।

জুতো খুলে হাতে নিলাম। পাহাড়ের কিছুদূর উঠে গিয়ে দেখি নিচে বনের মধ্যে যত অন্ধকার ওপর ততটা নয়। জ্যোৎস্না উঠলো, জ্যোৎস্না ফুটবে ভালো। প্রথম খানিকটা উঠেই মনে হ'ল ভুল জায়গা দিয়ে পাহাড় পার হচ্ছি, এখান দিয়ে কখনও কেউ পাহাড় পার হয়নি—যেমন বড় বড় পাথরের চাই, তেমনি কাঁটা গাছ সর্বত্র। খালি পায়ে ধারালো

পাথরের ওপর দিয়ে চলতে বিষম কষ্ট, অথচ জুতো পায়ে দেওয়াও চলে না।

পাহাড়ের ওপরে খানিকটা উঠে গেলাম দিব্যি। তারপরে এক জায়গায় গিয়ে দেখি সামনে একেবারে খাড়াই—দুরারোহ পাহাড় দেওয়ালের মতো উঠেচে। বড় বড় গাছের শেকড় ঝুলচে, যেন জলের তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে পড়েচে। আমি শিক্ষিত পর্বতারোহণ-কারী নই, সেই খাড়া উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে ওঠা আমার পক্ষে তাই সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এদিক ওদিক চেয়ে দেখি একদিকে একটা মসৃণ প্রকাণ্ড শিলা আড়ভাবে শোয়ানো, সেখানা উচ্চতায় আন্দাজ কুড়ি-বাইশ হাত এবং চওড়ায় ত্রিশ-বত্রিশ হাত হবে। এ ধরণের পাথরকে এদেশে 'রাগ্' বলে। 'রাগ্' পার হওয়া বিপদ্জনক, কারণ হাত-পা দিয়ে ধরবার এতে কিছু থাকে না। তবে এখানা অন্ততঃ ৬০ ডিগ্রি কোণ করে হেলে আছে বলে ভরসা হ'ল; এই একমাত্র পথে পাহাড়ের ওপরের দিকে ওঠা চলবে এখন।

জুতো যখন পায়ে নেই এক রকম করে চার হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে 'রাগ' পার হয়ে ওপরে উঠলাম। তারপরে ওঠার বিশেষ কষ্ট নেই, শুধু অর্জুন আর শুভ্র নিষ্পত্র শিববৃক্ষের জঙ্গল, বাঁকাভাবে চাঁদের আলো এসে শিববৃক্ষের দুধের মতো সাদা ধবধবে গুঁড়ির গায়ে পড়েচে। কারণ তখন প্রদোষের ঈষৎ অন্ধকার কেটে জ্যোৎস্না ফুটে উঠেচে। এক জায়গায় ওপর দিকে মনে হল যেন গাছে আগুন লেগে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কৌতূহল হ'ল অত্যন্ত, আপনি আপনি গাছে কি করে আগুন লাগবে? ওপরে উঠে গিয়ে দেখি সত্যিই এক জায়গায় একটা মোটা শেকড়ের গা দিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে—তবে কি ভাবে শেকড়ে আগুন লাগলো তা আজও বলতে পারি না।

তখন আমি অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়েচি, নিম্নের উপত্যকার গাছপালার মাথা কোঁকড়া-চুল কাফিদের মাথার মতো দেখাচ্ছে; চাঁদের আলো বনের নিবিড় অন্ধকার উপত্যকার মধ্যে এতটুকু ঢোকে নি, ওপর থেকে ঘন কালো দেখাচ্ছে। আর আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে চারিদিকে ধন্ঝরির বিভিন্ন চূড়ার বনরাজির মাথায় মাথায় শুভ্র ঢেউ। সে জনমানবহীন শৈলমালার ঊর্ধ্ব সানুতে জ্যোৎস্না-প্লাবিত শুক্লা চতুর্দশী রাত্রির শোভা যে দেখে নি তাকে বলে বোঝানো যাবে না সে কি অপূর্ব ব্যাপার! একা যেন আমি পৃথিবীর ঊর্ধ্বে কোন দেবলোকে বিচরণশীল আত্মা; আমার চোখের সম্মুখে যে দৃশ্য দূর থেকে সুদূর প্রসারিত, কোনো পার্থিব চক্ষু কোনোদিন তা দর্শন করেনি। কিন্তু সেখান থেকে আমার মনে হ'ল আমি সম্পূর্ণ ভুল করেচি, যে দিক দিয়ে পাহাড়ে উঠেচি সেখান দিয়ে পাহাড় টপকাবার উপায় নেই—যতই উঠি ততই দেখি আমার চোখের সামনে অর্জুন ও শিববৃক্ষের সাদা সাদা সোজা গুঁড়িগুলো থাকে থাকে উঠে যেন স্বর্গে উঠেচে। অর্থাৎ পাহাড়ের শিখরদেশের তখনও পর্যন্ত কোনো পাত্তাই নেই। তাছাড়া ক্লান্তও খুব হয়ে পড়েচি। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে যেন ঢেঁকির পাড় পড়চে অতিরিক্ত শ্রমের ফলে। এই বন ভেঙে অতখানি উঠে ওপারের ঢালু দিয়ে নামতে পারবো বলে মনে হ'ল না—তার চেয়ে যে পথে উঠেচি হাত-পা ভেঙে মরার চেয়ে নিম্ন উপত্যকায় নেমে জ্যোৎস্নার আলোয় আবার না হয় পথ খুঁজি।

বিপদ এলো এতক্ষণে এই নামবার সময়, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে; একেবারে মৃত্যুর সম্মুখীন হ'তে হ'ল প্রায়। দুর্ঘটনা যখন আসে তখন এমনি অতর্কিতে আসে।

যতটা উঠেছিলাম জ্যোৎস্নার আলোতে একরকম করে নেমে এসে সেই 'রাগ-খানার কাছে পেঁছিলাম। 'রাগ' পার হয়ে নেমে গেলে উপত্যকা আর বেশী নিচে নয়।

'রাগ' বেয়েই নামতে হবে, কারণ অন্য দিকে নামবার কোন উপায় নেই। অথচ রাগ এমন মসৃণ যে হাত-পায়ে-আঁকড়াবার কিছু নেই—এ ধরণের পাথর বেয়ে ওঠা বরং সহজ, কিন্তু নামা অত্যন্ত কঠিন। তাড়াতাড়িতে আর একটা ভুল করলাম, উপুড় হয়ে না নেমে চিৎ হয়ে নামতে গেলাম। যাই হোক্, খানিকটা তো নামলাম দিব্যি, তারপর পাথরখানার উপর দিকের যে প্রান্ত হাত দিয়ে ধরেচি সেটা ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে সড়্ সড়্ করে খানিকটা নামলাম। তারপর পাথরের গায়ে এক জায়গায় একরাশ শুকনো পাতা জমে আছে,

সেখানটিতে পাথরের কোন খাঁজ আছে ভেবে যেমন পা নামিয়ে দিয়েচি অমনি শুকনো পাতার রাশ হড়-হড় করে সরে গেল—সেই ঝোঁকে আমিও খানিকটা গড়িয়ে পড়লাম। অথচ পায়ে আটকাবার কোন খাঁজ বা উঁচু-নীচু জায়গা কিছুই পেলাম না।

তখন আমার অবস্থা সঙিন হয়ে উঠেচে। কোথাও কিছু ধরবার নেই—স্লেটের মতো মসৃণ পাথরখানার কোন জায়গায়। আমি চিৎ হয়ে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় তার ওপর শুয়ে আছি এবং আঙ্গুল টিপে বা সামান্য কিছু ধরে আছি, সেটা ছেড়ে দিলেই নিচের দিকে গড়িয়ে পাথরের নুড়ির স্তূপের ওপর গিয়ে পড়বো। সে পাথরের স্তূপ অন্ততঃ ত্রিশ ফুট নিচে, তার ওপর পড়লে তীক্ষ্ণ ধারালো অসমান প্রস্তরখণ্ডে বিষম আহত হ'তে হবে। তারপর হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকলে এ জনশূন্য পাহাড়ের ওপরে কে-ই-বা উদ্ধার করচে? এ অবস্থায় মৃত্যু ঘটা বিচিত্র কি?

যখন আমি বুঝলুম আমি খুব বিপদ্‌গ্রস্ত—তখন হাত-পায়ে যেন আর বল নেই। আঙুলে টিপে ধরব কি, আঙুলই অবশ হয়ে আসচে। এভাবে আর কিছুক্ষণ কাটলেই গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবো এবং সাংঘাতিক আহত হ'ব।—তখন মনে হ'ল ওঠবার সময় পাথরখানার এ অংশ দিয়ে উঠি নি, কোণ ঘেঁষে উঠেছিলাম। সেখানে নিচে ছোটবড় অসমান শিলাখণ্ডের ধাপমতো ছিল, তখন দিনের আলো ছিল বলে দেখে শুনে ওঠবার সুবিধা ছিল, এখন রাত্রে বিশেষ করে ওপরের দিক থেকে নামবার সময় অতটা বুঝতে পারি নি।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারিদিকে চাইলাম, জলে ডোবার পূর্ব মুহূর্তে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কোন আশ্রয় খোঁজে তেমনি। হঠাৎ নজরে পড়লো হাতখানেক দূরে একটা অর্জুন গাছের মোটা শেকড় ওপরের একখানা শিলাখণ্ডের ফাটল থেকে বার হয়ে ঝুলচে। মরীয়ার মতো সাহসে ঝোঁক দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সেই শেকড়টি আঁকড়ে ধরতে গেলাম এবং ধরেও ফেললাম। এতে নিজেকে আরও বিপন্ন করেছিলাম—কারণ শেকড় হাতের নাগালে না এলে টাল খেয়ে পড়ে গিয়ে সজোরে নিচের প্রস্তররাশির উপর পড়ে চূর্ণ হয়ে যেতাম—ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়লে হয়তো চোট খেয়ে বেঁচে যেতাম, এতে কিন্তু বাঁচবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না।

'রাগ' থেকে শেকড় ধরে নেমে এসে সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন ঝাল বেরুচ্ছে বলে মনে হ'ল!—নিশ্চিন্ত দুর্ঘটনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে যেমন হয় মানুষের। কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করে নিয়ে হাত-পায়ের অবশ ভাবটা কাটিয়ে আবার নামতে আরম্ভ করলাম এবং পনেরো মিনিটের মধ্যেই ধন্‌ঝরির উপত্যকার সমতল ভূমিতে পা দিলাম।

তখন আমার মনে সাহস বেড়ে গিয়েচে। গুরুতর দুর্ঘটনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সমতল ভূমিতে কোন বিপদই আর আমার কাছে বিপদ নয়। তখন রাত আন্দাজ দশটা হবে মনে হ'ল। জ্যোৎস্না খুব ফুটেচে, বনের মধ্যে আগের মতো অত অন্ধকার নেই। প্রথমে সেই পার্বত্য নদীর ধারে ধারে এসে পৌঁছলাম তার জলের কলধ্বনি শুনে। জল পান করে ও মাথায় মুখে জল দিয়ে শরীর ও মন সুস্থ হ'ল। মনে তখন ভয় বা উদ্বেগ আদৌ নেই। সুতরাং ধীর মস্তিষ্ক নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে সেই সুঁড়িপথটা প্রায় আধঘণ্টা পরে বার করলাম।

কুলামাড়ো যখন এসে পৌঁছেচি তখন রাত বারোটার কম নয়। গ্রাম নিষুতি হয়ে গেছে বহুক্ষণ; আমায় দেখে গ্রাম্য কুকুরের দল মহা ঘেউ ঘেউ শুরু করলে। একটা ঘরের দাওয়ায় লোকেরা শুয়েছিল, কুকুরের ডাক শুনে তারা জাগলো। আমায় দেখে তারা খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমায় বনের মধ্যে যেতে দেখেছিল দুপুরের পরে—বললে, "খুব বেঁচে গিয়েছিস বাবু। শঙ্খচূড় সাপের সামনে পড়লে আর বাঁচতিস্ না। ধন্‌ঝরির বনে বড্ড শঙ্খচূড় সাপের ভয়।"

রাতটা সে গ্রামে কাটিয়ে সকালের দিকে সুবর্ণরেখা পার হয়ে গালুডিতে ফিরে এলাম।

গাঙের ধারে পটলের ক্ষেত।

বুড়ো কুড়োন মণ্ডল সবুজ উলুখড়ের বেড়াঘেরা ক্ষেতটিতে বসে পটল তুলে বাজরা বোঝাই করছিল। ক্ষেতের নিচেই হারান মাঝি দেয়াড়ি পাতছে গাঙের জলে। আজ বড় মেঘলা দিন, বৃষ্টি হবে না হবে না করে এমন বৃষ্টি নেমেছে যে, দুদিনের মধ্যে থামল না। হারান বললে—ও কুড়োন, একটু তামাক খাওয়াবা?

—নামো ওখান থেকে। ইদিকে এস।

একটা বাবলা গাছের তলায় দুজনে তামাক খায় বসে। দুজনেই জলে ভিজছে, কিন্তু কেউ ওটা গ্রাহ্য করছে না। ভদ্দরলোক নয় যে ঘরের মধ্যে বসে থাকবে। জলে না ভিজলে ক্ষেতখামারের কাজ বা মাছ ধরার কাজ হবে কোথা থেকে। আর এতে ওদের শরীরও খারাপ হবে না ওরা জানে। রোদে জলে শরীর পেকে গিয়েছে। ভদ্দরলোক হলে এমনধারা ভিজলে নিউমোনিয়া হত হয়তো।

হারান বললে—হাটে যাবা?

—যাই। দু বাজরা মাল কাটাতি হবে তো।

—কোন্ হাটে যাবা? নতুন হাটে?

—তাই যাব। পুরনো হাটে কেউ বড় একটা আসছে না। মাল কাটে না।

—পটলের মণ?

—তা কি করে বলব। খদ্দেরে যা দেয়।

—মাছ?

—ন'সিকি।

দুজনে খুব খুশী। এবার চড়া পটল আর চড়া মাছের দাম গিয়েছে দু-তিন মাস।

হাতে কিছু জমেছে দুজনেরই। অবিশ্যি কুড়োন মণ্ডলের অবস্থা হারান মাঝির চেয়ে সচ্ছল। চরের সাত বিঘে পটল বাদে প্রায় দশ বিঘে কলাবাগান আছে ওর। একখানা ডিঙি বেয়ে হারান মাঝি আর ক'মণ মাছ ধরবে মাসে।

কুড়োন বাড়ী ফিরে খেয়ে নিলে, তার পর পটলের বাজরা মাথায় হাটের দিকে রওনা হল। এ হাটটা নতুন হয়েছে আজ মাস পাঁচ-ছয়। রসুলপুরের আবদুল খালেক মিঞা জমিদার গত পৌষ মাস থেকে এ হাট বসিয়েছেন। ঝিটকিপোতার পুরনো হাটে আজকাল লোক হয় না। নতুন হাটে খাজনা নেই, তোলা নেই, ভিখিরির উৎপাত নেই। কলকাতার পাইকিরী খদ্দের এখানে আসে বেশি, দামও দেয় বেশি।

হাটে গিয়ে কুড়োন বসে তার নির্দিষ্ট স্থানটিতে। পটল প্রথম ছিল দু আনা সের, কলকাতা ও রাণাঘাটের পাইকিরী খদ্দের যেমন আসতে শুরু করল, অমনি দাম চড়ল দশ পয়সা।

কুড়োন হাতে দাঁড়িপাল্লা নামিয়ে একবার তামাক সেজে কল্কেটা হাওয়ায় রেখে দিলে টিকে ধরাবার জন্যে। একটা খদ্দের এসে বললে—পটল কত?

কুড়োন গম্ভীর ও নিস্পৃহ সুরে বললে, বারো পয়সা।

—বারো পয়সা কি রকম! সব জায়গায় দশ পয়সা আর তোমার বারো পয়সা?

—তবে সেই সব জায়গায় নেও গে যাও।

—ভাল পটল?

—হাত দিয়ে দেখ আসল বোশেখী লতার পটল! তুলে দেখ না একটা? এর দাম বারো পয়সা।—কুড়োন মণ্ডল ঘুঘু ব্যবসাদার। খদ্দের কিসে ভোলে, কোন ধাপ্পায় তাকে কাবু করা যায়, এসব তার গত ছত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জিনিস। নিজের জিনিসের দাম নিজেই চড়িয়ে দিতে হবে এবং জোর গলায় নিজের জিনিসের তারিফ করতে হবে—

খদ্দের ভিজবেই, ভিজতে বাধ্য। খদ্দের তখন বারো পয়সার পটলকে কল্পনা-নয়নে অনেক উঁচু বলে ভাবতে শুরু করবে। ব্যবসার এ অতি গূহ্যতত্ত্ব, কুড়োন মণ্ডল সারাজীবন ধরে সাধনা করে এ তত্ত্বে সিদ্ধিলাভ করেছে। দেখতে দেখতে খদ্দেরের ভিড় লেগে গেল তার সামনে। দশ পয়সা সেরের পটল কেউ কেনে না। কুড়োন মণ্ডল মনে মনে হেসে চড়া গলায় বলতে লাগল—এই চলে এস খদ্দের, বারো পয়সা, সরাটির চড়ার সেরা পটল, বারো পয়সা—চলে এস—

কুড়ি মিনিটের মধ্যে আধমণ পটল উঠে গেল ঐ দরে। সিকি ও আনি প্রচুর জমল বগলিতে। কুড়োন আবদুল শোভান ফকিরের কাছ থেকে একছড়া পাকা মর্তমান কলা কিনে নিজের বাজরায় রেখে বললে—ক'টা পয়সা দেব, ও ফকির?

—দ্যাও যা দেবা। তিন আনা দ্যাও।

—বারোটা কলার দাম তিন আনা! এক একটা কলা এক একটা পয়সা?

আবদুল ফকিরও ঘুণ ব্যবসাদার। নিজের বাড়ীর উঠোনে সব রকম তরিতরকারি উৎপন্ন করে এবং তাই হাটে বেচে দু-পয়সা রোজগার করে।

ওর সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে এ অঞ্চলে। কে একজন দুটি পাতিলেবু চাইতে গিয়েছিল আবদুল শোভানের বাড়ী।

—ও ফকির, লেবু আছে তোমার বাড়ী?

পাছে বিনি পয়সায় দিতে হয়, তখনই ওর মুখ বন্ধ করবার জন্যে আবদুল ফকির বললে—পয়সা দিলিই পাওয়া যায়।... সে-ই আবদুল ফকির। সে অমায়িকভাবে হেসে বললে—যুদ্ধোর বাজারে কোন্ জিনিসটা সস্তা দ্যাখছো, ও কুড়োন? তুমি পটল বেচলে কি দর?

না, ফকিরের সঙ্গে পারা গেল না। অবশেষে দশটা পয়সা দাম দিতেই হল।

বেলা পাঁচটার মধ্যে পটলের বাজার কাবার। বিক্রিও বটে। কুড়োন তাদের গাঁয়ের হরিপদ মাইতিকে ডেকে বললে—কখানা বাজরা বেচলে?

—দুখানা।

—বেশ বিক্রি, কি বল ভাইপো?

—যুদ্ধোর সময় লোকের হাতে পয়সা কত আজকাল!

—তা সত্যি।

—এমন কখনও দেখেছিলে খুড়ো? তোমার বয়েস তো চার কুড়ির কাছে ঠেকল। তুমি যখন হাট করতে আরম্ভ করেছ তখন আমরা জন্মাই নি।

—তা সত্যি।

হরিপদ মিথ্যে বলে নি। কুড়োন ভেবে দেখে সত্যিই হরিপদ যখন জন্মায় নি, তখন থেকে সে হাটে পটল বেচে। কিন্তু সে এ-হাটে নয়, ঝিটকিপোতার পুরনো হাটে। এ হাট তো মোটে গত পৌষ মাস থেকে হয়েছে।

কুড়োন আজ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর ধরে ঝিটকিপোতার হাট করছে। কতদিনের কত স্মৃতি ঝিটকিপোতার হাটের সঙ্গে জড়ানো। এ নতুন হাটে এসে কোন আনন্দ হয় না। এখানে এসে পয়সা হয় বটে, কিন্তু সব ফাঁকা ঠেকে। মন খুশী হয়ে ওঠে না। মনের যোগাযোগ কিছু নেই এ হাটের সঙ্গে।

কথাটা তার রোজই মনে হয়।

ঝিটকিপোতার হাট তার কতকালের পরিচিত। এখানে বসে সে এতক্ষণ ভাবছিল ঝিটকিপোতার হাটের সেই অশ্বত্থ গাছের তলা, যেখানটিতে বিয়াল্লিশ বছর ধরে ফি হাটে বসে সে পটল বিক্রি করে এসেছে। কত পুরনো লোক ছিল, তাদের কথা মনে পড়ে। তার

আগে ঐখানটিতে বসত লক্ষ্মণ সর্দার, ভীম সর্দারের বাপ। লক্ষ্মণ সর্দার বেগুন বিক্রি করত, তার বাপের বয়সী বুড়ো, তাকে হাতে ধরে বেচা-কেনা শিখিয়েছিল—রোজ নিজের গাড়িতে চড়িয়ে ওকে নিয়ে আসত হাটে। লক্ষ্মণ সর্দার মরবার পরে তার ছেলে ভীম ওকে বললে—বাবার জায়গাটিতে তুমি বসে বেচা-কেনা কর দাদা। আমি হাট করা ছেড়ে দিলাম। বেগুন পটল বিক্রি আমার পোষাবে না, আমি পাটের ব্যবসাতে নামব ভাবছি।

দু বছর পরে পাটের ব্যবসাতে ফেল মেরে ভীম সর্দার আবার যখন হাটে ফিরে এল বেগুন-পটল বেচতে, তখন অশ্বত্থতলায় কুড়োনের আসন পাকা হয়ে গিয়েছে।

সে সব আজ কত বছরের কথা!

নতুন হাটে বসে পুরনো হাটের সেই অশ্বত্থতলার কোণটি বড় মনে পড়ে। ওই জায়গাটি ছিল ওর লক্ষ্মী, ওখানেই বেচাকেনার কাজে হাতেখড়ি ; জীবনের উন্নতির সূচনা। আজ যুদ্ধের বাজারে পটলের দাম বড় চড়া। এত চড়া দাম কখনও পটল বিক্রি হয় নি তার জীবনে, এত পয়সাও কোনদিন হাতে আসে নি। তবুও ভাল লাগে না। পয়সাতেই কি জীবনের সুখ হয় শুধু? আজ কোথায় গেল সেই ভূষণদা, কোথায় গেল কেষ্ট ময়রার বাবা হরি ময়রা, কোথায় গেল হাটের সাবেক ইজারাদার পাঁচু নিকিরি।

পাঁচকড়ি নিকিরি কখনও হাটের খাজনা আদায় করে নি ওর কাছে! বলত, তোমার কাছে চার পয়সা খাজনা নিয়ে কি করব কুড়োন, এক সের করে পটল দিও তার বদলে, আর দুটো বেগুনের চারা। এবার বর্ষায় আটবিঘেটাক বিগুন লাগাব ভাবছি। মুক্তকেশী বেগুন আছে?

—আছে। বীজ দেব এখন। নি-কাঁটা বেগুন। এক একটাতে এক এক সের।

—বল কি!

—হয় না হয় চোকি দেখো। নিজের চোকি দেখলি তো অবিশ্বাস যাবা না?

বেলা গেল। ওদের গাঁয়ের লোকেরা গাড়ী করে বেগুন পটল এনেছিল, খালি গাড়ীতে ওরা সবাই একসঙ্গে বসে বাড়ী ফেরে।

হাঁটতে হয় না এতটা রাস্তা। ওকে ডাকতে এল হরিপদ মাইতি। বললে—খুড়ো, বাড়ী যাবা না? চল, গাড়ী যাচ্ছে। কই দ্যাও তোমার বাজরা তুলে দিই গাড়ীতে।

—যাব। তুমি বাজরা তুলে দ্যাও, আমি মেছোহাটা পানে যাই।

—কনে যাবা? আজ মাছ কিনতি পারবা না। আড়াই টাকা কাটা পোনা।

—ও, আর আমাদের পটলের বেলা বুঝি সস্তা খোঁজে? আসছে হাটে চার আনার কমে কেউ বেচতি পারবা না, সবাইকে বলে দিচ্ছি।

গরুর গাড়ীতে ওদের গ্রামের আটজন উঠল। গল্প করতে করতে যাচ্ছে সবাই। পান-বিড়ি এ ওকে দিচ্ছে। কুড়োন মণ্ডলের সমবয়সী কেউ নেই গাড়ীতে, তবে নিতাই ঘোষ আছে ; সে যদিও তার দশ বছরের ছোট—বর্তমানে দুজনেই সমান বৃদ্ধ। কুড়োন নিতাইকে বললে—কিন্তু যতই বল, ঝিটকিপোতার হাটে গিয়ে যে মজা ছিল, এখানে তা নেই।

নিতাই বললে—যা বললে দাদা! সেখানে অন্তত ত্রিশ বছর হাট করিছি।

—তুমি ত্রিশ বছর আর আমি চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর সেখানে হাট করিছি—সেখানে মন বড্ড টানে।

—মনে পড়ে সেবার বন্যের সময় ভূষণ-দার দোকানে চড়ুইভাতি করেলাম?

—ওঃ সে সব কি আজকের কথা! ভূষণ-দা মারা গিয়েছে আজ অন্তত দশ বছর। সে অন্তত বিশ বছর আগের কথা।

—কি দিয়ে খেয়েছিলে বল তো? আমার আজও মনে আছে—খিচুড়ি, কুমড়ো ভাজা, পটল ভাজা। পোস্ত দিয়ে বড়া ভাজা—

—আমারও মনে আছে। আর হয়েছিল বেগুনের টক।

গাড়ীর অন্য সবাই ছোকরা বয়সের। দুই বুড়োর কথাবার্তা শুনে হেসেই তারা

অস্থির। ওদের মধ্যে একটি হাস্যরত ছোকরাকে ধমক দিয়ে কুড়োন বললে—ওরে থাম ছোঁড়া—হেসে যে মলি! তোরা তখন কোথায়? তোরা কি জানাব?

ছোকরা জিজ্ঞেস করলে—তখন পটলের দর কি ছিল দাদু?

—পয়সা পয়সা সের, কখনও বা পয়সায় দু সের।

—দুয়ো—এমন পয়সার জন্তে ছিল না তখন বল?

—ওরে বাপু, হাসিস নে, হাসিস নে। তখন একখানা বাজরা পটল বেচে এক টাকা পাঁচ সিকে হত—আর এখন হয় ষোল টাকা সতের টাকা। কিন্তু তখনই সুখ ছিল। এখন এক বাজরা পটল বেচে একখানা কাপড় হয় না।

—ওগো, মেঘ করে আসছে। শীগগির হাঁকিয়ে চল—পদ্মবিলের ওপারে দেখ না মেঘ!

একজন বললে—বুঝলে দাদু, সেবার এই পদ্মবিলের ধারে জ্যোচ্ছনা রাতে আমার জেঠা বড় মাছ পেয়েছিল ডাঙায়।

সকলে বললে—দূর!

বৃদ্ধ নিতাই বললে—দূর না, অমন হয়। আমি একবার এত বড় সরল পুঁটি পেয়েছিলাম গাঙের ধারের শর-ঝোপে। জল থেকে লাফিয়ে উঠে শরের ঝোপে আটকি ছট্‌ফট করছিল। খপ ক'রে গিয়ে ধরেলাম অমনি। এক সের পাঁচ পোয়া ওজন ছিল।

পুকুরে ডোবায় ব্যাঙ ডাকছে শুনে দু-একজন বললে—আজ রাত্তিরি ভন্না হবে—ওই শোন ব্যাঙের ডাক!

হরিপদ মাইতি বললে—চোক দিও না, চোক দিও না। আমন ধান হবে না জল না হলি। জল হক, জল হক। ধানের জাওলা খড় হয়ে গেল বৃষ্টি আবানে। এ দুদিনে যা বৃষ্টি হচ্ছে, এ তো শুকনো মাটি টেনে নেবে। বড় ভন্না হওয়ার দরকার। টিপ টিপ বৃষ্টির কাজ নয়।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। বেশ অন্ধকার। বর্ষা-সন্ধ্যায় ঝোপ-ঝাড়ে জোনাকি জ্বলছে. ঘেঁটকোল ফুলের কটুগন্ধ সজল বাতাসে।

ওরা গ্রামে পৌঁছে যে যার বাড়ী চলে গেল।

পিদিমের নিচে

একটিমাত্র গ্রামে আমার বাল্যে এই ধরণের এক ব্যক্তিকে আমি দেখেছিলাম। কেউ তার জীবনচরিত লেখে নি; কেউ জানেও না তাকে, কিন্তু আমি জানি এবং যতটুকু জানি বা নিজের চোখে দেখেছিলাম, লিখে রাখা উচিত ভেবে লিখে রাখলাম।

আমার ছেলেবেলায় দিনকতক মাসির বাড়ীতে কাটিয়েছিলাম সে গ্রামে। আমার তখন বয়স ন-দশ বছরের বেশী নয়।

গঙ্গার ধারের পথ দিয়ে একদিন মাসতুতো ভাই নন্দর সঙ্গে পাশের গ্রাম আমিনপুরে চাল আনতে যাচ্ছিলাম। বিকেলবেলা, বর্ষাকাল, গঙ্গার জলে খুব ঘোলা এসেচে, জল বেড়ে সাতনলির বড় চড়া ডুবে গিয়েচে, ঝিঙে পটলের ক্ষেত জলের অত্যন্ত ধারে এসে পড়েচে।

হঠাৎ নন্দ আমায় ধমক দিয়ে বললে—এই সরে আয়।

—কি রে?

আমার মুখ থেকে কথা বেরুতে না বেরুতে ঝুপ ক'রে অনেকখানি পাড় ভেঙে পড়লো অনেক নিচে ঘোলা জলের আবর্তের মধ্যে। আমার শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগলো।

নন্দ বললে—এখুনি গিইছিলি যে।

সত্যিই তাই। আর একটু হোলে আমি গিয়ে পড়তাম গঙ্গাগর্ভে। তখন সাঁতার জানতাম না। জলে পড়লে আর বাঁচবার উপায় ছিল না। আমার বড় ভয় হোলো, গঙ্গার ধার বেয়ে বেয়েই রাস্তা অনেক দূর চলে গিয়েচে। যদি আবার পাড় ভাঙে, বিশ্বাস কি!

নন্দকে বললাম—নন্দদা, আমি যাবো না, তুই যা। আমি বাড়ী যাই—বলেই স্বীকার করতে এখন লজ্জা হয়, কেঁদে ফেললাম।

নন্দ কাছে এসে বললে—ওই দ্যাখো, নাও, কেঁদে উঠলি কেন? কি মুশকিলেই পড়া গেল দ্যাখো। বাড়ী যেতে পারবি নে একলা। চল তোকে পাগল ঠাকুরের আস্তানায় রেখে আসি।

এইভাবে এই অদ্ভুত লোকটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো।

এ অঞ্চলে আমি আছি আজ মাস দুই। পাগল ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে আসচি এতদিন। শুনেছিলাম প্রথম আমার মাসিমার মুখে। আমি বলেছিলাম—সে কে মাসিমা?

—গঙ্গার তীরে থাকে। সাতনলির চরের এপারে।

—কে সে?

—জেতে বুনো। ওখানে আস্তানা করে আছে ঘর বেঁধে আজ বিশ-ত্রিশ বছর। আমার তো বিয়ে হয়ে এখানে এসে ইস্তক শুনে আসচি। অনেক ছোট জেতের গুরুদেব। মাঘ মাসে তার ওখানে মেলা বসে, লোকজন আসে, দোকানপসার জমে।

—আমি একদিন দেখতে যাবো?

—না, যায় না। বুনো বাগ্দি, ছোট জেতের কাণ্ড, সেখানে কি দেখতে যাবি তুই? ছুঁলে যাদের গঙ্গাস্নান না করলে শুদ্ধু হয় না!

সেই বিকেলে আমার মাসতুতো ভাই নন্দ আমায় পাগল ঠাকুরের আস্তানায় বসিয়ে রেখে চলে গেল। বললে—ফিরে না আসা পর্যন্ত বসে থাকবি—

একটা বাবলা বনের মধ্যে দুখানা খড়ের ঘর। একটা ছোট গোয়ালঘর, তাতে দুটি গাই-গরু বাঁধা। একখানা ঘরের দাওয়া অত্যন্ত নিচু, সেখানে খানতকত পিঁড়ি আর খেজুরের চেটাই পাতা। বাবলা গাছে ফুল ধরেচে, ফুল ঝরে ঝরে নিকোনো পুঁছোনো পরিষ্কার উঠোনটা ছেয়ে রেখেচে। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গোয়ালঘরে ঘুঁটের সাঁজাল দিচ্ছে। আর কেউ কোথাও নেই।

এমন সময় একটি লোক বাবলা বনের ওধার থেকে বড় ঘরখানার দাওয়ায় এসে একখানা দা রেখে দিলে। তার কাঁধে এক বোঝা সবুজ জোলো ঘাসের আঁটি। লোকটার লম্বা দাড়ি বুকের উপরে পড়েচে, মাথায় লম্বা লম্বা জট পাকানো চুল, পরনে অতি মলিন এক কাপড়—দেখে পাগল বলে মনে হয়।

লোকটা আমাকে লক্ষ্য করে বললে—কে ওখানে? কে গা?

আমার ভয় হয়েচে। আমি আমতা আমতা করে বললাম—এই—এই—ওই আমার মাসির বাড়ী—

সেই বৃদ্ধা বললে—বাঁওনদের ছেলে। বোধ হয় বাবুদের বাড়ীর। ভূপেনবাবুর নাতি নন্দ বসিয়ে রেখে গেল? ভয় কি খোকা? ভয় কি? শসা খাবা?

শসা খাবো কি. লোকটার হাবভাবে ও রক্তবর্ণ বড় বড় চোখ দেখে আমার প্রাণ তখন উড়ে গিয়েচে। আমি কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি। দস্যু-ডাকাতের গল্প শুনেচি, সেই দস্যু-ডাকাতদের একজন নয় তো?

হঠাৎ লোকটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললে—ভয় কি, বাবাঠাকুর? ভয় কি? কিছু ভয় নেই। বোসো।

তারপর একেবারে কাছে এসে অত্যন্ত মোলায়েম স্নেহের হাসি হেসে বললে—আহা. বালক!

আমি চুপ করে বসে আছি। বোবার শত্রু নেই।

লোকটা বললে—নাম কি বাবাঠাকুর?

ভয়ে ভয়ে বললাম—পতিতপাবন মুখোপাধ্যায়—

—পতিতপাবন? বাঃ, বেশ, বেশ। পতিতপাবন যিনি, তিনিও তোমার মতো! আহা-হা! আহা!

লোকটা শেষের কথাগুলো কাঁদো কাঁদো সুরে জোরে জোরে উচ্চারণ করলে। তারপর বললে—ওগো, পতিতপাবনের ভোগ দেবে কি দিয়ে? আমার বাড়ী এসেচেন দয়া করে, সে অদৃষ্ট করি নি যে বাবাঠাকুর। তোমার ও মুখে কি তুলে দেবো? পাকা তাল একটা নিয়ে যাও—তালের বড়া ভেজে দিতে বোলো তোমার মাসিমাকে—

আমার কথাগুলো ভালো লাগলো এবং ভয়ও অনেক চলে গেল। কিন্তু ওর রকম-সকম দেখে মনে হোলো লোকটা পাগল ঠিকই। তাই ওকে পাগল ঠাকুর বলে।

পাগল ঠাকুর ছোট ঘরটার দাওয়ায় গিয়ে বসে আমায় কাছে ডাকলে। হাতছানি দিয়ে বললে—এসো পতিতপাবন, এসো এসো—

বৃদ্ধা বললে—ওকে ডেকো না, ভয় পেয়েচে।

কিন্তু আমি সম্প্রতি নির্ভয় হয়েচি দেখাবার জন্যে পাগল ঠাকুরের পাশে গিয়ে বসলাম।

পাগল ঠাকুর একখানা খেজুরের চেটাইয়ের উপর বসে এক কল্কে তামাক না গাঁজা কি সাজলে। আমায় বললে—তুমি বাঁওন?

—হ্যাঁ।

—পায়ের ধুলো দেবা একটু?

—আমায় ছুঁয়ো না। মাসিমা বারণ করেচে।

পাগল ঠাকুর হেসে উঠে বললে—কেন, নাইতে হবে বুঝি? তা আমায় ছুঁলে তোমায় নাইতে হবে না। আমি বাঁওন নই, কিন্তু দয়াল গুরুর নামে থাকি। তিনি আমাদের সকলের চেয়ে বড়। দাও, পায়ের ধুলো—

পাগল আমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে কি যেন একটা অদ্ভুত ভাব হোলো। একটা অদ্ভুত আনন্দের ভাব. সে মুখে বলে বুঝিয়ে দিতে পারবো না, বিশেষতঃ তখন আমি বালক, বিশ্লেষণ ও তুলনা করে দেখবার ক্ষমতা ছিল না। এখন এক একবার ভাবি, পাগল ঠাকুরের পায়ের ধুলো নেওয়াটা হয়তো একটা ছুতো—আমাকে স্পর্শ করবার জন্যেই ও পায়ের ধুলো নিতে চেয়েছিল।

তারপর ও একটা গান করলে। গান আমার মনে নেই, কিন্তু বেশ গলার সুর ওর। গান গাইতে গাইতে ওর চোখে জল এল, গাল বেয়ে জল পড়তে লাগলো। 'ও আমার হৃদ-কমলের পরমগুরু সাঁই'—এই কথাটা বার বার ছিল গানের মধ্যে।

গান শেষ করেও বার বার বলতে লাগলো—কিছু খাওয়াতে পারলাম না, বাবাঠাকুর। একটা পাকা তাল নিয়ে যাও, বড়া করে দিতে বলো তোমার মাসিমাকে।

আমার ভয় এখন সম্পূর্ণরূপে কেটে গিয়েছিল। আমি বললাম—তুমি কি কর এখানে?

পাগল ঠাকুর হা হা করে হেসে উঠে আমার দিকে চাইল। তারপর সস্নেহ সুরে বললে—বাবাঠাকুরের কথা শোনো। হাসতে হাসতে মরি যে! খুব আনন্দ জুটিয়ে দিলেন সন্দেবেলা গুরুগোসাঁই। বলে কিনা—কি কর? আমি এখানে থাকি বাবাঠাকুর। আর কি করবো? গুরু গোসাঁইকে ডাকি।

—কে সে?

—ওই, ওই—

পাগল আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখিয়ে বললে—উনি।

আমার খুব ভালো লাগছিলো এই অদ্ভুত লোকটাকে। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি তার দিকে যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়ে পড়েচি দেখলাম। এই সময় সন্ধ্যের অন্ধকার নামলো। গায়ের রোঁয়া আর দেখা যায় না। ও উঠে দোরে জল দিয়ে ধুনো জ্বাললে। উঠোনের একটা ইটের মতো উঁচুমতো জায়গাতে প্রদীপ নিয়ে গিয়ে রেখে দিলে। আমি বললাম—তোমাদের তুলসীগাছ নেই?

—কেন বাবাঠাকুর?

—আমাদের বাড়ী আছে। মাসিমা পিদিম দেয় সন্দেবেলা।

—তুলসী রাখি নে তো বাবাঠাকুর। গুরুগোসাঁই ওই পিঁড়িতেই আছেন। তুলসী কি হবে?

—তুমি পুজো কর না বুঝি? তুলসী পাতা না হলে পুজো হয় না।

পাগল ঠাকুর হেসে বললে—হয় বাবা, হয়। কেন হবে না? সব ফুলে, সব পাতাতেই তাঁর পুজো হয়। তবে পুজো-আচ্চা আমি করি নে বাবা।

—কর না?

—না, বাবাঠাকুর। আমি ছোট জাত, বুনো। তেনার পুজো কি কত্তে পারি আমি? গুরুগোসাঁই পায়ে রাখেন যদি তবে আর পুজোর দরকার কি? ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করবে তোমরা—বাঁওনেরা। আমাদের ছোট জেতের হাতে ও সাজে না। পুজো কত্তে নেই আমাদের।

—তুমি তো ভালো লোক।

—কে বললে আমি ভালো লোক?

—সবাই বলে, আমি শুনিচি।

—তুমি যখন বলচো বাবাঠাকুর, তখন ভালোই হবো।

এই সময় আমার মাসতুতো ভাই ফিরে এসে আমায় ডাক দিল, তার সঙ্গে আমি বাড়ী চলে গেলাম। বাড়ী যাওয়ার আগে ওরা আমাকে তাল দিলে, শসা দিলে, আবার আসতে বলে দিলে।

পাগল ঠাকুরের সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখার পরে প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেল। মাসিমার বাড়ীর সেই গ্রামে আমার যাওয়া ঘটে নি এই পাঁচ বছরের মধ্যে।

১৯১৩ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়ে ইস্কুলের ঝক্কি কিছুদিন এড়াবার জন্যে চলে গেলাম আবার মাসিমার বাড়ী।

মাসিমা বললেন—এসো, এসো বাবা। বুড়ো মাসিকে ভুলেই গেলে। থাক—থাক—বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও।

আমার মনে আছে, দু-একটা কথার পরে আমি বুড়ীকে জিজ্ঞেস করলাম—মাসিমা, সেই পাগল ঠাকুর আছে তো?

মাসীমাকে 'বুড়ী' বললাম বটে কিন্তু তিনি সত্যিকার বুড়ী এখনও ঠিক নন। যৌবনে তিনি সুন্দরী ছিলেন। আমি যখনকার কথা বলচি তখনও তিনি তত মোটা হন নি, বেশ দোহারা, সুঠাম চেহারা, ফর্সা রং, বড় বড় চোখ। মাথার চুল কেবল ছোট করে ছেঁটে-ছিলেন বিধবা হওয়ার পর। দেহে জরার আক্রমণের কোনো চিহ্ন তখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তার ওপর মাসিমা ছিলেন গ্রাম্য জমিদারের ঘরের বধূ। চালচলনে একটা সেকেলে বনেদী ও স্পর্শ-ভীরু ঈষৎ গর্বিত আভিজাত্য সদা-সর্বদা বর্তমান থাকতো। মাসিমা তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন—কে? ও সেই পাগল ঠাকুর—হ্যাঁ, বেঁচে আছে। কেন, তার খোঁজে তোমার কি দরকার?

এখানে 'তোমার' কথাটার প্রয়োগ যে বিরক্তিসূচক তা আমার বুঝতে দেরি হোলো না। মাসিমা জমিদারের বাড়ীর বৌ। তাঁর বোনপো যে তাঁদেরই গ্রামের এক ছোট জাতের গুরুর সঙ্গে মিশবে এটা তাঁর ভালো লাগলো না। অবিশ্যি এটুকুও বলা উচিত যে, তাঁরা নামেই তখন জমিদার, কিছুই ছিল না তখন, সংসারে বিষম টানাটানি চলছিল, তাও জানতাম। নতুবা নন্দ জমিদারের ছেলে হয়ে কাঁটাদ'র হাট থেকে বেগুন বয়ে আনবে কেন ফি হাটে?

মাসিমার প্রশ্নের জবাব দিলাম—আমার কোনো দরকার নেই সেখানে। সেবার আলাপ হয়েছিল, তাই বেঁচে আছে কি না জানতে চাইচি।

—বাঁচবে না তো যাবে কোথায়?

—মেলা হয়?

—পাগল ঠাকুরের মেলা? কেন হবে না, যত বেটা বুনো বাগ্দির গুরুদেব, শুধু ব্যাটারা এসে পায়ের ধুলো নেয়, হৈ-হল্লা করে। ঝাঁটা মারো! গুরু—গুরু! গুরু এমনি গাছের ফল কিনা!

আমি কিন্তু বিকেলেই পাগল ঠাকুরের বাড়ী গিয়ে হাজির। সেবারকার সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতি আমার বালক-মনে একটি রহস্যজনক স্থান অধিকার করে আছে তখনও। আবার তাদের সেই দুখানা খড়ের ঘর, নিকোনো পুঁছোনো গোবর-লেপা উঠোন, ঝিঙের-ফুল-ফোটা গঙ্গার তীরে অপরাহ্ণ শোভা কতকাল পরে দেখলুম।

পাগল ঠাকুরের দাড়ি আরও সাদা হয়ে নারদ মুনির মত দেখতে হয়েচ। তবে বার্ধক্য-জনিত কোনো শীর্ণত্ব বা দৌর্বল্য নেই শরীরে। খুব শক্তসামর্থ্য, লাঠি-লাঠি চেহারা। মুখে সেই হাসি। এবার আর আমি নিতান্ত বালক নই। অনেক জিনিস বুঝি। আগের ভয় আর নেই।

বললাম—তোমাকে বড় ভালো লেগেছিলো সেবার—বড্ড মনে হোতো তোমাকে—

হেসে বললে—গুরুগোসাঁইয়ের কৃপা বাবাঠাকুর, তুমি যে পতিতপাবন, পতিতকে উদ্ধার করতে আসবা না?

—ওসব কথা আমায় বলতে নেই। তুমি আমার নাম মনে রেখেচ যে দেখচি?

—তুমি আমায় মনে রেখেছিলে, তাই আমিও তোমার কথা মনে রেখেছিলাম। আয়নায় মুখ দেখা যে বাবাঠাকুর। যেমন দেখাও তেমনি দেখি।

—একটা গান কর—

ওকে আর দ্বিতীয়বার খোশামোদ করতে হোলো না। সেবারকারের সেই বৃদ্ধাকে দেখলাম এবার। তাকে ডেকে বললে—একতারাটা দ্যাও তো। পতিতপাবন ঠাকুরকে একটা গান শোনাই—কিন্তু বাবা, একটা কথা বলি?

বলে সে হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাইলে।

আমি বললাম—কি?

ও একটা আলাভোলা, অসহায় ধরণের অনুরোধ যেন করচে, এমনি ভাবে বললে—আমি যেমন তোমায় গান শুনিয়ে গেলাম, তুমি পতিত উদ্ধার করতে এমনি ধারা আসবা তো... বলি হ্যাঁগা? ও ঠাকুর?...

নাঃ, ও পাগলামি শুরু করেচে আবার। কাকে কি বলে যে!

পাগল ততক্ষণ একতারা বাজিয়ে গান শুরু করে দিয়েচে—

ও আমার হৃদ্-কমলের পরম গুরু সাঁই,
রেতে আলো দিনে তারা রাত নাই দিন নাই।
তোমার সেথা বাঁশের ঝাড়ে
অরূপ রূপের পাথার পাড়ে
বাঁশের ফুলে ভুবন আলো দেখতে এলাম তাই।
চলার পথে বাদল দিনে তোমার সেই
বাঁশতলাতে দিও ঠাঁই,
ও আমার হৃদ্-কমলের পরম গুরু সাঁই...

সেই ছেলেবেলার শোনা গানটা।...ওর গান গাওয়ার ধরনটা আমার বেশ লাগে। চোখ উল্‌টে উদাস-নেত্রে ওপরপানে চেয়ে—সে ভাবই আলাদা। গলা ভালো নয়, ভাঙা গলা, দুটো বেসুরো সুর যেন গলা থেকে বেরিয়ে আসচে—তাই কি, চোখ দিয়ে যখন ওর দরদর জল নেমে এল, তখন আমাদের গ্রামের বিখ্যাত যাত্রার জুড়ি দাশু পরামানিকের চেয়েও ওকে সুকণ্ঠ বলে মনে হোলো।

আরও একটা, তারপর আর একটা। সরাটির চরে ঝিঙে-ফুল ফুটেছিল সেবার, ঝিঙে-ফুলের হলুদ-ক্ষেত আর পাগল ঠাকুরের গানের ক্ষ্যাপাটে সুর একতারে বাঁধা। ধু ধু সরাটির

চরে. নির্জন সরাটির চরে ঘুলি-ঘুলি আধ-অন্ধকারে কেউ ঝিঙের ফুল ফুটতে দেখেছিলে ত্রিশ বছর আগের এক ভাদ্র সন্ধ্যায়? তা হোলে পাগল ঠাকুরের গান বুঝতে পারবে।

আমি একমনে শুনচি। হঠাৎ গান থামিয়ে ও বললে—কি খাবা?

—কিছু না।

—সে বললে হবে কেন? আমারে পেরসাদ দেবে এখন কে?

—আমি খেতে আসিনি তোমার কাছে। তোমাকে দেখতে এসেচি। পাঁচ বছর পরে এলাম।

পাগল ঠাকুর বিস্ময়ের সুরে বললে—পাঁচ বছর হয়ে গেল এরি মধ্যে? কি জানি, দিন রেতের হিসেব তো রাখি নে। হ্যাঁ, তা তুমি অনেক বড় হয়ে গিয়েচ বাবাঠাকুর। তখন ছিলে এত বড়—ওগো শোনো—

সেই বুড়ী কাছে এসে বললে—কি বলচো? খোকাবাবু কে?

আমি বললাম—চিনতে পারলে না? সেই এসেছিলাম পাঁচ বছর আগে নন্দর মাসতুতো ভাই, আমার নাম পতিতপাবন।

—বাবাঠাকুর, বড় খুশী হলাম তুমি এয়েচ। আর চোখে ঠাওর হয় না আগেকার মত। ভালো আছে?

—হ্যাঁ, তা আছি। এখন ইস্কুলে পড়চি—এবার থার্ড ক্লাসে উঠেচি ফার্স্ট হয়ে।

—তা হবে। তোমাদের সব ভালো হোক, গুরু-গোসাঁইয়ের দয়ায় সব নিরুগী হয়ে থাকো।

পাগল ঠাকুর বললে—ঘরে কিছু আছে? বাবাঠাকুরের সেবায় লাগাও।

আমার দুর্বল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেবা-লাগানোর কাজে এল একটি পাকা পেঁপে। আমি খাচ্চি, ও হাত পেতে বালকের মত সুরে অথচ নারদ মুনির মত দাড়ি নিয়ে আমার ঠাকুরদার বয়সী লোক নিঃসংকোচে বললে—দ্যাও একখানা।

দিলাম। যেন আমার সমবয়সী খেলুড়ে। বললাম—তোমার এখানে থাকতে ভালো লাগে।

পাগল ঠাকুর হেসে বললে—তোমাকেও যে আমার রাখতি ভালো লাগে। থাকবা এখানে?

—ইচ্ছে তো করে। বাড়ীর লোকে থাকতে দেবে না যে।

পাগল ঠাকুর একটা মাটির পাত্র থেকে গুড় তুলে নিয়ে দা-কাটা তামাক মাখলে বসে বসে। একটা কল্কে ভরে তামাক সেজে হাতে করেই টানতে লাগলো। নিজেই একটা হাঁড়ি চড়ালে উঠোনের এক উনুনে।

আমি বললাম—হাঁড়িতে কি হবে?

—বাবাঠাকুর, ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাবো। দুটো চাল দিয়ে যাও গো—

হাঁড়িতে একখুঁচিটাক মোটা রাঙা আউশ চাল ফেলে দিয়ে একটু পরে বড় বড় গোটাকতক পাকা যজ্ঞিডুমুর সামনের জঙ্গলের থেকে পেড়ে নিয়ে আঠা সুদ্ধুই ফেললে হাঁড়িতে। আমি বসে বসে ওর খাওয়ার মজা দেখচি। ও আবার আমার পাশে এসে তামাক খেতে লাগলো। আমায় বললে—বাবাঠাকুর, ওপারের বুনোপাড়া উচ্ছন্নে গেল ওলাউঠোতে। রোজ সেখানে যাই, সারাদিন থাকি, এই খানিকটা আগে এইচি. তাই বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে।

—সেখানে কি কর?

—আমি কি কিছু করি? তিনি—গুরু-গোসাঁই করান। যাদের কেউ নেই. আমার অকেজো হাত দিয়ে তিনি তাদের মুখে জল দেন. ওষুধ দেন। আমার হাত ধন্য হয়ে গেল. আমার হাত না দিয়ে অন্য কারো হাত নিলেই পারতেন। তেনার কৃপা।

—গুরু-গোসাঁই কে, আজ বলতে হবে।

—ওই যে উনি—নিরাকার, সব ঘটে আছেন যিনি। তাই তো তুমি আমার পতিত-পাবন ঠাকুর। তুমিও যা. তিনিও তা—তোমার মধ্যেই তিনি। যারা রুগী. ওলাউঠোয় বমি করচে. হলদে হয়ে গিয়েচে চোখের শির. হাতে পায়ে খিঁচুনি ধরেচে. গলা ঘড়ঘড় করচে—

তাদের মধ্যে জনায় জনায় তিনি! তিনি উঁকি মারেন ওদের চোখের মধ্যে থেকে। বেশ দেখতে পাই—বমি ঘাঁটি, ঘেন্না আসে না, মনে হয় গুরু-গোসাঁইয়ের সেবা করচি! খেলা, সব তাঁর খেলা। তাঁর আবার রোগ! লীলা!

—আমায় নিয়ে যাবে বুনোপাড়ায়? তোমার সঙ্গে যাবো।

—ওরে বাবা রে! অমন কচি সুন্দর নতুন হাত বমি ঘাঁটবার জন্যে নয়! তার এখন দেরি আছে, ও সবের জন্যে তাড়াতাড়ি কি? পড়ো, এখন খুব মন দিয়ে পড়ো।

একটু পরে ও ভাত নামালে। একটা আঙট কলার পাতে ঢেলে যজ্ঞিডুমুরগুলো টিপে টিপে নুন তেল দিয়ে মাখলে। আমায় বললে—কিছু মনে কোরো না বাবাঠাকুর, আমি খাই? হুকুম করো—

আমার অনুমতির প্রয়োজন কি বুঝলাম না। তবু বললাম—বাঃরে, খাও, আমি কি বলবো? খাও—শুধু ডুমুর-ভাতে ভাত খেতে পারবে?

—কেন পারবো না, বাবাঠাকুর। একটা যা হয় হোলেই হোলো। জিবের সুখ যত বাড়াবে, ততই বাড়ে। ওর মধ্যে কিছু নেই। কে হাট-বাজারে ছোটে দুটো খাওয়ার জন্যে? জঙ্গলে গুরুগোসাঁই সব করে রেখেচেন। ডুমুর আছে, তেলাকুচো ফল আছে—

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম—তেলাকুচো?

—হ্যাঁ বাবাঠাকুর, তেলাকুচো ভাতে খাও, ভাজা খাও, তেলাকুচোর পাতা ভাজা খাও—দিব্বি জিনিস! পেয়ারা-ভাতে ভাত খেয়ে এক মাস কাটিয়ে দিই। উঠোনে ওই দ্যাখো পেয়ারা গাছ। পেয়ারা হয় নি, তাহলে তোমায় দিতাম। কেন যাবো বলো হাটে-বাজারে?

—তোমার উঠোনে তরি-তরকারি কর না কেন?

বড্ড খাটতে হয় ওর পেছনে। ঝঞ্চাট। কে অত ঝঞ্চাট করে? সে সময়টা গুরুগোসাঁইয়ের নাম নিলে কাজ হবে। ওই শসার গাছ করা হয় শুধু গুরুগোসাঁইয়ের সেবার জন্যে।

পাগল ঠাকুর খেয়ে উঠে এঁটো পাতা ফেলে দিলে। রাজ্যির কুকুর জড়ো হয়েছিল আগে থেকে, পাতের অনেকগুলো ভাত ওদের সামনে ছড়িয়ে দিলে।

আবার তামাক সাজতে বসলো। তামাক খেতে খেতে বুড়ীকে বললে—পাকাটি দ্যাও গোটাকতক, একটা মশাল করি।

আমি বললাম—কি হবে?

—এখুনি আবার বুনোপাড়ায় যেতে হচ্চে। দুটো রুগী এড়িয়ে আছে, দেখে এসেচি। তাদের ফেলে থাকতে পারবো না। নবীন ডাক্তারকে বলে এসেচি যাবার জন্যে। এখন গুরুগোসাঁইয়ের কৃপা হোলে সেরে উঠতে পারে। আর তিনি যদি চরণে টানেন—তবে হয়েই গেল—আহা-হা!

ওর চোখে প্রায় জল এসে পড়লো। আমার হঠাৎ বড় উদ্বেগ হোলে ওর জন্যে। ও যেন আমার আত্মীয় কতকালের। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—তুমি যেও না সেখানে। যদি তোমার হয়? বড় খারাপ রোগ—

পাগল ঠাকুর হেসে বললে—ওই দ্যাখো, বাবাঠাকুরের কথা। তাঁর নিয়ে সব। তাঁর যদি ইচ্ছে হয় এই খোলসটা বদলাবো, তবে তাই হবে। তিনি যেখানে নিয়ে যাচ্চেন, সেখানে যেতেই হবে। আমি তো যাচ্চি নে, তিনি নিয়ে যাচ্চেন—তাই যাচ্চি। আমি কেউ নই।

একটা অদ্ভুত ভাব ওর মুখে ফুটে উঠলো কথা ক'টা বলবার সময়। বুড়ী বললে—রাত্তিরে ফেরবা তো?

ও বললে—তা বলা যায় না। তুমি ঝাঁপ খুলে রেখো, আসি তো ঝাঁপ খুলে ঢুকবো। চলো বাবাঠাকুর, সন্দে হয়েচে, তোমায় পৌঁছে দিয়ে ওই পথে চলে যাই।

আমি বললাম, আমায় এগিয়ে দিতে হবে না, একাই যেতে পারবো। কারণ মাসিমা টের পেয় যাবেন যে আমি এতক্ষণ কোথায় ছিলাম। তিনি পছন্দ করবেন না আমার এখানে আসা-যাওয়াটা। মনে মনে তা আমি জানি। সুতরাং কতবেলতলা দিয়ে একাই বাড়ী চলে গেলুম। মাসিমাকে পাগল ঠাকুরের কথা কিছু বলি নি। তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করলেন—

ওদিকে গিইছিলি নাকি?

—কোন দিকে?

—পাগল ঠাকুরের আখড়ায়?

হ্যাঁ। একটু বসে ছিলাম। বেশ ভালো লোক। কোথায় কলেরা হয়েচে, নিজে গিয়ে তাদের সেবা করচে রাত্তির বেলাতে।

—হুঁ।

ঐ পর্যন্ত। উনি চুপ করে গেলেন, বুঝলুম না রাগ করলেন কিনা।

তার পরদিন আবার বিকেলে পাগলের আখড়ায় গিয়ে হাজির হই। কিসের একটা টান অনুভব করলাম, না গিয়ে থাকা গেল না।

পাগল ঠাকুর আপন মনে বসে গান করছিল একখানা তালপাতার চেটাই পেতে। ওর গানই ওর উপাসনা, ওর মুখে গান শুনলেই আমার তা মনে হয়েচে। আমার বয়েস কম হোলেও আমি তখন অনেক বুঝি। ওর মত ভক্তি আমি কারো দেখি নি। মাসিমাকে বাড়ী ফিরে কথাটা আমি বলেছিলাম। মাসিমা গীতা নিয়মিত পাঠ করতেন, রামায়ণ মহাভারত তাঁর বড় প্রিয় ছিল, ব্রত উপবাস করতেন, রোজ ভোরে গঙ্গাস্নান করে পুজো-আচ্চা করতেন বেলা নটা পর্যন্ত। কৃষ্ণ ঠাকুরের ছবিতে চন্দন মাখাতেন, ফুল দিতেন। পাগল ঠাকুর ওসব কিছু করে না অথচ সে ভক্ত লোক, এ কথা মাসিমা বুঝবেন না। তবুও মাসিমা মন দিয়ে কথাটা শুনলেন, শুনে চুপ করলেন।

পাগল ঠাকুরকে বললাম—কখন এলে কাল রাত্তিরে?

—সারা রাত ছিলাম বাবাঠাকুর। দুটোই মারা গেল, শ্মশানে গেলাম তাদের ভাসিয়ে দিতে।

—পোড়ালে না?

গরীব লোকদের পোড়াচেচ কে বাবাঠাকুর! কাঠকুঠো কোথায়? গুরুগোসাঁইয়ের নামে গঙ্গার বুকে ভাসিয়ে দিলাম—আর ভাবনা কিসের? দেহটা হাঙর কুমীরে খেলেও দেহ দিয়ে জীবের উপকার হোলো। পুড়িয়ে দিয়ে ফল কি, বলো? ওদের একটা ছেলেকে নিয়ে এলাম আমার এখানে। ওই দ্যাখো, কাঠ কুড়িয়ে আনচে, ছোট ছেলে, কেউ নেই—গুরু-গোসাঁই তাই আমার ঘাড়েই চাপালেন। তাঁর হুকুম।

ও এমনভাবে কথা বলচে যেন ভগবান ওর সঙ্গে পরামর্শ করেন সব কথা, আমার হাসি পেল। যা হোক, ওর মন ভারি সরল।

আমাকে ওই পাগল ঠাকুর ভয়ানক বেঁধেচে, ক্রমে বুঝচি। বিকেল হোলে আসতেই হবে যেন ওর এখানে। ও আমাকে কিছু খেতে দেবে, তারপর গান শোনাবে। কোনো বৈষয়িক কথা ওর মুখে শুনি নি। অনেক পরে বয়েস হোলে এ সব ভালো করে বুঝেছিলাম।

আমি বললাম—তুমি মাছ ধর?

—না, বাবাঠাকুর।

—তোমার বাড়ী কোথায় ছিল?

অন্য লোক হোলে এ কথার উত্তর দেয় না। কিন্তু পাগল ঠাকুরের মত সরল লোকের কোনো কিছুই গোপনীয় নেই। সে বললে—শঙ্করপুর। কাঁচড়াপাড়ার ওদিকে, এখান থেকে আট-ন কোশ।

—বাড়ী ঘর আছে সেখানে?

—কিছু নেই। আমরা গরীব লোক, খড়ের কুঁড়ে ছিল, ভেঙে গিয়েচে, ভিটতে কিছু নেই—মস্ত এক তালগাছ হয়ে আছে, সেবার দেখে এসেছিলাম।

—আপনার জন কেউ নেই?

—এই যে বাবাঠাকুর, ভুল কথা বলে। আপনার জন নেই কেন, এই তুমিই তো আমার আপনার জন। গুরুগোসাঁই সবাইকে আপন করে দিয়েচেন যে! কদিন থাকবে?

—আর দুদিন ছুটি আছে মোট।

—মোটে দুদিন? তারপর চলে যাবা? দুঃখু দিতে আসা কেন বলো তো। তুমি চলে গেলে আমার বড্ড কষ্ট হবে দিন-কতক। বিকেলটা কাটবে না। গুরুগোসাঁইয়ের ইচ্ছা!...

বলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেললে। সেই মুহূর্তে ও আমার বড় কাছে এসে পড়লো, আর দূরের লোক রইল না।

বাকি দুদিনও রোজ বিকেলে ওখানে যাই। বুনোদের সেই ছোট ছেলে এরই মধ্যে নিজের হয়ে গিয়েছে। সে দেখি রান্নাঘরে আউশ চালের পান্তাভাত বেগুনপোড়া আপনিই হাঁড়ি থেকে বেড়ে নিচ্চে দিব্যি। নিজের ঘরের মত।

পাগল ঠাকুর আমায় নিয়ে ছোট ঘরের দাওয়ায় বসে আর গান করে। একতারা বাজিয়ে ওর বেসুরো গলায় যখন গান করে, তখন প্রতিদিন এই গঙ্গার চরে যেন কোন বিরাট দেবের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি...ওদিকে বিষ্ণুপুর গ্রামের বাঁশবন, ঘোষপাড়ার বাবুদের লিচুবাগান —সব কেমন অদ্ভুত মনে হয়, সরাটির চরের কাশবনের পেছনে মস্ত আকাশটা লাল হয়ে ওঠে অস্তসূর্যের আভায়।

আমার অল্প বয়েস বলেই হোক বা যে জন্যেই হোক, কি অদ্ভুত টান যে হয়ে উঠেছিল পাগল ঠাকুরের ওপর! এখন মনে ভাবলে আশ্চর্য হই। বাল্যের সে কয়টি দিনের আনন্দ আর ফিরে পাবো না, তেমন ধরনের আনন্দও আর পাই নি কখনো।

পাগল ঠাকুর গান থামিয়ে একতারা নামিয়ে রেখে একগাল হেসে বললে—আনন্দ করো, আনন্দ করবার জন্যেই এই একপাশে পড়ে আছি। গুরুগোসাঁইয়ের দয়ায় শুধু আনন্দ নিয়ে আছি।

ওর হাসিভরা উজ্জ্বল চোখ দুটি আর নারদের মত সাদা দাড়ি, শিশুর মত সরল মুখ ওর কথার সত্যতা সপ্রমাণ করতো...সেই আনন্দ ছোঁয়াচে রোগের মতো পেয়ে বসতো সবাইকে, যে ওর সংস্পর্শে আসতো।

এর একটা উদাহরণ মধ্যে একদিন প্রত্যক্ষ করলাম। কোথা থেকে একদল মেয়ে-পুরুষ ওর এখানে এল। বোঁচকা-বুঁচকি এক একটা পিঠে বাঁধা। শুনলাম ওরা পাগল ঠাকুরের শিষ্য। ওই যে মাসিমা বলেন, ছোট জেতের গুরু।

কিন্তু গুরুর মত সম্ভ্রমসূচক ব্যবহার করে দূরে রইল না! সবাই একসঙ্গে বসে তামাক খেলে হাতে হাতে কল্কে পরিবেশন করে। পাগল ঠাকুরের চারিদিকে গোল হয়ে বসে একতারা বাজিয়ে গান করলে, হাসিমুশি, আনন্দ, খাওয়া-দাওয়া। ওদের মুখ দেখে মনে হোলো জীবনে ওদের কোন দুঃখকষ্ট নেই। খাওয়া-দাওয়া তো ভারি, পাগল ঠাকুরের ভাণ্ডার কারো আপন নয়, যার খুশি নিজের হাতে চাল বার করে নিচে, বুনোপাড়া থেকে দুটো রাঙা শাকের ডাঁটা নিয়ে এল, ডুমুর পাড়লে—চড়ালে ভাত, নুন ছড়িয়ে সবাই আগুট কলার পাতায় ভাত ঢেলে একসঙ্গে খেলে, গুরুও বাদ গেল না। দিনটা আনন্দ করে সন্ধ্যের দিকে সবাই বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে চলে গেল।

আমিও চলে এলাম তার পরের দিন।

এরপরে আবার সে গ্রামে যাই যেবার ম্যাট্রিক পাস দিয়ে কলেজে ঢুকেচি।...মাসিমা আগের চেয়ে বৃদ্ধা হয়ে পড়েচেন, চোখে ভাল দেখতে পান না।

বললাম—পাগল ঠাকুর বেঁচে আছে?

মাসিমা বললেন—আছে না তো যাবে কোথায়? তোমার বুঝি সেখানে যাওয়া চাই-ই—আহা, কি যে দেখেচ ওর মধ্যে তুমি! ছোটবেলা থেকে দেখে আসচি এই কাণ্ড—

পাগল ঠাকুরকে অন্য চোখে দেখলাম। সেই ছোট খড়ের ঘরের আশ্রম, সেই সদানন্দ সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ, সব তেমনি আছে। চার বছর আগের মত চেহারা আছে, বিশেষ কোনো পরিবর্তন নেই! আমাকে দেখে বললে—বাবাঠাকুর যে! আরে এসো, এসো, তোমার কথা কত বলি। কবে এলে?

—আজই। তুমি ভালো আছ?

—গুরুগোসাঁইয়ের কৃপায় আছি ভালোই। বসো, গান শোনবা?

—গান শোনবার জন্যেই তো আসা।

—শসা খাবা না ছেলেবেলাকার মত?

—না, শোনো, এখন আর ছেলেমানুষ নই। তুমি যা খুশি খেতে দিতে পারো, ভাত পর্যন্ত। ছেলেমানুষ নই আর, কারো এক্তাজারির মধ্যে নেই এখন। তোমার এখানে খাবো, তাতে দোষ কি? রাঁধো না তেমনি ডুমুর-ভাতে ভাত?

পাগল ঠাকুর ভয়ের ভান করে হেসে বললে—ও বাবারে, বাঁওনের জাত মেরে দিই এই সন্দেবেলা! তা হবে না—আর কি খাবা বলো? ওগো শোনো ইদিকে—এঁকে চেনো? সেই যে—

বুড়ী কুঁজো হয়ে পড়েচে আরও, চোখেও ভালো দেখে না মনে হোলো। কাছে এসে বললে—কে?

—ওই সেই যে ভূপেনবাবাদের বাড়ীর ছেলেটি কত বড় হয়েচে আর কি চমৎকার দেখতে হয়েচে দ্যাখো। শোনো, দুটো চাল আর কাঁটাল বীচি ভাজা ভেজে নিয়ে এসো তো, খেতে দিই। চা খাও বাবাঠাকুর, চা করে দিতে পারি। একজন এখানে চা রেখে গিয়েচে, সে মাঝে মাঝে এসে চা খায়। খাবে?

—করো।

চা করতে গিয়ে ওরা দুজনে বিষম বিপদে পড়লো। বুড়ো-বুড়ী নানা পরামর্শ করে, একবার জল ফোটায়, আবার নামায়—আধঘণ্টা হয়ে গেল, রান্নাঘর থেকে বেরোয় না। কাঁসার বাটিতে গরম জল আর চা একসঙ্গে গুড় সহযোগে সিদ্ধ করে অবশেষে এক ব্যাপার করে নিয়ে এল, সবাই মিলে অর্থাৎ তিনজনেই মহা আনন্দে তাই পান করা গেল।

তারপর তামাক সাজতে সাজতে বললে—এইবার কি খবর বলো বাবাঠাকুর—

—তোমায় দেখতে এলাম।

—আমায় কি আর দেখতে আসবা? ভালোবাসো তাই; নইলে আমি কি একটা দেখবার মত লোক?

—জানো, তোমাকে একজন দার্শনিক বলে মনে হয়?

—সে কি বাবাঠাকুর?

—আমার মনে হয় তুমি একজন দার্শনিক। সত্যিকার দার্শনিক—ঋষির মত লোক। তোমাকে লোকে চেনে না।

—ওসব কথা আমায় বলো না। আমাকে তিনি পায়ের দাস করে রেখেচেন। তাঁর দয়া। আমার কোন গুণ নেই, বাবাঠাকুর। আনন্দে রেখেচেন, আনন্দে আছি। গান শোনো—

আমার চোখ অনেকটা খুলেচে আগেকার চেয়ে। বৃদ্ধের সরল পবিত্র মুখভাব আর সহজ আনন্দ ওকে আমার চোখে ঋষির পদবীতে উঠিয়ে দিয়েচে।

পাগল ঠাকুর যদি ঋষি নয়, তবে ঋষি কে? লেখাপড়া জানলে, আর দু-তিন হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষের লোক হোলে, এই লোকেই উপনিষদ রচনা করতো—সরাটির চরের মত উদার হোতো তার বাণী, ঝিঙে-ফুলের সৌন্দর্য থাকতো তার ভাষায়, সন্ধ্যেয় সকালে বাঁশবনের পক্ষীকূজনের মত শান্ত সহজ আনন্দ মিশিয়ে থাকতো তার অঙ্গে অঙ্গে।

কিন্তু একে কেউ চিনলে না।

আমার সারা জীবন ওর দত্ত সহজ আনন্দের মন্ত্রে দীক্ষিত। যেবার বিবাহ করি মাসিমাকে নববধূ দেখাতে গিয়েছিলাম ওঁদের গ্রামে, ভেবেছিলাম পাগল ঠাকুরের ওখানেও নিয়ে যাবো, আসল উদ্দেশ্য ছিল সেটাই—কিন্তু পাগল ঠাকুরকে আর দেখতে পাই নি।

সেও এক বিকেলে গেলাম ওর আখড়াতে। বাবলা গাছের তলায় ওর সমাধি। ওদের সম্প্রদায়ে নাকি সমাধি দেওয়াই নিয়ম। মাটির একটা লম্বা ঢিবি, বাবলাফুল ঝরে ঝরে পড়েচে তার ওপর। কোনো শিষ্য কতকগুলো দোপাটি ফুলের গাছ রোপণ করে দিয়েচে মাটির ঢিবিটার চারিপাশে—পাগল ঠাকরের নশ্বরদেহের হাড় ক'খানা ওরই তলায় মাটি মুড়ি

দিয়ে আছে।

ওকে এখানকার কেউ চিনলে না। আমার মাসিমা তো এত গীতা পাঠ করেন, মন্ত্র জপ করেন, তিনিই বলেন—হ্যাঁ বাবু, তোমার সেই পাগল ঠাকুর আজ বছর দুই হোলো মারা গিয়েচে। কে জানে, ওসব ছোটলোকের খবর রাখি নে, রাখবার সময়ও পাই নে—

সেই বুড়ী কেবল বেঁচে আছে আজও। তাকে সন্ধ্যের পিদিম জ্বালতে দেখলাম সমাধির সামনে। রেড়ির তেলের মাটির পিদিম। খড়ের ঘরের খড় উড়ে পড়েচে। আখড়ার অবস্থা অতি খারাপ, কারো দৃষ্টি নেই এদিকে মনে হোলো। সংসারে এমনিই হয়।

প্রভাতী

সেদিন কি এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হোল নদীর তীরের কানন-ভূমিতে।

জানি, এসব কথা লেখা এত কঠিন! একটা ছত্র যদি লিখতে ভুল হয়, মনের ক্রমের সঙ্গে না মেলে, তবে সবটাই ভুল হয়ে যাবে ; অস্পষ্ট হবে, অবাস্তব ঠেকবে।

তবু আমায় চেষ্টা করতে হবে। সে অভিজ্ঞতার আনন্দ পরকে দিতে হবে। নিজে ভোগ করে চুপ করে বসে থাকা আমার ভাল লাগে না।

বর্ষার দিনের মেঘমেদুর আকাশ। ঠান্ডা দুপুরটি, অথচ বৃষ্টি হয় নি আজ তিন চার-দিন। রাস্তাঘাট শুকনো খটখট করচে। ঘন মেঘ জমে রয়েছে আকাশে, কালো মেঘে অন্ধকার জল-স্থল, বৃষ্টি এল এল, অথচ বৃষ্টি আসচে না। স্নান করতে গেলাম নদীতে ঘরের বাইরে পা দিয়েই কি যে আনন্দ হোল মনে!

সবুজ তাজা প্রাণের প্রাচুর্যে ধরিত্রীর অংক ভরপুর। শ্যামল আভা, সবুজ মটরলতা, মটরলতায় মটর ফল, মাকাল-লতার অগ্রভাগে মাকাল ফল, বুনো যজ্ঞিডুমুর গাছের আর্দ্র গুঁড়িতে থোলো থোলো কচি ডুমুর, ঝোপে ঝোপে নাকজোয়ালের সুদৃশ্য তিনরঙা ফুল (gladiosa superba) দুলচে সজল বাতাসে। সঙ্গে সঙ্গে দুলচে বাঁশের কোঁড়, নদীর গৈরিক জল ; ওপারের কালো নলখাগড়ার গুচ্ছ! আমি নদীজলে অবগাহন করলাম বাঁশ-তলার ঘাটে। স্নান করে উঠলাম সিক্ত বস্ত্রে। উঁচু পাড়, চখা বালির ঘাট, পায়ে এতটুকু কাদা লাগে না কোথাও, আবক্ষ অবগাহন করো, যতদূর যাও ততদূর চখা বালি। নম্র, নতশীর্ষ বেণুবন ঘাটের জলে ছায়া করে থাকে খর রোদের সময়, খড়খড় শব্দ করচে তালগাছে দোদুল্যমান বাবুইপাখীর বাসা। উঁচু পাড় বেয়ে উঠতে ডানধারে এক বিরাট ঝোপ, তার মাথায় মাথায় মটরলতার ঝোপ, আঙুরলতার ঝোপ। কাবুলী আঙুর নয় অবিশ্যি, আমাদের বনে এক রকম অতি সুদৃশ্য লতা বর্ষায় গাছের মাথা বেয়ে গজিয়ে উঠে নিবিড় ঝোপের সৃষ্টি করে, আঙুরের মত খাঁজকাটা পাতা, আঙুরের মত থোকো থোকো ফল ধরে লতার গাঁটে গাঁটে। মটরলতাও যাকে বলচি, মটরের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই—ওকে বলে বড়-গোয়ালে লতা. মটরের মত ছোট ছোট চমৎকার ফল গুচ্ছ গুচ্ছ দুলচে লতাগ্রভাগে. সবুজ কচি পত্রসম্ভার বুনো যজ্ঞিডুমুর গাছের তলায় নিবিড়তার সৃষ্টি করেচে।

আমি ভালবাসি এ ধরনের সম্পূর্ণ বন্য গাছঝোপ দেখতে, নইলে বিহারে চাকুলিয়া মিলিটারী ক্যাম্পের লোহার বেড়ায় দেখেচি পটপটিলতার ফুল—সে আমার ভাল লাগেনি. কেননা তার পাশেই রয়েচে ট্যাঙ্ক, মোটর, ট্র্যাক্টর প্রভৃতি জিনিস—যার পাশেই অদূরে রয়েছে বম্বার প্লেনের সারি। এখানে সে-সবের বালাই নেই। নিভৃত লতাবিতান ও কাননভূমি ও পল্লীনদীর শান্ত তীর, মানুষের উগ্রলোভ ও অর্থোপার্জনের জন্য নিষ্ঠুর স্বৈরাচার—এর জন্যে পটভূমিকা রচনা করে নি।

তারপর যে কথা বলছিলাম।

স্নান করে ঝোপটির কাছে এসে দাঁড়ালাম।

বেশ চমৎকার লাগছিল।

হঠাৎ নিজের মন সংযত করে নানাদিক থেকে মনকে কুড়িয়ে এনে চুপ করে দাঁড়ালাম।

ঠিক যেন দেবদর্শনে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা জগৎ যেন দেখতে পেলাম ঝোপের মধ্যে উঁকি দিয়ে। এতক্ষণ কোথায় কি পাখি ডাকছিল সেদিকে মন দিই নি। এই সময় ঝোপের গভীর অন্তপ্রদেশ থেকে একটা পাখী শুনলাম থেকে থেকে ডাকচে—অনেকক্ষণ থেকেই ডাকচে, বহুদূর থেকে ঘুঘুর ডাক ভেসে আসচে মেঘশীতল আকাশের তলা বেয়ে। মন সমস্তটা কুড়িয়ে এনে যেমন এই ঝোপের দিকে দিয়ে একমনে দাঁড়ালাম, অমনি এই সব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম। অমনি ঝোপের মধ্যে উঁকি মেরে সেই অদ্ভুত, অপূর্ব জগৎটাকে দেখতে পেলাম।

সে জগৎ কি আমি বর্ণনা করতে পারি?

এত সূক্ষ্ম, এত অদ্ভুত ধরণের জগৎ এ!

যে জগতে শুধু বনকলমীর গায়ে বেগুনি ফুল ফোটে, টুকটুকে মাকাল-ফল দোলে, মটর ফলের লতায় টুনটুনি পাখী বসে গান করে, বর্ষার সজল প্রভাতে যজ্ঞিডুমুরের ফল টুপ টুপ করে মাটিতে পড়ে, বনকুসুমের গন্ধ ভেসে আসে—বহুদূরের জগৎ অথচ খুব নিকটের—কিন্তু সে নিভৃত, নিরালা জগৎ অতি নিকটে থাকলেও চেনা যায় না, দেখা যায় না, দৃষ্টির অতীত, স্পর্শের অতীত কোন অনুভূতির রাজ্যে তার অবস্থান—ধরা দেয় না কিছুতেই। কি অবর্ণনীয়, গূঢ় শান্তি ও অপরূপ সৌন্দর্য বহন করে আনে দূর থেকে তার মনোমোহিনী রূপ। তার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না, কতকগুলি প্রতীক দিয়ে তাকে একটুকু বোঝানো যায় কি না যায়। অন্তর্মুখী মন সে জগৎকে একটু স্পর্শ করে যায় মাত্র —সে জগৎকে দেখতে পেলে মনের উদ্বোধনের নব-দ্বারপথে উঁকি দিতে হয়, তবে যদি ধরা পড়ে! আরও কত কি রহস্যময় কথা শোনায় এ জগতের পত্রমর্মরে। মন কোথায় নিয়ে যায় সীমাহারা সৌন্দর্যের রাজ্যে, দৈনন্দিন ক্ষুদ্রত্ব ও বন্ধন থেকে মুক্তির সন্ধান যোগায়—যে-মুক্তি নিরাসক্তির অমরত্বে ঐশ্চর্যশালী, প্রতিদিনের পরিচিত জগতের বহু দূরে সে লোকাতীত-লোকের বাণী মাঝে মাঝে দু'একজন মানুষের কানে এসে পৌঁছায়।

কতক্ষণ অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তখনও সেই নিভৃত, গুপ্ত জগৎ আমার চোখের সামনে ঝলমল করছে মৌন আমন্ত্রণের মুখরতায়। কিন্তু স্কুলের বেলা হয়ে গেল, দাঁড়ানোর উপায় নেই আমার। মনটাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে আসতে বাধ্য হলাম সে জগতের দূরাগত বংশীধ্বনির মূর্ছনা থেকে।

সেদিনই আবার বাঁশতলার ঘাটে অবগাহন করতে নামলুম সন্ধ্যার আগে। বর্ষার অপরূপ মেঘমেদুর অপরাহ্ন, পাখী তেমনিই ডাকচে, বনকলমীর ফুল তেমনি ফুটে আছে, মটরলতা তেমনি দুলচে—কিন্তু লতা-বিতানের নিরালা ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি—ও-বেলার দেখা সে রহস্যময় জগৎ অন্তর্হিত হয়েচে। কিছুতেই তাকে আর খুঁজে পেলাম না।

মড়িঘাটের মেলা

আমাদের গ্রাম্য নদীর ধারে মড়িঘাটা বলে ছোট একটা গ্রাম; ক'ঘর বুনোর বাস। এ জেলায় যখন নীলকুঠীর আমল ছিল, দোর্দণ্ডপ্রতাপ নীলকুঠীর সাহেবরা টমটম হাঁকিয়ে চলে যেত নদীর পাশের চওড়া ছায়াচ্ছন্ন পথ বেয়ে, তখন শ্রমিকের কাজ করবার জন্যে সাঁওতাল পরগণা থেকে যে সব লোক আমদানী করা হয়েছিল, তাদেরি বংশধরগণ এখন একেবারে ভাষায় ধর্মে, আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাঙালী হয়ে পড়চে—এদেশে তাদের বলে 'বুনো'। সমাজের নিম্নস্তরের শেষ ধাপে এদের স্থান। লোকের কাঠ কেটে, ধান মেড়ে, দিনমজুরি করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। সারাদিন খাটুনির পরে তাড়ি খায়। এই তাড়ি খাওয়ার জন্যেই এরা ঘৃণিত হয় পল্লীসমাজে। পল্লীগ্রামে হিন্দু বা মুসলমান চাষীমহলে মদ কেউ ছোঁয় না। ওটা ভদ্রলোকেদের একচেটে ব্যাপার।

মড়িঘাটা নদীপথে চার ক্রোশ আমাদের ঘাট থেকে।

সেবার মাঘী পূর্ণিমার দিন গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা যাচ্ছে কেউ নবদ্বীপে কেউ গৌরনগরের

ঘাটে। উভয় স্থানই বহু দূর আমাদের গ্রাম থেকে। যাদের নিজেদের গরুর গাড়ী আছে, তারা আগের রাত্রে গাড়ী চড়ে চলে গিয়েছে আঠারো উনিশ মাইল দূরবর্তী গোরনগরের গঙ্গা-তীরের দিকে। অপেক্ষাকৃত সাহসী ও চালাকচতুর যাত্রীরা যাবে ট্রেনে উঠে নবদ্বীপ।

রাধা দুধ দিতে এসে বললে—বাবু, গঙ্গাচানে গ্যালেন না?

—যে ভিড়। মেয়েদের নিয়ে অতদূর যাওয়া—

—তবে মাড়ঘাটা যান বাবু নৌকো করে। কত লোক যাচ্চে।

—সেখানে গঙ্গা কোথায়? মড়িঘাটায় গিয়ে কি হবে?

—না বাবু, সেখানে আজ গঙ্গা আসেন।

—কে বললে?

—সেখানে এক বুনো সাধু আছে, তাকে মা স্বপ্ন দিয়েছেন। আজ দুবার হোল মাঘী-পূর্ণিমার দিন গঙ্গা সেখানে আসবেন। মা বললেন, গরীব দুঃখী লোক, যারা নবদ্বীপে বা গোরনগরে পয়সা খরচ করে যেতি পারে না—তাদের উদ্ধার করবার জন্যি ঐ মড়িঘাটাতে তিনি আসবেন একদিনের জন্যি। সব গরীব দুঃখী লোক সেখানে যায় আজ দু'বছর ধরে। মস্ত মেলা বসে। যান না আপনি!

কথাটা লাগলো ভালো। গঙ্গাস্নানে উদ্ধার হবার বাসনা যত থাক না থাক, অনেক লোক যেখানে এসে জোটে পুণ্য অর্জনের আশায়, সে স্থানের অসাধারণত্ব অনস্বীকার্য।

অক্রুর মাঝির নৌকো ভাড়া করে সবাই মিলে রওনা হই মড়িঘাটার দিকে। আমাদের পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে আমাদের সঙ্গে চলেচে মেলা দেখতে। যেখানে মাঠে কুল পেকেচে সেখানেই তারা নৌকো লাগাবে ডাঙ্গায়, হৈ হৈ করে কুল পাড়তে ছুটবে, ছোলাক্ষেতে ঘুঘু মারবার চেষ্টা করবে গুলতি ছুঁড়ে, ছোলার ফল তুলবে। প্রথম বসন্তে মাঠে মাঠে ঘেঁটুফুল, বড় বড় শিমুল গাছে শিমুল ফুলের মেলা, কোকিল ডাকচে, জলপিপি চরচে শেওলার দামে, বাতাসে ঘেঁটুফুলের তেঁতো গন্ধ আর শুকনো কশাড়ঝোপের গন্ধ ভেসে আসচে।

মড়িঘাটা পৌঁছুতে বেলা বারোটা বেজে গেল।

দূর থেকে একটা কোলাহল কানে গেল। বহুলোকের সমাগম হয়েছে বটে। আমাদের নৌকা ভিড়লো একটা প্রাচীন বটবৃক্ষের ছায়ায়—সেখানে আমাদের মত অমন কত নৌকো ভিড়েচে। বটতলায় কত লোক রান্না করে খাচ্ছে। মেয়েদের ভিড় বটতলার ওপাশের ঘাটে—সেখানে সবাই স্নান করচে, গঙ্গা নাকি মাত্র সেই জায়গাটুকুতেই আসবার অঙ্গীকার করেছিলেন সেই বুনো সাধুর কাছে। সুতরাং সেখানেই ভিড় করেচে স্নানার্থীরা, তার এক হাত এদিকেও নয়, এক ফুট ওদিকেও নয়।

অক্রুর মাঝি বললে—মেয়েদের নিয়ে এপারের ভিড়ে কষ্ট হবে। চলুন ওপারে। ওপারে সেই বুনো সাধুর আখড়া। আপনি গেলি জায়গা দেবে। ওই দেখা যাচ্চে তেনার আখড়া। ওপারে রান্না করে খাওয়ার জায়গা হবে'খন। নইলি এপারে কনে বা কাঠ কনে বা উনুন—

মেয়েরা বললেন, আগে তাঁরা মেলা বেড়িয়ে দেখবেন।

মেলা বেড়াতে গেলেন মেয়েরা। আমিও সঙ্গে আছি। তেলেভাজা বেগুনি ফুলুরির দোকান, খেলনার দোকান, ঘুনসি ফিতে চিরুনির দোকান, চায়ের দোকান। ভিড় বেশী লেগেছে তেলভাজা খাবারের দোকানে আর তার চেয়েও ভিড় চায়ের দোকানে।

পাড়াগাঁয়ে চায়ের দোকানে ভিড় বেশী হয়। এখানে যারা এসেচে, এদের মধ্যে চা অনেকেই বাপের জন্মে খায়নি। শৌখীন জিনিস হিসেবে অনেকেই এক পেয়ালা কিনে চখে দেখচে। বুনো, কাওরা, মালো, ডোম, বাগদি, মুসলমানদের ভিড় বেশী এ সব মেলায়। হ্যাঁ, মুসলমানদেরও। তাদের মেয়েদের উৎসাহ কোনো অংশে কম নয়। 'গঙ্গা'স্নান তারা অবিশ্যি করে না, কিন্তু মেলা দেখতে আসে ও জিনিসপত্তর কেনে।

চায়ের দোকানের ভিড়ের মধ্যে দেখি মা অনিচ্ছুক ছোটছেলের মুখের কাছে চায়ের ভাঁড় ধরে বলচে—খেয়ে নে, অমন করবি তো—এরে বলে চা—ভারি মিষ্টি—দ্যাখো খেয়ে—ওষুধ—জ্বর আর হবে না—আ মোলা যা ছেলে। চার পয়সা দিয়ে কিনে এখন আমি

ফেলে দেবো ক'নে? মুই তো দু ভাঁড় খ্যালাম দেখ্‌লি নে? খা—

সরলা পল্লীবধূদের ঠকিয়ে মহকুমা শহুরের ঘুঘু দোকানদার অবিনাশ মোড়ল মনিহারি জিনিস বিক্রি করচে।

—এরে বলে 'সোহাগী' সাবান! গরম জলে করে মেখে দ্যাখো না নিয়ে গিয়ে। ভুর ভুর করবে গায়ে গন্ধ! চুলকুনি সেরে যাবে ছেলেদের। সাড়ে ন' আনা দাম, তা তোমাদের কাছে আলাদা কথা, দুটো পয়সা কম দিও। দাও পয়সা—বাবু যে! ভালো আছেন? মা'দের এনেচেন বুঝি? বেশ বেশ। প্রাতোপেন্নাম! একটা সিগারেট খান—আসুন—আচ্ছা, পেন্নাম হই—আসবেন তাহলে এর পর দয়া করে। রান্নাবান্না করবেন ওপারে? সেই ভালো—এপারে সাত্তিক জাতের ভিড়—

কিন্তু কি চমৎকার লাগে এদের আমোদ, উৎসাহ, ফুর্তি! বছরে একদিন—মেলা, এমন উৎসব আসে ওদের জীবনে। আর সব দিন এরা বেগুন পোঁতে, ধান মাড়ে, কলাই মাড়ে, হলুদ শুকোয়। আজ এসেচে ছেলেমেয়ের হাত ধরে মেলা বেড়াতে। খাবে না চা, কিনবে না 'সোহাগী' সাবান?

নদীর ধারে লোকেরা রেঁধে খাচ্চে। সবাই কিনচে নূতন হাঁড়ি, মাছ ও আলু। আমার বেশী ভাল লাগে দেখতে লোকে কি খায়। বেশীর ভাগ লোকে রেঁধেচে মাছের ঝোল আর ভাত। আলু ও বেগুন কুটে দিচ্চে ঝোলে। আলু ভাতে, বেগুন ভাতে মাখচে নুন-তেল দিয়ে, যাদের ভাত হয়ে গিয়েছে। কপি বিক্রি হচ্চে চড়া দামে। এ অঞ্চলে কপির চাষ নেই, ওটা শৌখীন শহুরে আনাজ বলে গণ্য। কপি সবাই কেনে নি, যারা কিনেচে তারা অনেকে রেখে দিয়েচে বাড়ী নিয়ে গিয়ে পাঁচজনকে দেখিয়ে খাবে। খুব গরীব যারা তারা রাঁধচে শুধু আলু বা মানকচু ভাতে ভাত। একটি মা ও ছেলে একটা আগুট কলার পাতে একত্রে খেতে বসেচে, মোটা লাল আউশ চালের ভাত একরাশ, তার সঙ্গে ছোট্ট এতটুকু আলুভাতে। তার পাশেই একদল বড় বড় কই মাছ ভাজচে দেখে ছোট ছেলেটা বলচে—দ্যাখ্ মা, কত বড় মাছ? কই মাছ খাবো মা—

—চুপ কর। ওদিকে তাকাতে নেই—খেয়ে নাও—নংকা খাবি? নংকা মেখে দেবো?

একজন কুলের অম্বল সাঁতলাচ্ছে ওপাশে।

আমাদের বেলা হয়ে যাচ্চে। মাছও কিনতাম, কিন্তু মাঝি বলে দিয়েছিল সাধুর আখড়াতে মাছ রান্না চলবে না। নৌকো নদী পার হোল। ওপারে মাঠের মধ্যে ঠিক নদীর ধারে সাধুর আশ্রম, পাঁচ-ছ'খানি খড়ের ঘর, নিচু চালা, নিচু দাওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিকোনো-পুঁছোনো ঘরগুলি। গোবর দিয়ে লেপা চওড়া উঠোন। উঠোনের মাঝখানে বাতাবিলেবু গাছ থোকা থোকা সাদা ফুল ও কুঁড়ি, মনমাতানো ভরভুরে তীব্র গন্ধ দুপুরের বাতাসে।

অনেক যাত্রী আশ্রয় নিয়েচে ঘরের দাওয়ায়, বাতাবিলেবুতলার ছায়ায়। এরা কিন্তু রাঁধচে না। আখড়ায় আজ মচ্ছব, বড় বড় হাঁড়িতে খিচুড়ি রান্না হচ্চে, সাধুর শিষ্যবর্গ মচ্ছবের প্রসাদ খাবে। আমাদের মাঝি গিয়ে আমাদের কথা বলতেই সাধু বেরিয়ে এল। বিনীত ভাবে হাত দুটি জোড় করে বললে—আসুন বাবাঠাকুর। বামুনের পায়ের ধুলো পড়লো। বড্ড ভাগ্যি আমার।

বললাম—আপনার আখড়াটি বেশ ভালো দেখছি।

—আপনাদের দয়া।

আঙুল ঊর্ধ্বদিকে তুলে বললে—আর তেনার দয়া। সে জনার দয়া। তা একটা কথা হচ্চে, এসেছেন যখন দয়া করে তখন রান্নাবান্নার যোগাড় করে দিই। মা ঠাকুরুণ তো আছেন—

বললাম—অন্য কোনো জোগাড়ের দরকার নেই। সব আছে আমার সঙ্গে। আপনি শুধু রান্না করবার একটা স্থান দেখিয়ে দিন আর উনুন খুঁড়বার জন্য দয়া করে একখানা শাবল যদি থাকে তো পাঠিয়ে দিন। মাঝি উনুন খুঁড়ে দেবে এখন। ঐ মাঠে শুকনো কাঠ পাওয়া যাবে না?

সাধু হেসে বললে—ওর জন্যি কিছু ভাববেন না। পুব পোতার ঘরখানা নিকোনো পুঁছোনো আছে, ওর দাওয়ায় নতুন উনুন পাতা আছে। কেউ রাঁধেনি সে উনুনে। কিন্তু একটা কথা বাবু—

—কি?

হাত জোড় করে বললে—চাল ডাল আমি দেবো—

—না না, কেন আপনি দেবেন? আমাদের সঙ্গে সব আছে। আমাদের শুধু একটু জায়গা দেখিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে।

সাধু দুঃখিত হোল বুঝলাম ওর মুখ দেখে, কিন্তু আর কিছু বললে না।

একটু পরে আমরা দলবলসুদ্ধ গাঙের ধারের ঘরখানা দখল করে নিজেদের জিনিসপত্তর সেখানে আনিয়ে নিলাম নৌকো থেকে। সাধু নিজে এসে দুখানা নতুন মাদুর বিছিয়ে দিয়ে গেল দাওয়ায়, বললে—মা ঠাকরুণদের জন্যে একখানা মাদুর ঘরের মধ্যে দেবো এনে?

—না, আমাদের সঙ্গে শতরঞ্জি রয়েচে।

সাধু ডাকলে—হরিদাসী, ও হরিদাসী—ইদিকে শুনে যাও—এনাদের জল তুলে এনে দাও—

একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের সুন্দর বৌ আধঘোমটা দিয়ে এসে দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে বললে—কি বাবা?

—এনাদের এখানে থাকো। যা লাগে এনে দাও। তেঁতুলতলা থেকে চালা করা শুকনো বড়ার কাঠ যত লাগে এনে দাও—মা ঠাকরুণকে শুধোও কি লাগবে।

বৌটি হাসিমুখে দাওয়ায় উঠে এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করলে। তারপর ছুটলো কাঠ আর জল আনতে। বার বার ছুটোছুটি করে সে এটা ওটা আনতে লাগলো, কেননা শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, অনেক জিনিসই আমাদের আনা হয়নি বাড়ী থেকে—যেমন, হাতা আনতে ভুল হয়েচে, জল রাখবার বালতি বা ঘড়া নেই, ডাল ঢালবার পাত্র নেই, শুকনো লঙ্কা খুঁজে পাওয়া গেল না মসলার পুঁটলিতে ইত্যাদি। আমার স্ত্রী অপ্রতিভ মুখে আমার দিকে চেয়ে আমার ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দেবার চেষ্টায় বললেন—বাবাঃ, যে তাড়াতাড়ি তোমার—ওতে কি সুশৃঙ্খলে সব জিনিস গোছানো যায়? অত হুড়বড়ানিতে মাথা গুলিয়ে যায় না?

আমি নির্বিকার ভাবে অন্যদিকে চেয়ে থাকি।

ইতিমধ্যে সাধু বাবাজি একটা বড় আড়াইসেরা পালি ভর্তি মুড়কি এবং একছড়া সুপক্ক মর্তমান কলা নিয়ে এসে বললে—বাবু, সেবা করুন—

—এ সব আবার কেন?

—কেন বাবু, আমরা এতই অধম জাত যে আমাদের কোনো জিনিস নেবেন না?

—নিচ্চি তো। জল নিচ্চি, কাঠ নিচ্চি, বাসন-কোসন নিচ্চি—তা হোলে কি নিলাম না বলুন! খাবারদাবার কেন আবার—

—তা হোক। আমার আখড়ায় আপনাদের মত লোক কখনো আসে নি। আমি জেতে বুনো। ভেক নিয়ে বোষ্টম হইচি। তেনার দয়া। কি বুঝি বলুন? আমার নাম ছিল রামলাল বুনো। আমার বাপের নাম ছিহরি বুনো। তিনি তবলদার ছিলেন। ভদ্দর-নোকের বাড়ী কাঠ কেটে সংসার নির্বাহ করতেন। তেনার বয়েস হয়েছিল অনেক, এক কম একশো বছরে মারা যায়। আমার বয়েস কত বলুন দিকি বাবু?

সাধুর চেহারা বেশ ভালো লেগেছিল আমার। খুব মোটা, জোয়ান লম্বা চেহারা। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি—অথচ অথর্ব গোছের মোটা নয়, বেশ বলিষ্ঠ, কর্মকুশল হাত পা। লম্বা ধরনের খুব বড় মুখখানা, মস্ত বড় বড় জ্বলজ্বল চোখ দুটো, নারদ ঋষির মত এতখানি সাদা দাড়ি। মাথায় লম্বা চুল পেছন দিকে মেয়েদের মত ঝুঁটি করে বাঁধা, অথচ মুখখানিতে বালকের সারল্য ও হাসি। যাত্রাদলের মহাদেবের মত দেখতে।

বললাম—কত হবে, ষাট-বাষট্টি?

সাধু হেসে বললে—বিশ্বাস করবেন না। উনআশি বছর যাচ্ছে তেনার দয়ায়—

সত্যিই আশ্চর্য হবার কথা। এমন মর্দ জোয়ান পুরুষটাকে আশি বছরের বুড়ো কোনো ক্রমেই ভাবা যায় না। মুখের চামড়া মসৃণ, অকুণ্ঠিত, বালকের মত। একটি রেখা নেই কোথাও মুখে। অবিশ্যি সেটা খানিকটা সম্ভব হয়েচে মেদবাহুল্যের দরুণ। অবাক হয়ে সাধুর দিকে আমি চেয়ে রইলাম।

—বাবু, বিশ্বাস না হয় অম্বরপুরের কাছারীর পুরনো কাগজ দ্যাখবেন। ১৩০১ সালের বন্যের সময় আমি কাছারীতে পেয়াদা ছিলাম। তখন আমার উঠ্‌তি বয়েস। নাঠি ধরতে পারি। শড়াক ধরতে পারি।

—তারপর?

—তারপর এ পথে আলাম। তেনার হুকুম হোল। তা অনেকদিন ভেক নিইচি, আজ ছত্রিশ-আটত্রিশ বছর হবে। বিয়েথাওয়া করি নি, এই আখড়া যেখানে দ্যাখচেন, এখানে জঙ্গল ছেল, কি গহিন্ জঙ্গল। বাঘ থাকতো। জঙ্গল কেটে আখড়া জমাই।

—ভাল লাগে?

—বড্ড আনন্দে থাকি বাবু। শিষ্যিসেবকরা আসে, সন্দেবেলা জ্যোচ্ছনা ওঠে। গাচের ধারের বড় ঘরখানা হোল ঠাকুরঘর। ওর দাওয়ায় বসে খোল কত্তাল বাজিয়ে হরিনাম করি। একটা কথা বাবু, পথচলতি লোক আমার আখড়ায় এলি ফিরতি পারে না। চাল দেই, ডাল দেই,—রেঁধে খাও, আমি ছোট জাত, আমাদের হাতে তো খাবা না? রান্নাবাড়া করো, খাও, মিটে গেল। মানুষের এট্টু সেবা, তা করবার ভাগ্যি কি আমার হবে? তেনার দয়া। বাবু, তামাক সেবা করেন?

—হ্যাঁ, তবে আমার কাছে বিড়ি আছে।

—তামুক সেজে আনি, বসুন।

নদীর ধারে ক্রমে বেলা পড়লো। সাধুর আশ্রমে ভিড় বেড়ে গেল খুব। মচ্ছবের কীর্তন শুরু হোল বাতাবিলেবুর তলায়। সাধু সর্বদিকে তদারক ক'রে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসে। কিন্তু একদন্ড সুস্থির হয়ে বসতে পায় না। এ এসে বলে, একটা ঘড়া দাও, ও এসে বলে, একটা ঘটি দাও। সাধু উঠে উঠে গিয়ে তাদের জিনিস দিয়ে আসচে। যে যা হুকুম করছে, তখুনি তামিল করচে। এতটুকু অহংকার নেই, সাধু-গিরির দম্ভ নেই, যেন সবারই ও চাকর। অনেক লোক আখড়ার বড় উঠানে ইতস্ততঃ রেঁধে খাচ্চে। সবাই মচ্ছবের ভাত খাবে না বুঝলাম।

একবার হরিদাসী এসে বললে—বাবা, নামযজ্ঞ শেষ হয়েছেন, কিছু মুখে দেন এবার। সকাল থেকে খাননি।

সাধু বললে—আগে ওদের সকলকে পাতা করে বসিয়ে দাও। আমার খাওয়ার জন্যি ব্যস্ত কেন?

তখন বেলা পাঁচটা হবে। আশ্চর্য হয়ে বললাম—সকাল থেকে কিছু খাননি?

হরিদাসী বললে—বাবার ওই রকম। সন্দের আগে একবার খান। অন্যদিন সকালে পেঁপে খান, কলা খান, আজ তাও খান নি। আপনি কিছু না মুখে দিলে আমি খেতে বসবো না বাবা।

সাধু হেসে বললে—আচ্ছা যা মা। একটু গুড়জল নিয়ে আয়। মাল্‌সা ভোগ নিবেদন হয়েচে? যা, বাবুদের জন্যি একটা ভালো দেখে মালসা নিয়ে আয় দিকি আগে। দুখানা পাটালি বেশী করে দিয়ে আনিস। বাবুদের মাল্‌সা ভোগ খেতে কোনো আপত্তি নেই তো?

—না, আপত্তি কিসের?

হরিদাসী চলে গেল এবং খানিক পরে একটা মাল্‌সা ভোগ আমাদের সামনে নিয়ে এসে রাখলে! রান্না হচ্ছিল পাশের ঢেঁকিশালের এক কোণে। হরিদাসী সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—বাবু, আপনাদের রান্না নেমে গিয়েচে। কলার পাতা কেটে আনি, জায়গা করে দিই—খেতে বসুন, বেলা নেই।—সে আবার চলে গেল।

জিগ্যেস করলাম—বৌটি কে?

—ওরা গোয়ালী। কাছেই কামদেবপুরে বাড়ী। আমাকে বড্ড ভক্তি করে। একেবারে

যেন আর-জন্মের মেয়ে কি মা! ওরা স্বামী-স্ত্রী আমাদের এখানে মচ্ছবের অন্নভোগ খায়। অনেকে খায়।

আমাদের খাওয়ার সময় সাধু কতবার যে এল গেল, হাতজোড় করে ঢেঁকিশালের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। খাওয়ার শেষে যখন হরিদাসী বড় একবাটি জ্বাল দেওয়া দুধ হাতে ঢুকলো, তখন আমরা প্রতিবাদ জানালাম। দুধ কেন আবার? হরিদাসী জানালে এ দুধ তার নিজের হাতে জ্বাল দেওয়া, খেতে কোনো আপত্তি হবার কারণ নেই।

সাধু বললে—সেবা করুন বাবু। আমি ওরে বলেছিলাম বাবুদের জন্যি দেড় সের দুধ আলাদা করে ক্ষীরের মত জ্বাল দ্যাও। ও'দের খাওয়ার কষ্ট হবে।

আহারাদির পর বেলা একেবারে গেল। অম্বরপুরের মাঠের বন্য ফুলগাছগুলোর পেছনে টক্‌টকে রাঙা সূর্যটা অস্ত যাচ্চে। লেবুফুলের সুবাস ছায়াস্নিগ্ধ বাতাসকে মদির করে তুলেচে। শুকনো কশাড়ঝোপের গন্ধ আসচে গাঙের ধার থেকে। মেলা-ফেরত যাত্রীরা আখড়ার সামনে গরুর গাড়ীতে উঠে নিজের নিজের গ্রামে রওনা হচ্ছে। খেয়াঘাটে একখানা যাত্রীবোঝাই নৌকো এপারের দিকে আসচে। মেলা থেকে যারা বাড়ী ফিরচে তাদের কারো হাতে তেলেভাজা পাঁপরের গোছা, কারো হাতে একটা কপি, কারো হাতে নতুন বঁটি।

মাঝি আবার ওপারে গেল মেয়েদের নিয়ে। যাবার আগে অপরাহ্ণের ছায়ায় আর একবার মেলা দেখতে চায় মেয়েরা। আমি গেলাম না। সাধুর সঙ্গে বসে গল্প করছি দেখে স্ত্রীও কিছু বললেন না।

সাধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—যাক, এ বছরের মত মেলা শেষ হয়ে গেল। আবার যদি বাঁচি আসচে বছর, তখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আসবেন তো বাবু?

কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, একটা কথা। মড়িঘাটের এখানে গঙ্গা আসেন কে নাকি স্বপ্ন দেখেছিল? আপনি নাকি?

সাধু গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে। কেমন এক অদ্ভুত ধরনের হাসি ওর দাড়ির জাল ভেদ করে ওর সারা মুখখানায় বিস্তারলাভ করল। কি চমৎকার জ্ঞান ও কৌতুক মিশ্রিত হাসির ছবি. যেন অতি প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ ঠাকুরদাদা কৌতুক ও করুণার হাসি হাসচেন তার অবোধ নাতিটির প্রশ্ন শুনে।

বললে—স্বপ্ন-টপ্ন নয়। এখানকার গরীব লোকে পয়সা খরচ করে গঙ্গায় নাইতে যেতে পারে না মাঘী পূর্ণিমায়। তাই রটিয়ে দিয়েছি মা গঙ্গা এই মড়িঘাটের গাঙে আসবেন বলেচেন আমার কাছে পূর্ণিমার যোগের দিন। মন শুদ্ধ করে নাইলে এখানেই গঙ্গা! তিনি নেই কোন্ জায়গায়?

সন্ধ্যা হবার আগেই সাধুর কাছে বিদায় নিয়ে যখন নৌকোয় উঠি তখন ওপারের সেই বটগাছটার পিছন থেকে মস্ত বড় চাঁদখানা উঠচে। এপারের চিক্‌চিকে চখা-বালির ঘাটে হাতজোড় করে বুনো সাধুটি দাঁড়িয়ে বলচে—মা-ঠাকরুণকে নিয়ে আবার আসবেন বাবু সামনের বছর।—ভুলে যেও না মা তোমার বুড়ো খোকাকে। দণ্ডবৎ হই মা—যদি বেঁচে থাকি সামনের বছর পায়ের ধুলো যেন পড়ে—।

দেখি আমার স্ত্রীর চোখে জল।

কুশল পাহাড়ী

ভাদ্রের শেষে মনোহরপুর বেড়াতে গিয়েছিলুম সেবার। কাছেই অরণ্যময় সুন্দরগড় স্টেট। মনোহরপুর স্থানটা চারিধারে শৈলাচলে ঘেরা। বেড়াতে এসেছিলুম দুদিনের জন্যে. এখানে থাকবো ঠিক করেছিলুম ডাকবাংলায়। কিন্তু আলাপ হয়ে গেল স্থানীয় এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি নিয়ে গেলেন তাঁর বাসায়, ছাড়লেন না কিছুতেই।

আমি বললাম—আপনার অসুবিধে হবে। হয়তো বেশিদিন থাকবো।

তিনি মৃদু হেসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আঃ বাঁচলুম। দুমাসের বেশিও কি থাকবেন?

—না।

—থাকুন না?

—না।

—তবে কেন 'কিন্তু' করচেন? প্রবাসে বাঙালীর বন্ধু বাঙালী। স্বদেশে তা নয়। জানেন তো সঞ্জীববাবুর উক্তি? যতদিন ইচ্ছে থাকুন। নিজের বাড়ী মনে ভাববেন।

মনোহরপুর থেকে ন' ক্রোশ দূরে কুশল পাহাড়ীর 'ভৈরব থান'—অর্থাৎ দেবতার ক্ষেত্র। একদিন মন্মথবাবু বললেন—যাবেন সতীশবাবু একটা খুব ভালো জায়গায়?

—কোথায়?

—ভালো একজন সাধু আছেন ওখানে। বড্ড জঙ্গল। রাস্তাও দুর্গম। গরুর গাড়ীতে যেতে হবে।

—আমার সাধু-সন্নিসিতে দরকার নেই। জঙ্গল আছে তো?

—রাম জঙ্গল।

—তবে যাবো।

সুন্দরগড় আরণ্য-প্রকৃতির লীলানিকেতন। পথে পথে করম গাছের ফুলের ঝরা পাপড়ি বিছানো। লম্বা-ঠোঁট ধনেশ পাখী ও বনটিয়া ডালে ডালে বেড়াচ্চে। ক্বচিৎ কোনো পর্বতচূড়ায় প্রভাতের সোনালী রোদ এলানো, ক্বচিৎ কোনো পার্বত্য ঝর্ণার জলের ধারে লোহাজালি ফুল ফুটে পাথর ঢেকে ফেলেচে। পথেরও শেষ নেই, অরণ্যেরও শেষ নেই, মুক্ত শৈলমালাবেষ্টিত ভূমিশ্রীরও শেষ নেই, প্রান্তরেরও শেষ নেই। বনে বনে ময়ূর, বনে বনে কোটরা, ভালুক, লেপার্ড।

গরুর গাড়ী চলেচে মন্থর গতিতে। কখনো ঢালু পাহাড়ীপথ উঠচে আমলকী গাছের ফলভারানত শাখাপ্রশাখার ছই ঘেঁষে। কখনো কূল ছড়ানো উপত্যকা বেয়ে নামচে জলভরা নালার দিকে। কালীপাহাড়ীর শৃঙ্গ ঠেলে উঠেচে ঘন বনের ওপরে ভিসুভিয়াসের মোচাকৃতি শিখরদেশের মত।

সকালে গরুর গাড়ী ছাড়া হয়েছিল। সঙ্গে ছিল চিঁড়ে, চিনি, কলা, দই, পাকা পেঁপে, বাড়ীর তৈরি ক্ষীরের সন্দেশ ও আচার। পথে যোগাড় করে নিলাম বড় বড় ডাঁসা আমলকী, পাকা বনডুমুর, কাঁচড়াদাম শাক। বর্ষার দিনে পথের এই সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। ভাবছিলুম আজ এ বন যেন শেষ না হয়। শেষ হলেই তো এ মায়া ফুরিয়ে যাবে। আবার পড়বে লোকালয়, তখুনি শুরু হবে ব্ল্যাকমার্কেট, খবরের কাগজ, হপ্তায়-একদিন-ভাত-খেও-না-উপদেশ, উদ্বাস্তু-সমস্যা। এই রকম মায়া-জগতের মধ্যে দিয়ে যতদিন চলে চলুক গাড়ী।

বেলা বারোটা।

একটা কি বন্য নদী বনের ছায়ায় ছায়ায় ছোট জলপ্রপাত তৈরি করে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলেচে। বর্ষার উচ্ছল জলস্রোতে প্রাণবন্ত।

বললাম সঙ্গীকে—কি নদী মশাই?

—কোয়েল নদীর শাখা।

—দক্ষিণ কোয়েল?

—নিশ্চয়। এই নদীর জলে এক রকম পাথর পাওয়া যায়, বেশ সুন্দর রং। আপনাকে দেখাবো...মনে হবে চাইনিজ্ জেড্। আসুন আগে একটা বড় পাথর আছে—তার ওপর বসে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে।

—আপনি কতবার এসেচেন এদিকে?

—ভৈরব থানের সাধুজির সঙ্গে দেখা করতে চারবার এসেচি। দেখবেন, তিনি সাধারণ সাধু নন। ভক্তি হবে আপনার।

—'এমন কি আপনারও' বলা উচিত ছিল বোধ হয়। আমার মতামত তো কাল

শুনলেনই।

সেই প্রকান্ড পাথরখানাতে একটা শতরঞ্জি বিছিয়ে আমরা বসে পড়লুম। ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল, এ উক্তি আমাদের পেটের অবস্থার তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল ও অবাস্তব। ক্ষুধায় আমাদের পেটের ভেতরটা দাউ দাউ করে জ্বলছিল। এ দেশের জলের গুণ আছে বটে। অগ্নিমান্দ্যে ভুগছিলাম গত এক বছর, ক্ষুধাবোধ একেবারে ছিল না। বেশ পেট ভরে চিঁড়ে, দই ও ফল খেয়ে ঝর্ণার নির্মল জল পান করে আবার গাড়ী ছেড়ে দিলাম। এবার অনেকটা পথ আমরা হেঁটে গেলাম—কেননা সব সময় গরুর গাড়ীতে যাওয়া বড়ই কষ্টকর। ছায়াস্নিগ্ধ বনবীথিতে বন্যকুসুম ছড়িয়ে দিয়েচে ঠান্ডা বাতাসে, অলস হয়ে এসেছে মধ্যাহ্নটি, এই দীর্ঘ অবকাশমুখর নিভৃত, নির্জন, অরণ্য-পথে, কুঞ্জবনে শুধু পাখীর মেলা, শুধুই সাদা মেঘের উড়ে-যাওয়া মাথার ওপরকার নীল আকাশের মাঝখানে, শুধুই ঘুঘুর ডাক দূরে দূরে গাছপালার মগডালে! বর্ষার মেঘ ওঠেনি তাই রক্ষে।

একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। নাগরিক জীবন থেকে বহু দূরের এই সব বনপথ সম্পূর্ণ নিরাপদ। চুরি ডাকাতি এখানকার লোকেরা জানে না। সঙ্গী বললেন—এদের কাছে টাকার বাক্স রেখে যাবেন, চেনেন না চেনেন, এসে আবার নিয়ে যাবেন—আমি জানি।

—রাস্তাঘাটে মেরে ধরে নেয় না? রিভলভার নেই? হাতবোমা নেই? জিপ্ নেই?

—ওসব শোনে নি কখনো এরা। চুরিই জানে না।

—চলে কি করে এদের? চাষ তো তেমন দেখচি নে।

—বিরহোড় জাত এদিকে বেশি। তারা বনের গাছে শিমের লতা তুলে দ্যায়—যেখানে সেখানে। ওই শিমই তাদের খাদ্য। আর পাখী, খরগোশ, গিরগিটি, সাপ সবই ওদের খাদ্য। অল্পে সন্তুষ্ট, খাটতে চায় না। মহুয়ার তাড়ি খেয়ে তিন দিন বুঁদ হয়ে রইল! টাকার মূল্য বোঝে খুব কমই।

একটি বিরহোড় পরিবারের পর্ণকুটীর পড়লো পথের পাশে বনের আড়ালে। পুরুষ নেই। মেয়েরা উদুখলে চিঁড়ে কুটচে। সুন্দর, সুঠাম দেহভঙ্গি, অটুট স্বাস্থ্য উপচে পড়চে সারা শরীর বেয়ে। মুখের হাসি পবিত্র, সলজ্জ। ওদের ঘরের কাছে অন্য কোনো ঘর নেই—আছে দূরে দূরে। কোনো বাঙালীর মেয়ে এই নিবিড় বনের মধ্যে এমনধারা পর্ণকুটিরে একা ছেলেপুলে নিয়ে থাকতে পারবেন না একদিনও। তাঁদের সভ্যতাদুর্বল মন বাঘ ভালুক ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাবে একদিনে। হাতে পায়ে খিল লাগবে।

সভ্যতা আমাদের শরীর ও মন নিস্তেজ করে দিয়েচে, এ কথার সত্যতা শহরে থেকে তত উপলব্ধি করা যাবে না। এক ট্রামস্টপ থেকে অন্য ট্রামস্টপ পর্যন্ত যেতে হলে যেখানে লোকে ট্রামে ওঠে, সেখানে থেকে বুঝতে পারা যাবে না মুক্ত অরণ্য জীবনের সাহস, শক্তি, তেজ, কষ্টসহিষ্ণুতা। ভাল করে বুঝলাম সেটা আজ।

অস্তদিগন্ত পাটল বর্ণের রঙে আকাশ রাঙিয়েচে, বনতরুর শীর্ষে শীর্ষে রাঙা আলো. লতা দুলুনি ঝোপে ঝোপে—এমন সময় ভৈরবথানে আমরা পৌঁছে গেলাম। সাথী বললেন—সঙ্গে মশারী আছে আমাদের?

—নেই।

—তবে?

—মশা খুব?

—মনে হচ্চে এখানে মশা আছে।

—চীনে ধূপ দু-একটা সুটকেস আছে, জ্বালাবো এখন। থাকবো কোথায়?

—একটা ঘর আছে সেখানে কেউ থাকে না। গাড়োয়ানকে দিয়ে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নেবো। রান্না করা যাবে রাত্রে।

—খুব ভালো। এ তো এক রকমের পিক্নিক। এখন মনে হচ্চে মেয়েদের নিয়ে এলে খুব আমোদ হত।

—সামনের পূর্ণিমায় মেলা হবে এখানে। কলকাতা থেকে মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে আসুন সে সময়ে, চমৎকার হবে।

—সাধুজীর সঙ্গে দেখা হবে না এখন?

—নিশ্চয়ই হবে। চলুন, ডেরা ঠিক করে নিয়ে তারপর ওখানে যাওয়া যাবে।

বাসা ঠিক হয়ে গেল তখনি। বেশি পরিষ্কার করতে হল না—কিন্তু ঘরের মেজেতে গোটাকতক গর্ত দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এই বর্ষাকালে গর্ত যেখানে থাকে, সেখানে বিষাক্ত সর্পের আড্ডা। কি করা যায়? আমার সঙ্গী বললেন, অত ভয় পাবেন না। রান্না তো শেষ করি আগে।

মঙ্গল টুডু বলে একজন সাঁওতালের সঙ্গে কাঠের কথা বলতে সে কাঠ এনে দিতে রাজী হল। চার পয়সা মাত্র চুক্তি—আমাদের রান্নার সব কাঠ এনে দেবে। সে-ই বললে কোন ঘরে রান্না করচিস তুরা?

—নাটমন্দিরে।

—কেনে রে? ওটায় যাসনি। ঘাটোয়ালী বাংলোয় যা, তোদের জন্যেই তো সাহেবের বাংলো খোলা থাকে। লিয়ে যাবো চল্ সেখানে।

মঙ্গল টুডু আমাদের কাঠ ও জল এনে দিয়ে রান্নার সাহায্য করলে। ঘাটোয়ালী বাংলোয় আমরা গেলাম রান্না খাওয়ার পরে। তখন সন্দ হওয়ার পর ঘণ্টা-দুই কেটে গিয়েছিল।

ঘাটোয়ালী বাংলোটি খড়ের ঘর বটে কিন্তু সিমেণ্টের মেজে, চেয়ার টেবিল খাটিয়া সব সাজানো আছে, এমন কি জানলায় দরজায় পর্দা পর্যন্ত। শিমুল শালের ঘাটোয়ালী জমিদার গবর্ণমেণ্ট বনবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বাসের জন্য এই বাংলোঘর করে দিয়েচেন এবং তাঁর খরচে এটার মেরামত, পরিষ্কার ইত্যাদি চালু রেখেচেন দয়া করে নয়, ঘাটোয়ালী আইন-অনুসারে বাধ্য হয়ে। আমরা গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী নই বটে কিন্তু বাঙালী ভদ্রলোক —সুতরাং সাত-খুন মাপ। চৌকিদার তখুনি সেলাম বাজিয়ে ঘর খুলে দিলে।

এইবার সাধুজীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্যে আমরা বেরুলাম। মঙ্গল টুডু আমাদের সঙ্গে ছিল, সে আমাদের জানালে, সাধু খুব বড়। মৌন থাকেন দিনে। রাত্রে কথা বলেন।

সাধু দেখে বিস্মিত হলাম। প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স হবে, আবক্ষ বিলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু, গলায় তুলসীর মালা, হৃষ্টপুষ্ট নাদুস-নুদুস দেহ, পিতৃস্নেহভরা শান্ত বড় বড় চোখ দুটি। বাঙালী সাধু, মানভূম জেলায় বাড়ী ছিল। সতেরো বছর বয়স থেকে উদাসী, গৃহত্যাগী। সব খোলাখুলি বললেন আমাদের কাছে। সাধুসুলভ গর্বের অস্পষ্টতা নেই তাঁর।

সাধুজী বসে ছিলেন একটা সুপ্রাচীন বিশাল শালতরুর গুঁড়ি ঘেঁষে খুব বড় ও চওড়া একখানা মসৃণ শিলাখণ্ডের ওপর। শুক্লা নবমী তিথির জ্যোৎস্না ডালপালার ফাঁকে ও'র আসনে এসে পড়চে। কুশল পাহাড়ীর শৈলশ্রেণী ভৈরবথানকে চারিদিকে ঘিরেছে। বহু পুরাতন পাথরের চাঁই। সব যেন এখানে সুপ্রাচীন—প্রাচীন সাধু, প্রাচীন শালবৃক্ষ, প্রাচীন শিলাসন, প্রাচীন অরণ্যভূমি! মনে হয় এ পরিবেশ ছেড়ে আর কোথাও যাচ্চিনে। থেকে যাই এখানেই। ঋষি, সাধু, প্রবক্তাদের জ্যোতির্বাহিনী এখানেই, এ জিনিস আর কোথাও পাবো না—সুন্দরগড় রাজ্যের এই সুদূর বনভূমিতে যে বৃদ্ধ, পিতৃবৎ স্নেহশীল, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির পাদমূলে এসে আজ পেঁাছেচি, তিনিই মনে শান্তি এনে দেবেন। পথেঘাটে এ দুর্লভ জিনিসের সন্ধান মেলে না।

আরো মুগ্ধ হলাম যখন সাধুজী ঈশোপনিষদের একটা শ্লোক উচ্চারণ করে তার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। বার বার বলতে লাগলেন, "কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ।" শ্লোকটির মধ্যকার 'কবি' কথাটার অর্থ—বৃদ্ধ। সাধুর মুখের সেই গম্ভীর বাণী আজও কানে বাজচে ঃ

"কবিই তিনি বটেন বাবা। এখানে বসে বসে দেখি। এই শালগাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায়, তখন ভাবি, কবিই বটে তিনি। আমি কিছু পাইনি বাবা। ভড়ং দেখচো, এ সব বাইরের। ভেতরের জ্ঞান কিছু হয়নি।

তবে দেখতে চেয়েচি তাঁকে। তাঁর এই কবিরূপ দেখে ধন্য হয়েচি।'

এ সব বছর সাতেক আগেকার কথা।

আবার কলকাতা শহরে দুবেলা নিয়মিত অফিস করচি। অর্থের সচ্ছলতা এমন নেই যে যখন তখন বা প্রতিবৎসর বেরিয়ে যাবো বেড়াতে। সেদিন একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম। বড়লোকের বাড়ীর পার্টি। অনেক বড়লোকের আনাগোনা দেখলাম—ক্রাইসলার হাঁকিয়ে, বুইক হাঁকিয়ে, মিনার্ভা হাঁকিয়ে। বেশ সুন্দর সব চেহারা, কেতাদুরস্ত সাজগোজ।

কিন্তু এত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত, অবস্থাপন্ন লোকের সম্মেলনে সেদিন যা আশা করে গিয়েছিলুম তা পেলাম কই? শুধুই শুনলুম বৈষয়িক কথাবার্তা।

যেমন—

—দেওঘরের বাড়ীটাতে এবার যাওয়া হল না। বড় ছেলের ইচ্ছে, আরো কিছু ফার্ণিচার কিনে পাঠিয়ে দিলাম। কেউ গেল না গতবার, এবারও না। এটা আর রাখবো না। আমার তো নিজের সময় নেই যাওয়ার। ছেলেরাও যেতে চায় না। বিষণলাল দালাল চল্লিশ হাজার দর দিয়েছিল মার্চ মাসে। আমার স্ত্রীর ইচ্ছে নয় বাড়ী বেচি। অথচ যাওয়াও হয় না। আপনার রিজেণ্ট পার্কের জমিটাতে কিছু করলেন?

—হ্যাঁ, প্ল্যান স্যাংশন করতে দেওয়া হয়েচে। আশি হাজারের ওপর এস্টিমেট দিয়েচে বাগচি। ওরাই করবে। পি ঘোষালের বাড়ীটা তো বাগচি করলো—চমৎকার করেচে।

অথবা—

—ইলেকশ্যনের আগে এই সব মজুর শ্রমিকের গোলমাল কেমন মনে করেন?

—ভালো না। সব জায়গায় চলচে। যে সব পার্টি মনে ভাবুন এদের সপক্ষে যাবে না, ইলেকশ্যনের সময় তাদের মুশকিলে পড়তে হবে।

—সে তো বোঝাই যাচ্চে। ইলেকশ্যনের আগে দেশের মধ্যে বিরোধ, দলাদলির ফল এই দাঁড়াবে—

তারপর চললো বিশ্লেষণ। রাজনৈতিক তথ্যের বিশ্লেষণ।

সেই বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত, সুবেশ, সুশিক্ষিত, ভদ্রজনসমাগমের মধ্যে বসে আমার মনে আসছিল কুশল পাহাড়ীর সেই প্রাচীন সাধুর কথা। তাঁর এই সুন্দর সরল বাণী, নির্জন বনানীঘেরা বটতলটিতে যা সে-রাত্রে উচ্চারিত হয়েছিল, এখানে বসে আবার তারই স্মৃতি জেগে উঠলো অতীত দিনের দূত, আধো-ভোলা, আধো মনে-পড়া কোনো মধুর গানের একটি চরণের মত।

আর একটি কথা তিনি বলেছিলেন।

কি অদ্ভুত লাগছিল সেটা ভরা ভদরের বেতসকুঞ্জ ও শালবীথির পরিবেষ্টনীতে। মস্ত বড় একটি বাণী।

বলেছিলেন তিনিঃ

—মুক্তির ধারণা বন্ধন আছে বলেই আছে। যথার্থ বিচারের দৃষ্টিতে মানুষের মুক্তিও নেই বন্ধনও নেই। ব্রহ্ম এক অচিন রাজ্য, যে সেখানে যায়, সেই বোঝে ব্রহ্ম দ্বৈতও নয় অদ্বৈতও নয়। তিনি শাস্ত্রেরও পারে, বাদানুবাদেরও পারে, দ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য নয়, অদ্বৈতবাদেরও প্রাপ্য নয়! অনুভূতিই একমাত্র জিনিস। মানুষ মুক্ত আছেই, কেবল সে-সম্বন্ধে সচেতন নয় সে। মানুষ সদামুক্ত, সে মানুষ। কিছু পড়তে হবে না। কিছু সাধনা করতে হবে না। অনুভূতিই উত্তরায়ণের সেই অভিযাত্রী, যা তাকে পলক মুক্তির জ্যোতির্লোকে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে! বিশ্বাস কর বাবা, মানুষ মুক্ত। সে-ই নিজেকে নিজে বেঁধেছে। সে-ই অনুভব করুক সে মুক্ত! সে মানুষ, সে মুক্ত।

স্বর্গে সবে সকাল হইয়াছে।

কালিদাস স্বগৃহের বহির্দেশে চম্পক বৃক্ষের তলায় বসিয়া ঝিরঝিরে বাতাসে খুব মনোযোগ দিয়া পুঁথি পড়িতেছিলেন, এমন সময় অঙ্গনের ও-প্রান্ত হইতে কে বলিল—বলি কালীদাস বাড়ী আছ কি?

কালিদাস মুখ তুলিয়া দেখিলেন ভাস এদিকে আসিতেছেন। 'মেঘদূত'খানা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া কালিদাস আগাইয়া গিয়া ভাসকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন।

ভাস বৃদ্ধ ব্যক্তি, শিখা-সূত্রধারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মত তেজোব্যঞ্জক মুখশ্রী, বড় বড় চোখ, শ্বেতশ্মশ্রু বুকের উপর পড়িয়াছে। বেশ দীর্ঘচ্ছন্দে পদবিক্ষেপ করিয়া হাঁটিবার অভ্যাস আছে। আসিতে আসিতে বলিলেন—সকালে কি করছিলে? গাছের তলায় বসে-ছিলে দেখলাম।

কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন—আজ্ঞে, বসে বসে 'মেঘদূত'খানা একবার দেখছিলাম। কাল রাত্রে যে রকম গুমোট গিয়েছে—তাতে গাছতলায় বসলে তবুও একটু—

—নাঃ, দু'চোখের পাতা কাল বুজতে পারি নি। স্বর্গ আর সে স্বর্গ নেই। ক্রমেই খারাপ হয়ে আসচে। দেবরাজ উদাসীন, একবিন্দু বৃষ্টি পড়ে নি আজ দশ-পনেরো দিন। তারপর তোমার কাছে একটু এলাম বাবাজী—

কালিদাস বয়োজ্যেষ্ঠ পূজ্যপাদ কবিকে সাদরে আসন প্রদান করিয়া বলিলেন—বিশ্রাম করুন। ব্যজনী কি আনাবো?

—থাক্, দরকার হবে না। এটি চম্পক বৃক্ষ দেখচি যে।

—আজ্ঞে, নন্দনকানন থেকে দেবরাজের কর্মচারীকে বলে কয়ে একটি চারা আনিয়ে-ছিলাম। তবে এখনো পুষ্প-প্রসবের সময় হয় নি।

—সে কি রকম? বর্ষাকাল, সে সময় তো উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে না কি? এখন তো—

—তা নয়। এ একটু অন্যরকম। আপনি যদি আজ্ঞা করেন, আপনাকে একটি চারা দিতে পারি।

—চম্পকের চারা আপাতত আবশ্যক নেই। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে অন্য একটু কারণে। আমাকে সুবন্ধু বলছিল তোমার 'মেঘদূত'-এর নাকি বাঙ্ময়-আলেখ্য হয়েচে মর্ত্যে নাকি কোন্ প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হচ্চে। এই হল আমার নান্দী। এখন উত্তর দাও।

—আজ্ঞে আপনার কথা যথার্থ. সুবন্ধু আপনাকে ঠিকই বলেচে। আজ ভাবছিলাম মর্ত্যে গিয়ে দেখে আসব দেব, আপনি সঙ্গে চলুন না?

—নিশ্চয় যাবো। সেই শুনেই তো আমি সকালেই এখানে এলাম। আজকাল মর্ত্যে আমাদের আর আদর নেই। সংস্কৃত ভাষাটাই ভারতবর্ষে সবাই ভুলে যাচ্চে। এখন সেখানে অন্য ভাষার চর্চা।

—আজ্ঞে বহু অর্বাচীন বালক কবির আজকাল সেখানে প্রাদুর্ভাব।

—তবুও তো তোমার কাব্য সেখানে আদৃত হয়, পঠিত হয়। আমার 'অবিমারক'-এর কথা, 'স্বপ্ন বাসবদত্তা'র কথা তো সবাই ভুলে গিয়েচে। তোমার কাব্যের বাঙ্ময়-আলেখ্যও তো হোলো। আমার নাটক কে পড়ে?

—আজকাল বাঙ্ময়-আলেখ্যর যুগ চলেচ ভারতবর্ষে। আমার উজ্জয়িনীতে পর্যন্ত দুটি বাঙ্ময়-আলেখ্যর প্রেক্ষাগৃহ। এবার যদি—

এমন সময় কবি সুবন্ধু গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে করিতে দেবদারু কুঞ্জের ছায়ায় ছায়ায় এদিকে আসিতেছেন দেখা গেল। সুবন্ধু অনেক ছোট ইঁহাদের চেয়ে—দ্বাদশ শতাব্দীর লোক কালিদাস ও ভাস তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। সুবন্ধু দীর্ঘাকৃতি লোক তাঁহারও শ্বেতশ্মশ্রু, তবে ভাসের মত বক্ষদেশালম্বী নয়, হাতে একটা সরু যষ্টি।

ভাস বলিলেন, ওহে ছোকরা, শোনো এদিকে। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

সুবন্ধু ভাসের সঙ্গে অত্যন্ত সমীহ করিয়া কথাবার্তা বলেন, ভাস কালিদাসেরও পূর্বাচার্য, সুবন্ধুর মত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবির পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। তবে সুবন্ধু মনে মনে এই বৃদ্ধ কবির প্রতি একটু অনুকম্পার ভাবও পোষণ করেন। হয়তো সেটা তারুণ্যের স্পর্ধা।

সুবন্ধু বলিলেন—আজ্ঞে, যাবো।

—এখন মর্ত্যে কোনো গোলযোগ নেই তো?

দুইজনই সুবন্ধুকে প্রশ্ন করিলেন। সুবন্ধু যে ঘুরঘুর করিয়া প্রায়ই মর্ত্যধামে যাতায়াত করেন, এ সংবাদ দুজনেই রাখেন। ভাবেন তরুণ বয়স, বুদ্ধি পরিপক্ক হইতে এখনো অনেক বিলম্ব, মর্ত্যধামের শৌখীন লীলা-বিলাসের বাসনা এখনও তাহার যায় নাই। সুবন্ধু লজ্জিত সুরে জবাব দিলেন—আজ্ঞে, মর্ত্যধামের গোলযোগ মিটবার নয়। ও লেগেই আছে। তবে তাতে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

ভাস বলিলেন—সুবন্ধু, এখন কি রচনা করচো?

—আজ্ঞে কিছু না। আপনাদের নাম তো মর্ত্যে এখনো যথেষ্ট। আমার নামই তো লোকে ভুলে গিয়েচে। আমার 'বাসবদত্তা' এখন আর কে পড়ে?

—আমার নাটক কে পড়ে?

—ও কথা যদি আপনি বলেন তো আমাদের আশাই নেই। আপনারা ঋষি হয়ে গিয়েচেন, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র।

ভাস উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সুবন্ধু বলিয়া উঠিলেন—পূজ্যপাদ ভবভূতি এদিকে আসচেন দেখচি--

ভবভূতি অঙ্গনে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন--আমার কি সৌভাগ্য! এখানেই যে আজ দেখচি কবি সম্মেলন।

সুবন্ধু বলিলেন—কিন্তু আমার সৌভাগ্য সকলের চেয়ে বেশী। সংস্কৃত সাহিত্যের তিনজন বিখ্যাত কবি আজ এখানে মিলিত হয়েচেন। দেখে ধন্য হোলাম।

কালিদাস বলিলেন—আমিও সে কথা বলতে পারি।

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—আপনি বলতে পারেন না।

—কেন?

—আপনি দেখচেন দুজনকে। আমি দেখচি তিন দিক্‌পালকে। আমি বিখ্যাত কবি নেই। আমাকে বাদ দিয়ে বিচার করবেন।

ভবভূতি বলিলেন—ওহে ছোকরা তুমি থাম তো! তোমাদের বিনয়ের কলহ এখন রাখো। আমি যে জন্যে এসেছি—কালিদাসকে বলি। আমার সময় কম। পিতৃব্য ভাস, আপনার কোন অসুবিধে হবে না?

ভাস ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—স্বচ্ছন্দে বল বাবাজী। আমার কি অসুবিধে!

ভবভূতি কালিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—পৃথিবীতে আমি দাম্ভিক বলে গণ্য হয়েছিলাম একটি শ্লোক লিখে, এখন দেখছি আমার সেই শ্লোক আমার কাব্যের চেয়েও খ্যাতি লাভ করেচে। এখন আমার একটা কথা। শুনলাম, দাদা, আপনার মেঘদূতের নাকি বাঙ্ময়-আলেখ্য হয়েচে পৃথিবীতে?

—হ্যাঁ ভাই।

—আমার 'উত্তররামচরিত'খানার ওইরকম করা যায় না? কিংবা 'মালতী-মাধবে'র? সেইজন্যেই আপনার কাছে এলাম আজ।

কালিদাস কিছু উত্তর দিবার পূর্বেই সুবন্ধু বলিলেন—ও ক'রে দেবো দাদা। সুধাংশু রায় নিপুণ বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্মাণকারক। সে স্বর্গে এসেচে কিছুদিন হোল, আমার সঙ্গে পরিচয় আছে। আমার বাসবদত্তা কাব্যখানার জন্য তাকে বলেছিলাম—

ভবভূতি অধীরকণ্ঠে বলিলেন—আচ্ছা, তার দেহ হাওয়া হ'য়ে রয়েচে—মর্ত্যধামে তার কিছু করবার ক্ষমতা আছে আজকাল? বড় ভরসার কথা বলো ছোকরা।

—আজ্ঞে, আমার কথা প্রণিধান করুন। আমার সঙ্গে ছিল সোঢ্‌ঢল—

—সে আবার কে?

—আজ্ঞে আপনারা সফরী মৎস্যের খবর কি রাখবেন? আমরা হোলাম কাব্য-সমুদ্রের সফরী—আপনারা অগাধ জলসঞ্চারী রুই কাৎলা—সোঢ্‌ঢল কবি ধরেচে তার কাব্যের বাঙময়-আলেখ্য নির্মাণের উদ্দেশ্যে—

—কি কাব্য?

—আজ্ঞে উদয়সুন্দরী-কথা নামে চম্পু কাব্য—খুব নামকরা কাব্য—তবে কি আপনার কিংবা পিতৃব্য ভাসের—কিম্বা কালিদাস দাদার—

—থাক্ আমার কথা বাদ দাও, ও'দের কথা বলতে পারো। সারা পৃথিবীতে মেঘদূতের নাম ব্যাপ্ত হয়েচে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ প'ড়ে একজন ম্লেচ্ছ কবি—

ভাস বলিলেন—বাদ ওই সঙ্গে আমার নামটাও দাও। একমাত্র স্নেহভাজন কালিদাসের নাম এখনো পৃথিবীতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েচে। হ্যাঁ, তুমি যে ম্লেচ্ছ কবির উল্লেখ করলে, আমি রাখি সে সংবাদ—তার নাম—ম্লেচ্ছ নাম বড় দুরুচ্চার্য—তার নাম—

কালিদাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন—গয়থী। ছোকরা আমার সঙ্গে দেখা করে মাঝে মাঝে। আমার নাটক তার নাকি ভাল লেগেছে। যাক সে সব কথা। আজ মর্ত্যধামে আমরা যাচ্চি মেঘদূতের আলেখ্য-দর্শনে। ভবভূতি তুমিও চলো, আমরা বড় আনন্দ পাবো। তোমার শিক্ষা মর্ত্যে অমর হয়ে আছে, অযথা বিনয় কেন? আলেখ্য-দর্শনের বীজ তুমিই বপন করেছিলে তোমার অমর নাটকে। তোমার সমানধর্মা লোকেরা তোমাকে এখন চিনেচে। ঠিকই বলেছিলে, কাল নিরবধি এবং পৃথিবীও বিপুল। ধন্য তুমি।

কথা শেষ করিয়া কালিদাস ভবভূতিকে সাদর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন।

মর্ত্যধামে রাত্রিকাল উপস্থিত হইবার পূর্বেই এই দলটি যাত্রা করিলেন কবিকুঞ্জ হইতে। পথে বাণভট্টের সঙ্গে দেখা। এতগুলি কবিকে একসঙ্গে দেখিয়া বাণভট্ট বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—উপাধ্যায়গণ, আপনারা কোথায় চলেচেন? একসঙ্গে এতগুলি জ্যোতিষ্ক? এই যে সুবন্ধুও—ব্যাপার কি?

ভাস প্রবীণতম এবং এই দলের অধিনায়ক। তিনি বলিলেন—আমরা যাচ্চি কালিদাসের মেঘদূতের বাঙময়-আলেখ্য দর্শনে, মর্ত্যে—তোমারও তো—

বাণভট্টের পরিধানে মহার্ঘ পীতবর্ণের পট্টবাস। মাথার চুল সাদা হইলেও কুঞ্চিত, পারিপাট্যযুক্ত ও দীর্ঘ। তাঁহার হস্তে একটি পুষ্পগুচ্ছ, দুই কর্ণে কর্ণিকার পুষ্পের গুঞ্জিকা, বেশ শৌখীন ধরণের লোকটি। ভাসের কথায় তাঁহার বিস্ময় যেন আরও বাড়িয়া গেল। শুধু বলিলেন—ও!

কালিদাস সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন বাণভট্টকেও।

এতক্ষণে বাণভট্ট যেন ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন—না না, আমাকে ক্ষমা করবেন। তাতঃপাদ ভাসও চলেচেন দেখচি। এসব সুবন্ধুর ক্রিয়াকলাপ আমি জানি। যখন তখন মর্ত্যধামে ঘুরঘুর ক'রে যাওয়ার ফল আর কি। আজকাল কি অতিরিক্ত আসব পান ক'রে থাকো সুবন্ধু?

সুবন্ধু অপ্রতিভের সুরে উত্তর দিলেন—না দাদা।

—সেদিনও তো দেখলাম বাঙময়-আলেখ্য প্রেক্ষাগৃহে—?

—আজ্ঞে না, আপনার ভ্রম হয়েচে! ও আসব নয়, একপ্রকার বৃক্ষপত্রের কাথ, দুগ্ধ ও শর্করা সহযোগে পান করা হয়। একটু আস্বাদ ক'রে দেখছিলাম—মর্ত্যে সবাই খায়—

—মর্ত্যবাসীদের অলীক ব্যসন তোমাকে পেয়ে বসচে ক্রমে ক্রমে। আর একটি হচ্চে এই বাঙময়-আলেখ্য। মর্ত্যে এর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। সেদিন এই সুবন্ধুর পরামর্শে ওর সঙ্গে আমার 'কাদম্বরী'র বাঙময়-আলেখ্য দেখতে গিয়ে হতাশ হয়ে এসেছি—

ভাস সাগ্রহে বলিলেন—কেন? কেন?

—আচার্য ভাস, আপনি প্রবীণ ও প্রাচীন, আপনাকে সেই রকম ভক্তি করি, আপনার সামনে আর সে সব কথা বলতে চাই নে। আর কথায় কথায় গীত। নাঃ, আমি তো দুঃখে

আক্ষেপে চলে এলাম—সুবন্ধু সব জানে, আবার আপনাদের আজ নিয়ে যাচ্চে—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, আমি নিয়ে যাই নি দাদা। কালিদাস দাদাই আমাকে বললেন, উনিই আমাকে নিয়ে যাচ্চেন। বরং আপনি ওঁদের জিজ্ঞেস করুন—

কালিদাস বলিলেন—সে ঠিক। সুবন্ধু জানতো না। আমি ওকে যেতে বলেচি! দেখেই আসি কেমন হোলো মেঘদূত। চললাম ভায়া বাণভট্ট—

রাত্রিকাল। কলিকাতায় 'প্রদীপ' সিনেমাতে 'মেঘদূত' হইতেছে। ভিড় খুব। ডিম ভাজা ও ঘুঘ্নি, চানাচুর, বাদাম ভাজা, আলু-কাবলিওয়ালাদের পাশ কাটাইয়া কবিদল সিনেমা হলে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ছবি আরম্ভ হইল। ছবি কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর কালিদাস বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—এ কি? এ কার মেঘদূত? আমার তো নয়—

ভাস বলিলেন—তাই তো। আমিও তাই ভাবচি।

ভবভূতি বলিলেন—শুধু নামটাই নিয়েচে।

কালিদাস ক্ষোভের সঙ্গে বলিলেন—এ এখানে বসে দেখে কি করবো। বাণভট্ট ঠিক বলেছিল। চলুন আর সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

বাহিরে আসিয়া কালিদাস বলিলেন—ওহে সুবন্ধু, তুমি সেই বৃক্ষপত্রের ক্বাথ সেবন করবে নাকি?

—আজ্ঞে না, চলুন। ও অভ্যেস নেই আমার, দৈবাৎ সেদিন একটু আস্বাদ করেছিলাম মাত্র।

এমন সময় দুটি ছোকরা যাইতে যাইতে একজন আর একজনকে বলিতেছে শোনা গেল—'মেঘদূত' কার লেখা বই হে?

অপর ছোকরা জবাব দিল—অতীন ঘোষের।

—'ভাবীকাল'?

—তা জানি নে। বই উঠেচে জানিস?

—কাল একখানা 'মেঘদূত' আর একখানা 'ভাবীকাল' খুঁজে দেখতে হবে পাওয়া যায় কিনা।

কালিদাস পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঠিক পিছনে ছোকরা দুটি। রাগে ও ক্ষোভে কালিদাস কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। ছবি দেখিয়াও এত রাগ তাঁহার হয় নাই। ভাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—শুনেচেন এ অর্বাচীন বালক দুটি কি বলচে? অতীন ঘোষ নামক কোনো ব্যক্তির লেখা নাকি এই বই। বাঙ্ময়-আলেখ্যই প্রধান জিনিস, লেখকের নামটা জানবার আবশ্যক কি?

সুবন্ধু বলিলন, এই বাঙ্ময়-আলেখ্যের নির্মাণকার হোলো অতীন ঘোষ নামক কোন লোক। ওরা অত কৌতূহলী নয় গ্রন্থকর্তা সম্বন্ধে। আলেখ্য নিয়ে আসল কথা। অতীন ঘোষকেই ভেবেচে গ্রন্থকর্তা। মহাস্থবির অশ্বঘোষের নাম করলেও কালিদাস দাদার মানটা থাকতো। তা নয়, অতীন ঘোষ!

সুবন্ধু হি হি করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

কালিদাস রাগের সুরে বলিলেন—অত হাস্য কিসের? বৃক্ষপত্রের ক্বাথ পান না করেই এই। চলো এখান থেকে যাই।

—বৃক্ষপত্রের ক্বাথে বিহ্বলতা আসে না দাদা, এ আসব নয়। আপনি আস্বাদ ক'রে দেখতে পারেন।

ফিরিবার পথে ভবভূতি বলিলেন—না হে সুবন্ধু, তোমার সেই সুধাংশু রায়কে আর কোন কথা বোলো না, আমার উত্তররামচরিতের বাঙ্ময়-আলেখ্য কোন প্রয়োজন নেই—

ভাস বলিলেন—আমারও 'স্বপ্ন-বাসবদত্তা' সম্বন্ধে ওই কথা, বাণভট্ট ছোকরা যথার্থ কথাই বলেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে—

কালিদাস বলিলেন—সুবন্ধু কিন্তু ওর বাসবদত্তার ঠিক আলেখ্য করাবে আপনি দেখে নেবেন—ও এখনো আসক্তি পরিত্যাগ করে নি—সেই সুধাংশু রায়কে ও ধরবে ঠিক—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—যা বলেন দাদা। আপনারা হোলেন প্রথিতযশা কবি, আপনাদের কথা আলাদা—নাম যা হবার আপনাদের হয়েই গিয়েচে—আপনাদের কি?

ইহার অপেক্ষাও বিস্ময়কর ঘটনা সেদিন কালিদাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

কালিদাস ভাসকে সঙ্গে লইয়া নিজের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব চম্পক বৃক্ষের বেদীমূলে বসিয়া আছেন। ব্যাসদেব প্রবীণতম ও প্রাচীনতম কবি, তিনি কখনো আসেন না। শুধু কবি নহেন, দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়াও তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ব্যাসদেবের আকৃতি প্রাচীন ঋষিদের ন্যায়, পরিধানে কাষায় বস্ত্র, মস্তকে শুভ্র কেশভার, গম্ভীর ও সৌম্য মুখভাব। উভয়ে সসম্ভ্রমে ব্যাসদেবের পাদ-বন্দনা করিলেন। কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন, আমার গৃহ পবিত্র হোলো আপনার চরণ-স্পর্শে। আমার প্রতি কি আদেশ, তাতঃপাদ?

ব্যসদেব আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—তোমার মঙ্গল হোক। কালিদাস, তোমার কুশল? ভাস, তুমি ভাল আছ? বোস, বোস। কোথায় গিয়েছিলে? মর্ত্যধামে? ভবভূতিও সঙ্গে ছিল? ছোকরা ভাল লেখে। সেখানে কেন?

কালিদাস কারণ বলিলেন।

ব্যাসদেব বলিলেন—আমিও ঐ কারণেই এসেছিলাম, গীতার একটি বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্মাণ করিয়ে দিতে পারো? অবশ্য আমি প্রচারের দিক দিয়েই বলচি। তত্ত্ব-প্রচারের সুবিধে হবে। তোমরা তো আজকালকার ছেলে, মর্ত্যের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ আছে, আমার তা নেই। ভাস কি বলো?

ভাস বলিলেন—অনুমতি যদি করেন তো বলি, ও সব কলঙ্ককারী ব্যাপারের মধ্যে আপনি যাবেন না। বলো না হে কালিদাস সব খুলে ঘটনাটা?

পরে ব্যাসদেব সব শুনিয়া নীরব রহিলেন।

ভাস বলিলেন—এখন আপনি বিবেচনা করে দেখুন। আপনাকে আমি কি বলবো?

ব্যাসদেব বলিলেন—তোমার যে কাব্যের বাঙময়-আলেখ্য হয়েচে, তার নামটি কি বললে? মেঘদূত? কি অবলম্বনে লেখা? কাব্যের ঘটনাটি কি?

কালিদাস লজ্জিত সুরে বলিলেন—সে আর আপনার শোনার প্রয়োজন নেই, তাতঃপাদ। সে কিছু না। ওই একটা দেশবিদেশের বর্ণনার মত। আমাদের কথা বাদ দিন। আপনি এবেলা আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য ক'রে যান।

ব্যাসদেব থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাকে ব্রহ্মার কাছে যাইতে হইবে। বেদ সম্বন্ধে কি আলোচনা আছে। অন্য সময়ে চেষ্টা করিবেন। এখন বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

ব্যাসদেব বিদায় লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ভাস কালিদাসের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—বোঝ ব্যাপার!

মানতালাও

সে বললে, খুব জানি, মানতালাও খুব বড় তবে ধারে বড় জঙ্গল। ভালুকের ভয় আছে, পাহাড় আছে, বাঘও আছে।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি। অসহ্য গরম। বেলা চারটা বেজে গিয়েছে। ভাবলুম, এই অসহ্য উত্তাপ বিহারের, এমন সুন্দর হ্রদে স্নান করা সৌভাগ্যের কথা।

সে প্রস্তাবে সবাই রাজী হল। আমার মন প্রথমত সায় দেয় নি। কি জানি কেমন তাল ও। মিথ্যেই দেখি হয়ে যাবে গয়া পোঁছাতে।

কিন্তু যখন মোটরটি হ্রদের সামনে পোঁছলো—হঠাৎ এসে পোঁছলো একটা বনের বাঁক ঘুরেই—তখন হ্রদের সেই অপূর্ব রূপ আমাকে এত বিস্মিত করে দিলে যে আমি করণ সিংকে

বললাম—কিজন্যে তুমি এর কথা আগে বল নি ?

—কেন বাবুজি ?

—এমন চমৎকার একটা জায়গা— !

—বড় জঙ্গল, ভালুক বাঘের ভয় আছে।

তা হোক, এমন অপূর্ব একটি জলাশয় আছে, যার ধারেই পশ্চিম তীরে সমান্তরাল নীচু শৈলমালা ও শালের জঙ্গল, উপর তীরে মাইলটাক দূরে পুনরায় শৈলমালা এবং ঘনসবুজ শালবন—কেবল পূর্ব ও দক্ষিণে পাহাড় নেই, বনও নেই—দিব্য সবুজ তৃণভূমি, একদম ফাঁকা ও সমতল, ফুটবল খেলার ভাল মাঠ হয়। এই মাঠের মধ্যে এদিক ওদিকে দু-চারটি হরীতকী, শিব বৃক্ষ, শাল ও আসান গাছ। দক্ষিণ কোণে চমৎকার অ্যাসবেস্টসের ছাদ বাঁধা ছোট বাংলো। বাংলোর ঠিক সামনাসামনি একটি পাথরের মোটা মোটা সোপানযুক্ত কারুকার্য-বিহীন বাঁধাঘাট--অনেকটা সুইমিং পুলের জাম্পিং বোর্ডের মত। সেই তক্তাগুলোর প্রান্ত মোটা মোটা শালের খুঁটিতে আবদ্ধ। যেখানে তক্তাগুলো শেষ হয়েছে সেখানে একখানা ধূসর-রং-করা জাহাজের লাইফ বোটের মত গড়নের বোট বাঁধা।

মোটরে হাজারিবাগ থেকে গয়া যেতে যেতে এই অদ্ভুত হ্রদটি পড়লো। 'মানতালাও অবিশ্যি স্থানীয় অধিবাসীদের দেওয়া নামটা। নামে কিছু আসে যায় না, এই অতি সুন্দর হ্রদ যে এমন এক বনাঞ্চলে আছে, গয়াগামী পিচঢালা রাস্তা থেকে তার কিছু বুঝবার উপায় নেই, যদি না হাজুদা রাস্তার পাশে একটা সাইনবোর্ডের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতো। সাইনবোর্ডের গোড়ার দিকে ও দক্ষিণ পাশে একই সরলরেখায় একটি তীরের ফলা হ্রদের অবস্থানবিন্দু নির্দেশ করচে

এই রকম হল বিজ্ঞাপনটা ঃ

মানতালাও হ্রদ,

আসুন !

এখান হইতে দু ফার্লং দূরে বনের মধ্যে সুন্দর একটি হ্রদ আছে। স্নান ও ভ্রমণের জন্য বনবিভাগ হইতে একটি প্রস্তর-বাঁধানো ঘাট ও নৌকাভ্রমণের জন্য একটি নৌকার ব্যবস্থা আছে। জ্যোৎস্নারাত্রে এই হ্রদ বিশেষরূপে উপভোগ্য। ভ্রমণেচ্ছুদের জন্য হ্রদের ধারে যে বাংলো আছে চৌকিদারের নিকট উহার চাবি মিলিবে।

দর্শনী—এক টাকা

নৌকাভ্রমণ ফি—৮ আনা ঘণ্টা পিছু

বাংলো ভাড়া, দৈনিক—৫ টাকা

এম্ রাও

ডি এফ ও,

গয়া ডিভিসন

কখনো নাম তো শুনিনি মানতালাও হ্রদের। অবিশ্যি কি করেই বা শুনবো, কদিনই বা এদিকে এসেছি। দুজনেই আমরা নবাগত পশ্চিম সফরে। ড্রাইভার করণ সিং এ অঞ্চলের লোক বিহার ট্রানস্পোর্টের বাস্গুলিতে অনেকদিন কাজ করচে, তাকে বললাম—তুমি জানো করণ সিং, কি তালাও আছে এখানে ?

খুব চওড়া হ্রদটা—আঁকাবাঁকা হ্রদটা বনের ও-মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে—নির্মল নীল জল, এবং হয়তো বললে বিশ্বাস করবেন না—তীরের কাছে কি চমৎকার সবুজ জলা ঘাস ও পান-কলস শেওলার বন—ঘাসে ফুল ফুটেচে, নীল রঙের, পান-কলসের ফুল ফুটেচে সাদা সাদা 'বাটার কপ' ফুলের মত। আর, কি অজস্র ফুটে আলো করচে বনপ্রান্ত, সেই পড়ন্ত বেলায় কি ঘন সুবাস সদ্যফোটা কুড়চিফুলের—সারা বনভূমি মাতিয়ে ফেলেছে এই সুবাসে, যেদিকেই চাও সেদিকেই থোকা থোকা কুড়চিফুল দুলচে বাতাসে। কি শোভা এই অপরিচিত অজ্ঞাত জলাশয় ও তার বন্য পরিবেশের ! কি অদ্ভুত নির্জনতা এর চারিপাশের ! কোথাও

একটি মানুষের চুলের টিকি দেখা যায় না। কেবল শোনো বিহঙ্গকাকলী, বন্য হনুমানের উপ আপ্ শব্দ দূরে বনের মধ্যে, আর জলাশয়ের বড় বড় ঢেউ ছপ্ ছপ করে সেই তক্তা-বাঁধা জেটির গায়ে এসে লাগবার শব্দ।

আমার বন্ধু ললিত প্রকৃতিকে দেখবার চক্ষু হারায় নি। সে দেখে-শুনে বলে উঠলো—শুধু এখানে বসে থাকো—ব্যস, আর কিছু না।

—তা খাওয়া ?

—সে হয়ে যাবে।

বলে সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নেড়ে কি যে নির্দেশ করলে, কেউ বুঝতে পারলে না।

বললাম—বোট চড়বে ?

—হ্যাঁ ভাই। কিন্তু সন্ধ্যায়, জ্যোৎস্না উঠলে। কি বলো ?

—রাত্রে তাহলে এখানে থাকতে হবে।

—থাকলাম।

—খাওয়া ?

—সে হয়ে যাবে।

বলে সে আবার পূর্ববৎ অর্থহীন ইঙ্গিত করলে হাত নেড়ে। আমার ইচ্ছা যে একেবারে না ছিল তা নয়। মোটর থেকে সবাই নেমে পড়লাম। বাংলোর চৌকিদারকে ডাকাডাকি করা গেল, কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আমরা বাংলোর বারান্দায় জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে সেখানে বসলাম। উদ্দেশ্য, চা তৈরি করার চেষ্টা দেখা। ললিত শীঘ্রই শুকনো কাঠকুটো কুড়িয়ে নিয়ে এসে চা চড়িয়ে দিলে। করণ সিং চৌকিদারকে ডাকতে গেল।

চা খাওয়া শেষ হল। সূর্য অস্ত গেল ওদিকের পাহাড়শ্রেণীর ওপারে। চমৎকার ছায়াভরা প্রান্তর ও বনানী। বনানীপ্রান্তস্থ এই বিরাট সরোবর। পাহাড়ের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেচে নির্মল কাকচক্ষু জলের পশ্চিম কোণে। পাখি-পাখালির কলরব ভেসে আসচে পাহাড়ের দিক থেকে।

এমন সময় করণ সিং চৌকিদারকে নিয়ে এলে দেখা গেল যে চৌকিদার একটি ষোল-সতেরো বছরের ছেলে। নাম তার ট্যাম্পা।

আমরা বললাম—কোথায় গিয়েছিলি ?

—হাটিয়া মে।

—কাঁহা কা হাটিয়া ?

—গবিন্‌পুর, দো মিল্ ইঁহাসে। পাহাড় কা বগল মে।

—রাত মে হাম্‌লোক বাংলো মে ঠহরনে সেকেগা ?

—জী। কাহে নেহি ? রহ্ যাইয়ে আপ্‌লোক। মগর হামারা পাস্ চাভি তো হ্যায় নেই।

—চাভি কাঁহা গিয়া ?

—মেরে চাচাকে পাস্ হ্যায় মকান্ মে। হ্যাম যায় গা, মাগায় গা।

—তব যাও, আউর মাগাও—

—আপ্ লোগোঁকো খানা-কি ক্যা হোগা ?

—তুম্‌কো বানানে পড়েগা। সকেগা নেই ?

—কহে নেই হুজুর ! মগর হিয়াঁ কুছ নেহি মিলেগা। না চাল, না দাল।

—ঘাবড়াও মাৎ। সব চিজ হ্যায় হামলোগোঁকা গাড়িমে। তুম্ একঠো মুরগী মাগাও হাটিয়া সে—হাঁ ?

—দিজিয়ে দো রুপেয়া। গাঁও সে মাগায়েঙ্গে।

—বোট কা চাভি কাঁহা !

—ও খুলা হুয়া হ্যায়। লে যাইয়ে। একঠো খাতামে সহি করনে হোগা।

—খাতা লাও—

ট্যাম্পা খাতা সই করিয়ে চাবি আনতে চলে গেল। আমরা করণ সিংকে জিনিসপত্রের

তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করে বোট ছেড়ে দিলাম।

সরোবরটি সব জায়গায় সমান চওড়া নয়, বোট নিয়ে যত আমরা ওর দৈর্ঘ্য ধরে এগিয়ে চললাম, তত বাঁদিকের প্রস্থ বাড়তে লাগলো—শেষে এমন হল যে ওপারের গাছপালা ছোট দেখাতে লাগলো, ওপারের পাহাড় হঠাৎ যেন বহুদূরে চলে গেল। হ্রদের জলে ছোট ছোট ঢেউয়ের সৃষ্টি করে পাহাড়ের দিক থেকে বাতাস বইচে। ললিত বললে—ভাই, স্নান করা দরকার। বোট লাগাও কোন এক জায়গায়।

আমাদের দুজনেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল ওপারের অপূর্ব বন-সৌন্দর্য। এপারের তীরে তৃণভূমিই বেশি, মাঝে মাঝে দু-চারটা বড়-ছোট গাছ। ললিতাকে বললাম—চলো ওপারে বোট নিয়ে। ওখানে যাওয়া যাবে।

ক্ষুদ্র বীচিসংকুল হ্রদটি পার হতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগলো। এইখানেই হ্রদটির প্রস্থ সর্বাপেক্ষা বেশি। পাহাড়ময় তীরভূমি যত কাছে আসতে লাগলো, ততই তার ঘন সবুজ রূপ আমাদের বাঙালী মনকে টানতে লাগলো ওর দিকে—এসব মরুভূমির মত উষর দেশের কংকরময় রুক্ষতার মধ্যে শ্যামল বনানীর বৈচিত্র্য চোখ জুড়িয়ে দেয় কি ভাবে তা উপলব্ধি করার বস্তু, শুধুই কানে শুনে বা বইয়ে পড়ে তা বোঝা সম্ভব নয়।

ওপারে আমরা যখন পৌঁছে গেলাম তখন দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ। একটু পরেই একাদশীর চাঁদের জ্যোৎস্না ফুটে উঠলো জলে, বনে, পাহাড়ে সর্বত্র।

ওপারে পৌঁছি ডাঙায় নেমে দেখি, তীরভূমি কি সুন্দর! পাষাণময় আগাগোড়া, সমতল laterite পাথরের বেদী যেন মস্ত বড়। ঠিক পেছনেই বন শুরু হয়েচে, একেবারে অনতি-দূরস্থ শৈলসানু পর্যন্ত বিস্তৃত বনভূমি। পাষাণময় চত্বরের দৈর্ঘ্য একশো হাতেরও বেশি, চওড়ায় প্রায় দশ বারো হাত। আমাদের স্নান ও বিশ্রামের জন্যে প্রকৃতি যেন পাথরের ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছে। কি ঠান্ডা জায়গাটি, বনের কি সুন্দর স্নিগ্ধ হাওয়া, কুড়চিফুলের কি ঘন সুবাস জ্যোৎস্নামাখা বাতাসে।

আমরা জলে নামলাম। যতদূর যাই পায়ের তলায় শুধুই পাথর যেন সিমেণ্টবাঁধা না সমতল চত্বর। জল ঈষতপ্ত, কিন্তু কাকচক্ষুর মত নির্মল। জলে পড়েচে চাঁদের জ্যোৎস্না, পাহাড়ের ওপর বন্যকুক্কুট ডেকে উঠলো রজনীর প্রথম যামের শুরুতে। সেই সঙ্গে ডেকে উঠলো শেয়ালের দল।

ললিত বললে—কি চমৎকার জায়গা ভাই!

—এমন যে জায়গা আছে তাই জানতাম না।

—অথচ কেউ আসে না। জানলে ভিড় জমে যেতো না এই গরমের দিনে?

—তুমিও যেমন! আমাদের দেশে এ সব জিনিস দেখবার শখ আছে ক'জনের? কে আসচে লেক্ দেখতে!

আমাদের পিছনে রহস্যাবৃত বনভূমি জ্যোৎস্নায়-অন্ধকারে অত্যন্ত গভীর ও বিপদ-সংকুল বলে মনে হচ্ছে। করণ সিং ভালুকের কথা তো বলেছিলই, বাঘের অস্তিত্বের সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেছিল, তাও অর্থপূর্ণ।

কিন্তু আমার মন ছিল না বনের বিপদের দিকে। সারাদিন প্রখর রৌদ্রতাপ, ধুলা ও ঘামের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এই বনানী বেষ্টিত নির্জন বিশাল জলাশয়ের গভীর জলে অবগাহন স্নান করবার আনন্দ আমার সব ভয়কে ছাপিয়ে উঠেচে। হ্রদের ধারে ধারে জলজ ঘাসে নীল ফুল ফুটে আছে—হাওয়ায় দুলচে ঘাসগুলো, উচেছলতার মত কি একটা লতা ঝুলে পড়েচে জলে, পাথরের ওপর দিয়ে সাপের মত সেটা চলে এসেচে জঙ্গলের দিক থেকে।

দুজনে পাষাণময় তীরভূমিতে উঠে সাবান মাখলাম আরাম করে, তারপর আবার নামলাম জলে। চাঁদের ছায়া ভেসে ভেসে যাচ্ছে জলের ভেতর, বুকে-মুখে লাগছে ঢেউ পাষাণময় তটে মৃদু শব্দে ছলাৎ ছলাৎ করচে, তাল খাচ্ছে, চারিধার নিঃশব্দ নির্জন—কি সুন্দর রাত্রি, কি সুন্দর দেবলোকের সরোবরের মত অগাধ জলরাশি। তিড়িং করে একটা ছোট মাছ লাফিয়ে উঠেই আবার জলে পড়ে গেল। জল! জল! জীবনদায়িনী সুধার প্রবাহ!

ভগবানের কি অদ্ভুত সৃষ্টি এই জল!

কিন্তু এই জলকে ঠিকমত ভোগ করতে হলে এমনিধারা অগাধ জলের সরোবরে বা নদীতে এমনি ছায়ানিবিড় বনকূলের ধারের ঠাণ্ডা জলে অবগাহন স্নান করা চাই—সারাদিনের পরিশ্রম, ধুলো ও দুর্দান্ত গ্রীষ্মের পরে। কলকাতার আঁট-সাঁট বাথরুমে জলের কল খুলে স্নান করে কিছুতেই বোঝা যাবে না জলের কি মহিমা, অবগাহন স্নানের কি আস্বাদ। তার ওপর যদি জ্যোৎস্নারাত হয়, আর এমনি জনহীন সরোবরটি পাওয়া যায়, তবে সৃষ্টির আনন্দের অনেকখানি স্নান করে উঠে নিয়ে আসা যায়—দৃষ্টির সাহায্যে ওর ফটো তুলে।

স্মৃতির পটে এই ফটো চিরদিন থেকে যাবে এবং জীবনের মহাসম্পদ হয়ে থাকবে।

স্নান করে স্নিগ্ধ হয়ে আবার আমরা বোট বেয়ে অজানা রহস্য-লোকের দিকে এগিয়ে চলি পশ্চিম তীর ধরে। আমাদের বাঁ দিকের বন ও পাহাড় ধরে ধরে অনেকদূর বেয়ে চলেচি ডাঙার কাছে—কোথাও বনের মধ্যে অজানা বনকুসুমের গন্ধ, কোথাও ঝিঁঝির সমস্বরে ঐকতান, কোথাও মরা পাতার ওপর অজানা কোন্ নিশাচর জন্তুর দ্রুত পদচারণের খস্ খস্ ধ্বনি, কোথাও ডালপালা কাঁপিয়ে বাতাস ওঠার শব্দ—সমস্ত বনভূমিতে ততক্ষণ জ্যোৎস্না নেমেচে, কেবল নিবিড় ঝোপঝাপ কিংবা পাহাড়ের খাঁজগুলো বড় অন্ধকার দেখাচ্ছে তখনো।

ললিত বললে—এ লেকের দেখচি সীমা নেই—কতদূর বাইবো?

—চলো, আজ সারারাত বাইবো বোট।

—এবার বাংলোতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করা যাক।

—একরাত্রি না-ই বা খেলুম, চলো দেখা যাক।

এক জায়গায় ডাঙায় মস্ত বড় একটা হর্তুকী গাছ, তার ডালে ডালে আলোকলতা দুলে দুলে দুলে পড়েচে জলের উপর। বড় বড় পাথরের চাঁই সেখানটাতে জল পর্যন্ত নেমে এসেচে—সমস্তটাতে জ্যোৎস্না পড়ে কি অপূর্ব দেখাচ্চে।

আমরা আবার সেখানে বোট বেঁধে পাষাণের উপর জ্যোৎস্নায় বসলাম। কাছেই কত কি বন্য লতাপাতার ঝোপ, কটুতিক্ত গন্ধ উঠচে বাতাসে। রাত দশটা বেজেচে। দিনের গরম অনেকক্ষণ কেটে গিয়ে রাত্রির শীতল বাতাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্চে আমাদের সঙ্গে গায়ে দেবার কোনো মোটা জামা বা কাপড় নেই।

ললিত বললে—এ দেখচি, কম্বল আনা উচিত ছিল—

—বেশ ঠাণ্ডা। সত্যি ভাই—

—চলো ফিরি।

হঠাৎ দুজনেই অবাক হয়ে জ্যোৎস্নালোকিত জলরাশির দিকে চেয়ে দেখলাম একদল বুনো হাঁস পাহাড় থেকে নেমেচে জলে, দিব্যি সাঁতার দিচ্চে—দূর থেকে দেখাচ্চে যেন একদল শুভ্রা নারী জলকেলি শুরু করেচে। গা ছমছম করে উঠলো দুজনেরই। বাংলো থেকে অনেকদূর এসে পড়েচি, রাত্রিও গভীর, পেট চুঁই চুঁই করচে খিদেয়, ঠাণ্ডা বাতাসে শীত ধরে গিয়েচে দুজনেরই।

বোট বেয়ে ফিরতে লাগলাম কূলের দিকে।

চাঁদ ঘুরে গিয়েচে। যেন মনে হল পথ হারিয়েচি, দিক নির্ণয় করতে পারচিনে—সমস্ত অঞ্চলটা যেন মায়াময় হয়ে গিয়েচে—যেন পৃথিবী থেকে বহুদূরে মহাব্যোমের অন্য কোন অজানা গ্রহে নির্জন বন-বেষ্টিত হ্রদের আমরা দুটি নিঃসঙ্গ প্রাণী, কোনো অজানা উপগ্রহের জ্যোৎস্নায় বিভ্রান্ত হয়ে পথ হারিয়ে ঘুরচি, আমাদের সে পরিচিত পৃথিবীর আত্মীয়-স্বজন থেকে চিরবিচ্যুত অবস্থায়। কতকাল যেন ছেড়ে এসেছি সে-সব পরিচিত পথরেখা, তারায় তারায় পরিব্যাপ্ত আকাশ আর জ্যোৎস্না-ভরা জলরাশির দিকে চেয়ে সে অনুভূতি আরও দৃঢ় হল মনে।

খানিকদূর এসে বাঁ দিকের পাহাড়ে স্পষ্ট একটা শব্দ শোনা গেল, যেন করাত দিয়ে তক্তা চিরচে।

ললিত বললে—ভাই! শোনো—

—বড় বাঘ। রয়েল বেঙ্গল গয়ার জঙ্গলে যথেষ্ট।

—তাড়াতাড়ি চলো—

পাহাড়ে পাহাড়ে যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো সে আওয়াজ। খুব গম্ভীর আওয়াজ নয়, ঠিক তক্তা চেরার শব্দ। করাতের কারখানায় বড় কলের করাতে তক্তা চিরচে। আমি বড় বাঘের এ ডাকের সঙ্গে সুপরিচিত।

যখন আবার আমরা ফিরে এলাম বাংলোর ঘাটে, তখন রাত আড়াইটে। করণ সিং ঘরের দরজা বন্ধ করেচে বাঘের ভয়ে। তার ভয় যে অমূলক নয়, তার পরিচয় কিছু আগেই পেয়েচি।

ডাকাডাকি করতে করণ সিং ও আর-একটা লোক দোর খুললো। অন্য লোকটা আমাদের সেলাম করলে। করণ সিং জানিয়ে দিলে, এ সেই বালক চৌকিদারের চাচা।

বললাম—ক্যা নাম তুম্‌হারা?

—মুনেশ্বর মাহাতো, হুজুর।

—ঠিক হ্যায়। ভাত পাকায়া?

—হুজুর, ও তো দশ বাজনেকো অন্দর মে পাকায় লিয়া। ভাত আউর মাস। খানা ঠান্ডা হো গিয়া হুজুর।

—কোই হরজ নেই। লে আও—

—টেবুল মে পারস কর্‌ লে হুজুর?

—করো। করণ সিং, তুম্‌ খানা খায়া?

—হাম্‌ তো চুড়া খা লিয়া। আউর কুছ নেহি খায়েঙ্গা।

আকণ্ঠ খাওয়া গেল। শেষরাত্রে মাংস আর ভাত। তারপর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া গেল। মুনেশ্বর বললে—হুজুর, এ-সব জায়গায় ভোরে তাড়াতাড়ি দোর খুলবেন না। অনেক সময় বাঘ ওৎ পেতে থাকে দোরের কাছে, যেমন দোর খোলা হয় অমনি মানুষকে নিয়ে পালায়। একবার হয়েছিল এ বাংলোয়।

করণ সিং বললে—বাজে গল্প করো না। মানুষখেগো বাঘ না হলে অমন করে না। আমি বিহার ট্রান্সপোর্টে কাজ করচি বিশ বছর। কত পাহাড় জঙ্গল ঘুরেছি। কখনো শুনিনি এমন কথা।

মুনেশ্বর রেগে বললে—আপ লোক ক্যা জানতা? মোটর সে ঘুম্‌তা হ্যায়, জঙ্গল ক্যা হালচাল ক্যা মালুম হ্যায় আপলোগোঁকা? ছোড় দিজিয়ে ও বাৎ—আপলোক রহিয়ে ইঁহা পর দো-পাঁচ রোজ, আপকো নেহি দেখলানে সকেঙ্গে তো জুর্মানা দেঙ্গে দশ রুপৈয়া—জরুর—

বেলা আটটায় দুজনে উঠলাম। তার আগেই মুনেশ্বর উঠে দোর খুলেচে, সুতরাং বাঘের ফাঁড়া থাকলেও কেটে গিয়েচে।

আমরা রওনা হবার আগে হ্রদের জলে স্নান করে নিলাম। জল অত্যন্ত শীতল। শরীরে যেন নতুন বল পেলাম, নতুন আনন্দ, নব-জীবন। সামনে আবার আজ যখন পড়বে বিহারের দুর্দান্ত গরম, লু বইবে দুপুরের দিকে, বালির ঝড়ে দিক অন্ধকার হয়ে যাবে, তখন দোর বন্ধ করে খাটিয়ায় শুয়ে মনে পড়বে এই অদ্ভুত মায়াময় হ্রদটি, এই অগাধ স্নিগ্ধশীতল জলরাশি, এই শ্যামলবনাকীর্ণ উপত্যকা। গতরাত্রে জ্যোৎস্নালোকিত হ্রদবক্ষের স্মৃতি হয়ে পড়বে তখন দূরকালের স্বপ্নের মত অবাস্তব।

বিদায়, অজানা সরোবর, বিদায়!

আবার এ-পথে এলে দেখা হবে নিশ্চয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকেল।

নদীর ধারের ঘন নিবিড় বন সেকেলে প্রাচীন আমগাছের তলায়। কুঁচলতা বেয়ে উঠেচে বৃদ্ধ আমগাছের ডাল। বাঁশগাছের আগা থেকে নেমে এসেচে বড়গোয়ালে লতার কচি ডগা, এবার বোশেখ মাসের শেষে দিনকয়েক বৃষ্টি হওয়াতে লতাপাতা চারাগাছের এত বৃদ্ধি। যেখানে কিছুদিন আগে পরিষ্কার তৃণলতাশূন্য ভূমি দেখেছি—এখন সেখানে দশ বর্গহাত জমিতে গজিয়ে উঠেচে বুনো উচ্ছে, বুনো করলা, বড়গোয়ালে লতা, করমচা লতা, বুনো সূর্যমণি ফুলের চারা, জ্যামের চারা, তরমুজের চারা, আরও কত জানা-অজানা বুনো গাছপালার চারা।

এখন বৃষ্টি নেই। আজ কদিন খুব গরম, খরসূর্য উঠেচে মেঘলেশশূন্য নীল আকাশে, দিগ্‌দিগন্ত প্রখর রৌদ্রে জ্বলেপুড়ে যায়, অপরাহ্ণে কিন্তু গহন ছায়া নেমে আসে মাঠে ঘাটে পথে, বনযুঁইয়ের সুগন্ধে বাতাস হয় সুরভিত, বাঁশঝাড়ের মগডাল দুলিয়ে, আম্রবন-শীর্ষ কাঁপিয়ে ঠান্ডা হাওয়া ওঠে নদীর বাঁক থেকে, নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ঢেউ উঠে পানকলস শেওলার কুচো সাদা ফুলের সারিকে নাড়িয়ে দেয় ডাঙার দিকে, পানকৌড়িকে উড়িয়ে দেয় সাঁইবাবলার ডাল থেকে, শেফালি ফুলের হলুদ পাপড়ি বাড়িয়ে দেয় নিবিড় বনের তলায় বর্ষাপুষ্ট তৃণভূমির তলে কিংবা নবোদ্ধত চারাগাছের মাথায়। গোধূলির রাঙা আলো বনে, মাঠে, চরে, জলে, নলখাগড়া আর কষাড় ঝোপে, উড়ন্ত বকের সারির পাখায়।

এই নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে ছায়াগহন প্রাচীন আমবাগানে ঢুকে দেখছি বনের কোন কোণে তিনি পত্রশয্যায় ঘুমিয়ে আছেন। তাঁকে দেখেছিলাম এই নির্জনে।

আমি অবিশ্যি দূর থেকে দেখেছি, কাছে যাইনি।

ছায়াঝোপের নিবিড় আশ্রয়ে তিনি শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন। নারীর মত সুকুমার কমনীয় মুখে এক অপার্থিব ভাব মাখা, দীর্ঘ-দীর্ঘ চোখ দুটি নিমীলিত দীর্ঘ কালো জোড়া-ভুরুর তলায়। সুন্দরী নারীর মত লাবণ্যভরা মুখ। মুখ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে ও'র। ঝুরঝুর করে ঝরা পাপড়ি ঝরে পড়চে সোঁদালি ফুলের ও'র শয্যার ওপর। ডালে ডালে বনের পাখি নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্ছে, কত কি বন্যলতার ভাগ ওপরের ডাল থেকে নেমে এসে দুলচে ও'র বুকের কাছে, মুখের কাছে। তিৎপল্লা ফুল ফুটে আছে একটু দূরে একটা ঝোপে, রঙিন প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে সোঁদালি ফুলের ঝাড়ে ঝাড়ে, পিড়িং পিড়িং দুর্গা টুনটুনি ডাকচে, উঁচু গাছের মগডালে ডাকচে কুললো, কি সুন্দর গোধূলির রাঙা রোদ-সাজানো বনকুঞ্জ, কি স্নিগ্ধ ছায়ানিবিড় বীথিতল।

কিন্তু হঠাৎ মনে হোল তিৎপল্লা ফুল তো এখন ফোটে না, ও ফোটে শীতের প্রথম মাসে, দুপুর বেলা।

এখন ও ফুল কেন?

তা না, মনে হলো মহাশিল্পী, মহাকবি উনি, নিজের অনন্ত শয্যায় অন্তর্নিদ্রার স্থানটি নিজের ইচ্ছামত সাজিয়ে বসবেন আমি যেসব ফুল ভালবাসি বা দেখেছি তাই দিয়ে। শুধু কি ফুল? কত কি সুদর্শন, সুকুমার বন্যলতা, যা নিতান্ত এই বাংলার পল্লীপ্রান্তরে সুপরিচিত। নেই সেখানে অর্ক ও কোবিদার। নেই কুরুবক, অশোক, পুন্নাগ ও চম্পক, বর্ষাসাথী নীপও চোখে পড়ে না। হে পূর্বাচলের সবিতা, তোমার জবাকুসুমসঙ্কাশ রশ্মির রবিকরণও এখানে তপস্যার অভাবে প্রবেশলাভ করেনি। কি তপস্যা করেছিল এই প্রাচীন দিনের গাঙ্গুলী বংশের আমবাগান, কি তপস্যা করেছিল ইছামতীর তীর-তরুশ্রেণী।

ভালো করে চেয়ে দেখবার জন্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেই বনে।

কি অপরূপ স্নিগ্ধ ছবিখানা আমার সামনে।

বিপুল মহাসাগরে ইথারের মহাসমুদ্র, যেখানে কোটি তারা ডোবে জলে, তার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি সবুজ খড়ের দ্বীপ পৃথিবী।

বিশ্বের রাজাধিরাজ পরম সৌম্য, পরম প্রেমী অধিদেবতা, যাঁর তৈরী আব্রহ্মস্তম্ভ এই জগৎ, এই মহাজগৎ, সেই পরম রহস্যময় দেবতা আজ কেন শায়িত এই আমবাগানে! সোঁদালি ফুল ঝরচে তাঁর সুকুমার লাবণ্যমাখা মুখের ওপর, সে-মুখ দেখে তক্ষনি ভালবাসতে ইচ্ছে করে—বিশেষ করে যখন মনে হয় জগতে ক'জনই বা ওঁকে জানে বা ওঁকে ভালবাসে বা ওঁর কথা ভাবে। উনি সব চেয়ে বেশি অবহেলিত জগতের মধ্যে—কাঁচ কাঁচ লতা দুলচে, একটু দূরে রাঙন প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড়ে ঝাড়ে, আবার নীল বনকলমীর ফুলে-ভর্তি একটা লতা উঠেচে ষাঁড়াগাছের মাথায়, অকালে একটা শিমুলের শাখায় রাঙা রাঙা ফুলে ফুটে আছে, টুকটুকে মাকালফল ঝুলচে, লেজঝোলা হলদে পাখী বসে আছে, যে ফুল কেউ দেখে না ও কেউ আদর করে না—তেমন ফুল ফুটে আছে তাঁর বনতলে, তাই দিয়ে রচিত হয়েছে তাঁর পত্রশয্যা।

প্রণাম, হে খেয়ালী দেবতা প্রণাম।

ছোট একটা লতা উঠচে আমার রোয়াকের ঠেস-দেওয়ালের পাশের নারিকেল গাছটা বেয়ে। আমার বাড়ির ওদিকটাতে ঘন বনঝোপ। আগে যুগলকাকার ভিটে ছিল ওখানটাতে, ছেলেবেলায় তাঁর কাছে আমি কিছুদিন অংক কষতাম, কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পরে তাঁর ছেলেরা এ গ্রাম থেকে উঠে অন্যত্র গিয়ে বাস করচে, এখন সেখানে ঘন ছোট এড়াঞ্চি গোয়ালে লতা, সোঁদালি গাঁদালে শাক, বনমৌরি ও আদাড়ে কাশের জঙ্গল।

আমি ঠেস-দেওয়ালটাতে বসে বসে লিখি। হঠাৎ দেখলাম একদিন নারকোল গাছের গা বেয়ে একটা লতা উঠেচে। ভালো করে চেয়ে দেখলাম, বুনো তিৎপল্লার লতা, যারা জানে না তারা বলে তেলাকুচো। কিন্তু তেলাকুচো লতা একটু অন্য রকমের। ফলের গড়ন তো সম্পূর্ণ আলাদা।

দিনে দিনে পাতাটি বেড়ে উঠে নারকোল গাছ বেয়ে ঠেলে উঠতে লাগলো। আমি অবাক হয়ে রোজ রোজ যেয়ে দেখি। ক্রমে তার ফুল হোল, যে ফুলের কুঁড়ি এসব অঞ্চলের দুলে মেয়েরা নাকে নোলক করে পরে। আমরাও বাল্য পরেছি। ফুলের সময়টাতে রঙবেরঙের কত প্রজাপতির বাহার। সুকুমার লতাগ্রভাগ নারকোল গুঁড়ি ছেড়ে এদিকে ছড়িয়ে পড়ে দুলচে বাতাসে, তাদের গাঁটে গাঁটে সাদা সাদা ফুল আর ফুলে ফুলে হলদেডানা নীলডানা প্রজাপতিকুলের মুক্তপক্ষ সঞ্চরণ। এরা বনান্তস্থলী একটি অপূর্ব সৌন্দর্যে মুখরিত করে রাখে সারা সকাল বেলাটা। আমি লেখা ছেড়ে মাঝে মাঝে সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি।

একদিন ওর ফলের জালি পড়লো। জালি পুষ্ট হয়ে তেলাকুচো আকারের ফলে পরিণত হোল। ক্রমে একদিন ফল পেকে টুকটুকে লাল দেখালো। ছোট্ট একটা দুর্গা টুনটুনি পাখি এক শ্রাবণ অন্ধকারের মেঘমেদুর শ্যামলতা ও অতলস্পর্শ শান্তির মধ্যে দেখি ফলটার পাশের লতার ডগায় বসে মহাআনন্দে রাঙা ফলটি ভোজন করচে। কি অপূর্ব আনন্দই না সেটুকু পুচকে পাখির খাওয়ার ভঙ্গির মধ্যে। তখনও দুলচে উপরের দিকের লতাগ্রভাগে কত সাদা কুচো কুচো ফুল নোলকের মত, কত সবুজ কাঁচফলের জালি।

ওর পিছনে বিশাল. প্রাচীন বকুল গাছটা। বর্ষার দিনে মেঘের ঘন ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আছে ওর তলা। আর্দ্র লতাকোণে কি সুগন্ধ ফুল ফুটেচে, জলভরা বাতাসে তার সুবাস। এই শ্যামল বনানীর নিবিড় পটভূমিতে সেই তিৎপল্লার লতাটা কি সুন্দর দেখায়। ঠেস-দেওয়ালে বসে চেয়ে দেখতে দেখতে এক-একদিন কি আনন্দ যে পাই।

শুধু ঐ ক্ষুদ্র তিৎপল্লার লতা আর তার ফুল নয়, এক অদ্ভুত ও আশ্চর্য জিনিস দেখি ওর মধ্যে। ও সামান্য বন্যলতা নয়। গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে সন্ধ্যায় একমনে ওর দিকে চেয়ে থেকো, চেয়ে থেকে দেখো। অসীমের মহিমময় বাণী এসে পেঁছবে তোমার মনে।

কি বিপুল সমারোহ করতে হয়েচে ওই বুনোলতাকে বাঁচিয়ে রাখতে, ওর ফুল ফোটাতে, ওর ফল পাকাতে। সূর্যের বিশাল অগ্নিকুন্ডটা আকাশের দূর প্রান্তে বসাতে হয়েচে ওর

জন্যে, কত কি গ্যাস, কত কি রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করতে হয়েচে ওর জন্যে, কোটি কোটি মাইল ইথারের সমুদ্র ভেদ করে সূর্যরশ্মিকে পৃথিবীতে ছুটে আসতে হয়েচে ওকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যগ্র আগ্রহে। তবে আজ ওর ফুল ফুটেচে, ওর ফল পেকে লাল টুকটুক করচে।

পরম ব্রহ্মের প্রাণময়ী বার্তা বহন করে এনেচে ওই বন্যলতা লোক-লোকান্তরের অসীমতা থেকে। যে মহাশিল্পীর হাতের এই অতি সুকুমার শিল্প, সেই শিল্পীর স্বাক্ষর আছে ওর পাতায়, ফুলে, লাবণ্যময় দুলুনিতে—ওর মধ্য দিয়েই তাঁকে প্রত্যক্ষ কর।

— বিভূতি গল্প-সমগ্র সমাপ্ত —